ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস

ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক

ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস

ভারতে মুসলিম শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (৭১২-১৯৭১) ঃ আরবদের সিন্ধু বিজয় হইতে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি পর্যন্ত ভারতে মুসলমানদের শাসনামল এবং ইংরেজ আমলে ভারতে মুসলমানদের অবস্থা এই পুস্তকের মূল বিষয়বস্তু। ১৯৪৭-এর পর হইতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা পর্যন্ত দুইটি অধ্যায়ে পাকিস্তানের প্রশাসনিক অবস্থা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিকা আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচ্য সময়ের প্রত্যেকটি বংশ, সাম্রাজ্য বা উল্লেখযোগ্য বিজয়ী সুলতান ও সম্রাটদের ইতিহাস উপস্থাপনকালে তাহাদের উপর প্রকাশিত গবেষণালব্ধগ্রন্থের সূত্র উল্লেখ করা হইয়াছে।

গ্রন্থের ভূমিকায় ভারতের ভৌগলিক বিবরণ, মুসলমানদের আগমন, ইতিহাসের উপাদান বিবৃত হইয়াছে। মূলগ্রন্থ তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের দশটি অধ্যায়ে সুলতানী আমলের বংশসমূহের ইতিহাস লেখা হইয়াছে। শেষ তিনটি অধ্যায়ে দিল্লী সালতানাতের পতন, সালতানাতের সাধারণ পর্যালোচনা ও গণজীবন আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের দশটি অধ্যায়ে মুঘল সম্রাটদের ইতিহাস তুলিয়া ধরা হইয়াছে। শেষ তিনটি অধ্যায়ে মুঘলগণ ও সাম্রাজ্যের পতন, মুঘল প্রশাসনের সাধারণ আলোচনা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্বলিত গণজীবন তুলিয়া ধরা হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডের একটি অধ্যায়ে ইউরোপীয়দের আগমন ও ক্ষমতা দখল,ব্রিটিশ শাসনে মুসলমানদের অবস্থা, মুসলমানদের সংস্কার আন্দোলন ও ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন, মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ নীতি, পাশ্চাত্য ছাপ, বেসামরিক প্রশাসন ও সাংবিধানিক পরিক্রমা, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং ভারত বিভক্তি আলোচনা করা হইয়াছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পরের এক অধ্যায়ে পাকিস্তানি আমলের ধারা বিবরণী এবং আরেকটি অধ্যায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন আলোচনা করা হইয়াছে।

পুস্তকের প্রতেকটি অধ্যায়ের শেষে পাদটীকা এবং সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হইয়াছে। ৭১২ সালে আরবদের সিন্ধু বিজয় হইতে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের ইতিহাসের একত্র সমারোহ পুস্তকটিকে এক বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। ফলে শিক্ষার্থী এবং সাধারণ ইতিহাসানুরাগী পাঠকদের অনেক অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করিয়াছে।

ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক ১৯৪১ সালে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৬২ সালে এম.এ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। রংপুর কারমাইকেল কলেজ, চট্টগ্রাম সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজসহ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কলেজে অধ্যাপনা শেষে ১৯৭০ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত আছেন। তিনি প্রভোষ্ট, প্রক্টরসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। ১৯৭৩-৭৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কাঠামো তিনিই নির্মাণ করেন। BNCC-এর অধিনায়ক হিসাবে তিনি লেঃ কর্ণেল পদ লাভ করেন। ১৯৯৫-৯৭ সাল পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। আন্তর্জাতিক সম্মেলন উপলক্ষে এশিয়া ও ইউরোপ সফর করেন। ১৯৯৬-৯৭ সালে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সদস্য ছিলেন। প্রকাশিত গবেষণাপত্রের মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'Sale Deed of Calcutta Sutanuti and Govindpur : An Analysis of the Position of the English in it' প্রবন্ধটি যথেষ্ট আলোচিত হইয়াছে। প্রকাশিত গ্রন্থ : 'A Short History of Muslim Rule in Indo-Pakistan; Bengal Towards the Close of Arangzib's Reign', 'ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন', 'বাংলার ইতিহাস : ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনাপর্ব' এবং অনুবাদগ্রন্থ : মধ্যপ্রাচ্য : অতীত ও বর্তমান। তাঁহার সম্পাদনা গ্রন্থ : Society and Culture in Islam.

এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, বাংলা একাডেমী, পশ্চিম বাংলা ইতিহাস সংসদের জীবন সদস্য। প্রশাসনিক কর্মদক্ষতার জন্য American Biographical Institute তাহাদের International Directory of Distinguished Leadership এর ৭ম, ৮ম ও ৯ম (Millennium) সংস্করণে, Asian/American Who's Who-এর প্রথম খণ্ডে Biography Today এর New Millennium Edition-এ তাঁহার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস

(৭১২খ্রিঃ-১৯৭১খ্রিঃ)

ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক

অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রাক্তন উপাচার্য

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন

ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস

ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক

মোরশেদ আলম, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ৬৭ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ, ফোন : ৭১১১৯৬৯। প্রচ্ছদ : ধ্রুব ত্রিবেদী। বর্ণবিন্যাস : ইমারত কম্পিউটারস, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০। মুদ্রণে : আল-ফয়সাল প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০। গ্রন্থস্বত্ব : লেখক। প্রকাশকাল : প্রথম সংস্করণ মার্চ, ২০০৩; পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল, ২০১১, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১৭।

মূল্য : পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

VHARATE MUSLIM SHASANER ITIHAS by Muhammad Inam-ul Hoque. Published By Morshed Alam, Jatiya Grontha Prakashan, 67 Pyari Das Road, Dhaka-1100. Bangladesh. Date of Publication, First Edition, March, 2003; Second Revised Edition, April, 2011; Third Edition, July 2017.

Price Tk. [illegible] Only. US $ 15.

ISBN 984-560-203-7

উৎসর্গ

আমার প্রথম শিক্ষক
মরহুম মৌলবী মুনিরুজ্জামান
ও
আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও শিক্ষক
মরহুম সৈয়দ আবদুল আলীম
স্মরণে

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল' বইখানি প্রকাশিত হওয়ার পর লক্ষ্য করলাম বাংলার মোগল আমলের ইতিহাসের উপর ব্যাপক কোন গবেষণা হয়নি বা ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত হয়নি, বিশেষ করে কিছু বিষয়ে কয়েকখানি বই ছাড়া। এই উপলব্ধি থেকে অনুভূত হলো ইতিহাসের মৌলিক উপাদানগুলি পুনর্মূল্যায়ন করে বাংলায় মোগল আমলের ইতিহাস পুনর্গঠন করার অবকাশ রয়েছে। তাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ' আমাকে সিনিয়র ফেলোশীপ মঞ্জুর করলে আমি বাংলার মোগল আমলের ইতিহাস লিখার কাজ হাতে নিই এবং মোগল আমল-এর প্রথম খণ্ড শেষ করে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হই।

বইটি 'ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর দ্রুতই পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বাজারে দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। কিন্তু নানাবিধ অসুবিধায় পড়ে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ বিলম্বিত হয়। অবশেষে পাঠকদের চাহিদার কথা ভেবে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো।

জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনকে ধন্যবাদ, তাঁরা অতি যত্নসহকারে অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রকাশ করতে পেরেছেন। বইটি ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক এবং সকল ইতিহাসানুরাগীর উপকারে আসলে পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

১৫.৪.০৫ মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক

ভূমিকা

হিষ্টরি অব বেংগল ভল্যুম ২ প্রকাশিত হওয়ার পরে চল্লিশ বৎসরেরও বেশী সময় গত হয়েছে। বইখানি স্যার যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। ইহা বাংলার মুসলমান শাসনের ইতিহাসে একটি মূল্যবান অবদান। ইহা আমাদের জ্ঞান প্রসারিত করেছে এবং প্রমাণ করেছে যে, পূর্ববর্তী ইতিহাস গ্রন্থ রিয়াজ-উস-সলাতীন এবং ষ্টুয়ার্টের হিষ্টরি অব বেংগল-এ প্রাপ্ত ইতিহাস ছিল নিতান্ত অপ্রতুল এবং ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। কালক্রমে স্যার যদুনাথ সম্পাদিত হিষ্টরি অব বেংগল-এর অপ্রতুলতা এবং ভুল-ভ্রান্তিও আধুনিক ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিগোচর হয়।

গত প্রায় তিন যুগ ধরে আমি বাংলার ইতিহাসের সুলতানী আমল নিয়ে গবেষণা করেছি এবং সুলতানী আমলের বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকখানি বই এবং বেশ কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছি, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবংগের আরও কয়েকজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিকও সুলতানী আমলের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং বই ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে বলা যায় যে সুলতানী আমল সম্পর্কে হিষ্টরি অব বেংগল, ভল্যুম ২-এর তুলনায় আমাদের জ্ঞান বেশ প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু বাংলার মোগল আমলের ইতিহাসে কোন ব্যাপক গবেষণা হয়নি বা ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত হয়নি। বিশেষ বিষয়ে কয়েকখানি বই প্রকাশিত হয়েছে, যেমন তপন কুমার রায় চৌধুরীর "বেংগল আণ্ডার আকবর এ্যাণ্ড জাহাংগীর", আমার "মুর্শিদকুলী খান এ্যাণ্ড হিজ টাইমস", খন্দকার মাহবুবুল করিমের "দি প্রভিনসেস অব বিহার এ্যাণ্ড বেংগল আণ্ডার শাহজাহান" এবং অঞ্জলি বসুর "বেংগল আণ্ডার আওরংজেব"। প্রথম বইখানি মূলত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. ফিল. থিসিস এবং শেষ তিনটি মূলত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এ্যাণ্ড আফ্রিকান ষ্টাডিজের পি.এইচ-ডি থিসিস। এই বইগুলি প্রমাণ করেছে যে, ইতিহাসের মৌলিক উপাদানগুলি পুনর্মূল্যায়ণ করে বাংলায় মোগল আমলের ইতিহাস পুনর্গঠন করার অবকাশ রয়েছে। তাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ আমাকে সিনিয়র ফেলোশীপ মঞ্জুর করলে আমি বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল) লিখার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। এই পরিকল্পনা নিম্নরূপ :

- প্রথম খণ্ড : বাংলা ইতিহাস : মোগল আমল : ১৫৭৬-১৬২৭। (দাউদ খান কররানীর পতন থেকে মোগল সম্রাট জাহাংগীরের মৃত্যু পর্যন্ত।)
- দ্বিতীয় খণ্ড : বাংলার ইতিহাসঃ মোগল আমল : ১৬২৭-১৭০৭। (শাহজাহান ও আওরংগজেবের রাজত্বকাল।)
- তৃতীয় খণ্ড : বাংলার ইতিহাসঃ মোগল আমল : ১৭০৭-১৭৫৭। (মুর্শিদকুলী খান থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত।)

চতুর্থ খণ্ড : বাংলার ইতিহাসঃ মোগল আমল : (সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস।)

পঞ্চম খণ্ড : বাংলার ইতিহাসঃ মোগল আমল : (অর্থনৈতিক ইতিহাস।)

এই পরিকল্পনা মতে প্রথম খণ্ড শেষ করে পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আনন্দিত বোধ করছি।

বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল) এর এই প্রথম খণ্ডে কররানী সুলতান দাউদ খানের পতন থেকে মোগল সম্রাট জাহাংগীরের মৃত্যু পর্যন্ত একপঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস লিখিত হয়েছে। এই অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস বাংলার ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সময়েই বাংলায় মোগল শাসন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের পরে বাংলায় স্থিতিশীলতা এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরে আসে। বাংলা মোগল সুবারূপে ইহার স্বাভাবিক ভৌগোলিক সীমারেখা ফিরে পায় এবং বাংলার হিন্দু-মুসলমান একত্রে মুসলমান মোগলদের বিরুদ্ধে একই কাতারে সমবেত হয়ে যুদ্ধ করার সুযোগ পায়। সুলতানী আমলে বাংগালা নামের উৎপত্তি হয়, মোগল আমলে বাংগালা স্বাভাবিক সীমায় রূপ লাভ করে। History of Bengal. vol. II প্রকাশিত হওয়ার পরে এই পর্বের ইতিহাসের বিশেষ কিছু নতুন উপাদান আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বেশ কিছু গবেষণা কর্ম প্রকাশিত হয়েছে। নতুন তথ্য আবিষ্কৃত না হলেও পুরাতন তথ্য নতুন আলোকে বিশ্লেষণ করে এই পুস্তকখানি লিখিত হয়েছে। ইহাতে আশাতিরিক্ত সুফল পাওয়া গেছে বলে আমার বিশ্বাস। আবদুল লতীফের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা ডায়রী এবং মিরযা নাথনের বাহরিস্তান-ই-গায়বী আবিষ্কারের কৃতিত্ব স্যার যদুনাথের, এই আবিষ্কারের জন্য বাংগালীরা স্যার যদুনাথের নিকট চিরদিন ঋণী থাকবে, কারণ এই দুইটি সূত্র আবিষ্কারের আগে বাংলায় মোগল অধিকারের ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু History of Bengal vol. II তে এই দুইটি মহামূল্যবান সূত্রের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে হয় না। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে এই পর্বের লেখক ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যা লিখেছিলেন, সম্পাদক স্যার যদুনাথ তা সংক্ষেপ করে প্রায় অর্ধেকে নিয়ে এসেছেন (HB II. preface. IX)। এই প্রথম খণ্ডে আমরা বার-ভূঁঞাকে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছি, ভাটি এবং ভাটির বার-ভূঁঞার নতুন করে পরিচিতি দেয়া হয়েছে এবং বার-ভূঁঞা সম্পর্কে পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের ভুল ধারণা নিরসন করা হয়েছে। মোগল আগ্রাসনের প্রতি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ভূঁঞাদের প্রতিরোধ, এবং মুসা খান মসনদ-ই-আলা ও বার-ভূঁঞার যুদ্ধ আমরা গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছি। খাজা উসমানের যুদ্ধ এবং তার পরিণামের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আকবরের বিখ্যাত সেনাপতিরা যেখানে বাংলা জয় করতে বিফল হয়েছেন, সেখানে ইসলাম খান চিশতী কিভাবে এবং কি গুনে মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে সারা বাংলা জয় করে অসাধ্য সাধন করেছিলেন. সেই বিষয়টির উপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। কাসিম খান এবং

ইবরাহীম খান ফতেহজংগের সুবাদারী আমলের প্রতিও History of Bengal. vol. II র তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বাংলার ইতিহাসের অনেক অস্পষ্ট বিষয়ে এই বই নতুন আলোকপাত করতে সক্ষম হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল) প্রথম খণ্ড রচনার সময় আমি অনেকের সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ কর্তৃপক্ষের কথা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনস্টিটিউট-এর অনেক অধ্যাপকদের সংগে আমার পূর্বপরিচয় ছিল কিন্তু রাজশাহী যাওয়ার আগে আমি জানতাম না যে সেখানে আমার এত অধিক সংখ্যক সুহৃদ এবং বন্ধু আছে। সকলের নাম উল্লেখ করা এখানে সম্ভব নয়, তবে যাঁদের নাম উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আমানুল্লাহ আহমদ, উপ-উপাচার্য প্রফেসর আতফুল হাই শিবলী, ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর সফর আলী আকন্দ, প্রফেসর মাহমুদ শাহ কোরেশী, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম, ড. প্রীতি কুমার মিত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এ. বি. মোশারফ হোসেন, প্রফেসর শাহানারা হোসেন, প্রফেসর এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, ড. গোলাম রসুল এবং ড. মুহিবুল্যা ছিদ্দিকী। ইনস্টিটিউটের সচিব জনাব জিয়াদ আলী এবং ফেলোরা সকলে আমার রাজশাহী অবস্থান স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলেন, ফেলো মিঃ মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন ও তৌহিদ হোসেন চৌধুরী এবং তাদের স্ত্রীদের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী, আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ফেলো সবাই আমাকে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেন, বিশেষ করে আবুল হাশেম, আমিনুল ইসলাম, তৌহিদ হোসেন চৌধুরী, জাফর হানাফী, বদীউল আলম এবং নীলকান্ত বেপারীর সাহায্য সহযোগিতা ভুলবার নয়। তাদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এ. এফ. সালাহউদ্দীন আহমদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ, তিনিই সর্বপ্রথম আমার রাজশাহী যাওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করেন, প্রফেসর আকন্দ প্রস্তাব বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন এবং মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর আমানুল্লাহ আহমদের আন্তরিকতায় প্রস্তাবটি বাস্তবিক হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আবদুল মোমিন চৌধুরী, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম, প্রফেসর কে. এম. মোহসীন এবং প্রফেসর মুফাখখারুল ইসলামের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ, তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি থেকে বই পুস্তক, সাময়িকীর ফটোকপি সরবরাহ করে আমাকে সাহায্য করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. আবদুল সাঈদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের সহকারী কিউরেটর জনাব শামসুল হোসাইনও বই পুস্তক সংগ্রহ করে দিয়ে সাহায্য করেছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক জনাব ফারুক আহমদ এবং সহকারী ডকুমেনটেশন অফিসার জনাব সাদেক রেজা চৌধুরীও বইপত্র দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। রাজশাহী বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক জনাব ফারুক আহমদ এবং সহকারী ডকুমেনটেশন অফিসার জনাব সাদেক রেজা চৌধুরীও বইপত্র দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। রাজশাহী বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরীও বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের সকলেই

সহযোগিতা করেছেন, বিশেষ করে জনাব মোঃ আবদুল গাফফার ও আবদুস সালাম আকন্দ বইখানির প্রেস কপি তৈরি করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, জামাতা, পুত্রবধূ এবং নাতি-নাতনীদের কথা না বললে এই পর্ব অসম্পূর্ণ থাকবে। আমার অনুপস্থিতিতে তারা আমার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমার স্ত্রী এবং ছোট ছেলে মাঝে মাঝে আমার সংগে রাজশাহীতে আসে। রাজশাহীর আবহাওয়া চট্টগ্রামের আবহাওয়ার চেয়ে কিছুটা অনুদার, যাতায়াত ব্যবস্থাও খুব সুখকর নয়। সুতরাং তারা রাজশাহীতে আসলেও অস্বস্তিতে থাকে, আবার চট্টগ্রামে থাকলেও উৎকণ্ঠায় দিন কাটায়। কিন্তু তারা হাসিমুখে এই অস্বস্তি এবং উৎকণ্ঠা সহ্য করে যায়। তাদের মংগলের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহতালার নিকট প্রার্থনা জানাই।

বইখানি নিষ্ঠাসহকারে ছাপাবার জন্য উত্তরণ প্রেসের মালিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বইখানি সমাদৃত হলে এবং ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও পাঠকদের কাজে আসলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
১৫-০১-১৯৯২

লেখক

এই লেখকের অন্যান্য বই :

ইংরেজি বই

Social History of the Muslims in Bengal (down to A. D. 1538)
Corpus of the Muslim Coins of Bengal (down to A. D. 1538)
Murshid Quli Khan and His Times
Dacca The Mughal Capital
Catalogue of Coins in the Cabinet of the Chittagong University Museum
Corpus of Arabic and Persian Inscriptions of Bengal
History of Bengal : Mughal Period, vol. I (Form the fall of Daud Karranl 1576 to the death of Jahangir).

বাংলা বই

ঢাকাই মসলিম
শরিয়তনামা (কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের শরীয়তনামার সম্পাদনা)
ভারত উপ-মহাদেশে মুসলিম শাসন
বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)
চট্টগ্রাম ইসলাম
হজরত শাহ সুফী আমানত খান
বাংলার সূফী সমাজ
মোল্লা মিসকিন শাহ
মক্কা শরীফে বাংগালী মাদ্রাসা
ফুতূহাত-ই-ফীরুজশাহী (সুলতান ফীরুজ শাহ তুঘলক বিরচিত ফুতূহাত-ই-ফীরুজশাহীর বাংলা অনুবাদ)

ANCIENT INDIA
(BHARATA-VARSHA)
English Miles
100 0 100 200 300 400
VIDEHA
PUNDRA
VARDHANA
Lichchhavis
Pataliputra (Patna)
MAGADHA
ANGA
GAUDA
RADHA
VARENDRI
SAMATATA
SUHMA
UTKALA
Kongoda
Ganjam
Dantapura
PURVA
SAGARA
JALANIDHI
SUVARNA BHUMI
Andaman Islands
Nicobar Islands
Longitude East 90° of Greenwich
90°
100°
30°
20°
10°

ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

মুসলমানদের আগমন ও দিল্লী সালতানাত

৭১১-১৫২৬ খ্রিঃ

প্রথম অধ্যায়
মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের অবস্থা

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতীয় উপমহাদেশের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল বলিয়া ধারণা করা হয়। তখনকার দিনে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কোন প্রকার উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। প্রাক-মুসলিম-ভারতের ইতিহাসে কোন প্রকার জাতিগত একাত্মতাবোধ বা ভৌগোলিক অখণ্ডতার ভাবধারণা পরিলক্ষিত হয় না। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের বিরাজমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার রূপরেখা ছিল নিম্নরূপ ঃ

রাজনৈতিক অবস্থা ঃ রাজা হর্ষবর্দ্ধন (মৃত ৬৪৫ খ্রিঃ) এক সুবিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেন এবং তাঁহার সময়েই ভারতের কিছুটা রাজনৈতিক সাম্রাজ্য বা রাজ্যবোধের উদয় হয়। কিন্তু ৬৪৫ সালে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশ বিশৃঙ্খলায় পতিত হয় এবং তৎকালীন দুর্ভিক্ষ এই বিশৃঙ্খলাকে আরও গুরুতর করিয়া তোলে। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর এই বিশৃঙ্খলা বেশ কিছু বৎসর স্থায়ী হয়। এই সময়ের গোলযোগকে হিন্দু হইতে মুসলিম ভারতের পরিবর্তন যুগ বলা যায়। হর্ষবর্দ্ধনের সময় ভারতের আংশিক ভৌগোলিক ঐক্যও দূরীভূত হয় এবং দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে মুহাম্মদ ঘোরি ভারতীয় বিশাল ভূখণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশগুলিকে দিল্লী সালতানাতের অধীনস্থ করিয়া ইসলামের ছত্রছায়ায় ভারতীয় ঐক্যের নূতন চত্বর রচনা করেন। তাঁহার পূর্বে ভারতীয় ঐক্যের পুনর্গঠন আর সম্ভব হয় নাই।

রাজপুত ঃ এই পরিবর্তন যুগের উল্লেখযোগ্য বিষয় রাজপুত গোষ্ঠীর উদয়। ইহাদের কথা পূর্বে ইতিহাসে আর কখনও শুনা যায় না। অষ্টম শতক হইতে তাহারা উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ইতিহাসে একটি প্রসিদ্ধ ভূমিকা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। রাজপুতগণ এতই খ্যাতিসম্পন্ন হইয়া উঠে যে, সপ্তম শতকের মাঝামাঝিতে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর হইতে মুসলমানদের ভারত বিজয় পর্যন্ত সময়কে রাজপুত-যুগও বলা চলে।

রাজপুতগণ নির্দিষ্ট কোন একটি বংশোদ্ভূত নহে। এই নাম বলিতে একটি যুদ্ধপ্রিয় স্বভাবের গোত্র বা গোষ্ঠী বুঝায় মাত্র। এই গোত্রের লোকেরা নিজেদের কুলীন সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া দাবি করে। মূলত তাহারা হিন্দু ছিল না। কিন্তু পরে তাহাদিগকে হিন্দু সমাজের মধ্যে গণ্য করিয়া লওয়া হয়।

এই পরিবর্তন যুগের গোলযোগে কতকগুলি নূতন রাষ্ট্রপুঞ্জের সৃষ্টি হয়। এইগুলি— (১) হিমালয়ের রাজ্যসমূহ, (২) মূল দাক্ষিণাত্য এবং মহীশূর, (৩) সুদূর দক্ষিণাবর্ত এবং (৪) সমতলভূমির উত্তর ও পশ্চিমা রাজ্যসমূহ।

হিমালয়ের রাজ্যসমূহ (Himalayan Kingdoms) :

ভারতের সীমান্তে চীন ঃ ৬৬১ হইতে ৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনদেশ পৃথিবীর বুকে অতুলনীয় সম্মান উপভোগ করে। সোয়াত উপত্যকা এবং পারস্য হইতে কোরিয়া পর্যন্ত এই সমগ্র ভূভাগ হইতে তাহারা রাজদূত গ্রহণ করে। কিন্তু এই খ্যাতি বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই। অষ্টম শতকে মুসলমানদের অগ্রগতি কাশ্মীর পর্বতশ্রেণীর উপর চীনাদের সমস্ত দাবি নস্যাৎ করিয়া দেয়।

তিব্বত ঃ সপ্তম এবং অষ্টম শতকে তিব্বত একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। ৬২৯ হইতে ৬৫০ সালের মধ্যে বিখ্যাত তিব্বতি রাজা স্ট্রঙ্গ স্যান গ্যামপো (Strong tsan Gampo) একজন জবরদখলকারীকে পরাভূত করেন। এই জবরদখলকারী হর্ষবর্দ্ধন কর্তৃক পরিত্যক্ত সিংহাসন অধিকার করিতে সাহস করে। এই রাজা তাঁহার রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলন করেন। তিনি লাসা শহরও স্থাপন করেন।

নেপাল ঃ এই উপত্যকাটি সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যের একটি অংশ হিসাবে দীপ্যমান ছিল। চতুর্থ শতকে নেপাল সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করে। সপ্তম শতকে এখানে তিব্বতের অধিকার সমুন্নত ছিল। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর অর্ধ-শতকের জন্য ইহা তিব্বতের অধীনে চলিয়া যায়। ভারতের ইতিহাসের স্রোত নেপালকে স্পর্শ করে নাই, কারণ ইহা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল।

কাশ্মীর ঃ কাশ্মীরের পর্বতরাজি প্রায়ই ইহাকে বিদেশী আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করে এবং এইভাবে ইহা স্বীয় বিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসে। এতদসত্ত্বেও মৌর্য এবং কুশান উভয় বংশই এই উপত্যকার উপর যথার্থ অধিকার চালাইয়া যায়। রাজা হর্ষবর্দ্ধন এই দেশকে তাঁহার সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে চেষ্টা করেন নাই। কাশ্মীরের হিন্দু শাসকগণ প্রায়ই অত্যাচারী ছিলেন। তাহাদের নীতি ছিল কৃষকদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত শোষণ করা এবং তাহাদের হাতে মাত্র সামান্য জীবিকাটুকু রাখিয়া আসা। চতুর্দশ শতকে অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করে।

আসাম ঃ কাশ্মীরের ন্যায় আসামও পর্বতশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত। দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতরাজির দরুন ইহা স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসে। এই দেশ মৌর্য অথবা কুশান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। চতুর্থ শতকে ইহার হিন্দু রাজা সমুদ্রগুপ্তের প্রভুত্ব মানিয়া নেন। আসামের রাজা যদিও রাজা হর্ষবর্দ্ধনের অধীনে ছিলেন না, তথাপি তিনি হর্ষবর্দ্ধনের রাজকীয় আদেশসমূহ পালন করিতেন। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর এই বশ্যতা ত্যাগ করা হয়।

দাক্ষিণাত্য এবং মহীশূর (The Deccan proper and Mysore) :

উত্তরে নর্মদা নদী, দক্ষিণে কৃষ্ণ ও তুঙ্গভাদ্র নদী এবং এইগুলির বাহিরের নদীসমূহের মধ্যে মূল দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি বিস্তৃত। মহীশূর সাধারণত সুদূর দক্ষিণাবর্তের চেয়ে মূল দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির সহিত অধিক সংযুক্ত। তৃতীয় শতকের প্রারম্ভে অন্ধ্রশক্তির বিলুপ্তি পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট। তৃতীয় শতক হইতে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত কদম্ব বংশ স্বাধীন ক্ষমতা উপভোগ করে। দ্বিতীয় শতক হইতে একাদশ শতক পর্যন্ত মহীশূরে গঙ্গা বংশ রাজত্ব করে।

চালুক্য বংশ ঃ মধ্যযুগের প্রথম দিকে যেইসব বংশ দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করে তন্মধ্যে চালুক্যগণ সুপ্রসিদ্ধ। এই বংশের রাজা দ্বিতীয় পুলকেশিন হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক। হর্ষবর্দ্ধন দাক্ষিণাত্যকে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে চেষ্টা করিলে দ্বিতীয় পুলকেশিন সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন। অন্যান্যদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন বিক্রমাদিত্য, বিষ্ণুবর্দ্ধন, হইসালা এবং দেবগিরি বা আওরঙ্গাবাদের যাদবগণ। ১৩০৯ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের শেষ স্বাধীন রাজা রামচন্দ্র আলাউদ্দিন খিলজির বিখ্যাত সেনাপতি মালিক কাফুরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

সুদূর দক্ষিণাবর্ত (The Far South) :

পল্লভ বংশ ঃ পল্লভদিগকে ইতিহাসে প্রথম দেখা যায় কারিকল, কোলা এবং সিংহলের গজবাহুর পর। তৃতীয় শতকে অন্ধ্র বংশের বিলুপ্তির পর এই বংশের উৎপত্তি হয়। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত পল্লভগণ সুদূর দক্ষিণাবর্তে প্রবল প্রতাপশালী শক্তি ছিল। তাহারা পাণ্ডিয়া, কোলা ও চেরার রাজা এবং সিংহলের অধিপতিকে উৎখাত করিয়াছিল। মহেন্দ্র বর্মন এবং নরসিংহ বর্মন পল্লভ বংশের বিখ্যাত শাসক।

পরবর্তীকালে কোলা, পাণ্ডিয়া এবং চেরা রাজ্যসমূহ সুদূর দক্ষিণাবর্তের অন্যত্র খ্যাতি অর্জন করে। তাহারা প্রায়ই একে অন্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত।

সমতলভূমির উত্তর ও পশ্চিমা রাজ্যসমূহ ঃ
(The Northern and Western Kingdoms of the Plains)

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর হইতে মুসলিম বিজয় পর্যন্ত যুগটির মধ্যে কোন বিদেশী আক্রমণ সংঘটিত হয় নাই। বিভিন্ন সময় প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য হিন্দু রাজ্য সবসময়েই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকে। সমতলভূমির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাজ্য সম্পর্কে এইস্থলে আলোচনা করা প্রয়োজন।

গুজারা-পরিহারা রাজ্য ঃ ষষ্ঠ শতকে গুজারা বংশ ভারতে আগমন করে এবং বিভিন্ন জায়গায় রাষ্ট্র স্থাপন করে। তন্মধ্যে দক্ষিণ রাজপুতানার গুজারা রাজ্যটি প্রধান। যদিও তাহারা বিদেশী, কিন্তু তবুও সপ্তম শতকে তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। আনুমানিক ৭২৫ খ্রিস্টাব্দে গুজারাদের একটি অংশ পরিহারাগণ একটি বংশ প্রতিষ্ঠা করে। পরিহারাগণ পরবর্তী যুগে হর্ষবর্দ্ধনের রাজকীয় রাজধানী অধিকার করে। ১০১৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ পরিহারাদিগকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করেন।

কনৌজ ঃ রাজা হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর কনৌজ খুবই দুর্ভোগের ভিতর কালাতিপাত করে। ৭৪০ খ্রিস্টাব্দে যশোবর্মনকে পরাজিত ও হত্যা করা হয়। ৭৬ বৎসরের মধ্যে কনৌজের চারিজন রাজা শত্রুভাবাপন্ন শক্তি কর্তৃক পদচ্যুত হন। শেষ পর্যন্ত পরিহারাগণ ইহা অধিকার করে। কনৌজের রাজা মিহির পরিহারা, যিনি সাধারণত ভোজা নামে পরিচিত, অর্ধ শতক পর্যন্ত শাসন করেন। তাহার উত্তরাধিকারিগণ সৌরাষ্ট্র ও অযোধ্যা উভয় রাজ্য শাসন করেন। ভোজার পুত্র মহেন্দ্র পাল (৮০৯-৯০৮ খ্রিঃ) মগধ বা দক্ষিণ বিহার হইতে রাজস্ব আদায় করেন।

বাংলাদেশ ঃ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরবর্তী বাংলা ও বিহারের ইতিহাস অস্পষ্ট।[১] রাজকীয় গুপ্ত বংশের লোকেরা দক্ষিণ বিহারে রাজত্ব করেন। বাংলার গৌড় বা লক্ষণাবতীতে আদিসূর নামে একজন রাজা রাজত্ব করেন। তিনি একজন খাঁটি হিন্দু ছিলেন। গোঁড়া হিন্দু ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য কনৌজ হইতে তিনি পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহার রাজত্বকাল ৭০০ খ্রিস্টাব্দ বা তাহার পরে। তাঁহার মৃত্যুর পর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং একটি স্থায়ী সরকার গঠন করিবার জন্য জনগণ গোপালকে নির্বাচিত করেন। গোপালের পুত্র ধর্মপাল পালবংশ স্থাপন করেন। ধর্মপাল খুবই শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন। কনৌজের রাজাদিগকে তিনি একের পর এক পদচ্যুত করেন।[২] তাঁহার সময় বাংলাদেশের রাজার ক্ষমতা বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার পুত্র দেবপালও একজন প্রতাপশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি আসাম এবং কলিঙ্গও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহার পরবর্তী শক্তিশালী রাজা ছিলেন মহীপাল। এই বংশ অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া খ্রিঃ ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের বিহার বিজয় পর্যন্ত টিকিয়া থাকে।

সপ্তম শতকে বাংলাদেশের কিছু অংশ সেনদের অধীনে চলিয়া যায়। লক্ষ্মণ সেন এই বংশের শেষ রাজা। ১১৯৯ সালে এই দেশ ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির অধীনে আসে।

উপরোল্লিখিত বিবরণে দেখা যায়, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। অশেষ বংশীয় যুদ্ধ এবং বিদ্রোহ রাজনৈতিক নিয়ম-প্রণালীর কোন উন্নতি সাধন করে নাই। ঐতিহাসিক ভি. এ. স্মিথ (V. A. Smith) বলেন, "সমস্ত রাষ্ট্রগুলি পুরাতন প্রথানুযায়ী স্বেচ্ছাচারী রাজা কর্তৃক শাসিত হইয়া আসে, যাহাদের প্রত্যেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে কোন ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন ধর্মীয় পরিচালক কর্তৃক বিধিনিষেধ আরোপ না করা পর্যন্ত স্বীয় রাজ্যে নিজের খেয়াল-খুশিমাফিক আচরণ করেন।"[৩]

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ ভারতীয় উপমহাদেশ ইহার কল্পিত সম্পদের জন্য বিখ্যাত ছিল। একমাত্র এই সম্পদের জন্যই ভারতকে অনেক বিদেশী আক্রমণের শিকার হইতে হয়। পাশ্চাত্যের সঙ্গে এই দেশের গভীর বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

ভারতের জনগণ অর্থনৈতিক সভ্যতায় বেশ অগ্রগামী ছিল। বিপুল বৈদেশিক বাণিজ্য এই দেশের লোকদিগকে অর্থশালী ও উন্নতিশীল করে। শহরের অধিবাসীরা অর্থ দ্বারা কেনা যায়—এই ধরনের সব বিলাসিতা উপভোগ করে। এই দেশের দক্ষিণ অঞ্চল মরিচ ও মুক্তায় ঐশ্বর্যশালী ছিল এবং এইগুলিই আকর্ষণ করে বিদেশীদিগকে—প্রথমে রোমানগণ এবং পরে আরব মুসলমানগণ।

ফা হিয়েন-এর বিবরণ

চীনা তীর্থযাত্রীদের সর্বপ্রথম ভ্রমণকারী ফা হিয়েন সমতলভূমির উত্তরাংশের লোকদের সাধারণ অবস্থা অবলোকন করিয়া মন্তব্য করেন—"এই দেশের লোক বহুসংখ্যক এবং সুখী। পরিবারের লোকজনদের নাম সরকারি খাতায় তালিকাভুক্ত করাইতে হয় না, অথবা কোন হাকিম এবং তাঁহার আইনের কাছে গিয়া দাঁড়াইতে হয় না। শিরশ্ছেদ বা দৈহিক শাস্তি ছাড়াই রাজা দেশ শাসন করেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা দানশালা স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে ভ্রমণকারীদের জন্য কামরা, কৌচ, বিছানা, খাদ্য এবং পানীয় সরবরাহ করা হয়।"[৪]

সামাজিক অবস্থা ঃ সামাজিক জীবনে ভারতের লোকেরা প্রশংসামূলক কোনকিছু স্থাপন

করিতে পারে নাই। হিন্দুদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ নীতি নিম্নস্তরের লোকদিগকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বাংলার বল্লাল সেনকে এদেশের কিংবদন্তীতে বর্ণ-নীতির প্রতিষ্ঠাতারূপে স্মরণ করা হয়। তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থদের মধ্যে 'কুলিন' প্রথা প্রবর্তন করেন এবং অন্যান্য স্থানীয় লোকজনকে নীচ বর্ণের জাত বলিয়া চিহ্নিত করেন।

ব্রাহ্মণ্যবাদ এতই উন্নত ছিল যে, বৌদ্ধ ধর্মকে ইহার জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইতে হয়। নিম্ন বর্ণের লোকেরা সমাজে ঘৃণার বস্তু ছিল। সমাজে মেয়েদের কোন সম্মানজনক স্থান ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা চালু ছিল এবং পুনরায় বিবাহ করিবার অনুমতি ছিল না। সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। সমগ্র দেশেই মূর্তিপূজা চলিত।

সবচাইতে দুর্ভাগ্যবান এবং অমানুষিক ব্যবহারের শিকার ছিল অস্পৃশ্যরা (Untouchables)। তাহারা কোন কিছু স্পর্শ করিলে তাহা অপবিত্র বলিয়া গণ্য হইত। ব্রাহ্মণগণ ছিলেন সমাজের বিশেষ সুবিধার অধিকারী। রাষ্ট্রের গুরুতর শাস্তি হইতেও তাঁহারা রেহাই পান। হিন্দু ধর্ম ও সমাজের অধঃপতনের উপর মন্তব্য করিতে গিয়া ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন ঃ "ধর্ম কুসংস্কারে ভারাক্রান্ত ছিল এবং সমাজ একটি কঠোর বর্ণ-নীতির আওতায় আবদ্ধ ছিল, যাহা বিভিন্ন দলের ভিতর ঐক্য স্থাপনকে অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল।"[৫]

উপরে বর্ণিত অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে মুসলমানদের আগমনের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা মূল্যায়ন করা যায়। প্রত্যেক কিছু দ্বিধাবিভক্ত ও ধ্বংসের চিহ্ন বহন করে এবং জাতীয় জীবন বিলুপ্ত হয়। বর্ণ প্রথা অতি প্রবল ছিল। রাজনৈতিক কোন স্থিতিশীলতা ছিল না। সতীদাহ প্রথা জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। পুরুষগণ একাধিক বিবাহ করিতে পারিত; কিন্তু মহিলারা বিধবা হইলে পুনরায় স্বামী গ্রহণ করিতে পারিত না। আন্ত-বর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। অস্পৃশ্যরা সমাজে নিগৃহীত ছিল। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাঠশালা চতুষ্পাঠী থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোকের জীবনধারা কুসংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইত। মোটের উপর হিন্দু সামাজিক জীবন ইহার বহুধা বিভক্তি ও একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের দরুন পশ্চিম হইতে আগত মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার মত যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না।

পাদটীকা

১। Wolseley Haig : *The Cambridge Shorter History of India* পৃ: ১১০।

২। ঐ পৃ: ১১১।

৩। All the States continued to be governed in the old-fashioned way by despotic Rajas, each of whom could do what he pleased so long as his power lasted, unless he suffered his will to be controlled by Brahman or other religious guides.

— V. A. Smith : *Oxford History of India.*

৪। The people are numerous and happy. They have not to register their households, or attend to any magistrates and their rules. The king governs without decapitulation or other corporal punishment.

People of various sects set up houses of charity where rooms, couches, beds, food and drink are supplied to travellors.

৫। Religion was encumbered by superstition, and society was held in the grip of a rigid caste system which rendered the unification of the various groups impossible.

গ্রন্থপঞ্জি

Ishwari Prasad : *A Short History of Muslim Rule in India.*

V.A. Smith : *Oxford History of India.*

Wolseley Haig : *Cambridge Shorter History of India.*

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভারতে মুসলমানদের আগমন

ভারতে মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয় ক্রমাগত আক্রমণের মাধ্যমে। এইসব আক্রমণকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট স্তরে ভাগ করা যায়। যথা—

১। আরবগণ কর্তৃক মদিনা ও দামেস্ক হইতে পরিচালিত আক্রমণ,

২। আফগানিস্তানের গজনী হইতে পরিচালিত আক্রমণ এবং

৩। ঘোর হইতে পরিচালিত আক্রমণ।

মুসলিম আক্রমণের প্রথম স্তর
আরবদের সিন্ধু বিজয়

পশ্চিম ভারতের ঐশ্বর্যশালী বন্দরগুলির প্রতি সর্বদাই মুসলমানদের প্রখর দৃষ্টি ছিল। পারস্য বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভারত বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্রতর হয়। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে

হযরত ওমরের সময়

হযরত ওমরের (রাঃ) সময় জলপথে একদল সৈন্য মুম্বাই-এর নিকটবর্তী থানা নামক স্থানে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) এই ধরনের দূরপাল্লার অভিযান সমর্থন করেন নাই, তাই উহা পরিত্যক্ত হয়। অতঃপর হযরত ওমরের (রাঃ) মৃত্যুর পর সিন্ধুর দেবল উপসাগর ও কালাতের আল-কিকানে একটি অভিযান প্রেরণ করা হয়। জলপথের এইসব অভিযানগুলি একের পর এক ব্যর্থ হয়। সপ্তম শতকের মাঝামাঝিতে দক্ষিণ আফগানিস্তান মুসলমানদের হস্তগত হয়। স্থলপথে মুসলমানগণ বেলুচিস্তানের মাকরান জয় করিতে সমর্থ হয়। ইহার পর ভারতের দিকে সমস্ত অভিযান বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

উমাইয়া খলিফাদের আক্রমণ ঃ উমাইয়া খলিফাদের (৬৩২-৭৫০ খ্রিঃ) সময় সিন্ধুর

প্রথম ওয়ালিদের সময়

রাজার কিছু কার্যাবলি মুসলিম বিজয়ের পথ সুগম করিয়া দেয়। এক ব্রাহ্মণ বংশ সিন্ধুতে একটি রাজ্য স্থাপন করে। রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল চাচ্চ। উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালীদের খিলাফতের সময় (৭০৫-৭১৫ খ্রিঃ) চাচ্চের পুত্র রাজা দাহির সিন্ধুর সিংহাসনে ছিলেন। প্রথম ওয়ালীদের অধীনে হাজ্জায বিন ইউসুফ ছিলেন ইরাকের শাসনকর্তা।

সিন্ধু অভিযানের কারণ ঃ (১) হাজ্জায বিন ইউসুফের গর্ভনর থাকাকালে কিছু সংখ্যক আরব বিদ্রোহী সীমান্ত অতিক্রম করিয়া রাজা দাহিরের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে।

(২) হাজ্জায বিন ইউসুফ ছিলেন রাজ্য বিস্তারকারী স্বভাবের। রাজা দাহিরের কার্যাবলি তাঁহার রাজ্য বিস্তারের লিপ্সাকে আরও জোরদার করিয়া তোলে।

(৩) কিছুসংখ্যাক আরব ব্যবসায়ী সিংহলে মৃত্যুবরণ করে। তাহাদের পরিবারবর্গকে কতকগুলি জাহাজে করিয়া আরবে পাঠানো হয়। খলিফা এবং গভর্নর হাজ্জায বিন ইউসুফের জন্য সিংহলের রাজা কর্তৃক প্রেরিত কিছু উপঢৌকনও ঐ জাহাজে প্রেরণ করা হয়। এই সব জাহাজ দেবল-এর জলদস্যুদল কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। রাজা ইহার কোন প্রতিকার করিতে অস্বীকার করিলে হাজ্জায বিন ইউসুফ কঠোর ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করেন। রাজা দাহিরের অস্বীকৃতিতে ক্রুদ্ধ হইয়া হাজ্জায পর পর দুইটি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহা রাজা দাহির কর্তৃক প্রতিহত করা হয়। অতঃপর এই রাজাকে শাস্তি দিবার জন্য হাজ্জাযের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা, নির্ভীক আরব যুবক মুহাম্মদ বিন কাশেমকে নিযুক্ত করা হয়।

মুহাম্মদ বিন কাশেম-এর অভিযানঃ ৭১২ খিস্টাব্দে ৬০০০ সুগঠিত সিরীয় ও ইরাকী সৈন্য লইয়া মুহাম্মদ বিন কাশেম মাকরান হইয়া দেবল পৌঁছেন এবং দেবল নগর অবরোধ করেন। তিনি জানিতে পারেন, নগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মন্দিরটির উপর যে বিশাল লাল পতাকাটি বিদ্যমান, উহার যাদুশক্তির উপর হিন্দু বাহিনীর প্রগাঢ় বিশ্বাস। সেই লাল পতাকাটি ধ্বংস করিবার জন্য মুহাম্মদ বিন কাশেম সঙ্গে সঙ্গে আদেশ প্রদান করেন। কল্পিত তান্ত্রিক পতাকাটির পতনের সঙ্গে সঙ্গে দেবলের প্রতিরক্ষা বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয়। দেবল নগরী তখন ইহার বিজয়ীদের দয়ার উপর নিপতিত হয়।

ব্রাহ্মণদের তান্ত্রিক পতাকা দেবল

দেবলে একটি ছোট আকারের সেনাদল রাখিয়া মুহাম্মদ বিন কাশেম সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত বিখ্যাত নগরী নীরনের দিকে যাত্রা করেন। তিনি নীরনের নগরদ্বারে উপস্থিত হইলে বৌদ্ধ পুরোহিতদের একটি দল তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং হাজ্জায বিন ইউসুফ কর্তৃক লিখিত একটি ক্ষমা ও রক্ষা প্রদানকারী পত্র দেখান। সুতরাং কোন রক্তপাত ছাড়াই নগরটি অধিকার করা হয়। ইহার পর শেহওয়ান জয় করা হয়। শেহওয়ান কোন বাধা প্রদর্শন ছাড়াই আত্মসমর্পণ করে। শেহওয়ান হইতে তিনি সিসামের দিকে অগ্রসর হন এবং জাঠদের বিরোধিতা দমন করেন।

নীরন শেহ্ওয়ান সিসাম

ইতোমধ্যে রাজা দাহির ৫০,০০০ অশ্বারোহী বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী সমাবেশ করেন এবং দুর্ভেদ্য রাওয়ার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবিলম্বে মুহাম্মদ বিন কাশেম নীরনে পৌঁছেন এবং জুন মাসের খরপ্রদাহ ও অপরতীরের সুতীব্র তীর বর্ষণ উপেক্ষা করিয়া তৎক্ষণাৎ সিন্ধু নদী অতিক্রম করেন। মুসলিম বাহিনী এই পর্যন্ত যত যুদ্ধ করিয়াছে, তন্মধ্যে এখানে সবচাইতে শক্তিশালী বাহিনীর সম্মুখীন হয়। চারিদিন যুদ্ধ চলে, কিন্তু কোন চূড়ান্ত ফলাফল পাওয়া যায় না। পঞ্চম দিন, ১০ই মহরম, চিত্তাকর্ষক এক হস্তী বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা দাহির স্বয়ং আক্রমণ পরিচালনা করেন। রাজা দাহিরের হস্তী পলায়ন করে এবং একজন আরব সৈন্য কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হওয়া পর্যন্ত রাজা মাটিতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়া যান। মুসলমানগণ অতঃপর দুর্গ অবরোধ করে এবং বিনাযুদ্ধে ইহা অধিকার করে।

রাওয়ার দুর্গ রাজা দাহিরের মৃত্যু

রাওয়ারের দুর্গ বিজয়ের পর মুহাম্মদ ব্রাহ্মণাবাদের দিকে অগ্রসর হন। শাহদাতপুরের নিকটবর্তী হায়দ্রাবাদ হইতে ৪৫ মাইলের ব্যবধানে এই শহরের অবস্থান পাওয়া গিয়াছে। মুসলিম বাহিনী নিকটবর্তী হইলে রাজা দাহিরের পুত্র তাঁহার অধিনায়কদের হাতে এই শহর

ব্রাহ্মণ্যবাদ আরোর দুর্গ

রক্ষার ভার ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন করেন। অধিনায়কগণ বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করেন। ব্রাহ্মণদের বিষয়াদি স্থির করিয়া মুহাম্মদ অতঃপর আরার দুর্গ অধিকার করেন।

মুহাম্মদ বিন কাশেম অতঃপর মুলতানের দিকে অগ্রসর হন। মুলতান মুসলিম বাহিনীকে ভীষণভাবে বাধা প্রদর্শন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা মুসলমানদের হস্তগত হয়। হাজ্জায বিন ইউসুফের মৃত্যুর খবর তাঁহার বিজয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। মুহাম্মদ বিন কাশেম বাধ্য হইয়া আরারে প্রত্যাবর্তন করেন।

আরবদের সফলতার মূল কারণ ঃ কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ পুরোহিতদের বিশ্বাসঘাতকতা আরবদের সফলতায় অংশিকভাবে সহায়তা করিলেও অষ্টম শতকের মাঝামাঝিতে আরব সৈন্যবাহিনী বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনীর মধ্যে পরিগণিত ছিল। বিশুদ্ধ সংগঠন, উল্লেখযোগ্য শৃঙ্খলা ও মনোবল, আক্রমণ পরিচালনায় উচ্চমানের যন্ত্রপাতি এবং উটের ব্যবহার আরব বাহিনীকে তখনকার বিশ্বের সমস্ত সৈন্যবাহিনীর উপর উল্লেখযোগ্য প্রাধান্য দান করে।

মুহাম্মদ বিন কাশেমের সৈন্যগণ গোলন্দাজ বাহিনী দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। গোলন্দাজ বাহিনীর সঙ্গে মানজানিক বা ক্যাটাপুল্টস নামক এক প্রকারের কামান ছিল। বড় বড় পাথর ও লৌহ গোলক দ্বারা কোন দুর্গ বোমা বিধ্বস্ত করিবার জন্য এই কামান ব্যবহার করা হইত। এই কামানের বড় আকারেরগুলিকে বলা হইত আরুস এবং ইহাকে কাজে লাগাইবার জন্য ৫০০ লোকের প্রয়োজন হইত। ঐ সময়ে আরবগণ একটি শক্তিশালী নৌ-বহর গঠন করে, অথচ রাজা দাহিরের কোন নৌ-বহর ছিল না। মোটের উপর রাজা দাহিরের সৈন্যদল যন্ত্রবিদ্যার কলাকৌশলে নিম্নস্তরের ছিল এবং তাঁহার অধিনায়কগণ সৈন্য পরিচালনায় বিশেষ নিম্নমানের ছিলেন। সেই যুগে ধর্মীয় প্রেরণায় মুসলমানগণ উজ্জীবিত ছিল এবং অপরপক্ষে হিন্দুরা ছিল ক্ষয়িষ্ণু। রাজা দাহিরের পারিবারিক গোলমাল এবং তাঁহার কুশাসনও আরবদিগকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। জাঠ ও মেড নামে কতকগুলি দেশীয় গোত্রও আরবদের পক্ষে যোগদান করে।

বিজিত লোকদের প্রতি মুহাম্মদ বিন কাশেমের আচরণ ঃ মুসলমানগণ যেখানেই গিয়াছে বিজিত লোকদের প্রতি ন্যায় ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীগণ মুসলমানদের শাসনব্যবস্থা এবং বিজিত লোকদের প্রতি তাহাদের নীতির প্রশংসা না করিয়া পারে নাই। মুহাম্মদ বিন কাশেমের দেবল নগরে প্রবেশের পর তিনি শুধু অযথা রক্তপাতেই বাধা প্রদান করেন নাই, বরং অধিবাসীদের প্রতি তিনি সৌজন্য ও উদারতামূলক আচরণ করেন। হিন্দুগণ তাহাদের পূর্ববর্তী পদে বহাল থাকে, শুধু মোটামুটি শাসনব্যবস্থাটুকু হিন্দুদের হাত হইতে মুসলমানদের হাতে চলিয়া যায়। হাজ্জায বিন ইউসুফের আদেশ অনুযায়ী মুহাম্মদ বিন কাশেম সমস্ত অমুসলিমদিগকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেন।

সবার প্রতি ধর্মীয় স্বাধীনতা

ব্রাহ্মণ্যবাদ, আরোর, রাওয়ার, মুলতান এবং অন্যান্য স্থানেও এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অমুসলিমদের উপর জিযিয়া ছাড়া অন্য কোন নূতন কর ধার্য করা হয় নাই। যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহাদিগকে 'জিযিয়া' কর হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

হিন্দুদিগকে বিভিন্ন উচ্চপদে বহাল করা হয়। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার করিতে আদেশ দেওয়া হয়।

মুহাম্মদ বিন কাশেমের মৃত্যু ঃ যেইরূপ দ্রুতগতিতে মুহাম্মদ বিন কাশেম উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিলেন, ঠিক অনুরূপভাবেই তাঁহার পতন হয়। রাজা দাহিরের দুইটি কন্যাকে খলিফার সম্মুখে পেশ করা হইলে তাহারা অভিযোগ করে যে, খলিফার সম্মুখে নীত হইবার পূর্বে মুহাম্মদ বিন কাশেম তাহাদিগকে অপমান করিয়াছেন। মুহাম্মদ বিন কাশেমের প্রতি নীতিবিরুদ্ধতার অভিযোগে খলিফা ক্রুদ্ধ হইয়া পড়েন। তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ জারি করেন যে, এই যুবক সেনাপতিকে জীবিতাবস্থায় কাঁচা গরুর চামড়ার মধ্যে সেলাই করিয়া দেওয়া হউক, এবং সেই অবস্থায় তাহাকে দামেস্কে পাঠাইয়া দেওয়া হোক। মুহাম্মদ বিন কাশেম নিজেই খলিফার সেই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। এই ভাবেই এই যুবক সেনাপতির মৃত্যু হয়। পরে দাহিরের কন্যাদ্বয় স্বীকার করে যে, তাহাদের পিতার প্রতি যে আচরণ করা হইয়াছিল, তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্যই তাহারা এই ধরনের মিথ্যা অপবাদ দিয়াছিল। খলিফা তাহাদিগকে কঠোর শাস্তির মাধ্যমে হত্যা করেন।[১]

সিন্ধুতে আরব শক্তির পতন ঃ সিন্ধু উপত্যকার সমগ্র নিম্নভূমি আরবগণ কর্তৃক শাসিত হয়। পরে প্রতিবেশী প্রদেশগুলির দিকে মুহাম্মদ বিন কাশেম ছোট ছোট অভিযান পরিচালনা করেন। মুহাম্মদ বিন কাশেমের মৃত্যুর পর সিন্ধুর শাসনকর্তা হন জুনায়েদ। তিনি আরও অধিক আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেন এবং মাড়াওয়ার, মান্দার, উজ্জয়ন, মালব ও গুজরাটের দিকে অভিযান প্রেরণ করেন। ভারতে প্রাপ্ত শিলালিপি অনুসারে মুসলমানগণ সিন্ধু, কচ্ছ, কাঠিয়াওয়ার, পশ্চিম রাজপুতানা, মালব এবং গুজরাট পর্যন্ত জয় করেন, কিন্তু চালুক্যগণ দক্ষিণ দিকে, পরিহারাগণ পূর্বদিকে এবং কারকোটাগণ উত্তরদিকে মুসলমানদের বিজয়াভিযান বন্ধ করিয়া দেয়।

অধিকন্তু, আরবগণ খলিফার সকল প্রকার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয়। তাহাদের কিছুসংখ্যক লোক স্বাধীন রাজ্য গঠন করে এবং কিছুসংখ্যক লোক ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল ঃ কিছু সংখ্যক লেখক আরবদের সিন্ধু বিজয়ের গুরুত্ব ছোট করিয়া দেখেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার স্টেন্‌লি লেনপুল মন্তব্য করেন ঃ "আরবদের সিন্ধু বিজয় ভারত ও ইসলামের ইতিহাসে একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা মাত্র, একটি বিজয়, যাহার কোন ফলাফল নাই।" একই ভাবধারায় ঐতিহাসিক শর্মা বলেন ঃ "রাজকীয় আকাশের চক্রবালে অর্ধচন্দ্রটি সর্বোচ্চ স্থানে উদিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করে, কিন্তু ইহা শুধু অর্ধচন্দ্র থাকিবার জন্যই, পূর্ণচন্দ্র নহে।"[২]

আরব বিজয়ের সত্যিকারের ফলাফল নির্ণয় করা কঠিন। বিভিন্ন প্রমাণপত্রে দেখা যায়, সুদূর মালব ও গুজরাট পর্যন্ত আরব সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হয়। সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের সাথে এই যোগাযোগ ভারতের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী ফলাফল রাখিয়া যায়। মুসলমানগণ ইতোমধ্যেই বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে প্রধান স্থান লাভ করে, এবং তাহাদের আগমন ভারতের লোকদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে যাবতীয় সুযোগ দান করে।

সামরিক অবস্থার উপর প্রতিক্রিয়া

সিন্ধুর জনগণ তাহাদের পূর্ববর্তী বেশ কিছু সংখ্যক জাতির ন্যায় স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং ক্রমে ক্রমে ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে ইহা একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ লাকায় পরিণত হয়। মুলতান ক্রমশ একটি আন্তর্জাতিক নগরে পরিণত হয়, এবং পৃথিবীর এই অংশ বহু শতাব্দী ধরিয়া সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃহত্তর কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান রাজত্ব ও শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি সিন্ধুতেই রচিত হয়।

সিন্ধু ও মুলতানের জনগণের উপর ধর্মীয় ফলাফল

আরবগণ ততদিনে গ্রীক, মিশরীয়, সিরীয়া, মেসোপটামিয়ান এবং পারস্যবাসীদের মত পুরাতন জাতিদের সভ্যতা আয়ত্ত করিয়া উহার উৎকর্ষ সাধন করে। এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলিকে এখন হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয়। আরবগণ তাহাদের জ্ঞানের উৎসাহের সঙ্গে হিন্দু বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে এবং তাঁহাদের কিছু জিনিসকে তাঁদের নিজস্ব ব্যবহারে লাগাইয়া দেয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরোহিতদের গুরুত্বপূর্ণ বইগুলিকে আরবিতে অনুবাদ করা হয়। ব্রাহ্মগুপ্তের দুইখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ 'খাদ্য খাদ্যান্ত' এবং 'ব্রাহ্মসিদ্ধান্ত'কে সংস্কৃত হইতে আরবিতে অনুবাদ করা হয়। অতএব, আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে, ভারতের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনা।

সাংস্কৃতিক ফলাফল

পাদটীকা

১। ঈশ্বরী প্রসাদ ঃ A Short History of Muslim Rule in India পৃঃ ৩৬।

২। The crescent on the horizon was destined to rise to the zenith in the imperial sky, but it was to remain only a crescent and not a full moon.

—S.R. Sharma : *Studies on Medieval Indian History.*

গ্রন্থপঞ্জি

Syed Amir Ali	: *A Short History of the Saracens.*
Elliot and Dowson	: *History of India as told by its own Historians, vol-1.*
Wolseley Haig	: *Cambridge History of India, Vol - 111.*
Elphinstone	: *History of India.*
Lane Poole	: *Medieval India*
V.A. Smith	: *Oxford History of India.*
S.R. Sharma	: *The Crescent in India.*
R.C. Majumdar	: *Arab Invasion of India.*

তৃতীয় অধ্যায়
মুসলিম আক্রমণের দ্বিতীয় স্তর

গজনী বংশ (৯৬৩-১১৮৬ খ্রিঃ)

৭৫০ খ্রিস্টাব্দ হইতে আব্বাসীয় খলিফাগণ বেশ জাঁকজমকের সহিত মুসলিম সাম্রাজ্য শাসন করেন। কিন্তু পরবর্তী আব্বাসীয়গণ শুধু নামে মাত্র শাসন করেন। খলিফাগণ কর্তৃক নিয়োজিত তুর্কি দেহরক্ষিগণই সত্যিকারের দেশ শাসন করেন। ফলে স্বাধীন দুঃসাহসিক অভিযানকারিগণ তাহাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশ স্থাপন করেন। মধ্য এশিয়ায় এই ধরনের একটি পারস্য বংশ হইল সামানীয়গণ। এই বংশের পঞ্চম সুলতান আবদুল মালেকের আলপ্তগীন নামে একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহাকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। আবদুল মালেকের মৃত্যুর পর আলপ্তগীন নিজেকে গজনীর প্রকৃত স্বাধীনতায় স্থাপন করেন। আলপ্তগীন একজন বড় দুঃসাহসী অভিযানকারী ছিলেন। তিনি বেশ কতকগুলি অভিযান পরিচালনা করেন এবং খাইবার গিরিপথ ও পেশোয়ার উপত্যকায় স্বীয় অধিকার স্থাপন করেন।

আলপ্তগীন

সবুক্তগীন (৯৭৭-৯৯৭ খ্রিঃ)

৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে আলপ্তগীনের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার লইয়া তাহার পুত্র ইসহাক ও জামাতা সবুক্তগীনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দক্ষ সেনাপতিগণও অংশগ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত আলপ্তগীনের জামাতা ও একজন সুদক্ষ সেনাপতি সবুক্তগীন গজনীর ক্ষমতা দখল করিতে সক্ষম হন।

উত্তরাধিকারের যুদ্ধের সুযোগ লইয়া কাবুলের রাজা জয়পাল সবুক্তগীনকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহাকে অবিলম্বে হটাইয়া দেওয়া হয়। এইভাবে গজনীর সবুক্তগীন এবং ভারতের জয়পালের মধ্যকার প্রতিযোগিতায় জয়পালই ছিলেন আক্রমণকারী এবং পরাজিত। অতঃপর সবুক্তগীন কান্দাহার জয় করেন।

জয়পালের আক্রমণ প্রতিহত

কান্দাহার বিজয় এবং প্রতিবেশী ভারতে মুসলিম অস্ত্রের আগমন ভাতিন্দার রাজা জয়পালকে শক্তিহীন করিয়া দেয়। রাজা জয়পাল অগ্রগামী হইয়া যুদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। খাইবার গিরিপথের লামঘান নামক স্থানে দুইটি চিরশত্রু মুখোমুখি দাঁড়ায়। যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত রাজা পরাজিত হন এবং শান্তি প্রার্থনা করেন। ক্ষতিপূরণ এবং সবুক্তগীনের নিকট নিয়মিত কর প্রদানের শর্তে এই প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়।

রাজা জয়পাল এই অপমান সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই দুই বৎসর পরে তিনি

আবার সবুক্তগীনের রাজ্যে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু এবারও তিনি পরাজিত হন এবং একটি মোটা অংকের ক্ষতিপূরণ দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সর্বোপরি অনেকগুলি অশ্বসহ সিন্ধু নদীর পশ্চিম পাড়ের চারিটি দুর্গ তিনি হস্তান্তর করিতে বাধ্য হন। এই অপমানের কিছুদিন পরেই জয়পাল চুক্তিটি ভঙ্গ করেন এবং ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করেন। এই বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তিস্বরূপ তাঁহার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি ধ্বংস করা হয় এবং লামঘান বা জালালাবাদ জেলাটি আমির সবুক্তগীন কর্তৃক গজনী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জয়পালের দ্বিতীয় অভিযান এবং পরাজয়

কিছুদিন বিরতির পর ৯৯১ সালে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ রাজা জয়পাল হিন্দু রাজাদের একটি আঁতাত গঠন করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য জোরদার প্রচেষ্টা চালান। অনেকের সঙ্গে এই আঁতাতে অংশগ্রহণ করেন কনৌজের পরিহারা রাজা রাজ্যপাল এবং যমুনার দক্ষিণ তীরবর্তী সুদূর চণ্ডাল রাজত্বের রাজা ঢাঙ্গা। কুররাম উপত্যকার নিকটে হিন্দু আঁতাত একটি শোচনীয় পরাজয় বরণ করে এবং ফলে পেশোয়ার মুসলমানদের হস্তগত হয়। ইহার কিছুদিন পরেই ৯৯৭ সালে সবুক্তগীন মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ভারতীয় আঁতাত পরাজিত পেশোয়ারের অন্তর্ভুক্তি সবুক্তগীনের মৃত্যু

প্রাচ্যের অদ্বিতীয় অধিনায়ক হিসাবে আমীর সবুক্তগীন ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ ও বিজ্ঞ শাসনকর্তা ছিলেন। কয়েকবার তিনি ভারতীয় নৃপতিদিগকে পরাজিত করেন। হিন্দু আঁতাতের বিরুদ্ধে শেষ যুদ্ধে তিনি তাঁহার কৃতকার্যতাকে কাজে লাগাইতে পারেন নাই। কারণ, সামানীয় সুলতানকে তাতারদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য উত্তরদিকে তাঁহাকে মনোনিবেশ করিতে হয়। যদিও সামানীয় সুলতানকে সাহায্য করিতে তিনি বাধ্য ছিলেন না, তবুও কূটনৈতিক কারণে তিনি সুলতানকে সাহায্য করেন। বিনিময়ে সুলতান সবুক্তগীনের পুত্র মাহমুদকে খোরাসানের শাসকর্তা নিযুক্ত করেন।

কৃতিত্ব/বিজয়

সবুক্তগীনই প্রথম নৃপতি, যিনি হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতের উত্তর-পশ্চিম গিরিপথের দ্বার উন্মুক্ত করেন।

সুলতান মাহমুদ
(৯৯৭-১০৩০ খ্রিঃ)

আমীর সবুক্তগীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মাহমুদ ও ইসমাইলের মধ্যে একটি ক্ষণস্থায়ী প্রতিযোগিতা হয়। শেষ পর্যন্ত মাহমুদ সফলতা অর্জন করেন এবং ৯৯৭ সালে গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবর্তী দুই বৎসর মাহমুদ তাঁহার শক্তি দৃঢ়করণে মনোনিবেশ করেন। খোরাসানে তাঁহার শাসনকার্য নিশ্চিত করিবার জন্য তিনি সামানীয় সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। মাহমুদ সুলতানকে পরাজিত করেন এবং সুলতানের বশ্যতা হইতে বাহির হইয়া আসেন। অতঃপর মাহমুদ বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফার তরফ হইতে স্বাধীনতার সনদ লাভ করেন। খলিফা তাঁহাকে 'সুলতান' উপাধি প্রদান করেন। তারপর সুলতান মাহমুদ একটি তুর্কি-পারস্য বা মধ্য-এশীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের দিকে মনোনিবেশ করেন। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া তিনি পূর্বদিকে

খলিফার পক্ষ হইতে স্বাধীনতার সনদ

তাঁহার শত্রুদিগকে স্তব্ধ করিবার জন্য ভারতীয় উপমহাদেশের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন।

তাঁহার ভারত অভিযানের কারণসমূহ ঃ ভারতের বিরুদ্ধে সুলতান মাহমুদের এতগুলি আক্রমণ পরিচালনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ছিল, ইহা এমন একটি প্রশ্ন, যাহা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে এবং উত্তরও দেওয়া হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য প্রায় সমস্ত মতামতই সুলতানের জীবনী, চরিত্র এবং তখনকার ইতিহাসের একটি ভাসা ভাসা জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় অভিযানের উপর বিভিন্ন মতামত

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের উদ্দেশ্যের উপর বর্তমানে সরাসরি তিনটি গবেষণা গোষ্ঠী বিদ্যমান। এক গোষ্ঠীর মতে, মাহমুদ একজন উচুদরের লুণ্ঠনকারী, যিনি তাহার স্বর্ণলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য আগুন জ্বালান, হত্যা করেন, লুণ্ঠন করেন অধিকার করেন এবং চলিয়া যান। আরেক গোষ্ঠীর মতে, তিনি ইসলামের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ, "যাঁহার ভারত আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য হইল পৌত্তালিকতা ধ্বংস করা এবং অসির ডগায় ইসলাম প্রচার করা। তৃতীয় গোষ্ঠি শুধু এই বলিয়া পাশ কাটাইয়া যায় যে, "মাহমুদের চরিত্র জটিল।" মূলত এইগুলির একটি অভিযোগও সত্য নহে। আক্রমণের কারণগুলি নিম্নলিখিত প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ঃ রাজা জয়পাল এবং আমীর সবুক্তগীনের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি জয়পাল কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করা। দ্বিতীয়ত, রাজা জয়পালের গজনী আক্রমণ। তৃতীয়ত, সুলতানের সহিত সন্ধিতে আবদ্ধ হইবার পর ভারতীয় রাজন্যবর্গ কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতা। চতুর্থত, সুলতানকে পদচ্যুত করিবার জন্য সুলতানের হিন্দু বন্ধুগণ কর্তৃক তাঁহার শত্রুদিগকে সাহায্য করিবার মাধ্যমে রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা। পঞ্চম ও সর্বশেষ কারণ ছিল, শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশীগণ কর্তৃক সুলতানের ভারতীয় হিন্দুদের উপর অত্যাচার।

অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ ঃ রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রাপ্তি ও উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থের গুরুত্ব খুবই পরিষ্কার। একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন, "এই কথা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, অর্থের যাদুশক্তির গুরুত্ব মাহমুদ বুঝিতে পারেন এবং ইহার যথার্থ মূল্যায়ন করেন।"[১]

ভারতের কল্পিত সম্পদ নিশ্চয় তাঁহার আত্মাকে আলোড়িত এবং আকাঙ্ক্ষাকে উত্তেজিত করে। এইভাবে অর্জিত সম্পদরাজি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য ব্যবহার করা হয়। ইহাই ছিল মূলত খ্যাতির দিক হইতে গজনী এবং শক্তির দিক হইতে মাহমুদ। ইহা জ্ঞান ও সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসাবে গজনীর প্রশংসা সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া দেয়।

মাহমুদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন ঃ সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগসমূহ অনুসন্ধান করিতে যাইবার পূর্বে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে ঃ

১। সুলতান মাহমুদের ভারতীয় আক্রমণগুলি সত্যিই কি জিহাদ ছিল?

২। ভারতে ইসলাম প্রচারই কি তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল?

৩। পৌত্তলিকতা ধ্বংসই কি তাঁহার আসল লক্ষ্য ছিল?

৪। রাজ্য বিস্তারই কি তাঁহার পরম লক্ষ্যবস্তু ছিল?

মুসলিম বিজয়ের আগে ভারত
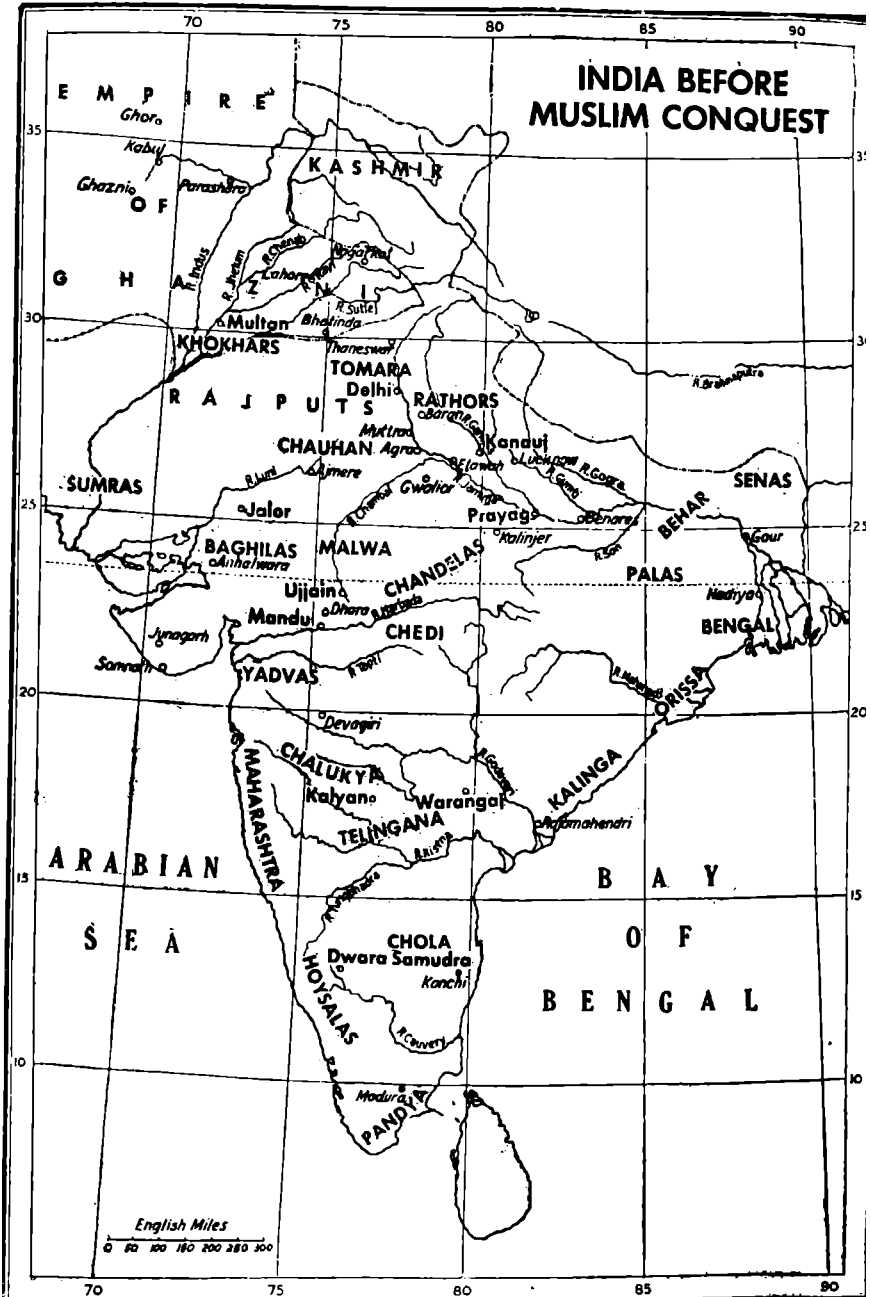
জিহাদের প্রশ্ন ঃ পবিত্র কোরআন-এর আলোকে দেখিতে গেলে সুলতান মাহমুদের ভারতীয় অভিযানগুলিকে জিহাদ বলা যায় না। কারণ, জিহাদের অস্তিত্ব একটি সত্য ও সরল বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত, যাহা আল্লাহ তায়ালার উপর এমনভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যে, সমস্ত স্বার্থপরতা ও সাংসারিক উদ্দেশ্য ইহার সামনে ক্ষুদ্র ও ম্লান বলিয়া মনে হয়। শুধু মাত্র অমানুষিক যুদ্ধ জিহাদের আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। মাহমুদের যুদ্ধাবলির ধারা দেখিয়া মনে হয় এইগুলি পার্থিব কার্য এবং ইসলাম বা আল্লাহ্ তায়ালার সেবায় নিয়োজিত ধর্মীয় যুদ্ধ নহে। যুদ্ধ ছিল সেই যুগের প্রচলিত ইচ্ছা বা রীতি, এবং এইগুলির পিছনে যুগের উৎসাহ ছিল, কোরআন-এর নির্দেশ নহে। এইসব ঘটনা বিবেচনা করিলে সুলতান মাহমুদের অভিযানগুলিকে ঠিক জিহাদ বলা যায় না।

তাঁর অভিযান গুলিকে জিহাদ বলা যায় না

ইসলাম প্রচার ঃ একজন পাকা মুসলমানের ন্যায় সুলতান মাহমুদ হয়ত তাঁহার ধর্ম প্রচারে আনন্দ পাইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার ভারত অভিযানের মূলে ইহাই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মনে হয় না। একজন গোঁড়া মতবাদ প্রচারক বা একজন সাধু ধর্ম প্রচারকের চেয়ে তিনি ছিলেন একজন বিজয়ী। ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বার বার ভারত আক্রমণ করেন বলিলে তাহা ঐতিহাসিক মতে হইবে ভুল এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে হইবে অসত্য। সমসাময়িক ঘটনায় এমন কোন তৃণবৎ প্রমাণও নাই যে, তিনি কখনও জোর করিয়া বা শাস্তিমূলকভাবে কোন লোককে ধর্মান্তর করিয়াছেন। বলা হইয়া থাকে, কিছু সংখ্যক রাজা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু খুব সম্ভবত তাঁহারা বিজয়ীর রোষ বহ্নি হইতে বাঁচিবার জন্য রাজনৈতিক কারণে ইসলাম গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার পৃষ্ঠ প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজ নিজ ধর্মে ফিরিয়া যান। ইহার স্পষ্টতর কারণ, ইসলাম কি এবং কি চায় তাহা হিন্দুদিগকে তখনও বলা হয় নাই। সুলতান মাহমুদের ধর্মীয় নীতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্সটোন বলেন—"ইহা কোথাও নিশ্চিত করিয়া বলা হয় নাই যে, যুদ্ধে অথবা কোন দুর্গ বলপূর্বক দখলের সময় ছাড়া তিনি কখনও কোন হিন্দুকে হত্যা করিয়াছেন।"[২] তাহার সময় হিন্দুগণ সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে। মাহমুদ ছিলেন একজন বিজয়ী। তাঁহার বিজয়ের সংকল্পে তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন ধরাবাঁধা পার্থক্য করেন নাই। হিন্দু রাজাদের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ ছিল সম্পূর্ণ রাজনীতির ব্যাপার, যেখানে ধর্মের বিন্দুমাত্র উল্লেখও নাই। সুতরাং যাহা তিনি করেন নাই বা করিতে চেষ্টাও করেন নাই এই ধরনের কাজের জন্য তাঁহাকে দোষও দেওয়া যায় না বা প্রশংসাও করা যায় না।

ইসলাম প্রচার উদ্দেশ্য ছিল না

পৌত্তলিকতার ধ্বংসসাধন ঃ ভারতে পৌত্তলিকতা ধ্বংসের জন্য সুলতান মাহমুদ কোন সুপরিকল্পিত গঠনমূলক পন্থা অবলম্বন করেন নাই। মাহমুদ কর্তৃক পবিত্র স্থান আক্রমণ, মন্দির ধ্বংস এবং মূর্তি বিধ্বস্তকরণ ধর্মীয় দিক হইতে পুণ্যের কাজ বলিয়া নহে, বরং এই জন্য যে, ঐগুলি ছিল সুরক্ষিত রক্ষণাগার, যাহার ভিতর স্থান লাভ করে ভারতের কল্পিত সম্পদরাজি। বর্ণিত মন্দিরগুলি ছাড়া অন্য কোন মন্দির তিনি স্পর্শ করেন নাই। সুলতান মাহমুদের পার্থিব উদ্দেশ্যের উল্লেখ করিয়া ঈশ্বরী টোপা বলেন, "ইহাও লক্ষ্য করা যায় যে, মাহমুদ ভারতের যেসব মন্দির আক্রমণ করেন, তাহা

তিনি মূর্তি ভঙ্গকারী ছিলেন না

ছিল অতিরিক্ত ও অবর্ণনীয় সম্পদের রক্ষণাগার, এবং তন্মধ্যে কিছু মন্দির ছিল রাজনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল। মূলত মন্দিরগুলি ভাঙ্গা হয় অভিযানের সময়, ধর্মীয় কারণে নহে। কিন্তু শান্তির সময় মাহমুদ একটি মন্দিরও ধ্বংস করেন নাই।"[৩] মন্দির ধ্বংস এবং পৌত্তলিকতার অবসান করা বা ভারতে ইসলাম প্রচার করা তাহার উদ্দেশ্য হইলে শান্তির সময়ও তিনি তাহা করিতেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তাঁহার রাজত্বকালে হিন্দুদিগকে সর্বপ্রকার ধর্মীয় সুবিধা দেওয়া হয়। এমনকি তাহারা ইচ্ছামত সুলতানের নাকের ডগায় বসিয়া তাহাদের মূর্তির সামনে শঙ্খও বাজাইতে পারিত। সুতরাং উপরে বর্ণিত ঘটনা অনুযায়ী কিছুতেই মন্তব্য করা যায় না যে, মূর্তিপূজার ধ্বংস সাধনই মাহমুদের ভারত আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

বিজয় বা রাজ্য বিস্তার ঃ এই ভাবধারাটি সুদূর পরাহত, কারণ সুলতান মাহমুদ কখনও ভারত সাম্রাজ্যের কথা কল্পনা করেন নাই। তিনি হয়ত জানিতেন, এই ধরনের একটি শত্রুদেশে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপন করা তখনও প্রায় অসম্ভব। তিনি আরও জানিতেন, ধর্ম, ভাষা ও আচার-অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ শত্রুভাবাপন্ন একটি জাতিকে বশ্যতায় রাখিতে চেষ্টা করা শুধু লোকবল ও অর্থক্ষয়ই হইবে। মধ্য এশিয়ায় এবং তৎসঙ্গে ভারতে তাঁহার রাজত্ব স্থাপন করা সত্যিকারের রাজনীতির পরিপন্থী ছিল। চিরস্থায়ীভাবে তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করাটাকেও তাঁহার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয় না। পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং মুলতানের কিয়দংশ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তিনি প্রমাণ করেন যে, ভারতকে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করাটা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তিনি পাঞ্জাব দখল করেন, কারণ ইহাকে ভিত্তি করিয়া মাহমুদ ইহার অপর পাড়ের স্থানগুলির উপর সফলতার সাথে আক্রমণ করিতে পারেন। অপরপক্ষে তাঁহার পশ্চিমা অভিযানগুলি একটি আলাদা নীতির পরিচয় দেয়—যাহা হইল দখল করা, অন্তর্ভুক্ত করা, বিজয় ও সুদৃঢ় করা।

বিজয় বা রাজ্য বিস্তার

একটি তুর্কি-পারস্য বা মধ্য এশীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করাই ছিল সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের আসল উদ্দেশ্য। ইহার ব্যতিক্রম আর কিছুই নহে। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার জন্যই তিনি ভারতে এইসব অভিযান পরিচালনা করেন। বারবার ভারত আক্রমণ করিয়া তিনি এই দেশের নৃপতিদিগকে শক্তিহীন করিয়া দেন। তিনি জানিতেন, এইভাবে দুর্বল করিয়া দিলে তাহারা তাঁহার দিকে আক্রমণাত্মক মনোভাব গ্রহণ করিতে পারিবেন না এবং তিনি নির্বিকারভাবে মধ্য এশীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন। ভারতে তাঁহার প্রত্যেক অভিযানের পরপরই তিনি পশ্চিমে ইরানের দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। অধিকন্তু পিছনে শক্তিশালী শত্রুভাবাপন্ন রাজাদের অক্ষত রাখিয়া পশ্চিমে অভিযান পরিচালনা করা তিনি সুবিবেচকের কাজ মনে করেন নাই। ফলে হইয়াছেও তাহাই। মূলত ভারতের নৃপতিবৃন্দ নিজেদের রাজত্ব সামলাইতেই ব্যস্ত থাকেন—মাহমুদের সাম্রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই।

আসল উদ্দেশ্য

সুলতান মাহমুদের ভারতীয় অভিযানসমূহ ঃ

সুলতান মাহমুদের অভিযানগুলির সঠিক সংখ্যা বা তারিখের ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। স্যার হেনরি ইলিয়টের বর্ণিত সতেরোটি অভিযান গণনা করা যাইতে

পারে। ভি. এ. স্মিথ বলেনঃ "যখনই সম্ভব প্রত্যেক বৎসর তিনি একটি অভিযান পরিচালনা করেন।" নিম্নলিখিতগুলি মাহমুদের প্রসিদ্ধ অভিযান।

প্রথম অভিযান ১০০০ খ্রিঃ

১০০০ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার সর্বপ্রথম অভিযানে সুলতান মাহমুদ খাইবার গিরিপথের সীমান্তবর্তী শহরগুলি অধিকার করেন। যুদ্ধ হিসাবে ইহা তত উল্লেখযোগ্য নহে, তবে সীমান্তের শহরগুলি অধিকারের রাজনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। এই শহরগুলিই ভারতে সুলতানের অনুপ্রবেশ সহজতর করে।

দ্বিতীয় অভিযান ১০০১ খ্রিঃ

১০০১ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ পেশোয়ারে শিবির সন্নিবেশ করেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল দশ হাজারের এক সৈন্যবাহিনী। রাজা জয়পাল ১২ হাজার অশ্বরোহী, ৩০ হাজার পদাতিক এবং ৩০০ হস্তী লইয়া সুলতানের পথরোধ করেন। উভয়পক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং মাহমুদ যুদ্ধে জয়লাভ করেন। জয়পাল পরাজিত ও বন্দি হন। অনেক সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়। সেখান হইতে সুলতান মাহমুদ ওয়াইহিন্দের দিকে অগ্রসর হন এবং তাহা ধ্বংস করেন। বসন্তের আগমনের সাথে সাথে তিনি গজনী ফিরিয়া যান।

তৃতীয় অভিযান ১০০৪ খ্রিঃ

গজনীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মাহমুদ ভাটিয়া আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ওয়ালিহাটান ও হিসারের পথে তিনি ভাটিয়া পৌঁছেন। তিনদিন ধরিয়া সেখানে যুদ্ধ চলে। ভাটিয়ার রাজা বাজরাও মাহমূদের বিরুদ্ধে তাঁহার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া স্বয়ং সাসানা নদীর দিকে অগ্রসর হন। মাহমূদ তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। বাজরাও আত্মহত্যা করেন এবং মুসলমানগণ ২৮০টি হস্তীসহ অনেক সম্পদের অধিকারী হয়।

চতুর্থ অভিযান ১০০৬ খ্রিঃ

১০০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুলতানে হঠাৎ আক্রমণ পরিচালনা করিতে সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মনে করেন, সোজা রাস্তায় অগ্রসর হইলে মুলতানের রাজা দাউদ তাঁহার পথ রোধ করিবেন। সুতরাং মুলতানের দিকে তিনি একটি বাঁকা পথ ধরেন। পথিমধ্যে রাজা জয়পালের পুত্র আনন্দপাল তাঁহার পথে বাধা সৃষ্টি করেন। বাধ্য হইয়া সুলতান তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া অনেক ধ্বংস সাধন করেন। আনন্দপাল কাশ্মীরে পলায়ন করেন। মাহমুদ মুলতান অবরোধ করেন এবং অনেক সম্পদ লইয়া গজনীতে ফিরিয়া যান।

পঞ্চম অভিযান ১০০৮ খ্রিঃ

মাহমুদ জানিতে পারেন যে, রাজা জয়পালের দৌহিত্র শুকপাল ইসলাম গ্রহণ করিবার পর পুনরায় তাহা ত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি শুকপালের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং চারি লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আদায় করেন।

ষষ্ঠ অভিযান ১০০৯ খ্রিঃ

রাজা আনন্দপাল তাঁহার পিতা জয়পালের পথ অনুসরণ করেন এবং উজ্জয়ন, গোয়ালিয়র, কনৌজ, দিল্লী ও আজমীরের হিন্দু রাজাদিগকে লইয়া একটি হিন্দু আঁতাত গঠন করেন। আমির সবুক্তগীনের বিরুদ্ধে রাজা জয়পাল যে পরিমাণ সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার চাইতেও অধিকসংখ্যক সৈন্য লইয়া হিন্দু আঁতাত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সুলতানের সঙ্গে হিন্দু আঁতাতের এক ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু আনন্দপালের হস্তী হঠাৎ পলায়ন করিতে আরম্ভ করে এবং উহার সাথে সাথে হিন্দু আঁতাত ভাঙ্গিয়া যায়। পরপর দুই দিন ও দুই রাত্রি ধরিয়া মাহমুদ তাহাদের অনুসরণ করেন। শেষ

পর্যন্ত ৮ হাজার লোকহত্যা এবং অনেক অর্থ লইয়া তিনি ক্ষান্ত হন।

এইখান হইতে মাহমুদ ভীমনগরের দিকে অগ্রসর হন এবং তিনদিন ধরিয়া সেই দুর্গ অবরোধ করেন। পরে তিনি দুর্গে প্রবেশ করেন। ভীম পাণ্ডব-এর যুগ হইতে স্তূপীকৃত রাশি রাশি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা তাঁহার করতলগত হয়। তারপর মাহমুদ গজনীতে ফিরিয়া যান এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের একটি সিংহাসন নির্মাণ করেন।

ভীমনগর বা কাংরা

১০১০ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ আবার বাহির হন এবং মুলতান অধিকার করেন। পূর্বে তিনি এই রাজ্যটি হস্তগত না করিয়া গিয়েছিলেন। কিন্তু ইহাকে এইবার অধিকার করেন এবং দাউদকে বন্দি করেন।

সপ্তম অভিযান ১০১০ খ্রিঃ

মাহমুদ থানেশ্বরের দিকে অভিযান করেন। রাজা ত্রিলোচনপাল ৫০টি হস্তী দিয়া সন্ধি করিতে চান। কিন্তু সুলতান তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। থানেশ্বর পৌঁছিয়া তিনি নগরটিকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পান। ফলে অনেক ধনরাশি তাঁহার অধিকারে আসে।

অষ্টম অভিযান ১০১২ খ্রিঃ

মাহমুদ নন্দা অধিকার করিতে মনস্থ করেন। রাজা ত্রিলোচনপাল সুদক্ষ কিছু সৈন্য প্রেরণ করেন। মাহমূদ তাঁহার পিছু ধাওয়া করেন। বিপুল অর্থ ও সম্পদ তাঁহার হস্তগত হয়। অনেক হিন্দুকে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন।

নবম অভিযান ১০১৪

১০১৬ সালে সুলতান মাহমুদ কাশ্মীর আক্রমণ করিতে মনস্থ করেন। গিরিপথের মুখে লৌহকোট দুর্গটি তিনি অবরোধ করেন। কিন্তু প্রচণ্ড শীতের দরুন তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

দশম অভিযান ১০১৬ খ্রিঃ

১০১৮ সালে তিনি জনবহুল ও উন্নত দেশ কনৌজ আক্রমণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রাজ্যপাল পরিহারা তখন কনৌজের রাজা। মাহমুদের আগমনের সাথে সাথে কনৌজ আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর মাহমূদ বুলন্দশহর আক্রমণ করেন। স্থানীয় রাজা হরদত্ত বশ্যতা স্বীকার করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

একাদশ অভিযান ১০১৮ খ্রিঃ কনৌজ

কনৌজ হইতে মাহমুদ মথুরার নিকটবর্তী মহাবন পৌঁছেন। মহাবনের রাজা কালাচান্দ পলায়নের চেষ্টা করেন, কিন্তু ধরা পড়িবার উপক্রম হইলে তিনি আত্মহত্যা করেন। মাহমুদ মহাবন অধিকার করেন। সেখান হইতে তিনি নিকটবর্তী মথুরার দিকে অগ্রসর হন। ইহা কৃষ্ণদেবের জন্মভূমি এবং হিন্দুদের একটি বড় তীর্থস্থান। মথুরায় উপস্থিত হইলে কেহই তাঁহাকে বাধা প্রদান করে নাই। তিনি ইহার সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করিতে আদেশ প্রদান করেন। বিপুল পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা তাঁহার হস্তগত হয়। মাহমুদ গজনী উপস্থিত হইলে তাঁহার লুণ্ঠিত দ্রব্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, ৫৩ হাজার দাস এবং ৩৫০টি হস্তী।

মহাবন মথুরা

রাজ্যপালের আত্মসমর্পণ অন্যান্য হিন্দু রাজাদিগকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। একজন চণ্ডাল যুবরাজের প্ররোচনায় তাহারা রাজ্যপালকে হত্যা করে। ত্রিলোচনপাল তাহার পরিবর্তে রাজা হন। সুলতানের বন্ধু রাজার এই পরিণতিতে তিনি ক্রুদ্ধ হন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ কারিবার সিদ্ধান্ত লন। ১০১৯ সালে মাহমুদ ত্রিলোচনপালের রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন। প্রচুর দ্রব্যসামগ্রী তাঁহার হস্তগত হয়।

দ্বাদশ অভিযান ১০১৯ খ্রিঃ

১০২১-২২ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ পুনরায় আগমন করিলে রাজা অনেক অর্থ প্রদান করিয়া যুদ্ধ হইতে পরিত্রাণ পান।

ত্রয়োদশ অভিযান ১০২০ খ্রিঃ

মাহমুদ খবর পান যে, নূর ও কিরাত নামে দুইটি সুদৃঢ় গিরিপথ আছে। সেখানে তিনি সৈন্য পরিচালনা করেন। কিরাতের শাহ্ বশ্যতা স্বীকার করেন এবং কিছু বিরোধিতার পর নূরও করায়ত্ত হয়।

চতুর্দশ অভিযান ১০২১ খ্রিঃ

১০২১ সালে মাহমুদ পুনরায় কাশ্মীর আক্রমণ করিতে মনস্থ করেন। লোহারকোট দুর্গ তিনি অবরোধ করেন। একমাস পরও ইহা আত্মসমর্পণ না করিলে তিনি লাহোর ফিরিয়া যান এবং সৈন্যবাহিনীকে সমগ্র দেশে ছড়াইয়া দেন। বসন্তের সময় তিনি গজনী ফিরিয়া যান।

পঞ্চদশ অভিযান ১০২২ খ্রিঃ

১০২২ সালে মাহমুদ গোয়ালিয়র ও কলিঙ্গ জয় করেন। রাজা নন্দ সুলতান মাহমুদের প্রশংসায় একটি কবিতা লিখিয়া পাঠান। মাহমুদ ইহাতে এতই সন্তুষ্ট হন যে, নন্দকে তিনি ১৫টি দুর্গ ছাড়িয়া দেন এবং অনেক মূল্যবান উপঢৌকন পাঠান।

পাঞ্জাব

সুলতান মাহমুদের কলিঙ্গ অভিযানের সময় লাহোরের রাজা তাঁহার পথরোধ করিয়াছিলেন। লাহোরের বিরুদ্ধে তিনি সৈন্য প্রেরণ করেন। ফলে সমগ্র পাঞ্জাব চিরদিনের জন্য মুসলমানদের করতলগত হয়।

ষোড়শ অভিযান ১০২৩ খ্রিঃ সোমনাথ মন্দির

সুলতান মাহমুদের অভিযানগুলির মধ্যে সবচাইতে চমকপ্রদ হইল তাঁহার ষোড়শ অভিযান। সৌরাষ্ট্র বা কাঠিয়াওয়ারের উপকূলে অবস্থিত সোমনাথ মন্দিরে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। মন্দিরটি অশেষ সম্পদের জন্য বিখ্যাত ছিল। হিন্দুগণ ইহাকে মুসলমানদের মক্কার ন্যায় ভক্তি করিত। মন্দিরে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূর্তিসমূহ ছিল। বহু মূল্যবান রাশি রাশি মণিমুক্তায় ইহা পরিপূর্ণ ছিল।

১০২৩ সালের বসন্তকালে সুলতান মাহমুদ ভারতের দিকে অগ্রসর হইলে তিনি এই মন্দিরের কথা শুনিতে পান। তিনি ইহাও শুনেন যে, সোমনাথের দিকের রাস্তা খুবই বিপদজ্জক। কিন্তু এইসবে কর্ণপাত করিবার লোক মাহমূদ নন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করিতে মনস্থ করেন এবং সেইদিকে সৈন্য পরিচালনা করেন। তিনি নগরের নিকটবর্তী হইলে মন্দিরের ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ খুব অভিনিবেশ সহকারে তাহাদের মূর্তিপূজা আরম্ভ করেন। নগরের প্রধান শাসনকর্তা তাঁহার পরিবারবর্গ ও কিছু লোকবল লইয়া নগর ত্যাগ করেন এবং নৌকায় গিয়া এক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুসলমান সৈন্যগণ যতদিন নগরে ছিল, ততদিন তিনি সেইখানেই অবস্থান করেন। মুসলিম সৈন্যগণ নগর অবরোধ ও আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। অচিরেই এক ফাঁকে মুসলমান সৈন্যগণ নগরে ঢুকিয়া পড়ে। মাহমুদ মন্দিরের সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করেন। সর্ববৃহৎ মূর্তিটিকে উহার মাটির ভিত্তি হইতে উপড়াইয়া ফেলা হয়। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত এই মূর্তির বিনিময়ে অনেক স্বর্ণমুদ্রার অঙ্গীকার করেন। কিন্তু মাহমুদ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া মূর্তিটি ভাঙ্গিবার আদেশ দেন। মূর্তির ভিতরে কল্পনাতীত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। মন্দিরের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এইভাবে স্বর্ণমুদ্রার মূর্তি, স্বর্ণমুদ্রা, অলংকার ও বিভিন্ন ধরনের সম্পদ সুলতানের হস্তগত হয়।

ফিরিবার পথে রাজা পরমদেব তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়ান। পরমদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার মত উৎসাহ ও সাজ-সরঞ্জাম তাঁহার নিকট তখন ছিল না। পাছে এই যুদ্ধ তাঁহার সমস্ত গৌরব ধ্বংস করিয়া দেয়, তাই তিনি সোজা রাস্তা না ধরিয়া একটি বাঁকা পথে মুলতান পৌঁছেন। সৈন্যগণ পথে পানির অভাবে খুবই কষ্ট করে। সবচাইতে বড় কথা, সিন্ধুর জাঠরা পথিমধ্যে তাঁহার সৈন্যদিগকে অশেষ কষ্ট দেয়।

সোমনাথ অভিযানই সুলতান মাহমুদের শেষ গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযান। তাঁহার সর্বশেষ অভিযান ছিল জাঠদের বিরুদ্ধে। সোমনাথ হইতে ফিরিবার পথে মুলতানের জাঠরা এবং সিন্ধু নদীর ভাটিগণ তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে খুবই কষ্ট দিয়াছিল। তাই তাহাদিগকে শাস্তি দিতে তিনি মনস্থ করেন। ১০২৭ সালে তিনি মুলতান পৌঁছেন। ১৪০০ নৌকা বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া ভাসান হয়। যুদ্ধে জাঠগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। প্রায় ৮০০০ জাঠ নিহত হয়। তাদের সমস্ত সম্পত্তি লুট করা হয়। তারপর বিজয়ী বেশে সুলতান মাহমুদ গজনীতে ফিরিয়া যান।

সপ্তদশ অভিযান ১০২৭ খ্রিঃ

জাঠদের বিরুদ্ধে এই অভিযানই তাঁহার শেষ অভিযান। তাঁহার জীবনের শেষ কয়টি বৎসর তিনি রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের ভিতর কাটান। ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সুলতান মাহমুদের অভিযানসমূহের ফলাফল ঃ সুলতান মাহমুদ কোন ভারতীয় সাম্রাজ্যের জন্য চেষ্টা করেন নাই এবং পাঞ্জাব, সিন্ধু ও মুলতানের কিছু অংশ অধিকার করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন। কিন্তু তাঁহার অভিযানগুলি কিছু ফলাফল রাখিয়া যায়, যাহা নিম্নলিখিত শিরোনামে ব্যাখা করা যায়।

রাজনৈতিক ঃ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এইসব অভিযানের কোন রাজনৈতিক ফলাফল নাই। কিন্তু মূলত এইগুলির কার্যকারিতা অনেক সুদূরপ্রসারী। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বিষয়টি ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইভাবে—"গজনভীদের পাঞ্জাব অধিকার ভারতের অভ্যন্তরীণ তোরণের দ্বার উন্মোচিত করিতে চাবিকাঠি হিসাবে কাজ করে।"[৪] অন্যত্র মজুমদার মন্তব্য করেন—"আরবগণ বা গজনভী (ইয়ামিনি) তুর্কিগণ কেহই ভারতকে ইসলামের ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যের সহিত যোগ করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু ইহার অন্যূন দুইশত বৎসর পরে গঙ্গার রাজত্বগুলিকে পরাভূত করিতে যে সর্বশেষ সংগ্রাম চলে, তাঁহারা উহার পথ পরিষ্কার করেন।"[৫] গজনভীগণই সর্বপ্রথম ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গিরিপথের দ্বার উন্মোচন করে। অতএব দেখা যায়, গজনভীগণ যদিও কোন ভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন নাই বা সুদৃঢ় করেন নাই, কিন্তু পরবর্তীকালে ইহারা ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রের পুণর্গঠনে প্রভূত সাহায্য করে।

অর্থনৈতিক ঃ ভারত ছিল অগাধ ধনভাণ্ডার। দেশের বিশাল স্বর্ণভাণ্ডার সুলতান মাহমুদ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। মাহমুদ দেশের সম্পদ নিঃশেষ করেন এবং ইহার সাজ সরঞ্জাম ভয়াবহ আকারে বিনষ্ট করেন।[৬] সুলতানের আক্রমণ দেশের সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। অপরপক্ষে এই সমস্ত ধনরাশি গজনীর সৌন্দর্য ও খ্যাতি বৃদ্ধিতে ব্যয় করা হয়।

সাংস্কৃতিক ঃ আরবদের সিন্ধু বিজয় দ্বারা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান আরম্ভ হয়, সুলতান মাহমুদের আক্রমণের দ্বারা তাহা জোরদার হইয়া উঠে।

সুলতান মাহমুদ ছিলেন শিল্প ও শিল্পীর একনিষ্ঠ সেবক। যেইসব সাহিত্যক ও শিল্পীকে তিনি ভারত হইতে লইয়া যান, তাঁহারা হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংমিশ্রণে যথেষ্ট সহায়তা করেন।

মাহমুদের দ্রুত সফলতার কারণ ঃ সুলতান মাহমুদের অদ্বিতীয় বিজয়সমূহ ইতিহাসের এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। বস্তুত এইসব বিজয়ের সফলতার মূলে কিছু কারণ বিদ্যমান। প্রথমত, হিন্দুদের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ মাহমুদকে তাহার বিজয়ে বিশেষভাবে সহায়তা করে। দ্বিতীয়ত, হিন্দুদের মধ্যে জাতীয় চেতনার অভাব। সবাই নিজেদের বিশেষ বংশের জন্য সচেতন ছিল, সামগ্রিকভাবে হিন্দুদের জন্য নহে। তৃতীয়ত, মধ্য এশীয় মুসলমানদের ধর্মীয় ও পারিবারিক শ্রেষ্ঠত্ব। চতুর্থত সুলতান মাহমুদের অদ্বিতীয় সেনাপতিত্ব তাঁহার ভারতীয় বিজয়গুলির চাবিকাঠি হইয়া দাঁড়ায়।

সুলতান মাহমুদের কৃতিত্ব ঃ আর. সি. মজুমদারের মতানুসারে—"বিশ্বের সর্বকালীন সামরিক নেতাদের মধ্যে সুলতান মাহমুদ নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ।"[৭] তাঁহার বীরত্ব, জ্ঞান, অসীম বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য গুণাবলি তাঁহাকে এশিয়ার ইতিহাসে একজন অত্যাশ্চর্য ব্যক্তি হিসাবে অংকিত করে। ভারতে তাঁহার সপ্তদশ অভিযান সর্বপরিচিত। এই সপ্তদশ অভিযান ছাড়াও পারস্য ও মধ্য এশিয়ায় তিনি সাফল্যের সাথে অনেকগুলি অভিযান পরিচালনা করেন।

সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি

৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১০৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। ত্রিশ বৎসরের উজ্জ্বল কৃতিত্ব তাঁহাকে বিশ্বের মহান নৃপতিদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। তাঁহার পিতা সবুক্তগীন হইতে তিনি একটি ক্ষুদ্র রাজ্য বংশানুক্রমে লাভ করেন। সুলতান মাহমুদ ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সেই ছোট রাজত্বকে পুরাদস্তুর গজনী সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করেন। ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ মন্তব্য করেন ঃ "একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্যকে শুধুমাত্র অস্ত্রের জোরে একটি বিশাল ও উন্নতিশীল সাম্রাজ্যে উন্নীত করা কোন নগণ্য কৃতিত্ব নহে।"[৮] মাহমুদ ভারতীয় সাম্রাজ্য চান নাই। তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা হইল ইহার সম্পদ; এবং ইহা যখন হাসিল হয়, অধিকার বা চিরস্থায়ী বিজয়ের কথা অবহেলা করিয়া তিনি গজনীতে ফিরিয়া যান।

সাহিত্যের প্রতি সুলতান মাহমুদের যথেষ্ট ঝোঁক ছিল এবং কবি ও ধর্মশাস্ত্রীদের একজন পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তিনি প্রশংসা অর্জন করেন।[৯] তিনি বিখ্যাত কবি ও বিদ্বানদের সমাগম করেন, যাহার মধ্যে ছিলেন প্রাচ্য বিদ্বানদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, যথা বিখ্যাত গণিতবিদ, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ ও সংস্কৃতের পণ্ডিত, বহুমুখি আল বিরুনী। যাহারা তাঁহার দরবার আলোকিত করেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন ঐতিহাসিক উতবী, দার্শনিক ফারাবী ও বায়হাকী। কিন্তু সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন পৃথিবীখ্যাত শাহনামার রচয়িতা ফেরদৌসী, যাঁহার প্রসিদ্ধ মহাকাব্য মাহমুদকে ইতিহাসের অমরদের মধ্যে স্থান দান করে। গজনীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি পাঠাগার এবং তাঁহার বিজিত দেশসমূহ হইতে আনা যুদ্ধের জয়চিহ্নসমূহ দ্বারা সজ্জিত একটি যাদুঘর স্থাপন করিয়া তিনি শিক্ষার উন্নতি বিধান করেন।

সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

বিচারক হিসাবে সুলতান মাহমুদ ছিলেন খুবই কঠোর ও অনমনীয়। সর্বদাই তিনি তাঁহার প্রজা সাধারণের জান মাল রক্ষার্থে প্রস্তুত থাকিতেন। বিচারের ব্যাপারে তাঁহার

নিকটাত্মীয়গণ দোষী থাকিলেও তিনি নিরপেক্ষ বিচার করেন। বিচারকার্যে তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নাই। এইরূপ অনেক উদাহরণও দেওয়া যায় যেখানে মাহমুদ বিচারের ক্ষেত্রে শাসন সম্পর্কীয় ব্যাপারে অমুসলিমদিগকে প্রাধান্য দেন।

বিচারক হিসাবে

প্রত্যেক ক্ষেত্রে সুলতান মাহমুদ উল্লেখযোগ্য উদাহরণ রাখিয়া যান এবং সেইজন্যই তাহাকে ইতিহাসের একজন কৌতূহলোদ্দীপক ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

সুলতান মাহমুদের উত্তরাধিকারিগণ
(১০৩০-১১৮৬ খ্রিঃ)

সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্য দেড়শত বৎসরের অধিক টিকিতে পারে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর ১০৩১ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার পুত্র মাসুদ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বীরত্বপূর্ণ ও যুদ্ধাভিলাষী লোক ছিলেন। মাসুদ যখন ভারতে ছিলেন, তখন সেলজুকগণ ও হিন্দুদের ষড়যন্ত্রে তাহার ছোট ভাই মুহাম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাসুদকে বন্দী করা হয় এবং ১০৪১ সালে হত্যা করা হয়। মাসুদ সুলতান মাহমুদের মতই একজন বীরপুরুষ ছিলেন এবং সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী ছিলেন।

মাসুদ মুহাম্মদ

মাসুদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মউদুদ মুহাম্মদকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। মউদুদের মৃত্যুর পর একে একে অনেক দুর্বল শাসনকর্তা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। সেলজুক তুর্কিগণ সাম্রাজ্যের বেশ কিছু অংশ কাড়িয়া লয়। পূর্ব পারস্যের ঘোর নামক স্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমীরগণ দৃঢ়ভাবে ক্ষমতায় আরোহণ করেন এবং আধিপত্যের জন্য গজনভীয়দের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন।

পরবর্তীকালে গজনভীগণ গজনী হইতে লাহোরে বিতাড়িত হন। এই সর্বশেষ আশ্রয় হইতেও তাঁহারা মুহাম্মদ ঘোরী কর্তৃক বহিষ্কৃত হন। ঘোরী ১১৮৬ সালে লাহোর অধিকার করেন এবং গজনী বংশের শেষ যুবরাজ খসরু মালিককে ক্ষমতাচ্যুত করেন। এইভাবে সুলতান মাহমুদের পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণের সময় গজনীর সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়। এইসব উত্তরাধিকারী ঘোরের যুবরাজদের উদীয়মান ক্ষমতার সামনে নিজেদের ক্ষমতা রক্ষা করিবার ব্যাপারে ছিলেন খুবই দুর্বল। পর্বতাকীর্ণ আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব হেরাতের একটি ছোট অজ্ঞাত এলাকায় ছিল ঘোর রাজ্যটির অবস্থান।

পাদটীকা

১। Suffice it to say that Mahmud understood the importance and appreciated the miraculous power of wealth.

২। It is nowhere asserted that he ever put a Hindu to death except in battle or in the storm of a fort.

৩। It may also be observed that temples of India which Mahmud raided were store-houses of enormous and untold wealth and also some of these were political centres. The temples were in fact broken during

the campaings for reasons other than religious, but in time of peace Mahmud never demolished a single temple.

৪। The Ghagnavid occupation of the Punjab served as the key to unlock the gates of the Indian interior—R.C Majumdar : An *Advanced History of India* পৃঃ ২৭৬

৫। Neither the Arabs nor the Ghagnavid (Yamini) Turks succeeded in adding India to the growing empire of Islam, but they paved the way for that final struggle which overwhelmed the Gangetic kingdoms some two hundred years.—R.C. Majumdar: Ibid

৬। He (Mahmud) drained the wealth of the country and despoiled it of its military resources to an appalling extent : R. C. Majumdar. Ibid.

৭। Sultan Mahmud was undoubtedly one of the greatest military leaders the world has ever seen.—R.C. Majumdar: Ibid.

৮। It was no mean achievement to develop a small mountain principality into a large and prosperous empire by sheer force of arms. —Ishwari Prasad : *A Short History of Muslim Rule in India.* P. 47

৯। V.A. Smith : *Oxford History of India.*

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

Habib : *Sultan Mahmud of Ghazna.*

Muhammad Nazim : *The Life and Times of Sultan Mahmud of Ghazna.*

Ishwari Prasad : *A Short History of Muslim Rule in India.*

V.A. Smith : *Oxford History of India.*

Wolesley Haig : *Cambridge History of India, Vol III.*

Ishwari Topa : *Politics in Pre-Mughal Times.*

S.R. Sharma : *Studies in Medieval Indian History*

Majumdar, Ray Chowdhury.
And Datta : *An Advanced History of India.*

Elphistone : *History of India.*

চতুর্থ অধ্যায়
মুসলিম আক্রমণের তৃতীয় স্তর

ঘোরী বংশ (১১৭৫-১২০৬ খ্রিঃ)

বংশ পরিচয় ঃ গজনী ও হিরাতের মধ্যবর্তী স্থানে ঘোরের ক্ষুদ্র তুর্কি পার্বত্য রাজ্য অবস্থিত। ঘোরের প্রধানগণ মূলত গজনীর রাজা ছিলেন। সুলতান মাহমুদের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ঘোরের প্রধানগণ তাঁহাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেন। বাহরাম নামে সুলতান মাহমুদের একজন উত্তরাধিকারী কুতুবুদ্দিন মুহাম্মদ ও সাইফুদ্দিন নামে দুইজন ঘোর যুবরাজকে হত্যা করেন। এই রক্তপাতকে কেন্দ্র করিয়া নিহত যুবরাজদ্বয়ের ভ্রাতা আলাউদ্দিন হোসেন গজনী নগরী আক্রমণ করেন। সাত দিন সাত রাত্রি পর্যন্ত আগুন জ্বালাইয়া ও লুটতরাজ করিয়া তিনি গজনী ধ্বংস করেন এবং এইভাবে ভ্রাতৃ হত্যার প্রতিশোধ লন। এই কাজ আলাউদ্দিনকে 'জাহানসূয' বা বিশ্বদগ্ধকারী উপাধিতে ভূষিত করে। তুর্কমানদের ঘুজ্জ গোত্র বাহরামের দুর্বল পুত্র ও উত্তরাধিকারী খসরু শাহকে গজনী হইতে বিতাড়িত করে। খসরু শাহ্ পাঞ্জাবে পলাইয়া যান। দশ বৎসরের জন্য গজনী ঘুজ্জ-তুর্কমানদের অধীনে থাকে এবং তারপর ইহা ঘোরের যুবরাজগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দে গিয়াস উদ্দিন মুহাম্মদ ঘুজ্জ-তুর্কমানদিগকে গজনী হইতে বিতাড়িত করেন। তাঁহার ভ্রাতা শিহাবুদ্দিন, যিনি মুঈজুদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম বা জনসাধারণ্যে পরিচিত মুহাম্মদ ঘোরী সেই প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। দুই ভ্রাতার মধ্যে খুব সম্প্রীতি বজায় ছিল। সেইখান হইতে এবং এই অবস্থায়ই মুহাম্মদ ঘোরী ভারত অভিযানে বাহির হন।

ঘোরীর আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর ভারতের অবস্থা ঃ রাজনৈতিক মতানৈক্য ভারতীয় উপমহাদেশকে ধ্বংস করিয়া দেয়। রাজপুতগণ তখন এই দেশের শাসনব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত। বিভিন্ন গোত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও গোলযোগ কাজের সময় মতৈক্য স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করে। ঘৃণিত বর্ণ বৈষম্য নীতি নীচ জাতের লোকদিগকে উঁচু জাতের লোকদের সাথে মেলামেশা করিতে দিত না। জায়গীরগুলি উত্তমবর্ণের লোকদের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে এবং এই নীতি বিশেষ সুবিধার লোকদিগকে বংশানুক্রমিক ও স্বার্থপর করিয়া তোলে। শেষ পর্যন্ত এই নীতি ভারতে রাজপুত শাসনব্যবস্থার ভিত্তিমূলকে দুর্বল করিয়া দেয়।

সুলতান মাহমুদের আক্রমণের পর রাজপুত রাজাদের মধ্যে যাহারা সবচাইতে শক্তিশালী ছিলেন, তাঁহারা হইলেন বিহারের বৌদ্ধ পাল বংশ এবং বাংলার হিন্দু সেন বংশ। বান্দেলখণ্ড ছিল চণ্ডালদের অধীনে। গাহ্দাভালগণ পরিহারাদের হাত হইতে কনৌজের শাসনক্ষমতা কাড়িয়া লয়। দিল্লী ও আজমীর ছিল চৌহানদের হাতে। বাঘেলাগণ ছিল গুজরাটে। এইসব রাজাদের মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী ছিলেন দিল্লী এবং কনৌজের রাজা,

যাহাদের নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদেশী আক্রমণকারীদের স্রোত প্রতিরোধ করা অসম্ভব করিয়া তোলে।[১] কনৌজের রাজা জয়চাঁদ দিল্লীর রাজা পৃথ্বীরাজের গর্বিত অবস্থানকে হিংসার চোখে দেখেন। জয়চাঁদ-এর একটি মেয়েকে পৃথ্বীরাজ ছিনাইয়া লইয়া যান।[২] পৃথ্বীরাজের এই কাজ তাহাদের তিক্ত সম্পর্ককে এতই বিষময় করিয়া তোলে যে, মুহাম্মদ ঘোরী ভারতের পশ্চিম গগনে উদিত হইলেও জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজের সঙ্গে যোগদান হইতে বিরত থাকেন। এই কথা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ তথাপি নাই যে, জয়চান্দ মুহাম্মদ ঘোরীকে ভারত আক্রমণ করিতে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন।[৩]

ঘোরীর আক্রমণের কারণ ঃ কোন সন্দেহ নাই যে, মুহাম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের মূলে ছিল তাঁহার বিজয়ের আশা ও নিজস্ব একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার আকাঙ্ক্ষা। তাঁহার আক্রমণের কিছু সুনির্দিষ্ট কারণও ছিল এবং তন্মধ্যে বিশেষ কারণগুলি হইল— (১) তাঁহার শত্রু, পাঞ্জাবের শেষ গজনভী সুলতান খসরু মালিককে দমন করা। (২) পারস্যের খাওয়ারিজিম শাহ্ কর্তৃক তাঁহার পশ্চিম দিকের রাজ্য বিস্তারের পথ রুদ্ধ হওয়া। শাহ্ কর্তৃক ঘোরীগণ ইতোমধ্যে কয়েকবার পরাজিত হন।

মুহাম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযান ঃ গজনীতে তাঁহার ক্ষমতা দৃঢ় করিবার পর মুহাম্মদ ঘোরী ভারতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তাঁহার প্রথম লক্ষ্য ছিল ভারতের মুসলিম নৃপতিদিগকে তাঁহার অধীনে সংঘবদ্ধ করা। প্রথম অভিযান তিনি উচ্চ এর ভাটি রাজপুতদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেন। ১১৭৫-'৭৬ সালে কারমাথিয়ানদের নিকট হইতে তিনি মুলতান অধিকার করেন। গুজরাটের বিরুদ্ধে তাঁহার পরবর্তী অভিযান ব্যর্থ হয়। পরে তিনি পেশোয়ার অধিকার করেন, এবং ১১৮২ সালে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র সিন্ধুদেশ তাঁহার করতলগত হয়। গজনভীদের শেষ সুলতান খসরু মালিক মুহাম্মদ ঘোরীর সাথে এক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। অতঃপর ঘোরী গজনীতে ফিরিয়া যান।

উচ্চ
মুলতান
পেশোয়ার
সিন্ধু

মুহাম্মদ ঘোরী গজনীতে ফিরিয়া গেলে খোকার গোত্রদের সহযোগিতায় খসরু মালিক শিয়ালকোট দুর্গ অবরোধ করেন, কিন্তু তাহা অধিকার করিতে ব্যর্থ হন। এই সংবাদে মুহাম্মদ ঘোরী ক্রুদ্ধ হন এবং পুনরায় লাহোরে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। ১১৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতারণামূলক কৌশলে তিনি খসরু মালিককে বন্দি করেন এবং সেই সঙ্গে সবুক্তগীনের বংশের পরিসমাপ্তি ঘটান। সমগ্র পাঞ্জাব ঘোরদের হাতে চলিয়া যায়। ইহার অধিকার ভারতের দিকে তাঁহার আরও বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে। ইহা অবশ্য রাজপুতদের সহিত, বিশেষত তাহার প্রতিবেশী আজমীর ও দিল্লীর শক্তিশালী অধিপতি পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবধারিত করিয়া তোলে।

পৃথ্বিরাজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

তারায়েনের প্রথম যুদ্ধ ঃ ১১৯০-৯১ সালের শীতকালে মুহাম্মদ ঘোরী পাঞ্জাবের পূর্বদিকে অগ্রসর হন। দুই লক্ষ অশ্বারোহী ও তিন হাজার হস্তীবিশিষ্ট এক বিরাট সামরিক বাহিনী লইয়া রাজপুতদের দুঃসাহসিক ও বীরত্বপূর্ণ অধিনায়ক পৃথ্বীরাজ তাঁহার পথরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হন। সমগোত্রীয় অনেক রাজপুত যুবরাজ তাঁহার সাহায্যার্থে আগাইয়া আসেন, কিন্তু রাজা জয়চাঁদ পৃথক থাকিয়া যান। উভয় সৈন্যবাহিনী ১১৯১ সালে থানেশ্বরের নিকটবর্তী তারায়েনে মিলিত হয়। রাজপুতগণ মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে সবদিক হইতে

পর্যুদস্ত ও শক্তিহীন করিয়া দেয়। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ ঘোরী একটি মারাত্মক আঘাতে আহত হইয়া গজনীতে ফিরিয়া যান।

তারায়েনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ঃ মুহাম্মদ ঘোরী প্রথম যুদ্ধের অপমান ভুলিতে পারেন নাই। ১১৯২ সালে হিন্দু রাজাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য তিনি পুনরায় ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তারায়েনেই শিবির স্থাপন করেন। পৃথ্বীরাজ তুর্কিদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার সমগোত্রীয় রাজপুতদিগকে তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইতে আহ্বান জানান। তাঁহার আবেদনে বেশ উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া যায় এবং অন্যূন ১৫০ জন রাজপুত যুবরাজ চৌহান যোদ্ধাকে শক্তিশালী করেন।

সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। শেষ পর্যন্ত ১২০০০ অশ্বারোহী লইয়া মুহাম্মদ ঘোরী বেপরোয়াভাবে আক্রমণ করেন এবং "সমগ্র হিন্দু শিবিরে মৃত্যু ও ধ্বংসলীলা বহন করেন। আক্রমনকারী বাহিনী উচ্চমানের কৌশল ও সেনাপতিত্বে রাজপুতদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে।"[৪] পৃথ্বীরাজ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন, কিন্তু শিরসুতির নিকট বন্দি ও নিহত হন।

মুহাম্মদ ঘোরীর বিজয়

তারায়েনের যুদ্ধের ফলাফল ঃ এই যুদ্ধে জয়লাভের দ্বারা মুহাম্মদ ঘোরী রাজপুত শক্তির উপর অপূরণীয় আঘাত হানেন। ইহার পর হইতে হিন্দুগণ আর কখনও মুসলিম আক্রমণের সামনে দাঁড়াইতে সক্ষম হয় নাই। বস্তুত ১১৯২ সালের তারায়েনের দ্বিতীয় যুদ্ধকে চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হিসাবে ধরা যায়, যাহা হিন্দুস্থানে শেষ পর্যন্ত মুসলিম আক্রমণকে কৃতকার্য করিয়াছিল।[৪] পরবর্তী সমস্ত হিন্দু আঁতাতই নিষ্ফল বলিয়া প্রমাণিত হয়। উত্তর ভারতে ইহা মুসলিম আধিপত্যের ভিত্তি স্থাপন করে।[৬]

অতঃপর মুহাম্মদ ঘোরী আজমীরের দিকে অগ্রসর হন এবং ইহা অধিকার করেন। রীতিমত কর আদায়ের শর্তে নগরটি পৃথ্বীরাজের এক পুত্রের হাতে অর্পণ করা হয়। মুহাম্মদ ঘোরী ভারতে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন নাই। তাঁহার সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবেক-এর হাতে এই নূতন অধিকৃত রাজ্যের ভার ন্যস্ত করিয়া তিনি গজনীতে ফিরিয়া যান। ১১৯৪ সালে মুহাম্মদ ঘোরী গজনী হইতে বাহির হন এবং কনৌজের রাজা জয়চন্দ্র-এর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জয়চন্দ্র একাকীই যুদ্ধ চালান। চান্দওয়ার ও এতাওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে মুহাম্মদ ঘোরী জয়চন্দ্রকে ভীষণভাবে পরাজিত করেন। তারপর তিনি বেনারস ও কোল জয় করেন এবং তারপর গজনীতে ফিরিয়া যান।

আজমীর অধিকার
জয়চন্দ্রের পরাজয়
বেনারস ও কনৌজ

অন্যান্য বিজয়সমূহ ঃ মুহাম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আইবেক নেহরওয়ালার রাজা ভীমদেব-এর বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং তাঁহাকে পরাস্ত করেন। একের পর এক দিল্লী, গোয়ালিয়র, বিয়ানা ও অন্যান্য স্থানসমূহ কুতুবুদ্দিন আইবেক কর্তৃক অধিকৃত হয়।

নেহরওয়ালা
দিল্লী
গোয়ালিয়র
বিয়ানা

বিহার বিজয় ঃ ১১৯৭ সালে একজন নির্ভীক, বীরত্বপূর্ণ ও বিচক্ষণ সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী আশ্চর্যজনক সহজে বিহার জয় করেন। মাত্র ২০০ অশ্বারোহীর একটি ক্ষুদ্র দল লইয়া তিনি আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং দ্রুতগতিতে প্রধান দুর্গগুলি অধিকার করেন।

বাংলাদেশ বিজয় ঃ বাংলা তখন রাজা লক্ষ্মণসেনের অধীনে ছিল। ১১৯৯ সালে কুতুবুদ্দিনের সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ তাঁহার সৈন্যবাহিনীর দল ছাড়িয়া সামনে অগ্রসর হন এবং মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী লইয়া বাংলার রাজধানী নদীয়া নগরীতে অতর্কিতে হাজির হন। তিনি রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত গিয়া বীরত্বের সহিত দ্বাররক্ষীদের আক্রমণ করেন। আক্রমণকারীগণ তাহাদের দাম্ভিকতায় কৃতকার্য হয়। ভি. এ. স্মীথ বলেন ঃ "রাজা, যিনি তখন মধ্যাহ্ন ভোজনে ছিলেন একটি পশ্চাৎদ্বার দিয়া পলায়ন করেন, এবং ঢাকার নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৭] রাজধানী অতপর নদীয়া হইতে গৌড়ে (লক্ষ্মণাবতীতে) স্থানান্তরিত হয়। ইখতিয়ার উদ্দিন কুতুবুদ্দিন আইবেকের সম্মতি আদায় করেন এবং একটি সম্পূর্ণ মুসলিম প্রাদেশিক সরকার গঠন করেন।

রাজা লক্ষ্মণ সেন

সহজে অর্জিত এই বিজয়টি ছিল চূড়ান্ত। অতঃপর ব্রিটিশদের আগমন পর্যন্ত কোন সময়েই বাংলার শাসনক্ষমতা মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয় নাই। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের পর ইহা পুনরায় পাকিস্তানের অংশ হিসাবে মুসলমানদের শাসনাধীন হয়।

কলিঙ্গ বিজয় ঃ ১২০২ খ্রিস্টাব্দে কুতুবুদ্দিন আইবেক বান্দেলখণ্ডে অবস্থিত কলিঙ্গের সুদৃঢ় চণ্ডাল দুর্গের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাছে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং অতঃপর ইহা মুসলমানদের হস্তগত হয়। তারপর কাল্পি ও বাদাউন দুর্গ জয় হয়। এইভাবে উত্তর-ভারতের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান কুতুবুদ্দিন আইবেক কর্তৃক গজনীর আয়ত্তাধীনে আনা হয়।

কলিঙ্গ বিজয়

মুহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যু ঃ ১২০৩ সালে মুহাম্মদ ঘোরীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গিয়াসুদ্দিন মারা যান। মুহাম্মদ ঘোরী এখন প্রকৃতপক্ষে গজনী, ঘোর ও দিল্লীর অধিপতি হন। কিন্তু শীঘ্রই ঘটনাপ্রবাহ অন্যদিকে মোড় নেয়।

গজনীর সুলতানগণ কখনও তাঁহাদের ভারতীয় বিজয়গুলি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা সর্বদা মধ্য এশীয় সাম্রাজ্যের আশা পোষণ করেন। তদনুসারে মুহাম্মদ ঘোরী পারস্যের খাওয়ারিজিম শাহের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেন। কিন্তু ১২০৫ সালে তিনি তথায় সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন এবং প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসেন। এই খবর বাহিরে ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গজনীর একজন সরকারি কর্মকর্তা একখানি জালপত্র সঙ্গে করিয়া ভারতে গমন করেন এবং নিজেকে সুলতান বলিয়া দাবি করেন। দুর্ভাগ্যবান মুহাম্মদ ঘোরীর মুখে গজনীর দ্বার বন্ধ হইয়া যায় এবং গোলযোগ সৃষ্টিকারী খোকারগণ পাঞ্জাবে উৎপাত আরম্ভ করে। কিন্তু মুহাম্মদ ঘোরী ছিলেন দুর্দমনীয়। তৃড়িতগতিতে তিনি মুলতান ও গজনী অধিকার করেন এবং খোকারদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া লাহোরে ফিরিয়া যান।

পরে লাহোর হইতে গজনী যাইবার সময় 'দেমইয়াহ্' নামক স্থানে তিনি ছুরিকাঘাতে নিহত হন। সুলতানের আততায়ীদিগকে কখনও সঠিকভাবে শনাক্ত করা যায় নাই। এইভাবে ১২০৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মুহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যু হয়।

ঘোর বংশের পতন ঃ মুহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর সাথে সাথেই ঘোর বংশ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়। মুহাম্মদ ঘোরীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। ভ্রাতুষ্পুত্র মাহমুদ তাঁহার মৃত্যুর পর ঘোরের

সুলতান হন। তিনি খুব সংকীর্ণ একটি এলাকার শাসনকর্তা হন। তাঁহার প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ তাঁহাদের স্বস্ব এলাকায় নিজস্ব আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহারা ছিলেন— ১। গজনীতে তাজুদ্দিন ইলদিজ, ২। ভারতে কুতুবুদ্দীন আইবেক এবং ৩। সিন্ধুতে নাসিরুদ্দিন কাবাকা। মাহমুদ অতি অল্পকালের জন্য শাসন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর খাওয়ারিজিম শাহ্ কর্তৃক ঘোর আক্রান্ত ও অধিকৃত হয় এবং এইভাবেই ঘোর বংশের পতন হয়।

মুহাম্মদ ঘোরীর কৃতিত্ব ঃ মুহাম্মদ ঘোরী একজন বড় রাজনীতিবিদ ও সেনাপতি ছিলেন। ঘোরের মত ছোট রাজ্য হইতে তিনি পরবর্তীকালে প্রায় সম্পূর্ণ ভারত অধিকার করেন। মুহাম্মদ ঘোরী তাঁহার বিজয়গুলিকে সুদৃঢ় করিতে চেষ্টা করেন, এবং এই কাজে তিনি কুতুবুদ্দিন আইবেক ও তাজুদ্দিন ইলদিজের মত সুযোগ্য সেনাপতিদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেন। ভারতের ঘুণে ধরা রাজনৈতিক কাঠামো তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝিতে সক্ষম হন এবং একটি চিরস্থায়ী প্রভুত্ব স্থাপন করিতে মনস্থ করেন।[৮]

মুহাম্মদ ঘোরী তাঁহার রাজ্য বিজয়ে সম্পূর্ণভাবে ব্যস্ত ছিলেন, তাই শিল্পকলায় মনোনিবেশ করিবার মত যথেষ্ট সময় তিনি পান নাই। তবুও তিনি শিল্প ও সাহিত্যের একজন বিদগ্ধ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

মুহাম্মদ ঘোরী ও সুলতান মাহমুদের মধ্যে তুলনা ঃ সুলতান মাহমুদের সঙ্গে তুলনা করিলে মুহাম্মদ ঘোরীর নাম প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। উভয় সেনাপতির ক্ষেত্রেই তরবারিই ছিল খ্যাতি অর্জনের একমাত্র পন্থা, কিন্তু সেনাপতি হিসাবে সুলতান মাহমুদ মুহাম্মদ ঘোরীর চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তবুও মুহাম্মদ ঘোরীর ভারতীয় বিজয়সমূহ সুলতান মাহমুদের চাইতে অধিক বিস্তৃত ও স্থায়ী । মুহাম্মদ ঘোরী একজন প্রকৃত রাজনীতিবিদ ছিলেন। ভারতের নড়বড়ে রাজনৈতিক কাঠামো তিনি প্রত্যক্ষ করেন এবং একটি স্থায়ী রাজত্ব স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু ভারতে কোন স্থায়ী প্রভুত্ব স্থাপন করিবার ইচ্ছা সুলতান মাহমুদের ছিল না। "গজনীর মাহমুদের বিপরীতে মুঈজুদ্দিন ছিলেন একজন সিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ; ভারতের পচা রাজনৈতিক কাঠামোর তিনি পুরাপুরি সুযোগ গ্রহণ করেন।"[৯]

দুইজনের অভিযানের মধ্যে সুলতান মাহমুদের অভিযানসমূহ কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই। ইহা ছিল কতকগুলি বিজয়ী আক্রমন মাত্র। অতুলনীয় লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত করিয়া তিনি তাঁহার নিজ দেশে ফিরিয়া যান। সুলতান মাহমুদের লক্ষ্য ছিল সম্পদ, রাজ্য নহে। কিন্তু মুহাম্মদ ঘোরী ছিলেন একজন সত্যিকারের বিজয়ী। তিনি এই দেশ জয় করেন এবং ইহার স্থায়িত্বের উপর লক্ষ্য রাখেন।

সাম্রাজ্য দৃঢ়করণের ব্যাপারে সুলতান মাহমুদের মনে ছিল মধ্য এশীয় সাম্রাজ্য। অতএব তিনি ভারতের জন্য পরোয়া করেন নাই। কিন্তু মুহাম্মদ ঘোরীর লক্ষ্য ছিল একটি ভারতীয় সাম্রাজ্য। এইজন্যই দেখা যায়, মুহাম্মদ ঘোরী যেখানে ভারতে মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তন করেন সেস্থলে সুলতান মাহমুদ কৃতকার্য হন গজনী সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী, সম্পদশালী, মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে, যে সাম্রাজ্য তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় একশত বৎসর পর্যন্ত টিকিয়া থাকে।

মাহমুদ ও মুহাম্মদ ঘোরীর লক্ষ্য

মানুষ হিসাবে দুইজন বিজয়ী ছিলেন দুই প্রকৃতির। মুহাম্মদ ঘোরী ছিলেন প্রধানত

একজন সৈনিক। কিন্তু সুলতান মাহমুদ শুধু একজন সৈনিকই ছিলেন না, তিনি শিল্প ও সাহিত্যের একজন বড় পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে ঃ "তিনি (মুহাম্মদ ঘোরী) একজন ন্যায়নিষ্ঠ, খোদাভক্ত এবং প্রজাদের সদা মঙ্গল কামনাকারী নৃপতির চরিত্র ধারণ করেন।"[১০]

পাদটীকা

১। ঈশ্বরী প্রসাদ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭, ৫৮।

২। আর. সি. মজুমদার ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৯।

৩। ঐ।

৪। ঐ, পৃঃ ২৭৯।

৫। In fact the second battle of Tarain in 1192 A. D. may be regarded as the decisive contest which ensured the ultimate success of the Muhammada attack on Hindostan—V.A. Smith: *Oxford History of India.*

৬। আর. সি. মজুমদারঃ প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৮০।

৭। The Raja who was at his dinner slipped away by a backdoor and retired to the neighbourhood of Dacca. —V. A. Smith: *Oxford History of India.*

৮। He (Ghori) clearly perceived the rotten political conditions of India and made up his mind to found a permanent dominion — Ishwari Prasad: Ibidi P. 61

৯। Unlike Mahmud of Ghazna, Muizuddin was a practical statesman; of the rotten political structure of India he took the fullest advantage— Habibullah : *Foundation of Muslim Rule in India.*

১০। He (Muhammad Ghori) bore the character of a just monarch, fearing God, and ever having the good of his subjects.—Ferista.

গ্রন্থপঞ্জি

Habibullah. A. B. M : *Foundation of Muslim Rule in India*

Ishwari Prasad : *A Short History of Muslim Rule in India.*

Elliot and Dowson : *History of India as told by its own Historians.*

V. A. Smith : *Oxford History of India.*

Minhaz-us Seraj : *Tabaqat-i-Nasiri*

Briggs : *Rise of Muhammadan Power in the East.*

পঞ্চম অধ্যায়
দিল্লী সালতানাত

প্রাথমিক তুর্কি সাম্রাজ্য
বা
তথাকথিত দাস বংশ
(১২০৬-১২৯০ খ্রিঃ)

ভূমিকা ঃ মুহাম্মদ ঘোরী ভারত ত্যাগ করিবার সময় তাঁহার সুযোগ্য সেনাপতি কুতুব উদ্দিন আইবেককে ভারতে তাঁহার বিজয় করা রাজ্যগুলির শাসনকর্তা রাখিয়া যান। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর আইবেক নিজেকে দিল্লীর সুলতান হিসাবে ঘোষণা প্রদান করেন এবং যথারীতি ঘোরীর অন্যান্য শাসনকর্তাদের স্বীকৃতি লাভ করেন। ১২০৬ সালে আইবেকের সুলতান ঘোষণার পর হইতে ১৫২৬ সালে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত দিল্লীর সব শাসক নিজেকে সুলতান হিসাবে ঘোষণা দেন এবং এইজন্য এই যুগকে 'দিল্লী সালতানাত' বলা হয়, যদিও এই সময়কালে অনেকগুলি বংশ দিল্লীর শাসন কার্যে নিয়োজিত ছিল।

কুতুবুদ্দিন আইবেক স্বয়ং তুর্কি ছিলেন এবং ১২০৬ হইতে ১২০৯ সাল পর্যন্ত তাঁহার অনুসারী যাহারা শাসন করিয়াছেন, তাহারা সবাই ছিলেন তুর্কি। এইজন্য ঐতিহাসিক প্রফেসর আজিজ আহমদ সহ অনেক ঐতিহাসিক এই রাজ্যকে 'দিল্লীর প্রাথমিক তুর্কি সাম্রাজ্য নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

১২০৬ হইতে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালটি দাস বংশ বা মামলুক বংশ নামে সমধিক পরিচিত, কিন্তু সত্য কথা বলিতে 'দাস' বা 'বংশ' কোনটিই এই যুগে খাটানো যায় না বা এই যুগকে বলা যায় না।

ইহাতে কোন মতভেদ নাই যে, এই যুগের প্রধান সুলতানগণ, যথা ঃ কুতুবুদ্দিন আইবেক, ইলতুৎমিশ এবং গিয়াসুদ্দিন বলবন মূলত দাস ছিলেন। কুতুবুদ্দিন আইবেক মুহাম্মদ ঘোরীর দাস ছিলেন এবং ঘোরীর জীবতকালে আইবেক ভারত শাসন করেন দাস হিসাবেই। কিন্তু মুহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারি ও ভ্রাতুষ্পুত্র মাহমুদের নিকট হইতে তিনি একটি মুকুট এবং সুলতান উপাধি লাভ করেন। সুতরাং কুতুবুদ্দিন আইবেক যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি দাস ছিলেন না, বরং একজন স্বাধীন সুলতান ছিলেন।

সুলতান কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী লইয়া সামান্য মতবিরোধ হয়। শেষ পর্যন্ত কুতুবউদ্দিনের দাস শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু সঠিক

প্রমাণাদি দ্বারা দেখা যায়, আইবেক তাঁহার জীবিতকালে শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশকে মুক্তি দিয়াছিলেন। ইলতুৎমিশ-এর উত্তরাধিকারিগণ দাস ছিলেন না, তাঁহার পুত্র ও কন্যা ছিলেন। উল্লেখ্য সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন ইলতুৎমিশের প্রসিদ্ধ চল্লিশজন দাসের একজন ছিলেন। সুলতানের অন্যান্য ঊনচল্লিশ জন দাসদের সঙ্গে গিয়াসুদ্দিনও মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

এই যুগের সুলতানগণ কোন একটি বংশোদ্ভূত নহেন। প্রকৃতপক্ষে 'দাস' ও 'বংশ' এই দুইটি পদবী সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী। ইলতুৎমিশ কুতুবউদ্দিনের পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন না। গিয়াসউদ্দিন বলবনও ইলতুৎমিশের চল্লিশজন দাসের একজন ছিলেন। অতএব এসব সুলতানদিগকে এক বংশ বা পরিবারভুক্ত বলা যায় না।[১]

তাঁহারা এক বংশোদ্ভূত ছিলেন না

আরেকটি গলদ হইল, তাহাদিগকে পাঠান বা আফগান বলা হয়। কিন্তু সত্যিকারভাবে তাঁহারা সবাই ছিলেন তুর্কি। সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেককে তুর্কিস্তান হইতে আনা হয়; এবং ইলতুৎমিশ ও বলবন উভয়েই তুর্কিস্তানের প্রসিদ্ধ ইলবারি গোত্রের লোক।

এই যুগের বৈশিষ্ট্য হইল ভারতে মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন, যাহা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে। যদিও শাসনক্ষমতা এক বংশ হইতে আরেক বংশে হস্তান্তর হইয়াছে, কিন্তু শাসক সবাই ছিলেন মুসলিম।

যুগের বৈশিষ্ট্য

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক
(১২০৬-১২১০ খ্রিঃ)

তাঁহার প্রাথমিক জীবন ঃ সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক মূলত একজন তুর্কিস্তানি ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার বাল্যকালে নিশাপুরের কাজী ফখরুদ্দিন আব্দুল আজিজ কুকী তাঁহাকে একজন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে খরিদ করেন। কাজীর পুত্রদের সঙ্গে কুতুবুদ্দিনও ধর্মীয় ও সামরিক শিক্ষা লাভ করেন। কাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ কুতুবুদ্দিনকে একজন ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করেন।[২] ব্যবসায়ীটি তাঁহাকে গজনী আনয়ন করেন। গজনীতে পুনরায় তাঁহাকে মুহাম্মদ ঘোরীর নিকট বিক্রয় করা হয়।

তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্তি ঃ আইবেক প্রশংসনীয় গুণাবলি ও অতি চমৎকার চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। যোগ্যতাবলে তিনি ক্রমে ক্রমে আমির আখুর (আস্তাবলের অধিনায়ক) পদে উন্নীত হন।[৩] মুহাম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের সময় আইবেক আনুগত্যের সহিত তাহাকে অনুসরণ করেন এবং তাঁহার কার্যের পুরস্কারস্বরূপ ঘোরী তাঁহাকে ভারতীয় বিজয়গুলির শাসনকর্তা হিসাবে রাখিয়া যান। রাজনৈতিক কারণে তিনি তাজুদ্দিন ইলদিজের কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং স্বীয় কন্যাকে নাসিরুদ্দিন কাবাকার নিকট বিবাহ দেন। আরেক কন্যাকে তাঁহার ক্রীতদাস ইলতুৎমিশের নিকট বিবাহ দেন। এই সমস্ত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তিনি ভারতে তাঁহার অবস্থান সুদৃঢ় করেন।

তাঁহার বিজয়সমূহ ঃ বিজয়ী হিসাবে আইবেক-এর জীবন ছিল খুবই প্রশংসনীয়। তিনি হান্সি, মিরাট, দিল্লী, রানথাম্ভোর ও কোল জয় করেন এবং বেনারস পর্যন্ত সমগ্র দেশ তাঁহার পদানত করেন। ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে এক তুমুল যুদ্ধে তিনি নেহরওয়ালার অধিপতিকে পরাজিত করিয়া সমগ্র দেশ মুসলমানদের অধীনস্থ করেন। ১২০২ সালে তিনি কলিঙ্গ দুর্গ এবং পরে

মাহোবা দুর্গ অধিকার করেন। ইতোমধ্যে আইবেকের সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বিহার ও বাংলা জয় করেন। দিল্লী হইতে কালিঞ্জর ও গুজরাট এবং লক্ষ্মণাবতী হইতে লাহোর পর্যন্ত সমগ্র ভারত মুসলমানদের করতলগত হয়।

সালতানাত এর কাজে ঃ মুহাম্মদ ঘোরীর স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্য কোন পুত্র সন্তান তিনি রাখিয়া যান নাই। সুতরাং বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তাদের সাথে কুতুবুদ্দিন আইবেক সুলতান উপাধি ধারণ করেন এবং ভারতীয় কর্মকর্তাগণ কর্তৃক তিনি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অধিপতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

পাঞ্জাবের আধিপত্য লইয়া তাজুদ্দিন ইলদিজ আইবেকের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। আইবেক ইলদিজকে পরাজিত করেন ও চল্লিশ দিনের জন্য গজনী অধিকার করেন। কিন্তু গজনীর জনসাধারণ গোপনে ইলদিজকে আহ্বান করে। ইলদিজ ত্বরিতগতিতে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। ইলদিজের বাহিনীর হঠাৎ আগমনে আইবেক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং গজনী ছাড়িয়া পলায়ন করেন। এইভাবে আফগানিস্তান ভারতের আওতা বহির্ভূত থাকিয়া যায়। কুতুবুদ্দিন আইবেক মূল ভারতের সুলতান থাকিয়া যান। ১২১০ সালে লাহোরে চৌগান বা পোলো খেলিবার সময় অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইয়া তিনি মারা যান।[৪]

সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের কৃতিত্ব ঃ সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক অন্তরাত্মার অনেকগুলি প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী ছিলেন এবং উদারতা, দানশীলতা ও সাহসিকতার দিক হইতে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চত্যের তাঁহার সমস্ত সমসাময়িকদিগকে অতিক্রম করিয়া যান। 'তারিখ এ ফখরুদ্দিন মুবারক শাহী'র গ্রন্থকার লিখিয়াছেনঃ "তাঁহার বিক্রম, সাহসিকতা ও সাহসিক কাজগুলি এমন যে, রুস্তম যদি জীবিত থাকিতেন, তবে তিনি তাঁহার হাজিব (কোষাধ্যক্ষ) হইতে গর্ববোধ করিতেন।[৫] কুতুবুদ্দিন আইবেক প্রথম মুসলিম নৃপতি, যিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ভারতে মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন।[৬]

বেসামরিক শাসনব্যবস্থার মৌলিক তথ্যের উপর আইবেক বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন। অসীম বীরত্ব ও নিখুঁত বিশ্বাসের নৃপতি কুতুবুদ্দিন আইবেক ছিলেন রাজ্যের যথোপযুক্ত ব্যক্তি এবং আধিপত্যের জন্য ছিলেন যোগ্য শাসক। তিনি একজন সুবিচারক সুলতান ছিলেন এবং উলামা ও বিদ্বান ব্যক্তিবর্গকে তিনি মর্যাদায় সমাসীন রাখেন। সুবিচার এবং নিরপেক্ষতা তিনি এমন শক্ত ভিত্তিতে স্থাপন করেন যে, তাঁহার পতাকাতলে তুর্কি, ঘোরী, খোরাসানী, খিলজী ও হিন্দুস্থানী সমস্ত জাতের লোকই সমবেত হয়; কিন্তু জোরপূর্বক কেউ কাহারও একটি শস্যের কণাও লইতে সাহস করে নাই।

"সাহসী ও উৎসাহী, বীরত্বপূর্ণ এবং মুসলিম আদর্শ অনুসারে ন্যায়পরায়ণ আইবেক ধর্মের প্রতি ছিলেন একনিষ্ঠ, এবং সামরিক বীরত্বে সুপরিচিতি একটি জাতির জন্য বিদেশী মাটির উপর একটি বিশাল রাজ্য স্থাপনকারী হিসাবে তিনি মুসলিম ভারত বিজয়ীদের মহান অগ্রগামীদের সাথে স্থানলাভ করিয়াছেন।"[৭] অন্যেরা যাহা কৌশল ও কূটনীতি দ্বারা আদায় করেন, তাহা তিনি তাঁহার দুইটি প্রধান অস্ত্র, কাঠিন্য ও মহানুভবতার দ্বারা আদায় করেন। তাঁহার ভয়াবহতা ও বদান্যতার আশা তাঁহার অনেক মহাশত্রুকেও তাঁহার পার্শ্বে আনয়ন করিয়াছে এবং একটি শক্ত ও স্থায়ী সরকার গঠনে বেশ সাহায্য করিয়াছে।

সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক সর্বদা নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। সব

লেখকই তাঁহার দানশীলতার প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহাকে লাখ্বখ্স বা লক্ষদানকারী উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।[৮] দুর্ভাগ্যবশত তিনি তাঁহার শ্রমের ফল ভোগ করিবার জন্য বেশিদিন বাঁচেন নাই। কিন্তু ভারতে একটি শক্তিশালী মুসলিম কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র রাখিয়া যাইতে তিনি সক্ষম হন। ইসলামের বিজয় পতাকা তিনি যে দেশে স্থাপন করেন, তাহা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বর্তমান থাকে। দিল্লীতে একটি মসজিদ এবং আজমীরে আরেকটি মসজিদ স্থাপন করিয়া তিনি তাঁহার ধর্মীয় উৎসাহের প্রমাণ রাখিয়া যান।

আরাম শাহ্

লাহোরে সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক-এর হঠাৎ মৃত্যুতে লাহোরের আমির ও মালিকগণ আরাম বখ্স্‌কে সুলতান আরাম শাহ্ উপাধি দিয়া আইবেকের উত্তরাধিকারী করেন। কুতুবুদ্দিন ও আরাম শাহের সম্পর্ক পুরাপুরিভাবে জানা যায় নাই। কোন কোন সূত্র অনুযায়ী, তিনি কুতুবুদ্দিনের পুত্র ছিলেন। কিন্তু মিনহায-উস-সিরাজে উল্লেখ আছে, আইবেকের মাত্র তিনটি কন্যা ছিল। ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁহাকে আইবেকের ভাই বলিয়া উল্লেখ করেন। কিছু সংখ্যক লেখক আবার বলিয়া থাকেন, দুইজনের মধ্যে কোন সম্পর্কই ছিল না।[৯]

রাজ্য পরিচালনা করিবার মত কোন ক্ষমতা বা যোগ্যতা আরাম শাহের ছিল না। দিল্লীর আমিরগণ শীঘ্রই তাঁহার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র করেন এবং তৎকালীন বাদাউনের শাসনকর্তা শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশকে দিল্লীর ক্ষমতা গ্রহণের আহ্বান জানান। ইলতুৎমিশ এই আহ্বানে সাড়া দেন এবং দিল্লীর নিকটবর্তী জুদ প্রান্তরে আরাম শাহ্‌কে পরাজিত করিয়া সুলতান হন। ইলতুৎমিশ লাহোর হইতে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তর করেন।

সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ
(১২১০-১২৩৬ খ্রিঃ)

প্রাথমিক জীবন ঃ জুদের প্রান্তরে আরাম শাহ্‌কে পরাজিত করিয়া ১২১০ সালে সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তুর্কিস্তানের ইলবারি বংশোদ্ভূত। তিনি উল্লেখযোগ্য সুন্দর ছিলেন এবং বাল্যকালেই তাঁহার বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ দেখা যায়। ইহা তাঁহার ভাইদিগকে ঈর্ষান্বিত করিয়া তোলে এবং ফলে তাঁহাকে সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হয়। তাঁহার গুণাবলি সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সুলতান তাঁহাকে খুব উচ্চ মূল্যে খরিদ করেন। তাঁহার বিভিন্ন গুণাগুণের দ্বারা তিনি ধাপে ধাপে উন্নীত হন। শেষ পর্যন্ত তিনি বাদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং কুতুবুদ্দিন আইবেকের কন্যাকে বিবাহ করেন। খোকারদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় তাঁহার কার্যাবলির প্রশংসা করিয়া মুহাম্মদ ঘোরীর আদেশ অনুযায়ী আইবেক তাঁহাকে দাসত্বমুক্ত করেন এবং আমির-উল-উমারার পদে উন্নীত করেন।

সালতানাত-এর তৎকালীন অবস্থা ঃ ইলতুৎমিশ দিল্লীর সিংহাসনকে পুষ্পশয্যা হিসাবে পান নাই। সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের সমস্যাবলি অমীমাংসিত অবস্থাতেই পড়িয়া ছিল। সিন্ধুতে নাসিরুদ্দিন কাবাকা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং পাঞ্জাবের উপর তাঁহার আধিপত্য

বিস্তার করিবার আশা পোষণ করেন। গজনীর সুলতান তাজুদ্দিন ইলদিজ তখনও মুহাম্মদ ঘোরীর ভারতীয় বিজয়গুলির আশা পোষণ করেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দিনের মৃত্যুর পর আলী মর্দান নামে একজন খিলজী আমিরকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি সেখানে দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন এবং নিজেকে সুলতান আলাউদ্দিন উপাধিতে ভূষিত করেন। হিন্দু প্রধান ও যুবরাজগণ নিজেদের স্বাধীনতা হারাইয়া আক্রোশে ছিলেন এবং আরাম শাহের দুর্বল শাসনের সময় গোয়ালিয়র ও রানথাম্বোর অধিকার করেন। সর্বোপরি কিছু সংখ্যক আমির ইলতুৎমিশের শাসনের বিরুদ্ধে আক্ষেপ প্রকাশ করেন এবং 'তুর্কি' নামক একজন আমিরের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেন।[১০]

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ হিন্দু আক্রোশ

ইলতুৎমিশের গৃহীত পন্থাবলি ঃ দিল্লীর আশেপাশে এইসব আমিরদের বিদ্রোহে ইলতুৎমিশ প্রথমত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। এক সপ্তাহ পর ইজউদ্দিন বখতিয়ার, নাসিরুদ্দিন মর্দান শাহ, হাজবর উদ্দিন আহমদ সূর এবং ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ ওমরের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী জড়ো করেন। দিল্লীর নিকটবর্তী জুদ প্রান্তরে তিনি বিদ্রোহীদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন[১১] এবং বাদাউন, অযোধ্যা, বেনারস ও সিওয়ালিকের মত করদরাজ্যগুলিকে তাঁহার সরাসরি আয়ত্তে আনয়ন করেন। এতদসঙ্গে সালতানাতের দূরবর্তী রাজ্যগুলিকে তাঁহার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করেন। কিছুকাল পর জালরের রাজা উদয় সিং বিদ্রোহ করেন এবং প্রচলিত কর দিতে অস্বীকার করেন। সুলতান অতঃপর চৌহান রাজা উদয় সিং-এর বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য করেন।[১২]

দূরবর্তী এলাকাকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনয়ন উদয় সিং-এর বিদ্রোহ

১২১৪ সালে তাজুদ্দিন ইলদিজ পারস্যের খাওয়ারিজিম শাহ্ কর্তৃক গজনী হইতে বিতাড়িত হন। ইলদিজ অতঃপর থানেশ্বর পর্যন্ত পাঞ্জাব জয় করেন এবং ইলতুৎমিশের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করেন। ইলতুৎমিশ ইহা বরদাশত করিতে পারেন নাই। ১২১৬ সালে তিনি তারায়েনের নিকটে ইলদিজকে পরাজিত করেন এবং বাদাউনে বন্দি করেন।

ইতোমধ্যে নাসিরুদ্দিন কাবাকা লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হন, কিন্তু পরে ইলতুৎমিশ কর্তৃক সেইখান হইতে বিতাড়িত হন। ১২২৮ সালে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন এবং সিন্ধু নদীতে ডুবিয়া মারা যান।

মোঙ্গল নির্গমন ঃ সুলতান ইলতুৎমিশের সময়েই মোঙ্গলগণ তাহাদের বিখ্যাত নেতা চেঙ্গিস খান-এর নেতৃত্বে ১২২১ সালে সর্বপ্রথম সিন্ধু নদীর তীরে উদয় হয়। মোঙ্গলগণ খিভের সর্বশেষ খাওয়ারিজিম শাহ জালালুদ্দিন মঙ্গবারাণীকে আক্রমণ করে। জালালুদ্দিন পাঞ্জাবে পলায়ন করেন এবং সুলতান ইলতুৎমিশের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন, কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন।[১৩] জালালুদ্দিন অতঃপর মোঙ্গলদের সাথে এক শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া মুলতানের নাসিরুদ্দিন কাবাকাকে পরাজিত করেন, সিন্ধু ও উত্তর গুজরাটে লুটতরাজ করেন এবং পরে পারস্যে চলিয়া যান। চেঙ্গিস খান ভারতের জল-বায়ু তাঁহার জন্য খুব গরম মনে করেন,

পারস্যের জালালুদ্দিন মঙ্গবারাণী

সুতরাং মোঙ্গলগণ ফিরিয়া চলিয়া যায়। এইভাবে ভারত অন্তত সেইবারের মত মোঙ্গলদের ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা পায়। অবশ্য মোঙ্গল আক্রমণ পরবর্তী দিল্লীর সুলতানদিগকে খুবই বিরক্ত করে।

বাংলাদেশ ঃ আলী মর্দান ও গিয়াসুদ্দিন খিলজীর মত খিলজী মালিকগণ বাংলায় দিল্লী সালতানাতের আনুগত্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা এমনকি নিজেদের নামে মুদ্রার প্রচলন এবং খুৎবায় নিজেদের নাম পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ১২২৫ সালে ইলতুৎমিশ একটি সৈন্যদল প্রেরণ করিলে খিলজী মালিকগণ সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু ইলতুৎমিশের সৈন্যবাহিনী ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা আবার বিদ্রোহ করেন। কিন্তু পরে তাহাদিগকে পরাজিত করা হয় এবং খিলজী মালিকদিগকে বন্দি করা হয়। খিলজি মালিকগণ পুনরায় বিদ্রোহ করেন। কিন্তু ১২৩০-৩১ সালে তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ আনুগত্যে আনা হয় এবং আলাউদ্দিন জামীকে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

খিলজী বিদ্রোহ
খিলজী বিদ্রোহ দমন

বিজয়সমূহ ঃ ১২২৬ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিশ হিন্দুদের নিকট হইতে রানথাম্ভোর পুনরায় অধিকার করেন। কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পর গোয়ালিয়র পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে, কিন্তু ১২৩২ সালে ইলতুৎমিশ ইহার হিন্দু রাজা মঙ্গলদেবের নিকট হইতে ইহা পুনরায় অধিকার করেন। ১২৩৮ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিশ মালব রাজ্য আক্রমণ করেন এবং ভিলসা দুর্গ দখল করেন। তারপর তিনি প্রসিদ্ধ নগরী উজ্জয়ন অধিকার করেন। সুলতানের শেষ অভিযান প্রেরিত হয় বানিয়ানের বিরুদ্ধে। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। ফলে তাঁহাকে পুনরায় দিল্লীতে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানেই তিনি ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বাগদাদের খলিফা কর্তৃক অভিষেক ঃ ১২২৯ সালে সুলতান ইলতুৎমিশ বাগদাদের খলিফা আল-মুসতানসির বিল্লাহ-এর নিকট হইতে একটি সম্মানসূচক রাজকীয় পোশাক ও একটি রাজকীয় অভিষেক লাভ করেন। 'সুলতান-ই-আযম' হিসাবে ইলতুৎমিশ কর্তৃক বিজিত সমস্ত জলে-স্থলে তাঁহার অধিকার অনুমোদন করা হয়। ইহা ইলতুৎমিশের আধিপত্যে নূতন ধরনের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং তাঁহাকে মুসলিম বিশ্বে একটি উচ্চ মর্যাদা দান করে।

সুলতানই আযম উপাধি

ইলতুৎমিশের কৃতিত্ব ঃ সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ ছাব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। "তাঁহাকে ন্যায়সঙ্গতভাবে দিল্লীর প্রাথমিক তুর্কি সালতানাত-এর সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক মনে করা যায়।"[১৪] তিনি সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের অসমাপ্ত কাজ পুনরাম্ভ করেন এবং প্রবল বিপত্তি ও অসম্পূর্ণ ভিত্তির উপর এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করেন, যাহার আধিপত্য রক্ষা করিতে অসাধারণ কূটনৈতিক বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। "আইবেক দিল্লী সালতানাত ও ইহার স্বাধীন মর্যাদার রূপরেখা অংকন করিয়াছেন; কিন্তু ইলতুৎমিশ নিঃসন্দেহে ইহার প্রথম সুলতান।"[১৫]

ইলতুৎমিশ-এর ন্যায় একজন প্রাক্তন ক্রীতদাস যে তাঁহার পুত্রদের জন্য রাজমুকুট রাখিয়া যাইতে সক্ষম হন, ইহাই তাঁহার গঠনমূলক রাজনীতির পরিচায়ক। অসাধারণ বাস্তবতা, স্থির সংকল্প এবং ভবিষ্যৎ-দর্শন ছিল তাঁহার বৈদেশিক কার্যাবলির মাপকাঠি। সুলতান কুতুবদ্দিন আইবেকের বিজয়গুলিকে একটি শক্ত ও সংঘবদ্ধ রাষ্ট্র হিসাবে মজবুত

করিবার মধ্যে তাঁহার কৃতিত্ব নিহিত, যে রাষ্ট্রের সীমারেখা তাঁহার মৃত্যুর সময় কিছু বহির্গত প্রদেশ ছাড়া সমগ্র ভারতে বিস্তৃত ছিল।

একজন দুর্দান্ত যোদ্ধা এবং শত্রুর কঠোর পশ্চাদ্ধাবনকারী ইলতুৎমিশ তাঁহার জীবনের শেষ বৎসর পর্যন্ত সামরিক বিজয়ে ব্যস্ত থাকেন। "মইজুদ্দিনের বিজয়গুলিকে পুনরাধিকার করা ছাড়াও তিনি রাজপুতানা ও গঙ্গা নদীর অপর পার্শ্বস্থ অঞ্চলে অগ্রসর হন এবং সিন্ধু উপত্যকার সীমান্ত পুনর্গঠনেও প্রশংসনীয় উদ্যম গ্রহণ করেন।"[১৬]

ইলতুৎমিশ একজন সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বনকারী ও বুদ্ধিমান সংগঠক ছিলেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রথম খসড়া অংকনের জন্য সালতানাত তাঁহার নিকট ঋণী। তিনি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন, যাহা পরবর্তীকালে খিলজীদের সময় একটি সামরিক সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে একটি সুকৌশল সমঝোতার মাধ্যমে তিনি নৈতিক বিরোধিতাকে নিরস্ত করেন। তৎসঙ্গে সামরিক শ্রেণীও তাঁহার রাজ্য বিস্তারের নীতিতে বেশ সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। ১২২৯ খৃষ্টাব্দে বাগদাদ হইতে আব্বাসীয় খলিফার রাজদূত তাঁহাকে একজন ইসলামী সুলতান হিসাবে ক্ষমতা প্রদান করিতে আসিলে শুধু তাঁহার রাজশক্তি ও বংশ নহে, বরং তাঁহার রাষ্ট্রও চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে।

একজন বুদ্ধিমান সংগঠক

সুলতান ইলতুৎমিশের দৃঢ় ও উৎসাহব্যঞ্জক কর্মপন্থার দ্বারা প্রাথমিক দিল্লী সালতানাত ইহার অংকুরে বিনষ্ট হইবার কাল কাটাইয়া উঠে। অনেক শক্তিশালী ও পুরাতন সাম্রাজ্যসমূহ নির্মূলকারী মোঙ্গল উন্মত্ততার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য মধ্যযুগীয় ভারত তাঁহার নিকট শুধু সামান্য কৃতজ্ঞতায় ঋণী নহে।[১৭] রাজপুতদের বিরুদ্ধে তাঁহার অগ্রগামী নীতি বেশ কৃতকার্যতার পরিচয় দান করে, এবং বড় আকারের নৈতিক মূল্যের ফল প্রদান করে। এই নীতি সদ্য স্থাপিত মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাজপুতদের এই প্রথম যুদ্ধংদেহী আহ্বানের যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করে।

মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে রাজপুতদের বিরুদ্ধে

১২৩১-১২৩২ সালে সুলতান ইলতুৎমিশ কর্তৃক সমাপ্ত দিল্লীর প্রসিদ্ধ কুতুবমিনার তাঁহার মহত্ত্বের চিরস্থায়ী সাক্ষি স্বরূপ বিরাজমান। ইলতুৎমিশ একজন খাঁটি ধার্মিক ছিলেন এবং নামাজ কালামের ব্যাপারে তিনি খুবই নিষ্ঠাবান ছিলেন। মিনহায-উস-সিরাজ উল্লেখ করেন ঃ "এইরকম একজন ধার্মিক, দয়ালু ও জ্ঞানী এবং দরবেশদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সুলতান আর কখনও সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই।"[১৮] সমসাময়িক কিছু সংখ্যক শিলালিপিতে তাঁহাকে 'খোদার রাজ্য রক্ষাকারী', 'খোদার ভৃত্যদিগকে সাহায্যকারী" ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

সুলতান ইলতুৎমিশ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন শাসক ছিলেন। ক্ষমতার চিহ্ন তিনি প্রত্যেক কাজের মধ্যে রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যু ও বংশ ধ্বংস হইবার অনেক পরেও জনসাধারণ অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার উন্নতিশীল ও গৌরবান্বিত রাজত্বের দিকে ফিরিয়া তাকায়।

সুলতান রুকনুদ্দিন ফিরূয শাহ

শাসনকার্য পরিচালনা করিবার মত উপযুক্ত পুত্র সন্তান ইলতুৎমিশের ছিল না। সুতরাং তিনি তাঁহার কন্যা রাজিয়াকে উত্তরাধিকারিণী নিযুক্ত করেন। কিন্তু দিল্লীর আমিরগণ একজন

মহিলার সামনে মাথা নত করিতে অনীহা প্রকাশ করেন। সুতরাং তাঁহারা ইলতুৎমিশের জীবিত জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তৎকালীন বাদাউন এবং লাহোরের শাসনকর্তা রুকনুদ্দিন ফিরুযকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু রুকনুদ্দিন শাসনকার্যের জন্য অযোগ্য ছিলেন। তিনি অসৎকাজে মত্ত থাকেন, রাষ্ট্রীয় কাজে অবহেলা করেন এবং রাষ্ট্রের সম্পদরাজি অযথা ধ্বংস করিতে আরম্ভ করেন। রুকনুদ্দিনের মাতা শাহ তুরখান সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন, এবং তাঁহার পুত্র সর্বদা আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকেন। সমগ্র রাজত্ব অরাজকতায় পতিত হয়। বাদাউন, মুলতান, হান্সি, লাহোর, অযোধ্যা ও বাংলার কেন্দ্রীয় শক্তিকে অবজ্ঞা করা হয়। দিল্লীর আমিরগণ তুরখানের অন্যায় কর্তৃত্বে এখন অসন্তোষে জ্বলিতে থাকেন। তাঁহারা অতঃপর তুরখানকে বন্দি করেন এবং রাজিয়াকে দিল্লীর সিংহাসনে বসান। রুকনুদ্দিন ফিরুয কিলোখরিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে তাঁহাকে পুনরায় বন্দি করা হয় এবং ১২৩৬ সালের নভেম্বর মাসে সেখানেই তিনি মারা যান।

সুলতানা রাজিয়া
(১২৩৬-১২৪০ খ্রিঃ)

সিংহাসনে আরোহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সুলতানা রাজিয়া ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হন। উজির জুনাইদি ও অন্যান্য ক্ষমতাবান আমিরগণ তাঁহার বিরোধিতা আরম্ভ করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন এবং পাঞ্জাবসহ সমগ্র ভারতে তাঁহার কর্তৃত্ব আরোপ করেন। বাংলা ও সিন্ধুর শাসকর্তাগণও তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লন। মিনহায-উস-সিরাজ বর্ণনা করে ঃ "লক্ষ্মণাবতী হইতে দেবল ও দামরিলা পর্যন্ত এলাকার সমস্ত মালিক ও আমিরগণ তাহার নিকট তাঁহাদের আনুগত্য ও বশ্যতা প্রকাশ করেন।" কিরামিতা ও মুলাহিদা সম্প্রদায়ের কতিপয় ধর্মবিরোধী লোকজন নূরুদ্দিন নামক একজন তুর্কির নেতৃত্বে এক হাজার লোককে ঢাল-তলোয়ার সহকারে উপস্থিত করে এবং জামে মসজিদে প্রবেশ করে। কিন্তু রাজকীয় সৈন্যবাহিনী তাহাদিগকে বিতাড়িত করে।

প্রাথমিক গোলযোগ

শীঘ্রই রাণীর ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়। জালালুদ্দিন ইয়াকুত নামক একজন আবিসিনীয় ক্রীতদাসের প্রতি তিনি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তুর্কিগণ ইহা কিছুতেই সহ্য করিতে না পারিয়া সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকায়। গোঁড়া আলেমদের অসন্তোষ—যাহারা বেপর্দা অবস্থায় সুলতানা রাজিয়ার দরবারে ও সব জায়গায় বিচরণ পছন্দ করিতেন না—এই অসন্তোষের বহ্নিতে ঘৃত প্রয়োগ করে।

সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

সরহিন্দের শাসনকর্তা ইখতিয়ার উদ্দিন আলতুনিয়া প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সুলতানা নিজেই এই বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বন্দি হন। তাঁহাকে আলতুনিয়ার হেফাজতে রাখা হয়। দিল্লীর অভিজাতবর্গ তাঁহার ভাই মুঈজুদ্দিন বাহরামকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। নিষ্ফলভাবে রাজিয়া আলতুনিয়াকে বিবাহ করিয়া এই গণ্ডগোলের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার স্বামী আলতুনিয়াকে লইয়া তিনি দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে আলতুনিয়ার অনুগামীরা তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। পরে ১২৪০ সালে তিনি মুঈজুদ্দিন বাহরাম কর্তৃক পরাজিত হন। সুলতানা রাজিয়া ও তাঁহার স্বামী আলতুনিয়াকে বন্দি করা হয় এবং পরদিন হত্যা করা হয়।

বিদ্রোহ মৃত্যু

বাহ্‌রাম শাহ্‌ ও মাসুদ শাহ্‌ (১২৪০-১২৪৬ খ্রিঃ)

সুলতানা রাজিয়ার মৃত্যুর পর রাজ্যে কিছুদিন বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ চলিতে থাকে।

বাহ্‌রাম শাহ

রাজিয়ার ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী বাহ্‌রাম শাহ্‌ একজন অযোগ্য লোক ছিলেন। তাঁহার শাসনকাল হত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা ও চক্রান্তে পরিপূর্ণ থাকে। তাঁহার অনুসৃত কতিপয় সুদৃঢ় ব্যবস্থা তাঁহার প্রতি অসন্তোষ আরও বাড়াইয়া তোলে।

১২৪১ সালে মোঙ্গল বাহিনী ভারতে অভিযান চালাইয়া লাহোর দখল করে। শীঘ্রই সুলতান গুপ্তঘাতক কর্তৃক নিহত হন এবং ইলতুৎমিশের দৌহিত্র মাসুদ শাহ্‌ তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। ১২৪৫ সালে মোঙ্গলগণ পুনরায় আগমন করিলে তাহাদিগকে বিপুল ক্ষতি সাধন করিয়া পরাজিত করা হয়। পরবর্তিকালে মাসুদ শাহ্‌ আরামপ্রিয় হইয়া যান। তাই আমিরগণ ইলতুৎমিশের আরেক পুত্র নাসিরউদ্দিনকে শাসনভার গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। ১২৪৬ সালে মাসুদ শাহ্‌ কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন।

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ (১২৪৬-১২৬৬ খ্রিঃ)

সুলতান নাসিরুদ্দিন বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজ্যের তৎকালীন অবস্থার জন্য যে ক্ষমতার

প্রধানমন্ত্রী বলবন

প্রয়োজন, তিনি সে তুলনায় অনেক নিচু পর্যায়ের ছিলেন। সুলতানের শ্বশুর ও রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী গিয়াসুদ্দিন বলবনই ছিলেন সিংহাসনের মূল শক্তি। বলবনের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়, তজ্জন্য তিনি নিজেকে উহার জন্য উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণ করেন।

১২৪৫ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গু খানের নেতৃত্বে মোঙ্গল বাহিনী পুনরায় আক্রমণ করিলে বলবন তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করেন। ১২৪৬

মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে

সালে বলবন রাভি নদী অতিক্রম করেন এবং জুদ ও ঝিলাম পাহাড়গুলি বিধ্বস্ত করেন। বিদ্রোহী হিন্দু রাজা ও জমিদারদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য তিনি বারবার দোয়াব ও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করেন।

বিভিন্ন অভিযানে বলবন রাজধানীর বাহিরে থাকাকালে তাঁহার প্রভাবে ঈর্ষান্বিত ইমাদুদ্দিন রিহান নামক একজন আমির তুর্কি মালিকদিগকে উত্তেজিত করিয়া তোলেন এবং

বলবনের বরখাস্ত ও পুনর্নিয়োগ

সুলতানকে বলবনের বিরুদ্ধে সন্দেহপরায়ণ করিয়া তুলিতে সক্ষম হন। সঙ্গে সঙ্গে সুলতান বলবনকে বরখাস্ত করেন। কিন্তু শীঘ্রই মালিকগণ নিজেদের ভুল অনুধাবন করেন এবং বলবনকে পুনরায় তাঁহার পূর্বপদে বহাল করেন।

পুত্র-সন্তানহীন সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ১২৬৬ সালে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি গিয়াসুদ্দিন বলবনকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। সুলতান নাসিরুদ্দিন একজন অমায়িক ধার্মিক স্বভাবের লোক ছিলেন। রাজকীয় আমোদ-প্রমোদ হইতে নিজেকে

নাসিরুদ্দিনের মৃত্যু একজন ধার্মিক সুলতান

বিমুখ করিয়া তিনি একজন দরবেশের ন্যায় জীবন যাপন করেন এবং কোরআন শরীফ নকল করিয়া তাঁহার জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি বিদ্বানদের একজন পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। মিন্‌হাযুস সিরাজ, যিনি তাঁহার অধীনে একটি উচ্চপদে বহাল ছিলেন এবং অনেক মূল্যবান উপহার লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রসিদ্ধ 'তাবাকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থটি তাঁহার রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকের নামে উৎসর্গ করেন। নাসিরুদ্দিনের সাথে সাথে ইলতুৎমিশের বংশও শেষ হয়।

সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন
(১২৬৬-১২৮৭ খ্রিঃ)

প্রাথমিক জীবন ঃ গিয়াসুদ্দিন বলবন তুর্কিস্তানের বিখ্যাত ইলবারি গোত্রের একজন বংশধর ছিলেন। যৌবনকালে মোঙ্গলরা বন্দি হিসাবে তাঁহাকে বাগদাদে লইয়া যায়। খাজা জামালুদ্দিন বুসরা নামে একজন ধার্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহাকে তথায় খরিদ করেন। খাজা তাঁহাকে দিল্লীতে আনয়ন করেন এবং সুলতান ইলতুৎমিশের নিকট বিক্রয় করেন। এইভাবে অন্যান্য তুর্কি ক্রীতদাস দলের সহিত বলবনও 'প্রসিদ্ধ চল্লিশজন" (চেহেলগাম) এর অন্তর্ভুক্ত হন। প্রথমে তাঁহাকে ইলতুৎমিশের নিজস্ব অনুচর হিসাবে নিয়োগ করা হয় এবং পরে তাঁহার যোগ্যতার দ্বারা তাঁহাকে উচ্চপদে বহাল করা হয়। অতঃপর তিনি নাসিরুদ্দিনের প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ করেন। ১২৪৯ খ্রিস্টাব্দে বলবনের একটি কন্যা নাসিরুদ্দিনের নিকট বিবাহ দেওয়া হয়। সুলতান নাসিরুদ্দিনের অধীনে তিনি বিশ বৎসর মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন। নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর বলবন সুলতান হন।

সিংহাসনে আরোহণের পর বলবন সুখে-শান্তিতে থাকিতে পারেন নাই। সুলতান ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পরবর্তী ত্রিশ বৎসরে তাঁহার উত্তরাধিকারীদের অযোগ্যতার দরুন রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যাবলি বিশৃঙ্খলায় পতিত হয়। কোষাগার শূন্য হইয়া পড়ে এবং দিল্লী সালতানাত-এর মর্যাদা অনেক নিচে নামিয়া যায়। অপরপক্ষে তুর্কি আমিরদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ঔদ্ধত্য অনেক বাড়িয়া যায়। সংক্ষেপে ঐতিহাসিক বারানীর মন্তব্য অনুসারে ঃ "শাসন-শক্তির ভয়, যাহা সব উত্তম সরকারেরই মূলবস্তু এবং সব রাষ্ট্রের গৌরব ও শোভার উৎপত্তিস্থল, তাহা সব মানুষের অন্তর হইতে চলিয়া গিয়াছিল এবং দেশ একটি জঘন্য অবস্থায় পতিত হইয়াছিল।" অভ্যন্তরীণ দৈন্যতা ও বিশৃঙ্খলার সাথে যুক্ত হইয়াছিল সময় সময় প্রত্যাগমনশীল মোঙ্গল আক্রমণের ভীতি। তাই সেই সময় একজন কঠোর স্বেচ্ছাচারী শাসকের প্রয়োজন ছিল এবং গিয়াসুদ্দিন বলবনের মধ্যে সেই গুণ পাওয়া যায়। ইহা ছিল একটি হাঙ্গামা ও দুশ্চিন্তার সময় এবং শুধু বলবনের মত একজন লৌহমানবই এইসব বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী লোকদিগকে কঠোরভাবে দমন করিতে পারিতেন।

প্রাথমিক গোলযোগ
অভ্যন্তরীণ গোলযোগ

সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন সঠিকভাবে অনুধাবন করেন শাসনকার্যের স্থিতিশীলতা এবং দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করিবার জন্য একটি বৃহৎ শক্তিশালী ও কর্মক্ষম সৈন্য বাহিনীর একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং তিনি একটি শক্ত ও কর্মক্ষম সৈন্য বাহিনী গঠন করেন। পুরাতন ও নূতন সমস্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীকে অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত সেনাপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়। এই বাহিনীর সহায়তায় তিনি দোয়াব ভূমিতে ও দিল্লীর আশেপাশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। রাজপুত ও মেওয়াতিদের হাঙ্গামা দিল্লীর সিংহাসনের পক্ষে মারাত্মক হুমকি হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারা রাজধানীর আশে-পাশে লুটতরাজ চালায় এবং জনসাধারণকে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রণা প্রদান করে। জীবন, ধর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংকটাপন্ন হইয়া পড়ে।

তাঁহার সমস্যা সমাধানের পন্থা

দিল্লীর আশপাশ হইতে সুলতান মেওয়াতিদিগকে তাড়াইয়া দেন এবং অনেককে হত্যা করেন। দিল্লী নগরীর আশেপাশে অনেকগুলি ঘাঁটি নির্মাণ করিয়া ভবিষ্যতে কোন গোলমাল

যাহাতে না হয়, তজ্জন্য তিনি সাবধানতা অবলম্বন করেন। ঐসব ঘাঁটিকে তিনি দক্ষ আফগান সেনাধ্যক্ষদের দায়িত্বে ন্যস্ত করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গোপালগীরে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। পরের বৎসর ১২৬৭ খ্রিস্টাব্দে বলবন দোয়াব অঞ্চলের ডাকাতদিগকে শায়েস্তা করেন। কাম্পিল, পাতিয়ালি ও ভোজপুর ছিল ডাকাতদলের সুরক্ষিত স্থান। এইসব ডাকাতদল রাস্তায় ওৎ পাতিয়া থাকিত এবং পণ্যদ্রব্য একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাওয়া অসম্ভব করিয়া তুলিত। এইসব দস্যুকে শায়েস্তা করিবার জন্য সুলতান স্বয়ং অগ্রসর হন এবং তাহাদের সুরক্ষিত স্থানে অনেক দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি জালালী দুর্গটিকেও মেরামত করেন। একই বৎসর তিনি কাথেরের বিদ্রোহীদিগকে দমন করেন। কিছুদিন পর তিনি জুদ পর্বতে একটি অভিযান পরিচালনা করেন এবং সেইখানকার পাহাড়ি গোত্রগুলিকে শায়েস্তা করেন। এইভাবে বলবন দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনেন। ষাট বৎসর পর বারানী মন্তব্য করেন, "তখন হইতে রাস্তাগুলি দস্যুশূন্য হইয়াছে।"

আমিরদের ক্ষমতা খর্ব ঃ আমিরদের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য তিনি দোয়াবের জমিগুলির ভোগ দখল নিয়মিত করিতে সচেষ্ট হন। সুলতান ইলতুৎমিশের সময় হইতে সামরিক কার্য সম্পাদনের শর্তে ২০০০ শামছি অশ্বারোহী এইসব জমি উপভোগ করিত। ঐসব অশ্বারোহী বেতনের পরিবর্তে দোয়াবে কতকগুলি গ্রাম দখলে রাখিয়াছিল। ভোগদখলকারীদের অনেকেই তখন বৃদ্ধ ও স্থবির হইয়া পড়ে এবং তাহাদের অনেকেই ইতোমধ্যে মারা যায়। তাহাদের বংশধরগণ পিতার উত্তরাধিকার হিসাবে ঐসব জমি দখল করে। তাহাদের কেউ কেউ সুযোগ মত সামরিক কাজ করে এবং কেউ কেউ বিভিন্ন অজুহাতে বাড়িতেই পড়িয়া থাকে। সমস্ত ভোগদখলকারীদের অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য সুলতান অবিলম্বে একটি আদেশ জারি করেন। ফলে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। পুরাতন দানপত্রগুলি তিনি চালু রাখেন, কিন্তু দানগ্রহীতাদের বয়স অনুসারে তিনি তাহাদের জীবিকার জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এইসব বৃদ্ধ খানগণ দিল্লীর কোতওয়াল ফখরুদ্দিনের দ্বারস্থ হন এবং তাঁহাদের পক্ষে সুলতানের নিকট সুপারিশ করিতে অনুরোধ করে। কোতওয়াল অতি বাগ্মিতার সহিত এইসব বৃদ্ধ যোদ্ধাদের জন্য ওকালতি করেন। সুলতান তাহাদের সহানুভূতিতে ব্যথিত হন এবং জমিদারী বাজেয়াপ্ত পত্রটি নাকচ করেন।

মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ঃ সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের সবচাইতে বড় সংকট ছিল উত্তর পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণের মোকাবিলা করা। মোঙ্গলগণ লাহোর অধিকার করিয়া প্রত্যেক বৎসর সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে লুটতরাজ আরম্ভ করে। ১২৭১ সালে সুলতান লাহোরের দিকে অগ্রসর হন এবং মোঙ্গলগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত দুর্গটিকে মেরামত করিবার নির্দেশ প্রদান করেন। অনেকদিন যাবৎ সুলতানের চাচাত ভাই, রাষ্ট্রের একজন যোগ্য সেবক শেরখান শুংকার দক্ষতার সাথে সীমান্ত রক্ষা করেন এবং মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন। ভাতিন্দা, ভাতনাইর, সামানা ও সুনাম এর জায়গীর তাঁহার হাতে থাকে। শেরখান অনেক উদ্ধত গোত্রকেও আয়ত্তাধীনে আনয়ন করেন। কিন্তু আনুমানিক সেই সময় তিনি মারা যান, এবং তাঁহার মৃত্যুতে মোঙ্গলগণ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিকে ধ্বংস করিতে উৎসাহ লাভ করে। অতএব, মোঙ্গলদের আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সুলতান তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ মুহাম্মদকে মুলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, এবং

মোঙ্গল আক্রমণ

তৎসঙ্গে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র যুবরাজ বোঘরাও খানকে সামানা ও সুনামের ভার অর্পণ করেন। তদুপরি মোঙ্গলদের আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য তাঁহার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার উপদেশ দান করেন। অন্যূন ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গলগণ পুনরায় আক্রমণ আরম্ভ করে এবং সুতলেজ নদী অতিক্রম করে। কিন্তু যুবরাজ মুহাম্মদ, বোঘরাও খান ও মালিক মুবারক বেকতার এবং সম্মিলিত বাহিনীর দ্বারা তাহারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। এইভাবে সাময়িকভাবে মোঙ্গল ভীতি দূর করা হয়।

বাংলায় বিদ্রোহ ঃ একই বৎসর ঐশ্বর্যশালী প্রদেশ বাংলার দিক হইতে আরেকটি বিপদ সুলতানকে বিচলিত করে। রাজধানী দিল্লী হইতে এই প্রদেশের দূরত্ব প্রায়শই ইহার শাসনকর্তাদিগকে দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করিতে প্রলোভন দেয়। সুলতানের নিযুক্ত বাংলার শাসনকর্তা তুঘ্রিল খান একজন কর্মঠ, সাহসী ও উদার প্রকৃতির তুর্কি ছিলেন। তিনি একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসনকর্তাও ছিলেন। তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাঁহাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেয়। বলবনের বৃদ্ধ বয়স এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গলদের আক্রমণের সুযোগ গ্রহণ করিয়া কিছু সংখ্যক পরামর্শদাতার উস্কানিতে তিনি বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। তুঘ্রিলের বিদ্রোহ সুলতানকে ভীষণভাবে বিচলিত করে।

তুঘ্রিল খান

আলপ্তগীন ওরফে আমির খানের নেতৃত্বে বলবন একটি বৃহদাকারের সৈন্যবাহিনী বাংলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু বিদ্রোহী শাসনকর্তার হাতে আমির খান পরাজিত হন, এবং তাঁহার অনেক সৈন্য তুঘ্রিল খানের সঙ্গে যোগ দেয়। আমির খানের পরাজয়ে সুলতান এতই ক্রুদ্ধ হন যে, তিনি দিল্লীর তোরণে তাঁহাকে ফাঁসি দিতে হুকুম করেন। পরবর্তী বৎসর মালিক তরঘীর নেতৃত্বে তিনি বাংলায় আরেকটি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু তুঘ্রিল খান এই অভিযানও প্রতিহত করেন। এই পরাজয়ে তিনি খুবই বিরক্ত হন এবং একটি শক্তিশালী বাহিনী লইয়া পশ্চিম বাংলার রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে তিনি স্বয়ং একটি অভিযান পরিচালনা করেন। তাঁহার পুত্র বোঘরাও খানকেও তিনি সঙ্গে নেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ সুলতানের আগমনের খবর পাইয়া তুঘ্রিল লক্ষ্মণাবতী ত্যাগ করেন এবং যাযনগরের জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিদ্রোহীর পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে সুলতান পূর্ববাংলায় অগ্রসর হন। শের আন্দাজ নামে সুলতানের একজন সৈনিক তুঘ্রিলকে বাহির করেন। একটি তীরের আঘাতে তুঘ্রিলকে হত্যা করিয়া তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং তাঁহার দেহ নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও অধিকাংশ সৈন্যদিগকে গ্রেফতার করা হয়। লক্ষ্মণাবতীতে ফিরিয়া আসিয়া সুলতান তুঘ্রিলের আত্মীয়-স্বজন ও সমর্থকদিগকে ভীষণ শাস্তি প্রদান করেন। বাংলা ত্যাগের পূর্বে তিনি তাঁহার পুত্র বোঘরাও খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং শাসনকার্যের ব্যাপারে সাবধান হইবার উপদেশ প্রদান করেন।

তুঘ্রিল খানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

গিয়াসুদ্দিন বলবনের শেষ জীবন ঃ বাংলার বিদ্রোহ কার্যকরভাবে দমন করা হয়, কিন্তু শীঘ্রই সুলতান একটি পারিবারিক অশান্তিতে নিপতিত হন। ১২৮৫ সালে মোঙ্গলগণ তাহাদের অধিনায়ক তামার বা সামার-এর নেতৃত্বে পুনরায় পাঞ্জাব আক্রমণ করে। এই আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য বলবনের পুত্র যুবরাজ মুহাম্মদ লাহোর ও দিপালপুরের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যুদ্ধে যুবরাজ পরাজিত ও নিহন হন।

মৃত্যু

তাঁহার আত্মদান তাঁহাকে শহীদ যুবরাজ বা খান-ই-শহীদ উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ পুত্রের অকাল মৃত্যু অশীতিপর বৃদ্ধকে ভীষণ আঘাত দেয়। ইহা তাঁহাকে শোকের সমুদ্রে নিমজ্জিত করে ও তাঁহার মৃত্যু তরান্বিত করে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুত্র বোঘরাও খানকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিতে চান। কিন্তু যুবরাজ রাজত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। অতএব তাঁহার দৌহিত্র কায় খসরুকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া ১২৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

গিয়াসুদ্দিন বলবন কেন রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন নাই ঃ "হিন্দুস্তানের সুলতান হিসাবে বলবনের জীবন ছিল অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বহির্গত বিপদের বিরুদ্ধে একটি সুদীর্ঘ সংগ্রাম।"[১৯] অতএব নূতন কোন দেশ জয় বা সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিবার কোন সুযোগ বা সময় তিনি পান নাই। তাঁহার পরিবারবর্গ নূতন দেশ জয় করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করেন। তিনি নিজেকে রাজ্যের শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করা ও প্রতিরক্ষা কাজে সন্তুষ্ট রাখেন। বলবন সাম্রাজ্যে সম্পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করেন, সুদৃঢ় ভিত্তিতে ইহাকে গঠন করেন এবং মোঙ্গলদের ভয়াবহ আক্রমণ হইতে ইহাকে রক্ষা করেন। জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া প্রশাসনিক কোন সংগঠনে তিনি আত্মনিয়োগ করেন নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে, তিনি এমন একটি স্বেচ্ছাচারী সরকার গঠন করেন, যাহার স্থায়িত্ব ইহার শাসকের নিজস্ব শক্তির উপর নির্ভর করে। ফলে বলবন রাজধানী ছাড়িয়া বাহিরে বেশিদিন কাটাইতে পারেন নাই। তাই সাম্রাজ্যের সীমা যদিও বৃদ্ধিলাভ করে নাই, কিন্তু অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার ব্যাপারে তিনি কৃতকার্য হন।

সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের কৃতিত্ব ঃ গিয়াসুদ্দিন বলবন নিঃসন্দেহে একজন ক্ষমতাবান সুলতান ছিলেন। "চল্লিশ বৎসরে বিস্তৃত, কঠোর কার্যাবলিতে পরিপূর্ণ বলবনের জীবন ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাসে অতুলনীয়।"[২০] তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের সময় দিল্লী সালতানাত অনেক বিপদাপদে জড়িত ছিল। সুতরাং সুলতান যাহাদিগকে রাষ্ট্রের শত্রু মনে করেন, তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ও ভয়াবহ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত মোঙ্গলদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার যোগ্যতার পরিচয় দান করেন। রাজ্য বিস্তার হইতে নিজেকে বিরত রাখিয়া তিনি তাঁহার কঠোর বাস্তববাদের পরিচয় দেন। শাসনযন্ত্রকে দৃঢ় করাটাই ছিল তখনকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, তাই বলবন বুদ্ধিমানের মত নিজেকে শাসনযন্ত্র দৃঢ়করণের কাজে নিয়োগ করেন।

দিল্লী সালতানাতের মর্যাদা ও মহিমাকে বলবন বিশেষভাবে সমুন্নত করেন। পুরাতন পারস্য সম্রাটদের রীতি অনুযায়ী তিনি তাঁহার দরবার সজ্জিত করেন এবং পারস্য শিষ্টাচার ও

রাজার মর্যাদা উন্নীতকরণ

আচার-অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেন। সুলতানের মর্যাদাকে উন্নত ও পারিষদদের মর্যাদাকে খাটো করিয়া তিনি ভারতের তুর্কি রাষ্ট্রে নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করেন। তাঁহার সময় দিল্লীর দরবার ইহার জাঁকজমকের জন্য বেশ খ্যাতি অর্জন করে।

গিয়াসুদ্দিন বলবন একটি জমকালো দরবার চালু রাখেন, যেখানে তিনি সাধারণ উপলক্ষেও খুবই জাঁকজমকের সহিত নিজেকে উপস্থাপন করেন। তিনি সর্বদা প্রাচ্যের একজন সম্ভ্রান্ত নৃপতির মত আচরণ করেন, এবং তাঁহার রাজকীয় সম্মানজ্ঞান এত প্রখর ছিল যে তিনি সম্পূর্ণ পোশাক ব্যতীত এমনকি তাঁহার নিজস্ব ভৃত্যদের সম্মুখেও বাহির হইতেন

না। বলবনকে কখনও প্রকাশ্য দরবারে জোরে হাসিতে বা ঠাট্টা করিতে দেখা যায় নাই।[২১]

তাঁহার জমকালো দরবারে কঠোর নিয়মবোধ

কাহাকেও তিনি তাঁহার সামনে জোরে হাসিতে বা আমোদ-প্রমোদ করিতে দিতেন না। নীচ স্বভাবের ও ইতর লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করাটাকে সুলতান সব সময় ঘৃণার চোখে দেখেন। কোন কিছুই তাঁহাকে কখনও বন্ধু বা অচেনা লোকদের সাথে অপ্রয়োজনীয় মেলামেশায় আনিতে পারে নাই।[২২]

নীচ বংশকে বলবন সর্বদা রাজকার্যের জন্য সবচাইতে বড় অযোগ্যতা বলিয়া মনে করেন। আমিরগণও কখনও কোন নীচ বংশের লোককে সরকারি চাকুরির জন্য সুলতানের নিকট সুপারিশ করেন নাই। উঁচু বংশের মর্যাদার ব্যাপারে তিনি এতই সূক্ষ্ম ছিলেন যে, একবার কিছু সংখ্যক ধনী ব্যক্তি তাঁহাকে কয়েক লক্ষ মুদ্রা উপহার দেন। কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন শুধু এই অজুহাতে যে, তাহারা উঁচু জাতের লোক ছিলেন না।

উচ্চবংশের মর্যাদা দান এবং নীচ বংশের প্রতি ঘৃণা

একজন খাঁটি সুন্নি মুসলমানের ন্যায় তিনি সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন। যৌবনকালে তিনি মদ্যপানের খুব ভক্ত ছিলেন, কিন্তু সুলতান হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহা ছাড়িয়া দেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন দয়ালু লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার সন্তানাদি ও আত্মীয়-স্বজনদিগকে ভালবাসিতেন।[২৩]

ব্যক্তিগত জীবন

সুলতান মনে করেন, সুলতান পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্র প্রতিনিধি।[২৪] সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বিশ্বাস করেন যে, কতকগুলি কাজ সরল অন্তরে সম্পাদন করিয়া ইহার মর্যাদা বজায় রাখা সুলতানের কর্তব্য। কাজগুলি হইল ঃ ধর্ম রক্ষা করা এবং শরিয়তের বিধি-বিধানসমূহ পালন করা; দুর্নীতি ও পাপাচার রোধ করা; ধার্মিক লোকদিগকে রাজকার্যে নিয়োগ করা এবং সমানভাবে ন্যায়বিচার করা। সুলতান গিয়াসুদ্দিনের সূক্ষ্ম বিচারজ্ঞান ছিল, যাহা তিনি পক্ষপাতহীনভাবে প্রয়োগ করেন। নিজেকে সমস্ত খবরাখবর সম্পর্কে অবহিত রাখিবার জন্য তিনি সমগ্র দেশকে একটি গুপ্তচর ব্যবস্থা দ্বারা বেষ্টন করেন।

রাজা সম্পর্কে তাঁহার ধারণা

জ্ঞানী ও ধার্মিক মুসলমানদের সঙ্গে বলবনের আন্তরিক যোগাযোগ ছিল। তিনি সর্বদা তাঁহাদের সঙ্গে আহার করিতেন এবং আইন ও ধর্মীয় ব্যাপারে আলোচনা করিতেন। বলবনের জমকালো দরবার পনের জন নৃপতি ও যুবরাজের উপস্থিতিতে সন্মানিত হয়।[২৫] এইসব নৃপতি ও যুবরাজ মোঙ্গল ধ্বংসলীলার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য দিল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্য কোন মুসলিম দরবারই তাঁহাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। অনেক উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকও এইসব বাস্তুত্যাগীদের দলে ছিলেন। তাহাদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কবি আমির খসরু, যিনি ভারতের তোতা নামে সমধিক পরিচিত।[২৬]

বিদ্বান লোকের পৃষ্ঠপোষকতা

বলবনের দরবারে আগত বাস্তুত্যাগী পনের জন নৃপতিকে তিনি দিল্লীতে পনেরটি মহল্লায় আবাসনের ব্যবস্থা করেন। ফলে দিল্লীতে পনেরটি পৃথক মহল্লা গড়িয়া উঠে। এইগুলি হইল ঃ 'আব্বাসী' 'সঞ্জরী', 'খাওয়রিজিম শাহী', 'দায়লামী', 'আলিভি', 'আতাবাকী', ঘোরী, চিঙ্গিজী, রুমী, সুনকারী, ইয়ামেনী, মৌসুলনী, সমরকন্দী, কাসগড়ী এবং খিতাই।[২৭]

বাস্তুত্যাগী নৃপতি

বলবন একজন কঠোর শাসক ছিলেন। তাঁহার নীতি ছিল নির্দয় ত্রাসের দ্বারা রাজ্য শাসন করা। তাঁহার এই নীতি বেশ ফলদায়ক হয়। তাঁহার নিষ্ঠুরতা আমাদের কাছে জঘন্য ও বিরক্তিকর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তখনকার দুর্যোগকালে ইহাকে জঘন্য বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। অধিকন্তু, তাঁহার নীতি ছিল যুক্তিপূর্ণ। তাঁহার পদে পদে উচ্চাকাঙ্ক্ষী তুর্কি প্রধানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দিল্লীর তোরণের সন্নিকটে লুণ্ঠনকারীদের দস্যুবৃত্তি এবং সর্বোপরি সীমান্ত ঘাঁটিগুলির দরজায় মোঙ্গলদের প্রতিনিয়ত আঘাত হানা বলবনের কঠোর ও অতন্দ্র প্রহরার পিছনে প্রবল যুক্তি যোগায়।[২৮]

শাসক হিসাবে

একজন কঠোর ও ন্যায়পরায়ণ শাসক, বিচারকার্যে নিরপেক্ষ, দরবারের মর্যাদা রক্ষক, ধার্মিক ও বিদ্বানদের পৃষ্ঠপোষক এবং বহিঃশত্রুর মোকাবিলায় একজন অতন্দ প্রহরী সুলতান হিসাবে গিয়াসুদ্দিন বলবন ভারতবাসীর নিকট একটি উদাহরণ হিসাবে চিরদিন জাগরূক থাকিবেনা।

কায়কোবাদ
(১২৮৭-১২৮৯ খ্রিঃ)

সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রের প্রধান অভিজাতগণ বোঘরাও খানের পুত্র মুইজুদ্দিন কায়কোবাদকে সিংহাসনে বসান। ইহা ছিল মৃত সুলতানের মনোনয়নের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি পিতামহের কঠোর শৃঙ্ক্ষলার মধ্যে লালিত-পালিত হন এবং তাঁহাকে পদে পদে গৃহশিক্ষকগণ পর্যবেক্ষণ করেন।[২৯] অকস্মাৎ সিংহাসনে আরোহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সব সংযম ও বুদ্ধি হারাইয়া ফেলেন। নিজেকে তিনি আমোদ-প্রমোদে মত্ত রাখেন এবং রাজকার্যের দায়িত্ব ভুলিয়া যান। ফলে নিযামুদ্দিন সমস্ত ক্ষমতা নিজ হাতে তুলিয়া লন। সমগ্র রাজ্যে বিশৃঙ্ক্ষলা ও গোলযোগ বিরাজ করিতে থাকে।

রাজ্যে গোলযোগ

খিলজী বিপ্লব ঃ কায়কোবাদ-এর শাসনকালে অভিজাতদের তুর্কিদল ও খিলজী দলের মধ্যে শাসনকার্যের প্রাধান্য লইয়া তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। খিলজীগণ মালিক জালালুদ্দিন ফিরূযের নেতৃত্বে দরবারে প্রাধান্য বিস্তার করে এবং তুর্কি দলের নেতৃস্থানীয় মালিকদিগকে হত্যা করে। কায়কোবাদ তাঁহার কিলোখরী প্রাসাদে একজন খিলজী আমির কর্তৃক নিহত হন। তাঁহার মৃতদেহ যমুনা নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে ফিরূয জালালুদ্দিন ফিরূয শাহ্ উপাধি লইয়া কিলোখরী প্রাসাদে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কায়কোবাদের শিশুপুত্রকে জালালুদ্দিন হত্যা করেন। এইভাবে গিয়াসুদ্দিনের বংশ অপমানের মধ্য দিয়া শেষ হয়।

ভারতে মুসলমানদের সফলতার কারণ ঃ মুসলমানদের ভারত বিজয় এবং একটি সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠা করা ইতিহাসের একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা। মুসলমানগণ এই দেশে মুসলমান হিসাবেই তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে, এবং তাহাদের পূর্বসূরি অন্যান্য বিদেশী বসতি স্থাপনকারীদের মত এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মধ্যে বিলীন হইয়া যায় নাই। ইসলাম ধর্মের বলিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা এবং সাম্যই ইহার প্রধান কারণ। ইসলামের সামাজিক জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন একটি সুষ্ঠু ন্যায়-নীতির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। মানবজীবনের এমন কোন দিক নাই, যে

ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য হিন্দু রাজাদের অনৈক্য

ব্যাপারে ইসলাম আলোকপাত করে নাই। ফলে নবাগতরা এই ধর্ম অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে ও গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। তাই বিজিত দেশে হু হু করিয়া নবদীক্ষিতদের সংখ্যা বাড়িতে দেখা যায়। আজ যে ইহার শত্রু, কালই সে ইহার পূজারী হইয়া দাঁড়ায়। ইহার পাশাপাশি দেখা যায়, হিন্দু সমাজ নিজেদের হিংসা-বিদ্বেষের ফলে উহার মূল শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণ সর্বদাই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকেন, যাহা শেষ পর্যন্ত হিন্দু শাসনব্যবস্থার ভিত্তি দুর্বল করিয়া ফেলে।

হিন্দু সমাজ ইহার সামরিক শক্তি হারাইয়া ফেলে। মুসলমানগণ আফগান পর্বতের অপর পাড়ের হিম অঞ্চল হইতে আগমন করে এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে ও অভিযানে যথেষ্ট শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দেয়।[৩০] উত্তম সংগঠন, শৃঙ্খলা ও সংহতি ছিল তাহাদের বৈশিষ্ট্য। হিন্দুদের সামরিক নীতি ছিল মান্ধাতার আমলের। দুর্ধর্ষ, সুশিক্ষিত ও অশ্বারোহী সেনাধ্যক্ষদের সামনে হিন্দুদের মন্থরগতিসম্পন্ন হস্তীবাহিনীর উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়াটা মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। এই ক্ষেত্রে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অর্জনের পরও তাহারা পুরাতন সামরিক নীতি আঁকড়াইয়া থাকে।[৩১] মুসলমানরা আফগান পর্বতের অপর পাড় হইতে নূতন নূতন সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রে আনিতে সক্ষম হয়, অথচ হিন্দুদিগকে হাল আমলের ছোট ছোট বিভাগ ও প্রদেশের ন্যায় বিক্ষিপ্ত রাজ্যসমূহের উপর নির্ভর করিতে হয়। অধিকন্তু, হিন্দু সমাজব্যবস্থা সামরিক কার্যকলাপকে বিশেষ শ্রেণীর উপর সীমাবদ্ধ রাখে। ফলে জনসাধারণের বেশিরভাগ লোক হয়ত সামরিক কাজের জন্য অযোগ্য বা রাজনৈতিক বিপ্লবের ব্যাপারে লিপ্ত থাকে।

হিন্দু সামরিক শক্তির অভাব

ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, "ইসলাম একটি মহান ভ্রাতৃত্ব, যাহার মধ্যে উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র সবাই সমান এবং মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নাই।"[৩২] ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মুসলমানগণ শত্রুর বিরুদ্ধে একটি শক্ত সৈন্যসারিতে দাঁড়াইতে পারে। মুসলমানগণ তাহাদের ধর্মের জন্য হাসিমুখে জীবন বিপন্ন করিতে পারে, এবং কঠিন আত্মদান ইতোপূর্বে তাহারা করিয়াছেও। মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুগণ ছিল দুর্বল ও বিভক্ত এবং শুধু গোত্র বা বর্ণনীতিই তাহারা তুলিয়া ধরে। বর্ণনীতি তাহাদের মধ্যে কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগের সৃষ্টি করে এবং ইহা কোন সামগ্রিক প্রয়োজনে একতাবদ্ধ হইবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এই দুই জাতির মধ্যে যুদ্ধ ছিল দুইটি ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার—একটি পুরাতন ও ক্ষয়িষ্ণু এবং অপরটি যৌবনের পূর্ণ শৌর্য-বীর্য ও আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ।

ইসলামের প্রাধান্য হিন্দু বর্ণনীতি

মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ক্রীতদাস প্রথাও বিরাট শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করে। কখনও কখনও ইহা ইলতুৎমিশ ও বলবনের মত যোগ্য ব্যক্তিত্বও তৈয়ার করে। প্রাচ্যদেশে একজন মহান রাজা বা সেনাপতির ক্রীতদাস হওয়াকে একটি বিশেষ সুবিধা বলিয়া মনে করা হয় এবং প্রায়ই নীচজাতের লোকদিগকে খাঁটি অভিজাত বংশের লোকদের সমকক্ষ এমনকি ইহার চেয়েও শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। দাস প্রথার যোগ্যতা সম্পর্কে স্যার স্টেনলি লেনপুলের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "একজন মহামহিম রাজার পুত্র যেখানে অকৃতকার্য হইতে পারে, একজন সত্যিকার নেতার দাস প্রায়ই সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রভুর সমকক্ষ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।"

মুসলমানদের ক্রীতদাস প্রথা

প্রাথমিক তুর্কি শাসনের পর্যালোচনা ঃ

১২০৬ হইতে ১২৯০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৮৪ বৎসর প্রাথমিক তুর্কি সাম্রাজ্যের শাসনকাল স্থায়ী হয়। এই যুগের দশজন সুলতানের মধ্যে তিনজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা হইলেন— কুতুব উদ্দিন আইবেক, যিনি দিল্লী সালতানাতের বহিঃরেখা অঙ্কন করেন। শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ, যিনি উত্তর ভারতে মুসলিম শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন, এবং গিয়াসুদ্দিন বলবন, যিনি সেই সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক গোলযোগ হইতে রক্ষা করেন। অন্যান্য সুলতানদের মধ্যে সুলতানা রাজিয়া ও নাসিরুদ্দিন মাহমুদের নাম উল্লেখ করা যায়। অবশিষ্ট সমস্ত সুলতানই ছিলেন অযোগ্য।

প্রাথমিক তুর্কি সাম্রাজ্যের সুলতানগণই উত্তর ভারতের মুসলিম শাসনের ভিত্তি দৃঢ় করেন এবং ইহাই তাহাদের শ্রেষ্ঠ অবদান। পাঞ্জাব, আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্ত প্রদেশসমূহ, তৎসঙ্গে বিহার, গোয়ালিয়র, সিন্ধু এবং রাজপুতানা ও মধ্য ভারতের অন্যান্য অংশগুলিতে সুলতানগণ দৃঢ়ভাবে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তার করেন। চেঙ্গিস খানের যুগ হইতে পাঞ্জাবের উপর আধিপত্য লইয়া সুলতান ও মোঙ্গলীয়দের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। শেষ পর্যন্ত সুলতানগণ সফলতা অর্জন করেন। বাংলার শাসনকর্তাগণ প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন ছিলেন, যদিও বলবনের কঠোরতার ফলে বাংলার শাসনকর্তাগণ দিল্লীর আধিপত্য স্বীকার করিতে ও কর আদায় করিতে বাধ্য হন। তাহাদের আরেকটি অবদান হইল মোঙ্গলদের হাত হইতে ভারতকে রক্ষা করা। ইহার ফলে মোঙ্গল আক্রমণের ভয়াবহতা হইতে ভারতের অধিবাসিগণ নিস্তার লাভ করে।

সাম্রাজ্য সুদৃঢ়করণ মোঙ্গল আক্রমণের ভয়াবহতা হইতে ভারতকে রক্ষা করা

দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বের জায়গীরগুলি বস্তুত মুসলিম প্রভুত্বের মূলকেন্দ্র ছিল, কিন্তু অনেক স্বাধীন দেশীয় রাজা ও শত্রুভাবাপন্ন অধিবাসিগণও ছিলেন, যাহারা সর্বদা কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্য অস্বীকার করিতে চেষ্টা করেন। বলবনসহ কয়েকজন সুলতান ছিলেন দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী। ভারতের আদি বাসিন্দাদের ব্যাপারে তাহাদের নীতি ছিল উদার প্রকৃতির। আদি অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা বশ্যতা স্বীকার করে, তাহাদের অনেকেই সামরিক ও বেসামরিক অফিস-আদালতে স্থান লাভ করে। স্যার ওলস্‌লি হেগ মন্তব্য করেন, "মোটের উপর ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, দাস সুলতানদের শাসন ইংল্যান্ডের নরম্যান রাজাদের মত ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু এবং স্পেন ও নেদারল্যান্ডের দ্বিতীয় ফিলিপের চাইতেও অধিক সহিষ্ণু ছিল।[৩৩]

অমুসলিমদের প্রতি উদার নীতি

প্রাথমিক তুর্কি সুলতানগণ স্থাপত্যশিল্প এবং সাহিত্যেও সমদক্ষ ছিলেন। পুরাতন দিল্লীর 'কুতুব' শ্রেণীর ইমারতগুলিকে যথাযথভাবে সর্বোৎকৃষ্ট কার্য বলিয়া গণ্য করা হয়। বিখ্যাত কুতুবমিনারটি সুলতান কুতুবদ্দিন আইবেক আরম্ভ করেন এবং সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের হাতে ইহার নির্মাণ কাজ শেষ হয়। সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ও সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন সাহিত্যের খ্যাতনামা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বলবন সর্বদা সাহিত্যিকবর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতে পছন্দ করিতেন এবং তাহাদের সঙ্গে আহারও করিতেন।

পাদটীকা

১। প্রফেসর আজিজ আহমদ ঃ *Early Turkish Empire of Delhi.*

২। ঐ।

২। ঐ পৃঃ ১২৫.

৩। ঐ পৃঃ ১২৬।

৪। ঐ পৃঃ ১৪৭।

৫। ঐ, পৃঃ ১৪৮।

৬। ঐ।

৭। Brave and energetic, sagacious and just, according to Muslim ideas, Aibek was devoted to the faith, and as the founder of a large kingdom on foreign soil among races whose martial prowess was well known, he ranks among the great pioneers of Mulsim conquest in India. —Ishwari Prasad. প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৪।

৮। ঈশ্বরী প্রসাদ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪।

৯। আজিজ আহমদ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫০

১০। ঐ পৃঃ ১৬২।

১১। ঐ

১২। আজিজ আহমদ ঃ প্রাগুক্ত , পৃঃ ১৬৩।

১৩। ঐ পৃঃ ১৬৬।

১৪। He may justly be regarded as the greatest ruler of the Early Turkish Sultanate of Delhi. K. K. Datta : *An Advanced History of India.* পৃঃ ২৮৫

১৫। Aybak outlined the Delhi Sultanate and its sovereigns status; Ilttutmish was unquestionably its first king—A. B. M. Habibullah : *Foundation of Muslim Rule in India.*

১৬। Beyond recovering Muizuddin's conquests, he made appreciable advances into Rajputana and trans-Gangetic tracts and also towards reorganising the Indus valley frontier. —Habibullah প্রাগুক্ত।

১৭। হবিবুল্লাহ ঃ প্রাগুক্ত।

১৮। মিনহায-উস-সিরাজ ঃ তাবাকাত-ই-নাসিরী ঃ আজিজ আহমদ কর্তৃক প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃ ঃ ১৮১

১৯। Balban's career as a Sultan in Hindustan was one of long struggle against internal troubles and external dangers; - Kalikinkar Datta : *An Advanced History of India.* পৃঃ ৩৯৪।

২০। Balban's career, full of strenuous activety, extending over a period of forty years, is unique in the annals of medieval India. —Ishwari Prasad প্রাগুক্ত. পৃঃ-৭৮

২১। ঈশ্বরী প্রসাদ ঃ *A Short History of Muslim Rule in India* : পৃঃ ৭৯।

২২। আজিজ আহমদ ঃ *The Early Turkish Empire of Delhi.* পৃঃ ২৬৭

২৩। ঐ পৃঃ ২৬৪।

২৪। ঐ পৃঃ ২৬৪।

২৫। ঈশ্বরী প্রসাদ ঃ *A Short History of Muslim Rule in India* পৃঃ ৭৮

২৬। আজিজ আহমদ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৬।

২৭। ঐ পৃঃ ২৬৪।

২৮। "With the ambitious Turkish Chiefs trading on his heels, with marauders infestinyg the very gates of Delhi and above all with the Mongols ever hammering on the doors of the frontier posts, Bablan had good reasons to be stern and watchful."

২৯। আজিজ আহমদ ঃ প্রাগুক্ত, ৭ম অধ্যায়, পৃঃ ২৯৫।

৩০। ঈশ্বরী প্রসাদ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০, ৮১।

৩১। ঐ পৃঃ ৮১।

৩২। Islam is one great brotherhood in which high and low, rich and poor are all alike and no distinctions are made between man and man- ঈশ্বরী প্রসাদ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮১।

৩৩। On the whole it may be assumed that the rule of the Slave Kings was as just and human as that of the Norman Kings in England and far more tolerant than that of Philip II in Spain and the Netherlands.—Sir Wolseley Haig: *Cambridge History of India vol II*

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

A.B.M. Habibullah	:	*Foundation of Muslim Rule in India*
Ziauddin Barani	:	*Tarikh-i-Firuz Shahi*
Sir Wolseley Haig	:	*Cambridge History of India vol III*
S. Lane-Poole	:	*Medieval India*
Minhaj ud Din Shiraj	:	*Tabaqat-i-Nasiri (Translated by Raverty)*
Briggs	:	*Rise of Mohammedan Power in the East, vol I*
Ishwari Prasad	:	*Muslim Rule in India*
Majumdar		
Raychoudhury and Datta	:	*An Advanced History of India*
Tripathy	:	*Some Aspects of Muslim Administration*

ষষ্ঠ অধ্যায়
খিলজী বংশ
(১২৯০-১৩২০ খ্রিঃ)

খিলজীদের বংশ পরিচয় ঃ দিল্লীর লোকেরা খিলজীদিগকে আফগান জাতিভুক্ত মনে করিত। ঐতিহাসিক রেভার্টি প্রমাণ করিতে চান যে, তাহারা আফগানও ছিল না, পাঠানও ছিল না, বরং তাহারা ছিল তুর্কি।[১]

সমসাময়িক ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী ইহাদিগকে তুর্কি হইতে ভিন্ন মনে করেন এবং বলেন, কায়কোবাদের মৃত্যুর পর তুর্কিগণ সাম্রাজ্য হারায়। কিছু সংখ্যক আধুনিক লেখক মত প্রকাশ করেন যে, খিলজীগণ মূলত তুর্কি জাতিভুক্ত, কিন্তু আফগানিস্তানে অনেকদিন বসবাসের ফলে তুর্কি স্বভাব হারাইয়া তাহারা আফগান স্বভাব গ্রহণ করে। আধুনিক লেখকদের এই মত সত্য বলিয়া ধরা হয়। যাহা হউক, প্রাথমিক তুর্কি সাম্রাজ্য বা তথাকথিত দাস বংশের ধ্বংসস্তূপের উপর সমসাময়িক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে তাহারা নিজেদেরকে ক্ষমতাসীন করিবার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে।[২]

সুলতান জালালুদ্দিন ফিরূয শাহ (১২৯০-১২৯৬ খ্রিঃ) ঃ প্রাথমিক তুর্কি সাম্রাজ্যের শেষ সুলতানের মৃত্যুর পর প্রভাবশালী খিলজী অভিজাতদের সহায়তায় জালালুদ্দিন ফিরূজ ১২৯০ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু প্রথমে অভিজাতবর্গ ও দিল্লীর জনসাধারণ তাঁহাকে পছন্দ করেন নাই। তাই কিলোখরিকে তিনি রাজধানী ঘোষণা করেন। ক্রমশ তিনি তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করেন। বারানী বলেন, "তাঁহার চরিত্রের শ্রেষ্ঠতা, তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা, দয়া ও অনুরাগ ক্রমে জনগণের অসন্তোষ দূর করে এবং জায়গীরের আশা যদিও ঈর্ষাসহকারে ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার অভিজাতদের সম্প্রীতির আপস করিতে সহায়তা করে।" শেষ পর্যন্ত সৈন্যবাহিনী ও নাগরিকগণ কিলোখরিতে আয়োজিত এক সাধারণ দরবারে নূতন সুলতানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।[৩]

সিংহাসনে আরোহণের সময় জালালুদ্দিন ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ ছিলেন। 'পরকালের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত' এই অজুহাতে সুলতানের নীতি খুবই কোমল ছিল বলিয়া সমালোচনা করা হয় এবং বস্তুত তিনি তাঁহার দায়িত্বের তুলনায় খুবই বৃদ্ধ ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। রক্তপাত ছাড়াই তিনি শাসন করিতে চান। ফলে তিনি "বিদ্রোহী ও অপরাধীদের প্রতি অবিবেচনাসুলভ কোমলতা" প্রদর্শন করেন। তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয় সনে বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কারার যায়গীরদার মালিক চাজ্জু দিল্লী অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর সামনে তিনি পলায়ন করেন। তাঁহার কিছু সংখ্যক সৈন্যকে গ্রেফতার করিয়া

খুবই কোমল নীতি
মালিক চাজ্জুর বিদ্রোহ
আলাউদ্দিন খিলজী
কারার শাসনকর্তা

সুলতানের সম্মুখে পেশ করা হয়। কিন্তু সুলতান তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন।[৪] তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন খিলজীর হাতে অতঃপর কারার শাসনভার ন্যস্ত করা হয়।

সুলতানের শান্তিপ্রিয় ব্যবহারের ফলে দিল্লীর সিংহাসনের আধিপত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বন্ধ হইয়া যায়। ইহা তাঁহাকে খিলজী অভিজাতদের মধ্যেও অপ্রিয় করিয়া তোলে। এইসব অভিজাতবর্গ সর্বদা ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধার জন্য লালায়িত থাকেন। অনুষ্ঠানাদির মন্ত্রী মালিক আহমদ চ্যাপ সুলতানকে একবার সরাসরি বলেন, "রাজার উচিত রাজত্ব করা ও রাজকার্যের যাবতীয় আইন-কানুন মানিয়া চলা, অন্যথায় তাঁহার সিংহাসন ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।" কিন্তু শুধু একবার সিদি মাওলা বলে একজন দরবেশকে শুধুমাত্র রাজদ্রোহী সন্দেহে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিবার বেলায় তিনি তাঁহার স্বভাবজাত কোমলতা বিসর্জন দেন।[৫]

সুলতান জালালুদ্দিন ফিরূয দেশ বিজয়ের একটি শক্তিশালী নীতি গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন। এইজন্যই রনথাম্ভোর-এর বিরুদ্ধে জালালুদ্দিনের অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অনেক মুসলমানের প্রাণহানি হইবে এই অজুহাতে তিনি ইহা জয় না করিয়াই ফিরিয়া আসেন। কিন্তু ১২৯২ সালে তিনি সফলতার সহিত একটি শক্তিশালী মোঙ্গল আক্রমণের হাত হইতে তাঁহার রাজ্য রক্ষা করেন এবং আক্রমণকারীদিগকে লাহোর হইতে বাহির করিয়া দেন। আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে প্রায় ত্রিশ হাজার মোঙ্গল মুসলমান হইয়া যায়। ইহারা পরে 'নূতন মুসলমান' নামে পরিচিত হয়। দিল্লীর নিকটবর্তী শহরতলীতে ইহাদিগকে বসবাস করিতে দেওয়া হয়। স্থানটি পরে মোঘলপুরা নামে পরিচিত হয়। এইসব নূতন মুসলমান পরবর্তীকালে দিল্লী সালতানাতের অনেক গোলযোগের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

দাক্ষিণাত্যে অভিযান ঃ সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা, কারার শাসনকর্তা আলাউদ্দিন খিলজীকে মালব অভিমুখে একটি অভিযান পরিচালনা করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু আলাউদ্দিন মালব পার হইয়াও তাহার বিজয়াভিযান চালাইয়া যান এবং দাক্ষিণাত্যের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। ইতোপূর্বে এই এলাকা আর কোন মুসলমান বিজয়ী কর্তৃক আক্রান্ত হয় নাই। রাজধানী হইতে তাঁহার গতিবিধির খবরাখবর গোপন করিয়া তিনি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। বেরার ও খান্দেশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া আলাউদ্দিন দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রকে হঠাৎ আক্রমন করেন। তিনি রাজার রাজধানী লুট করেন এবং ইলিচপুর সমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। রাজার আস্তাবল হইতে আলাউদ্দিন ত্রিশ হইতে চল্লিশ হাজার হাতী এবং এক হাজার ঘোড়া লইয়া যান।[৬] অতঃপর স্বর্ণ ও মণি-মুক্তার অনেক লুণ্ঠিত দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া তিনি আরায় ফিরিয়া যান।

জালালুদ্দিনের হত্যাঃ কালীকিংকর দত্ত মন্তব্য করেন ঃ "এমনকি এরূপ একজন শান্তিপ্রিয় সুলতানও তাঁহার শয্যায় স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করিতে পারেন নাই।"[৭] ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিনের কৃতকার্যতার খবর পাইয়া সুলতান তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কারায় যাত্রা করেন। কিন্তু ১২৯৬ সালে তিনি তথায় বিশ্বাসঘাতকদের হাতে নিহত হন। আলাউদ্দিনের সঙ্গিগণ সেইখানেই তাঁহাকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করে।

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী
(১২৯৬-১৩১৬ খ্রিঃ)

প্রাথমিক গোলযোগ ঃ সুলতান জালালুদ্দিন ফিরুযের হত্যাকাণ্ডের পর ১২৯৬ সালের ১৯শে জুলাই আলাউদ্দিনের সমর্থকগণ তাঁহাকে তাঁহার শিবিরে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করে। তিনি অতঃপর তাঁহার ভাই আলমাস বেগকে উলুঘ খান, মালিক হিযাবুদ্দিনকে জাফর খান এবং মালিক সঞ্জরকে আলপ খান এবং মালিক নুসরাত জালেসারকে নুসরাত খান উপাধি প্রদান করেন।[৮] আলাউদ্দিনের পরবর্তী প্রয়োজনীয় কাজ ছিল নিজেকে দিল্লীতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। ইতোমধ্যে বিধবা রাণী মালিকা জাহান তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বালক কুদ্দুর খানকে রুকনুদ্দিন ইব্রাহিম উপাধি দিয়া দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।[৯] কিন্তু তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠপুত্র আরকালী খান তখন মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন। মালিকা জাহান তাঁহাকে দিল্লী আসিবার আমন্ত্রণ জানাইলে তিনি মুলতানে অবস্থান করাটাই শ্রেয় মনে করেন। কারণ ইতোমধ্যে আলাউদ্দিন এক বিরাট বাহিনী লইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এদিকে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া আলাউদ্দিন দ্রুতগতিতে দিল্লী যাত্রা করেন। মৃদু বাধা প্রদানের পর ইব্রাহিম তাঁহার মাতা ও বিশ্বস্ত আহমদ চ্যাপকে লইয়া মুলতানে পলাইয়া যান। পরে আরকালী খান, ইব্রাহিম, তাঁহাদের ভগ্নীপতি উলুঘ খান ও আহমদ চ্যাপকে বন্দি করা হয়। কিছুকাল পর তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আরকালীর সব ছেলেকে হত্যা করা হয় এবং আরকালী ও তাঁহার ভাইকে হান্সির দুর্গে বন্দি করা হয়। মালিকা জাহান ও আহমদ চ্যাপকে দিল্লীতে কড়া প্রহরায় রাখা হয়। আলাউদ্দিন অতঃপর জালালুদ্দিনের কিছুসংখ্যক সমর্থকের মোকাবিলা করেন। কিন্তু শীঘ্রই প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণাত্যের স্বর্ণ বিতরণের মাধ্যমে তিনি সমস্ত অভিজাতবর্গ, কর্মচারী ও দিল্লীর জনসাধারণের মন জয় করিয়া নেন। অতঃপর তাঁহাকে বলবনের লালপ্রাসাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। মৃত সুলতানের কোন পলাতক আত্মীয়-স্বজনকে মুলতানে থাকিতে দেওয়া হইল না। জিয়াউদ্দিন বারানী অবস্থাটিকে এরূপে বর্ণনা করেন ঃ

"সিংহাসন অতঃপর নিরাপদ হইল, এবং রাজকর্মচারীগণ ও হস্তীরক্ষকগণ তাহাদের হস্তীসমূহ লইয়া, কোতোয়ালগণ দুর্গের চাবি লইয়া এবং বিচারকগণ ও নগরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আলাউদ্দিনের নিকট হাজির হন এবং একটি নূতন সমাজব্যবস্থা গঠনে ব্রতি হন। তাঁহার সম্পদ ও শক্তি ছিল অপরিসীম। সুতরাং কোন লোক তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিল কি করিল না, তাহাতে থোড়াই আসিল গেল। কারণ খোতবা ও মুদ্রা তাঁহার নামেই প্রচলিত হইল।"[১০]

সিদি মাওলার অধীনে তুর্কিদের অবাধ্যতা, রাজপুতানা, মালব ও গুজরাটের রাজাদের আইন অমান্যমূলক আচরণ, তৎসঙ্গে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদের ষড়যন্ত্র, যাহারা তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল—এই সমস্ত শত্রুদিগকে আলাউদ্দিন মোকাবিলা করেন। ডঃ কালী কিংকর দত্ত বলেন ঃ "কিন্তু মেজাজ ও স্বভাব তাঁহার চাচা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, নূতন সুলতান এই সমস্ত অসুবিধাকে অনমনীয় উৎসাহে ধ্বংস করিতে প্রয়াস পান এবং তাঁহার ব্যবস্থাদি কৃতকার্যতায় সুশোভিত হয়।"[১১]

মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে ঃ স্বীয় ক্ষমতা নিরাপদ করিয়া আলাউদ্দিন সদা সংঘটিত মোঙ্গল

আক্রমণের ভয়াবহ বিপদের মোকাবিলা করিতে মনস্থ করেন। তিনি গিয়াসুদ্দিন বলবনের পরিকল্পনাসমূহ সমাপ্ত করিয়া রাজ্যের সীমান্ত ঘাঁটিগুলিকে শক্তিশালী করিয়া তোলেন। আলাউদ্দিনের সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই বিরাট এক মোঙ্গলবাহিনী ভারত আক্রমণ করে। কিন্তু জলন্ধরের নিকট আলাউদ্দিনের সেনাপতি জাফর খান তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দান করেন। দ্বিতীয় বৎসর সালভি নামক একজন সেনাপতির অধীনে মোঙ্গলবাহিনী পুনরায় আক্রমণ করিলে সামানা, পাঞ্জাব ও মুলতানের শাসনকর্তাগণ এবং সেনাপতি জাফর খান তাহাদিগকে এইবারও শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। সালভি গ্রেফতার হন এবং ২০০০ মোঙ্গল বন্দিসহ তাঁহকে দিল্লী পাঠানো হয়।[১২]

মোঙ্গলদের প্রথম আক্রমণ
দ্বিতীয় আক্রমণ

কিন্তু মোঙ্গলদের ভয়াবহ আক্রমণ পরিচালিত হয় ১২৯৯ সালে। সেইবার কুতলুঘ খাজা ২ লক্ষ মোঙ্গল সেনা লইয়া ভারত আক্রমণ করেন।[১৩] লুণ্ঠনের চাইতে দিল্লী অধিকার করাই ছিল তাহাদের এবারকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব যেসব দেশের উপর দিয়া তাহারা অগ্রসর হয় সেইগুলিকে ধ্বংস না করিয়াই তাহারা দিল্লীর উপকণ্ঠে আসিয়া পৌছে।[১৪] শত্রুদের এই আক্রমণ প্রতিহত করিবার উপায় বাহির করিবার জন্য সুলতান তৎক্ষণাৎ একটি যুদ্ধ পরিষদ আহ্বান করেন। পরিষদের অমত থাকা সত্ত্বেও আলাউদ্দিন শত্রুকে আক্রমণ করিতে কৃতসংকল্প হন। তিন লক্ষ অশ্বারোহী ও ২৭,০০০ হস্তী সম্বলিত বিরাট বাহিনী লইয়া তিনি শহরের বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হন। শহরের বাহিরে অবস্থিত সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া তিনি যুদ্ধের জন্য সৈন্যদিগকে বিন্যস্ত করেন। শত্রুরাও তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রথম আগমনের সময় হইতে কোন সমরক্ষেত্রে এরূপ বিশাল সমাবেশ ঘটে নাই। স্বয়ং সুলতান, সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনানায়ক জাফর খান এবং সুলতানের ভ্রাতা আলিফ খান যথাক্রমে সেনা ব্যূহের কেন্দ্র, দক্ষিণ ভাগ ও বাম ভাগের নেতৃত্বে সৈন্য পরিচালনা করেন। খিলজী বাহিনী অমিত তেজে মোঙ্গলদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলে তাহাদের প্রতিরক্ষা ভাঙ্গিয়া যায়। জাফর খানের প্রচণ্ড আক্রমণে মোঙ্গলবাহিনী দিশেহারা হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। কিন্তু জাফর খানের কৃতিত্বে ঈর্ষাপরায়ণ আলিফ খানের বিশ্বাসঘাতকতায় জাফর খান নিহত হন।[১৫] কিংকর্তব্যবিমূঢ় মোঙ্গলবাহিনী ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া শীঘ্রই পলায়ন করে।

তৃতীয় আক্রমণ

প্রায় একই সময়ে তারঘী নামক একজন নেতার অধীনে মোঙ্গলগণ এক বিরাট সৈন্য বাহিনী লইয়া পুনরায় ভারত আক্রমণ করে। কিন্তু হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া (রঃ)-এর মধ্যস্থতায় এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়। এইসব বিপত্তি সত্ত্বেও ১৩০৪ সালে মোঙ্গলগণ আরেকটি অভিযান পরিচালনা করে এবং আলী বেগ ও খাজা তুস-এর নেতৃত্বে তাহারা আমরোহা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। কিন্তু সুলতানী বাহিনী বিপুল ক্ষতি সাধন করিয়া তাহাদিগকে হটাইয়া দেয়। দিপালপুর এলাকার অধিনায়ক গাজী মালিক মোঙ্গলদের আরেকটি আক্রমণ প্রতিহত করেন। আলাউদ্দিন খিলজীর সময় মোঙ্গলগণ শেষ অভিযান পরিচালনা করে ১৩০৭-১৩০৮ সালে। তাহাদের নেতা ইকবাল মনদ একাধিকবার সৈন্যবাহিনী লইয়া আগমন করেন। কিন্তু তিনি পরাজিত ও নিহত হন। অনেক মোঙ্গল আমিরকে হস্তীর

চতুর্থ আক্রমণ
পঞ্চম আক্রমণ
ষষ্ঠ আক্রমণ
শেষ মোঙ্গল অভিযান

পদতলে নিষ্পেষিত করা হয়। বারবার পরাজয় এবং দিল্লী সালতানাতের এরূপ কঠোর ব্যবহারে ভীত হইয়া মোঙ্গলগণ আলাউদ্দিন খিলজীর সুলতানী আমলে আর আসে নাই।

মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ঃ মোঙ্গলদের হাত হইতে রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী গিয়াসুদ্দিন বলবনের সীমান্ত নীতি গ্রহণ করেন। মোঙ্গলদের আগমনের পথে অবস্থিত অনেক পুরাতন দুর্গ মেরামত করা হয় এবং অনেক নূতন দুর্গ নির্মাণ করা হয়। রাজকীয় সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করা ছাড়াও সামান ও দিপালপুরের সীমান্ত ঘাঁটিগুলিতে যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত অবস্থায় সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হয়। রাষ্ট্রীয় কারখানায় বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক প্রকৌশলী নিযুক্ত করা হয়। প্রায় সিকি শতাব্দীর জন্য গাজী মালিক, পরবর্তীকালের গিয়াসুদ্দিন তোঘলক ১৩০৫ সাল হইতে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা হিসাবে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে থাকাকালে যোগ্যতার সহিত মোঙ্গল অক্রমণ প্রতিহত করেন।[১৬]

নূতন মুসলমান ঃ উচ্চপদে নিয়োগের আশা পূরণ হয় নাই—এই অজুহাতে নূতন মুসলমানগণ সর্বদা গোলমাল করে। আলাউদ্দিনের সৈন্যবাহিনী গুজরাট হইতে ফিরিবার পথে তাহারা সত্যসত্যই বিদ্রোহ করে। সুলতান তাই নূতন মুসলমানদিগকে রাজকার্য হইতে বরখাস্ত করেন। ইহাতে তাহারা আরও অসন্তুষ্ট হয় এবং সুলতানকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু শীঘ্রই ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। ফলে সমস্ত নূতন মুসলমানকে হত্যা করিবার আদেশ দিয়া সুলতান ভীষণ প্রতিশোধ নেন। আদেশটি কার্যকর করা হয় এবং একদিনে বিশ হইতে ত্রিশ হাজার নূতন মুসলমানকে হত্যা করা হয়।

নতুন মুসলমানদের হত্যা

সুলতানের নির্বুদ্ধিতা ঃ অস্ত্রের সফলতায় সুলতান আলাউদ্দিন দিশেহারা হইয়া যান। জিয়াউদ্দিন বারানী লিখেন ঃ "এইসব সাফল্য তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। নাগালের বাহিরের বড় বড় আশা ও লক্ষ্য তাঁহার মস্তিষ্কে দানা বাধে। তাঁহার পূর্বের কোন সুলতানের মনে যাহা কখনও উদিত হয় নাই, এরূপ খেয়াল তিনি পোষণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বিজয়োল্লাসে, অজ্ঞতায় ও নির্বুদ্ধিায় তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায় এবং তিনি সম্পূর্ণ অসম্ভব পরিকল্পনা ও আজেবাজে আশা পোষণ করিতে থাকেন।[১৭] স্বয়ং পয়গাম্বর হইয়া তিনি একটি নূতন ধর্ম প্রচার করিবার স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করেন। বিশ্ববিজয়ী হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধ আলেকজান্ডারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে মনস্থ করেন। এই ব্যাপারে তিনি ঐতিহাসিক বারানীর চাচা কাজী আলাউদ্দিন মুল্‌ক এর সাথে আলোচনা করেন। প্রথম পরিকল্পনার ব্যাপারে কাজী মন্তব্য করেন ঃ "নবুয়ত কখনও রাজন্যবর্গের হস্তগত হয় নাই এবং যতদিন পৃথিবী টিকিয়া থাকে, কখনও হইবেও না, যদিও কোন কোন পয়গাম্বর রাজার কার্য সম্পাদন করিয়াছেন।" দ্বিতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, আলেকজান্ডার-এর যুগ চলিয়া গিয়াছে এবং সুলতানের অবর্তমানে রাজ্য শাসন করিবার জন্য অ্যারিস্টটলের (Aristotle) ন্যায় উজিরও নাই। অধিকন্তু ভারতের বিশাল অংশ এখনও বিজয়ের অপেক্ষা রাখে এবং রাজ্য এখনও মোঙ্গল আক্রমণের সম্মুখীন হইয়া রহিয়াছে। এইভাবে সুলতানকে সুবুদ্ধি দেওয়া হয়। বিশ্ববিজয়ের খেয়াল ছাড়িয়া তিনি ভারত বিজয়ে অবতীর্ণ হন, যদিও মুদ্রায় নিজেকে তিনি "দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার" হিসাবে উল্লেখ করেন।[১৮]

আলাউদ্দিনের রাজ্য জয়

মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের পর সুলতান নিজেকে দেশ বিজয়ে নিয়োজিত করেন। স্যার ওল্‌সলি হেগের মতে, ইহার সাথেই শুরু হয় "সালতানাতের রাজকীয় যুগ", যাহা প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল স্থায়ী হয়। ১২৯৭ সালে উলুঘ খান ও নুসরাত খানকে পাঠানো হয় রাজপুতানার হিন্দু রাজ্য গুজরাট ও নেহরওয়ালা জয় করিবার জন্য। দ্বিতীয় রায় কর্ণদেব নামে একজন বাঘেলা রাজপুত যুবরাজ তখন গুজরাটের রাজা ছিলেন।

গুজরাট ও নেহরওয়ালা বিজয়

সমস্ত গুজরাট রাজ্য জয় করিয়া আক্রমণকারিগণ রাণী কমলা দেবীকে বন্দি করে। রাজা দ্বিতীয় কর্ণদেব দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। আক্রমণকারিগণ বিপুল ধন-সম্পদ ও রাণী কমলাদেবীকে লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে। সঙ্গে করিয়া তাহারা কাফুর নামে একজন তরুণ ক্রীতদাস লইয়া আসে, "যিনি পরে রাষ্ট্রের খুব প্রভাবশালী অভিজাতে পরিণত হন এবং আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পূর্বে ও পরে কিছুদিনের জন্য রাষ্ট্রের সত্যিকারের বিধাতা হইয়া উঠেন।"[১৯] পরবর্তীকালে কাফুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

রাণী কমলা দেবী কাফুর

১২৯৯ সালে রনথম্ভোর দুর্গ পুনরাধিকার করিবার জন্য তাঁহার ভ্রাতা সুলতান উলুঘ খান ও উজির নুসরাত খানকে প্রেরণ করেন। ইতোপূর্বে সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক ও ইলতুৎমিশ রনথম্ভোর জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজপুতগণ ইহা পুনরাধিকার করে। হামির দেব নামে একজন রাজপুত ইহাতে রাজত্ব করেন। তিনি কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী নূতন মুসলমানদের স্থান দিয়াছিলেন। উলুঘ খান ও নুসরাত খান শীঘ্রই ঝৈন দুর্গ অধিকার করেন এবং রনথম্ভোরের নিকটে শিবির সন্নিবেশ করেন; কিন্তু রাজপুতগণ তাহাদিগকে প্রতিহত করে। দুর্গের ভিতর হইতে প্রস্তর নিক্ষেপের ফলে নুসরাত খান গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং সেই আঘাতে পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেনাপতিদের পরাজয়ের খবর পাইয়া আলাউদ্দিন স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং ১৩০১ সালে রনথম্ভোর অধিকার করেন। হামির দেব ও অন্যান্য নূতন মুসলমানকে পরে হত্যা করা হয়। উলুঘ খানকে দুর্গের ভার দিয়া আলাউদ্দিন দিল্লী ফিরিয়া যান।

রণথম্ভোর

সুলতানের দৃষ্টি অতঃপর মেবারের প্রতি ধাবিত হয়। নিবিড় পর্বতরাজি দ্বারা সুরক্ষিত থাকায় মেবার বহুদিন যাবৎ দিল্লীর আধিপত্য অস্বীকার করে। রনথম্ভোরের মত এই অভিযানও সুলতানের রাজ্য বিস্তারের নীতির ফলে সংঘটিত হয়। রানা রতন সিং এর রাণী পদ্মিনী দেবীকে হস্তগত করিবার জন্য সুলতানের তথাকথিত আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই বিষয়টি সমসাময়িক কোন ইতিহাস বা শিলালিপিতেও সুষ্ঠুভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। যাহা হউক, ১৩০৩ সালে আলাউদ্দিন মেবারের সুপ্রসিদ্ধ চিতোর দুর্গ অধিকার করেন। সুলতানের পুত্র খিজির খানকে চিতোরের শাসনভার দেওয়া হয় এবং ইহাকে খিজিরাবাদ বলিয়া পুনরায় নামকরণ করা হয়।

মেবার চিতোর দুর্গ অধিকার

চিতোর জয় করিবার পর সুলতান মালবের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করেন এবং ১৩০৫ সালে ইহা জয় করেন। সুলতানের বিশ্বস্ত উজির আইন-উল-মুলককে মালবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। মালবের পর উজ্জয়ন,

মালব উজ্জয়ন, মান্দু, ধর, চান্দেরি

মান্দু, ধর ও চান্দেরি বিজিত হয়। এইভাবে ১৩০৫ সালের মধ্যে সমগ্র উত্তর ভারত খিলজী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই বিজয় সুলতানের দাক্ষিণাত্য অভিযানে অনুপ্রেরণা দান করে।

সুলতান আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য নীতি ঃ যদিও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ভারতের পশ্চিম উপকূলের সঙ্গে মুসলমানদের অনেক পূর্ব হইতেই সম্পর্ক ছিল, তবুও আলাউদ্দিন খিলজীই প্রথম সুলতান, যিনি দাক্ষিণাত্যে বিজয়াভিযান পরিচালনা করেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহ আলাউদ্দিনকে এই বিজয়ে উদ্বুদ্ধ করে। উত্তরাংশ জয় করিবার পর দাক্ষিণাত্যে রাজ্য বিস্তার করাটা আলাউদ্দিনের মত উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুলতানের পক্ষে একটি অবধারিত ব্যাপার। দাক্ষিণাত্যের সম্পদও একজন দুঃসাহসিক অভিযানকারীর পক্ষে যথেষ্ট লোভনীয় ছিল।

কারণসমূহ

রাজনৈতিকভাবে দাক্ষিণাত্য চারিটি অংশে বিভক্ত ছিল— ১। সুশাসক রামচন্দ্র দেবের (১২৭১-১৩০৯) অধীনে দেবগিরির যাদব রাজ্য, ২। তৃতীয় বীর বল্লালের (১২৯২-১৩৪২) অধিনে হইসালা রাজ্য, যাহা বর্তমানে মহীশুরের অন্তর্ভুক্ত। ইহার রাজধানী ছিল দ্বারসমুদ্র বা আধুনিক হেলেবিদ; ৩। মহাবমনকুলশেখরের (১২৬৮-১৩১১) অধীনে সুদূর দক্ষিণাবর্তের পাণ্ডিয়া রাজ্য; ৪। কাকাতিয়া বংশের প্রথম প্রতাপরুদ্র দেবের অধীনে ছিল তেলিঙ্গানা রাজ্য এবং ইহার রাজধানী ছিল বরঙ্গল। এই সমস্ত ছোট ছোট রাজ্য ছাড়াও আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও রাজা ছিলেন। রাজনৈতিক দলাদলি দাক্ষিণাত্যের প্রতিরক্ষাকে দুর্বল করিয়া দেয়। ফলে ইহা আলাউদ্দিন খিলজীর সহজ শিকারে পরিণত হয়।

বিভিন্ন অংশে বিভক্ত

দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রদেব বিগত ত্রিশ বৎসর দিল্লী সালতানাতের প্রাপ্য ইলিচপুরের রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন এবং গুজরাটের রাজা দ্বিতীয় রায় কর্ণদেবকে আশ্রয় দান করেন। সুতরাং ১৩০৭ সালে মালিক কাফুরের নেতৃত্বে আলাউদ্দিন রামচন্দ্রদেবের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। খাজা হাজীর সহযোগিতায় কাফুর মালব ও গুজরাটের মধ্য দিয়া দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হন। রামচন্দ্রদেবকে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং শান্তি প্রার্থনা করিতে বাধ্য করেন। অতঃপর রামচন্দ্রদেবকে ক্ষমা করা হয় এবং ইহার পর হইতে তিনি দিল্লী সালতানাতের অধীনস্থ হিসাবে দেবগিরিতে রাজত্ব করেন।

দেবগিরি

১৩০৩ সালে কাকাতিয়ার প্রতাপরুদ্র দেবের বিরুদ্ধে আলাউদ্দিন অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৩০৯ সালে তিনি আরেকটি অভিযান প্রেরণ করেন। আলাউদ্দিনের লক্ষ্য ছিল সম্পদ হস্তগত করা। সুতরাং তিনি মালিক কাফুরকে নির্দেশ দেন—যদি রাজা তাঁহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি সমর্পণ করিতে রাজি হন, তবে যেন সে দেশ ধ্বংস করা না হয়। নিজেকে বরঙ্গলের দুর্গে আবদ্ধ রাখিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র দেব খিলজী বাহিনীকে প্রতিহত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এমন ভীষণভাবে দুর্গটি আক্রমণ করা হয় যে, ১৩১০ সালে রাজা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। দাবিকৃত ধন-সম্পত্তি হস্তান্তর ও বশ্যতা স্বীকারে রাজি হইবার পর মালিক কাফুর দেবগিরি, ধর ও ঝৈনের পথে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

কাকাতিয়া বা তেলিঙ্গানার বিরুদ্ধে রাজ্য

১৩১০ সালে মালিক কাফুর ও খাজা হাজীর নেতৃত্বে সুলতান আলাউদ্দিন সুদূর দক্ষিণাবর্তের হইসালা রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। ইহার মন্দিরের

অবর্ণনীয় ধন-সম্পদের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ ছিল। দেবগিরির পথে অগ্রসর হইয়া খিলজী বাহিনী দ্বারসমুদ্রে পৌছায়। হঠাৎ আক্রমণে রাজা তৃতীয় বীরবল্লাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁহার সম্পদরাজি হস্তান্তর করেন। অতঃপর হইসালা রাজ্যও দিল্লী সালতানাতের অধীনস্থ করদ রাজ্যে পরিণত হয়।

হইসালা রাজ্য

দ্বারসমুদ্রে মালিক কাফুর বার দিন অবস্থান করিয়া মাদুরার পাণ্ডিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। ইহাকে মাবার বলা হইত, যাহা প্রায় সমগ্র করমেণ্ডাল উপকূল এবং পশ্চিম উপকূলে কুইলন হইতে কেপ কমরিন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুন্দর পাণ্ডিয়া ও বীর পাণ্ডিয়া এই দুই ভ্রাতার বিরোধ মুসলমানদিগকে তাহাদের সুদীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ দান করে। বীর পাণ্ডিয়া ছিলেন রাজার প্রিয় পাত্র। এই পক্ষপাতিত্বে ক্রুদ্ধ হইয়া সুন্দর পাণ্ডিয়া রাজাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তিনি আবার বীর পাণ্ডিয়া কর্তৃক পরাজিত হন। এরূপ ভীষণ অবস্থায় পতিত হইয়া সুন্দর পাণ্ডিয়া মুসলমানদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৩১১ সালে মালিক কাফুর মাদুরা পৌছিয়া নগরটিকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পান। অনেক লুণ্ঠিত দ্রব্য কাফুরের হস্তগত হয়। তন্মধ্যে ছিল ৬১২টি হস্তী, ২০ হাজার ঘোড়া, ৯৬ হাজার মণ স্বর্ণ এবং মণিমুক্তার কয়েকটি বাক্স।[২০] মালিক কাফুর সুদূর রামেশ্বরন পর্যন্ত পৌছান। এইভাবে মাবারের দেশ আলাউদ্দিন খিলজীর করায়ত্ত হয় এবং মুহাম্মদ তোঘলকের রাজত্বের প্রথম যুগ পর্যন্ত দিল্লী সালতানাতের করদ রাজ্য হিসাবে থাকিয়া যায়।

মাদুরার পাণ্ডিয়া রাজ্য

ইতোমধ্যে দেবগিরির রামচন্দ্র দেবের পুত্র শংকর দেব ১৩১২ সালে বিদ্রোহ করেন। তাঁহার পিতার প্রতিশ্রুত দিল্লী সালতানাতের কর দেওয়া তিনি বন্ধ করিয়া দেন এবং স্বাধীনতা অর্জন করিতে চেষ্টা করেন। মালিক কাফুর পুনরায় দিল্লী হইতে অভিযান করিয়া শংকর দেবকে পরাজিত ও নিহত করেন।

দেবগিরীর বিদ্রোহ দমন

সুলতান আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য নীতি ঃ উত্তর ভারতের বিজিত দেশগুলির প্রতি আলাউদ্দিন খিলজীর নীতি ছিল এইগুলিকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা এবং ভিত্তি সুদৃঢ় করা। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের ব্যাপারে তিনি রাজস্ব আদায় ও আনুগত্য গ্রহণে সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু মূল শাসনব্যবস্থা দেশীয় হিন্দু রাজাদের হাতেই তিনি ছাড়িয়া দেন। করদাতা রাজাদের মাধ্যমে দাক্ষিণাত্য শাসন করিবার নীতি মোটের উপর তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। কারণ, সুদূর দক্ষিণের প্রদেশগুলির উপর কার্যকর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা সত্যিই খুব দুরূহ ব্যাপার ছিল।

রাজপদ সম্পর্কে আলাউদ্দিনের নীতি ঃ রাষ্ট্রনীতিতে আলিমদের হস্তক্ষেপ সুলতান আলাউদ্দিন কখনও পছন্দ করিতেন না এবং এই ব্যাপারে তিনি প্রাক্তন সুলতানগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন, আলিমদের উপদেশ ছাড়াই তিনি রাজকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। একটি শক্তিশালী রাজ সরকার গঠন করিবার জন্য তিনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন তাহাই করেন এবং ক্ষণিকের জন্যও চিন্তা করেন না, কাজটি আইনসম্মত বা আইন বিরোধী কিনা। তদনুসারে তিনি একবার বিয়ানার কাজী মুগীসুদ্দিনকে বলেন—"যাহাই আমি রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য বা জরুরি অবস্থার জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করি, তাহাই আমি আদেশ করি।[২১] তৎসঙ্গে ইহা মনে করাও ভুল হইবে যে, আলাউদ্দিন ইসলাম

ধর্ম অমান্য করেন। ভারতের বাহিরে তিনি ইসলামের একজন শ্রেষ্ঠ রক্ষাকর্তা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। স্বয়ং আলাউদ্দিন কাজীকে বলেন, "যদিও আমি বিজ্ঞান বা গ্রন্থ পড়ি নাই, তবুও আমি মুসলমান বংশেরই একজন মুসলমান।'[২২]

শাসনকার্যের সংস্কার ঃ ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন ঃ "আলাউদ্দিন তাঁহার শাসনকার্যের নীতিতে যোগ্যতা ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি আনয়ন করেন, যাহা শুধুমাত্র সামরিক জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের মধ্যে কদাচ দেখিতে পাই।"[২৩]

নিতান্ত মামুলি অবস্থা হইতে তিনি মধ্যযুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের মর্যাদায় উঠিতে সক্ষম হন। একটি শক্তিশালী ও সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে তিনি দেশীয় রাজন্যবর্গকে রাজ্যচ্যুত করেন এবং দেশ হইতে বিদ্রোহ নির্মূল করেন। একটি যোগ্য শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি পুরা দুই যুগ রাজত্ব করেন।

বিদ্রোহের কারণসমূহ আলোচনা

তাঁহার নিকটাত্মীয়দের বিদ্রোহ ও নূতন মুসলমানদের ষড়যন্ত্র দ্বারা তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস হয় যে, শাসনকার্যে নিশ্চয়ই কোন গলদ রহিয়াছে। তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত পরামর্শদাতাদের সহিত ব্যাপারটি আলোচনা করেন এবং তারপর রাজনৈতিক বিশৃংখলার কারণ নিরূপণ করিবার জন্য ধীর-স্থিরভাবে চিন্তা করেন। তিনি শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিশৃংখলার কারণ চারিটি ঃ

১। রাষ্ট্রীয় কাজে সুলতানের অমনোযোগিতা;

২। মদ্যপান;

৩। সাম্রাজ্যের মালিক, আমির ও জমিদারদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও অত্যধিক সামাজিক আদান-প্রদান;

৪। ধন-সম্পদের আধিক্য, যাহা মানুষের মন উত্তেজিত করে এবং গর্ব ও রাজদ্রোহ আনয়ন করে।

এই সমস্ত দোষ দূর করিবার জন্য এবং নিজেকে বিদ্রোহের হাত হইতে নিরাপদ রাখিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প হইয়া সুলতান আলাউদ্দিন একটি দমনমূলক বিধান রচনা করেন। প্রথম ব্যবস্থা তিনি কার্যকরী করেন সমস্ত সম্পত্তি এই আইন বলে বাজেয়াপ্ত করিবার মাধ্যমে। সমস্ত দান, বৃত্তি এবং যৌতুকাদি বাজেয়াপ্ত করা হয়। যেসব গ্রাম মালিকানা সূত্রে,

দমনমূলক বিধি বিধান

বখশিশ সূত্রে এবং ওয়াকফ হিসাবে ভোগ করা হইত, সবগুলি খাস জমির সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, সুলতান একটি সুদক্ষ গুপ্তচর বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার সাহায্যে রাজ্যের কোথায় কি হইতেছে, সমস্ত কিছু সম্পর্কে নিজেকে অবহিত রাখিতে চেষ্টা করেন। ফলে প্রায়ই গুপ্তচরেরা রাজনুগ্রহ প্রাপ্তির আশায় বাজারের হালকা আলাপাচারও সুলতানের কর্ণগোচর করে। তৃতীয়ত, উত্তেজনামূলক মদ ও ঔষধাদি নিষিদ্ধ করা হয়। মদ্যপান ছাড়িয়া দিয়া সুলতান স্বয়ং উদাহরণ সৃষ্টি করেন, এবং তাঁহার সমস্ত সুরাপাত্রগুলি টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।[২৪] চতুর্থত, সমস্ত আমোদ উৎসব ও সামাজিক আদান-প্রদান বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই আইনটি এমন কঠোরভাবে কার্যকর করা হয় যে, ভোজ ও আত্মীয়তা সম্পূর্ণ অচল হইয়া যায়। গুপ্তচরের ভয়ে অভিজাতবর্গ নিজেদেরকে স্তব্ধ করিয়া রাখেন; তাঁহারা সব ভোজসভা বন্ধ করিয়া দেন এবং পরস্পরের সাথে খুব কমই মেলামেশা করেন।

বেশ কিছু সংখ্যক লোককে দুর্দশাগ্রস্ত করিবার জন্য সুলতান এমন কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যেগুলি ছিল সত্যিই চরম বেদনাদায়ক। প্রজাসাধারণ তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধেক অংশ রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারে জমা দিতে এবং গবাদি পশুর জন্য মোটা অংকের গো-চারণ ভূমির কর দিতে বাধ্য হয়। ফলে ঐ সমস্ত লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা এত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া যায় যে, তাহাদের নিকট অস্ত্র বহন করা, ঘোড়ায় চড়া অথবা কোন বিলাসিতা করিবার মত সামর্থ্য থাকে না। তাহাদের ঘরে স্বর্ণ, রৌপ্য, টংকা বা জিতাল অথবা কোন প্রাচুর্যের চিহ্নও দেখা যায় না। চরম দুর্দশার এমন স্তরে গিয়া তাহারা উপনীত হয় যে, 'খুট' ও 'মোকাদ্দমদে'র স্ত্রীগণ শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের ঘরে ঘরে ঝি-চাকরানীর কাজ করিতে বাধ্য হন।[২৫]

অর্থনৈতিক ও রাজস্ব সংস্কার ঃ তুর্কি সুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দিন খিলজী ছিলেন প্রথম সুলতান, যিনি অর্থনৈতিক ও রাজস্ব সংস্কারে মনোযোগ দেন।[২৬] অধিক রাজস্ব আদায়ের জন্য কঠোর নীতি অবলম্বন করিবার মূল কারণ ছিল প্রধানত দুইটি— ১। পুনঃ পুনঃ মোঙ্গল আক্রমণের ভয়াবহতার ফলে সুলতান এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী সব সময় মোতায়েন রাখিতে হইলে অর্থনৈতিক সংস্কার প্রয়োজন। ২। অভিজাতবর্গের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ রোধ করা। অতএব, বেসামরিক বা রাজস্ব প্রশাসনে বা জনহিতকর কাজে তিনি যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন উহাতে তাহার একটি উদ্দেশ্য ছিল অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত সমস্যার ব্যাপারে নিরাপত্তার বিধান করা।[২৭]

কারণসমূহ

সুলতানের এক আদেশের ফলে সমস্ত দান, বখশিশ ও ওয়াকফ্-এর মাধ্যমে ভোগদখলী গ্রামগুলি খাস জমির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আরেক বিধি অনুসারে উৎপন্ন দ্রব্যের উপর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কর ধার্য করা হয়। ভারতের মুসলিম নৃপতিদের মধ্যে আলাউদ্দিনই প্রথম সুলতান, যিনি ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করেন।[২৮] বর্তমানে আলাউদ্দিনের ভূমি জরিপের পন্থা বা যন্ত্র কিছুই পাওয়া যায় না। এমনকি বারানীও ইহার কোন বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই। যাহা হউক, তিনি রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে 'বিসরাহ্' মাপের কথা উল্লেখ করেন। ইহার দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হয় যে, জরিপের ব্যাপারে সমান ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই নীতি অনুসারে ধনী-দরিদ্র সবাইর উপর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হারে কর নির্ধারণ করা হয়।[২৯] এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারদের অবস্থা প্রায় সাধারণ কৃষকদের সমপর্যায়ে নামিয়া আসে।

রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে নীতি নির্দ্ধারণ

জমির খাজনা ছাড়াও সুলতান আলাউদ্দিন বাড়ির খাজনা এবং গো-চারণভূমির খাজনাও আদায় করেন। বারানীর বর্ণনা অনুসারে, গরু ও ছাগলের ন্যায় গবাদি পশুর উপর কর নির্ধারিত হয়। ফিরিস্তার বর্ণনা অনুযায়ী, দুই জোড়া ষাঁড়, দুইটি মহিষ, দুইটি গাভী এবং দশটি ছাগল পর্যন্ত সংখ্যার গবাদি পশুর উপর কর নির্ধারিত হয়। কারি বা 'কারহ' নামক আরেকটি কর আদায় করা হইত। কিন্তু এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছুই জানা যায় নাই।[৩০]

খাজনা

উৎপন্ন দ্রব্যের উপর অর্ধেক হারে কর নির্ধারণ বাস্তবিকই কঠোর। হিন্দু শাসনামলে রাষ্ট্রীয় দাবি ছিল এক চতুর্থাংশ হইতে এক ষষ্ঠমাংশ। তবে অবস্থাভেদে উৎপন্ন দ্রব্যের উপর

সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ হইতে সর্বনিম্ন এক-ষষ্ঠমাংশে উঠানামা করিত। মুসলিম শাসকদের মধ্যে ইলতুৎমিশ ও বলবনের সময়ও এক-তৃতীয়াংশের উপর কর ধার্য করা হয় নাই। ফলে সুলতান আলাউদ্দিনের অর্ধেক কর ধার্য করা জমিদার বা কৃষক কারো নিকট সুখকর হয় নাই। তবে ইহা কোন ইসলামী আইন বিরোধী ছিল না, কারণ, মুসলিম আইন বিশারদগণ সর্বোচ্চ পঞ্চাশ শতাংশ কর নির্ধারণ আইনসিদ্ধ বলিয়াছেন। সুলতান কর্তৃক অধিকাংশ মদ জুয়ার আসরসমূহ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় সরকারি কোষাগারের উপর প্রবল চাপ পড়ে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য তিনি পঞ্চাশ শতাংশ কর নির্ধারণ করেন।[৩১]

দিল্লীর সুলতানগণ অমুসলিম দরিদ্র মধ্যবিত্ত এবং ধনীদের উপর যথাক্রমে দশ টংকা, বিশ টংকা ও চল্লিশ টংকা হারে জিযিয়া কর আদায় করেন। ভারতের হিন্দুদের নিকট হইতে আলাউদ্দিন জিযিয়া আদায় করেন। কিন্তু উত্তর ভারতের রাজাদের নিকট হইতে যে ধরনের জিযিয়া আদায় করেন, সেই তুলনায় দাক্ষিণাত্যের রাজাদের নিকট হইতে আদায়কৃত জিযিয়া ছিল অনেকটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।[৩২] ঠিক কী পরিমাণ টাকা জিযিয়া কর হইতে আদায় হইত, তাহা সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন নাই, তবে খারাজ বা এই জাতীয় কর হইতে কি পরিমাণ রাজস্ব আদায় হইত, তাহাও তাঁহারা উল্লেখ করেন নাই।

জিযিয়া

ভূমিকর ছাড়াও আলাউদ্দিন গৃহকর এবং গো-চরণভূমির উপর কর আরোপ করেন। দুগ্ধ প্রদানকারী জন্তু, যথা গাভী, ছাগল-এর জন্য কর প্রদান করিতে হইত। কত সংখ্যক জন্তুর উপর করারোপ করা হইত, উহার কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও ঐতিহাসিক ফিরিস্তা উল্লেখ করেন যে, দুই জোড়া ষাঁড়, দুইটি মহিষ, দুইটি গাভী এবং দশটি ছাগল পর্যন্ত কর মওকুফ ছিল। উহার অধিক হইলে কর দিতে হইত।

আরেক প্রকারের কর আদায় করা হইত যাহাকে বলা হইত 'কারি' বা 'কারহ'। এই কর সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। ইহাকে সংস্কৃত শব্দ কর হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়, যাহার অর্থ—কর বা খাজনা। জিয়াউদ্দিন বারানী বা ফিরিস্তা ইহা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলেন নাই। তাহাতে মনে হয়, ইহা অতীতে হিন্দু ও মুসলিম যুগে আদায়কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করের একটি ।[৩৩]

কারিকর

যুদ্ধ জয়ের পর লুণ্ঠিত দ্রব্য হইতে পাঁচ ভাগের এক ভাগ বা এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা হয়। ইহাকে বলা হয় খুম্‌স্ (যাহার অর্থ এক-পঞ্চমাংশ)। লুণ্ঠিত দ্রব্যের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কিন্তু আলাউদ্দিন এই আইনের বিরোধিতা করিয়া পাঁচভাগের চারিভাগই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেন। এই নিয়ম সুলতান ফিরূয শাহ্ তুঘলক পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। তিনি আলাউদ্দিনের নিয়ম পাল্টাইয়া পুরাতন আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কোষাগারে পাঁচ ভাগের এক ভাগ জমা দেন।[৩৪]

খুম্‌স বা যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ

যাকাত সম্পূর্ণভাবে একটি ধর্মীয় কর। শুধুমাত্র মুসলমানদের নিকট হইতে গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ভারতে ইহা অনুরূপ ধর্মীয় কর হিসাবে থাকে নাই এবং ধার্মিক সুলতান ফিরূয শাহ্ তোঘলক ইহাকে রাষ্ট্রীয় কর হিসাবে তালিকাভুক্ত করেন। ভারতে এই কর বা সমস্ত দুগ্ধ প্রদানকারী গাভীর গোচারণ কর হিসাবে হিন্দু-মুসলমান সবার নিকট

যাকাত

হইতে গ্রহণ করা হয়। ইসলামী আইন অনুযায়ী মুসলমানদের আমদানি শুল্ক পাঁচ শতাংশ এবং অমুসলিমদের আমদানি শুল্ক দশ শতাংশ।[৩৫]

সুলতান আলাউদ্দিন 'দিওয়ানে মুস্‌তাখরাজ' নামে পরিচিত একটি বিভাগ সৃষ্টি করেন। মুসতাখরাজের কাজ ছিল রাজস্ব আদায়কারীদের নামে বকেয়া খাজনার অনুসন্ধান করা। রাজস্ব প্রশাসনের জন্য অনেক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে সফলতার সমস্ত সম্মান মন্ত্রী (নায়েব উজির) শরফ কায়ানীর প্রাপ্য। এই কর্মকর্তা উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থানে সুলতানের রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত আদেশ কার্যকর করিবার জন্য বহু বৎসর কঠোর পরিশ্রম করেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পশ্চিমাংশ ব্যতীত সমগ্র ভারতের পঞ্চাশ শতাংশ রাজস্ব এবং গোচারণ কর চালু করা সম্ভব হইয়াছিল।[৩৬] নূতন প্রবর্তিত ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়ে প্রথমদিকে বেশ বেগ পাইতে হয়। রাজস্ব আদায় প্রায়ই বকেয়া পড়িয়া যাইত। তাছাড়া বর্ধিত সংখ্যক রাজস্ব আদায়কারীদের মধ্যে অনেক দুর্নীতিবাজ ও অর্থ আত্মসাৎকারী কর্মকর্তাও ছিলেন। তাই বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য আলাউদ্দিন আমিল (রাজস্ব আদায়কারী) ও কারুকনদিগকে যথেচ্ছভাবে শাস্তি দেন।

দিওয়ানে মুস্‌তাখরাজ

পরিশেষে নির্দ্বিধায় বলা যায়, আলাউদ্দিন 'ইকতা' বা 'খুতী'[৩৭] প্রথা বিলুপ্ত করেন নাই; তিনি শুধু জমিদারদের সুবিধাদি কর্তন করেন, তাহাদের বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের পরিবর্তন করেন এবং একটি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতে বাধ্য করেন। তাঁহার অতিরিক্ত কর ভারে কৃষককুলের কোন উপকার হয় নাই। সত্য কথা, আলাউদ্দিনের রাজস্ব নীতি ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত, কিন্তু কৃষকদের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল হওয়া বা ব্যবসায়ীদের প্রতিও রাজস্ব কর্মচারীদের আরও একটু সদয় হওয়া তাঁহার পক্ষে কোন অসম্ভব কিছু ছিল না। আলাউদ্দিনের প্রশাসনের সবকিছুই ছিল জোর-জবরদস্তির ব্যাপার এবং তাই শেখ বশীর যখন বলেন আলাউদ্দিনের সরকারের ভিত্তি ছিল অতি দুর্বল, তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। একটি সুদৃঢ় সরকারের ভিত্তি রচিত হয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপর—জোর-জবরদস্তির উপর নহে।[৩৮]

আলাউদ্দিনের বিখ্যাত মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Price Control System) ঃ কতগুলি বিশেষ কারণে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর জন্য বাজারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। প্রথমত, ঘন ঘন মোঙ্গল আক্রমণ ভারতে মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তোলে। আলাউদ্দিন একজন সত্যিকারের সমরনীতিবিদ ছিলেন। দেশ বিজয়ের একটি নেশা প্রতিনিয়ত তাঁহাকে তাড়া করিয়া ফিরে। তাই তিনি উপলব্ধি করেন, একটি শক্তিশালী স্থায়ী সেনাবাহিনী ছাড়া একদিকে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করা যাইবে না, অপরদিকে তাঁহার রাজ্য জয়ের লিপ্সাও পূরণ করা যাইবে না। স্যার লেনপুল বলেন ঃ "প্রধান সমস্যা ছিল, কিভাবে সেনাবাহিনী বাড়ানো যায় এবং কিভাবে উত্তমরূপে পোষণ করিয়া, উত্তমরূপে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া, উত্তমরূপে প্রশিক্ষণ দিয়া এবং পর্যাপ্ত তীরন্দাজ সরবরাহ করিয়া ইহাকে সুযোগ্য রাখা যায়।"[৩৯] তিনি সৈনিকদের বেতন বৃদ্ধি করিতে পারেন না, কারণ, তাহার ফলে রাষ্ট্রের সম্পদের উপর প্রবল চাপ পড়ে। অতএব, সৈন্যদিগকে সাধারণ বেতনের উপর চলিতে সাহায্য করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে এবং ইহা সম্ভব হয় একমাত্র যদি

তাহারা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একটি নির্ধারিত মূল্যে খরিদ করিতে পারে। এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি সৈন্যদের বাৎসরিক বেতন ২৩৪ টংকায় নির্ধারণ করেন, এবং যাহারা দুইটি ঘোড়া পালন করিতে সক্ষম, তাহাদিগকে ইহার সঙ্গে ৭৮ টংকা অতিরিক্ত দেওয়া হয়।

নিম্নলিখিতভাবে এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা যায়—

১। খাদ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ;

২। কাপড়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ;

৩। গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ।

১। খাদ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ঃ খাদ্য মূল্য স্বাভাবিক রাখিবার জন্য আলাউদ্দিন আটা, বার্লি, চাউল, ডাল, মসুর প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেন। ইহার বাস্তব সুবিধা এই যে, ইহাতে ব্যক্তি মুনাফাখোরির কোন সুযোগ থাকে না, কারণ প্রত্যেকটি দ্রব্যের মূল্যই নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়। সঙ্গে মাল গুদামজাত করিবারও কোন সম্ভাবনা থাকে না, কারণ খোলাবাজার ও মজুদকারীদের বিরুদ্ধে সুলতান যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তৎসঙ্গে মজুতদারদিগকে শস্য ডিলারদের হাত হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। দুষ্কৃতকারীদের দমনের জন্য নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করা হয় ঃ

(ক) রাজধানীর আশেপাশের খাস জমিগুলি হইতে খাজনা বাবদ টাকার পরিবর্তে খাদ্যশস্য নেওয়া হয় এবং দিল্লীর রাজকীয় শস্যভাণ্ডারগুলি খাদ্যশস্য দ্বারা পরিপূর্ণ রাখা হয়, যাহাতে জরুরি অবস্থায় এইসব শস্যভাণ্ডার হইতে প্রয়োজনীয় শস্য সরবরাহ করা যায়।[৪০]

(খ) বাজারে মালামাল সরবরাহ করিবার জন্য শস্য উৎপাদনকারীদিগকে একটি ন্যায়-সঙ্গত মূল্য প্রদান করা হয়। মাঠের মূল্য ও বাজারের মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের জন্য ডিলারগণ মাঠ হইতে মাল খরিদ করিতে ছুটিত। উৎপাদনকারিগণ ইচ্ছা করিলে তাহাদের মালামাল বাজারেও বিক্রয় করিতে পারিত।

(গ) কাহাকেও ব্যক্তিগতভাবে মাল গুদামজাত করিতে দেওয়া হয় না। এই আইনটি এমন কার্যকরিভাবে প্রয়োগ করা হয় যে উৎপাদনকারিগণও তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য মজুদ করিয়া রাখিতে পারিত না।

'দিওয়ানে রিসালাত' ও 'সাহানা মণ্ডি' নামক দুইজন রাজকর্মচারী বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন। পূর্ণ রেশন ব্যবস্থা চালু করিবার দায়িত্ব তাহাদের উপর ন্যস্ত করা হয়। এইসব কর্মচারী কঠোর সতর্কতা ও নিয়মানুবর্তিতার সহিত তাঁহাদের কর্তব্য পালন করেন। হিন্দু বা মুসলিম সমস্ত ব্যবসায়ীদিগকেই তাহাদের নাম সরকারি খাতায় তালিকাভুক্ত করিয়া লইতে হয় এবং এই মর্মে চুক্তি করিতে হয় যে, তাহাদের সমস্ত পণ্যদ্রব্য তাহারা বাদাউন গেটে অবস্থিত 'সেরা-ই-আদল' নামক খোলা বাজারে আনয়ন করিতে বাধ্য থাকিবে। সম্পদশালী ও সম্মানিত মুলতানী ব্যবসায়ীদিগকে বাহিরের বাজার হইতে অধিক পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য সরকারি কোষাগার হইতে অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

বাজার নিয়ন্ত্রণকারিগণ

২। কাপড়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ঃ খাদ্যের পর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূল্য নিয়ন্ত্রিত পণ্য হইল কাপড়। বস্তুতপক্ষে সৈন্যদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য সুলতান পৃথক পৃথক বাজার স্থাপন করেন। তন্মধ্যে ছিল ঘোড়ার বাজার, গরু-ছাগলের বাজার, দাস-দাসীদের বাজার,

মিষ্টির বাজার, মসল্লার বাজার, ফলমূলের বাজার, অস্ত্রশস্ত্রের বাজার, জুতার বাজার প্রভৃতি।[৪১] দিওয়ানে রিয়াসাত কাপড় বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন। বাজারের রাজকর্মচারীদের অনুমতি ছাড়া কাহাকেও উৎকৃষ্ট মানের কাপড় কিনিতে দেওয়া হয় না। এই ধরনের কাপড়ের মূল্য কমাইয়া রাখিবার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করা হয়। বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট কাপড় আমদানির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের সাথে কাপড়ও সেরা-ই-আদল বাজারে বিক্রয় হয়।

৩। গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ ঃ সেনাবাহিনীর জন্য অশ্বের প্রয়োজন। তাই গবাদি পশুর বাজারও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে উৎকৃষ্টতর ঘোড়া সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার মূল্যও নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়। দালালি প্রথা বন্ধ করিয়া দিয়া গবাদিপশুর বাজার নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এইগুলি ছাড়াও অন্যান্য যাবতীয় দ্রব্য এমনকি টুপি, পেয়ালা, চিরুনি, সুচ ইত্যাদির মত সাধারন জিনিসের মূল্যও নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ নিয়ন্ত্রণের ফলে প্রথম শ্রেণীর ঘোড়া ১০০ হইতে ১২০ টংকায়, দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোড়া ৮০ হইতে ৯০ টংকায়, তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়া ৬৫ হইতে ৭০ টংকায় ক্রয় করা যায়। অপরদিকে ছোট ছোট টাট্টু ঘোড়া ৩ হইতে ৪ টংকায় এবং একটি বকরী ১০ বা ১২ জিতালে ক্রয় করা যায়।[৪২]

বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃতি এবং ওজনের হেরফের বিবেচনা করিয়া ১৯৫০ সালে কে. এস. লাল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, ১ টংকা সমান এক ভারতীয় রুপী এবং এক জিতাল সমান এক পয়সার তিন ভাগের এক ভাগ।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ফলাফল ঃ সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী এইভাবে সমগ্র বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সৈন্যদিগকে সাধারণ বেতনে বাঁচিবার সুযোগ দান করেন। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খুব সুফল দান করে এবং সুচারুরূপে চলে। স্যার ওল্‌সলি হেগ বলেন ঃ "অপরিপক্ক রাজনৈতিক অর্থনীতির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইলেও এইসব ব্যবস্থা এত সুন্দরভাবে ইহার লক্ষ্য হাসিল করে যে, ইহার ফলে আলাউদ্দিন প্রায় অর্ধমিলিয়ন (পাঁচ লক্ষ) অশ্বারোহীর একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী সংগঠন ও সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হন। সমস্ত অফিসার ও সৈনিক আলাউদ্দিনের আশাতিরিক্ত বাধ্য হইয়া উঠে। সেনাবাহিনীর বর্ধিত শক্তি ও সামর্থ্য মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে নির্বিঘ্নতার নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং বিদ্রোহাত্মক রাজা ও দলপতিদিগকে ঠেকাইয়া রাখে। ব্যবস্থাগুলি সুলতানের জীবিতকাল পর্যন্ত তাঁহার ইচ্ছানুসারে কাজ করে।"[৪৩] সমস্ত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ নির্মূল হয় এবং মানুষের স্বভাব এমন সুশৃঙ্খল হইয়া ওঠে যে, অপরাধ প্রবণতা অনেকাংশে কমিয়া যায়। ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে স্যার লেনপুল বলেন ঃ "এইগুলি নিঃসন্দেহে কৃতকার্য হইয়াছিল। অতঃপর আমরা আর কোন বিদ্রোহের কথা শুনি না; এবং মোঙ্গলগণ সুলতানের নূতন সেনাবাহিনীর সামনে নির্গত হইবার চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে কার্যকরীভাবে পরাজিত করা হয়।" ব্যবস্থাগুলি এমন দক্ষতার সাথে কাজ করে যে, বারানী মন্তব্য করেন ঃ "বাজারে শস্যের অপরিবর্তিত মূল্য থাকাটাকে যুগের অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বলিয়া মনে করা হয়।"

সফলতার কারণ ঃ এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফলতার মূল কারণ হইল ইহার ব্যাপকতা এবং এই নীতি কার্যকরী করিবার জন্য সুলতানের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ। এইসব

আইন ভঙ্গ করিলে দোকানদারকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হয়। গুপ্তচরেরা বাজারের অবস্থা সম্পর্কে সুলতানকে সর্বদা অবহিত রাখে। "দোকানদারদের মাপের স্বল্পতা রোধ করিবার জন্য এক আদেশ জারি করা হয় এই মর্মে যে, মাপের অসম্পূর্ণ অংশ তাহাদের গায়ের মাংস হইতে কাটিয়া লওয়া হইবে।[৪৪]

দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

আলাউদ্দিন খিলজীর শেষ জীবন ঃ ১৩১২ সাল হইতে আলাউদ্দিন খিলজীর জীবনের বিষাদপূর্ণ অধ্যায় আরম্ভ হয়। তাঁহার ভাগ্য আর তাঁহার জন্য সুপ্রসন্ন হয় নাই। জিয়াউদ্দিন বারানী মন্তব্য করেন ঃ "তাঁহার কপালে কৃতকার্যতা আর আসে নাই। ভাগ্যও অনুরূপ ক্ষণস্থায়ী হইয়া যায় এবং অদৃষ্ট তাঁহাকে ধ্বংস করিবার জন্য ছোরা উত্তোলন করে।[৪৫] তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়, রোগ মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায় এবং তিনি তাঁহার ক্রীতদাস মালিক কাফুরের হাতের ক্রীড়নক হইয়া যান। কাফুরকে তিনি ইতোমধ্যে প্রধান সেনাপতি ও উজির নিযুক্ত করেন। বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া যায়।[৪৬] মালিক কাফুরের ষড়যন্ত্রে পারিবারিক গোলযোগ দেখা দেয় এবং মালিক কাফুর প্রকৃত প্রস্তাবে খিলজী বংশের শাসনকর্তা হইয়া দাঁড়ায়। এইসব অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত গোলযোগের মধ্যে ১৩১৬ সালের ২রা জানুয়ারি সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী প্রাণ ত্যাগ করেন। দিল্লীর জুম্মা মসজিদের সম্মুখে তাঁহাকে কবরস্থ করা হয়।

অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত গোলযোগ, তাঁহার মৃত্যু

আলাউদ্দিন খিলজীর চরিত্র বিশ্লেষণ ঃ মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে ক্ষমতায় আরোহণ করিয়া আলাউদ্দিন অদ্বিতীয় বুদ্ধিমত্তা, সুনিপুণ কৌশল এবং অসাধারণ কর্মক্ষমতার দ্বারা পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। ১২৯৬ সালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি ১৩১৬ সাল পর্যন্ত দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করেন। একেবারে শূন্য অবস্থা হইতে উঠিয়া আসিয়া তিনি মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকদের একজন হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। একটি শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর সাহায্যে তিনি দেশীয় যুবরাজদের ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং দেশ হইতে সর্বপ্রকারের ষড়যন্ত্র দূরীভূত করেন। নিয়মিত একটি শুল্ক নীতির দ্বারা তিনি অস্থির বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন এবং একটি সুযোগ্য প্রশাসনিক যন্ত্রের সাহায্যে তিনি পুরা দুই যুগ দেশ শাসন করেন।[৪৭] সমসাময়িক মুসলিম গ্রন্থকারগণ তাঁহার সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। ইবনে বতুতা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ সুলতানদের মধ্যে একজন মনে করেন। বারানী বলেন, "আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা ইতোপূর্বে কোন যুগে বা সময়ে আর কখনও দেখাও যায় নাই, শুনাও যায় নাই এবং সম্ভবত আর কখনও শুনা যাইবেও না।"

সুলতান আলাউদ্দিন তাঁহার শাসননীতির মধ্যে এমন যোগ্যতা ও অন্তর্দৃষ্টি আনয়ন করেন, যাহা নিছক একজন সমরকুশলীর মধ্যে দেখা যায় না। আলাউদ্দিনই ছিলেন প্রথম সুলতান, যিনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আলিমদের হস্তক্ষেপে আপত্তি করেন। এমনকি তিনি এরূপ ঘোষণাও প্রদান করেন যে, তাঁহার সরকারের রাজনৈতিক হিতাহিতের ব্যাপারে তিনি আলিমদের পরামর্শ ছাড়াই কাজ করিতে পারেন। যোদ্ধা হিসাবে তাঁহার কার্যকলাপ তাঁহার সাংগঠনিক কৃতিত্বের সামনে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহার শাসনকার্যের প্রভাব ইচ্ছামত দেশ শাসনের জন্য আবিষ্কৃত তাঁহার বিভিন্ন মহৎ

কার্য পরিচালক হিসাবে

পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে প্রকাশ পায়। সেনাবিভাগে সরাসরি লোক ভর্তি, রাষ্ট্রীয় অশ্ব চিহ্নিতকরণ ও নগদ বেতনের নীতি, বাজার নিয়ন্ত্রণ, রেশন ব্যবস্থা চালু ও পারমিট প্রদান করা, ব্যবসায়ীদের নাম তালিকাভুক্ত করা এবং এইরূপ আরও ডজন খানেক ব্যবস্থাদি নিঃসন্দেহে সুলতানের উদ্ভাবনশক্তি প্রমাণ করে। আলাউদ্দিনই ছিলেন প্রথম সুলতান, যিনি ভূমি জরিপ, স্থানীয় সরকার এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য আইন প্রণয়ন করেন।

শাসক হিসাবে

একজন অসাধারণ শাসক হিসাবে আলাউদ্দিন তাঁহার যোগ্যতা প্রমাণ করেন। রাষ্ট্রের বিপজ্জনক ব্যক্তিবর্গকে তিনি অংকুরেই বিনষ্ট করিয়া দেন। তিনি সাফল্যের সাথে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং সালতানাতের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন ঃ "নজিরবিহীন তেজস্বিতার সাথে আলাউদ্দিন বিশ বৎসর হিন্দুস্থান শাসন করেন এবং তাঁহার রাজ্যের সীমান্ত বিস্তৃত করেন।" একমাত্র শাসক হিসাবেই আলাউদ্দিন তাঁহার পূর্বপুরুষদের মধ্যে সবার উপরে স্থানলাভ করেন।

মানুষ হিসাবে

সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ সুলতানের ব্যক্তিগত দিক সম্পর্কে খুব কমই আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র ও গুণাবলির উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন। সাহিত্যিক শিক্ষা ধরিতে গেলে সুলতানের তাহা মোটেই ছিল না। জিয়াউদ্দিন বারানী বলেন ঃ "সুলতানের লেখাপড়া মোটেই ছিল না এবং তিনি না পড়িতে জানিতেন, না লিখিতে জানিতেন।"[৪৮] ঐতিহাসিক ফিরিস্তা দাবি করেন . ঃ "তাহার শেষ বয়সে তিনি যে স্বয়ং গুপ্তচরদের বিবরণাদি পড়িতেন, ইহা সন্দেহের ব্যাপার।" কিন্তু অশিক্ষিত হইলেও আলাউদ্দিন যথেষ্ট সাধারণ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন, যাহা তাঁহার বয়সের সাথে সাথে অনেক গুণ বাড়িয়া যায়। তাঁহার পরামর্শদাতা ছিলেন, কিন্তু নিজে কখনও পরামর্শদাতাদের অধীনে ছিলেন না। তিনি একজন স্বেচ্ছাচারী লোক ছিলেন এবং কোন বিষয়ে তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া গেলে আর কাহারও পরামর্শ কানে নিতেন না। তবুও জটিল সমস্যাগুলিতে তিনি তাঁহার অভিজাতবর্গের সাথে আলোচনা করিতেন।

নৈতিক চরিত্র

আলাউদ্দিনের কোন প্রেমিক ছিলেন না। তাঁহার একাধিক মহিষী ছিলেন, কিন্তু তিনি কোন মহিষীর বা নারীর প্রভাবে ছিলেন বলিয়া মনে হয় না।[৪৯] মধ্যযুগে যখন নারী, মদ ও গান-বাজনাই ছিল যুগের ধর্ম, তখনও আলাউদ্দিন কখনও একজন লাগামহীন স্বৈরাচারী জীবন যাপন করেন নাই। প্রথম জীবনে তিনি কিছু কিছু মদ পান করিতেন, কিন্তু শেষ জীবনে তিনি ইহা শুধু ত্যাগ করেন নাই বরং ইহাকে তিনি নিষিদ্ধ করিয়া দেন। মদ্যপান, ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তির বিরুদ্ধে সুলতানের আদেশসমূহ তাঁহার বিশুদ্ধ মনের পরিচায়ক।[৫০]

তাঁহার ধর্মীয় মতামত

জিয়াউদ্দিন বারানী বলেন, আলাউদ্দিন অধার্মিক না হইলেও তিনি একজন ধর্মহীন লোক ছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। যদিও তিনি কোরআন শরীফ পড়িতে পারিতেন না, রমযান মাসের রোযা ঠিকমত পালন করিতেন না, কখনও জুমার নামাযে যান নাই এবং শাসনকার্যে ধর্মীয় হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করেন নাই, তবুও তিনি একজন সত্যিকারের মুসলমান ছিলেন। স্বধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল এবং ধর্মবিরোধী কোন কার্যকলাপ শুনিতে বা করিতে তিনি দিতেন না। আউলিয়া-দরবেশদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। যদিও তিনি ব্যক্তিগতভাবে হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন

আউলিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই, তবুও তাঁহার ঐশ্বরিক ক্ষমতার উপর সুলতানের গভীর আস্থা ছিল। রাজকীয় পরিবারের প্রায় সবাই শেখের শিষ্য ছিলেন। উলুঘ খানের মৃত্যুতে সুলতান অনেক টাকা-পয়সা দান করেন। ঐতিহাসিক ইছামি বলেন, সুলতান শরীয়তের আদর্শ অনুযায়ী কাজ করেন এবং তাঁহার বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে ইসলাম প্রকাশ পায়।

যদিও অশিক্ষিত, সুলতান আলাউদ্দিন সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমির খসরু ও হাসানের ন্যায় বিখ্যাত কবিগণ তাঁহার সভা অলংকৃত করেন। আমির আর-সালান ও কালাহীর ন্যায় বিদ্বান ঐতিহাসিক, আলাউল মুলকের ন্যায় খাঁটি অভিজাত এবং কাজী মুগিসুদ্দিনের ন্যায় খাঁটি আলিমগণ সুলতানকে সদুপদেশ দান করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন।

শিক্ষা ও স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক

সুলতানের আদেশে অনেক দুর্গ নির্মাণ করা হয়, যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল আলাই দুর্গ। সমস্ত পুরাতন মসজিদ তাঁহার সময় মেরামত করা হয়। সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবেক নির্মিত কুতুব মসজিদকে তিনি সম্প্রসারিত করেন এবং মসজিদের প্রাঙ্গণে একটি নূতন মিনার স্থাপন করেন। কিন্তু রাজত্বের গোলযোগের জন্য তিনি ইহাকে সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

তাঁহার নিষ্ঠুরতা

যে শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্ব ও দয়া শিক্ষা দেয়, উহার অভাবই বোধ হয় আলাউদ্দিনের চরিত্রের নিষ্ঠুরতার জন্য দায়ী।[৫১]

কোন রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। 'যালের' নামক স্থানের বিদ্রোহীদের পরিবারদের প্রতি তিনি যে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন, তাহা বিলক্ষণ লজ্জাজনক ও বিরক্তিকর। ডঃ লাল মন্তব্য করেন ঃ "জালালুদ্দিন, ইনাত খান, ওমর খান ও মঙ্গু খান-এর হত্যা এবং উলুঘ খানকে গোপনে বিষপ্রয়োগ সুলতানের সম্পূর্ণ অমানবিক প্রকৃতির পরিচয় বহন করে।"[৫২] সুলতান খুবই প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন। শত শত নিরাপরাধ লোক নিহত হয় শুধু এই কারণে যে, সুলতান তাহাদিগকে দোষী বলিয়া মনে করেন। সুলতান জালালুদ্দিনের যেসব অভিজাতবর্গ (Jalali nobles) তাঁহাকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে শাস্তি দিবার মত বড় নৃসংশতা আর কোথাও হয় না। পরবর্তীকালে তাঁহাদের কিছু সংখ্যককে তিনি বন্দি করেন এবং কিছু সংখ্যককে হত্যা করেন।

সচরাচর বিশ্বাস করা হয় যে, আলাউদ্দিন স্থায়ী কোন কিছু রাখিয়া যান নাই। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বশির দিবানের মতানুসারে ঃ "আলাউদ্দিনের সরকারের কোন শক্ত ভিত্তি ছিল না এবং আলাই শাসনের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্যই খিলজী বংশকে সহজেই স্থানচ্যুত করা সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার সরকার ছিল একনায়কত্বের সরকার এবং স্যার যদুনাথ সরকার যেমন মন্তব্য করেন ঃ "ব্যক্তিগত ইচ্ছার একটি সরকার প্রকৃতিগতভাবেই অনিশ্চিত। আলাউদ্দিনের শাসন শক্তির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত, জন-সাধারণের ইচ্ছার উপরে নহে।" সুলতান দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে অবহেলা করেন,

আলাউদ্দিনের শাসনের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা

এবং শুধুমাত্র তাঁহার সামরিক কর্মচারীদের সুবিধার্থে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্ত উৎসাহ ধ্বংস করিয়া দেন। কৃষক শ্রেণীকে তিনি খুব যত্নের মধ্যে রাখেন। তাঁহার বিশাল গুপ্তচর বিভাগ জনসাধারণের জীবন বিষাক্ত করিয়া তোলে। অভিজাতদের প্রতি দমননীতি চালাইবার ফলে তিনি মারা যাইবার পর রাষ্ট্রযন্ত্র জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

আলাউদ্দিন খিলজীর উত্তরাধিকারিগণ ঃ সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর মৃত্যুর পর মালিক কাফুর সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার মৃত্যুর দ্বিতীয় দিবসে কাফুর মৃত সুলতানের একটি উইল হাজির করেন। এই উইল সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খানকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করে এবং তৎপরিবর্তে সুলতানের পাঁচ বৎসর বয়সের

কাফুরের ঔদ্ধত্য

পুত্র শিহাবুদ্দিন ওমরকে সুলতান বলা হয় এবং কাফুরকে শাসনকারী বা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বেচ্ছাচারী করা হয়। অতঃপর ওমরকে সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। মালিক কাফুর তারপর খিজির খান ও সাদী খানকে অন্ধ করিয়া দেন। সুলতানের তৃতীয় পুত্র মুবারককেও অন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বন্দি করা হয়, কিন্তু তিনি পলাইয়া যান। মালিক কাফুর এমনকি আলাউদ্দিনের সমস্ত সমর্থককে সরাইয়া দিতে মনস্থ করেন। পঁয়ত্রিশ দিনের কুশাসনের পর মালিক কাফুর মৃত সুলতানের দেহরক্ষীগণ কর্তৃক নিহত হন। মোবারককে তাঁহার শিশু ভ্রাতার শাসনকর্তা হিসাবে লুক্কায়িত স্থান হইতে আনা হয়। কিন্তু কিছুদিন পর মুবারক ওমরকে অন্ধ করিয়া দেন এবং নিজে কুতুব উদ্দিন মোবারক শাহ উপাধি লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কুতুব উদ্দিন মুবারক শাহ্ ও খিলজী বংশের পতন ঃ মুবারক শাহ্ অতি বীরত্বের সাথে রাজত্ব আরম্ভ করেন। তাঁহার পিতার কঠোর ব্যবহারের ব্যাপারে আপস করিতে তিনি

কুতুব উদ্দিন মুবারক শাহ্

চেষ্টা করেন। তদনুসারে তিনি রাজনৈতিক বন্দিদিগকে মুক্তি প্রদান করেন। যে সমস্ত জমি মৃত সুলতান বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন, সেইগুলি উহাদের মালিকদের হাতে ফেরত দেন এবং বাধ্যতামূলক শুল্ক রহিত করেন।

তাঁহার রাজত্বের সময় মোঙ্গলগণ ভারত আক্রমণ করে নাই। দেবগিরি ও গুজরাটের বিদ্রোহ কার্যকরভাবে দমন করা হয়। এইসব বিজয় দ্বারা মুবারকের বুদ্ধি লোপ পায়।[৫৩] তিনি বাগদাদের খিলাফতের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করেন এবং নিজেকে "ইসলাম ধর্মের সর্বোচ্চ কর্তা, স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভুর খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং 'আল-ওয়াসিক বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। শীঘ্রই সুলতান নিজেকে আমোদ-প্রমোদে নিমজ্জিত করেন। মদ্যপান ও গান-বাজনা সুলতানের একমাত্র অভ্যাস হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার পথের কাঁটা হইতে পারে বিবেচনায় তিনি আলাউদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খানকে হত্যা করেন। খসরু খান শাসনকার্যের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি সুলতানের পদচ্যুতির ষড়যন্ত্র করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার প্ররোচনায় ১৩২০ সালে মুবারক শাহ্ ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

খসরু শাহ ঃ মুবারক শাহের হত্যার পর উজির খসরু নাসিরুদ্দিন 'খসরু শাহ্' উপাধি লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার বংশের লোকেরা তাঁহাকে সিংহাসনে আরোহণে সাহায্য করে বলিয়া তিনি তাহাদের মধ্যে অনেক টাকা-পয়সা বিলি করেন। মৃত সুলতানের পরিবারের লোকদিগকে অপমান করা হয়। মূলত খসরু শাহ একজন হিন্দু ছিলেন। সুতরাং

গাজী মালিক

তিনি হিন্দুদের প্রতি খুবই সহানুভূতি প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার স্বল্পকালীন রাজত্বে হিন্দুদিগকে অনেক আধিপত্য দেওয়া হয়। এইসব কার্যাবলিতে আলাউদ্দিনের অভিজাতবর্গ অসন্তুষ্ট হন এবং সীমান্ত এলাকার শাসনকর্তা গাজী মালিকের সহায়তা প্রার্থনা করেন। দিপালপুর হইতে যাত্রা করিয়া গাজী মালিক খসরুকে দিল্লীতে পরাজিত করেন এবং তাঁহাকে অন্ধ করিয়া হত্যা করেন।[৫৪] যে স্থানে খসরু শাহ্ মুবারক

শাহকে হত্যা করেন একই স্থানে তাহাকে হত্যা করা হয়। যে প্রাসাদ হইতে তিনি মুবারক শাহের মৃত দেহ ফেলিয়া দিয়াছিলেন, একই প্রাসাদ হইতে তাহার মৃতদেহও ফেলিয়া দেওয়া হয়।

আলাউদ্দিনের পরিবারের কোন পুরুষ বংশধর জীবিত না থাকায় অভিজাতবর্গ গাজী মালিককে সিংহাসনে আরোহণ করিতে অনুরোধ করেন। সুতরাং ১৩২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি 'গিয়াসুদ্দিন তুঘলক' উপাধি লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সমস্ত জনসাধারণ ও অভিজাতবর্গ তাঁহাকে দিল্লীর সুলতান বলিয়া মানিয়া লন।

পাদটীকা

১। রেভার্টি ঃ *Journal of the Asiatic Society of Bengal* 1,1875, Part-I
২। কালীকিংকর দত্ত *An Advance History of India* পৃঃ ২৯৬
৩। ঐ।
৪। ঐ।
৫। ঐ।
৬। কে. এস. লাল ঃ *History of the Khaljis.* পৃঃ ৫৩।
৭। কালীকিংকর দত্ত ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৭।
৮। কে. এস. লালঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯।
৯। কাশিম ফিরিশতা ঃ ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস, অনুঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, পৃঃ ২৫৩.
১০। The throne was now secure, and the revenue officers and the keepers of elephants with their elephants, and the Kotwals with the keys of the forts and the magistrates and the chief men of the city came out to Alauddin, and a new order of things now established. His wealth and powers were great, so whether individuals paid their allegiance or whether they did not, mattered little, for the Khutba was read and coins were struck in his name.— জিয়াউদ্দিন বারানী ঃ তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী ঃ ঈশ্বরী প্রসাদ কর্তৃক প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত ঃ পৃঃ ৮৫।
১১। But quite different from uncle in temperament and outlook, the new Sultan tried to combat these odds with indomitable energy, and his efforts were crowned with success.—কালী কিংকর দত্ত ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৯।
১২। ঐ।
১৩। ভি. ডি. মহাজন ঃ *The Muslim Rule in India* পৃঃ ৭২
১৪। কাশিম ফিরিশতা ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৮।
১৫। ঐ।
১৬। কালীকিংকর দত্ত ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০০।
১৭। All this prosperity intoxicated him. Vast desires and great aims far

beyond him formed their germs in his brain, and he entertained fancies which had never occured to any king before him. In his exultation, ignorane and folly, he, quite lost his head forming to most impossible schemes and nourishing the most extravagant desiesr.— V. D. Mahajan: প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪

১৮। Wright : Catalogue of the coins in the Indian Museum Vol II পৃঃ ৮। কালীকিংকর দত্ত কর্তৃক প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩০১।

১৯। কালীকিংকর দত্ত ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০১।

২০। ঐ।

২১। ঐ।

২২। ঐ।

২৩। Alauddin brought to bear upon his methods of administration ability and insight, which we rarely find in men endowed with mere military genius— ঈশ্বরী প্রসাদ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫

২৪। কালীকিংকর দত্ত ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৭

২৫। খুট, মোকাদ্দম, চৌধুরী ইত্যাদি পদবী দ্বারা ভূমি অভিজাত শ্রেণীকে বুঝায়। এই স্থলে এই শব্দগুলি দ্বারা ভূম্যাধিকারী, ভূঞা ইত্যাদিকে বুঝানো হইয়াছে,—ঈশ্বরী প্রসাদ ঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৬

২৬। কে. এস. লাল: *History of the Khaljis* পৃঃ ২৪১

২৭। ঐ।

২৮। ঐ পৃঃ ২৪৬।

২৯। ঐ।

৩০। ঐ।

৩১। ঐ পৃঃ ২৪৬, ২৪৭।

৩২। ঐ পৃঃ ২৪৯।

৩৩। ঐ, পৃঃ ২৪৮।

৩৪। ঐ পৃঃ ২৫০।

৩৫। ঐ, পৃঃ ২৫১, ২৫২।

৩৬। ঐ পৃঃ ২৫২, ২৫৩।

৩৭। 'ইকতা' বা খুতী ভূস্বামীদের শ্রেণীবিশেষ

৩৮। কে. এস. লাল, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫৫।

৩৯। The main difficulty was how to increase the army and maintain it in efficient order, well-maintained, well-armed, well- trained and well-supplied with archers—S. Lane Poole: *Medieval India*

৪০। কে. এস. লাল ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৪, ২৭৫।

৪১। ঐ পৃঃ ২৭৮।

৪২। ঐ পৃঃ ২৭০, ২৭১।

৪৩। কালীকিংকর দত্ত ঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ৩০৯
৪৪। ঐ।
৪৫। ঐ।
৪৬। ঐ পৃঃ ৩০৩।
৪৭। ঐ।
৪৮। জিয়াউদ্দিন বারানীঃ তারিখ-ই-ফিরূজ শাহী, পৃঃ ২৬২ কে. এস. লাল কর্তৃক প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩০৫।
৪৯। কে. এস. লাল ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৭।
৫০। ঐ, পৃঃ ৩০৮।
৫১। ঐ পৃঃ ৩০৬।
৫২। ঐ।
৫৩। ঐ, পৃঃ ৩৩৬।
৫৪। ঐ, পৃঃ ৩৬২।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

K. S. Lal	:	*History of the Khaljis*
Ziauddin Barani	:	*Tarikh-i-Firuz Shahi*
Amir Khasru	:	*Khajain-al-Futuh* (trans. Prof. Habib)
Do	:	*Tughlaq Nawab*
S. Lane Poole	:	*Medieval India*
Elliot and Dowson	:	*History of India As told by its own Historians*
I.H. Qureshi	:	*The Administration of the Sultanat of Delhi*
W. Haig	:	*Cambridge History of India*, Vol III
Ishwari Prasad	:	*A Short History of Muslim Rule in India.*

সপ্তম অধ্যায়
তুঘলক বংশ
(১৩২০-১৪১৩ খ্রিস্টাব্দ)

গিয়াসুদ্দিন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ)

গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের পিতা সুলতান বলবনের রাজত্বকালে ভারতে আগমন করেন এবং পাঞ্জাবের এক জাঠ মেয়েকে বিবাহ করেন। স্বীয় যোগ্যতা ও ক্ষমতাবলে গিয়াসুদ্দিন রাজ্যের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। বৃদ্ধ বয়সে সুলতান হওয়া পর্যন্ত তিনি সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর অধীনে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা থাকাকালে দিল্লী সালতানাতের সীমান্ত অঞ্চলকে সদা আগত মোঙ্গল আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করেন।[১]

প্রাথমিক জীবন

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর মৃত্যুর সাথে সাথে দূরবর্তী প্রদেশসমূহ দিল্লী সালতানাতের প্রতি তাহাদের আনুগত্য স্বীকার বন্ধ করিয়া দেয়। বিশৃঙ্খলার যুগে শাসনযন্ত্রের কার্যকলাপ ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু গিয়াসুদ্দিন তুঘলক নিজেকে সেই অবস্থার জন্য যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণ করেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সম্পত্তির দাবি ও জায়গীরগুলির তদন্ত করিবার জন্য সুলতান তুঘলক এক আদেশ জারি করেন। সমস্ত বেআইনী দানসমূহ বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রদেশসমূহে তিনি সৎ চরিত্রের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং রাজস্ব দাবি মোটামুটি উৎপন্ন দ্রব্যের দশ ভাগের এক ভাগ বা এগারো ভাগের এক ভাগ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি রাজস্বের বোঝা হাল্কা করেন। কৃষিকার্য বিশেষ প্রেরণা লাভ করে এবং এই ব্যাপারে সমস্ত সুযোগ-সুবিধাদি প্রদান করা হয়। বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের সংস্কার করা হয়। ফলে দেশে নিরাপত্তা ফিরিয়া আসে। তৎসঙ্গে তিনি শিল্প, সাহিত্য ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিরও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ডাকবিভাগকে পুনর্গঠন করা হয় এবং সৈন্যবিভাগকে সুদক্ষ ও সুশৃঙ্খল করা হয়। দিল্লীর নিকটে তিনি 'তুঘলকাবাদ' নামে একটি শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করেন।

দিল্লীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করিয়া সুলতান দূরবর্তী প্রদেশসমূহে তাঁহার আধিপত্য নিশ্চিত করিতে মনোযোগ দেন। দাক্ষিণাত্যে বরঙ্গলের কাকাতিয়া রাজা দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্রদেব দিল্লীর সুলতানকে কর দিতে অস্বীকার করেন। গিয়াসুদ্দিন তুঘলক তাঁহার পুত্র যুবরাজ জুনা খানকে এই রাজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যুবরাজ তাঁহার প্রথম অভিযানে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু দ্বিতীয় অভিযানে একই যুবরাজ সমগ্র কাকাতিয়ার দেশ জয় করেন।

বরঙ্গল জয়

ইতোমধ্যে সুলতান স্বয়ং বাংলাদেশ অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন। ১৩১৮ সালে শামসুদ্দিন

ইলিয়াস শাহ্‌র মৃত্যুর পর বাংলাদেশে তাঁহার পুত্রদের মধ্যে তখন গৃহযুদ্ধ চলিতেছিল। সুলতান এই গোলমাল মিটাইয়া দেন এবং সুদূর সোনারগাঁও (ঢাকা) পর্যন্ত অগ্রসর হন ও তিরহুত অধিকার করিয়া ফিরিয়া আসেন।

বাংলাদেশ অধিকার

বাংলাদেশ হইতে প্রত্যাগমনকারী সুলতানকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে যুবরাজ জুনা খান তুঘলকাবাদের নিকটবর্তী আজমপুরে একটি কাঠের মণ্ডপ নির্মাণ করেন। তথায় অপেক্ষমাণ হস্তীদলের ধাক্কায় মণ্ডপ ভাঙ্গিয়া পড়িলে বৃদ্ধ সুলতান ১৩২৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[২] তাঁহার মৃত্যুর কারণ লইয়া মতভেদ আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, সুলতানকে হত্যা করিয়া তাড়াতাড়ি ক্ষমতা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যুবরাজ জুনা কর্তৃক পূর্বক্ষণে গৃহীত ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ এই মণ্ডপ ভাঙ্গিয়া পড়ে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, বজ্রপাতের ফলে মণ্ডপ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যু

সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলক দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন খাঁটি ও খোদাভীরু লোক ছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা দ্বারাই তিনি এরূপ চরিত্রের অধিকারী হন। এই ব্যাপারে তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষগণ হইতে বিসদৃশ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত কোমল স্বভাবের লোক ছিলেন। "তাঁহার দরবার একমাত্র বলবন ছাড়া আর সমস্ত সুলতানের চেয়ে কঠোর ছিল।"

মুহাম্মদ বিন তুঘলক
(১৩২৫-১৩৫১ খ্রিঃ)

সিংহাসনে আরোহণ ঃ গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর তিন দিন পর যুবরাজ জুনা খান মুহাম্মদ বিন তুঘলক উপাধি লইয়া নিজেকে সুলতান বলিয়া দাবি করেন। আফগানপুরে চল্লিশ দিন অতিবাহিত করিবার পর তিনি দিল্লীর পথে যাত্রা করেন এবং অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণে কেউ কোন বিরোধিতা করে নাই। সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি অভিজাতবর্গ ও জনসাধারণের মধ্যে অবর্ণনীয় স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করেন।[৩]

প্রাথমিক গোলযোগঃ

খেতাব ও স্বর্ণমুদ্রা বিতরণের মাধ্যমে সুলতান অসন্তুষ্ট অভিজাতবর্গ ও সাধারণ মানুষের মুখ বন্ধ করিলেও ১৩২৭ সালে মুলতানের শাসনকর্তার বিদ্রোহের সাথে সাথে সাম্রাজ্যে গোলযোগ আরম্ভ হয়। প্রায় একই সময় চাগতাই মোঙ্গলদের প্রধান তারমিশিরিন এক বিশাল বাহিনী লইয়া দিল্লী অভিমুখে অভিযান করেন। সুলতান মুলতানের শাসনকর্তাকে দমন করেন এবং বিপুল পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে তিনি মোঙ্গলদিগকে প্রতিহত করেন।

তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনাসমূহ ঃ

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক এমন এক চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন যাহা সমসাময়িক যুগের জন্য ছিল অচল। জনসাধারণ ও দেশের উন্নতির জন্য সরল উদ্দেশ্য লইয়া তিনি কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তাঁহার বিভিন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনাসমূহ হইল—

(ক) দিল্লী হইতে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর;
(খ) তথাকথিত খোরাসান অভিযান;
(গ) মুদ্রা সংস্কার;
(ঘ) তথাকথিত চীন অভিযান;
(ঙ) দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি।

এই সমস্ত পরিকল্পনার কার্যকারিতা লইয়া পক্ষে বিপক্ষে অনেক আলোচনা হইয়াছে। একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে বুঝা যায়, পরিকল্পনাগুলি কতদূর সুফলদায়ক ছিল এবং কতদূর অবাস্তব ছিল।

(ক) দিল্লী হইতে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর ঃ (১৩২৭-১৩২৯) ঃ ১৩২৭ সালে সুলতান দিল্লী হইতে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের আদেশ দেন এবং দেবগিরির নাম পরিবর্তন করিয়া দৌলতাবাদ রাখেন—উত্তর ভারত হইতে দক্ষিণে রাজধানী সরাইয়া নেন। দিল্লীর অধিবাসীদিগকে কষ্ট দিবার জন্য এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় বলিয়া কেউ কেউ মন্তব্য করেন। প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার পিছনে কতকগুলি জোরালো যুক্তি ছিল। প্রথমত, সেই সময় সাম্রাজ্যের পরিধি প্রায় সমগ্র ভারত জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল, কিন্তু রাজধানী হিসাবে দিল্লী সর্ব উত্তর প্রান্তে অবস্থিত; অপরদিকে দৌলতাবাদ সমগ্র ভারতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং সীমান্ত হইতেও অনেক গভীরে অবস্থিত। দ্বিতীয়ত, সদা সংঘটিত মোঙ্গল আক্রমণের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য আরও সুকৌশলে পরিবৃত রাজধানীর প্রয়োজন হয়। মোঙ্গলদের হাত হইতে দিল্লী যেরূপ নিকটবর্তী, দৌলতাবাদ অনুরূপ নহে। তৃতীয়ত, নববিজিত দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজন্যবর্গ সর্বদা বিদ্রোহাত্মক মনোভাব পোষণ করে। বিজয়ী বাহিনী সেই এলাকা ছাড়িয়া আসা মাত্রই তাহারা বিদ্রোহ করে, এবং তাই সুলতানের উপস্থিতি সেইখানে একান্তই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া সুলতান নূতন রাজধানীকে তাঁহার রাজকর্মচারীদের মনঃপূত করিবার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।[৪] কিন্তু পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত করিতে গিয়া সুলতান মারাত্মক ভুল করেন। পরিকল্পনা কার্যকর করিবার ব্যাপারে তিনি অতিরিক্ত তাড়াহুড়া করেন। তিনি শুধু রাজধানী স্থানান্তর করিয়া সুখী হন নাই, বরং দিল্লীর জনসাধারণকেও তথায় স্থানান্তর করেন। তবে ইবনে বতুতার মন্তব্য ঃ "এমনকি কুকুর-বিড়ালকেও স্থানান্তর না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই," এবং ইছামির অভিমত যে, "বৃদ্ধ, অন্ধ ও শিশুদিগকেও দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে টানিয়া নেওয়া হয়—" ইত্যাদির নিশ্চয়ই কোন ভিত্তি নাই। বারানীর মতানুসারে ঃ "বাস্তুত্যাগীদের যাওয়া-আসা উভয় পথেই সুলতান তাহাদের প্রতি উদারতা ও অনুকম্পার ব্যাপারে খুবই অনুগ্রহশীল ছিলেন।"

পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হইবার কারণ

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুলতানের ব্যর্থতার বিভিন্ন কারণ রহিয়াছে। অনেকগুলি কারণের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণসমূহ সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ

প্রথমত, যে সমস্ত সাধারণ মানুষ দিল্লী ত্যাগ করেন, তাঁহারা পুরুষানুক্রমে দিল্লীর অধিবাসী ছিলেন এবং পূর্বের অনেক স্মৃতি এই নগরীর সাথে জড়িত ছিল।[৫] তাই তাঁহারা ভগ্নহৃদয়ে দিল্লী ত্যাগ করেন এবং কিছুদিন পরেই তাঁহারা দিল্লী ফিরিয়া যাইবার জন্য ছটফট করিতে থাকেন।

দ্বিতীয়ত, দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজাদের ন্যায় উত্তর ভারতের হিন্দু রাজাগণও সুলতান ও তাঁহার সেনাবাহিনীর অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেন। অনেক জায়গায় তাঁহারা অবাধ্যতার চিহ্ন প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন।

তৃতীয়ত, মোঙ্গল আক্রমণ সুলতানকে জ্বালাতন করিতে থাকে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের সেনাবাহিনীকে উত্তর ভারতের সীমান্ত প্রহরার জন্য পাঠানো খুবই দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

সুলতান এই পরিকল্পনার বোকামি বুঝিতে সক্ষম হন এবং রাজধানী পুনরায় দিল্লীতে স্থানান্তরের আদেশ দেন। কিন্তু ৭০০ মাইলের এই কষ্টকর ভ্রমণের পর খুব কম লোকই জীবিত থাকে। দিল্লী ইহার পূর্বেকার উন্নতি ও জাঁকজমক হারাইয়া ফেলে। ১৩৩৪ সালে ইবনে বতুতা দিল্লীর কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত অবস্থায় পান। এইভাবেই স্যার লেনপুলের মন্তব্য অনুসারে—"দৌলতাবাদ ছিল ভুলপথে পরিচালিত ক্ষমতার একটি স্মৃতিচিহ্ন।" (Daulatabad was a monument of misdirected energy)

রাজধানী প্রনঃ পরিবর্তন

(খ) তথাকথিত খোরাসান অভিযান (১৩২৯-১৩৩২) ঃ পারস্যের একটি অংশ খোরাসানের স্থানীয় কুশাসনে তথায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের প্রথমদিকে কিছু খোরাসানী অভিজাতবর্গ তাঁহাকে এই বিদ্রোহের সুযোগে খোরাসানে একটি অভিযান পরিচালনা করিবার পরামর্শ দেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পারস্যের একটি অংশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকাটা সুলতানের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল। তবে ঐতিহাসিক বারানী অভিযোগ করেন যে, কিছু সংখ্যক খোরাসানী ও ইরাকী মোঙ্গল অভিজাতবর্গ ভারতে আসিয়া সুলতানকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করিয়া লয়।[৬] সুলতান এই উদ্দেশ্যে ৩,৭০,০০০ সৈন্য ভর্তি করেন এবং এক বৎসর তাহাদিগকে ভরণ-পোষণ প্রদান করেন। একটি অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনার নিমিত্ত এতগুলো অর্থ ব্যয়ের জন্য কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহার সমালোচনা করেন। তবে বাল্খ্ ও বাদাখসান জয় করিবার নিষ্ফল চেষ্টার জন্য ঐতিহাসিকদের কেহই সুলতানকে দোষী বলিয়া মনে করেন না। যাহা হউক, এক বৎসর প্রস্তুতির পর সুলতান এই অভিযানের দুরূহতার কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া জ্ঞানের পরিচয় দেন। কতকগুলি বিশেষ কারণে সুলতান এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন ঃ

প্রথমত, ইরান, মিসর ও ট্রান্সঅক্সিয়ানার কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে ব্যাপক পরিবর্তনের কারণে ইরানের আবু সাঈদ ও মিশরের আল-নাসের-এর মধ্যে বন্ধুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং চাগতাই মোঙ্গল প্রধান তারমশিরিনের ক্ষমতাচ্যুতি। ফলে সুলতান আবু সাঈদের বিরুদ্ধে যে সমঝোতা হইয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। আন্তর্জাতিক এই সমঝোতা ভাঙ্গিয়া যাইবার ফলে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পক্ষে একাকী এই অভিযানে নির্গত হওয়া সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয়ত, ভৌগোলিক ও যানবাহনের সমস্যা এই অভিযানের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। একটি বিরাট সেনাবাহিনীকে হিন্দুকুশ বা হিমালয় পর্বতমালা অতিক্রম করানো খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

বরঙ্গলের জয়

তৃতীয়ত, এত বড় বিশাল বাহিনীর জন্য অত দূরদেশে রসদপত্র যোগান দেওয়াও ছিল এক কঠিন ব্যাপার। অধিকন্তু ভারতের সেনাবাহিনী মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ বিকটাকার সেনাবাহিনীর সাথে শারীরিক ও অস্ত্রশস্ত্রের দিক হইতে কতদূর আঁটিয়া উঠিতে পারিবে তাহাও চিন্তা করিবার ব্যাপার।[৭]

(গ) মুদ্রা সংস্কার (১৩২৯-১৩৩২) ঃ তাম্রের প্রতীক মুদ্রা প্রবর্তন ছিল সুলতানের সবচাইতে দুঃসাহসিক পরিকল্পনা। বিশিষ্ট মুদ্রাবিশেষজ্ঞ এডওয়ার্ড থমাস মুহাম্মদ তুঘলককে 'টাকা নির্মাতার রাজা' (Prince of Moneyers) হিসাবে বর্ণনা করেন। থমাস বর্ণনা করেন ঃ "তাঁহার রাজত্বের প্রথম দিকের একটি কাজ ছিল বহুমূল্য ধাতুর পরিবর্তিত মূল্যের সাথে মুদ্রার বিভাগগুলিকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার জন্য মুদ্রার পুনঃসংস্কার করা এবং নিকৃষ্ট প্রচলিত মুদ্রার নূতন ও আরও অধিক সাদৃশ্য মুদ্রা উদ্ভাবন করা।"[৮] চীন ও পারস্যে এই ধরনের মুদ্রার প্রচলন ছিল। অধিকন্তু সেই সময় আন্তর্জাতিক বাজারে বিপুল স্বর্ণ ঘাটতি দেখা দিয়াছিল। তাই স্বর্ণ মওজুদ করিয়া রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধিশালী করাটাও সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং স্বর্ণ ও রৌপের ন্যায় প্রতীক তাম্র মুদ্রার প্রচলন অনুমোদন করিয়া সুলতান একটি ফরমান জারি করেন।

রৌপ্য মুদ্রার সমমান বিশিষ্ট তাম্র মুদ্রা প্রচলন করিবার ব্যাপারে আমাদের বর্তমান কাগজের মুদ্রার মূলনীতিই গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করে নাই। কারণ, তাঁহার সরকার বিপুল পরিমাণে মুদ্রা জাল বন্ধ করিতে ব্যর্থ হয়।[৯]

মূলনীতি ফলাফল

পরবর্তীকালে প্রতীক তাম্র মুদ্রার সংখ্যা অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। ফলে জনসাধারণ প্রতীক মুদ্রা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। যেহেতু জনসাধারণকে ঠকাইবার কোন উদ্দেশ্য সুলতানের ছিল না, তাই তিনি প্রতীক মুদ্রার বিনিময়ে রৌপ্য মুদ্রা দিয়া দিতে আদেশ দেন। অতএব এই ব্যাপারে সরকারই হয় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

ব্যর্থ হইবার কারণ

উচ্চমানের সদুদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত কারণসূহের জন্য পরিকল্পনাটি কার্যকর হয় নাই—

১। পরিকল্পনাটি সেই যুগের জনসাধারণের বোধগম্যের বাহিরে ছিল, তাই তাহারা ইহার মাহাত্ম্য বুঝিতে সক্ষম হয় নাই।

২। ভারতে মুসলিম শাসনের প্রথানুযায়ী পরিবর্তনশীলতা, যেখানে এক বংশ অতি শীঘ্রই আরেক বংশের স্থলাভিষিক্ত হয়। ফলে প্রতীকী মুদ্রা প্রচলনের মত গ্রহণযোগ্যতা বা আস্থা সুলতানের উপর মানুষের ছিল না।

৩। জালিয়াতি বন্ধ করিবার ব্যাপারে সঠিক সাবধানতার অভাব। চীনের কাগজের মুদ্রার ন্যায় এই দেশে তাম্র মুদ্রার অকৃত্রিমতার জন্য কোন বিধিনিষেধ ছিল না। ফলে বাজারে বিপুল পরিমাণে জাল মুদ্রা ছড়াইয়া পড়ে। প্রত্যেক হিন্দু বাড়ি টাঁকশালে পরিণত হয় এবং বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুরা লক্ষ কোটি তাম্র মুদ্রা তৈয়ার করে।

কেউ কেউ বলিয়া থকেন সুলতানের শূন্য কোষাগার পূরণ ও দেউলিয়াপনা দূর করিবার জন্য সুলতান তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। বস্তুত দেউলিয়াপনা দূর করিবার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই; বরং এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ফলেই দেউলিয়াপনা আসে। ইতোপূর্বে টংকার রৌপ্য ইহার স্বাভাবিক মূল্য হইতে অনেক কমাইয়া ফেলা হয়; কিন্তু জনসাধারণ

তাহাতে কোন আপত্তি করে নাই। সুতরাং তিনি মনে করেন, প্রতীক মুদ্রাও সাফল্য লাভ করিবে। সেই যুগের রৌপ্য ঘাটতি হইতেও তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

(ঘ) তথাকথিত চীন অভিযান (১৩২৯-১৩৩২) ঃ সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক কখনও চীন জয়ের আশা পোষণ করেন নাই। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বারানী বলেন— ভারত ও চীনের মধ্যবর্তী কারাচল পর্বত জয় করাই ছিল সুলতানের পরিকল্পনা। দিল্লী হইতে দশ মঞ্জিলে ইহা অবস্থিত। কারাচল বা কারাচিলের অধিপতি ছিলেন একজন শক্তিশালী রাজপুত রাজা। আগা মেহদী হোসেন বলেন, বিশ্বপর্যটক ইবনে বতুতা কারাচিল বলিতে সম্ভবত কূর্মাচল বুঝাইয়াছেন, যাহার অত্যন্ত শক্তিশালী শাসক ছিলেন একজন রাজপুত। ইহা কুমাউন-গাড়ওয়াল অঞ্চলে অবস্থিত মধ্য হিমালয়ের একটি জনপদ। ইহার উপর দিল্লীর সুলতানদের কখনও কোন আধিপত্য ছিল না। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইহা চাঁদ বংশের নিয়ন্ত্রণে ছিল। দিল্লী সালতানাতের অবাধ্য ব্যক্তিবর্গ এইখানে আশ্রয় লইতেন। ঘটনাদৃষ্টে মনে হয়, সুলতান বেশ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা লইয়াছিলেন।[১০]

সুলতানের পরামর্শ অনুযায়ী অভিযানের সেনাপতি খসরু মালিক সতর্কতার সাথে অগ্রসর হন এবং যৌক্তিক দূরত্বে একাধিক ঘাঁটি স্থাপন করেন। রাজকীয় বাহিনী প্রাথমিকভাবে বেশ সাফল্য অর্জন করে এবং জুদিয়া সহ হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত মূল্যবান এলাকা দখল করে। অতঃপর তাহারা আরও উপরে উঠিয়া ওয়ারাঙ্গল দখল করে। প্রাথমিক সফলতায় উজ্জীবিত হইয়া খসরু মালিক সুলতানের উপদেশ অমান্য করিয়া সমস্ত সৈন্য একযোগে বিন্যাস করিয়া তিব্বতে গিয়া হাজির হন। সেইখানে অতঃপর বর্ষা আরম্ভ হইয়া যায় এবং ব্যাপক আকারে প্লেগ রোগ দেখা দেয়। ইহাতে সৈন্যদের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হয় এবং এই হতোদ্যম অবস্থায় শত্রুসৈন্যরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে প্রায় ৮০,০০০ সৈন্যের মধ্যে মাত্র কয়েক হাজার সৈন্য ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হয়। অবশিষ্ট সব সৈন্য নিহত হয়।[১১] তবে পার্বত্য রাজা সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করায় এই অভিযানের উদ্দেশ্য সফল হয়।

(ঙ) দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি (১৩৩৩-১৩৩৪) ঃ গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকাকে দোয়াব অঞ্চল বলা হয়। ভূমির উৎপাদন শক্তি অধিক হওয়ায় ইহা খুবই উর্বর। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, জমির উর্বরা শক্তি নহে, বরং দোয়াব অঞ্চলের বিদ্রোহী প্রজাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবার জন্য সুলতান সেই অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন। জিয়াউদ্দিন বারানী বলেন, "কর বৃদ্ধির এই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হইয়াছিল জনসাধারণকে ধ্বংস ও অবনতির মুখে ঠেলিয়া দিবার জন্য।" কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা তেমন নহে। তুঘলক বংশের গবেষক আগা মেহদী হোসেন বলেন, "খোরাসান ও কারাচিল অভিযানে এবং প্রতীকী মুদ্রার পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবার দরুন সাম্রাজ্যের অর্থনীতিতে বিরাট ধস নামে এবং এই ধ্বসকে সামাল দিবার জন্য দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করা হয়।[১২] কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে ঃ সামরিক সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং শাসনকার্যকে সুযোগ্য করিবার জন্য মুহাম্মদ ইবনে তুঘলক কর বৃদ্ধি করেন।

কর বৃদ্ধির হার ঃ সাধারণ বর্ণনানুযায়ী, ১০ হইতে ২০ গুণ খাজনা বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু ইহাকে কিছুটা বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হয়। ফিরিস্তা বিরোধিতা করিয়া বলেন, "কর ৩

হইতে ৪ গুণ বৃদ্ধি করা হয়। বাদাউনির মতানুসারে, খাজনা দ্বিগুণ করা হয়। কিন্তু ইহাও সত্য বলিয়া মনে হয় না। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক বলেন, কর বৃদ্ধিটা মূলত খুব বেশি ছিল না এবং শতকরা ৫০ ভাগের বেশি মোটেই ছিল না। আলাউদ্দিন খিলজীর সময়ও এইভাবে কর বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। তবে সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলক শতকরা ১০ ভাগ কর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলক শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সুলতান ফিরূয শাহ পুনরায় ১০ ভাগে নামাইয়াছিলেন। [১৩]

দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অঞ্চলে যখন দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল, ঠিক তখনই পরিকল্পনাটি কাজে লাগানো হয়। অন্যথায় এই পরিকল্পনায় বিশেষ কোন অসুবিধা হইবার কথা নহে। কিন্তু

প্রজাসাধারণের দুর্ভোগের কারণ

চাষীদিগকে টাকা ঋণ দিয়া, কূপ খনন করিয়া, কর্ষিত জমিগুলি রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় চাষের বন্দোবস্ত করিয়া ও আর্থিক সাহায্য দ্বারা সুলতান চাষীদের সহায়তার বন্দোবস্ত করেন।

সুলতানের পরিকল্পনাসমূহের পরিণাম ঃ সমস্ত জনহিতকর আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাসমূহ ব্যর্থ হয়। এইসব পরিকল্পনা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া দেয় এবং দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে। সর্বদা নূতন নূতন পরিকল্পনার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে জনসাধারণ ধৈর্য হারাইয়া ফেলে এবং মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজশাসনের উপর বিরক্ত হইয়া উঠে। সুলতানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের মাধ্যমে এই ধৈর্যচ্যুতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে।[১৪]

বিদ্রোহ ঃ কিছুসংখ্যক উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক সুলতানের জনপ্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন অঞ্চল হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করে। ১৩৩৫ সালে জালাল উদ্দিন আহসান শাহ মাবারে বিদ্রোহ করেন। সুলতান স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে অভিযান করেন এবং বরঙ্গলের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু রাজকীয় শিবিরে হঠাৎ মহামারী দেখা দিবার ফলে

মাবার

সুলতান দৌলতাবাদে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। এইভাবে জালালুদ্দিন নির্বিঘ্নে টিকিয়া থাকেন এবং ১৩৭৭ সালে মাবার সম্পূর্ণভাবে বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পাঞ্জাব

দিল্লী হইতে সুলতানের অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমির হালাযুন পাঞ্জাবে বিদ্রোহ করেন এবং লাহোরের শাসনকর্তাকে হত্যা করেন। দাক্ষিণাত্য হইতে সুলতান কর্তৃক প্রেরিত দুইজন সাহায্যকারী লইয়া খাজা জাহান দিল্লী হইতে পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হন। হালাযুন পরাজিত হন এবং লাহোর পুনরায় সুলতানের হস্তগত হয়।

বাংলা

শীঘ্রই ১৩৩৮ সালে বাংলার শাসনকর্তা ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ দিল্লী সুলতানের বশ্যতা অস্বীকার করেন। সেই সময় সুলতান অন্যান্য গোলযোগ লইয়া ব্যস্ত থাকায় তিনি বাংলার বিদ্রোহের প্রতি নজর দিতে পারেন নাই এবং এইভাবে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়।

অযোধ্যা

সালতানাতের অন্যান্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে অযোধ্যা ও জাফরাবাদের শাসনকর্তা আইনুল মুলক ১৩৪০-৪১ সালে বিদ্রোহ করেন।

১৩৪২ সালের শেষের দিকে সমস্ত বিদ্রোহ দমন করা হয়। কিন্তু এইগুলি রাষ্ট্রের সম্পদ ও সুলতানের উৎসাহ ধ্বংস করিয়া দেয়।

এইরূপ দায়গ্রস্ত অবস্থায় সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক খলিফা উপাধি ধারণ করিবার

খলিফা উপাধি ধারণ জন্য মিশরের আব্বাসীয় খলিফার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। যথাসময়ে সুলতান অনুমতি পান, এবং খুৎবা ও মুদ্রায় তাঁহার উপাধি খলিফা বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

বিভিন্ন দিক হইতে সুলতান অসংখ্য বিপত্তির মধ্যে ব্যস্ত থাকেন। দাক্ষিণাত্যের তেলিঙ্গানায় হোইসালা রাজা তৃতীয় বীর বল্লালের নেতৃত্বাধীনে হিন্দুরা মুসলমানের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন গড়িয়া তোলে। কৃষ্ণ নদীর আশেপাশেও এরূপ একটি আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের ফলে দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

বিজয় নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা

১৩৪৭ সালে বিদেশী আমিরগণ দেবগিরি বা দৌলতাবাদে বিদ্রোহ করেন এবং এইভাবেই আবুল মুজাফ্ফর আলাউদ্দিন বাহমন শাহ কর্তৃক বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। সালতানাত-এর অবস্থা এরূপ হইয়া দাঁড়ায় যে, বিদ্রোহীদের পিছনে পিছনে সুলতানকে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় প্রতিনিয়ত ছুটাছুটি করিতে হয়।

বাহমনী রাজ্য প্রতিষ্ঠা

মৃত্যু এইভাবে বিদ্রোহীদের পিছনে ছুটিতে ছুটিতে ১৩৫১ সালে সুলতান সিন্ধুতে পরলোকগমন করেন।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র বিশ্লেষণ ঃ ১৩২৫ সাল হইতে ১৩৫১ সাল পর্যন্ত সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিল্লী সালতানাতে রাজত্ব করেন। তাঁহার ন্যায় একজন জটিল ও পরস্পরবিরোধী সুলতানের চরিত্র বিশ্লেষণ করা খুব সোজা ব্যাপার নহে। বারানী মন্তব্য করেন," আমি মন্তব্য না করিয়া পারি না যে, সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন সৃষ্টির এক মহাবিস্ময়। তাঁহার পরস্পরবিরোধী গুণাবলি ছিল বিদ্যা ও সাধারণ জ্ঞানের নাগালের বাহিরে।"

সুলতান যুগের সমস্ত কুঅভ্যাস হইতে মুক্ত ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ছিল সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর। ইবনে বতুতার মতানুসারে, তিনি ছিলেন "খুবই নম্র ব্যক্তি এবং ন্যায় ও সৎ কাজের প্রতি সদা আগ্রহশীল।" ইবনে বতুতা আরও বলেন, "তাঁহার গুণাবলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল উদারতা।"

ব্যক্তিগত জীবন

মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁহার যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও গুণান্বিত মনীষী। ডঃ কালীকিংকর দত্ত বলেন ঃ "তীক্ষ্ণবুদ্ধি, আশ্চর্য মেধা ও জ্ঞানার্জনের উজ্জ্বল ক্ষমতার অধিকারী মুহাম্মদ বিন তুঘলক যুক্তিবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র, গণিতবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞানের ন্যায় বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী ছিলেন।[১৫] প্রাচীন ফার্সি ভাষার সঙ্গে তাঁহার নিবিড় যোগাযোগ ছিল এবং স্বয়ং একজন শ্রেষ্ঠ ফার্সি শ্লোক রচয়িতা ছিলেন। তিনি একজন সুন্দর ক্যালিগ্রাফী (calligraphy) লেখক ছিলেন। বারানী ও অন্যান্য লেখকগণ তাঁহাকে একজন মহাবিদ্বান হিসাবে প্রশংসা করেন। পদার্থবিদ্যার সঙ্গে তাঁহার গভীর যোগাযোগ ছিল। ঐতিহাসিক স্যার এল্‌ফিন্সটোন (Elphinstone) বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ বিন তুঘলক "কোন অসাধারণ রোগের লক্ষণ দেখিবার জন্য স্বয়ং রোগীদের দেখাশুনা করেন।" তিনি তাঁহার যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা ও গুণান্বিত নৃপতি ছিলেন।

ধর্মীয় ব্যাপারে

ধর্মীয় কর্তব্যের ব্যাপারে সুলতান খুবই সতর্ক ছিলেন। এল্‌ফিন্সটোন (Elphinstone) বলেন ঃ "উপাসনার ব্যাপারে তিনি নিয়মিত ছিলেন, মদ্যপান করিতেন না এবং ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সমস্ত ধর্মীয় নৈতিক বিধি বিধান মানিয়া চলিতেন।"[১৬] কোন কোন লেখক তাঁহাকে ধর্মহীনতা এবং সাধু ও বিদ্বান লোকদের হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করেন, কিন্তু ইবনে বতুতা দাবি করেন, "তিনি ঐকান্তিকতার সহিত ধর্মীয় আদর্শসমূহ মানিয়া চলেন এবং নিজে নামাজ পড়েন এবং যাহারা উহা অবহেলা করে তাহাদিগকে শাস্তি দেন।"[১] ফেরিশতাও এই মত পোষণ করেন।

শাসক হিসাবে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক খুবই দয়ালু ও উদার ছিলেন। তাঁহার দয়া কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়া যায়। বারানী বলেন, হাতেম তাঈ ও অন্যান্যরা যে পরিমাণ এক বৎসরে দান করেন, তিনি তাহা একবারেই দান করেন। উপহার প্রদানে তিনি খুবই অপব্যয়ী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন হাসপাতাল ও দানশালা নির্মাণ করেন, এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি তাঁহার দয়া ছিল অভূতপূর্ব। বিচারের ব্যাপারে তিনি সর্বদা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। সুলতান স্বয়ং বিবাদী হিসাবে কাজীর সামনে দণ্ডায়মান হন—এরূপ উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। কাজীর রায় তিনি সর্বদা শিরোধার্য করিয়া লন।

শাসক হিসাবে

দয়া ও উদারতা সত্ত্বেও সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক কার্য নির্বাহক হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছেন। স্যার লেনপুল মন্তব্য করেন ঃ "শ্রেষ্ঠ মনোভাব ও মহৎ কল্পনাশক্তি থাকা সত্ত্বেও ভারসাম্যতা বা ধৈর্য ও স্থান-কাল-পাত্রের বিবেচনা না থাকার ফলে মুহাম্মদ তুঘলক নিদারুণভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন।"[১৭] যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ব্যর্থ হন, উহার উপর তাঁহার কোন হাত ছিল না। প্রায় এক যুগ স্থায়ী একটি দুর্ভিক্ষ তাঁহার রাজত্বের সমস্ত মহিমা ধ্বংস করিয়া দেয়। অধিকন্তু, তাহার ব্যর্থতার আর একটি কারণ হইল, তিনি কিছুটা উগ্র মস্তিষ্কের লোক ছিলেন। সুতরাং কোন বিরোধিতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

কোন কোন ঐতিহাসিক মুহাম্মদ বিন তুঘলককে রক্তপিপাসু দানব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, পুরোহিত শ্রেণীর লোকেরাই এইসব অভিযোগ উত্থাপন করেন, যাহারা সর্বদা তাঁহার পরিকল্পনায় বাধা প্রদান করেন। কোন কোন লেখক তাঁহাকে সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের হত্যাকারী বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু ইহা অদ্যাবধিও আলোচনার বিষয়। ঐতিহাসিক বারানী বলেন, "যে মণ্ডপ ধসিয়া পড়িবার ফলে গিয়াসুদ্দিন তুঘলক মারা যান, তাহা প্রকৃতপক্ষে বজ্রপাতের ফলেই ধসিয়া পড়ে। বিদ্রোহীদের প্রতি মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কঠোরতা সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর কঠোরতাকে ছাড়াইয়া যায় নাই। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ এই প্রসঙ্গে বলেন, "বারানী ও ইবনে বতুতার গ্রন্থাবলির পৃষ্ঠায় অনেক প্রমাণ রহিয়াছে যে, নিছক রক্তপাতের জন্য তিনি রক্তপাত করেন নাই এবং (ইহাও আছে যে,) তিনি তাঁহার শত্রুদের প্রতিও দয়ালু, উদার ও ন্যায়পরায়ণ হইতে পারিতেন।"[১৮]

রক্তপিপাসুতার অভিযোগ

তাঁহার পরিকল্পনাগুলির ব্যাপারে কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার তাঁহাকে পাগল বলিয়া অভিযুক্ত করেন। কিন্তু এ ধরনের ধারণা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নহে। যাহারা তাঁহার পরিকল্পনাসমূহ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও

পাগলামির অভিযোগ খণ্ডন

THE INVASION OF TIMUR, 1398 A. D.
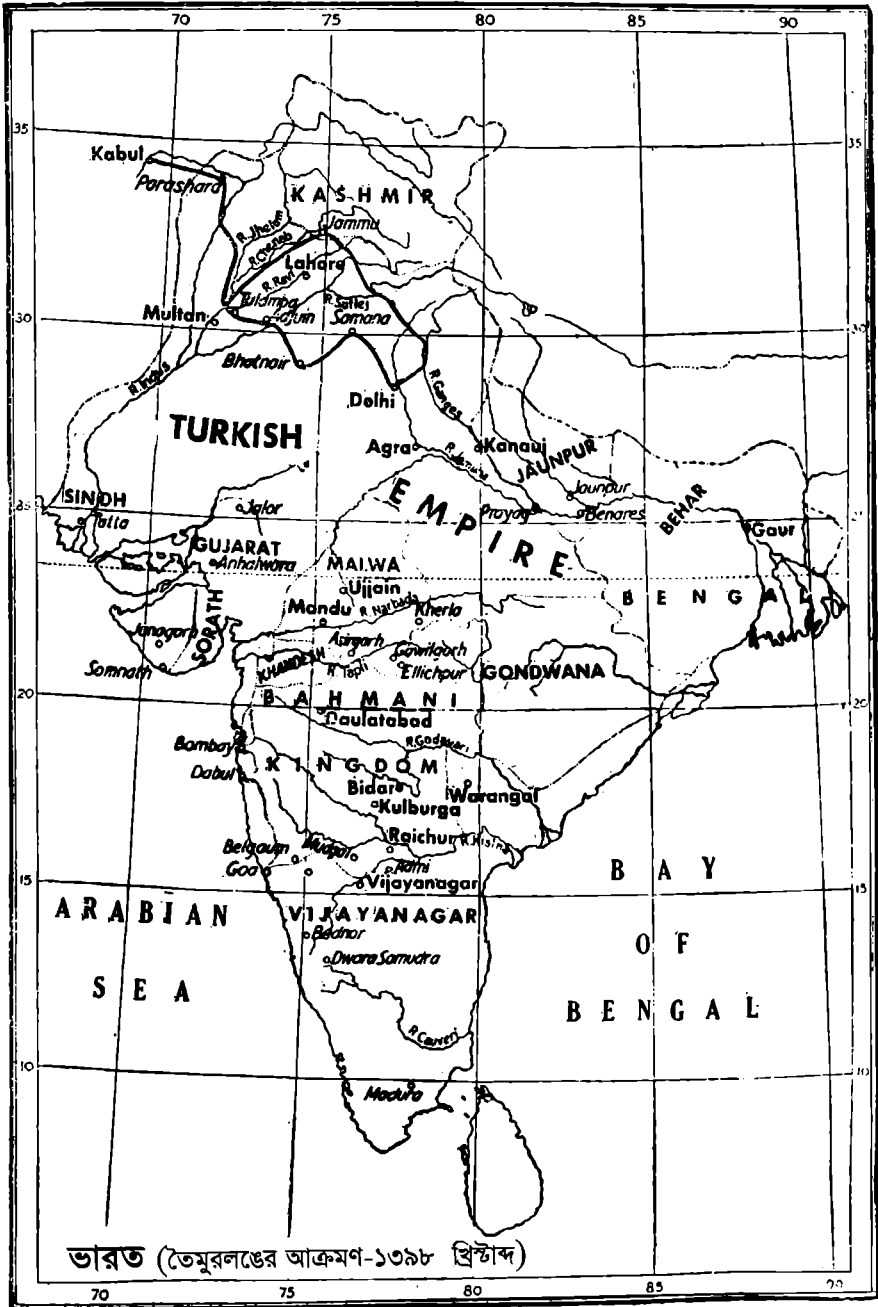
তাঁহাকে পাগল বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে সুলতান তাঁহার যুগের অনেক অগ্রবর্তী ছিলেন। প্রজাসাধারণ তাঁহার পরিকল্পনাগুলি বুঝিতে পারে নাই, তাই তাঁহারা এইগুলির প্রশংসা করিতে পারে নাই। অধিকন্তু তিনি প্রকৃতিগতভাবে ত্বরিতগতিসম্পন্ন ছিলেন। কোন পরিকল্পনার গুরুত্ব জনসাধারণ বুঝিতে পারিবার পূর্বেই তিনি ঐগুলি কার্যকর করিতে চান।[১৯]

প্রাথমিক তুর্কি সাম্রাজ্যের পতনের জন্য সুলতানকে কিছুটা দায়ী করা হয়। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বের কিছু মারাত্মক পরিণতি ছিল। কিন্তু ইহাও স্মরণ করা প্রয়োজন, তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের জন্য এমন কতগুলি গভীর কারণ ছিল, যেগুলির উপর কোন ব্যক্তিগত লোকের হাত ছিল না।

তুর্কি সাম্রাজ্যের পতনের জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না

ইবনে বতুতা ঃ ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার তানজিয়ারে আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বা জনসাধারণ্যে পরিচিত ইবনে বতুতার জন্ম হয়। তিনি আফ্রিকার অধিবাসী একজন মুসলিম পর্যটক। ভ্রমণের নেশা তাঁহার বাল্যকাল হইতেই ছিল এবং ২১ বছর বয়সে তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়েন। আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি হিন্দুকুশ পার হইয়া ১৩৩৩ সালে ভারতে আগমন করেন। শীঘ্রই তিনি দিল্লী পৌঁছেন, এবং দিল্লীর দরবারে তাঁহাকে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁহাকে দিল্লীর কাজী নিযুক্ত করেন। আট বৎসর পর ১৩৪২ সালে তিনি এই পদ ছাড়িয়া দেন। তারপর তাঁহাকে চীনে রাষ্ট্রদূত হিসাবে প্রেরণ করা হয়। তিনি চীন পৌঁছেন। কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্য লইয়া তথায় গমন করেন তাহা ব্যর্থ হয়। অতঃপর তিনি কালিকটে ফিরিয়া আসেন এবং সেইখান হইতে জাহাজযোগে স্বদেশ যাত্রা করেন। ৭৩ বৎসর বয়সে ইবনে বতুতা ১৩৭৭-৭৮ সালে প্রাণত্যাগ করেন।

বৃদ্ধ বয়সে ইবনে বতুতা তাঁহার সফর নামা নামক গ্রন্থে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র তিনি বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে 'বিপরীতের সংমিশ্রণ' বলিয়া আখ্যায়িত করেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলক সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া পেশ করা হয়। কিন্তু তাঁহার বিবৃত ঘটনাবলি ও ভৌগোলিক বিবরণ পরীক্ষাহীনভাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, সময় সময় তিনি বাজারের আলোচনাকেও ইতিহাস বলিয়া ভুল করেন।

তাঁহার গ্রন্থ সফরনামা

তৎকালীন হিন্দু ও মুসলমানের আচার-ব্যবহারের উপর ইবনে বতুতা যথেষ্ট আলোকপাত করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর ঋণের আইন সম্পর্কে তিনি একটি কৌতুকপ্রদ বর্ণনা দান করেন এবং-তাঁহার অভিমতসমূহ তাঁহার পূর্বের ভারত সফরকারী মার্কো পোলো কর্তৃক সমর্থিত। তাঁহার বক্তব্যে আমরা ভারতের তৎকালীন জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের একটি বিশদ বর্ণনা পাই। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বারানী এবং অন্যান্য লেখকগণ এই ব্যাপারে একই মত পোষণ করেন।

ফিরুজ শাহ্ তুঘলক
(১৩৫১-১৩৮৮ খ্রিঃ)

সিংহাসনে আরোহণ ঃ সিন্ধুর থাট্টা শহর অবরোধের প্রাক্কালে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুতে রাজকীয় শিবিরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সেই অঞ্চল তখন বিদ্রোহীতে পরিপূর্ণ। মোঙ্গল দস্যুরা রাজকীয় শিবির আক্রমণ করিয়া তাহা লুণ্ঠন করে। পথ প্রদর্শকের অভাবে সৈন্যবাহিনী অশেষ কষ্টভোগ করে। এই দুর্যোগ মুহূর্তে শিবিরে উপস্থিত অভিজাতবর্গ মৃত সুলতানের চাচাত ভাই ফিরুজ তুঘলককে সিংহাসনে আহ্বান করিলে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহা গ্রহণ করেন। মৃত সুলতানের কোন পুরুষ উত্তরাধিকারী ছিলেন না, এবং ইহাতে মনে হয়, তিনি হয়ত ফিরুজ তুঘলককে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে দিল্লীর প্রতিনিধি খাজা জাহান এক বালককে সিংহাসনে বসাইয়া তাহাকে মৃত সুলতানের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। যাহা হউক, পরে ফিরুজ তুঘলক দিল্লী পৌঁছিলে খাজা জাহান বশ্যতা স্বীকার করেন। অতঃপর পরামর্শদাতাদের প্ররোচনায় খাজা জাহানকে হত্যা করা হয়।[২০]

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা

সিংহাসনে আরোহণের পর ফিরুজ তুঘলক এক কঠিন কর্তব্যের সম্মুখীন হন। তাঁহার কর্তব্য ছিল, মৃত সুলতানের রাজত্বের শেষের দিকে দিল্লী সালতানাত যে দ্বিধাবিভক্ত ও মনোবলহীন অবস্থায় পড়িয়া ছিল, সেই অবস্থা হইতে ইহাকে উদ্ধার করা। কিন্তু নূতন সুলতানের মধ্যে উত্তম সেনাপতিত্ব ও সহনশীল প্রচেষ্টার অভাব ছিল। সাম্রাজ্যের হৃত প্রদেশগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি কোন গুরুতর প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন নাই, এবং তাঁহার সামরিক অভিযানগুলি অধিকাংশই ছিল ব্যর্থ। কখনও কখনও তাঁহার মুসলিম ভাইদের অযথা রক্তপাত হইবে—এই অজুহাতে তিনি বিজয়ের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসেন।

কঠিন দায়িত্ব

তাঁহার অভিযানসমূহ ঃ দক্ষিণ বাংলায় শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ একটি স্বাধীন ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৩৪২ সালে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেন। ১৩৫৩ সালে সুলতান ফিরুজ শাহ্ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলে তিনি একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সুলতান দিল্লী ফিরিয়া যান। ১৩৫৯ সালে সুলতান পুনরায় অভিযান করিলে ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহ্ একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ অবরোধের পর সিকান্দার শাহ্ সুলতানের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন এবং সুলতান তাঁহার রাজকীয় উপাধি মানিয়া লন। আফগানদের উত্থান পর্যন্ত দুই শতাব্দী যাবৎ বাংলা দিল্লী কর্তৃক লাঞ্ছিত হয় নাই।

বাংলা

বাংলা হইতে সুলতান জৌনপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতোপূর্বে বাংলা হইতে ফিরিবার সময় তিনি এই নগরটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিছুদিন তথায় অবস্থানের পর তিনি উড়িষ্যায় একটি অভিযান পরিচালনা করেন। রাজধানী জাজনগর হইতে ইহার হিন্দু রাজা পলায়ন করেন। পরে রাজা দিল্লীর নিকট ২০টি হস্তী রাজস্ব হিসাবে প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৩৬১ সালে ফিরুজ শাহ্ দুরূহ নগরকোট দুর্গের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। সুদীর্ঘ অবরোধের পর দুর্গের হিন্দু প্রধান সুলতানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

উড়িষ্যা নগরকোট

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে বলিয়া ১৩৬২ সালে সুলতান সিন্ধুর থাট্টা নগরীর লোকদিগকে শাস্তি দিবার জন্য একটি অভিযান পরিচালনা

করেন। থাট্টার রাজা দৃঢ়তার সহিত তাঁহার নগরী রক্ষা করেন। ইতোমধ্যে রাজকীয় শিবিরে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে সুলতান তাঁহার সৈন্যবাহিনী গুজরাটে লইয়া যাইতে বাধ্য হন।

থাট্টা-সিন্ধু

বাহমনী রাজ্যের একজন অসন্তুষ্ট পদস্থ কর্মচারী দাক্ষিণাত্য পুনরাধিকার করিবার জন্য সুলতানকে আহ্বান করেন, কিন্তু সুলতান তাঁহার পূর্ব লক্ষ্যে অবিচল থাকেন। সেনাবাহিনী পুনরায় সিন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযান করিলে থাট্টার রাজা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু সিন্ধুর প্রাক্তন রাজার এক আত্মীয়কে ইহা শাসন করিতে দেওয়া হয়।

বিদ্রোহসমূহ ঃ সুলতান ঘোষণা করেন, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যতীত তিনি আর কোন অভিযান পরিচালনা করিবেন না। দাক্ষিণাত্য পুনরাধিকারের একটি আহ্বান তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। গুজরাটের শাসনকর্তা শামসুদ্দিন দামঘানী বিদ্রোহ করিলে স্থানীয় অভিজাতবর্গ তাঁহাকে দমন করেন। তারপর সুলতান কাথেরের একটি বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করেন।

গুজরাট

সুলতানের শেষ জীবন ঃ সুলতান ফিরূজ শাহ্ তুঘলকের শেষ জীবন গভীর যন্ত্রণার মধ্যে শেষ হয়। ১৩৭৪ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফতেহ্ খানের মৃত্যু তাঁহাকে মনোকষ্ট দেয়। ক্রমে তিনি অভিজাতবর্গের হাতের পুতুল হইয়া যান। উজির খান জাহান সমস্ত ক্ষমতা তাঁহার হাতে লইয়া ফেলেন। খান জাহান সুলতান ও তাঁহার পুত্র মুহাম্মদ খানের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যুবরাজ উজিরের পদচ্যুতি করাইয়া দেন। সুলতান যুবরাজকে 'রাজ' উপাধি অর্পণ করেন। কিন্তু যুবরাজ সেই উপাধির অযোগ্য বলিয়া প্রমাণ করেন। অতঃপর ফিরূজ তাঁহার দৌহিত্র, ফতেহ্ খানের পুত্র তুঘলক খানকে সেই উপাধি অর্পণ করেন। ১৩৮৮ সালে ৮৩ বৎসর বয়সে সুলতান পরলোক গমন করেন।

মৃত্যু

তাঁহার শাসনকার্যের সংস্কার ঃ সুলতান ফিরূজ শাহ্ তুঘলকের শাসনকার্যের মূল কাঠামো কোরআনের আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। বারানী বলেন ঃ "তিনি মহানবীর (সাঃ) আইনসমূহকে তাঁহার পথ প্রদর্শক বানান।" অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্য তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে কতকগুলি জায়গীরে বিভক্ত করা হয় এবং ঐ সব জায়গীর পুনরায় কতগুলি জেলায় ভাগ করা হয়। সুলতান আলাউদ্দিন কর্তৃক রহিত জায়গীরদারী প্রথা তিনি পুনরায় প্রবর্তন করেন।[২১] এইসব জায়গীর ছাড়াও পদস্থ কর্মচারিগণ বিভিন্ন ভাতা উপভোগ করেন। ফলে তাঁহারা বিরাট অর্থের মালিক হইয়া যান। অভিজাতবর্গ প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের জায়গীরের স্বাধীন শাসনকর্তা হইয়া উঠেন এবং যাহার ফলে স্থানীয় সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্য নষ্ট হইয়া যায়।

জায়গীরদারী পূনঃ প্রবর্তন

ভূমি খাজনার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ জনগণের প্রভূত মঙ্গল সাধন করে। কর নির্ধারণ ব্যবস্থা, উপাধি ও ভোগাধিকার তদন্তের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হয় এবং কর আদায়ের সহিত জড়িত কতকগুলি কুপ্রথার বিলোপ সাধন করা হয়।

ভূমি খাজনা

সুলতান চাষীদের স্বার্থ উত্তমরূপে সংরক্ষণ করেন। বারোটি খাল খননের দ্বারা বিরাট এলাকায় সেচের ব্যবস্থা করা হয় এবং ইহার জন্য সংশ্লিষ্ট কৃষি এলাকার মোট উৎপন্ন দ্রব্যের শতকরা দশ ভাগের একটি ক্ষুদ্র অংশ খাজনা হিসাবে আদায় করা হয়। কর ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়া ইসলামী আইনানুযায়ী কর নির্ধারিত হয়। সুলতান ২৩টি যন্ত্রণাদায়ক কর রহিত করেন। ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক তিনি শুধু চারিটি খাজনা আদায় করেন যথাঃ খারাজ, যাকাত, জিজিয়া ও খুমুস। প্রবর্তিত নূতন রাজস্ব ব্যবস্থা ব্যবসা ও কৃষিকার্যের দ্রুত উন্নতি সাধন করে।

কৃষিকাজ

শাস্তি প্রদানে অঙ্গচ্ছেদ ও পীড়ন প্রথার উচ্ছেদ সাধনের জন্য তিনি ভূয়সী প্রশংসার অধিকারী। সুলতান তাঁহার স্বহস্তে লিখেন ঃ "মহান ও দয়ালু আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাঁহার চাকর বানাইয়াছেন মুসলমানদের অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং তাঁহাদের উপর বা কোন মানুষের উপর যে কোন ধরনের পীড়ন কার্যে বাধা দানে নিজেকে নিয়োজিত করিবার জন্য, তাঁহার দয়া প্রার্থনা করিবার জন্য এবং আশাবাদী হইবার জন্য।[২২]

পীড়ন প্রথা রহিত

বিচার বিভাগে কোরআনের আইনই ছিল প্রধান আইন। পূর্ণ আনুগত্যের সাথে তিনি কোরআন অনুসরণ করেন। মুফতী আইন ব্যাখ্যা করেন এবং কাজী তদনুযায়ী বিচার করেন। বিচার ব্যবস্থাকে তিনি সংস্কার সহকারে ঢালিয়া সাজান। পীড়ন প্রথা তিনি রহিত করেন এবং অপরাধীদের শাস্তি দানের ব্যাপারে তিনি সরলতা দেখান।[২৩]

বিচার বিভাগ

প্রজাসাধারণের মঙ্গলার্থে ফিরূজ কর্তৃক প্রবর্তিত কতকগুলি ব্যবস্থাকে মাতামহসুলভ আইন বলা যায়।[২৪] তন্মধ্যে বিবাহ সংস্থা ও চাকুরি সংস্থাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। বিবাহ বিভাগের মাধ্যমে তিনি তাঁহার স্বধর্মের কোন সাবালক মেয়ে যৌতুকের অভাবে অবিবাহিত থাকিতেছে কিনা, তাহা দেখিবার সুযোগ পান। তাঁহার এই ব্যবস্থা বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বিধবা এবং অনাথদের মধ্যে কার্যকরী হয়। চাকুরি সংস্থাটি বিশেষভাবে যাহারা কেরানীপদ বা শাসনকার্যের অন্যান্য পদপ্রার্থী, তাহাদের উপকারে আসে। সেই সময় কৃষিকার্যের বিস্তৃতি ও জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দিনমজুর ও হস্তশিল্পীদের জন্য অনেক চাকুরির পথ খুলিয়া যায়। কোতওয়াল বেকারদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া চাকুরি সংস্থার উজিরের নিকট পেশ করিলে তিনি তাহাদিগকে বিভিন্ন চাকুরি প্রদান করেন।

বিবাহ সংস্থা
চাকুরি সংস্থা

১৩৭০-৭১ সালে মিশ্র তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রার দুই ভাগ—আধুলি ও সিকি জিতাল প্রস্তুত করিয়া ফিরূজ তাঁহার মুদ্রার সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের সুবিধার্থে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মুদ্রা জাল ইহার উপকারিতা অনেকাংশে ব্যাহত করে। তবে তিনি নূতন কোন মুদ্রা প্রস্তুত করেন নাই।[২৫]

মুদ্রার বিভক্তি

সুলতান ফিরূজ শাহ্ তুঘলক তাঁহার উদারতার অতিশোয়াক্তির দ্বারা সামরিক বিভাগকে দুর্বল করিয়া দেন। স্থায়ী সৈন্যদিগকে নগদ বেতনের পরিবর্তে জমি প্রদান করা হয় এবং অস্থায়ী সৈন্যদিগকে কোষাগার হইতে নগদ বেতন দেওয়া হয়। যাহারা এই দুই ব্যবস্থার একটাও পায় না, তাহাদিগকে রাজস্বের উপর অস্থায়ী স্বত্ব দেওয়া হয়। সুলতান এই আইন জারি করেন যে, "যখন কোন সৈনিক বৃদ্ধ ও অক্ষম হইয়া যান তবে তাহার পুত্র প্রতিনিধি হিসাবে উত্তরাধিকারী হইবে। যদি তাহার কোন পুত্র সন্তান না থাকে,

সামরিক বিভাগ

তবে তাহার জামাতা, এবং যদি তাহার জামাতাও না থাকে, তবে তাহার ক্রীতদাস তাহার প্রতিনিধিত্ব করিবে। যদি কোন ক্রীতদাসও না থাকে, তবে মৃত সৈনিকের কোন নিকটাত্মীয় তাহার উত্তরাধিকারী হইবে। যদি এই ধরনের কোন নিকটাত্মীয়ও না থাকে, তবে তাহার বিধবা স্ত্রী ও মহিলা আত্মীয়গণ উত্তরাধিকারী হইবে।"[২৬]

সুলতান এইভাবে কৃষকদের প্রতিও দয়াশীল ছিলেন। পূর্বের সুলতানগণের সময় কোন পরিবার একটার অধিক গরু রাখিতে পারিত না; ফিরূজ শাহ্ এই বাধ্যবাধকতা অপসারণ করেন। অতঃপর প্রত্যেক ঘরে একাধিক গরু দেখা যায়।[২৭]

ক্রীতদাস ব্যবস্থা

ক্রীতদাস লালন পালনের ব্যাপারে সুলতান কঠোর পরিশ্রম করেন। জায়গীরদারদিগকে তিনি এই মর্মে আদেশ দেন যে, তাহারা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপ্ত ক্রীতদাসদিগকে দিল্লীর দরবারের কাজে পাঠাইয়া দেন। যাহারা অধিক সংখ্যক ক্রীতদাস পাঠাইতে সক্ষম হন, তাহারা সুলতানের নিকট হইতে অধিক অনুগ্রহ লাভ করেন। দরবারে প্রায় বারো হাজার ক্রীতদাস বিভিন্ন কাজে সুদক্ষ হইয়া উঠে। দিল্লী ও অন্যান্য জায়গীর মিলাইয়া ক্রীতদাসদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক লক্ষ আশি হাজারে। সুলতান ইহাদের পরিচর্যার জন্য বিশেষ যত্ন নেন।

শিল্প কারখানার পৃষ্ঠপোষক

"রাজপ্রাসাদের প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র ন্যায্য মূল্যে বাজার হইতে ক্রয় করিবার জন্য সুলতান আদেশ জারি করেন। রাজকীয় কারখানায় মজুদ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় বাজারে সরবরাহ রাখিবার জন্য তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এইসব জিনিসপত্র প্রস্তুতকারীরা যাহাতে ন্যায্যমূল্য পায় এবং চোরাকারবারীরা নিয়মিতই লভ্যাংশে যেন ভাগ বসতে না পারে সেইদিকে সুলতানের নজর ছিল। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক পরগনা এবং প্রতি ক্রোশ দূরত্বে আনুমানিক চারিটি গ্রাম গজাইয়া উঠে এবং প্রত্যেক বাড়িতে যথেষ্ট পরিমাণ শস্য, সম্পত্তি, ঘোড়া এবং আসবাবপত্র ও মূল্যবান অলংকার থাকিত। কৃষক পরিবারভুক্ত কোন মহিলাই অলংকারবিহীন ছিল না। প্রত্যেক ঘরে আরও থাকিত পরিষ্কার বিছানা, সুদৃশ্য পালং এবং অনেক তৈজসপত্র, সম্পত্তি ও কাপড়-চোপড়।"[২৮]

জনহিতকর কার্য

ফিরূজ তুঘলক একজন শ্রেষ্ঠ স্থপতি ছিলেন। তিনি জৌনপুর, ফিরূজাবাদ ও ফতেহাবাদের ন্যায় নগরীসমূহ প্রতিষ্ঠা করেন। ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে তিনি বিভিন্ন জায়গায় অনেক মসজিদ, আশ্রয় ও সরাইখানা নির্মাণ করেন। স্থাপত্যের কাজে বিভিন্ন শিল্পীদের নিয়োগ করা হয় এবং তাহাদের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য একজন সুদক্ষ পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করা হয়। দিল্লীতে তিনি একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন এবং বিনামূল্যে ঔষধ পথ্য বিতরণ করেন। রোগীরা রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে সেইখানে খাদ্যও লাভ করে।

সুলতান একজন বিখ্যাত উদ্যান নির্মাতাও ছিলেন। দিল্লীর আশেপাশে তিনি প্রায় ১২০০ নূতন বাগান নির্মাণ করেন। ঐসব বাগান হইতে রাষ্ট্র বেশ মোটা অংকের করও লাভ করে।

জ্ঞান বিস্তারের ব্যাপারে সুলতান খুবই উৎসাহী ছিলেন। বহু মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া তিনি উহাতে উদারভাবে দান করেন। তিনি অনেক ফকির ও বিদ্যার্থীর

পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সমগ্র সাম্রাজ্যে শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। বিদ্বান লোকদিগকে তিনি ভাতা ও পারিতোষিক প্রদান করেন। তিনি ইতিহাস চর্চার একজন ভক্ত ছিলেন। বারানী ও আফিফ-এর গ্রন্থগুলিকে তিনি অভিনন্দিত করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সময় আইন ও ধর্মতত্ত্বের উপর অনেক গ্রন্থ লেখা হয়। তিনি অনেক কলেজ, আশ্রম ও গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। ধর্মীয় সাহিত্য ছাড়াও অন্যান্য লৌকিক সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিল। তাঁহার আদেশে নগরকোটের গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত কতকগুলি সংস্কৃতের গ্রন্থ ফার্সিতে অনুবাদ করা হয়। ফকির-দরবেশদের মধ্যে যাহারা সুলতানের অনুগ্রহ লাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে জালালুদ্দিন রুমী অন্যতম।

বিদ্যার প্রসারতা

তাঁহার কৃতিত্ব বিশ্লেষণ ঃ ১৩৫১ হইতে ১৩৮৮ সাল পর্যন্ত সুলতান ফিরূজ শাহ তুঘলক ৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন। ভারতের ঐতিহাসিকগণ সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের পর ফিরূজ তুঘলককে একজন খুব ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু ও উপকারী শাসক হিসাবে প্রশংসা করেন। বারানী লিখেন, মুইজুদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম-এর পর দিল্লীর কোন সুলতান এইরূপ নম্র, দয়ালু, সত্যপ্রিয়, বিশ্বস্ত ও ধার্মিক ছিলেন না। বস্তুত ফিরূজ শাহ্ তুঘলক মমতা ও উপকারিতার ন্যায় মহৎ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের সময় মোটমুটি শান্তি ও উন্নতি বিরাজ করে। তিনি দয়ালু ও দানশীল ছিলেন এবং দরিদ্র ও বেকারদিগকে সরলভাবে সাহায্য করেন। পীড়ন প্রথার উচ্ছেদ, মোকদ্দমার নিয়মাবলি সংক্ষিপ্তকরণ এবং গুপ্তচর প্রথা রহিত করিবার ন্যায় বিভিন্ন বিচার বিভাগীয় সংস্কারের মাধ্যমে তাঁহার দয়া প্রকাশ পায়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বারানী ও আফিফ তাঁহাকে একজন আদর্শ মুসলিম শাসকরূপে বর্ণনা করেন।

"কিন্তু তাঁহার ভেদাভেদহীন দয়া ও অনুগ্রহ শেষ পর্যন্ত দিল্লী সালতানাতের পতনের মূলে অল্পমাত্রায় সহায়তা করেনি।[২৯] তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সাহসের অভাব ছিল। সেই যুগের নৃপতিদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা—যুদ্ধের নির্মম উৎসাহ তাঁহার ছিল না। আলাউদ্দিন খিলজী বা মুহাম্মদ বিন তুঘলকের যোগ্যতা, বীরত্ব ও শক্তির কিছুই তাঁহার ছিল না। রাজনৈতিক দিক হইতে তিনি ব্যর্থ হন। ইহা দিবালোকের মত সত্য মনে হয় যে, ফিরূজ শাহ তুঘলকের কোন সামরিক দক্ষতা ছিল না। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তাঁহার প্রাথমিক অভিযানসমূহ ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ফল এবং তাঁহার রাজত্বের অধিকাংশ সময় তিনি যুদ্ধ হইতে বিরত থাকেন।

ভাল সৈনিক ছিলেন না

সুলতানের শান্তিপ্রিয় মনোভাব সাম্রাজ্যের দূরে অবস্থিত প্রদেশগুলিকে স্বাধীন হইয়া যাইতে অনুপ্রেরণা দান করে। জায়গীরদারী প্রথার পুনঃপ্রবর্তন কেন্দ্রীয় শক্তিকে খর্ব করিয়া দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ইহা সাম্রাজ্যের অখণ্ডতায় বাধা সৃষ্টি করে। তাঁহার ক্রীতদাসদের লালন-পালন ব্যবস্থা কোষাগার শূন্য করিয়া দেয়। ক্রীতদাসদের সংখ্যা এইরূপ বাড়িয়া যায় যে শেষ পর্যন্ত ক্রীতদাসরা সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের প্রতি মারাত্মক হুমকি হইয়া দাঁড়ায়। এই সমস্ত কার্যাবলির দ্বারা সুলতান ফিরূজ শাহ্ তুঘলককে দিল্লী সালতানাতের পতনের জন্য দায়ী করা হয়।

দিল্লী সুলতানদের পতনের জন্য দায়ী

ফিরূজ শাহ্ তুঘলক-এর উত্তরাধিকারিগণ
(১৩৮৮-১৪১২ খ্রিঃ)

সুলতান ফিরূজ শাহ তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দিন শাহ্ উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু ১৩৮৯ সালে তিনি তাঁহার চাচাত ভাই আবু বকরের সমর্থকদের প্ররোচনায় পরাজিত ও নিহত হন। অতঃপর আবু বকরকে সিংহাসনে দেওয়া হয়। কিন্তু কয়েক মাস পরেই ফিরূজ তুঘলকের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ্ কর্তৃক তিনি বন্দি হন। মীরাটের কারাগারে আবু বকরের মৃত্যু হয়। দোয়াব ও মীরাটে বিদ্রোহীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় ১৩৯৪ সালে নাসিরুদ্দিনের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র হুমায়ুন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁহার রাজত্বের সময় দেশে ভয়ানক গোলযোগ আরম্ভ হয় এবং তিনি শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

(১) দ্বিতীয় তুঘলক শাহ
(২) আবু বকর
(৩) নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ
(৪) হুমায়ুন

তুঘলক বংশের শেষ সুলতান ছিলেন নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ্। কিছু সংখ্যক ক্ষমতা-শালী অভিজাত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। ঐসব অভিজাত ফিরূজ তুঘলকের অপর দৌহিত্র নুসরাত শাহ্কে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সিংহাসনে স্থাপন করেন। শীঘ্রই রাজত্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। মালিক সারওয়ার নিজেকে জৌনপুরের সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন এবং 'সারকি বংশ' প্রতিষ্ঠা করেন। গুজরাটের শাসনকর্তা জাফর খান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অন্যান্য শাসকর্তাগণও একই পথ অনুসরণ করেন।

(৫) নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ

তৈমুরের আক্রমণ ও তুঘলক বংশের পতন
(১৩৯৮-১৪১৩ খ্রিঃ)

১৩৩৫ সালে ট্রান্স-অক্সিয়ানার (Transoxiana) 'কেশ' নামক স্থানে আমির তৈমুরের জন্ম হয়। তিনি বারলাস তুর্কিদের অন্তর্ভুক্ত আমির তুরঘীর পুত্র। ১৩৬৯ সালে তিনি চাগতাই তুর্কিদের নেতা হন এবং দূরবর্তী বিজয়ে বাহির হইয়া পড়েন। তৈমুর পূর্বদিকে পারস্য, আফগানিস্তান ও আরমেনিয়া জয় করেন এবং একজন শক্তিশালী বিজয়ী হিসাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী খ্যাতি অর্জন করেন। মধ্য এশিয়া জয় করিবার পর তিনি ভারত বিজয়ে মনস্থ করেন। ইহার জন্য তিনি কোন কারণের প্রত্যাশা করেন নাই। রাজ্য সরকারের স্থিতিহীন অবস্থা এবং এই দেশের সম্পদের সুখ্যাতি ইসলামের মুখোসের সঙ্গে যোগ হইয়া তাঁহাকে এই দেশ জয় করিবার অনুপ্রেরণা দান করে।

১৩৯৮ সালের প্রথমভাগে তৈমুরের দৌহিত্র পীর মুহাম্মদ সিন্ধু নদী পার হইয়া উচ্ছ্ অধিকার করেন এবং মুলতানের দিকে অগ্রসর হন। অতঃপর এক বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া আমির তৈমুর হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন এবং সিন্ধু নদী পার হন। মুলতানের উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত তুলাম্বা তিনি অধিকার করেন। ১৩৯৮ সালে দিল্লীর পথে দিপালপুর ও ভাটনাইর তৈমুরের হাতে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দিল্লী অধিকারের প্রাক্কালে তিনি-দিল্লী অধিকারে বাধা দান করিবে এই ধারণায় ১ লক্ষ হিন্দু নাগরিককে হত্যা করেন।

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ও তাঁহার উজির মাল্লু ইকবাল ১০ হাজার অশ্বারোহী, ৪০

হাজার পদাতিক এবং ১২০টি হস্তীর এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করেন। যুদ্ধে দিল্লীর সৈন্যরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। সুলতান গুজরাটের দিকে এবং মাল্লু ইকবাল বারান অভিমুখে পলায়ন করেন। তৈমুর দিল্লী অধিকার করেন এবং নাগরিকদিগকে রক্ষা করিতে রাজি হন। কিন্তু কিছু সংখ্যক নাগরিকদের বাধা দান করিবার ফলে একটি লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। পাঁচ দিন ধরিয়া নগরটি লুণ্ঠিত হয়। অসংখ্য বন্দি ক্রীতদাসের সঙ্গে বংশানুক্রমে সঞ্চিত ধনরাশি সমরকন্দে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু তিনি খুব সতর্কতার সহিত বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় শিল্পীকেও লইয়া যান।

১৩৯৯ সালের ১লা জানুয়ারি আমির তৈমুর দিল্লী ত্যাগ করেন। তিনি মীরাট, কাংরা ও জম্মু অধিকার করেন। সৈয়দ খিজির খানকে তিনি মুলতান, লাহোর ও দিপালপুরের শাসনকর্তা হিসাবে রাখিয়া যান।

ফলাফল ঃ আমির তৈমুর ভারতে বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী রাখিয়া যান। উত্তর ভারতে তিনি রাজসরকারের সমস্ত চিহ্ন ধ্বংস করিয়া দেন। রাজত্বের বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে গোলযোগ সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিক বাদাউনি লিখেন ঃ "নগরটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় এবং যে সব অধিবাসীদিগকে এখানে রাখিয়া যাওয়া হয়, তাহারা সবাই মরিয়া যায় এবং পুরা দুই মাস দিল্লীতে কোন পাখি উহার বাহু প্রসারিত করে নাই।"

দোয়াবে পলাতক নুসরাত শাহ্ নিজেকে দিল্লীর অধিপতি ঘোষণা করেন, কিন্তু মাল্লু ইকবাল তাঁহাকে নগর হইতে বিতাড়িত করেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও জায়গীরদারগণ সবাই স্বাধীন হইয়া যান। ১৪০১ সালে মাল্লু ইকবাল নাসিরুদ্দিন মাহমুদকে দিল্লীতে আহ্বান করেন, কিন্তু সুলতানের ক্ষমতা দিল্লী, রোহটাক, সাম্ভাল ও দোয়াবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। শেষ তুঘলক সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ১৪১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রাণত্যাগ করেন এবং তাঁহার সাথে সাথে গিয়াসুদ্দিন তুঘলক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশের শেষ হয়।

পাদটীকা

১। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, আগমেহদী হোসেন ঃ Tuglaq Dynasty পৃঃ ২০-২৩।

২। কাশিম ফিরিশতা ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৩।

৩। আগা মেহদী হোসেন ঃ প্রাগুক্ত , পৃঃ ১০৩।

৪। কাশিম ফিরিশতা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৪।

৫। আগা মেহদী হোসেন ঃ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩।

৬। জিয়াউদ্দীন বারানী ঃ তারিখ-ই-ফিরূয শাহীঃ মেহদী হোসেন কর্তৃক প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃঃ ১৭৫,১৭৬।

৭। কালীকিংকর দত্ত ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৩-৩২৪।

৮। One of the earliest acts of his reign was to remodel the coinage, to re-adjust its divisions to the altered values of the precious metals and to originate new and more exact representatives of the subordinate circulation.

৯। বারানী বলেন, এই মুদ্রা প্রচলনের ফলে প্রত্যেকটি হিন্দু বাড়ি এক একটি টাকশালে পরিণত হয় এবং প্রত্যেক স্বর্ণকার তাহার নিজস্ব কারখানায় মুদ্রা বানাইতে আরম্ভ করে। —আগা মেহদী হোসেন, প্রাগুক্ত

, পৃঃ ১৯০।

১০। আগা মেহদী হোসেন ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮২।

১১। ঐ পৃঃ ১৮৪।

১২। ঐ পৃঃ ১৯১।

১৩। গার্ডনার ব্রাউন ঃ Journal. U. P. Historical Society vol 1. part II. পৃঃ ১১-১২; আঃ মেঃ হোসেন —প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯২ পাদটীকা।

১৪। আঃ মেঃ হোসেন ঃ প্রাগুক্তঃ পৃঃ ১৯২

১৫। কালীকিংকর দত্ত ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৭, ৩১৮। Endowed with a keen intellect, a wonderful memory and a brilliant capacity of assimilating knowledge, he (Muhammad bin Tuglaq) was proficient in different branches of learning like Logic, Philosophy, Mathematics, Astronomy and the Physical sciences.

১৬। এলফিনস্টোন ঃ Histry of India. পৃঃ ৩৯৮। He was regular in his devotions, abstained from wine, and conformed in his private life to all the moral precepts of his religion.

১৭। With the best intentions, excellent ideas, but no balance or patience, no sense of proportion, Muhammed Tuglag was a transcendent failure—S. Lane Poole. *Medieval India.*

১৮। There is ample evidence in the pages of Barani and Ibn Batuta to show that he was not fond of shedding blood for its own sake and that he could be kind, generous and just even towards his enemies.—Ishawri Prasad: *History of Muslim Rule in India.* পৃঃ ১১৭।

১৯। আগা মেহদী হোসেন, *Tughlaq Dynasty* পৃঃ ৪৮২।

২০। ঐ পৃঃ ৩৮৬-৩৮৯।

২১। ঐ পৃঃ ৩৯৬।

২২। "The Almighty God helped me to such an extent that I banned the shedding of Muslim blood and prohibited every kind of tortures and mutilation" সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাকে এতদূর সাহায্য করেন যে আমি মুসলমানদের রক্তপাত নিষিদ্ধ করি এবং সবধরনের উৎপীড়ন ও অঙ্গচ্ছেদ নিষিদ্ধ করি—ফিরূয শাহ্ *Futuhat-i-Firuz Shahi* পৃঃ ২। আগা মেহদী হোসেন কর্তৃক *(Tughlaq Dynasty)* গ্রন্থে ৩৪৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২৩। ঈশ্বরী প্রসাদ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৪।

২৪। শাম্‌স-ই-সিরাজ আফিফঃ *Tarikh-i- Firuz Shahi* আ: মে: হোসেন কর্তৃক প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃঃ ৩৯৬ (Some of the measures introduced by Firuz for the welfare of his subjects may be described as grandmotherly legislation.

২৫। কালীকিংকর দত্ত ঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩৩।

২৬। আগা মেহদী হোসেন ঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯৭

২৭। ঐ

২৮। আফিফঃ তারিখ-ই-ফিরূয শাহী, পৃঃ ১০০। আগা মেহদী হোসেন কর্তৃক প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৯৮।

২৯। But his indiscriminate generosity and concessions contributed in no small degree to the dismemberment of the Delhi Sultanat in the long run. -কালীকিংকর দত্ত ঃ প্রাগুক্তঃ পৃঃ ৩৩৫।

গ্রন্থপঞ্জি

Ziauddin Barani : *Tarikh-i-Firuz Shahi*

Shams-i-Siraj Afif : *Tarikh-i Firuz Shahi.*

Ibn Batuta : *Safarnamah.*

Agha Mahdi Hussain : *Tughlaq Dynasty.*

S. Lane Poole : *Medieval India*

I. H. Qureshi : *The Administration of the Sultanat of Delhi.*

Wolesley Haig : *Cambridge History of India,* Vol-III

Ishwari Prasad : *History of the Qarauna Turks in India*

Majumder Ray Chowdhury and Datta : *An Advanced History of India*

R. P. Tripathi : *Some Aspects of Muslim Administration.*

অষ্টম অধ্যায়
দিল্লী সালতানাতের পতন

(ক) তথাকথিত সৈয়দ বংশ
(১৪১৪-১৪৫১ খ্রিঃ)

খিজির খান (১৪১৪-১৪২১) ঃ সুলতান নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর দিল্লীর অভিজাতবর্গ দৌলত খান লোদীকে দিল্লীর সিংহাসনে বসান। কিন্তু তিনি মাত্র কয়েক মাসের জন্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। আমির তৈমুর কর্তৃক নিযুক্ত সুলতানের শাসনকর্তা খিজির খান দৌলত খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং ১৪১৪ সালের মে মাসে দিল্লী অধিকার করেন।

কতিপয় ঐতিহাসিক খিজির খানকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বংশধর বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু এই বংশ তালিকা সবাই গ্রহণ করেন নাই। খিজির খান সর্বদা আমির তৈমুরের চতুর্থ পুত্র শাহরুখের আধিপত্য স্বীকার করেন। খিজির খানের সাত বৎসরের রাজত্ব কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ব্যতীতই অতিবাহিত হয়। দিল্লী সালতানাতের ক্ষমতা একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। দোয়াবের বিদ্রোহী হিন্দুদের বিরুদ্ধে তিনি কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু দিল্লী সালতানাত হইতে বিচ্ছিন্ন প্রদেশগুলিকে করায়ত্ত করিবার জন্য তিনি কোন চেষ্টাই করেন নাই। তাঁহার ক্ষমতা মোটামুটি দিল্লী, দোয়াব ও পাঞ্জাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ১৪২১ সালে খিজির খান মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মৃত্যু

মুবারক শাহ ঃ (১৪২১-১৪৩৪) ঃ মঈজুদ্দিন মুবারক তাঁহার পিতা খিজির খানের স্থলাভিষিক্ত হন এবং রাজকীয় শাহ্ উপাধি ধারণ করেন। মুবারক শাহের রাজত্বের সময়েই ইয়াহ্ইয়া বিন আহমদ সারহান্দি কর্তৃক বিখ্যাত মৌলিক গ্রন্থ 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' রচিত হয়। মুবারক শাহ্ ১৩ বৎসর রাজত্ব করেন। কিন্তু খোকার ও দোয়াবের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযান ছাড়া তাঁহার রাজত্বের উল্লেখযোগ্য আর কিছুই নাই। এক ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি ১৪৩৪ সালে নিহত হন।

মুহাম্মদ শাহ্ (১৪৩৪-১৪৪৫) ঃ ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ শাহ্ মুবারক শাহের উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার রাজত্বকালে মালবের মাহমুদ খিলজী দিল্লী পর্যন্ত সসৈন্যে অগ্রসর হন। কিন্তু গুজরাটের আহমদ শাহের হাত হইতে স্বীয় রাজত্ব রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হয়। লাহোর ও সারহিন্দের আফগান শাসনকর্তা বাহলুল লোদী মুহাম্মদ শাহ্‌কে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। সুলতান তাঁহাকে 'খান-ই-খানান' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং প্রকাশ্যে তাঁহাকে নিজ পুত্র বলিয়া সম্বোধন করেন। কিন্তু বাহলুল লোদি একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ছিলেন। খোকারদের উস্কানিতে পড়িয়া তিনি নিষ্ফলভাবে দিল্লী অধিকার করিতে চেষ্টা

করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার প্রদেশে ফিরিয়া যান। কিন্তু চতুর্দিকে দিল্লীর আধিপত্যের প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন আরম্ভ হয়।

আলাউদ্দিন আলম শাহ্ (১৪৪৫-১৪৫১) ঃ ১৪৪৫ সালে মুহাম্মদ শাহের পুত্র আলম শাহ্ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু তিনি একজন অযোগ্য শাসক ছিলেন। তাঁহার উজিরের বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ লইয়া ১৪৫১ সালে বাহলুল লোদী দিল্লী অধিকার করেন। আলম শাহ্ কোন প্রকার বাধা প্রদান করেন নাই এবং তাঁহার জীবনের শেষ সময়গুলি তিনি বাদায়ুনে অতিবাহিত করেন। এইভাবে তথাকথিত সৈয়দ বংশের পতন হয়।

(খ) লোদী বংশ
১৪৫১-১৫২৬ খ্রিঃ

বাহলুল লোদী (১৪৫১-১৪৮৯) ঃ বাহলুল লোদী একজন সুযোগ্য ও উচ্চকাঙ্ক্ষী লোক ছিলেন। কিন্তু দিল্লী সালতানাতকে ইহার পূর্ব অবস্থায় ফিরাইয়া আনা তাঁহার সাধ্যের বাহিরে ছিল। আফগান অভিজাতবর্গ সুলতানকে তাঁহাদের সমকক্ষ মনে করেন। জৌনপুরের মাহমুদ শাহের উপর তাঁহার বিজয় সুলতানের আধিপত্যকে কিছুটা দৃঢ় করে। যাহা হউক, তিনি দোয়াব ও মেওয়াটের অবাধ্য লোকদিগকে শায়েস্তা করেন এবং ১৪৭৯ সালে জৌনপুর অধিকার করেন। অতঃপর কাল্পি, ঢোলপুর এবং গোয়ালিয়রও তাঁহার করায়ত্ত হয়। ১৪৮৯ সালে বাহলুল লোদী প্রাণত্যাগ করেন।

জৌনপুর অধিকার
মৃত্যু

সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫১৭) ঃ বাহলুল লোদীর পুত্র নিজাম খান তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং 'সিকান্দার শাহ্' উপাধি ধারণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা জৌনপুরের শাসনকর্তা বারবাক শাহ্ নূতন সুলতানের বশ্যতা প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু শীঘ্রই তিনি বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। বারবাক শাহের আরেকটি প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। অতঃপর সুলতান তাঁহাকে বন্দি করেন। সুলতান স্বয়ং জৌনপুরে গমন করিলে সেখানকার জমিদারগণ হোসাইন শাহের নেতৃত্বে একত্রিত হন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে সিকান্দার শাহের জয় হয়। তারপর সুলতান বিহার অধিকার করেন। পূর্বদিকে সালতানাতের সীমা বাংলা পর্যন্ত স্পর্শ করে।

বিহার

সিকান্দার লোদী একজন শক্তিশালী শাসক ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মান তিনি অনেকাংশে বর্ধিত করেন। তিনি বিদ্রোহীদিগকে শায়েস্তা করেন; এমনকি গর্বিত আফগানদিগকেও তিনি ক্ষমা প্রদর্শন করেন নাই। সুলতান সর্বদা হিসাব-নিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং দুর্নীতিবাজদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। একটি সুদক্ষ গুপ্তচর বিভাগ সুলতানকে রাজ্যের বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রাখে।

একজন শক্তিশালী শাসক

সিকান্দার শাহ্ লোদী বংশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। তিনি একজন ধার্মিক লোক ছিলেন এবং সর্বদা শরিয়ত অনুযায়ী দেশ শাসন করিতে চান। সুলতান শিল্প- সাহিত্যের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সিতে অনুবাদ করেন। আগ্রা নগরী তিনি প্রতিষ্ঠা করেন, যাহা মুঘলদের আমলে সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠে। ১৫১৭ সালে সুলতান মৃত্যুবরণ করেন।

শিল্প সাহেত্যের পৃষ্ঠপোষক
আগ্রা নগরী প্রতিষ্ঠা

ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-১৫২৬) ঃ সিকান্দার লোদীর পর তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম লোদী সিংহাসনে আরোহণ করেন। আফগান অভিজাতদের মধ্যে যাহারা তাঁহাদের জায়গীরকে সুলতানের অনুগ্রহ মনে না করিয়া নিজেদের বাহুবলে অর্জিত সম্পত্তি মনে করেন তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে তিনি মনস্থ করেন। ইহা শেষ পর্যন্ত সুলতান ও অভিজাতদের মধ্যে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয়। অভিজাতবর্গ সুলতানের ভ্রাতা জালালুদ্দিনকে জৌনপুরের সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই গোয়ালিয়রে নিহত হন।

সুলতান ও অভিজাতবর্গের এই সংগ্রাম চরমে পৌঁছে এবং পাঞ্জাব-এর শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরকে ভারত আক্রমণ করিতে আহবান করেন। ১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী পরাজিত ও নিহত হন এবং ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

প্রথম পানি-পথের যুদ্ধ

দিল্লী সালতানাতের পতনের কারণ ঃ

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ও সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক এই দুই শাসকের অধীনে দিল্লী সালতানাতের বিস্তৃতির এক বিসদৃশ রূপ দেখা যায়। সুলতান নাসিরুদ্দিনের সময় ইহার বিস্তৃতি ছিল মাত্র দিল্লী হইতে পালাম পর্যন্ত। অপরপক্ষে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সময় সালতানাত এক বিশাল ভূখণ্ডে বিস্তৃত ছিল, যাহার মধ্যে প্রায় সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়। এই বিশাল সালতানাতের পতনের লক্ষণসমূহ সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষের দিকে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

নাগরিক শাসনব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও বৈদেশিক শত্রুর চাপ—এই উভয় কারণেই দিল্লী সালতানাতের পতন অনিবার্য হইয়া পড়ে। প্রাথমিক তুর্কি সাম্রাজ্যে নিশ্চয়ই একটি নিয়মিত শাসনব্যবস্থা ও একটি স্থায়ী কার্যনির্বাহক বা আইন পরিষদের অভাব ছিল। অধিকন্তু, রাজ সরকারের সংগঠন মোটেই সুযোগ্য ছিল না। সরকার ইহার শক্তিশালী অভিজাতবর্গ, আমির ও জমিদারদের উপর কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলে এবং সাম্রাজ্য পতনের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়।

রাজ সরকার ব্যবস্থা দুর্বলতা

মিঃ কীন মন্তব্য করেন, দিল্লী সালতানাত কখনও হিন্দুদের সুযোগ-সুবিধা দেখে নাই এবং হিন্দুদের শুভেচ্ছা, আর্শীবাদ, কার্যকরী সহযোগিতা ও স্বেচ্ছাসমর্থনের আশাও করেন নাই। অপরপক্ষে হিন্দুরাও কখনও শান্তিপূর্ণভাবে মুসলমানদের আধিপত্য স্বীকার করে নাই। দাক্ষিণাত্যের হিন্দুগণ কখনও বলপ্রয়োগ ভিন্ন মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে নাই। দোয়াব অঞ্চলের হিন্দুগণ সর্বদা দুর্বল সুলতানের সুযোগ গ্রহণ করে। এইভাবে হিন্দুগণ সর্বদা দিল্লী সালতানাতের পতনের মূলে মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করিবার অপেক্ষায় থাকে।

অমুসলিমদের ক্রমাগত শত্রুতা

উত্তরাধিকারের একটি বলিষ্ঠ আইন না থাকিবার দরুন কোন সুলতান মারা যাইবার পর সর্বদাই উত্তরাধিকারের যুদ্ধ লাগিয়া যায়। ইহা এমন পর্যায়ে গিয়া পৌঁছে যে, একজন সুলতান মারা যাইবার পর উত্তরাধিকার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। পরিণতিতে ইহা সালতানাতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রগতি বাধাগ্রস্ত করে। সাম্রাজ্যে ইহা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে এবং শত্রুতার পর শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

উত্তরাধিকারী আইনের অভাব

সমস্ত ঐতিহাসিক ইহা অনুমোদন করেন যে, তুর্কি অভিজাতবর্গ, আমির ও প্রধানরাই সুলতানকে সিংহাসনে স্থাপন ও সিংহাসনচ্যুত করিবার মালিক ছিলেন। সুতরাং অভিজাত মাত্রই সিংহাসনের আশা পোষণ করেন এবং বর্তমান সুলতান ও তাঁহার বংশকে সিংহাসনচ্যুত করিতে সমস্ত ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক কূটনীতি ও কুমন্ত্রণায় অংশগ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন। অনেক দুর্বল সুলতান হইতে সিংহাসন কাড়িয়া লইতে তাঁহারা সাফল্যও লাভ করেন। যে কোন সুলতানের প্রতি অভিজাতবর্গের বংশানুক্রমিক আনুগত্যের অভাব দিল্লী সালতানাতের একটি গতানুগতিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

অভিজাতদের কূটনীতি

প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ তাহাদের এলাকায় ভয়ানকভাবে গতিহীন, বাধাহীন ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। যোগাযোগ ও ভৌগোলিক অসুবিধা তাঁহাদিগকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্রশ্রয় দেয়। কেন্দ্রে দুর্বল সুলতানের সুযোগে তাঁহারা কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে খর্ব করিয়া দেন এবং সময় সময় এমনকি স্বাধীনতাও ঘোষণা করেন।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অসীম ক্ষমতা

মধ্যযুগে যোগাযোগের অব্যবস্থার কালে এত বড় সাম্রাজ্য একটি মাত্র কেন্দ্র হইতে শাসন করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। দাক্ষিণাত্য বিজয় একটি দণ্ডনীয় ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয়। দাক্ষিণাত্যের অশেষ বিদ্রোহ রাষ্ট্রের সম্পদের অপচয় ঘটায় এবং পরিণতিতে রাষ্ট্রকে দুর্বল করিয়া দেয়। সামরিক বলপ্রয়োগ ভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকার দাক্ষিণাত্যে ইহার আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হয় নাই।

সাম্রাজ্যের বিশালতা

সাধারণ পতনোন্মুখতার সঙ্গে মুহাম্মদ বিন তুঘলক ও ফিরুজ শাহ তুঘলকের রাজ্যশাসনে অদ্ভুত বেসাদৃশ্য ও এই বিপদকে ত্বরান্বিত করে। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের ভয়াবহ ও কঠোর শাসনব্যবস্থার পর ফিরূজ তুঘলকের কোমল শাসনব্যবস্থা আসে। তাঁহার জায়গীরদারী প্রথার পুনঃ প্রবর্তন শাসন ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণে সহায়তা করে, এবং সামরিক চাকুরি বংশানুক্রমিক করিয়া তিনি পতনের বীজ বপন করেন । ফিরূয তুঘলকের প্রাসাদের ৪০,০০০ ক্রীতদাস কুতুবুদ্দিন আইবেক, ইলতুৎমিশ বা বলবনের মত ক্রীতদাস তৈয়ার করিতে পারে নাই। অধিকন্তু এইসব ক্রীতদাস রাষ্ট্রের একটি স্থায়ী বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

মুহাম্মদ বিন তুঘলক ও ফিরুজ তুঘলকের শাসনের মধ্যে বৈসাদৃশ্য

সালতানাতের পতনের জন্য শুধুমাত্র শাসককে কখনই দায়ী করা যায় না। মুসলিম যোদ্ধারা তাহাদের দুর্ধর্ষ পূর্বপুরুষদের গুণাবলি হারাইয়া ফেলে। তাহারা আরামপ্রিয় ও দুশ্চরিত্র স্বভাবের বশবর্তী হইয়া পড়ে। ইহা সত্যই বড় দুঃখের বিষয় যে, চতুর্দশ শতাব্দী কুতুবুদ্দিন আইবেক, ইলতুৎমিশ, বলবন, আলাউদ্দিন খিলজী ও মালিক কাফুর-এর মত লোক তৈয়ার করিতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তী তুর্কি আফগান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে রণকৌশল ও সামরিক জ্ঞানের শোচনীয়ভাবে অভাব ছিল।

সৈন্য বিভাগে দুর্বলতা

১৩৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ বিজয়ী আমির তৈমুর ভারত আক্রমণ করিয়া জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের অবর্ণনীয় ক্ষতি ও নজিরবিহীন দুর্দশা রাখিয়া যান এবং তখনই সাম্রাজ্য ইহার মৃত্যুবাণ প্রাপ্ত হয়। কথিত আছে, এই আক্রমণ সমগ্র দিল্লী নগরী ধ্বংস করিয়া দেয়। দুই দিনের জন্য কোন পাখি ইহার বাহু বিস্তার করিতে চেষ্টা করে নাই।

বিদেশ আক্রমণ

সুলতান ইব্রাহিম লোদী একজন বোকা ও নিষ্ফল অহংকারী সুলতান ছিলেন।

১৫২৬ সালে মধ্য এশীয় আক্রমণকারী জহিরুদ্দিন বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদীর মৃত্যুর সাথে সাথে দিল্লী সালতানাতের পতন হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

Baveridge : *Memoires of Babar*

Ishwari Prasad : *A Short History of Muslim Rule in India.*

A Halim : *The Lodi Sultans of Delhi.*

Edward Thomas : *The Chronicles of the Pathan kings of Delhi.*

Elliot and Dowson : *History of India as Told by its own Historian, vol-IV*

নবম অধ্যায়
প্রাদেশিক মুসলিম রাজ্যসমূহ

দিল্লী সালতানাতের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সমস্ত রাজ্যের ইতিহাস লিখিতে এক-একটি রাজ্যের উপর এক-এক খণ্ড গ্রন্থের প্রয়োজন, কারণ প্রত্যেক রাজ্যের স্বস্ব ইতিবৃত্ত রহিয়াছে। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষের দিক হইতে মুঘল সাম্রাজ্যে এইগুলির অন্তর্ভুক্তি পর্যন্ত এইসব প্রদেশ সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। সুতরাং ভারতে মুসলিম ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে এই সমস্ত রাজ্যের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থটির স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য ঐ সমস্ত রাজ্যের প্রধান ঘটনাবলির একটি সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদান করা হইল।

বাংলাদেশ

১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলাদেশ বিজয়ের পর হইতে ১৩৩৮ সালে দিল্লীর আধিপত্য অস্বীকার করিবার সময় পর্যন্ত যুগটি বাংলার ইতিহাসে গোলযোগ ও হাঙ্গামায় পরিপূর্ণ। এই সময় দিল্লীর সুলতানদের নিযুক্ত শাসনকর্তাদের দ্বারা বাংলাদেশ শাসিত হয়। প্রাথমিক মুসলিম বাংলার ইতিহাসের জন্য দিল্লী সালতানাতের রাজকীয় ইতিহাসে যেসব ঘটনাবলি অল্প-বিস্তর সংযোজিত হইয়াছে উহার উপরই নির্ভর করিতে হয়। দিল্লী হইতে অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া ইহার শাসনকর্তাগণ অধিক স্বাধীনতা ভোগ করেন। এইসব শাসনকর্তার আধিপত্য দিল্লী সালতানাতের দুর্বল ও ক্ষমতাশালী সুলতান অনুসারে নির্ণয় করা হয়। সুলতান যদি ক্ষমতাশালী হন, তাহা হইলে শাসনকর্তাগণ স্বল্প স্বাধীনতা উপভোগ করেন। পক্ষান্তরে সুলতান যদি দুর্বল হন, তবে শাসনকর্তাগণ অধিক স্বাধীনতা উপভোগ করেন। ভি. এ. স্মীথ বলেন, "শুধু কিছু সীমান্ত যুদ্ধ ব্যতীত প্রদেশটি (বাংলা) অন্যান্য সমস্ত রাজ্যসমূহকে উপেক্ষা করিয়া এবং উহাদের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া নিজের মতানুযায়ী চলে।"

গোলযোগের যুগ

বাংলার রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক স্তরগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, ইহার কয়েকজন শাসনকর্তা দিল্লীর রাজকীয় আধিপত্য অস্বীকার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালান। তাঁহাদের জন্য ইলতুৎমিশ ও বলবনকে বেশ বেগ পাইতে হয়। বলবনের উত্তরাধিকারীদের যুগে বাংলাদেশ প্রায় স্বাধীন হইয়া যায়। কিন্তু গিয়াসুদ্দিন তুঘলক দিল্লীর আধিপত্য পুনরায় বিস্তারকরত ইহাকে তিনভাগে ভাগ করিয়া দেন, এবং যথাক্রমে লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁও ও সোনারগাঁওয়ে রাজধানী স্থাপন করেন। তারপর সেখানে অনেক শাসনকর্তা

ধারাবাহিক বিদ্রোহ
বাংলাকে বিভক্ত করা
স্বাধীনতা ১৩৩৮ খ্রিস্ট
যুক্তবাংলা ১৩৪৫

নিযুক্ত হন এবং অনেক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৩৩৮ সালে বাহরাম খানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ফখরুদ্দিন সাতগাঁওয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ্ উপাধি ধারণ করেন। শীঘ্রই আলাউদ্দিন আলী শাহ্ উত্তর বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তাঁহার রাজধানী লক্ষ্মণাবতী পাণ্ডুয়ায় স্থানান্তরিত করেন। দশ বৎসর রাজত্বের পর ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁহার পুত্র ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী সোনারগাঁওয়ে সিংহাসনে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৩৪৫ সালে হাজী ইলিয়াস সমগ্র বাংলার স্বাধীন সুলতান হন।

ইলিয়াস শাহ্ (১৩৪৫-১৩৫৭) ঃ আলাউদ্দিন আলী শাহের পোষ্যভ্রাতা হাজী ইলিয়াস ১৩৪৫ সালে 'শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্' উপাধি লইয়া বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। তিনিই প্রথম সুলতান, যিনি সমগ্র বাংলার স্বাধীন সুলতান হন।। ১৩৫৩ সালে পূর্ব বাংলা অধিকার করা ছাড়াও ইলিয়াস শাহ্ উড়িষ্যা ও তিরহুত হইতে কর আদায় করেন। তাঁহার রাজত্বের সময় সুলতান ফিরূজ শাহ্ তুঘলক বাংলা পুনরাধিকার করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ইলিয়াস শাহ্ ১৩৫৭ সালে মারা যান। তাঁহার রাজত্বের সময় বাংলার উন্নতি সাধিত হয়। রাজ্যে সর্বদা শান্তি বিরাজ করে। তাঁহার সময় বাংলায় শিল্প ও স্থাপত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়।

উড়িষ্যা ও তিরহুত

সিকান্দার শাহ্ (১৩৫৭-১৩৯৩) ঃ সিকান্দার শাহ ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার পিতা ইলিয়াস শাহের উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার সময় দিল্লীর সুলতান ফিরূজ শাহ্ তুঘলক বাংলা অধিকার করিবার জন্য পুনরায় চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। সিকান্দার শাহ্ শান্তিপূর্ণভাবে ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৩৯৩ সালে তাঁহার পুত্র গিয়াসুদ্দিন আজমের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় তিনি নিহত হন। মুদ্রায় অতি সুন্দর নক্সা এবং বিখ্যাত আদিনা মসজিদ তাঁহার উন্নতিশীল রাজত্বের স্বাক্ষর বহন করে।

পরবর্তী শাসক গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ্ একজন সুযোগ্য সুলতান ছিলেন এবং আইনের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। ১৪০৯ সালে তিনি চীন সাম্রাজ্যের সহিত রাষ্ট্রদূত বিনিময় করেন। ১৭ বৎসর রাজত্বের পর ১৪১০ সালে তিনি প্রাণত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্র সাইফুদ্দিন হামজা শাহ্ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন।

গিয়াসুদ্দিন আজম ১৩৯৩-১৪১০ খ্রিঃ হামজা শাহ্

এই সময় রাজা গনেশ নামে ভাতুরিয়ার একজন জমিদার ক্ষমতা লাভ করেন, এবং হামজা শাহ্ তাঁহার হাতের ক্রীড়নক হিসাবে রাজত্ব করেন। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতানুসারে রাজা গনেশ একজন স্বাধীন রাজা হিসাবে বাংলা শাসন করেন। তিনি তাঁহার পুত্র যদুর নামে সিংহাসন ত্যাগ করেন। পরে যদু মুসলমান হইয়া যান এবং জালালুদ্দিন মুহাম্মদ নাম ধারণ করিয়া ১৪১৪ সালে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। জালালুদ্দিন মুহাম্মদ ১৪৩১ সালে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র শামসুদ্দিন আহমদ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন এবং ১৪৪২ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁহার অত্যাচারের ফলে তিনি প্রজাসাধারণের বিরাগভাজন হন। অতএব তিনি শাদী খান ও নুসরাত খান নামে দুইজন পদস্থ কর্মচারীর শিকারে পরিণত হন। কিন্তু শীঘ্রই নুসরাত খান শাদী খানকে হত্যা করেন, কারণ উভয়েই

রাজা গণেশ জালালুদ্দিন মুহমদ শামসুদ্দিন আহাম্মদ (১৪৩১-১৪৪২)

ক্ষমতার জন্য লালায়িত ছিলেন। নুসরাত খান মাত্র কয়েকদিন রাজত্ব করিবার পর শামসুদ্দিন আহমদের সমর্থক অভিজাতবর্গ কর্তৃক নিহত হন। অভিজাতবর্গ পরে নাসিরুদ্দিন নামে হাজী ইলিয়াসের একজন দৌহিত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তিনিই নাসিরুদ্দিন আবুল মুজাফফার মাহমুদ শাহ্ উপাধি লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁহার সাথে পুরাতন ইলিয়াস শাহী বংশ পুনরায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।

নাসিরুদ্দিন মাহমুদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রুকনুদ্দিন বারবাক শাহ্ ১৪৬০ সালে উত্তরাধিকারী হন। তিনি আবিসিনিয়া হইতে বহু সংখ্যক ক্রীতদাস আমদানি করেন। ১৪৭৪ সালে তাঁহার পুত্র ইউসুফ শাহ্ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ইউসুফ শাহের সময়েই সিলেট জয় করা হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় সিকান্দার শাহকে সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। তিনি একজন অপদার্থ পুত্র বলিয়া প্রমাণিত হন। অতঃপর নাসিরুদ্দিন মাহমুদের আরেক পুত্র জালালুদ্দিন ফতেহ খানকে সিংহাসনে দেওয়া হয়। তিনি আবিসিনীয় ক্রীতদাসদের ক্রমবর্ধমান বিপদ বুঝিতে পারেন এবং নিষ্ফলভাবে তাহাদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন। ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে তাহারা জালালুদ্দিন ফতেহ খানকে হত্যা করে এবং তাহাদের নেতা 'বারবাক শাহ্' উপাধি লইয়া ক্ষমতা কাড়িয়া লন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি আবিসনীয়গণ কর্তৃক নিহত হন এবং আরেকজন নেতা ইনদিল খান অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর অভিজাতবর্গ ফতেহ খানের একজন পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। শীঘ্রই তিনি আবিসিনীয় নেতা সিদি বদর কর্তৃক নিহত হন। সিদি বদরের অত্যাচারে সবাই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, এমনকি তাঁহার মন্ত্রী সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসাইন শাহ্ও বিরক্ত হইয়া যান। শেষ পর্যন্ত অভিজাতবর্গ ১৪৯৩ সালে আলাউদ্দিন হোসাইন শাহ্কে সিংহাসনে স্থাপন করেন।

হোসাইন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৮) : হোসাইন শাহ্ কর্তৃক বাংলার সিংহাসন অধিকার এই দেশের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আবিসিনীয়দিগকে বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া তিনি দেশে শান্তি ও স্থায়িত্ব আনয়ন করেন। ১৪৯৪ সালে সিকান্দার লোদী জৌনপুরের হোসাইন শাহ্ সারকীকে বিতাড়িত করিলে তিনি সারকীকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। শান্তি ও শৃংখলা স্থাপন করিয়া তিনি বাংলা এলাকাসমূহ পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করেন এবং এইভাবেই তিনি দক্ষিণে উড়িষ্যার সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হন। জৌনপুরের সারকীদের হাত হইতে তিনি মগধ পুনরাধিকার করেন এবং কুচবিহারের কমতাপুর অধিকার করেন। তাঁহার আসাম অভিযান ব্যর্থ হয়। ১৫১৮ সালে হোসাইন শাহ্ প্রাণ ত্যাগ করেন।

হোসাইন শাহী বংশ
১৪৯৩-১৫১৮ খ্রিঃ
বিজয়
মৃত্যু

ডঃ কালী কিংকর দত্ত বলেন : "একজন বিদ্বান ও জ্ঞানীলোক, হোসাইন শাহ্ বাংলার শাসকদের মধ্যে সবচাইতে জনপ্রিয় ছিলেন।"[১] সমগ্র বাংলায় এখনও তাঁহার নাম সর্বপরিচিত এবং তাঁহার সময়ে কখনও কোন গোলযোগ বা বিদ্রোহ দেখা দেয় নাই। প্রজাদের ভালোবাসা এবং প্রতিবেশীদের দ্বারা সম্মানিত হইয়া তিনি একটি শান্তিপূর্ণ ও সুখী রাজত্ব উপভোগ করেন।[২] অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করিবার জন্য তিনি প্রাসাদরক্ষীদিগকে দমন করেন। বাংলার বিভিন্ন অংশে তিনি মসজিদ ও দানছত্র নির্মাণ

কৃতিত্ব
ভক্তি মতামত
সত্যপীর মতবাদ
বাংলা ভাষার উন্নতি

করেন। সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য তিনি সীমান্ত ফাঁড়ি স্থাপন করেন। তাঁহার রাজত্বের সময় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ঋষি শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার ভক্তি মতবাদ প্রচার করেন। হিন্দু ও মুসলমানদের একতার জন্য হোসাইন শাহ্ 'সত্যপীর' মতবাদ প্রচার করেন। হোসাইন শাহের সময়েই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি আরম্ভ হয়। তাঁহার সময় প্রসিদ্ধ কবি পরমেশ্বর 'মহাভারত' গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় বিজয় গুপ্ত প্রসিদ্ধ পদ্মপুরাণ' বাংলায় অনুবাদ করেন। দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেন ঃ "মুসলিম সম্রাট ও প্রধানদের পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুগ্রহই বাংলা ভাষাকে হিন্দু রাজাদের দরবারে অনুমোদনের সূচনা করে।" ভি. এ. স্মীথ মন্তব্য করেন ঃ "হিন্দু রাজাদের ব্রাহ্মণ শিক্ষকদের পরিচালনায় সংস্কৃত ভাষার উৎসাহ দানের দিকে অধিক ঝোঁক ছিল।"

নুসরাত শাহ্ (১৫১৮-১৫৩৩) ঃ পিতার মত নুসরাত শাহ্ও একজন সুযোগ্য ও জ্ঞানী সুলতান ছিলেন। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন এবং তাঁহার ভাইদের প্রতি তিনি সুবিচার করেন, যাহা সাধারণত ভারতের অন্যান্য সুলতানদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। তিনি তিরহুত আক্রমণ করিয়া ইহা অধিকার করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের সঙ্গে তিনি একটি সম্মানজনক শান্তিচুক্তি করেন। পিতার ন্যায় নুসরাত শাহ্ও শিল্প ও সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গৌড়ে তিনি অনেকগুলি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং বাংলা সাহিত্যের উন্নতিতে সাহায্য করেন। ১৫৩৩ সালে প্রাসাদক্রীত দাসগণ কর্তৃক নুসরাত শাহ্ নিহত হন। তাঁহার পুত্র আলাউদ্দিন ফিরুজ শাহ্ তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি তাঁহার চাচা হোসাইন শাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ কর্তৃক নিহত হন। আফগান নেতা শের খান সূর কর্তৃক তিনি বাংলা হইতে বিতাড়িত হন।

বাবরের সাথে শান্তিচুক্তি
হোসাইন শাহী বংশের পতন

শের খান সূর বাংলাকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন এবং জেলা কর্মকর্তাদের তাঁহার নিকট দায়ী করেন। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী ইসলাম খান এই ব্যবস্থা পাল্টাইয়া মুহাম্মদ খান সূরকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১৫৬৩ সালে সুলাইমান কররানী বাংলা ও বিহারের স্বাধীন সুলতান হন। ১৫৭৬ সালে শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাট আকবর সুলাইমান কররানীর পুত্র ও উত্তরাধিকারী দাউদের হাত হইতে বাংলা অধিকার করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় বাংলায় পুরাপুরি শান্তি প্রতিষ্ঠা করা পর্যন্ত ইহা লইয়া মুঘল, আফগান-প্রধান ও বাংলার প্রসিদ্ধ বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম চলে।

আফগানদের অধীনে বাংলা
আকবর কর্তৃক চূড়ান্ত অধিকার

মালব

হিন্দু আমলে মালব প্রসিদ্ধ রাজ্যসমূহের পীঠস্থান ছিল। ১২৩৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ইলতুৎমিশ এই রাজ্য আক্রমণ করেন। ১৩১০ সালে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী ইহা জয় করেন এবং সুলতান ফিরুজ শাহ্ তুঘলকের সঙ্গে দিল্লী সালতানাতের পতন পর্যন্ত মালব মুসলিম শাসনকর্তাগণ কর্তৃক শাসিত হয়।

ঘুরী বংশ ঃ ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দের কিছুকাল পর দেলোয়ার নামক মুহাম্মদ ঘুরীর একজন বংশধর ১৪০১ সালে সুলতান 'শিহাবুদ্দিন ঘুরী' উপাধি ধারণ করিয়া মালবে একটি রাজ্য

স্থাপন করেন। ১৪০৫ সালে তিনি মারা যান। তাঁহার পুত্র আলাপ খান 'হুসাং শাহ' উপাধি লইয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী হন এবং তাঁহার রাজধানী ধর হইতে মান্দুতে স্থানান্তরিত করেন।

শিহাবুদ্দিন ঘুরী হুসেন শাহ গজনী খান

হুসাং শাহ্ মান্দুতে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন। মালবের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও ইহার জমির উর্বরতা ইহাকে সর্বদা গুজরাট, জৌনপুর এবং দিল্লীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত রাখে। গুজরাটের সঙ্গে এই ধরনের একটি যুদ্ধে হুসাং শাহ্ পরাজিত ও এক বৎসরের জন্য বন্দি হন। পরে তাঁহাকে পূর্ব সিংহাসনে বহাল করা হয়। ১৪৩২ সালে তাঁহার পুত্র গজনী খান তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু নূতন সুলতান রাষ্ট্রীয় কাজে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকেন। ফলে ১৪৩৬ সালে তাঁহার প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ খান নামে একজন খিলজী তুর্কি মালবের সিংহাসন জবরদখল করেন।

খিলজী বংশ ঃ মাহমুদ খিলজী মালবের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মালব একটি শক্তিশালী ও উন্নত রাজ্যে পরিণত হয়। রাজপুতানা, গুজরাট ও বাহমনী সুলতানদের বিরুদ্ধে অশেষ যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি সমগ্র ভারতে একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ঐতিহাসিক ফেরিস্তা লিখেন ঃ "মালবের সুলতান মাহমুদ নম্র,

মাহমুদ খিলজী

সাহসী, ন্যায়পরায়ণ ও বিদ্বান ছিলেন, এবং তাঁহার রাজত্বের সময় তাঁহার প্রজাগণ, হিন্দু মুসলিম উভয়েই সুখী ছিল এবং একে অন্যের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আদান-প্রদান করে.......। তাঁহার বিশ্রামের সময় তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন রাজা ও দরবারের স্মৃতির ইতিহাস শ্রবণে মনোনিবেশ করেন।" মাহমুদ খিলজী তাঁহার রাজ্যকে বর্ধিত করিয়া দক্ষিণে সাতপুরা পর্বতশ্রেণী, পশ্চিমে গুজরাট, পূর্বে বান্দেলখণ্ড ও উত্তরে মেবার পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ১৪৬৯ সালে মাহমুদ প্রাণ ত্যাগ করেন।

পরবর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দিন খুবই শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র তাঁহাকে বিষপানে হত্যা করিয়া ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন দখল করেন। ১৫১০ সালে দ্বিতীয় মাহমুদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। দ্বিতীয় মাহমুদ মেদিনী রাও নামে একজন রাজপুত অভিজাতকে মন্ত্রীপদে নিয়োগদান করেন। ফলে রাজ্যে রাজপুত দৌরাত্ম্য বাড়িয়া যায়। অতঃপর দ্বিতীয় মাহমুদ এক যুদ্ধে মেবারের রানা সংঘ কর্তৃক ধৃত হন। কিন্তু পরে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া

সম্রাট হুমায়ুন কর্তৃক মুঘল শাসন

হয়। পরে রানাদের বন্ধু গুজরাটের বাহাদুর শাহ্ কর্তৃক দ্বিতীয় মাহমুদ নিহত হন। ১৫৩১ সালে মালব গুজরাটের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। ১৫৩৫ সালে বাহাদুর শাহ্ মুঘল সম্রাট হুমায়ুন কর্তৃক মালব হইতে বিতাড়িত হন, এবং মালব মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। আফগানদের সময় ইহা আফগান শাসনকর্তাগণ দ্বারা শাসিত হয়। ১৫৬২ সালে সম্রাট আকবরের সেনাপতিগণ পাকাপাকিভাবে মালব অধিকার করেন। তৎকালীন আফগান শাসনকর্তা বাজ বাহাদুর মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং রাজকীয় অনুগ্রহের চিহ্ন স্বরূপ তাহাকে ২০০০ অশ্বারোহীর সেনাপতিত্ব প্রদান করা হয়।

গুজরাট

গজনীর সুলতান মাহমুদ সর্বপ্রথম গুজরাট জয় করেন এবং তারপর মুসলিম বিজয়িগণ তথায় অনেকগুলি অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু স্থায়ী বিজয়ের দিকে কেহই মনোনিবেশ

করেন নাই। ১২৯৭ সালে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী গুজরাটের বাঘেলা রাজপুত রাজা কর্নকে পরাজিত করিয়া ইহাকে দিল্লী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন। যতদিন দিল্লী সালতানাত স্থায়ী ছিল, ততদিন পর্যন্ত ইহার সুলতানগণ গুজরাটে শাসনকর্তা প্রেরণ করেন।

মুসলিম বিজয়

গুজরাটে দিল্লী কর্তৃক নিযুক্ত শেষ শাসনকর্তা জাফর খান মূলত স্বাধীনভাবেই গুজরাটে ছিলেন। কিন্তু ১৪০১ সালে তিনি সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁহার পুত্র তাতার খানকে তিনি 'নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ' উপাধি দিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু পরে জাফর খান স্বয়ং মুজাফফর শাহ উপাধি লইয়া গুজরাটের সুলতান হইয়া যান। পরবর্তীকালে তাঁহার দৌহিত্র আলপ খান 'আহমদ শাহ্' উপাধি লইয়া গুজরাটের সুলতান হন।

স্বাধীনতা মুজাফফর শাহ

১৪১১ হইতে ১৪৪১ সাল পর্যন্ত আহমদ শাহ্ রাজত্ব করেন এবং তাঁহাকে 'স্বাধীন গুজরাট রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা' বলিয়া অভিহিত করা যায়। রাজ্যের বিস্তার, ইসলাম প্রচার ও তাঁহার রাষ্ট্রের শাসনকার্যের উন্নতি সাধনে তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। সমগ্র রাজত্বকালে তিনি কখনও পরাজয় বরণ করেন নাই। আহমদ শাহ শ্রেষ্ঠ ও মনোমুগ্ধকর 'আহমদাবাদ' নগরী স্থাপন করেন। ১৪৪১ সালে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন।

আহমদ শাহ (১৪১১-১৪৪১) আহমদাবাদ নগরী প্রতিষ্ঠা

পরবর্তী সুলতান ছিলেন মাহমুদ বিগারহ। তিনি আহমদ শাহের দৌহিত্র ছিলেন এবং ১৩ বৎসর বয়সে ১৫৫৯ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৫১১ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার বংশের মধ্যে তিনি সর্বপ্রসিদ্ধ সুলতান ছিলেন। তাঁহার কৃতিত্ব এত উজ্জ্বল যে, তিনি সুদূর ইউরোপেও একজন পৌরাণিক ব্যক্তি হইয়া দাঁড়ান। যুদ্ধবিগ্রহে তিনি সর্বদা সাফল্য লাভ করেন। তিনি চম্পানীর ও জুনাগড় দুর্গ অধিকার করেন এবং কচ্ছ ও আহমদনগর পর্যন্ত জয় করেন। সুলতান মাহমুদ পর্তুগীজদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য তুর্কি সুলতান হইতে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্মিলীত বাহিনী চউলের নিকট পর্তুগীজদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। কিন্তু পরে সুলতান পর্তুগীজদের নিকট দিউ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

মাহমুদ বিগারহ (১৪৫৯-১৫৫৯) পর্তুগীজদের পরাজয়

মাহমুদ বিগারহের পর তাঁহার দৌহিত্র বাহাদুর শাহ্ ১৫২৬ সালে সুলতান হইয়া ১৫৩৭ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। মালবের দ্বিতীয় মাহমুদ খিলজীকে পরাজিত করিয়া এবং ১৫৩৪ সালে চিতোর দুর্গ বলপূর্বক আক্রমণ করিয়া তিনি তাঁহার পূর্ণ সামরিক খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু পরবর্তী বৎসর তিনি মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। বাহাদুর শাহ্ মালবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সম্রাট হুমায়ুন শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইলে বাহাদুর শাহ্ পুনরায় গুজরাটে প্রত্যাবর্তন করেন। পর্তুগীজদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক শত্রুতামূলক ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৫৩৭ সালে পর্তুগীজ শাসনকর্তা নূনো দ্য চুনহা (Nuno da Cunha)-এর জাহাজে তিনি বিশ্বাসঘাতকতার সহিত নিহত হন। তিনি কোন পুত্র সন্তান রাখিয়া যান নাই। তাহার উত্তরাধিকারীদের হাতে রাষ্ট্রের কার্যাবলি বিশৃঙ্খল হইয়া যায় এবং তারপর ১৫৭২ সালে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে গুজরাট মুঘলদের হস্তগত হয়।

বাহাদুর শাহ (১৫২৬-১৫৩৭) ১৫৭২ সালে মুঘলদের হস্তগত

কাশ্মীর

১৩১৫ খ্রিস্টাব্দে সোয়াতের অধিবাসী শাহ্ মির্জা নামে জনৈক মুসলিম অভিযাত্রী কাশ্মীরের এক হিন্দু রাজার অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। হিন্দু রাজা মারা যাইবার পর শাহ্ মির্জা ১৩৩৯ সালে শামসুদ্দিন শাহ্ উপাধি লইয়া কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করেন। ১৩৪৯ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার চারি পুত্র—জামসেদ, আলাউদ্দিন, শিহাবুদ্দিন, কুতুবুদ্দিন পর্যায়ক্রমে প্রায় ৪৬ বৎসর কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। ১৩৯৪ খ্রিস্টাব্দে কুতুবুদ্দিনের পুত্র সিকান্দার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

শামসুদ্দিন মির্জা (১৩৩৯-১৩৪৯)

সিকান্দার ২২ বৎসর রাজত্ব করেন। আমির তৈমুরের ভারত আক্রমণের সময় সিকান্দার এই দিগ্বিজয়ীর সহিত দূত বিনিময় করেন। তিনি সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং পারস্য, আরব ও মেসোপটেমিয়ার (আধুনিক ইরাক) বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ তাঁহার দরবারে জমায়েত হন। ১৪১৬ সালে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আলী শাহ্ কয়েক বৎসর রাজত্ব করেন। তারপর তাঁহার ভ্রাতা শাহী খান ১৪২০ সালে 'জয়নুল আবেদিন' উপাধি লইয়া কাশ্মীরের ক্ষমতা জবরদখল করেন।

সিকান্দার (১৩৯০-১৪৬৬)

জয়নুল আবেদিন একজন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সার্বজনীন সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করেন। বিতাড়িত ব্রাহ্মণদিগকে তিনি আমন্ত্রণ জানান এবং হিন্দুদের উপর হইতে জিজিয়া কর উঠাইয়া দেন। স্থানীয় অপরাধের জন্য গ্রাম্য সম্প্রদায়কে দায়ী করিবার তাঁহার এই নীতি চুরি ও বড় রাস্তার ডাকাতি অনেকাংশে কমাইয়া দেয়। জনসাধারণের উপর হইতে করের বোঝা তিনি হাল্কা করিয়া দেন এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি সাহিত্য, কলা ও সুরের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁহার সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারত ও রজতরঙ্গিণী মহাকাব্যদ্বয়কে সংস্কৃত হইতে ফার্সিতে অনুবাদ করা হয়। তাঁহাকে যথার্থভাবে কাশ্মীরের আকবর (Akbar of Kashmir) বলা হয়। ১৪৭০ সালে জয়নুল আবেদিন প্রাণ ত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্র হায়দার শাহ্ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন।

জয়নুল আবেদিন (১৪২০-১৪৭০)

কাশ্মীরের পরবর্তী ইতিহাস তেমন উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ নহে। মির্জা হায়দার নামে হুমায়ুনের এক আত্মীয় ১৫৪১ সাল পর্যন্ত ১১ বৎসর রাজত্ব করেন। কয়েক বৎসর পর চক বংশ কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করে। সম্রাট আকবরের সময় ইহাকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জৌনপুর

১৩৬০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বার বাংলার সিকান্দার শাহের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় সুলতান ফিরুজ তুঘলক এই নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। আমির তৈমুরের ভারত আক্রমণের সময় খাজা জাহান নামে দিল্লী সালতানাতের একজন উজির দিল্লীর বশ্যতা অস্বীকার করিয়া জৌনপুরে একটি স্বাধীন বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান মাহমুদ তুঘলক খাজা জাহানকে 'মালিক-উস-সার্ক' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে এই বংশকে 'সারকী বংশ' বলা হয়। ১৩৯৯ সালে খাজা

খাজা জাহান মুবারক শাহ (১৩৯৯-১৪০২)

জাহানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কারানফুল সারকী তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়া 'মুবারক শাহ্ সারকী' উপাধি গ্রহণ করেন। ১৪০২ সালে মুবারক শাহ্ মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁহার ভ্রাতা ইব্রাহিম শাহ্ সারকী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

ইব্রাহিম শাহ্ সারকী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। তিনি কলা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফলে জৌনপুর মুসলমানদের একটি শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইব্রাহিম শাহ্ একজন শ্রেষ্ঠ স্থপতি ছিলেন। তিনি অনেকগুলি সুরম্য অট্টালিকা ও মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৪০৭-১৪০৮ সালে তিনি জৌনপুরের বিখ্যাত অতলাদেবী মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁহার সময় 'জৌনপুর নমুনা স্থপতি' নামে একটি আলাদা ধরনের স্থাপত্য কৌশল গ্রহণ করা হয়। ১৪৩৬ সালে ইব্রাহিম শাহ মৃত্যুবরণ করিলে তাঁহার পুত্র মাহমুদ শাহ উত্তরাধিকারী হন এবং চুনারের এক বিরাট এলাকা অধিকার করেন। দিল্লী অধিকারের চেষ্টা করিবার সময় মাহমুদ শাহ্ দিল্লীর বাহলুল লোদী কর্তৃক পরাজিত হন। ১৪৫৭ সালে মাহমুদ শাহ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র মুহাম্মদ শাহ্ নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। অচিরেই তিনি অভিজাতদের অপ্রিয়ভাজন হইয়া পড়েন এবং তাহাদের দ্বারা নিহত হন। অভিজাতবর্গ তাঁহার ভ্রাতা হোসাইন শাহ্‌কে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।

ইব্রাহিম শাহ
(১৪০২-১৪৩৬)
মাহমুদ শাহ
(১৪৩৬-১৪৫৭)
মুহাম্মদ শাহ

১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে হোসাইন শাহ দিল্লীর বাহলুল লোদীর সঙ্গে চারি বৎসরের একটি শান্তিচুক্তি করেন। এই চারি বৎসর তিনি জমিদারদের দমন ও অভিজাতদের ক্ষমতা হ্রাস করিবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। উড়িষ্যা ও গোয়ালিয়রে তিনি সাফল্যজনক অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু শীঘ্রই অবস্থা পাল্টাইয়া যায় এবং আফগানদের বিরুদ্ধে পুনরুজ্জীবিত হইয়াও তিনি বাহলুল লোদী কর্তৃক বিতাড়িত হন। অতঃপর জৌনপুর দিল্লী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

হোসাইন শাহ
(১৪৫৮-১৪৬৭)

জৌনপুরে ৮৫ বৎসরের সারকী শাসন ইহার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। প্রায় সব সারকী শাসকরাই সাহিত্য ও স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দেশটি সর্বদিক হইতে উন্নতিশীল ছিল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চরম উন্নতির ফলে এই দেশকে ভারতের শিরাজ (The Shiraz of India) বলা হইয়া থাকে।

বাহমনী রাজ্য
(১৩৪৭-১৫২৬ খ্রিঃ)

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক-এর রাজত্বের শেষভাগে দিল্লীর আমিরগণ ইসমাইল মুখ নামে একজন আফগানকে তাহাদের সুলতান বানাইয়া দাক্ষিণাত্যে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তিনি এই পদের বিবেচনায় অধিক বৃদ্ধ ছিলেন। তাই তিনি হাসান নামে আরেকজন যোগ্য লোকের সপক্ষে পদত্যাগ করেন। হাসান জনসাধারণ্যে জাফর খান নামে পরিচিত ছিলেন এবং দিল্লী সালতানাতের অধীনে একজন পারস্যবাসী পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবুল মুজাফফর আলাউদ্দিন 'বাহমন শাহ্' উপাধি লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। পারস্যের বিখ্যাত নেতা ও ইসফানদিয়ারের পুত্র বাহমন বংশের লোক ছিলেন বলিয়া তিনি বাহমন উপাধি গ্রহণ

স্বাধীনতা
আলাউদ্দিন হাসান
(১৩৪৭-১৩৫৮)

করেন। সুতরাং তাঁহার বংশ বাহমনী বংশ নামে পরিচিত হয়। এই বংশ পরিচয় দ্বারা ফেরিস্তা বর্ণিত কাহিনীকে খণ্ডন করা হয়। ফেরিস্তা বলেন যে, হাসান দিল্লীর একজন ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর ক্রীতদাস ছিলেন—এই কাহিনীর পিছনে কোন সত্যতা নাই। অধিকন্তু কোন মুসলিম ঐতিহাসিক এই কাহিনীর কথা উল্লেখ করেন নাই। এমনকি কোন মুদ্রাও ফেরিস্তার এই কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করে না।

আলাউদ্দিন হাসান গুলবারগায় তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন এবং ইহাকে আহ্সানাবাদে নামান্তরিত করেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর আলাউদ্দিন দাক্ষিণাত্যের এক বিশাল অংশ জয় করেন। ১৩৫৮ সালে তাঁহার মৃত্যুর সময় তাঁহার অধীনস্থ বিরাট রাজ্যের সীমা পশ্চিমে আরব সাগর, পূর্বে ভঙ্গীর, দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী এবং উত্তরে ওয়াঙ্গেনা নদী (Pen Ganga) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

হাসান বাহমনীর কৃতিত্ব

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি রাজ্যকে গুলবারগা, দৌলতাবাদ, বেরার ও বিদার—এই চারিটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হাতে সামরিক-বেসামরিক শাসনকার্য পরিচালনা এবং কর্মচারী নিয়োগের ভার ন্যস্ত হয়। আলাউদ্দিন হাসান একজন ন্যায়পরায়ণ ও সুযোগ্য সুলতান ছিলেন এবং তাঁহার শাসনকার্যের দক্ষতার ফলে বিদ্রোহগুলি কার্যকরভাবে বন্ধ হইয়া যায়। সেই সঙ্গে তিনি দাক্ষিণাত্যে ইসলাম প্রচারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চালান।

আলাউদ্দিন হাসানের পুত্র প্রথম মুহাম্মদ শাহ্ তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার রাজত্ব প্রধানত বরঙ্গল ও বিজয়নগরের বিরুদ্ধে ভয়াবহ যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে অতিবাহিত হত। বিজয়নগর রাজ্য সর্বদা বাহমনা রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। কিন্তু বাহমনী সুলতানগণ বিজয়নগর রাজ্যকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং অপমানজনক চুক্তিতে শান্তি স্থাপন করিতে বাধ্য করেন। প্রথম মুহাম্মদ শাহ্ দস্যুদের বিরুদ্ধে সর্বদা কঠোর ছিলেন এবং তাঁহার ভয়াবহ শাস্তি প্রদান দ্বারা দস্যুবৃত্তি চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়। তিনি সরকারি শাখাসমূহকে উজির পরিষদ, দেহরক্ষীবাহিনী ও প্রাদেশিক শাসন কার্য—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন। কিন্তু সুলতান নিজে অধার্মিক জীবন যাপন করেন। ১৩৭৭ সালে প্রথম মুহাম্মদ শাহ পরলোক গমন করেন।

প্রথম মুহাম্মদ শাহ (১৩৫৮-১৩৭৭)

পরবর্তী সুলতান মুজাহিদ বাংকাপুর দুর্গ জয় করেন এবং অনেকগুলি যুদ্ধ জয়করত ইহার রাজাকে স্থান হইতে স্থানান্তরে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার চাচা দাউদ কর্তৃক তিনি নিহত হন। তারপর হাসান বাহমনীর চতুর্থ পুত্র দ্বিতীয় মুহাম্মদ শাহ্ সুলতান হন। তিনি একজন শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ও এতিমখানা নির্মাণে তিনি তাঁহার ক্ষমতা ব্যয় করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে ১৩৯৭ সাল পর্যন্ত সময়টি অনেক ষড়যন্ত্র ও দুর্বল সুলতানদের মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত হয়।

মুজাহিদ মুহাম্মদ শাহ

তাজুদ্দিন ফিরূজ শাহ্ বাহমনী রাজ্যের অষ্টম সুলতান ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের সময় বিজয়নগরের রাজা মুদকল ও রাইচুর পুনরাধিকার করিবার জন্য বাহমনী রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু ফিরূজ শাহ তাহাদিগকে এমন কঠোর শিক্ষা দেন যে, বিজয়নগর রাজ্য শেষ পর্যন্ত অনেক স্বর্ণমুদ্রা দিয়া মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে তাহাদের

ফিরূজ শাহ (১৩৯৭-১৪২২)

রাজ্য হইতে বাহির করিতে বাধ্য হয়। আরেকবার বিজয়নগরের রাজা বাহমনী সুলতানকে তাঁহার কন্যাদান করিয়া একটি চুক্তি করিতে বাধ্য হন। বিজয়নগরের রাজন্যবর্গ বাহমনী সুলতানদিগকে বাৎসরিক কর প্রদানে বাধ্য হন। ফিরুজ সর্বদা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিজয়ীবেশে ফিরেন। কিন্তু ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণা নদীর উত্তরে 'পঙ্গল' নামক স্থানে তিনি এক শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন এবং ভগ্নহৃদয়ে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতা আহমদের হাতে তিনি সিংহাসন ছাড়িয়া দেন এবং ১৪২২ সালে পরলোকগমন করেন। সুলতান ফিরুজ শাহ্ সর্বদা বিদ্বান লোকদের সাহায্য পছন্দ করেন। রাজধানীতে তিনি অনেকগুলি চমৎকার মসজিদ নির্মাণ করেন। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল বড় মসজিদ, যাহা তিনি স্পেনের কর্ডোভায় অবস্থিত বড় মসজিদের নমুনায় নির্মাণ করেন। ঐতিহাসিক ফেরিস্তা মন্তব্য করেন, "সুলতান ফিরুজের সময় বাহমনী রাজ্য খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে।"

সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে সুলতান ফিরুজের সময় বাহমনী সৈন্যবাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতির প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য আহমদ শাহ্ হিন্দুদের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করেন। বাহমনী সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বিজয়নগর অবরোধের ফলে এই নগরীর অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করে এবং ইহার রাজা অবশেষে শান্তি স্থাপনের জন্য একটি মোটা অংকের কর আদায় করিতে বাধ্য হন। অতঃপর আহমদ শাহ্ বরঙ্গল দুর্গ অধিকার করেন এবং হিন্দু রাজ্য সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেন। তারপর তিনি মালবের হুসাং শাহকে পরাজিত করেন। কিন্তু গুজরাটের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আহমদ শাহ্ তাঁহার রাজধানী আহসানাবাদ (গুলবারগা) হইতে বিদারে স্থানান্তরিত করেন। তিনি বিদ্বান লোকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং শেখ আযারী ও মাওলানা সরফুদ্দিন মাজানদারানীর মত বিখ্যাত সুধীবৃন্দ তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করেন। ১৪৩৫ খ্রিস্টাব্দে আহমদ শাহ্ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আহমদ শাহ (১৪২২-১৪৩০)

আহমদ শাহের পুত্র দ্বিতীয় আলাউদ্দিন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। রাজত্বের প্রথমদিকে তিনি তাঁহার ভ্রাতা মুহাম্মদের একটি বিদ্রোহ দমন করেন। তারপর তিনি কংকান জয় করেন। যুদ্ধকৌশল শিক্ষা করিবার জন্য বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় দেব রায় অনেক মুসলমানকে তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করেন এবং তাহাদিগকে জায়গীর প্রদান করেন। এমনকি তিনি তাঁহাদের সন্তুষ্টির জন্য বিজয়নগরে একটি মসজিদও নির্মাণ করেন। এই পুনর্গঠিত সৈন্যবাহিনী লইয়া তিনি ১৪৪৩ সালে রায়চর দোয়াব আক্রমণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় আলাউদ্দিন তাঁহাকে সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য করেন। দ্বিতীয় আলাউদ্দিন একজন ইসলাম প্রচারক ছিলেন। ফেরিস্তা বলেন, "তিনি মসজিদ, পাবলিক স্কুল এবং হাসপাতাল ও সরাইখানার মত দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করেন।" তিনি ছিলেন একজন কঠোর শাসক, শ্রেষ্ঠ স্থপতি এবং শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক। দ্বিতীয় আলাউদ্দিন ১৪৫৭ সালে প্রাণ ত্যাগ করেন এবং পুত্র হুমায়ুন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

আলাউদ্দিন (২) (১৪৩৫-১৪৫৭)

হুমায়ুন একজন রক্তপিপাসু অত্যাচারী ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে তিনি বহু বৎসর পর্যন্ত জালিম বা অত্যাচারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ১৪৬১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার শিশুপুত্র ও উত্তরাধিকারী নিজাম শাহের আমলে উড়িষ্যা ও তেলিঙ্গানার হিন্দু রাজাগণ এবং তৎসঙ্গে মালবের প্রথম মাহমুদ খিলজী বাহমনী রাজ্যকে

হুমায়ুন নিজাম শাহ

হুমকি প্রদর্শন করেন। যাহা হউক, গুজরাটের সুলতান মাহমুদ বাগেরহা এই অবস্থা হইতে নিজাম শাহকে উদ্ধার করেন। নিজাম শাহ্ ১৪৬৩ খ্রিস্টাব্দে মারা যান এবং তাঁহার ভ্রাতা তৃতীয় মুহাম্মদ শাহ্ উত্তরাধিকারী হন।

রাজত্বের প্রথমদিকেই তৃতীয় মুহাম্মদ শাহ্ ক্ষমতার অপব্যবহারকারী পুরাতন মন্ত্রী খাজা জাহানকে হত্যা করেন। তাঁহার পদে খাজা মাহমুদ গাওয়ান নামে একজন পারস্যবাসীকে মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হয়। মাহমুদ গাওয়ান সামরিক ও বেসামরিক শাসনকার্য উভয়ক্ষেত্রেই সম দক্ষ ছিলেন। তৃতীয় মুহাম্মদ শাহের সমস্ত কৃতিত্ব মাহমুদ গাওয়ানেরই প্রাপ্য। তিনি আনুগত্যের সাথে বাহমনী বংশের অধীনে কাজ করেন এবং রাজ্যের সীমা এতদূর বিস্তৃত করেন, যাহা ইতোপূর্বে আর কোন সুলতানের আমলে সাধিত হয় নাই।

মুহাম্মদ শাহ (১৪৬৩-১৪৮২) খাজা মাহমুদ গাওয়ান

১৪৭৩ সালে মাহমুদ গাওয়ান বিলগাঁওয়ের সুদৃঢ় দুর্গ অধিকার করেন এবং বিজয়নগরের হাত হইতে গোয়া পুনরুদ্ধার করেন। কংকনের হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে অভিযানের সময় তিনি অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করেন এবং সঙ্গমেশ্বরের রাজা তাঁহার প্রতিনিধির নিকট খেলনা দুর্গ সমর্পণ করেন। এই আমলের সবচাইতে সাফল্যজনক কীর্তি হইল কাঁচির বিরুদ্ধে অভিযান। এই অভিযান "অসংখ্য ক্রীতদাসী ছাড়াও অবর্ণনীয় লুক্কায়িত ধন-সম্পদ ও অলংকার এবং মূল্যবান মণিমুক্তা" প্রদান করে। উড়িষ্যার বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযানও অনেক লুণ্ঠিত দ্রব্য ও হস্তী লইয়া ফিরিয়া আসে।

মাহমুদ গাওয়ানের বিজয়সমূহ

তৃতীয় মুহাম্মদ শাহ্র রাজত্বের সবচাইতে মর্মান্তিক ঘটনা হইল, সুযোগ্য মন্ত্রী খাজা মাহমুদ গাওয়ানের মৃত্যুদণ্ড। অভিজাতবর্গের স্বার্থপর কোন্দল সুলতানের ধ্বংস ডাকিয়া আনে। বাহমনী দরবার দাক্ষিণাত্য দল ও বিদেশী দল, পারস্যবাসী ও তুর্কি—এই দুই দলে বিভক্ত ছিল। মাহমুদ গাওয়ান একজন পারস্যবাসী ছিলেন। অতএব ইহা দাক্ষিণাত্য দলের মনে হিংসার উদ্রেক করে। কারণ, তাহারা দরবারে মাহমুদ গাওয়ানের প্রভাব-প্রতিপত্তি সহ্য করিতে পারে নাই। মাহমুদ গাওয়ান বিজয়নগরের রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতামূলক আদান প্রদানে আছে, এই মর্মে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিরা সুলতানের নিকট একটি জালপত্র পেশ করে। সুলতান ইহা বিশ্বাস করেন এবং ১৪৮১ সালের ৫ই এপ্রিল মাহমুদ গাওয়ানের মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করেন।

মাহমুদ গাওয়ানের মৃত্যুদণ্ড

নাগরিক কার্যকলাপের ব্যবস্থাপনায় খাজা মাহমুদ গাওয়ান একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মেডোস টেলর (Meadows Tailor) বলেন ঃ শুধুমাত্র তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে নহে, বরং ভারতের পুরাতন মুসলিমদের মধ্যে মাহমুদ গাওয়ানের চরিত্র বিশাল ও মহানুভবে একজন নিখুঁত, খাঁটি ও উপযোগী হিসাবে প্রতিভাত হয়। স্বয়ং একজন বিদ্বান লোক হিসাবে এই মন্ত্রী সর্বদা শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ঐশ্বর্যশালী কলেজসমূহ এবং বিদারে তিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন ভক্ত মুসলমান ছিলেন এবং একটি খাঁটি ও আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করেন। ন্যায় বিচারের প্রতি আগ্রহ ও জনহিতকর কার্যাবলির দ্বারা তিনি ইতিহাসে সবার প্রশংসা অর্জন করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার

মাহমুদ গাওয়ানের কৃতিত্ব ফলাফল

কৌশল ও বীরত্ব তাঁহার বিজয়গুলিতে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠে। ঐতিহাসিক টেলর আরও বলেন ঃ "মাহমুদ গাওয়ানের মৃত্যু পতনের সূচনা করে, এবং তাঁহার সাথে সাথে বাহমনী রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তি চলিয়া যায়।"

পরবর্তীকালে তৃতীয় মুহাম্মদ শাহ্ তাঁহার ভুল বুঝিতে সক্ষম হন। কিন্তু তাহা ছিল অনেক বিলম্বে। পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে ১৪৮২ সালে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন।

বাহমনী রাজ্যের পতন

তৃতীয় মুহাম্মদ শাহ্-এর মৃত্যুর পর রাষ্ট্রের কার্যাবলি বিশৃঙ্খল অবস্থায় পতিত হয়। তাঁহার পরবর্তী সুলতান মাহমুদ শাহের গোলযোগ দূর করিবার জন্য কোন সুযোগ্য মন্ত্রীর সাহায্য ছিল না এবং তাঁহার নিজেরও কোন যোগ্যতা ছিল না। তিনি এবং তাঁহার পরবর্তী চারিজন উত্তরাধিকারী শুধু তুর্কি অভিজাতবর্গের হাতের ক্রীড়নক ছিলেন। শেষ সুলতান কলিমুদ্দিন শাহ গোপনে মুঘল সম্রাট বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থ হন। প্রায় ১৮০ বৎসর রাজত্বের পর বাহমনী বংশ ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

বাহমনী বংশের পর্যালোচনা ঃ ১৮৬ বৎসরের রাজত্বকালে ১৪জন বাহমনী সুলতান রাজত্ব করেন। অধিকাংশ সুলতান সাহিত্য ও স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফলে আহ্সানাবাদ বা গুলবারগা এবং পরবর্তীতে বিদার বিদ্বান লোক ও বিভিন্ন কলেজের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। ঐতিহাসিক কালী কিংকর দত্ত বলেন ঃ "বাহমনী সুলতানদিগকে তাঁহাদের চিন্তাধারায় বিদ্যা ও শিক্ষার সমন্বয় সাধন, দুর্গ ও অট্টালিকাসমূহ নির্মাণ এবং পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে সেচ ব্যবস্থা স্থাপন, যাহা দ্বারা চাষীরা উপকৃত হয়, তৎসঙ্গে রাষ্ট্রের জন্য অধিক রাজস্ব জোগাড় করা—এইগুলির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সম্মান দেওয়া উচিত।

শাসনকার্যে

শাসনকার্যের ব্যাপারে তাঁহারা প্রায় অতুলনীয় যোগ্যতার পরিচয় দেন। বাহমনী শাসনবিভাগ রাজস্ব নগদ বা পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে আদায়ের পন্থা অবলম্বন করে। রাজস্ব আদায় করিবার ব্যাপারে চাষীদিগকে সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য সুলতানগণ বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, তাঁহারা শত্রুদের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধের সময়ও তাঁহারা চাষীদের নিকট হইতে অত্যাচারমূলক কর আদায়ের দোষে দুষ্ট নন।

রুশ পর্যটক নিকিতিনের বিবরণ

১৪৭০ হইতে ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় মুহাম্মদ শাহ্-এর রাজত্বকালে বাহমনী রাজ্য পর্যটক, রাশিয়ার ব্যবসায়ী অ্যাথনাসিয়াস নিকিতিন (Athnaseus Nikitin) এর বর্ণনা হইতে আমরা বাহমনী রাজ্যের অবস্থার একটি চিত্র অংকন করিতে পারি। তিনি বলেন, দেশটি জনবহুল, ইহার ভূমি উত্তমরূপে কর্ষিত, রাস্তাগুলি ডাকাতদল হইতে নিরাপদ, এবং রাজত্বের রাজধানী পার্ক ও বীথিতে সমৃদ্ধ একটি সুরম্য নগরী। নিকিতিনের এই বর্ণনা হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, ইহার শাসকগণ মহৎ লোক ছিলেন এবং জনসাধারণের মঙ্গল সাধনই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সুলতানদের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে রুশ ব্যবসায়ী নিকিতিন আরও বলেন, অভিজাতবর্গ অতি জাঁকজমকের ভিতর দিন অতিবাহিত করেন; কিন্তু এ ব্যাপারে শুধু বাহমনী সুলতানগণই দোষী ছিলেন না, বরং সমগ্র মধ্যযুগীয় পৃথিবীর শাসকগণই জনসাধারণের অর্থ ও সম্পদ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যয় করেন।

দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি সালতানাত

বাহমনী রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ তাঁহাদের স্ব-স্ব প্রদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে তাঁহারা আলাদা আলাদা সালতানাত গঠন করেন। যথা—

১। বেরারের ইমাদ শাহী বংশ,
২। আহমদনগরের নিজাম শাহী বংশ,
৩। বিজাপুরের আদিল শাহী বংশ,
৪। গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী বংশ এবং
৫। বিদারের বারিদ শাহী বংশ।

বেরারের শাসনকর্তা ফতহুল্লাহ্ সর্বপ্রথম ১৪৮৪ বা ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে 'ইমাদ-উল-মুলক' উপাধি লইয়া বেরার প্রদেশে তাঁহার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এইভাবে তিনি চারি পুরুষ স্থায়ী ইমাদ শাহী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। আনুমানিক ১৫৭৪ সালে ইহাকে আহমদনগর রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া লওয়া হয়। পরে ১৫৯৬ সালে সম্রাট আকবর ইহাকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন।

(১) বেরার

বাহমনী রাজ্যের রাজধানী বিদারের নিজামুল মুলক বাহ্‌রী দাক্ষিণাত্য দলের একজন নেতা ছিলেন। মাহমুদ গাওয়ানের বিরুদ্ধে তিনিও একজন ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন। নিজামুল মুলকের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ও জুন্নারের শাসনকর্তা মালিক আহমদ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৪৯০ সালে তিনি মাহমুদ বাহমনীর সেনাবাহিনীকে পরাজিত করিয়া স্বীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আহমদনগর নগরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাজধানী তথায় স্থানান্তরিত করেন। তিনি 'নিজাম শাহ্' উপাধি ধারণ করেন এবং তদনুসারে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশকে নিজাম শাহী বংশ বলা হয়। ১৪৯৯ সালে তিনি দৌলতাবাদ দুর্গ অধিকার করিয়া স্বীয় রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন।

(২) আহমদনগর

দ্বিতীয় সুলতান বুরহান নিজাম শাহ্ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি একজন শিয়া মুসলমান ছিলেন। বিজাপুরের সুলতানকে শাস্তি প্রদান করিবার জন্য তিনি বিজয়নগরের রাজা সদাশিবের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। পরবর্তীকালে বুরহান নিজাম শাহের উত্তরাধিকারী প্রথম হোসাইন নিজাম শাহ বিজয়নগরের বিরুদ্ধে বিজাপুরের সঙ্গে হাত মিলান। প্রথম হোসাইন নিজাম শাহ-এর উত্তরাধিকারিগণ দুর্বল সুলতান ছিলেন। তবুও তাঁহারা ১৫৭৪ সালে বেরার অধিকার করেন। ১৬৩৭ সালে সম্রাট শাহজাহান আহমদনগর রাজ্যকে সরাসরি মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

ইউসুফ আদিল শাহ্ ছিলেন বিজাপুরের আদিল শাহী সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তুরস্কের একজন পলাতক যুবরাজ ছিলেন এবং উজির মাহমুদ গাওয়ান তাঁহাকে ক্রয় করিয়াছিলেন। মাহমুদ গাওয়ানের অনুগ্রহে তিনি খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেন। ১৪৯৮ সালে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইউসুফ আদিল শাহ্ একজন সুযোগ্য শাসক ছিলেন। যদিও শিয়া মতবাদের প্রতি তাঁহার দুর্বলতা ছিল, কিন্তু তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামির অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন। তিনি তাঁহার মুসলিম প্রতিবেশী ও বিজয়নগরের রাজাদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করেন। পর্তুগীজদের হাত হইতে তিনি গোয়া

(৩) বিজাপুর
ইউসুফ আদিল শাহ

অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর পর্তুগীজরা ইহা পুনর্দখল করিয়া লয়। ইউসুফ আদিল শাহ্ শিক্ষা ও বিদ্বান লোকদের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফেরিস্তা বলেন, তিনি ছিলেন, "নিজে সুশ্রী, বক্তৃতায় বাকপটু, এবং তাঁহার শিক্ষা, উদারতা ও সাহসিকতার জন্য প্রসিদ্ধ। পরবর্তী সুলতান ইসমাইল আদিল শাহকে বিজয়নগর ও আহমদনগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয়। সমস্ত যুদ্ধে তিনি কৃতকার্য হন এবং বিজয়নগরের হাত হইতে রাইচুর দোয়াব অধিকার করেন।

ইসমাইল আদিল শাহ্
আলী আদিল শাহ

ইসমাইলের উত্তরাধিকারী ইব্রাহিম আদিল শাহ্ সুন্নী মতবাদে ফিরিয়া যান। তিনি বিদার, আহমদনগর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদিগকে পরাজিত করেন। কিন্তু তিনি একজন চরিত্রহীন লোক ছিলেন, যাহা শেষ পর্যন্ত তাঁহার ধ্বংস আনয়ন করে। পরবর্তী সুলতান আলী আদিল শাহ্ পুনরায় শিয়া মতবাদে ফিরিয়া যান। বিজয়নগর রাজ্যের সাহায্যে তিনি আহমদনগরের ধ্বংস সাধন করেন। পরে বিজয়নগরের শক্তি যখন প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, তখন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ মির্জাপুর সন্ধিতে একত্রিত হইয়া ১৫৬৫ সালে রামরায়কে তালিকোটায় পরাজিত করে।

পরবর্তী সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ্ এক সার্বজনীন সহনশীল ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। ১৫৯৪ সালে তিনি আহমদনগরের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ১৬২৬ সালে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। ১৬৮৬ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক আদিল শাহী বংশ মুঘল সাম্রাজ্যের অর্ন্তভূক্ত করিয়া লওয়া হয়।

ইব্রাহিম আদিল শাহ (২)

কুতুবশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুতুব-উলমুলক মূলত মাহমুদ শাহ্ বাহমনীর অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। ১৫১৮ সালে তিনি বরঙ্গল ও বাহমনী রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহের কেন্দ্রস্থল গোলকুণ্ডা প্রদেশে তাঁহার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৫৪৩ সালে আততায়ীর হস্তে নিহত হওয়া পর্যন্ত তিনি নিজে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁহার দুর্বল ও অপদার্থ উত্তরাধিকারিগণ ১৬৮৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক গোলকুণ্ডা অধিকার করা পর্যন্ত মুঘল শাসনের বিরোধিতা করেন।

গোলকুণ্ডা (৪)

বাহমনী রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে ১৫২৬ সালে আমির আলী বারিদ বিদারে একটি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬১৮ সালে বিজাপুর রাজ্য কর্তৃক অধিকৃত হওয়া পর্যন্ত ইহা বর্তমান ছিল।

বিদার (৫)

পাদটীকা

১. কালী কিংকর দত্তঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৬

২। ঐ।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

Firishta : *History of India*

Sherwani : *The Bahamani Kingdom*

Do : *Mahmud Gawan*

Banerjee : *History of Bengal*

Bayley : *Local Muhammadan Dynasties of Gujrat*

Briggs : *Rise of Muhammadan Power in the East.*

Elliot & Dowson : *History of India as Told by its own Historians.*

দশম অধ্যায়
দিল্লী সালতানাতের একটি সাধারণ পর্যালোচনা

শাসনব্যবস্থা ঃ ভারতের মুসলিম রাষ্ট্র ছিল ধর্মভিত্তিক (Theocracy)। আইনগতভাবে রাষ্ট্র ইসলামী কানুন হইতে বিভিন্ন নিয়ম-প্রণালী গ্রহণ করে এবং পুনরায় ইসলামী কানুন হইতেই উহার অনুমোদন আদায় করে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কোন বিধিনিষেধের অনুমোদন ছাড়াই সুলতান একজন স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় কাজ করেন এবং তাঁহার কথাই ছিল আইন। যদিও ইসলামী বিধান মতে প্রভুত্ব বা আধিপত্য হইল সম্পূর্ণ সাংবিধানিক এবং গণতান্ত্রিক মতাবলম্বী, কিন্তু সুলতানগণ কখনও জনসাধারণের ইচ্ছা বা মতামতের উপর নির্ভর করেন না। সুতরাং কাগজে-কলমে যদিও দিল্লী সালতানাতের ভিত্তি ছিল ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা যায় না।.

শাসন ব্যবস্থার ধারা

উত্তরাধিকারের ব্যাপারে দিল্লী সালতানাতের কোন সুপরিচিত বা সুনির্দিষ্ট আইন ছিল না এবং ইহা লইয়া বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে উহা সমাধানের কোন আইনসম্মত পন্থাও ছিল না। এই প্রশ্নে গোলমাল দেখা দিলে অবশ্য মৃত সুলতানের পরিবারভুক্ত লোককেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণভাবে সুবিধার জন্য এবং আইনের প্রাধান্যের জন্য নহে মোটেই। কখনও কখনও জন্মবৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা এবং মৃত সুলতানের মনোনয়নকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু ইহাও আবার সম্পূর্ণভাবে অভিজাতবর্গের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, এইসব অভিজাত রাষ্ট্রের সুবিধার চাইতে নিজেদের সুবিধাকেই বেশি প্রাধান্য দেন।

উত্তরাধিকারের প্রশ্ন

কেন্দ্রীয় সরকার ঃ ভারতের মুসলিম রাষ্ট্র স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত ছিল এবং সমগ্র শাসনব্যবস্থায় সুলতান ছিলেন সর্বাধিনায়ক। সুলতানের আধিপত্যের উৎস ছিল সামরিক শক্তি। শাসনকার্যের সর্বাধিনায়ক হিসাবে সুলতান রাষ্ট্রের কার্যাবলি তাঁহার ইচ্ছামত নিযুক্ত কর্মকর্তা ও মন্ত্রীদের দ্বারা সমাধা করিতেন। সুলতান ছিলেন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি, প্রধান আইন প্রণয়নকারী এবং সর্বোচ্চ আপিল কোর্ট। ইসলামী আইন অনুসারে প্রভুত্ব আইনের উপর ন্যস্ত, যে আইনের উৎস হইল কোরআন। সুলতান ছিলেন আইনের প্রধান ব্যাখ্যাকারী। এইসব ক্ষমতা সত্ত্বেও সুলতানের কার্যকলাপের উপর কিছু বিধি-নিষেধ ছিল। তিনি অতি সহজেই আইন অমান্য করিতে পারিতেন না। সুলতানের কার্যাবলির উপর আরেকটি বিধি-নিষেধ ছিল অভিজাতবর্গের মতামত ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা। দিল্লী সালতানাতের সমস্ত

সুলতান, সুলতানের কার্যকলাপের উপর বিধিনিষেধ

সুলতানের আমলে অভিজাতবর্গ সুলতানের রাজকীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে বাধাস্বরূপ বিরাজ করেন।

'মজলিসে খালওয়াত' নামে শুভাকাঙ্খী ও বিশ্বাসী কর্মকর্তাদের লইয়া গঠিত একটি পরিষদের সাহায্যে সুলতান রাজকার্য পরিচালনা করেন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তিনি এই মজলিসের সাথে আলোচনা করেন। মজলিস উহার মতামত ব্যক্ত করে, কিন্তু সুলতান তাহা পালন করিতে বাধ্য ছিলেন না। ক্ষমতাশালী সুলতানের আমলে মজলিসের এইসব সভ্য সচিব হিসাবে কাজ করেন। অপরপক্ষে সুলতান দুর্বল হইলে এইসব সভ্য তাঁহাকে হাতের ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করেন।

মজলিসে খালওয়াত

মন্ত্রিসভা ঃ উজির বা প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কর্মকর্তা। তাঁহার দফতরকে বলা হয় দিওয়ানে ওয়াজারাত। সরকারের অন্যান্য দফতরের উপরও উজিরের কর্তৃত্ব থাকে। অন্যান্য দফতরসমূহ হইল ঃ ১। দিওয়ানে রিসালাত বা আপিল বিভাগ;

প্রশাসনিক বিভাগসমূহ

২। দিওয়ানে আরজ বা সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ;

৩। দিওয়ানে ইন্‌সা বা যোগাযোগ বিভাগ;

৪। দিওয়ানে বান্দেগান বা ক্রীতদাস বিভাগ;

৫। দিওয়ানে কাজী বা বিচার ও ডাক বিভাগ;

৬। দিওয়ানে আমির কোহী বা কৃষি বিভাগ;

৭। দিওয়ানে খায়রাত বা দানছত্র বিভাগ এবং

৮। দিওয়ানে ইসতিহকাক বা পেনশন বিভাগ।

এইসব প্রধান বিভাগ ছাড়াও অন্যান্য নিম্নপদস্থ বিভাগও ছিল। সেইগুলি হইল ঃ মুসতানফিয়ে মামালিক বা প্রধান হিসাব নিরীক্ষক (Auditor General);

মুশরিফে মামালিক, যিনি প্রাপ্তিস্বীকারপত্রের হিসাবের দায়িত্বে নিয়োজিত;

আমির-ই-বাহর বা জাহাজ নিয়ন্ত্রণকারী;

বাখসিয়ে ফৌজ বা সৈনিকের বেতন দাতা কর্মচারী ইত্যাদি।

উজিরের নিচে ছিলেন নায়েবে ওয়াজিরে মামালিক বা সহকারী উজির। কিন্তু তাঁহার কোন উচ্চ মর্যাদা ছিল না। তুঘলক আমল ছিল মুসলিম ভারতের 'মন্ত্রিত্বের উল্লাসের যুগ'। কিন্তু তারপর মন্ত্রীদের ক্ষমতা অনেকাংশে খর্ব করা হয় এবং আফগানদের আমলে মন্ত্রীর পদ অস্পষ্ট হইয়া যায়।

রাজস্ব শাসনব্যবস্থা ঃ নিম্নলিখিত উৎস হইতে রাষ্ট্র ইহার রাজস্ব আদায় করে ঃ

১। আল গানিমাহ্ বা যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য। যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি হইতে রাষ্ট্র মোট আয়ের পাঁচ ভাগের এক ভাগ লাভ করে। সুতরাং এইসূত্রে ইহাকে খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশও বলা হয়।

২। যাকাত বা মুসলমানদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ধর্মীয় কর।

৩। খারাজ বা হিন্দু প্রধান ও জমিদারদের নিকট হইতে আদায়কৃত ভূমি কর।

৪। খাল্‌সা বা রাষ্ট্রের খাস জমি হইতে আদায়কৃত ভূমি রাজস্ব।

৫। অমুসলিমদের নিকট হইতে আদায়কৃত জিজিয়া, যাহার পরিবর্তে তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা পায় এবং তাহারা সামরিক কাজ হইতে রেহাই পায়।
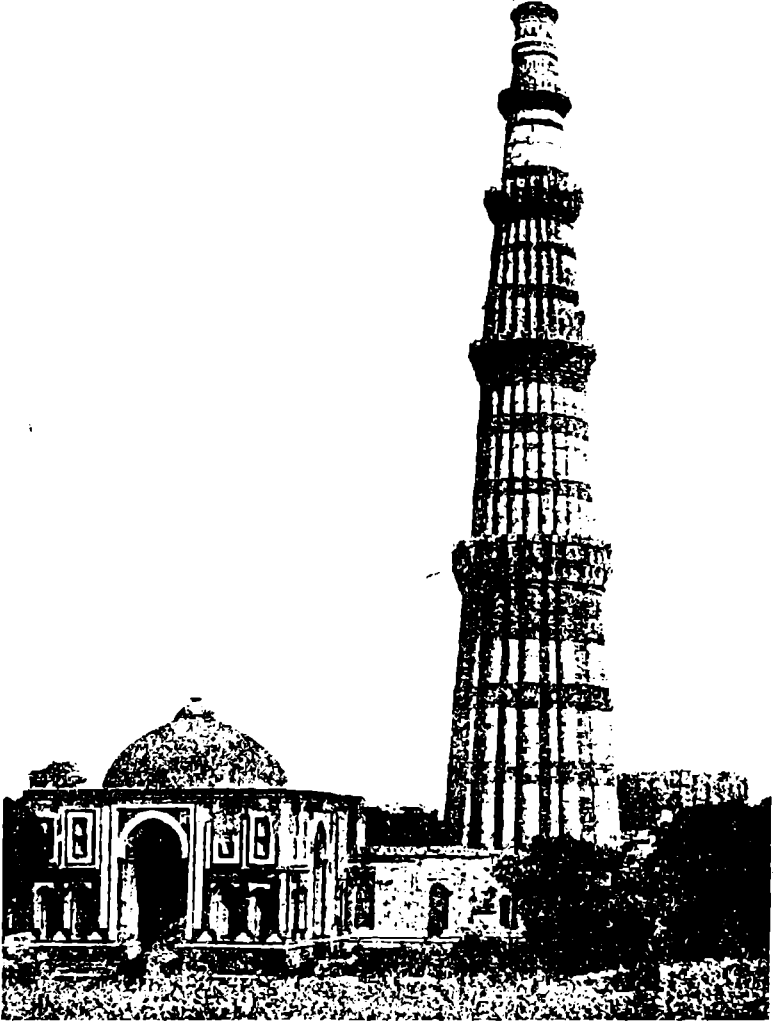
১। কুতুব মিনার, দিল্লী
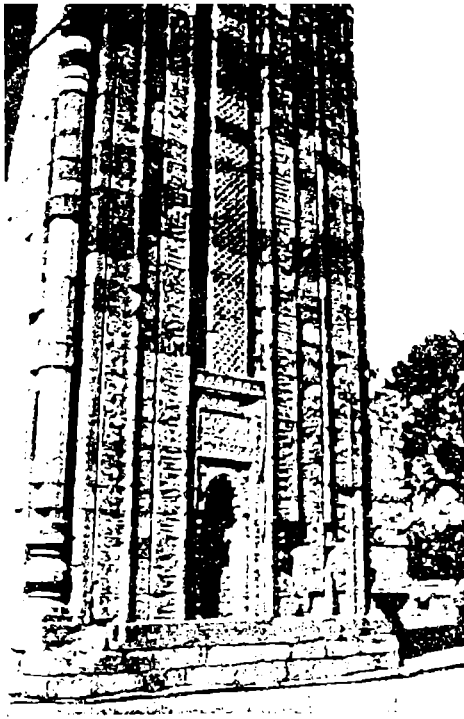
২। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ, দিল্লী

৩। হযরত নিজামুদ্দিন আওলীয়া দরগাহের মসজিদ, দিল্লী
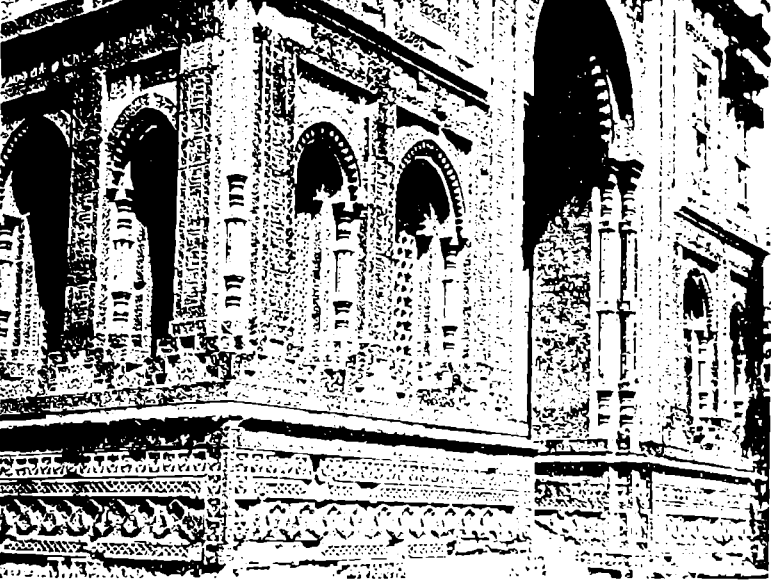
৪। কুতুব মিনারের আলাই দরওয়াজা, দিল্লী

৫। ফিরুজ শাহের সমাধি, দিল্লী
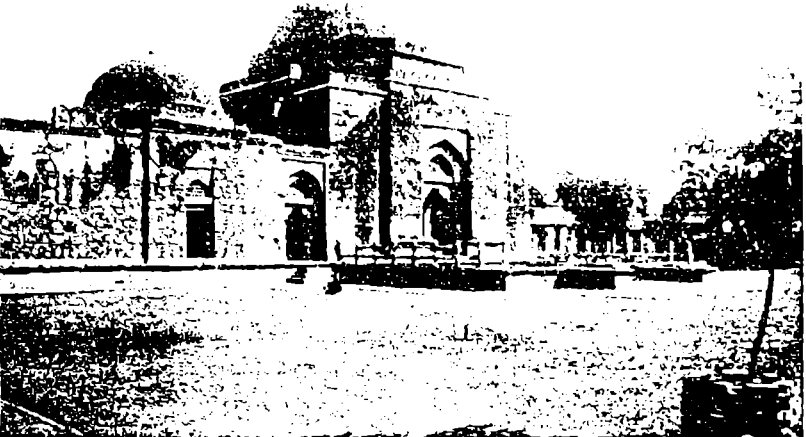
৬। অতলাদেবী মসজিদ, জৌনপুর

৭। ছোট সোনা মসজিদ, গৌড়
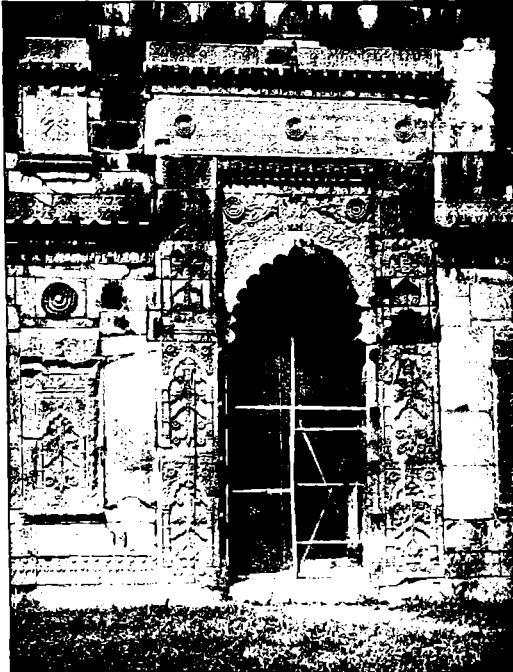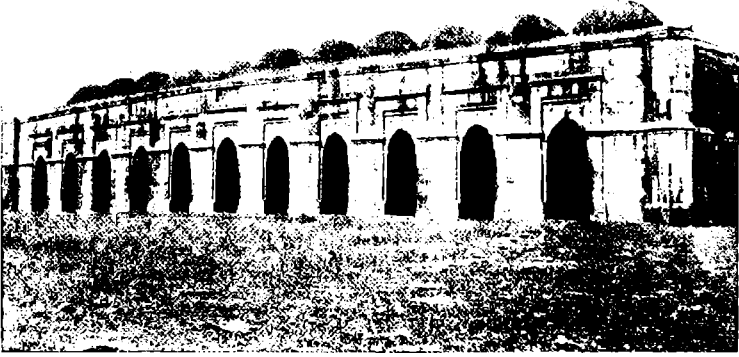
৮। বড় সোনা মসজিদ, গৌড়

৯। আদিনা মসজিদ, পাণ্ডুয়া
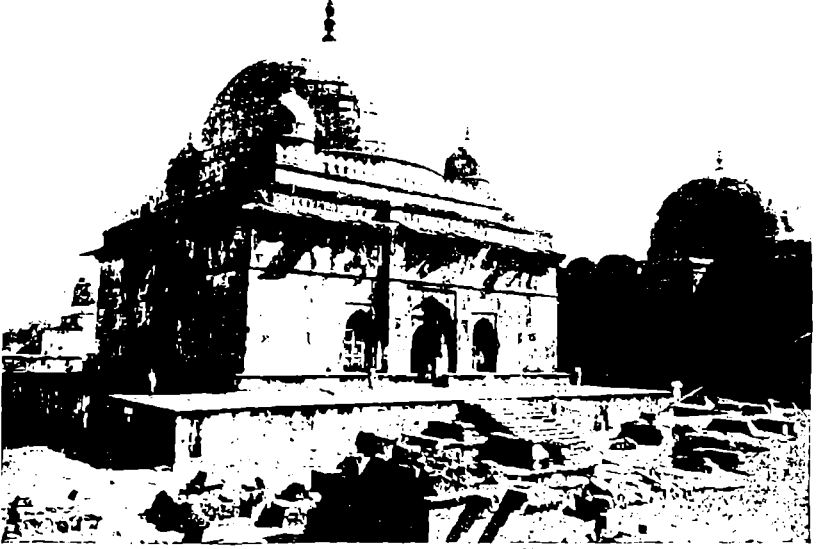
১০। হুসাং শাহের সমাধি

১১। ফিরুজ শাহ্ বাহ্মনীর সমাধি, গুলবার্গন
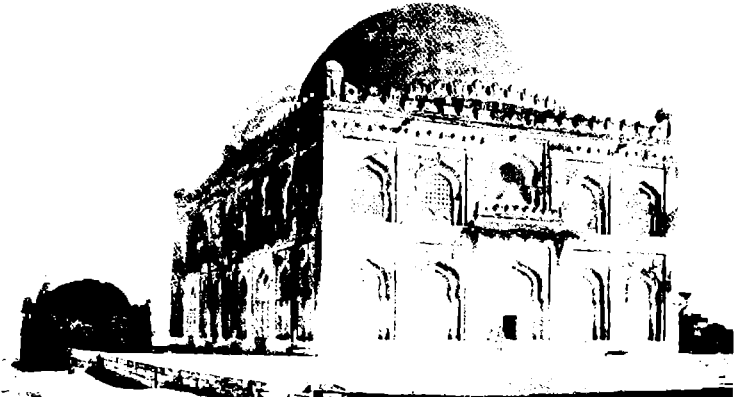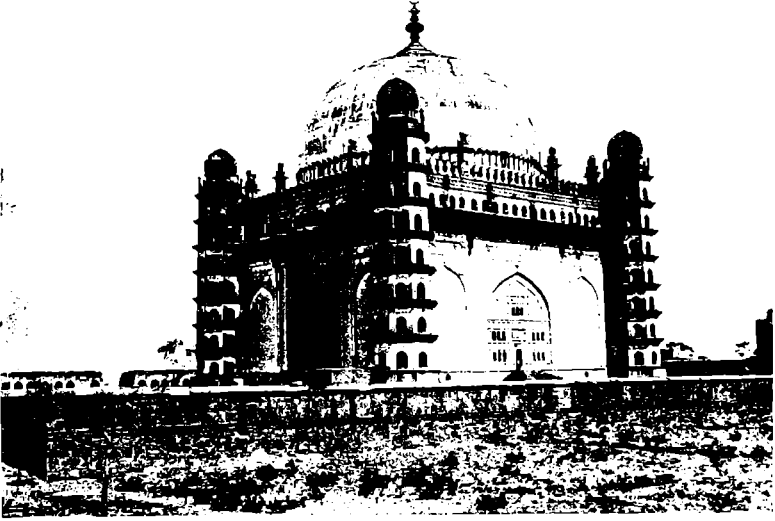
১২। আদিল শাহের সমাধি, বিজাপুর

লাহোর দুর্গ

দিল্লী তোরণ, আগ্রা দুর্গ

হুমায়ুনের সমাধি, দিল্লী
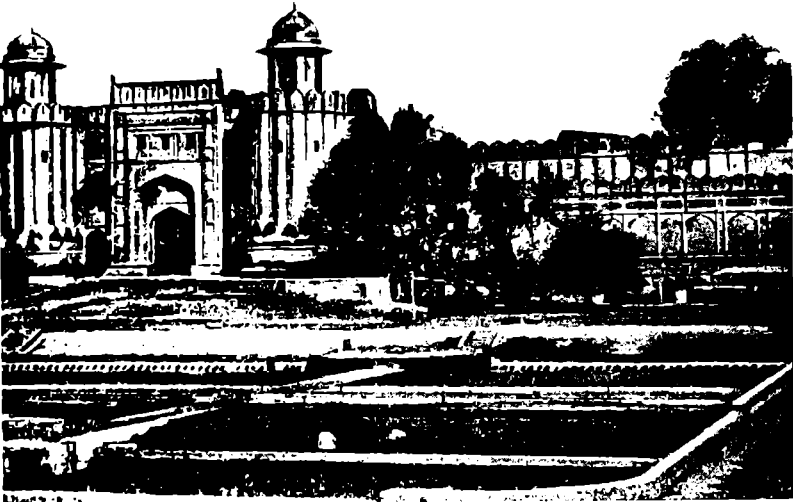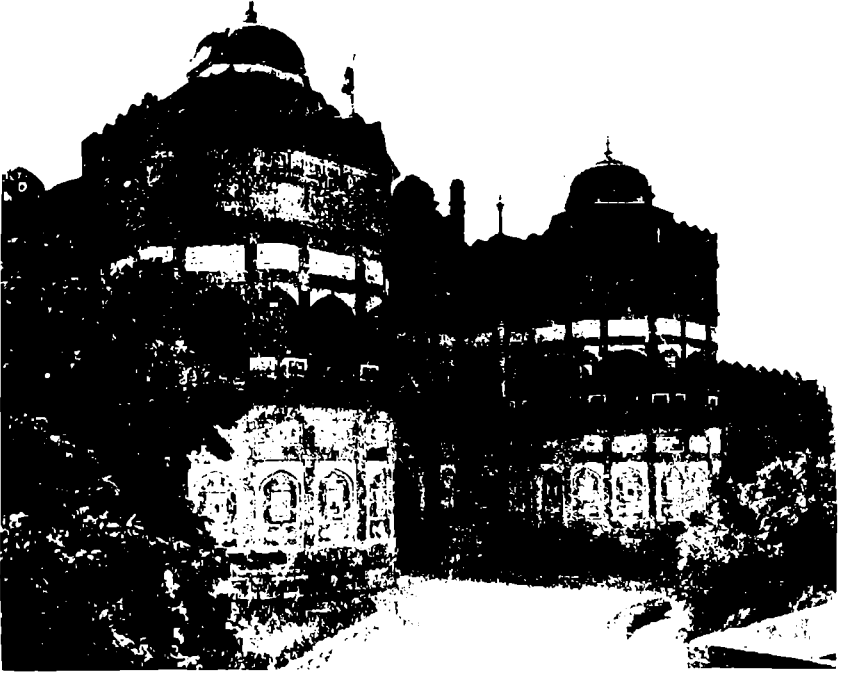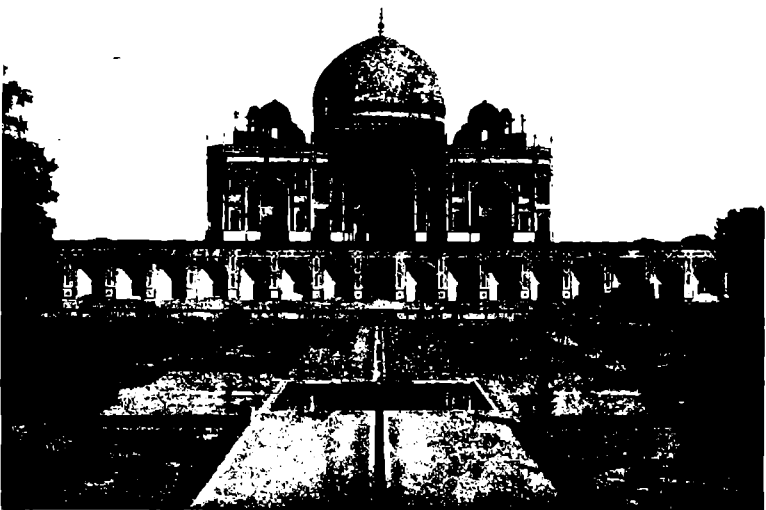
যোধবাঈয়ের প্রাসাদ, ফতেহ্‌পুর সিক্রি

আকবরের সমাধিক্ষেত্র, সেকেন্দ্রা, আগ্রা
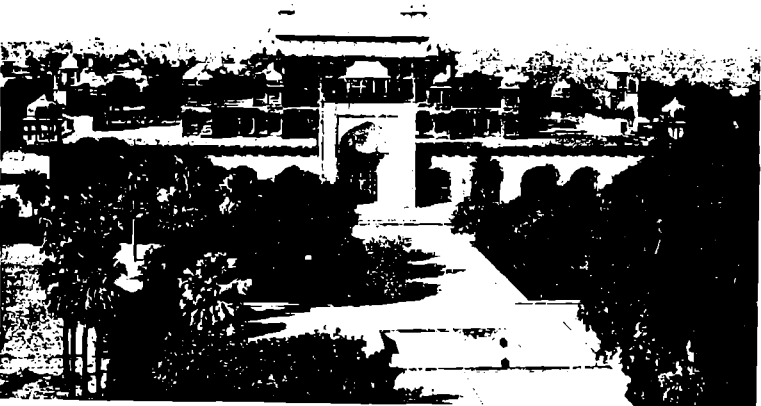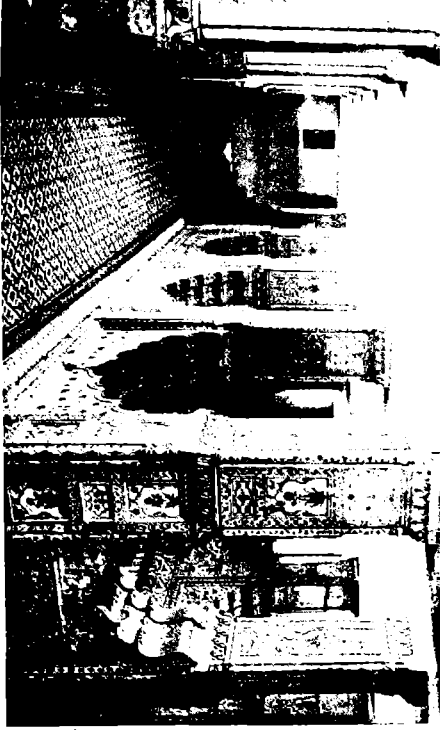
দিওয়ানে খাস, দিল্লী দুর্গ (লাল কেল্লা)
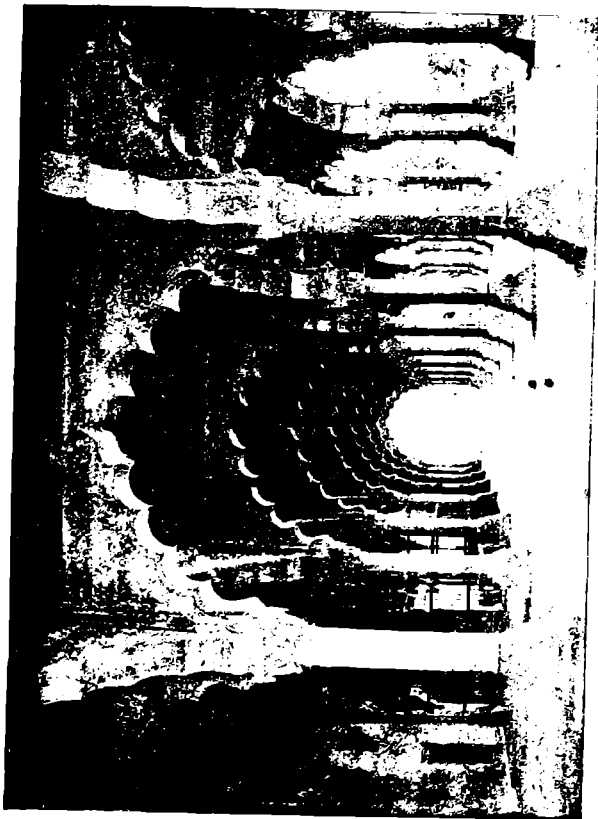
দিওয়ানে আম, দিল্লী দুর্গ (লাল কেল্লা)

মোতি মসজিদ, আগ্রা দুর্গ

জামে মসজিদ, আগ্রা

তাজমহল, আগ্রা
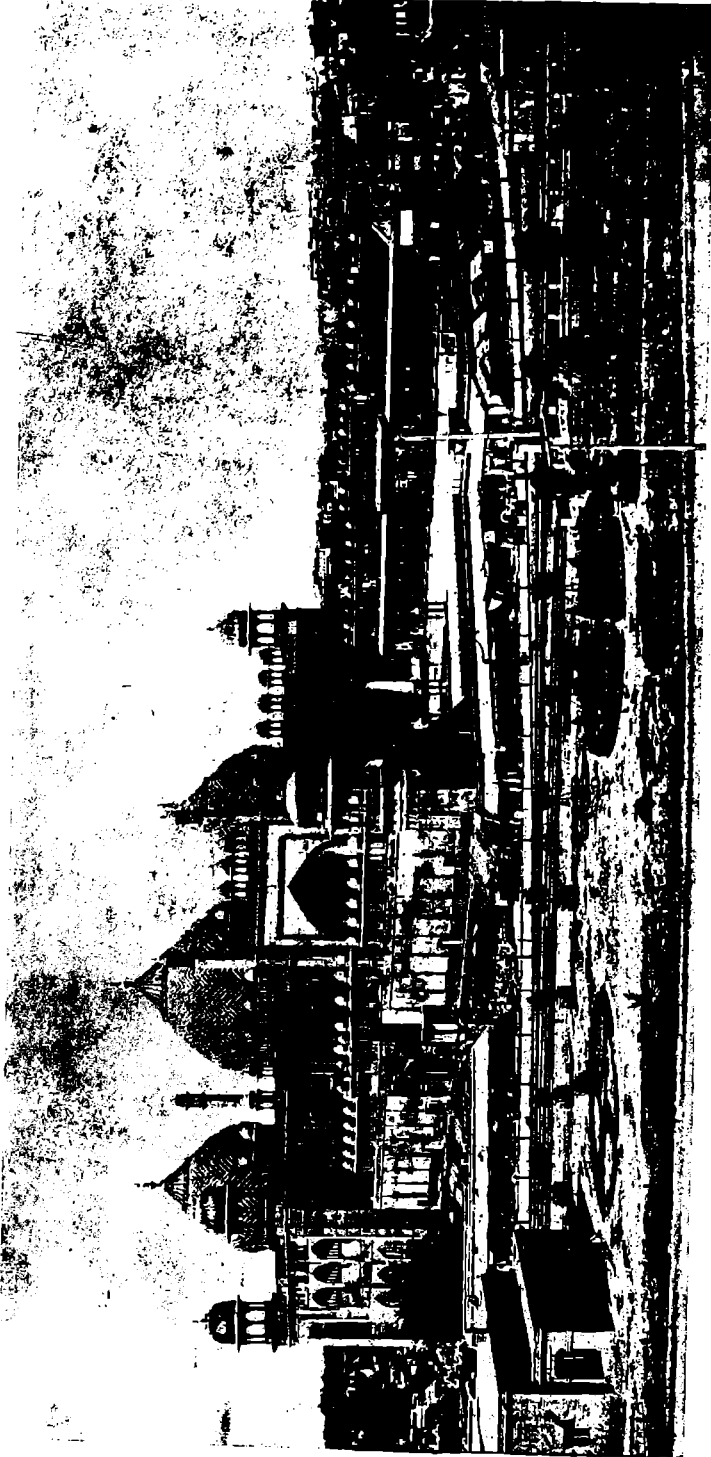
জাহাঙ্গীরের সমাধিক্ষেত্র, লাহোর

JAHĀNGĪRĪ MAHAL, ĀGRA FORT

এই সমস্ত প্রধান সূত্রগুলি ছাড়াও রাষ্ট্র আরও বিভিন্ন সূত্র হইতে রাজস্ব আদায় করে, যথা 'ইকতাস' বা কয়েক বৎসর বা সারাজীবনের জন্য সামরিক কর্মকর্তাদিগকে প্রদত্ত জমি এবং 'আবওয়াব্স' অথবা শুল্ক বা গৃহকর, গো-চারণভূমি কর, পানির কর ইত্যাদির মত রাজস্ব। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী করের পরিমাণ নির্ধারণের বন্দোবস্ত করেন যাহার ফলে রাষ্ট্র ও চাষীদের মধ্যে একটি নিখুঁত ও পক্ষপাতহীন ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়। খাজনা নগদ টাকায় বা পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে আদায় করা হয়। কখনও কখনও ভূমি রাজস্ব মোট উৎপন্ন দ্রব্যের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের চড়া নিয়মে আদায় করা হয়। কিন্তু গিয়াসুদ্দিন তুঘলক এই নিয়ম পরিবর্তন করিয়া মোট উৎপন্ন দ্রব্যের শতকরা দশ ভাগ খাজনা আদায় করেন।

বিচার বিভাগ ঃ কাজী-উল-কোজাত বা প্রধান বিচারপতি সাধারণত রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ পরিচালনা করেন। কোরআনী আইন ব্যাখ্যাকারী মুফতীগণ সর্বদা কাজী-উল-কোজাতকে সহায়তা করেন। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী ও সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ব্যতীত সমস্ত সুলতানই মুফতীগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত কোরআনী আইন মান্য করেন। কাজী-উল-কোজাত নিম্ন বিচারালয়ের আপীল ও বিচার সম্পাদন করেন এবং স্থানীয় কাজী নিয়োগ করেন। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শহরেরই এক-একজন কাজী থাকেন। মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত মামলা কাজীগণ মীমাংসা করেন এবং শুধু অমুসলিমদের মধ্যে সংগঠিত মামলা সাধারণত গ্রাম্য পঞ্চায়েতসমূহ মীমাংসা করে। কোতওয়াল ছিলেন শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী। তিনি পুলিশ বিভাগ ও একজন সোপর্দকারী বিচারকের কর্তা। দণ্ডবিধির আইন ছিল খুবই কঠোর। অপরাধীকে প্রায়ই অঙ্গচ্ছেদ ও মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। বন্দিদের উপর এই ধরনের অত্যাচার সুলতান ফিরুজ তুঘলক অনেকাংশে রহিত করেন। গুপ্তচর বিভাগের সাহায্যে সুলতান নিজেকে রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যাবলি সম্পর্কে অবহিত রাখেন।

সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ ঃ সেই যুগে সুযোগ্য সরকার একটি সুদক্ষ সশস্ত্রবাহিনীর উপর নির্ভর করে। এই বিভাগের প্রতি সুলতান গভীর মনোযোগ দান করেন। বিভিন্ন জাতির লোকদিগকে সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ করা হয়। সামরিক বাহিনী সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত ছিল, যথা ঃ পদাতিক বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী এবং হস্তীযূথ বাহিনী। অশ্বারোহী বাহিনী ছিল সামরিক বাহিনীর মেরুদণ্ড। সেই সময় নিয়মিত কোন গোলন্দাজ বাহিনী ছিল না। তবে সুলতান ইলতুৎমিশের সময় রকেট বা ন্যাপথা জাতীয় গোলা নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইত না। তাহা ছাড়া দুর্গ অবরোধের সময় অগ্নিগোলা, পাথর ও লৌহ গোলা নিক্ষেপ করিবার জন্য 'মানজানিক, 'মানগোনেল' ও 'মানগন' নামের বিভিন্ন অপরিপক্ক ধরনের অস্ত্র ব্যবহৃত হয়। 'আরজে মামালিক' ছিলেন সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের যাবতীয় কাজের প্রধান। সমস্ত সৈন্যের 'হুলিয়া' (বিবরণ তালিকা) তাঁহার কাছে থাকিত। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি ভাল ভাল ঘোড়াগুলিকে চিহ্নিত করিবার ব্যবস্থা করেন।

প্রাদেশিক সরকার ঃ সুদক্ষ শাসনকার্যের জন্য দিল্লী সালতানাত বিশটি বা পঁচিশটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের আমলে দিল্লী সালতানাত ২৩টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এইগুলি হইল ঃ

১। দিল্লী, ২। দৌলতাবাদ, ৩। মুলতান, ৪। কোহ্‌রাম। ৫। সামানা, ৬। শিওয়ান, ৭। উচ্চ্‌ ৮। হান্‌সী, ৯। শিরসূতী। ১০। মাবার, ১১। তেলাঙ্গ, ১২। গুজরাট, ১৩। বাদাউন, ১৪। অযোধ্যা, ১৫। কনৌজ, ১৬। লক্ষণাবতী, ১৭। বিহার, ১৮। কারা, ১৯। মালব, ২০। লাহোর, ২১। কালানূর, ২২। জাজনগর এবং ২৩। দ্বার সমুদ্র।

নায়েব-ই-সুলতান (গভর্নর) ছিলেন প্রাদেশিক শাসনকার্যের প্রধান কর্তা। প্রত্যেকটি প্রদেশ সাম্রাজ্যের একটি প্রতিবিম্ব ছিল। নায়েব-ই-সুলতান শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও সামরিক বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। নায়েব-ই-সুলতান বা গভর্নর নিযুক্ত করা সম্পূর্ণভাবে সুলতানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। নায়েব-ই-সুলতান রাজস্ব আদায় করেন এবং প্রাদেশিক খরচপত্র মিটাইয়া অবশিষ্ট রাজস্ব সরাসরি কেন্দ্রে সুলতানের নিকট পাঠাইয়া দেন।

'মুক্‌তা' বা আমিরদের অধীনে প্রদেশগুলি আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়। কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটি পরগনা হয়, যাহা সাধারণত স্থানীয় লোকদের দ্বারাই শাসিত হয়। প্রদেশগুলি ছাড়াও কিছু ছোট ছোট হিন্দু রাষ্ট্রও ছিল। এইগুলি সাধারণত সুলতানকে মোটা অংকের উপহার ও রাজস্ব দিয়া নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে।

সুলতানী আমলে গণজীবন

(ক) সামাজিক অবস্থা : দিল্লীর সুলতানগণ সর্বদা গুণী লোকদের প্রাধান্য দেন, এবং এই ব্যাপারে জাতি বা বর্ণের উপর তাঁহারা তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। কিন্তু তৎসঙ্গে এমন সুলতানও ছিলেন, যাঁহারা সামাজিক বৈশিষ্ট্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন অভিজাত গোত্রের লোক ছাড়া কাহাকেও কখনও সরকারি উচ্চপদে বহাল করিতেন না। সেই যুগে উত্তেজক সুরাপান ছিল সাধারণ অভ্যাস। কিন্তু উত্তেজক সুরা পান নিষিদ্ধকারী সুলতানও এই যুগে ছিলেন।

মদ্যপান

"বলবন মদ নিষিদ্ধ করিয়া একটি নির্দেশ জারি করেন এবং তাঁহার পুত্র মুহাম্মদ, যিনি মাত্রাতিরিক্ত মদ পান করিতেন, তাঁহার সামনে কোন প্রকার নির্বোধ কথাবার্তার প্রশ্রয় দিতেন না, যাহা লাহোরে তাঁহার পারিপার্শ্বিক সমাজের উপর উপকারক ফলদান করে।" আলাউদ্দিন খিলজী মদ্যপানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলক এবং মুহাম্মদ বিন তুঘলকের আমলে সামাজিক রুচিবোধ বেশ উন্নতি লাভ করে। রাষ্ট্রীয় জাঁকজমক পুরাপুরিভাবে রক্ষা করা হয়। ক্রীতদাস প্রথা যদিও তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলক, কুতুবুদ্দিন আইবেক, ইলতুৎমিশ, বলবন ও মালিক কাফুরের মত সুযোগ্য ক্রীতদাস বাহির করিবার জন্য ক্রীতদাসদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন।

ক্রীতদাস প্রথা

"সেনাপতি, শাসনকার্য পরিচালক এবং সময় সময় রাজা-নির্মাতা হিসাবে অভিজাতবর্গ রাষ্ট্রে প্রভুত্বব্যঞ্জক প্রভাব বিস্তার করেন।[১] দিল্লী সলতানাতের অভিজাতবর্গ সুলতানদের কঠোর অভিভাবকের ন্যায় কাজ করেন। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মত দিল্লী সালতানাতের অভিজাত শ্রেণী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য ছিল না। কঠোর ও সুযোগ্য সুলতানের অধীনে অভিজাতবর্গ উত্তম পরামর্শদাতার ন্যায় কাজ করেন। কিন্তু দুর্বল সুলতানের ক্ষেত্রে "অভিজাতবর্গ বিক্ষিপ্ত পরমাণুর স্তূপবিশেষ ছিলেন।"[২]

অভিজাত শ্রেণী

হিন্দু ও মুসলিম উভয় শ্রেণীর মহিলারাই তাঁহাদের স্বামী বা অন্যান্য পুরুষ আত্মীয়-স্বজনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সর্বদা একটি সম্মানজনক জীবন যাপন করেন। তাঁহাদিগকে পর্দার আড়ালে আলাদাভাবে থাকিতে হইত। শ্রেণী হিসাবে মহিলাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি ছিল বিভিন্ন মানের। উদাহরণ স্বরূপ, গ্রাম্য মহিলারা তাঁহাদের গৃহস্থালি কার্যকলাপে নিজেদের নিয়োগ করেন এবং অভিজাত শ্রেণীর মহিলারা শিল্পকলা ও বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেন। সুলতানদের মহিলাগণ রাষ্ট্রপরিচালনায়ও অংশ গ্রহণ করেন। ছেলেমেয়েদের অল্পবয়সেই বিবাহ দেওয়া হইত। হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। স্বামীর সহিত সহমরণের জন্য সুলতানের নিকট হইতে বিধবাদের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করিতে হইত।

মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা সতিদাহ প্রথা

হিন্দুদের সামাজিক মর্যাদা ঃ ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, দিল্লী সালতানাতের আমলে হিন্দু ও মুসলমানগণ দৈনন্দিন জীবনে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে দুই সম্প্রদায় হিসাবে বসবাস করেন। মুসলমানগণ সর্বদা বিজয়ীর ন্যায় আচরণ করেন। কিন্তু জিম্মি বা "রক্ষিত প্রজা" হিসাবে হিন্দুদের সহিতও বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা জিজিয়া নামে একপ্রকার কর প্রদান করেন এবং তৎপরিবর্তে তাহাদিগকে সামরিক কার্য হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। দেশের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা মোটামুটি তাহাদের হাতেই থাকে। প্রত্যেক প্রদেশে একাধিক স্থানীয় হিন্দু ক্ষুদ্র রাজ্য বর্তমান থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারকে উপঢৌকন ও রাজস্ব প্রদানের দ্বারা এইসব ক্ষুদ্র রাজ্য উহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। সুলতানগণ সর্বদা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। এমনকি হিন্দুরা যখন দরবারে রাজস্ব ও উপঢৌকন প্রদান করিতে আসে তখনও হাজীব বা সুলতানের সচিব উচ্চস্বরে বলেন, 'হাদাক আল্লাহ' বা আল্লাহ আপনাকে সৎ পথে আনয়ন করুক। এতদসত্ত্বেও সুলতানগণ ঐসব হিন্দু রাজাদের জোর করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন নাই। জনসাধারণের মধ্যে বা চাষীদের মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার এই পার্থক্য অত প্রবল ও শত্রুভাবাপন্ন ছিল না।

(খ) অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ সুলতানী আমলের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি পরিষ্কার চিত্র অংকন করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। কারণ, সুলতানদের কোন ধারাবাহিক অর্থনৈতিক নিয়ম-পদ্ধতি ছিল না। ইতিহাসের সমস্ত সূত্র এই ইঙ্গিত দেয় যে, ভারত তাহার অবর্ণনীয় সম্পদের জন্য বিখ্যাত ছিল। ঐতিহাসিক ফিরিস্তার সূত্রে বর্ণনা করা হয় যে, সুলতান মাহমুদ অনেক লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া যান এবং এমনকি মুহাম্মদ বিন তুঘলকের অমিতব্যয়ের পরেও আমির তৈমুর কর্তৃক সমরকন্দে লইয়া যাইবার মত যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ এই দেশে বর্তমান ছিল।[৩]

কিন্তু আলাউদ্দিন খিলজী অর্থনৈতিক ব্যাপারে ব্যতিক্রম ছিলেন। সাধারণ বেতনে একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী পোষণ করিবার জন্য তিনি অর্থনৈতিক সংবিধান চালু করেন। তাঁহার সংবিধানের পর পণ্যদ্রব্যের মূল্য এত কমিয়া যায় যে, একজন সৈনিক একটি ঘোড়া লইয়া মাসিক বিশ টাকার চেয়েও কম বেতনে জীবন যাপন করিতে সক্ষম হয়। রাজকীয় শস্যাগারে শস্য মজুদ রাখা হয় এবং অভাবের দিনে সেগুলি জনসাধারণের নিকট কম মূল্যে বিক্রয় করা হয়। যদিও সুলতান আলাউদ্দিনের পর সংবিধানটি অকেজো হইয়া যায়, তবুও দেশে শস্যের কোন অভাব হয় নাই এবং রাষ্ট্র কোন অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন

হয় নাই। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক বিভিন্ন ব্যয়সাধ্য পরিকল্পনায় হাত দেন, তাঁহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ ব্যর্থ হয়; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়।

ভারতের অবর্ণনীয় সম্পদের প্রধান উৎস কৃষিকাজ। সুলতানগণ সর্বদা দেশের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। তাঁহারা চাষীদের সেচ ব্যবস্থার সুবিধাদি প্রদান করেন। সুলতান ফিরূজ শাহ্ তুঘলক চাষীদের খুবই যত্ন নেন। তাঁহার শাসনামলে কৃষিকার্যের উৎপন্ন দ্রব্য এত অধিক ছিল যে, দেশের সমস্ত প্রয়োজন মিটাইবার পরও বিদেশে রপ্তানির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য থাকিয়া যায়। ফলে দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু খুবই সস্তা থাকে। ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে চীনা পর্যটক মাউ হাউ বাংলার প্রভূত সম্পদের কথা উল্লেখ করেন। বারথেমা নামক জনৈক বিদেশী পর্যটক ১৫০৩-১৫০৮ সালে ভারত সফর করেন এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সস্তায় বাস করিবার মত দেশ।"[৪] ইবনে বতুতা মন্তব্য করেন, বাংলাদেশের চেয়ে সস্তায় জিনিসপত্র বিক্রয় হয়, এরূপ কোন দেশ তিনি দেখেন নাই। তিনজনের এক পরিবারের বাৎসরিক খরচপত্রের জন্য এই দেশে আট দিরহামই ছিল যথেষ্ট।[৫]

কৃষিকাজ বাংলাদেশ

"ত্রয়োদশ ও চর্তুদশ শতাব্দীতে ব্যবসার অবস্থা লাভজনক ছিল।"[৬] কঠোর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বেশ প্রশস্ত ছিল। দেশের আন্তর্জাতিক ব্যবসাও সুবিস্তৃত ছিল। ভারতের সাথে দূরবর্তী ইউরোপীয় দেশসমূহ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন ও প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দেশসমূহের নৌ-যোগাযোগ ছিল। স্থলপথে মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, পারস্য ও হিমালয়ের অঞ্চলসমূহের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ইউরোপীয় পর্যটক মার্কো পোলো লিখেন, অধিবাসীরা উত্তম স্বভাবের এবং তাহারা ব্যবসা ও উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে।[৭] ব্যবসায়ীরা জাহাজ ও মালপত্র লইয়া এই দেশে আসিত। মাসালিক আল-আসবার গ্রন্থে লিখা আছে ঃ "সব দেশের ব্যবসায়ীরাই ভারতে নিখাদ সোনা লইয়া যায় এবং পরিবর্তে ঔষধি ও (আঠা তৈয়ারির) বৃক্ষ নির্যাসের পণ্যদ্রব্য লইয়া আসে।"[৮]

ব্যবসা বাণিজ্য

ভারতে আমদানিকৃত দ্রব্যাদি ছিল ধনী লোকদের খেলনার বস্তু এবং ঘোড়া ও খচ্চর। রফতানিকৃত মালপত্র ছিল প্রধানত কৃষিদ্রব্য এবং তাঁতের উৎপন্ন দ্রব্য। গাঁজা, আফিম, দেশীয় রুটি প্রভৃতিও রফতানি করা হইত। পারস্য উপসাগর পরিবেষ্টিত কতকগুলি দেশ ভারতের খাদ্যদ্রব্য রফতানির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল। ভারতের আমদানি রফতানি ব্যবসার জন্য প্রধানত বাংলা ও গুজরাটের বন্দরসমূহ ব্যবহৃত হইত।

ঐতিহাসিকগণ এই ব্যাপারে একমত যে, দিল্লীর সুলতানগণ দেশে শিল্প-কারখানার উন্নতিতে উৎসাহ প্রদান করেন। সিল্ক কাপড়ের তাঁত, সোনালী আঁশ তৈয়ারির কারখানা ইত্যাদির মত শিল্পসমূহ সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়িয়া উঠে। "দিল্লীর রাজকীয় কারখানা বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ সুলতানের চাহিদা মিটাইবার জন্য অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য ছাড়াও কখনও কখনও ৪০০০ সিল্কের তাঁতী নিযুক্ত করে।"[৯] বাংলা, গুজরাট, ব্রোচ ও কালিকট ছিল ব্যবসা ও সিল্কের প্রধান কেন্দ্রস্থল। কৃষিকার্য যদিও জনসাধারণের প্রধান পেশা

শিল্প

ছিল, তবুও শহরে ও গ্রামে বিভিন্ন মূল্যবান কারখানা গড়িয়া উঠে। কারখানাগুলির মধ্যে ছিল তাঁত, রঙিন ও চিত্রিত কার্পাস কাপড়, চিনি, ধাতব কাজ, পাথর ও ইটের কাজ এবং কাগজ প্রস্তুত শিল্প। তাহা ছাড়া পেয়ালা প্রস্তুত, জুতা তৈয়ারি, তীর-ধনুকের মত অস্ত্র তৈয়ারি, আতর ও মদ তৈয়ারির মত ছোট ছোট বিভিন্ন কারখানাও ছিল।

দেশ ঐশ্বর্যশালী হওয়া সত্ত্বেও ধনাঢ্য শ্রেণী ও চাষীদের মধ্যে জীবনযাত্রার মানে আকাশ-পাতাল তফাৎ ছিল। কৃষকদের ঘাড়েই সমস্ত করের বোঝা চাপানো হয়। ফলে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যেখানে আমোদ-প্রমোদে গা ভাসাইয়া রাখে, ঠিক সেই স্থলে কৃষকরা দুঃখ-দারিদ্রের চাকার তলায় নিষ্পেষিত থাকে। যদিও জনসাধারণ দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে, কিন্তু আজকালকার মানের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে তাহাদের খুব কম চাহিদাই ছিল। গ্রামগুলি অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ফলে গ্রাম্য জনগণের চাহিদাগুলি স্বস্থান হইতেই তাহাদের তুষ্টিমাফিক সরবরাহ করা হইত।[১০] সুতরাং জীবনযাত্রার মান যাহাই থাক না কেন, দিল্লী সালতানাতের আমলে জনগণ সর্বদা সুখীই ছিল। বংশসমূহের উত্থান-পতনে এবং রাজকীয় পরিবারের হত্যাকাণ্ডে তাহাদের থোড়াই কিছু আসিত যাইত।

জীবন যাত্রার মান

হিন্দু সংস্কৃতির উপর ইসলামের প্রভাব

স্যার জন মার্শাল মন্তব্য করেন ঃ "একত্রে মেলামেশা করা সত্ত্বেও মোহাম্মদীয় ও হিন্দু ধর্মের মত দুইটি বিস্তৃত ও শক্তিশালীভাবে গঠিত, তবুও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির দুইটি সভ্যতা মানব ইতিহাসে কদাচ দৃষ্ট হয়। তাহাদের ভিতরগত মূল বৈপরীত্য তাহাদের সংস্কৃতি ও ধর্মের বিস্তৃত দুইমুখী নীতিই তাহাদের প্রভাবের ইতিহাসকে অদ্ভুতভাবে শিক্ষাপ্রদ করিয়া দেয়।[১১] যদিও দুইটি ধর্ম সম্পূর্ণভাবে মিলিয়া যায় নাই, তবুও ইসলাম হিন্দু সংস্কৃতির উপর একটি স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মুসলমানদের উদার নীতি হিন্দু পুরোহিত শ্রেণীকে বিশেষভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। সুতরাং হিন্দুদিগকে ইসলাম হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা গোঁড়া হিন্দুদের রক্ষণশীলতাকে কঠোর করিয়া তোলে। একটি কঠিন বর্ণনীতি গ্রহণ করিয়া তাহারা ধর্মান্তরকরণ প্রথা দুরূহ করিয়া ফেলে।

কঠোর বর্ণনীতি গ্রহণ

মহিলাদের জন্য ইসলাম পর্দা প্রথার প্রবর্তন করে। মুসলমানদের প্রত্যেক শ্রেণীর মহিলাই এই প্রথা পালন করেন। হিন্দু মহিলারা পর্দা প্রথা পালন করিলেও তাহা অত কঠোর ছিল না। সুলতানী আমলে পর্দা প্রথা একটি ফ্যাসন হইয়া দাঁড়ায়। ফলে হিন্দুরাও এই প্রথাটি কঠোরভাবে পালন করিতে আরম্ভ করে। অধিকন্তু, হিন্দু মহিলাদিগকে মুসলিম সৈন্যদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যও তাহারা এই প্রথা পুরাপুরিভাবে পালন করিতে আরম্ভ করে।

পর্দা প্রথা

অপরদিকে ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শ অতি সহজেই হিন্দু সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঢুকিয়া পড়ে। ইহা তাহাদের ধর্মের ভিত্তিমূলে আঘাত হানে এবং যাহার ফলে বিভিন্ন ধর্ম প্রচারকের দ্বারা কতকগুলি উদার প্রকৃতির আন্দোলন গড়িয়া উঠে। এইসব ধর্ম প্রচারকরাই উদার প্রকৃতির ভক্তি আন্দোলনের প্রচার করেন। তাঁহারা সমস্ত ধর্মের মৌলিক ঐক্য ও খোদার একত্ববাদ প্রচার করেন। তাঁহারা আরও প্রচার করেন

ভক্তি আন্দোলন

যে, মানুষের মান-সম্মান নির্ভর করে তাহার কার্যকলাপের উপর, জন্মের উপর নহে। ভক্তিবাদের প্রচারকগণ ধর্মের বাহ্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠান ও পুরোহিতদের আধিপত্যকে সম্পূর্ণভাবে নিরুৎসাহিত করেন।

রামানুজ

ভক্তিবাদ আন্দোলনকে যিনি প্রাধান্যতায় আনয়ন করেন, তিনি হইলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত রামানুজ, যিনি খুব সম্ভবত ১১৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রাণ ত্যাগ করেন। রামানুজের মৃত্যুর পর রামানন্দ এই আন্দোলন চালাইয়া যান। খুব সম্ভবত তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ছিলেন। এই ভক্তিবাদের উৎপত্তিস্থল ভারতের দক্ষিণ অংশ, এবং রামানন্দ ছিলেন "দক্ষিণ ও উত্তরের ভক্তিবাদের যোগ সাধক।" এলাহাবাদের একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁহার জন্ম। উত্তর ভারতের সমস্ত পবিত্র স্থান তিনি সফর করেন। তাঁহার যুগের ধর্মীয় সমস্যার সমাধানে রামানন্দের অবদান হইল ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানে সহজতা এবং পৌরাণিক বর্ণনীতিতে উদারতা। কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিকের মতানুসারে, এইসব মহৎ অবদানের উৎস হইল ইসলামী প্রভাব। ফলে একজন নাপিত, একজন মুচি ও একজন মুসলমানও তাঁহার বারো জন প্রধান শিষ্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রামানন্দের অনুসারীরা তাঁহাদের আদর্শে ঠিক থাকিতে ব্যর্থ হন। কোন কোন লেখকের মতে, তাঁহার একমাত্র মুসলিম শিষ্য কবির একজন জন্মগত মুসলমান নহেন। ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম ভক্তিবাদকে গ্রাস করে।

কবির

মধ্যযুগীয় ভারতে কবির একজন বিখ্যাত সংস্কারক হিসাবে পরিচিত। খুব সম্ভবত তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি একজন হিন্দু বিধবার জারজ সন্তান। বেনারসের একটি পুকুরের পার্শ্বে পতিত অবস্থা হইতে উঠাইয়া লইয়া কবিরকে একজন মুসলিম তাঁতী লালন-পালন করেন। তদনুসারে তিনি ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করেন। ডঃ কার্পেন্টার বলেন ঃ "কবিরের মতবাদের সম্পূর্ণ পটভূমি হিন্দু ধর্মীয়।"[১২] কিন্তু যেসব সুফী দরবেশ ও কবিদের সংস্পর্শে তিনি আসেন তাঁহাদের দ্বারাও তিনি বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।[১৩] কবির একটি ভালোবাসা ও ঐক্যের ধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার নিকট "হিন্দু ও তুর্কি (মুসলিম) একই মাটির তৈয়ারি পাত্র ঃ আল্লাহ্ ও রাম শুধু ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র।" ধর্মের ক্ষেত্রে কবির হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে একটি সুবিবেচিত চেষ্টা চালান।

চৈতন্য

শ্রীচৈতন্য ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের নদীয়ায় এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনিই বিখ্যাত বৈষ্ণব ঋষী, যিনি বাংলায় জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণদের বিবেচিত অবশ্যকরণীয় ধর্মীয় ক্রিয়া পদ্ধতির তিনি প্রবল বিরোধিতা করেন। প্রেম ও ঐকান্তিকতার বাণী প্রচারে তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার অনুসারীরা তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মনে করেন। শ্রীচৈতন্য বিশ্বাস করেন, "প্রেম ও ভক্তি, নাচ ও গানের মাধ্যমে যে উল্লাস সৃষ্টি হয়, তাহাতে ভগবানের ব্যক্তিগত উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়।"

গুরু নানক

গুরু নানক শিখ ধর্মের প্রবর্তক। ১৪৬৯ সালে লাহোরের নিকটবর্তী তালওয়ান্দি (আধুনিক নানকানা) নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। লাহোরের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদীর অধীনে তিনি একটি সামান্য চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার বিশ্বসহনশীলতার ধর্ম প্রচারে বাহির হইয়া

পড়েন। ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের ভাল ভাল পদ্ধতিসমূহ লইয়া তিনি এই সহনশীলতার ধর্ম উদ্ভাবন করেন। ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে তিনি চিরতরে নির্মূল করিতে সংকল্প করেন। তিনি বিস্তৃতভাবে ভারত সফর করেন, এমনকি মক্কা ও বাগদাদ পর্যন্ত তিনি ভ্রমণ করেন। গুরু নানক খোদার একত্ববাদও প্রচার করেন।

ভাষা, স্থাপত্য শিল্প ও সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধন

(ক) ভাষা ঃ সুলতান, আমির ও প্রাদেশিক মুসলিম শাসনকর্তাগণ কর্তৃক ফারসি ভাষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। সেই যুগের অন্যান্য কবিদের মধ্যে আমির খসরু সর্বশ্রেষ্ঠ। মুসলিম শাসকগণ এশিয়ার বিভিন্ন অংশ হইতে আগত ফারসি বিদ্বানদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। দিল্লী, জলন্ধর, ফিরুজাবাদ ও অন্যান্য স্থানে তাঁহারা ফার্সি ভাষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বিভিন্ন গ্রন্থাগারও তাঁহারা স্থাপন করেন, তন্মধ্যে দিল্লীর গ্রন্থাগার সর্ববৃহৎ। আমির খসরু "একজন প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন, যাহার প্রতিভা স্বভাবত কবিতা, গদ্য ও সঙ্গীতে বিকশিত হইয়াছে।" তিনি খিলজী ও তুঘলকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। আরেকজন প্রসিদ্ধ কবি হাসান-ই-দেহলভী। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর দরবারে বিভিন্ন বিদ্বান ও পণ্ডিতদের একত্র সমাবেশ হইত, যাহার ফলে দিল্লী, বাগদাদ, কায়রো ও কনস্টান্টিনোপলের ঈর্ষার পাত্র হইয়া দাঁড়ায়। খিলজী ও তুঘলক বংশের প্রায় সমস্ত সুলতানই সাহিত্য ও বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের আমলের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ছিলেন মাওলানা উমরানী। ফতুহায়ে ফিরুজ শাহী নামক গ্রন্থটি সুলতান ফিরুজ শাহ্ স্বয়ং রচনা করেন। তাঁহার আমলে কাজী আবদুল মুকতাদির শানিহী, মাওলানা খাজাগী এবং আহম্মদ থানেশ্বরী ছিলেন খুব প্রসিদ্ধ ফারসি পণ্ডিত। এই সময় বিখ্যাত ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী তাঁহারা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী' রচনা শেষ করেন।

ফারসি ভাষা

এই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষাও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে। আনুমানিক ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে পার্থ সারথী মিশ্র কর্ম-মীমাংসার উপর অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য নাটক হইল 'হামির মদ-মরদানা' 'প্রদ্যুমনালে যুদ্ধ' এবং 'প্রতাপরুদ্র কল্যাণ' প্রভৃতি। রামানন্দ ও কবির এমন একটি ভাষা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন, যাহা হিন্দু ও মুসলিম উভয়েই সহজে গ্রহণ করিতে পারে। যাহার ফলে হিন্দি ভাষার উৎপত্তি লাভ করে। বাংলার মুসলিম শাসকগণ বাংলা সাহিত্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এইভাবেই গৌড়ের সুলতান নুসরাত শাহ 'মহাভারত' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন। কবি বিদ্যাপতি এই সুলতান এবং সুলতান গিয়াসুদ্দিনের প্রশংসায় অনেকগুলি রচনা প্রণয়ন করেন। এই সময়ে ভগবতগীতাও বাংলায় অনূদিত হয়। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছোটি খানের মত অন্যান্য শাসনকর্তাগণ মহাভারতের 'অশ্বমেধ প্রভা'কে বাংলায় অনুবাদ করেন।

সংস্কৃত ভাষা
হিন্দি ভাষার উৎপত্তি
বাংলা ভাষা

ভারতের হিন্দু-মুসলমান ভাষাগত সংমিশ্রণের জ্বলন্ত প্রমাণ হইল উর্দু ভাষার উৎপত্তি। সুলতানী ও মুঘল আমলে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ভাষাভাষি লোক, যথা তুর্কি, ইরানি, তুরানি, হিন্দুস্থানি সৈন্য একত্রে বসবাস করে। তাহারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। এইভাবে বিভিন্ন

ভাষার সংমিশ্রণে উর্দু ভাষার উৎপত্তি হয়, যাহার উচ্চারণ হিন্দি কিন্তু বর্ণমালা আরবি-ফার্সী। সংমিশ্রণের ফলে অনেক হিন্দু ফার্সী ভাষায় কাব্য রচনা করেন এবং অনেক মুসলমান হিন্দু বিষয়ের উপর কাব্য রচনা করেন, যথা মালিক মুহাম্মদ জায়সী পদ্মিনীর উপর এবং অনেক হিন্দু মুসলমান এই বিষয়ে লিখেন, যথা রাই ভানা মল তাঁহার ইতিহাসে লিখেন।[১৪]

উর্দু ভাষার উৎপত্তি

(খ) স্থাপত্য শিল্প ঃ দিল্লীর সুলতানগণ ভারতে স্থাপত্য শিল্পের অনেকগুলি নূতন কায়দা-প্রণালী প্রবর্তন করেন। এইগুলি প্রধানত মক্কা, দামেস্ক ও মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অট্টালিকাসমূহের অনুকরণে নির্মাণ করা হয়। কিন্তু হিন্দু প্রভাবে ইহা অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে।[১৫] কারণ, মসজিদ, মহাবিদ্যালয় ও অন্যান্য অট্টালিকাসমূহ নির্মাণ করিতে গিয়া সুলতানদিগকে ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পীদের দ্বারা কাজ করিতে হয়। ফলে এইসব নূতন ইমারতকে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা মুসলিম জাহানের অন্যান্য কীর্তিসমূহের চাইতে ভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

গজনীর সুলতান মাহমুদ ভারতীয় স্থপতিদের স্থাপত্য শিল্পে এমন বিমোহিত হন যে, ভারত হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় কয়েক হাজার ভারতীয় স্থপতি তিনি গজনী লইয়া যান এবং ইহাদিগকে গজনীর জামে মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যবহার করেন।[১৬] তাঁহার পদাংক অনুসরণ করিয়া পরবর্তী সুলতান মুহাম্মদ ঘোরী, কুতুবুদ্দিন আইবেক এবং ইলতুৎমিশও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। স্থপতি কার্যে তাঁহারা উল্লেখযোগ্য দক্ষতার পরিচয় দান করেন। দিল্লীর বিখ্যাত কুতুব মিনার সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক আরম্ভ করেন এবং সুলতান ইলতুৎমিশ ইহা সমাপ্ত করেন। তবে এই বর্ণনাটিতে মতভেদ রহিয়াছে। ফারগুসন মনে করেন, টিকিয়া রহিয়াছে বলিয়া সুবিদিত স্তম্ভসমূহের মধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ। স্যার জন মার্শাল বলেন ঃ "এইরূপ সুদৃঢ় ও বিশাল ইমারতের চাইতে অধিক উপযুক্ত বা চিত্তাকর্ষক মুসলিম শক্তির নিদর্শন আর কোন কিছু নিশ্চয়ই হইতে পারে না; ইহার মত সমৃদ্ধিশালী কিন্তু সংযত ভাস্কর্যের চাইতে মনোমুগ্ধকরও অন্য কিছু হইতে পারে না।"[১৭] সিনহা ও ব্যানার্জি বলেন ঃ তবে ইহা সম্পূর্ণভাবে একটি ইসলামী ইমারত; কারণ এই ধরনের স্তম্ভ হিন্দুদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। কুতুবুদ্দিন আইবেক আজমীরে 'আড়াই দিন কা ঝোপড়া' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং ইলতুৎমিশ একটি মার্বেল পাথরের খোদাই করা পর্দা দিয়া ইহাকে সুন্দরতম করেন।

প্রাথমিক সুলতানগণ

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী অট্টালিকা পছন্দ করিতেন। তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর ইমারত নির্মাণ করেন। খিলজী স্থপতিসমূহ ব্যাপকভাবে অলংকারের ব্যবহার ও সবিশেষ বর্ণনারীতিতে সমৃদ্ধ। হিন্দু প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় ইলতুৎমিশের সময় এবং ফলে হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজারের পার্শ্বে নির্মিত আলাউদ্দিন খিলজীর "মসজিদকে মুসলিম রীতিতে তৈয়ারি ভারতের সর্বপ্রথম একটি মসজিদ" বলিয়া বর্ণনা করা হয়। আলাউদ্দিন খিলজীর 'আলাই দরওয়াজা' ইসলামী স্থাপত্য শিল্পের আরেকটি নমুনা। সিরিতে আলাউদ্দিনের ইমরাতসমূহের ধ্বংসাবশেষ আমাদিগকে সামরিক স্থাপত্য শিল্পের কিছু উদাহরণ প্রদান করে।

খিলজী বংশ

তুঘলক বংশের স্থপতিগুলি ইহার দৃঢ়তা এবং একটি কঠোর ও ধর্মীয় সরলতার জন্য

উল্লেখযোগ্য। তুঘলকাবাদ নগরী ও গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের মাজার এইগুলির সরলতা ও সুদৃঢ়তার জন্য প্রসিদ্ধ। মুহাম্মদ বিন তুঘলক আদিলাবাদ দুর্গ ও জাহানপানাহ্ নগর স্থাপন করেন। ফিরূজ তুঘলক ফিরূজাবাদ দুর্গ, ফতেহাবাদ, জৌনপুর, হিসারে ফিরূজ প্রভৃতি নির্মাণ করেন।

তুঘলক বংশ

লোদীদের আমলে তুঘলক আমলের বিশালতা দূরীভূত হয়। লোদীগণ স্থাপত্য শিল্প নির্মাণ করিবার মত অত সমৃদ্ধিশালী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের ইমারতসমূহ জীবন্ত ও মনোরম। এই যুগের রীতি মুঘলগণও অনুকরণ করেন। বস্তুত মুঘল স্থাপত্য শিল্পে এই যুগের যথেষ্ট প্রভাব দৃষ্ট হয়।

সৈয়দ ও লোদীগণ

বিভিন্ন প্রদেশে শাসনকর্তাগণ স্থাপত্য শিল্প ও চিত্রকলায় বেশ উৎসাহ প্রদান করেন। বাংলার গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষসমূহ এখনও আকর্ষণীয়। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ ও গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা বাংলার ইমারতসমূহের শ্রেষ্ঠ নমুনা। কিন্তু এইগুলি গুজরাট রীতির তুলনায় নিম্নশ্রেণীর। আহমদনগরের আহমদ শাহের জামে মসজিদ এবং চম্পানীরের মাহমুদ বিগারহের বড় মসজিদ খুব সুন্দর ইমারত। স্থাপত্য শিল্পের আরেকটি কেন্দ্রস্থল জৌনপুর। ইব্রাহিম শাহ্ সারকি নির্মিত অতলা মসজিদ জৌনপুর রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

প্রাদেশিক স্থাপত্য শিল্প

(গ) **সঙ্গীত ঃ** দিল্লী সালতানাতের আমলে সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধনের কোন নিদর্শন সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। তাহা সত্ত্বেও ভারতের সঙ্গীত ছিল খুবই সমৃদ্ধিশালী। ইহা অতি সহজেই দিল্লী সালতানাতের নগণ্য সঙ্গীত শিল্পের স্থান লাভ করে। ফলে, সঙ্গীতে সংমিশ্রণ সর্বাধিকভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং এই দুইয়ের সংমিশ্রণে একটি কোমল মিশ্রণের উৎপত্তি হয়।

সূফী মতবাদ ঃ সূফী মতবাদ মারেফাতের একটি অংশ। প্রত্যেক যুগে ও স্থানে কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে এই মতবাদ পাওয়া যায়। ইহা মনের একটি অবস্থা। যাহারা আল্লাহর গজবকে ভীষণভাবে ভয় করেন, তাঁহাদের মধ্যেই ইহার সঞ্চার হয়। আত্ম-সাধনা ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি গভীর প্রেমে এই মতবাদ নিমগ্ন করে। সুতরাং সূফী মতবাদ প্রধানত আল্লাহ্র প্রেমের উপর গড়িয়া উঠে।

সূফীবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে মতভেদ আছে। বর্তমানে চারিটি মতামত পাওয়া যায়ঃ

১। ভারতীয় বৈদান্তিক বা বৌদ্ধ ধর্মপ্রসূত। এই মতামত অনুসারে বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের সংস্পর্শে আসিয়া মুসলমানদের মধ্যে সুফীবাদ ঢুকিয়া পড়ে।

২। খ্রিস্টধর্মপ্রসূত। এই গোষ্ঠী মনে করে যে, খ্রিস্টানদের নিউ প্লাটুনিকদের সংস্পর্শে ইহার উৎপত্তি হয়।

৩। কেউ কেউ পারস্যবাসীদের মধ্যে ইহার উৎপত্তি বলিয়া মনে করেন।

৪। ইহা ছাড়া আরও এক মতানুসারে কোরআনই হইল সূফী মতবাদের উৎপত্তিস্থল।

সূফীবাদের চারিটি শাখা বা তরিকা রহিয়াছে ঃ

১। চিশতিয়া, ২। কাদেরিয়া, ৩। নক্সবন্দিয়া, ৪। মোজাদ্দেদিয়া।

দিল্লী সালতানাতের আমলে ভারতে চিশতিয়া শাখা খুবই জোরদার ছিল। এই উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে তাহাদের যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে।

পাদটীকা

১। The nobility exercised a predominant influence in the State as generals, administrators and sometimes as king makers.— কালী কিংকর দত্ত ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৫।

২। ঐ, পৃঃ ৩৯৬।

৩। 'We know from Ferishta how Mahmud of Ghaza carried off a vast booty, and it is striking that even after the extravagance of Muhammad bin Tughlaq, and the chronic disorders of the later Tughlaq period, there remained sufficient quantities of wealth for Amir Taimur to carry away to Samarqand.—কে. কে. দত্ত ঃ প্রাগুপ্ত, পৃঃ ৩৯৬।

৪। As the cheapest country to live in.

৫। Eight Dirhams were sufficient here for the annual expenses of a family of three- কে. কে. দত্ত. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৯।

৬। The trade conditions were favourable in the thirteenth and fourteenth centuries— ঈশ্বরীপ্রসাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৯।

৭। The inhabitants are good and live by their trade and manufacture—Marco-Polo ঈশ্বরী প্রসাদ কর্তৃক প্রাজ্ঞক্ত গ্রন্থে উদ্বৃত্ত পৃঃ ১৯০।

৮। Merchants of all countries never cease to carry pure gold into India and to bring each exchange commodities of herbs and gums. —Masalik al Asbar.

৯। Thus the Royal Karkhanas or manufacturers at Delhi sometimes employed 4000 weavers of silk besides manufactureres of other staffs to satisfy royal demands.—K. K. Datta প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯৭।

১০। But, judged by standards of today, they had fewer needs. The villages being economically self sufficient, the simple requirements of the rural population were supplied locally to their satisfaction.—কে. কে. দত্ত প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯।

১১। Seldom in the history of mankind has the spectacle been witnessed of two civilizations, so vast and so strongly developed yet so radically dissimilar as the Mohammedan and Hindus, meeting and mingling together. The very contrast which existed between them, the wide divergence in their culture and their religions, make the history of their impact peculiarly instructive ... Sir John Marshall.

১২। The whole background of Kabir's thought is Hindu.

১৩। কে. কে. দত্ত ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৯।

১৪। কালী কিংকর দত্তঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০২।

১৫। They were based primarily on the model of buildings at Mecca, Damascus and other cities of the Muslim world, but profoundly modified by Hindu influence.

১৬। ঈশ্বরী প্রসাদ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯১।

১৭। Nothing certainly, could be more imposing or more fittingly symbolic of Muslim power than this stern and stupendous fabric, nor could anything be more exquisite than its rich but restrained carvings in India, —Marshall.

গ্রন্থপঞ্জি

A. B. M. Habibullah	:	*Foundation of Muslim Rule in India*
W. Hussain	:	*Administrators of Justice in Muslim India*
Fergusson	:	*History of India and Eastern Architecture* Vol. I & II
Tara Chand	:	*Influence of Islam on Indian Culture.*
D. C. Sen	:	*History of Bengali Language and Literature.*
Majumder, Raychaudhury and Datta	:	*An Advanced History of India.*
Ishwari Prasad	:	*A Short History of Muslim Rule in India*
Ibn Batuta	:	*Travels*
অনুঃ মোহাম্মদ নাসীর আলী	:	সফর নামা

দ্বিতীয় খণ্ড

মুঘল সাম্রাজ্য

১৫২৬-১৮৫৮ খ্রিঃ

প্রথম অধ্যায়
মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

বাবর
(১৫২৬-১৫৩০ খ্রিঃ)

ভারতের তৎকালীন অবস্থা ঃ "ভারতের মুসলমানগণ জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল ....। একটি বিজয়ী জাতি সিংহাসনের বিলাসিতার জন্য একে অপরের সহিত লাঠালাঠিকারী বিবাদী জনতায় পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু ক্ষমতা টিকাইয়া রাখিবার মত শক্তি তাহাদের ছিল না।"[১] সুলতান ইব্রাহিম লোদীর আধিপত্য আগ্রা, দোয়াব, বিয়ানা ও চান্দেরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পাঞ্জাব দৌলত খান এবং তাঁহার দুই পুত্র গাজী খান ও দিলওয়ার খানের অধীনে ছিল। ইব্রাহিম খানের অত্যাচারে শংকিত হইয়া তিনি সর্বদা দিল্লীর বশ্যতা অস্বীকার করিবার সুযোগে ছিলেন।

পশ্চিমে সিন্ধু ও মুলতান এবং পূর্বে জৌনপুর, বাংলা ও উড়িষ্যা ইতোমধ্যে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। মধ্যভাগে মালব ও খান্দেশ তখন স্বাধীন সুলতানগণ কর্তৃক শাসিত হয়। স্বাধীন মুসলিম শাসকগণ নিজেদের মধ্যে তখন ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত। শেষ পর্যন্ত সব প্রদেশ, ছোট ছোট জেলা, এমনকি নগর এবং দুর্গসমূহ পর্যন্ত স্বাধীন হইয়া উপরস্থ কোন শাসকের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া চলে। ইহা হইল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাগণের যুগ, যাহাদিগকে আরব ঐতিহাসিকগণ উপযুক্তভাবেই 'মুলক উল তাওয়াইফ' বা বিবদমান রাজন্যবর্গ বলিয়া আখ্যায়িত করেন। উত্তর ও মধ্যভাগের রাজত্বগুলির মাঝে ছিল রাজপুত রাষ্ট্রসমূহ, যাহাদের ক্ষমতা দিল্লীর অপসৃয়মান শক্তি ও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বিবাদের সুযোগে দিন দিন বর্ধিত হইতেছিল। শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবের দৌলত খান লোদী ও আলম খান লোদীর আমন্ত্রণের দ্বারা মুঘল দিগ্বিজয়ী বাবর কর্তৃক ভারতীয় উপমহাদেশ বিজয়ের পথ সুগম হয়।

তাঁহার প্রাথমিক জীবন ঃ জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান চীনা তুর্কিস্তানের অন্তর্গত ফারঘানায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার দিক হইতে তিনি মধ্য এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিজয়ী আমির তৈমুরের বংশধর। মাতার দিক হইতে তিনি প্রসিদ্ধ মোঙ্গল বিজয়ী চেঙ্গিস খানের বংশধর। যদিও তিনি মুঘল হিসাবেই পরিচিত, কিন্তু মূলত তিনি একজন চাগতাই তুর্কি। বার বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা ওমর শেখ মীর্জা বর্তমান চীনা তুর্কিস্থানের অন্তর্গত ফারঘানা নামক ক্ষুদ্র রাজ্যটি রাখিয়া ১৪৯৪ সালে পরলোকগমন করেন।[২]

বংশ পরিচয়

পিতার মৃত্যুর পর বাবর বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। তবে তিনি অতি সতর্কতার সহিত তাঁহার পিতার ক্ষুদ্র রাজ্যটি রক্ষা করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ আমির তৈমুরের সমগ্র

রাজ্য হস্তগত করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও উজবেক নেতা শাইবানী খান তাঁহার আকাঙ্খার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ান। ১৪৯৭ সালে তিনি সমরকন্দ অধিকার করেন। কিন্তু সমরকন্দে থাকাকালীন তিনি ভীষণ অসুস্থ হইয়া পড়ায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সমরকন্দ ছাড়িতে হয়। ইতোমধ্যে তিনি তাঁহার পিতৃরাজ্য ফারঘানাও হারাইয়া ফেলেন। তাঁহার অবস্থা এখন একজন ভূমিহীন অভিযানকারীর পর্যায়ে নামিয়া আসে। ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনরায় সমরকন্দ অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। পরবর্তী বৎসর তিনি অসহায়ভাবে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান। তৎকালে কাবুল উজবেকদের হাতে ছিল। উজবেকদের অন্য স্থানে একটি বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া তিনি ১৫০৪ সালে কাবুল অধিকার করেন। পারস্যের শাহ ইসমাইল সাফাভীর সাহায্য লইয়া ১৫১১ খ্রিস্টাব্দে বাবর পুনরায় সমরকন্দ অধিকার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৫১২ সালে উজবেকগণ কর্তৃক শেষবারের মত তিনি বিতাড়িত হন।

ভাগ্য বিতাড়িত বাবর

উত্তর-পূর্ব দিকে তাঁহার পথ রুদ্ধ দেখিয়া বাবর দক্ষিণ-পূর্বদিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। উপমহাদেশে সরাসরি প্রবেশ করিবার প্রাক্কালে তিনি এইদিকে কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন, কিন্তু প্রত্যেকটিই ছিল পর্যবেক্ষণমূলক অভিযান। ১৫১৯ সালে উপমহাদেশের প্রথম অভিযান তিনি ইউসুফজাইয়ের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেন এবং ১৫২০ সালে রাজাউর-এর বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযান পরিচালনা করেন। আমির তৈমুরের বংশধর হিসাবে বাবর পাঞ্জাবকে তাঁহার পিতৃসম্পত্তি বলিয়া মনে করেন। ১৫২৪ সালে তিনি খাইবার গিরিপথের মধ্য দিয়া অগ্রসর হন এবং ঝিলাম ও চেনাব নদী অতিক্রম করিয়া দিপালপুর আক্রমণকরত ইহা অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহাকে পুনরায় লাহোরে পশ্চাদপসারণ করিয়া কাবুলে ফিরিয়া যাইতে হয়। কারণ, ইতোমধ্যে দৌলত খান ও আলম খান তাঁহার বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করেন। টলটলায়মান লোদী বংশকে একটি শোচনীয় পরাজয় দিবার জন্য বাবর এখন নিজেকে প্রস্তুত করেন।

উপমহাদেশ অভিযানে মনোনিবেশ

ভারত অভিযান ঃ ১৫২৫ সালের নভেম্বর মাসে চূড়ান্তভাবে ভারত বিজয়ের জন্য বাবর পুনরায় বহির্গত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন বদখসান হইতে একদল যোদ্ধা লইয়া উপস্থিত হন। দৌলত খান বাবরের সঙ্গে প্রতারণা করেন এবং ৪০ হাজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কিন্তু বাবরের উপস্থিতিতে দৌলত খানের বিশাল সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া যায় এবং বাবর তাঁহার বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখেন।

"১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১শে এপ্রিল চূড়ান্ত যুদ্ধটি সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক পলাশির প্রান্তরে, যেখানে ভারতের সিংহাসন তিনবার জয় হইয়াছিল।"[৩] কয়েকদিন যাবৎ বাবর তাঁহার প্রস্তুতি লইয়া ব্যস্ত থাকেন। ইতোমধ্যে তিনি যে বাহিনী লইয়া ভারতে অভিযান চালাইয়াছিলেন, তাহার চেয়েও সতর্কতার সহিত বাছাই করা এক সেনাবাহিনী লইয়া বাবর তাঁহার অভিযান পরিচালনা করেন। তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য ইব্রাহিম লোদী দিল্লী যুদ্ধযাত্রা করেন। প্রথমে ছোট আকারের একটি সংঘর্ষ হয় এবং তথায় হুমায়ুন তাঁহার বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তারপর দিল্লী

পানিপথের যুদ্ধ ২১শে এপ্রিল ১৫২৬

ভারত (১৫২৫ খ্রিস্টাব্দ)

GUJRAT
R. Tapti
BERAR
R. Wardha
ORISSA
R. Godavari
R. Painganga
AHMADNAGAR
Bombay
Chaul
Dabhol
BIDAR
Warangal
GOLCONDA
R. Bhima
Kulburga
Kulburga
BIJAPUR
R. Kistna
Talicota
Raichur
R. Kistna
Kondavid
Kondapalli
Mudgal
Anagundi
R. Tungabhadra
Honavar
Nellore
R. Pennar (N)
Pennakonda
Chandragiri
VIJAYANAGAR
BAY
OF
BENGAL
Conjeeveram
Seringapatam
R. Pennar (S)
ARABIAN
SEA
R. Cauvery
Trichnopoly
Cochin
Madura
Rameshwaram
Cape Comorin
দাক্ষিণাত্য

হইতে ৪০ মাইল দূরে পানিপথ নামক একটি ছোট্ট শহরে উভয় সৈন্যবাহিনী মিলিত হয়। বাবরের সঙ্গে ছিল একটি বৃহদাকারের গোলন্দাজ বাহিনী ও ১২ হাজার পদাতিক সৈন্য। অপরপক্ষে, বাবরের অনুমান মত ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে ছিল এক লক্ষ সৈনিকের একটি বিরাট বাহিনী। এই বাহিনী সবদিক হইতে ছিল বাবরের বাহিনীর চাইতে উচ্চ মানের। কিন্তু বাবরের মধ্যে ছিল চরিত্রের দৃঢ়তা ও একজন বীরত্বপূর্ণ সেনানায়কের অভিজ্ঞতা। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যবাহিনী এক শোচনীয় পরাজয় বরণ করে এবং ইব্রাহিম লোদী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। বাবর তাঁহার আত্মজীবনীতে (Memoirs) লিখেন ঃ "সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহে ও দয়ায় এই কঠিন কাজ আমার নিকট সহজ করিয়া দেওয়া হয় এবং সেই বিশাল সেনাবাহিনীকে অর্ধদিনের মধ্যে ধূলায় ভূলুণ্ঠিত করিয়া দেওয়া হয়।" তিনিটি যাত্রায় বাবর দিল্লী পৌছান এবং তারপর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ই মে একজন বিজয়ী সম্রাট হিসেবে তিনি আগ্রায় উপস্থিত হন।

পানিপথের যুদ্ধ দিল্লীর সাম্রাজ্য বাবরের হাতে অর্পণ করে। লোদী বংশের ক্ষমতা ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। "কিন্তু ইব্রাহিমের উপর বাবরের বিজয়লাভের ফলে মুঘলদের হিন্দুস্থান বিজয় সমাপ্ত হয় নাই। ইহা তাঁহাকে দেশের প্রকৃত আধিপত্য প্রদান করে নাই। কারণ, সেখানে তখনও আফগান সামরিক শক্তি ও রানা সংঘের অধীনে রাজপুতদের মত রাজনৈতিক ক্ষমতাকাঙক্ষী সুদৃঢ় শক্তিবর্গ বর্তমান ছিল, এবং তাঁহার বিরোধিতা করাটা, অতএব, অবশ্যম্ভাবী ছিল।"[৫] একজন আধুনিক লেখক বলেন, বাবরের কর্তব্যের ব্যাপকতা ঠিক তখনই বুঝা যায়, যখন আমরা বলি প্রকৃতপক্ষে ইহা পানিপথের সঙ্গেই আরম্ভ হয়। সাম্রাজ্য গঠনের পথে পানিপথ তাঁহাকে সূচনা প্রদান করে, এবং এই পথের প্রথম বিপত্তি ছিল আফগান গোত্রগুলির বাধা প্রদর্শন। তাহা সত্ত্বেও পানিপথের যুদ্ধ ভারতে মুঘল আধিপত্যের গোড়া পত্তন করে।

ফলাফল

পানিপথের যুদ্ধের পর বাবর দিল্লীর উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে আফগান অভিজাতবর্গকে দমন করেন। অবিজিত অঞ্চলসমূহে আফগান প্রধানদিগকে দমন করিবার জন্য তাঁহার সেনাপতিদিগকে প্রেরণ করিয়া বাবর রানা সংঘের অধীনে রাজপুতদের সংঘবদ্ধ দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য স্বয়ং আগ্রায় অবস্থান করিতে থাকেন।

রানা সংঘ

খানুয়ার যুদ্ধ (১৫২৭) ঃ পানিপথের যুদ্ধের পর হইতে এই পর্যন্ত বাবর তাঁহার স্বধর্মীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু এখন তাঁহাকে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ধরনের শত্রুর মোকাবিলা করিতে হয়। মেবারের রানা সংঘ এক অসাধারণ কৃতিত্বের লোক। তিনি নিশ্চয়ই ইব্রাহিম লোদীর চেয়ে অধিক দুর্ধর্ষ ক্ষমতার অধিকারী। উভয়েই সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতিসত্তার অধিকারী—বাবর হলেন পশ্চিম তাতারীর তুর্ক-মঙ্গোলিয়ান জাতিভুক্ত আর রানা সংঘ হলেন প্রাচ্যের খাঁটি আর্যজাতিভুক্ত, কিন্তু উভয়েই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর দুর্ধর্ষতা স্বীকার করেন।[৬] রানা সংঘ মাড়ওয়ার, আম্বর, গোয়ালিয়র, আজমীর ও চান্দেরী শাসকদের সাহায্য লাভ করেন। সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে ছিল ১২০ জন নেতা, ৮০ হাজার অশ্বারোহী, ৫০০ গজারোহী বাহিনী ও ১০ হাজার পদাতিক সেনা। শক্তিশালী, বীরত্বপূর্ণ, যুদ্ধাকাঙক্ষী ও রক্তপিপাসু রাজপুত জাতীয় চেতনায় সজীব হইয়া মুঘল সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়।

বাবরের ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী আতংকগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার অনুচরদের মধ্যে ভয় ও ত্রাসের সঞ্চার হয়। কিন্তু বাবর দুর্জয় বীর্যের অধিকারী। তিনি তাঁহার সৈন্যবাহিনীর আত্মসম্মান ও ধর্মীয় চেতনায় জোরালোভাবে আবেদন করেন। তৎসঙ্গে তিনি তাঁহার মদপাত্রগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলেন, সমস্ত মদ উপুড় করিয়া মাটিতে ঢালিয়া দেন এবং জীবনে কখনও আর মদ পান করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। ইহার ফলে তিনি এক যাদুকরী প্রতিক্রিয়া লাভ করেন। তাঁহার সমস্ত সৈন্য বিজয় বা মৃত্যুবরণ করিবার জন্য কোরআন শরীফ স্পর্শ করিয়া শপথ করেন। ১৫২৭ সালের ১৬ই মার্চ, মুঘল ও রাজপুত সেনানী আগ্রার পশ্চিমে খানুয়া নামক গ্রামে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বাবর পানিপথের যুদ্ধের মত একই কৌশল এখানে প্রয়োগ করিয়া রানার সেনাবাহিনীর মধ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন। সারাদিন ধরিয়া যুদ্ধ চলে এবং বিকালের দিকে ইহার মীমাংসা হইয়া যায়। রাজপুত বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করে এবং আতংকগ্রস্তভাবে ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। রানা সংঘ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। খানুয়ার যুদ্ধের দিবস হইতে বাবর গাজী উপাধি ধারণ করেন। বাবর এই বিজয়ের ফল ভোগ করেন এবং চান্দেরী অধিকার করেন। ইহার কিছুদিন পরেই রানা সংঘ মৃত্যুবরণ করেন।

কাজী বাবর

"খানুয়ার যুদ্ধ নিশ্চয়ই ভারতের ইতিহাসের চূড়ান্ত যুদ্ধসমূহের অন্যতম"। ইহার ফলে শক্তিশালী রাজপুত জোট ধ্বংস হইয়া যায় এবং ভারতের মুসলমানগণ নিশ্চিহ্ন হইবার হাত হইতে রক্ষা পায়। এই যুদ্ধ রাজপুত শক্তির পুনর্জাগরণ বন্ধ করিয়া দেয়। রাজপুতদের পরাজয়ের ফলে ভারতে একটি নূতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা বাবরের জন্য সহজ হইয়া যায়। এই বিজয় বাবরের কার্যাবলির কেন্দ্রস্থল কাবুল হইতে হিন্দুস্থানে স্থানান্তরিত করে। প্রফেসর রাস্‌ব্রুক উইলিয়ামস্ যথার্থই মন্তব্য করেন যে, খানুয়ার যুদ্ধের পূর্বে হিন্দুস্থান অধিকার করাটা হয়ত বাবরের অভিযানকারী জীবনের একটি ঘটনাবিশেষের মতই মনে হইত, কিন্তু এই বিজয়ের পর হইতে ইহা তাঁহার পরবর্তী জীবনের কার্যাবলির প্রধান সুর হইয়া দাঁড়ায়।[৮]

খানুয়ার যুদ্ধের ফলাফল

গোগরার যুদ্ধ (১৫২৯) ঃ কিছু সময়ের জন্য বাবর আফগান প্রধানদিগকে ছাড়িয়া রাজপুতদের বিরুদ্ধে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। রাজপুতদিগকে দমন করিবার পর তিনি আফগানদিগকে দমন করিবার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করেন। পূর্বাঞ্চলের আফগানরা বাবরকে খুবই বিপদে ফেলে এবং তাই তাঁহাকে বেশ কিছু অভিযান তথায় প্রেরণ করিতে হয়। তাঁহার সর্বশেষ অভিযানে গঙ্গানদী পার হইয়া তিনি বেনারস ও গাজীপুর অধিকার করেন। অতঃপর গোগরা নদী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে তিনি উপনীত হন। পূর্বাঞ্চলের রাজ্য জৌনপুরের আফগান অভিজাতবর্গ বাংলার সুলতান নুসরাত শাহ্ ও বিহারের অন্যান্য আফগানদের সহিত মিলিত হন। বাবর বাংলা, বিহার ও জৌনপুরের সম্মিলিত বাহিনীর সহিত মোকাবিলা করিয়া ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মে পাটনার নিকটবর্তী গোগরা নদীর তীরে তাহাদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। বহু আফগান নেতা বাবরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং বাংলার সুলতান তাড়াতাড়ি তাঁহার সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি করেন। অন্যান্য বিরুদ্ধপক্ষীয় আফগানগণ দিল্লী বাহিনীর সম্মুখে আর টিকিতে পারে নাই। ফলে বাবরের রাজত্বের শেষ বৎসর খুব নিরাপদেই অতিবাহিত হয়। এইভাবেই তিনটি যুদ্ধের দ্বারা বাবর

অক্সাস হইতে গোগরা এবং হিমালয় হইতে গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল রাজ্যের অধিকারী হইয়া যান।

জীবনের ন্যায় সম্রাট বাবরের মৃত্যুও শেষ অবধি মানবধর্মী। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন রোগ শয্যায় শায়িত। ডাক্তারগণ তাঁহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দেন। বাবরের একজন বন্ধু কথা প্রসঙ্গে বলেন, সময় সময় দেখা যায় যে, পীড়িত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সবাইতে প্রিয় বস্তু বিসর্জন দিলে আল্লাহ তায়ালা তাহা গ্রহণ করেন এবং পীড়িত ব্যক্তিকে মুক্তি দেন। অতঃপর বাবর মন্তব্য করেন যে, তাঁহার জীবনই যুবরাজ হুমায়ুনের সবচাইতে প্রিয়বস্তু। তিনি অতি একাগ্রতার সহিত মুনাজাত করিয়া পীড়িত যুবরাজের শয্যায় তিনবার প্রদক্ষিণ করেন। তারপর বাবরকে বলিতে শুনা যায়, তিনি সফলকাম হইয়াছেন এবং তাঁহার পুত্র বাঁচিয়া গিয়াছে। শীঘ্রই হুমায়ুন রোগমুক্ত হন এবং তৎসঙ্গে ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর বাবর প্রাণত্যাগ করেন। পূর্ব ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাকে কাবুলে দাফন করা হয়।

বাবরের মৃত্যু

সম্রাট বাবর মাত্র চারি বৎসর উপমহাদেশে অবস্থান করেন এবং ইহার মধ্যে তিনি পাঞ্জাব, আধুনিক যুক্তপ্রদেশ, উত্তর বিহার এবং প্রধান রাজপুত রাষ্ট্র মেবার করায়ত্ত করেন। কিন্তু বিজয় ছাড়া আর কিছুই তিনি করিতে পারেন নাই। কারণ, বিজিত দেশগুলিকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্বেই তিনি মারা যান। স্বভাবতই তাঁহার বিজয়সমূহের সহিত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তিনি আনয়ন করিতে পারেন নাই। যাহা তিনি করিয়া গিয়াছেন, তাহার চাইতেও যাহা তিনি অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিচারকার্য পরিচালনা করিবার জন্য রাজ্যে কোন বিচার বিভাগ ছিল না। দেশের প্রচলিত আইন-কানুন চালু রাখিবার জন্য বাবর নির্দেশ প্রদান করেন। সাম্রাজ্যকে তিনি কতকগুলি জায়গীরে বিভক্ত করিয়া ঐগুলিকে তাঁহার অনুগত কিছুসংখ্যক জায়গীরদারের হাতে অর্পণ করেন। এইসব জায়গীরদার লোদীদের ন্যায় স্বাধীন না হইলেও এই প্রথার মধ্যে পূর্বের ন্যায় গলদ থাকিয়া যায়। যত্রতত্র অর্থ বন্টনের দ্বারা দেশে অর্থনৈতিক গোলযোগ দেখা দেয়। ফলে, প্রয়োজনীয় অস্ত্র ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত কিছু কর তাঁহাকে আদায় করিতে হয়। সুতরাং রাসব্রুক উইলিয়ামস্-এর সাথে আমরা একমত হইতে পারি যে, "তিনি (বাবর) তাঁহার পুত্রের হাতে এমন একটি রাজ্য অর্পণ করেন, যাহাকে শুধু যুদ্ধাবস্থা স্থায়িত্বের দ্বারাই সন্নিহিত রাখা যায়; যাহা শান্তির সময় ছিল দুর্বল, কাঠামোহীন ও মেরুদণ্ডহীন।"[৯]

নূতন সাম্রাজ্যের শাসনকার্য

সম্রাট বাবরের চরিত্র বিশ্লেষণ ঃ এশিয়ার ইতিহাসে বাবর অত্যন্ত বিচিত্র ও চমকপ্রদ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অন্যতম।[১০] একজন নৃপতি, যোদ্ধা ও পণ্ডিত হিসাবে তিনি মধ্যযুগীয় সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য। ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন ঃ "মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষ, প্রাগৈতিহাসিক যাযাবর জাতি ও রাজকীয় সরকার, তৈমুর লঙ্গ ও আকবরের মধ্যে বাবর একটি যোগসূত্র।[১১]

ইতিহাসে তাহার স্থান

বাবর এমন এক শ্রেণীর লোক, যাঁহারা মানসিক ও শারীরিক দিক হইতে এত কর্মঠ যে, তাঁহারা কখনও অলস থাকেন না এবং প্রত্যেক কাজের জন্য সময় পাইয়া থাকেন। তিন বৎসর কাশগড়ের সুলতানের তত্ত্বাবধানে তাসখন্দে থাকিবার সময় ব্যতীত জীবনে তিনি

কখনও অবসর দেখেন নাই। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন, জীবনের শেষভাগে তিনি রমজানের রোজা কখনও এক স্থানে দুইবার রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার চরিত্র মানবধর্মী, এবং নিজস্ব ইতিবৃত্তে তিনি নিজ চরিত্র এমনভাবে অংকিত করেন, যাহার মধ্যে তাঁহার দোষ বা গুণ কিছুই তিনি লুকাইবার চেষ্টা করেন নাই। মোঙ্গল ও তুর্কিদের স্বভাবসিদ্ধ নিষ্ঠুরতা এবং মানব জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসিনতা তিনি বংশানুক্রমে লাভ করেন। কিন্তু তৎসঙ্গে যাহারা তাঁহার সহিত দুর্ব্যবহার করিয়াছে, তাহাদিগকে ক্ষমা করিবার মত মহানুভবতাও তাঁহার ছিল। বাবর একজন দুর্দমনীয় স্পৃহা ও উল্লেখযোগ্য সামরিক দক্ষতার অধিকারী। অপ্রয়োজনীয় হত্যাকাণ্ড ও যথেচ্ছ ধ্বংসসাধনে উল্লসিত নিষ্ঠুর বিজয়ী তিনি ছিলেন না।[১২] তিনি একজন স্নেহশীল পিতা, একজন দয়ালু প্রভু, একজন মহানুভব বন্ধু এবং প্রকৃতি ও সত্যের একজন একান্ত প্রেমিক।

মানুষ হিসাবে বাবর নিষ্ঠুর বিজয়ী তিনি ছিলেন না

সৈনিক হিসাবে বাবর তাঁহার জাতির অধিকাংশের ন্যায় যুদ্ধে নির্ভীক ছিলেন এবং সেনাপতি হিসাবে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ রণকুশলী ছিলেন। তাঁহার সামরিক দক্ষতা এত নিপুণ ছিল যে, শত্রুদের সামান্য ত্রুটিও তিনি ধরিয়া ফেলিতে পারিতেন। এশিয়ায় তিনিই ছিলেন একমাত্র সামরিক পরিচালক, যিনি সর্বপ্রথম গোলন্দাজ বাহিনীর মূল্য বুঝিতে সক্ষম হন। মধ্য এশিয়ার মোঙ্গল ও তুর্কিদের প্রচলিত নিয়মই ছিল তাঁহার সমরকৌশল। কিন্তু তন্মধ্যে তিনি অনেক পরিবর্তন সাধন করেন এবং নিজ গোলন্দাজ বাহিনীকে তিনি এত সুনিয়ন্ত্রিত করেন যে, যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করা খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। কূটনীতিক হিসাবে তিনি আফগানদের সাথে কার্যকলাপে তাঁহার নিজস্ব লোকদের চাইতে অধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন বলিয়া মনে হয়। সুলতান ইব্রাহিম লোদীর বিদ্রোহী আমিরদিগকে তিনি যেভাবে নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত করিয়াছেন, তাহা মেকাইভ্যালী **(Machiavelli)** নীতিরই উপযুক্ত হইয়াছে।

সৈনিক হিসেবে বাবর

বাবর একজন সত্যিকারের কবি ছিলেন। তাঁহার ইতিবৃত্তের ছিটাফোঁটা শ্লোকগুলি ছাড়াও তাঁহার হাতের এমন কিছু তুর্কি গীতিকবিতা পাওয়া গিয়াছে, যেগুলিকে তাঁহার যুগের শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহের সহিত তুলনা করা যায়। ইতিহাসে কোন দিগ্বিজয়ীর পক্ষে একজন প্রসিদ্ধ কবি হইবার দৃষ্টান্ত খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। জুলিয়াস সিজার ও নেপোলিয়ন যদিও বিদ্বান ছিলেন, কিন্তু বাবর তুর্কি ভাষায় এমন এক কবি ছিলেন যে, সৈনিক বা শাসক হিসাবে খ্যাতি না থাকিলেও কবি হিসাবে তিনি সুখ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন। 'মুবাইয়েন' নামে বাবর একটি ধর্মীয় কবিতাও রচনা করেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পূর্বে প্রসিদ্ধ খাজা আহরার কর্তৃক তাঁহার পিতার সম্মানে লিখিত পবিত্র গ্রন্থ 'রিসালাতে ওয়ালিদিয়ার' একটি যথার্থ অনুবাদও তিনি প্রণয়ন করেন। বাবর একজন সত্যিকারের প্রকৃতি ও সত্য প্রেমিক ছিলেন। সঙ্গীত ও অন্যান্য কলায় তিনি দক্ষতা অর্জন করেন।

শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

তাঁহার ইতিবৃত্ত *(Memoirs)* ঃ বাবর একটি আত্মচরিত রাখিয়া যান, যাহা প্রাচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন-চরিত হিসাবে পরিগণিত হয়। ইহার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কোন সন্দেহই নাই। ইহার অন্তর্নিহিত সাক্ষ্যগুলিই ইহার বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে। বিখ্যাত দার্শনিক রুশোর স্বীকৃতির মতই ইহা খাঁটি ও বাস্তব; এবং বাস্তবে উপলব্ধিকারী কোন লোক ভিন্ন এই গ্রন্থের

অন্তর্নিহিত ঘটনাবলি লিখিতে পারে না। নিজেকে সত্য ঘটনা ছাড়া অন্য কিছু দিয়া অংকিত করিতে তিনি চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলি ও সাফল্যের ন্যায় বিস্তৃতভাবেই তিনি তাঁহার বোকামি এবং ব্যর্থতাগুলিও নিষ্ঠুরভাবে বর্ণনা করেন। এই আত্মচরিতে আমরা তৎকালীন ভারতের একটি বিশদ বর্ণনা পাই। একই গ্রন্থে এই ইতিবৃত্তটি একটি ইতিহাস, জীবন চরিত এবং একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য।

১৫৫৩ সালে বাবরের হস্তলিখিত মৌলিক গ্রন্থ হইতে সম্রাট হুমায়ুন এই ইতিবৃত্ত বা 'তুজুক-ই-বাবরী'র অনুবাদ করেন এবং পরবর্তীকালে ১৫৯০ সালে সম্রাট আকবরের সময় আবদুর রহমান খান-ই-খানান ইহাকে ফার্সিতে অনুবাদ করেন। আধুনিক যুগে ইউরোপীয় অনেক ভাষায় এই ইতিবৃত্তটি অনূদিত হইয়াছে।

ধর্মীয় ব্যাপারে বাবর একজন খাঁটি সুন্নী মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সংস্কৃতি-জ্ঞান তাঁহাকে ধর্মীয় গোঁড়ামি হইতে রক্ষা করে। শিয়াদিগকে তিনি "সম্পূর্ণ ধর্মবিরোধী এবং খাঁটি ধর্মের বিরোধী একটি অসৎ ধর্মের অনুসারী" বলিয়া মনে করেন। তাঁহার রাজত্বে হিন্দুদিগকে

তাঁহার ধর্মীয় মতামত

ধারাবাহিক নির্যাতনের কোন নজির পাওয়া যায় না এবং শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি কাহাকেও শাস্তি প্রদান করেন নাই। আল্লাহর উপর তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল এবং তাঁহার প্রত্যেকটি সাফল্যকে তিনি আল্লাহর দয়া বলিয়া মনে করেন এবং আধিপত্যকে তিনি আল্লাহর দান মনে করেন। তুমুল যুদ্ধের সময় তিনি আল্লাহ্র সাহায্যের প্রতি তাকাইয়া থাকিতেন। কারণ, তাঁহার প্রত্যেকটি যুদ্ধই ছিল আল্লাহর রাস্তায়।

পাদটীকা

১। The Muslims of India had grown effete ..... A race of conquerors had become a squabbling crowd, jostling each other for the luxuries of the thrones, but wanting the power to hold a sceptre. —S. Lane Poole: *Babar*.

২। ঐ পৃঃ ১৭

৩। The decisive battle was fought on April 21st, 1526, on the plain at Panipat—the historic site where the throne of India has been thrice won— এস. লেনপুল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬১।

৪। By the grace and mercy of Almighty Allah, this difficult task was made easy to me, and that mighty army, in the space of half a day, was laid in the dust.

৫। But the Mughal conquest of Hindustan was not an accomplished fact as a result of Babar's victory over Ibrahim. It did not give him the vartual sovereignty over the country, because there were other strong powers like the Afghan military chiefs, and the Rajputs under Rana Sangha who also then aspired after political supremacy and

were thus sure to oppose him.—কালী কিংকর দত্তঃ *An Advanced History of India.*

৬। The two men belonged to widely different races—Babar, the Turc—Mongolian of Western Tartary, Sangha, the pure Aryan of the East: but each recognised This rival's greatness.—লেনপুলঃ Babar পৃঃ ১৭৪।

৭। কালী কিংকর দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২৯। The battle of Khanua is certainly one of the decisive battles of Indian history.

৮। Before the battle of Khanua, the occupation of Hindustan might have been looked upon as a mere episode in Babar's career of adventure, but from henceforth it becomes the keynote of his activities for the reminder of his life—Rushbrook Williams: *History of India.*

৯। He (Babar) bequethed to his son a monarchy which could be held together only by the continuance of war conditions, which in times of peace was weak, stutruc reless invertebrate. —W. Rushbrok Williams: *History of India.*

১০। Babar is one of the most romantic and interesting personalities in the history of Asia— কালী কিংকর দত্ত, প্রাগুক্ত

১১। Babar is the link between Central Asia and India, between predatory hordes and imperial goverment, between Tamrlane and Akbar.—এস. লেনপুলঃ *Babar.*

১২। A man of indomitable spirit and remarkable military prowess, he was no ruthless conqueror exulting in needless massacres and wanton destruction

গ্রন্থপঞ্জি

Beveridge	:	*Memoirs of Babar.* (Tuzuk-i-Babari)
Rushbrook Williams	:	*An Empire Builder of the Sixteenth Century.*
S. Lane Poole	:	*Babar*
Edwardes and Garrett	:	*Mughal Rule in India.*
Haig	:	*Cambridge History of India vol-iv*
Ishwari Prasad	:	*A Short History of Muslim Rule in India.*
Datta Raychowdhury and Majumder	:	*An Advaneed History of India.*
Erskin	:	*History of India under Babar and Humayun Vol-I-II*

দ্বিতীয় অধ্যায়

হুমায়ুন

(১৫৩০-১৫৪০)—(১৫৫৫-১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে)

প্রাথমিক গোলযোগ ঃ সম্রাট বাবরের মৃত্যুর পর নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ুন ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর ভারতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের সময় রাজত্বের অবস্থা ছিল দুর্যোগপূর্ণ। বাবর দৃঢ়ভিত্তিক ও পূর্ণ কার্যপদ্ধতিমূলক কোন রাষ্ট্র রাখিয়া যান নাই। সত্যিকারভাবে তিনি সামরিক বাহিনীগুলিকে পরাজিত করিয়াছিলেন, রাজত্বকারী বংশগুলির শক্তি ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের জনসাধারণের উপর একমাত্র অধিকার, যাহা তিনি বা তাঁহার বংশের ছিল, তাহা হইল সামরিক শক্তি।[১] রাজপুতদিগকে পরাজিত করা হইয়াছিল সাময়িকভাবে মাত্র। আফগানদিগকে পরাজিত করা হইলেও তাহাদিগকে ধ্বংস করা ছিল সুদূরপরাহত। বিদ্রোহের জন্য সুপরিপক্ব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আফগান অভিজাতবর্গ নিজেদেরকে একত্রিত করিবার জন্য একজন শক্ত ও সুযোগ্য নেতার খোঁজে ছিলেন এবং এই সুযোগ্য গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তাঁহারা লাভ করেন শেরখানের মধ্যে। বাহাদুর শাহের অধীনে গুজরাটের ক্রমবর্ধমান শক্তিও ছিল হুমায়ুনের পক্ষে মারাত্মক।

এইসব বিপত্তি ছাড়াও হুমায়ুন তাঁহার চতুর্দিকে ছদ্মবেশী মারাত্মক শত্রুভাবাপন্ন দলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়েন। রাজকীয় পরিবারে ছিল একতার অভাব এবং তাঁহার চাচাত ভাই মুহাম্মদ জামান ও মুহাম্মদ সুলতান ছিলেন সিংহাসনের দাবিদার। অধিকন্তু, জেষ্ঠ্যাধিকারের আইন মুসলমানদের মধ্যে স্বীকৃত নহে। জ্যেষ্ঠপুত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠপুত্রই পিতার ক্ষমতার উত্তরাধিকারী। সুতরাং হুমায়ুনের ভ্রাতা কামরান, হিন্দাল এবং আসকারীও সিংহাসনের দাবিদার ছিলেন। অসিই ছিল প্রধান অধিকার মীমাংসাকারী এবং প্রত্যেক পুত্রই তাঁহার ভাইদের বিরুদ্ধে নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিলেন।[২]

এই অবস্থার জন্য উচ্চ সামরিক কৌশল, কূটনৈতিক জ্ঞান ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবিশিষ্ট একজন লোকের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। কিন্তু হুমায়ুনের এই সমস্ত কোন গুণই ছিল না। খুব সম্ভবত তাঁহার পিতার মৃত্যুকালীন নির্দেশ অনুসারে হুমায়ুন তাঁহার ভাইদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করেন এবং ইহাই ছিল তাঁহার প্রথম ভুল। কাবুল ও কান্দাহার পাকাপাকিভাবে কামরানকে দেওয়া হয় এবং পরে সমস্ত পাঞ্জাব তাঁহার কর্তৃত্বাধীন চলিয়া যায়। 'হিসারে ফিরুজার কর্তৃত্ব পাইবার সঙ্গে সঙ্গে কামরান দিল্লী হইতে কান্দাহারগামী নূতন সামরিক সড়কটির অধিকারী হন। আসকারীকে সাম্ভালের জায়গীর দেওয়া হয় এবং হিন্দালকে আলওয়ার প্রদান করা হয়। এইভাবে সম্রাট হুমায়ুন বাবরের সাম্রাজ্যের ঐক্যমূলে আঘাত হানেন।

ভ্রাতাদের প্রতি হুমায়ুনের সহানুভূতি

যাহা হউক প্রাথমিক যুদ্ধগুলিতে হুমায়ুন ভাগ্যবান ছিলেন। বান্দেলখণ্ডের কালিঞ্জর দুর্গের বিরুদ্ধে তিনি একটি অভিযান পরিচালনা করেন। কারণ, ইহার রাজা আফগানদের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের আফগান ভীতি তাঁহাকে বিপদের সংকেত দান করে। সুতরাং ক্ষতিপূরণ হিসাবে কিছু অর্থ লইয়া তিনি কালিঞ্জর পরিত্যাগ করেন। দাওরাহ্ নামক স্থানে আফগানদের উপর চূড়ান্ত বিজয় লাভ করিয়া তিনি সুলতান মুহাম্মদ লোদীকে জৌনপুর হইতে বাহির করিয়া দেন। তারপর তিনি আফগান নেতা শেরখান অধিকৃত চুনার দুর্গ অবরোধ করেন। হঠাৎ তিনি সম্পূর্ণ অস্থায়ী বশ্যতার উপর ইহা পরিত্যাগ করেন। কারণ, ইতোমধ্যে গুজরাটের বাহাদুর শাহ্ ভীষণ গোলমাল আরম্ভ করিয়া দেন।

তাঁহার প্রাথমিক যুদ্ধসমূহ

কখনও কখনও রাজপুতদের সাহায্যে আবার কখনও কখনও বাহিরের কোন সাহায্য ছাড়াই বাহাদুর শাহ্ ক্রমশ প্রায় সম্পূর্ণ গুজরাট ও মালবের অধিপতি হইয়া দাঁড়ান। হুমায়ুনের চাচাত ভাই মুহাম্মদ জামান বাহাদুর শাহের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মুহাম্মদ জামানকে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের ফলেই হুমায়ুন ও বাহাদুর শাহের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। হুমায়ুনের পূর্বাঞ্চলে অবস্থানের সুযোগে বাহাদুর শাহ্ মেবার-এর রাজধানী চিতোর অবরোধ করেন। রাজস্থান গ্রন্থের রচয়িতা জেমস টড বর্ণনা করেন যে, মেবারের রাণী কর্ণবতী হুমায়ুনের নিকট একটি রাখী প্রেরণ করেন। ভারতীয় ইতিহাসে দেখা যায়, রাখীপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রেরক ভাই ও রক্ষাকারী উপাধি দিয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা বুঝা যায়। হুমায়ুন রাণী কর্ণবতীর সাহায্যের জন্য প্রতিজ্ঞা করেন এবং তাঁহার পূর্বাঞ্চলের বিজয়গুলি ছাড়িয়া দিয়া গুজরাটের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু ইহা ছিল অনেক বিলম্বে। কারণ, ইতোমধ্যে রাণী আগুনে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন।

গুজরাটে হুমায়ুন

হুমায়ুনের নিষ্ঠা সময়ের জন্য রানী কর্ণবতীর আবেদন

হুমায়ুন বাহাদুর শাহ্‌কে পরাজিত করিয়া চিতোর হইতে বহিষ্কার করেন। বাহাদুর শাহ্ চাম্পানীরে পলায়ন করেন এবং সেইখান হইতে ক্যাম্বে যান। কিন্তু হুমায়ুন তাঁহাকে অনুসরণ করেন এবং বাধ্য হইয়া বাহাদুর শাহ্ পর্তুগীজ উপনিবেশ দিউতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হুমায়ুন অতঃপর চাম্পানীর ও গুজরাটের রাজধানী আহমদাবাদ এবং মালব অধিকার করেন। কিন্তু এই কৃতকার্যতার পরবর্তী সময় হুমায়ুন ভারিভোজন ও আমোদ আহ্লাদের মধ্যে অতিবাহিত করেন। তাঁহার ভ্রাতা আসকারী অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন, এবং আগ্রার নিকটবর্তী প্রদেশসমূহ বিদ্রোহ করে। বাহাদুর শাহ্ এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া মুঘল সৈন্যদিগকে গুজরাটের বাহিরে বিতাড়িত করেন। আসকারীর অসৎ উদ্দেশ্যের ফলে মালব অধিকারে রাখা হুমায়ুনের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত আগ্রার নিকটবর্তী বিদ্রোহসমূহ এবং পূর্বাঞ্চলে শের খানের সফলতার জন্য হুমায়ুন বাধ্য হইয়া গুজরাট ও মালবের বিজয়সমূহ ত্যাগ করেন। শীঘ্রই হুমায়ুন আগ্রা পৌঁছেন। এইভাবেই প্রথম বৎসরেই দুইটি বড় বড় প্রদেশ অতি দ্রুত বিজিত হয় এবং দ্বিতীয় বৎসর ঐগুলি তাড়াতাড়ি হস্তচ্যুত হয়।

হুমায়ুনের অযথা কালক্ষেপন

বাহাদুর শাহ্ কর্তৃক গুজরাট পুনর্দখল

শের খানের সঙ্গে হুমায়ুনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঃ আগ্রার নিকটবর্তী গোলযোগ দমন করিয়া হুমায়ুন কিছুদিন আরাম আয়েসে দিন অতিবাহিত করেন, এবং তারপর তিনি পূর্বাঞ্চলে

আফগান ভীতির ভয়াবহতা উপলবিদ্ধ করিতে সক্ষম হন। পূর্বদিকে তিনি যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং শীঘ্রই চুনার দুর্গ অবরোধ করেন। এই ছয় মাসের মধ্যে ১৫৩৮ সালের এপ্রিল মাসে গৌড় অধিকার করিবার জন্য শের খান যথেষ্ট সুযোগ লাভ করেন। শেরখান ইতোমধ্যে রোহটাস দুর্গও অধিকার করেন। অতঃপর হুমায়ুন রাজমহল হইয়া বাংলার দিকে অগ্রসর হন এবং জুলাই মাসে গৌড় অধিকার করেন। ইহা ছিল বর্ষাকালের মাঝামাঝি সময়। শের খান সুকৌশলে হুমায়ুনের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ এড়াইয়া যান। মুঘল সেনাবাহিনীর কিছু অংশ আগ্রায় ফিরিয়া যায় এবং অবশিষ্ট অংশ সম্রাটের সঙ্গে গৌড়ে তিন মাস অতিবাহিত করে। সম্রাট আমোদ আহ্লাদের মধ্যে তিন মাস অতিবাহিত করেন।

শের খানের গৌড় অধিকার

হুমায়ুন অলসতার মধ্যে কালাতিপাত করিলেও শের খান তাহা করেন নাই। তিনি বেনারস অবরোধ ও অধিকার করিয়া চুনার ও জৌনপুর হস্তগত করেন, এবং কনৌজ পর্যন্ত তাঁহার লুণ্ঠনকাজ পরিচালনা করেন। পশ্চিমের সমস্ত খবরাখবর হইতে হুমায়ুন বিচ্যুত হইয়া থাকেন। ইতোমধ্যে তাঁহার ভ্রাতা হিন্দাল আগ্রায় নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। শের খানের কার্যাবলির খবর পাইয়া হুমায়ুন বিব্রত হইয়া পড়েন। অতিকষ্টে তিনি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন এবং শেষ পর্যন্ত বক্সারের নিকটবর্তী চৌসারে শের খান কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। আফগান ও মুঘলদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আরম্ভ হয়। মুঘল সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য; অধিকন্তু আফগানদের বেশিরভাগই তাহাদের নিজস্ব ভূমিতে লড়াই করে, এবং অনেক অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজেদের জন্য অতি সহজে খাদ্যদ্রব্য অন্বেষণ করিতে সক্ষম হয়। অপরদিকে মুঘলরা ছিল অধিকাংশই বিদেশী এবং ফলে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহে ছিল অক্ষম। মুঘল শিবিরের দুঃখ-দুর্দশা চরমে পৌঁছে এবং শেষ পর্যন্ত তাহারা ১৫৩৯ সালের জুন মাসে এক শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। তৈজসপত্র ও অর্থসম্পদ সবকিছু শের খানের হস্তগত হয়। হুমায়ুন স্বয়ং যৎকিঞ্চিৎ আঘাত প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার অনুসারীদের দ্বারা পলায়ন করিতে বাধ্য হন। নদীতে পতিত হইয়া তিনি তাঁহার ঘোড়া হারাইয়া ফেলেন এবং নিজাম নামে এক ভিস্তিওয়ালা তাঁহাকে উদ্ধার করে। অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়া তিনি আগ্রায় পলাইয়া আসেন এবং কামরান ও হিন্দাল উভয় কর্তৃক সম্রাট বলিয়া স্বীকৃত হন।

চৌসারের যুদ্ধ

পর বৎসর ভাইদের সহযোগিতা ছাড়াই হুমায়ুন তাঁহার ভাগ্য পরীক্ষা করেন। একদিকে ছিল পরাজয়ে হতভম্ব মুঘল ভাড়াটিয়া সৈন্যবাহিনী, যাহাদের পরিচালকের উপর ছিল না কোন আস্থা এবং আলস্যের দ্বারা ছিল দুর্বল, অপরদিকে ছিল আফগানদের সংগ্রহ করা সৈন্যবাহিনী, যাহারা তাহাদের নিজস্ব দেশ হইতে আগত লোকবল দ্বারা ছিল উৎসাহিত। বিজয়োল্লাসে তাহাদের বিশ্বাসী পরিচালক দ্বারা তাহারা ছিল পরিচালিত। ১৫৪০ সালের মে মাসে কনৌজের নিকটবর্তী স্থানে চূড়ান্ত সংগ্রাম আরম্ভ হয়। বিলগ্রামের যুদ্ধ বা সাধারণ্যে পরিচিত কনৌজের যুদ্ধে মুঘল বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। হুমায়ুন কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হন। এইভাবেই হিন্দুস্থানের সিংহাসন মুঘলদের হাত হইতে আফগানদের নিকট হস্তান্তরিত হয়। শের খান অতঃপর শের শাহ্ উপাধি ধারণ করেন।

কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধ

হুমায়ুনের পলায়ন ঃ ১৫৪০ সালে কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হুমায়ুন আগ্রা পৌছেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে লইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু দিল্লী নগরীকে তিনি দুরধিগম্য অবস্থায় পান এবং অতঃপর তিনি সিরহিন্দের দিকে যাত্রা করেন। ভ্রাতাকে সাহায্য দিবার পরিবর্তে কামরান ভীষণ গোলযোগ ও অশান্তির কারণ ইহয়া দাঁড়ান। অগত্যা সিন্ধুর দিকে অগ্রসর হইয়া হুমায়ুন ভাক্কার অবরোধ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এইখানেও তাঁহাকে অনুসরণ করে। অতঃপর তিনি যোধপুরের রাজা মালদেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং রাজা তাঁহাকে ২০ হাজার রাজপুত সেনা দিয়া সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। কিন্তু শীঘ্রই মালদেবের মধ্যে হুয়ায়ুন বিশ্বাঘাতকতার গন্ধ পান এবং তাই তিনি অমরকোটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অমরকোটের রানা প্রসাদ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং ভাক্কার ও থাট্টা বিজয়ে সম্রাটকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দান করেন। এখানেই এক মরুভূমির দুর্গে ১৫৪২ সালের ২৩শে নভেম্বর শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাট আকবর জন্মগ্রহণ করেন। অনতিকাল পরেই রাজপুত সৈন্য লইয়া হুমায়ুন ভাক্কার অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু শীঘ্রই মুঘল সেনাবাহিনী ও রানার মধ্যে এক বিবাদের ফলে রাজপুত সৈন্যগণ দলত্যাগ করে। যাহা হউক, ভাক্কারের শাসনকর্তা হুমায়ুনের সঙ্গে একটি সন্ধি করেন এবং অতঃপর হুমায়ুন কান্দাহারের দিকে যাত্রা করেন। ইতোমধ্যে কামরান সমগ্র আফগান এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করেন এবং আসকারী ও হিন্দাল তাঁহার ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকেন। এইসব অবিশ্বাস্য লোকের মধ্যে হুমায়ুন কোন সাহায্যের আশ্বাস পাইলেন না এবং তাই তাঁহার পুত্র আকবরকে কান্দাহারে রাখিয়া তিনি শাহ্ তামাশ্প-এর সাহায্যের আশায় পারস্যে চলিয়া যান।

যোধপুরে অমরকোটে আকারের জন্য পারস্যে

হুমায়ুনের ব্যর্থতার কারণ ঃ হুমায়ুনের ব্যর্থতা সম্পর্কে একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন—"জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি প্রদত্ত বাবর-এর উত্তরাধিকার ছিল অনিশ্চিত স্বভাবের, কিন্তু হুমায়ুন নিজেকে তাঁহার নিকৃষ্টতম শত্রু বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন।"[৩]

(১) শের খানের সঙ্গে হুমায়ুনের ব্যর্থতার জন্য স্থানীয় আমির ও রাজাগণের অবাধ্যতা অন্যতম একটি কারণ। বাবর কোন দৃঢ়ভিত্তিক বা সুসংগঠিত সাম্রাজ্য রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে, তিনি সামরিক বাহিনীগুলিকে পরাজিত করেন, রাজত্বকারী বংশগুলির শক্তি ধ্বংস করেন, কিন্তু ভারতের জনসাধারণের উপর একমাত্র অধিকার যাহা তিনি বা তাঁহার বংশের ছিল, তাহা হইল সামরিক শক্তি। রাজপুত বা আফগান কাহাকেও সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয় নাই। সুতরাং এইসব দিকে হুমায়ুনকে বিশেষভাবে নজর দিতে হয়।

(১) আমির ও রাজাদের অবাধ্যতা
(২) তাহার ভ্রাতাদের গোলমাল
(৩) হুমায়ুনের ব্যক্তিগত চরিত্র

(২) হুমায়ুনের পথে তাঁহার ভ্রাতাগণ সর্বদাই অন্তরায় হইয়া দাঁড়ান। সম্রাট রাজধানী ত্যাগ করিলেই তাঁহার ভ্রাতাগণ বিদ্রোহ করিয়া দাঁড়ান। তিনি তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের উপরেও আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহারাও সিংহাসনের প্রত্যাশী ছিলেন। অধিকন্তু তাঁহার ভ্রাতাদের মধ্যে সাম্রাজ্য বন্টনের ফলে ইহার ভিত্তিমূলে আঘাত করা হয়।

(৩) হুমায়ুনের স্বভাব-চরিত্রও তাঁহার ব্যর্থতা আনয়ন করে। সুরুচিসম্পন্ন ও সংস্কৃতি প্রেমিকের গুণে গুণান্বিত হইলেও তাঁহার মধ্যে পিতার জ্ঞান ও সতর্কতার ন্যায় কঠোর

সংকল্পের অভাব ছিল। ঐতিহাসিক স্যার লেন পুল যথার্থই মন্তব্য করেন ঃ তিনি সুষম প্রচেষ্টায় অপারগ ছিলেন এবং একটি জয়ের পরমূহূর্তেই নিজেকে তিনি অন্তঃপুরে ব্যস্ত রাখেন এবং তাঁহার শক্ররা যখন সিংহদ্বারে গর্জন করিতেছে তখনকার মুল্যবান সময়গুলি তিনি আফিমখোরের স্বর্গে বৃথা নষ্ট করেন। স্বভাবসুলভ দয়ালু বলিয়া যখন শাস্তি প্রদান করা প্রয়োজন, তখন তিনি ক্ষমাপ্রদর্শন করেন। কোমল হৃদয় ও সঙ্গপ্রিয় বলিয়া যখন তাঁহার ঘোড়ার জিনের উপর থাকিবার কথা, তখন তাঁহাকে টেবিলের পাশে দেখা যায়।[৪] তাঁহার চরিত্র আকৃষ্ট করে কিন্তু কখনও কর্তৃত্ব করে না। সমগ্র জীবনে স্বভাবসিদ্ধভাবেই ভবিষ্যতের কথা তিনি চিন্তা করিতে পারিতেন না। আফিম এর প্রতি নিদারুণ ঝোঁক থাকিবার ফলেই বোধ হয় তাঁহার পরিণামদর্শিতার অভাব ছিল। যোদ্ধা হিসাবে তিনি ছিলেন দুঃসাহসিক; কিন্তু সেনাপতি হিসাবে তাঁহাকে অচল বলিয়াই মনে হয়।

(৪) অপরদিকে শের শাহ্ অতি ধূর্ত ও সাহসিক কৌশলে সর্বদা কাজ করেন। তাঁহার অধীনস্থ আফগানরা ছিল সাহসী, বিজয়োল্লাসে মত্ত এবং এমন একজন সেনানায়ক কর্তৃক পরিচালিত, যাহার উপর তাহাদের ছিল প্রগাঢ় আস্থা। তৎকালীন মুঘলরা ছিল একদল ভাড়াটিয়া সৈন্য, পরাজয়ে ভগ্নোদ্যম এবং এমন একজন সেনানায়ক দ্বারা পরিচালিত, যাহার উপর তাহাদের সুস্থির কোন আস্থা ছিল না।

মুঘলদের সমুত্থান ঃ

পারস্যের সম্রাট শাহ্ তামাশ্প হুমায়ুনকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং হুমায়ুনকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত শাসনকর্তাকে নির্দেশ দান করেন। পারস্যের শাহ্ হুমায়ুনের দুর্ভাগ্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে শিয়া সম্প্রদায়ে মতান্তর করিতে চেষ্টা করেন। হুমায়ুন দৃঢ়ভাবে ইহার বিরোধিতা করেন। কিন্তু পলায়নের উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার পরামর্শদাতাগণ তাঁহাকে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে উপদেশ দেন। অতঃপর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাহার ফলে বোখারা, কাবুল ও কান্দাহার জয় করিবার জন্য হুমায়ুনকে একটি পারস্য সেনাবাহিনী দিতে শাহ্ সম্মত হন। চুক্তিতে ইহাও লিপিবদ্ধ হয় যে, কান্দাহার জয়ের পর ইহা পুনরায় শাহের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, হুমায়ুন নিজেকে একজন শিয়া বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং খুৎবায় শাহের নাম পাঠ করা হইবে। গভীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও হুমায়ুন এই চুক্তি মানিয়া লন। অতঃপর ১৪ হাজার সৈন্য লইয়া হুমায়ুন কান্দাহার অভিমুখে যাত্রা করেন।

১৫৪৫ খিস্টাব্দে হুমায়ুন কান্দাহার অধিকার করেন এবং কামরানকে পরাজিত করিয়া তিনি কাবুল অধিকার করেন। কামরান কাবুল পুনর্দখল করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। সেই যুদ্ধে হিন্দাল নিহত হন। তাঁহার পিতার মৃত্যুকালীন উপদেশানুসারে হুমায়ুন কামরানকে হত্যা করিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে অন্ধ করিয়া মক্কায় পাঠাইয়া দেন। অতঃপর আসকারীকে বন্দি করা হয়। তাঁহাকেও অনুরূপভাবে অন্ধ করিয়া মক্কায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ভ্রাতাদের হাত হইতে মুক্ত হইয়া হুমায়ুন ভারত পুনর্বিজয়ের জন্য প্রস্তুতি লইতে আরম্ভ করেন।

তাঁহার ভ্রাতাদের দমন

১৫৪৫ খিস্টাব্দে শের শাহের মৃত্যু আফগানদের জন্য ছিল অপূরণীয় ক্ষতি।

উত্তরাধিকারিগণ অতি দ্রুত আসেন এবং যান। সমগ্র সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খলায় পতিত হয়। হুমায়ুন সর্বদা আফগান সাম্রাজ্যের গোলযোগ লক্ষ্য করেন। ১৫৫৪ সালের নভেম্বর মাসে তিনি ভারতের দিকে যাত্রা করেন এবং ১৫৫৫ সালে লাহোর দখল করেন। সিরহিন্দে হুমায়ুন ও শেষ আফগান শাসক সিকান্দর সূরের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে আফগান নেতা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। জুন মাসে হুমায়ুন দিল্লীতে পুনঃপ্রবেশ করেন। কিন্তু এই বিজয়ের ফল ভোগ করিবার জন্য হুমায়ুন বেশিদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারেন নাই। একদিন দিল্লীর দ্বীনপানাহ দুর্গের গ্রন্থাগারের উপর হইতে অবতরণ করিবার সময় আজানের শব্দ শুনিয়া তিনি মাথা নিচু করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে পদস্খলন হইয়া তিনি নিচে পতিত হন। অপ্রস্তুত পতনে তিনি ভীষণ আঘাত পান। ডাক্তারদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তিনি ১৫৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে পরলোকগমন করেন।

হিসিরখন্দের যুদ্ধ মৃত্যু ১৫৫৬ খৃঃ

সম্রাট হুমায়ুনের কৃতিত্ব পর্যালোচনা ঃ প্রকৃতিগতভাবে হুমায়ুন একজন দয়ালু, মহানুভব ও সদালাপী সম্রাট ছিলেন। কেহই, এমনকি তাঁহার শত্রুরাও তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলিতে পারে না। ভ্রাতাদের সঙ্গে ব্যবহারই তাঁহার পরম সহনশীলতার সাক্ষ্য বহন করে। তাঁহার ভাই ও প্রধান শত্রু মীর্জা কামরানকে হত্যা করিবার জন্য অভিজাতবর্গ তাঁহাকে পরামর্শ দান করিলে তিনি জবাব দেন—"যদিও আমার মস্তক আপনাদের কথায় সায় দেয়, কিন্তু আমার অন্তর তাহা দেয় না।[৫] এবং এই বলিয়া তিনি ভাইকে হত্যা করিতে অস্বীকার করেন। এমনকি কামরানের ঔদ্ধত্যের চরম অবস্থাতেও হুমায়ুন তাঁহাকে হত্যা করেন নাই।

তাঁহার স্বভাব

যুদ্ধক্ষেত্রে হুমায়ুন খুবই সাহসী ছিলেন এবং যোদ্ধা হিসাবে যে কোন দুঃসাহসিক কাজ তিনি করিতে পারিতেন। কিন্তু যে দুর্জেয় শক্তি ও ইচ্ছার দ্বারা তাঁহার পিতা তিনবার সমরকন্দ অধিকার করিতে চেষ্টা করেন, সেই গুণ তাঁহার ছিল না। তিনি এমন সন্দেহশূন্য ছিলেন যে, বার বার প্রতারিত হইবার পরও উহা হইতে তিনি পরিণামদর্শিতা অর্জন করিতে পারেন নাই। তিনি জাঁকজমক ও নিষ্ফল অনুষ্ঠানাদি বেশি পছন্দ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সাতটি স্বর্গীয় বস্তুর নামে তিনি সাতটি হলঘর উৎসর্গ করেন। সপ্তাহে একদিন তিনি এক-একটি হলঘরে দরবার করেন এবং নিজে ও সভাসদবর্গ সেই ঘরের দেওয়ালের বর্ণ অনুযায়ী কাপড় পরিধান করিয়া আসেন। সাতটি ঘরেরই সাতটি রংবিশিষ্ট দেয়াল ছিল।

তাঁহার জীবনের মন্দ দিকগুলি

পিতার ন্যায় হুমায়ুনও কবিতা ভালবাসিতেন এবং নিজেও একজন কবি ছিলেন। শিল্প ও সাহিত্যের তিনি একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্র বিশেষ পছন্দ করিতেন এবং তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুর ফলে তিনি দিল্লীতে একটি মানমন্দির স্থাপন করিতে পারেন নাই। সম্রাট হুমায়ুন একজন ক্ষমতা প্রদর্শনকারী প্রভু, অকৃত্রিম বন্ধু ও একজন অমায়িক লোক ছিলেন। তাঁহার প্রতি কেউ কোন উপকার করিলে উহার প্রতিদান দিতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন।

শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

পাদটীকা

১। In fact, he had defeated the armies and broken the power of reigning dynasty, but the only hold which he, or his race, yet had upon the people of India was military force কে. কে. দত্ত, প্রাগুক্ত।

২। The sword was the grand arbiter of right, and every son was prepared to try his fortune against his brothers,—Erskine: *History of India under Babar and Humyun* vol I, II

৩। Babar's legacy towards his eldest son was of a precarious nature, but Humayun himself proved to be his worst enemy.

৪। He was incapable of sustained effort, and after a moment of triumph would busy himself in his harem and dream away the precious hours in the opium eater' paradise whilst his enemies were thundering at gate. Naturally kind, he forgave when he should have punished, light hearted and sociable, he reveailed at the table when he ought to have been in the saddle."—S. Lane Poole: *Babar.*

৫। Though my head inclines to your word, my heart does not.

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

Beveridge : *Humayan Namah of Gulbadan Begum*

S. Lane Poole : *Medieval India*

Haig & Burn : *Cambridge History of India. vol-iv*

Tripathi : *Rise and Fall of the Mughal Empire*

Ishwari Prasad : *The Life and Times of Humayun.*

তৃতীয় অধ্যায়
শের শাহ্
(১৫৪০-১৫৪৫ খ্রিঃ)

প্রাথমিক জীবন ঃ পানিপথ-এর যুদ্ধে সম্রাট বাবর আফগানদিগকে পরাজিত করেন এবং ইব্রাহিম লোদীকে হত্যা করেন। কিন্তু আফগান শক্তির নির্মূল সাধন তখনও ছিল সুদূর পরাহত। নিজদিগকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য তাহারা একজন নেতার সন্ধানে থাকে এবং আফগান পুনর্জাগরণের নায়ক শের খান সূর-এর মধ্যে তাহারা সেই নেতার সন্ধান লাভ করে।

পরিচিতি ঃ শের শাহ্-এর প্রকৃত নাম ফরিদ। তাঁহার পিতামহ ইব্রাহিম একজন সূর বংশীয় আফগান ছিলেন। প্রয়োজনের সময় সাহায্য করেন বলিয়া রোহ্ অঞ্চলের আফগানদের প্রতি বাহ্লোল লোদীর বেশ পক্ষপাতিত্ব ছিল। সুতরাং সুলতান বাহ্লোল লোদী ইব্রাহীম সূরকে বিহারের অন্তর্গত সাসারাম-এর জায়গীর প্রদান করেন। ফরিদ ইব্রাহিম সূর-এর পুত্র হাসান সূর-এর পুত্র। বিমাতার প্ররোচনার ফলে ফরিদ তাঁহার পিতার কুদৃষ্টিতে পতিত হন। ফরিদ গৃহত্যাগ করিয়া জৌনপুর চলিয়া যান এবং আরবি ও ফার্সি ভাষায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ইহাতে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। কিছুদিন পর শাসনকর্তা জালাল খান-এর চাপে পড়িয়া হাসান সূর ফরিদকে সাসারাম-এর জায়গীর প্রদান করেন। ফরিদ এই জায়গীরের শাসনকার্য এত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন যে, চাষীরা তাঁহার গুণগান ছাড়া আর কিছুই করিত না। ইহা আবার তাঁহার বিমাতার মনে হিংসার উদ্রেক করে এবং তিনি হাসান সূরকে পুত্রের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর ফরিদ স্বেচ্ছায় সেইখান হইতে সরিয়া আসেন এবং বিহারের শাসনকর্তা দরিয়া খান লোহানীর পুত্র বিহার খান-এর অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন।

বিমাতার দুর্ব্যবহার

একদা বিহার খান-এর সঙ্গে শিকারে গিয়া ফরিদ একাকী একটি ব্যাঘ্র বধ করেন। বিহার খান তাঁহার উপর খুব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'শের খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিলে ফরিদ তাঁহার চাকুরি ছাড়িয়া দেন। অতঃপর তিনি বাবর-এর অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। বাবর-এর পূর্বাঞ্চলীয় অভিযানসমূহের সাফল্যে শের খান বিশেষভাবে সাহায্য করেন। তাঁহার কার্যাবলির প্রশংসাস্বরূপ বাবর তাঁহাকে তাঁহার পিতা হাসান সূর-এর সাসারাম-এর জায়গীর প্রদান করেন। পিতার মৃত্যুর পর বিহার খান-এর পুত্র জালাল খানকে বিহারের শাসনকর্তার পদে পুনরায় বহাল করা হয় এবং শের খানকে

শের খান উপাধি লাভ
বাবরের অধীনে চাকুরি গ্রহণ

তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। কারণ, জালাল খান একজন অল্প বয়স্ক বালক ছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই জালাল খান তত্ত্বাবধায়কের হাত হইতে মুক্তি পাইতে চান এবং বাংলার সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু শের খান উভয়কে পরাজিত করিয়া বিহারের অধিনায়ক হইয়া বসেন।

শের খান অতঃপর বাংলার দিকে হস্ত প্রসারিত করেন। বাংলার সৈন্যদের অগ্রগামী দলকে তিনি অকেজো করিয়া দিয়া ১৫৩৬ সালে গৌড়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন। বাংলার সুলতান আহমদ শাহ্ অনেক টাকা-পয়সা দিয়া তাঁহার সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি করেন। পরবর্তী বৎসর শের খান পুনরায় বাংলা আক্রমণ করিয়া অতি সহজেই ইহা অধিকার করেন। সম্রাট হুমায়ুন তখন গুজরাটে ছিলেন। তাঁহার চিরাচরিত নিয়মে মন্থরগতিতে তিনি আগ্রা পৌঁছেন এবং অনেক পরে তিনি পূর্বাঞ্চলের বিপজ্জনক অবস্থার কথা হৃদয়ঙ্গম করেন। কিন্তু গৌড়ে অগ্রসর হইবার পরিবর্তে তিনি চুনার দুর্গ অবরোধ করেন। চুনার-এ শের খান-এর দুর্গরক্ষী বাহিনী হুমায়ুনকে ছয় মাস ঠেকাইয়া রাখে এবং অপরদিকে শের খান গৌড় অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করেন। পরে হুমায়ুন গৌড়ের দিকে অগ্রসর হইলে শের খান অতি সতর্কতার সাথে সমস্ত সংঘর্ষ এড়াইয়া যান। হুমায়ুন যখন গৌড়ে আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত, শের খান তখন বিহার, জৌনপুর ও কনৌজ পর্যন্ত তাহার লুণ্ঠন কার্য চালাইয়া যান।

বাংলার দিকে অগ্রসর

হুমায়ুন নিজের নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু পথিমধ্যে চৌসার নামক স্থানে তিনি শের খান কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। শের খান হুমায়ুনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। পরবর্তী বৎসর ১৫৪০ সালে হুমায়ুন পুনরায় কনৌজ বা বিলগ্রাম-এর যুদ্ধে শের খান কর্তৃক পরাজিত হন এবং তাহার সাম্রাজ্য হারাইয়া পারস্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১] শের খান-এর মৃত্যুর পর ১৫৪৫ সালে তিনি পুনরায় ভারত অধিকার করেন।

শের শাহ্-এর বিজয় ঃ চৌসার-এর যুদ্ধে সাফল্য লাভের পর শের খান 'শের শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি আগ্রা, দিল্লী ও লাহোর-এর সম্রাট হইয়া যান। হুমায়ুন-এর অধীনে মুঘলরা লাহোর ত্যাগ করিলে শের শাহ্-এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তাঁহারা যেন নিরাপদে ভারত ত্যাগ করিতে পারেন। তাই তিনি হুমায়ুনকে হত্যা করিতে চেষ্টা করেন নাই। লাহোরের সম্মুখে শের শাহ দস্যু বংশ গাক্কারদের সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া যান। গাক্কারদিগকে প্রতিহত করিবার জন্য তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। কিন্তু শীঘ্রই বাংলার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে, যেখানে ১৫৪১ সালে বাংলা বিদ্রোহ করে। অতি দ্রুত বিদ্রোহ দমন করিয়া তিনি তাঁহার নিযুক্ত কিছু সংখ্যক শাসনকর্তার অধীনে বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করিয়া দেন। পরে তিনি গোয়ালিয়র, মালব, সিন্ধু ও বাইসিন জয় করেন। অতঃপর যোধপুর-এর মালদেবকে পরাজিত করিয়া তিনি মাড়ওয়ার অধিকার করেন। শীঘ্রই তিনি চিতোর দুর্গ অধিকার করেন। এইভাবে শের শাহ সমগ্র রাজপুতানায় স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন।

আগ্রা, দিল্লী, লাহোরের অধিকর্তা
গাক্কারদের সহিত সংঘর্ষ
বাংলার বিদ্রোহ
রাজপুতদের আধিপত্য

সর্বশেষ অভিযান তিনি পরিচালনা করেন কালিঞ্জর-এর রাজার বিরুদ্ধে। জয় প্রাপ্তির

পূর্ব মুহূর্তে বারুদ বিস্ফোরণের ফলে শের শাহ্ গুরুতর আহত হন। কালিঞ্জর দুর্গ অধিকার করা হয়; কিন্তু বিস্ফোরণের আঘাতের ফলে ১৫৪৫ সালের ২২শে মে শের শাহ্ প্রাণ ত্যাগ করেন।

তাঁহার মৃত্যু (১৫৪৫)

শের শাহ্ কর্তৃক শাসনব্যবস্থার সংস্কার ঃ বিজয়ী শের শাহ হইতে শাসক শের শাহ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। অতি সঙ্কীর্ণ পাঁচ বৎসরের শাসনকালে তিনি দেশের শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। তাঁহার কতকগুলি ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত সমগ্র উপমহাদেশে চালু রহিয়াছে। প্রাচীন ও আধুনিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে তিনি একটি যোগসূত্র স্থাপন করেন। ঐতিহাসিক কীন (Keene) মন্তব্য করেন— 'কোন সরকার, এমনকি ব্রিটিশও এই পাঠানের মত বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হয় নাই।'[২] শের শাহ্ মুঘল-শ্রেষ্ঠ আকবর-এর পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং সম্রাট আকবর তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এই আফগানের নিকট অনেকাংশে ঋণী। শের-প্রশাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি যদিও স্বেচ্ছাতন্ত্র ছিল, কিন্তু ইহা ছিল জনকল্যাণমূলক ও প্রগতিশীল। প্রজা সাধারণের মঙ্গল সাধনে তিনি নজর দেন। এই কাজে তিনি সর্বদা নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। চাষীদের উন্নতির দিকে তিনি নজর দেন। প্রজা সাধারণের প্রতি তাহার শুভেচ্ছার কথা চিন্তা করিলে শের শাহ্‌কে একজন সত্যিকারের স্বেচ্ছাচারী বলা যায় না।

আকবরের পথপ্রদর্শক

বেসামরিক শাসনব্যবস্থা ঃ সমগ্র সাম্রাজ্যকে শের শাহ্ ৪৭টি ইউনিট বা 'সরকার'-এ বিভক্ত করেন এবং সরকারগুলিকে কতকগুলি পরগনায় বিভক্ত করেন। পরগনার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন একজন আমিন, একজন শিকদার, একজন খাজাঞ্চি বা ট্রেজারার, একজন মুন্সেফ, দুইজন লেখক বা মুন্সি—একজন হিন্দু ও একজন ফার্সিভাষী। একটি সরকারের অধীনস্থ পরগনাসমূহের শাসনকার্যের জন্য ছিলেন একজন 'শিকদার-ই-শিকদারান' এবং একজন 'মুন্সেফ-ই-মুন্সেফান'। শাসন বিভাগের প্রত্যেকটি অংশ শের শাহ্ নিজে তদারক করেন। কর্মচারীদের দুর্নীতি বন্ধ করিবার জন্য প্রতি দুই বা তিন বৎসর অন্তর তিনি বদলির ব্যবস্থা করেন।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগ

ভূমি রাজস্ব সংস্কার ঃ রাষ্ট্রের কার্যাবলি নির্বাহের জন্য রাজস্ব আদায় করা হইত। কিন্তু সময় সময় তাহা এত চরমে উঠিত যে, চাষীদের দুর্ভোগের সীমা থাকিত না। শের শাহ্-এর পূর্বে জমি জরিপের বিশেষ কোন বন্দোবস্ত ছিল না এবং কানুনগোদের হিসাব অনুযায়ী অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া রাজস্ব আদায় করা হইত। কিন্তু শের শাহ্ জমির পরিমাণ নিরূপণের বন্দোবস্ত করেন, যাহা প্রত্যেক শস্য কর্তনের সময়েই নিরূপণ করা হয় এবং উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ কর আদায় করা হয়। নগদ মূল্য বা উৎপন্ন শস্যের বিনিময়ে এই কর আদায় করা হয়। রাজস্ব আদায়ের জন্য সরকার, আমিন, মুকাদ্দাম, শিকদার, কানুনগো ও পাটোয়ারীদের শ্রম কাজে লাগায়।

জমির পরিমাণ নির্ধারণ

শের শাহ্-এর ভূমি সংস্কারের অন্যতম হইল জমির মালিকানা নির্ধারণ। ইতোপূর্বে প্রজাগণ জমির দখলি সূত্রে মালিক হইলেও ইহার সমর্থনে কোন লিখিত দলিল ছিল না। অপরদিকে ভূমি রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে সরকার জমির উপর মালিকানার দাবিদার ছিল। এই সংক্রান্ত অস্পষ্টতা দূরীকরণের জন্য এবং জমির উপর মালিকানা নির্ধারণের জন্য শের

শেরশাহের সাম্রাজ্য (১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ)

শাহ্ এক নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ইহাকে 'কবুলিয়াত' ও 'পাট্টা' বলা হয়। প্রজাগণ লিখিতভাবে তাহাদের জমি ও দায়িত্বের বর্ণনাকারীর একটি দলিল সরকারকে প্রদান করে। ইহাকে 'কবুলিয়াত' বলা হয়। আবার সরকার লিখিতভাবে প্রজাদেরকে ঐ জমির মালিকানা প্রদান করে। ইহাকে 'পাট্টা' বলা হয়। প্রজাদের এই জমির মালিকানা যুগ যুগ ধরিয়া চলিতে থাকে এবং বংশপরম্পরায় রায়তি স্বত্ব হিসাবে আজ পর্যন্ত বহাল রহিয়াছে। জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ হওয়া পর্যন্ত খাজনা আদায়কারী হিসাবে জমিদারগণ জমির উপর জমিদারি স্বত্বের মালিক ছিলেন।

কবুলিয়াত ও পাট্টা

উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার সময় খুবই উদার এবং রাজস্ব আদায়ের সময় কঠোরতা প্রদর্শন করিবার জন্য শের শাহ সর্বদা তাঁহার কর্মচারীদিগকে নির্দেশ দেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য শস্য বিনষ্ট হইলে সরকার হইতে চাষীদিগকে অগ্রিম ঋণ প্রদানের ব্যবসস্থা করা হয়। কৃষকদিগকে সব রকমের সুযোগ-সুবিধাদি প্রদান করা হয়।

সামরিক শাসনব্যবস্থা ঃ সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন ও আলাউদ্দিন খিলজীর মত শের শাহ্ও একটি শক্তিশালী ও সুযোগ্য সেনাবাহিনী পালন করিবার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। আলাউদ্দিন খিলজী কর্তৃক উদ্ভাবিত সামরিক শাসনব্যবস্থার তিনি প্রশংসা করেন। একটি সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী বা জমিদারির বরকন্দাজের দ্বারা তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাই সম্রাট কর্তৃক সরাসরি নিযুক্ত দায়িত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তাঁহার নিকট দায়ী একটি শক্তিশালী ও নিয়মিত সেনাবাহিনী তিনি পালন করেন এবং জায়গীরদারি প্রথাকে উচ্ছেদ করিয়া দেন। সৈনিকদিগকে তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া দেন এবং বিভিন্ন সেনানিবাসে মোতায়েন রাখেন, যাহার মধ্যে দিল্লী ও রোহ্টাস-এর সেনানিবাসই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের সেনাবাহিনীর একটি ডিভিশনকে বা অংশকে বলা হয় 'ফৌজ' এবং ইহার সেনাপতিকে বলা হয় 'ফৌজদার'। আফগানদের মধ্যে গোত্র-প্রীতি খুবই প্রবল। তাই গোত্র-প্রধানদিগকে তাহাদের আয়ত্তাধীনে বড় বড় বাহিনী রাখিবার অনুমতি প্রদান করা হয়। অশ্বারোহী বাহিনী ছিল সুদক্ষ। সমস্ত অশ্বগুলিকে চিহ্নিত করা হয় এবং একটি বর্ণনাকারী খাতা রাখা হয়। সম্রাট স্বয়ং সৈন্যবিভাগে লোক ভর্তি করেন এবং তাহাদের বেতন নির্ধারণ করিয়া দেন। শের শাহ্-এর অধীনে ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) অশ্বারোহী বাহিনী, ২৫ হাজার পদাতিক বাহিনী, ৩০০ গজারোহী বাহিনী এবং গোলন্দাজ বাহিনী সংযুক্ত একটি সামরিক বাহিনী ছিল। সেনানিবাসসমূহের সুন্দর আবহাওয়ার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়।

মুদ্রা ও শুল্ক সংস্কার ঃ প্রজাদের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য শের শাহ মুদ্রা ও শুল্ক সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তিনি টাঁকশালের অনেক পরিবর্তন সাধন করেন এবং পূর্ববর্তী শাসকদের সময়কার টাকার দ্রুত অবমূল্যায়ন রোধ করার চেষ্টা করেন। শের শাহ বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ব্যবসা আদান-প্রদানের শুল্ক রহিত করেন, যাহার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

বিভিন্ন প্রদেশের মালপত্র আমদানি-রপ্তানির জন্য তিনি যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন করেন। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিকে তিনি বড় বড় সড়কের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

তাঁহার সড়কসমূহের মধ্যে সবচাইতে দীর্ঘ হইল প্রসিদ্ধ গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোড, যাহা আজ পর্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে। এই সড়ক পূর্ববাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) সোনারগাঁও হইতে 'সিন্ধু' নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১,৫০০ ক্রোশ (৩,০০০ মাইল)। আগ্রা হইতে বোরহানপুর পর্যন্ত আরেকটি সড়ক তিনি নির্মাণ করেন। একটি সড়ক আগ্রা হইতে যোধপুর হইয়া চিতোর পর্যন্ত বিস্তৃত। আরেকটি সড়ক লাহোর হইতে মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সমস্ত সড়কে শের শাহ বৃক্ষরোপণ করেন এবং হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত সহকারে অনেক সরাইখানা নির্মাণ করেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর আদান-প্রদানের জন্য এই সমস্ত সরাইখানা তথ্য সরাবরাহ কেন্দ্র হিসাবেও কাজ করে।

বিচার ব্যবস্থা ঃ শের শাহ একজন কঠোর ন্যায়বিচারক ছিলেন এবং সবার প্রতি সমান বিচার করিতেন। তাঁহার মতানুসারে, আইনের সামনে সবাই সমান এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজনও তাহাদের বিরুদ্ধে মামলার রায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না। পরগনাসমূহে আমিরগণ ছিলেন দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারক এবং কাজী ও মিরাজ-ই-আদল অন্যান্য মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। 'সরকার' এ মুন্সেফ-ই-মুন্সেফান বিচারকার্য পরিচালনা করেন। রাজধানীতে ছিলেন প্রধান কাজী, রাজকীয় সদর এবং সর্বোপরি ছিলেন সম্রাট স্বয়ং।

শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনীর পুনর্গঠন করা হয় এবং স্থানীয় অপরাধের জন্য স্থানীয় কর্মচারীদিগকে দায়ী করা হয়। এইভাবে গ্রামের শান্তি রক্ষা ও অপরাধী শনাক্ত করিবার জন্য গ্রাম প্রধানদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ফলে রাস্তাঘাট এত নিরাপদ হইয়া যায় যে, ঐতিহাসিক নিজামুদ্দিন বলেন— 'কোন লোক এক থলে স্বর্ণমুদ্রা লইয়া কোন পরিত্যক্ত স্থানে রাত্রি যাপন করিলেও কোন পাহারার প্রয়োজন হইত না।'[৩]

ধর্মীয় নীতি ঃ শের শাহ নিজে একজন ধার্মিক মুসলমান ছিলেন এবং সর্বদা অমুসলিমদের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করেন। হিন্দুদিগকে বড় বড় পদে, এমনকি সেনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিবার নজিরও শের শাহ্-এর যুগে অনেক পাওয়া যায়। চাকুরিতে নিয়োগের ব্যাপারে তিনি ধর্মের চেয়ে প্রার্থীর গুণের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখেন। ঐতিহাসিক ইর্‌কসিন মন্তব্য করেন— "আইন ও প্রজা-সাধারণের রক্ষাকারী হিসাবে আকবর-এর পূর্বে অন্য যে কোন শাসকের চেয়ে শের শাহ অধিক উৎসাহী ছিলেন।"[৪] এইভাবে তিনি হিন্দুদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি অর্জন করেন।

শের শাহ্-এর চরিত্র ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণ ঃ

শের শাহ ইতিহাসে অতি উচ্চাসন পাইবার যোগ্য। তাঁহাকে যথার্থভাবেই মধ্যযুগীয় ভারতের শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম বলা হয়। রাজপদ সম্পর্কে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন এবং বলেন— "মহানদের জন্য সর্বদা কর্মতৎপর থাকা কর্তব্য।"[৫] অলসতা ও মাত্রাতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদ শের শাহ্-এর অজানা ছিল। প্রজা-সাধারণের সুযোগ-সুবিধার জন্য কঠোর পরিশ্রমী শের শাহ শাসন কার্যের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয় স্বয়ং তদারক করেন এবং বিভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপ গভীর মনোনিবেশ সহকারে তিনি পরিচালনা করেন। নিজেকে সারাদিন ব্যস্ত রাখা সত্ত্বেও তিনি কিছু সময় কোরআন শরীফ তিলাওয়াত ও নামাজ-কালামের জন্য নির্দিষ্ট রাখেন। রাষ্ট্রের

একজন মানুষ ও শাসক হিসাবে

শাসন বিভাগের তিনি বড় কর্তা ছিলেন। সুতরাং রাষ্ট্রের সমস্ত বিভাগকে তাঁহার নিকট তাহাদের কার্য-বিবরণী সবিস্তারে প্রদান করিতে হইত। শের শাহ অন্যায়, দুর্নীতি মনে-প্রাণে ঘৃণা করেন। তাই যে কোন আকারের বা যে কোন প্রকারের অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করিতে তিনি মোটেই দ্বিধাবোধ করেন না। চাষীদের ব্যাপারে তিনি খুবই সজাগ দৃষ্টি রাখেন এবং কেউ যদি ইচ্ছাপূর্বক কোন ফসল নষ্ট করে, তবে তাহাকে তিনি ভীষণ শাস্তি প্রদান করেন। দরিদ্রদের সম্পর্কে তিনি খুবই মহানুভব ছিলেন এবং উপযুক্ত লোকদিগকে তিনি রাজকীয় ভাণ্ডার হইতে খাদ্য প্রদান করেন। কালী কিঙ্কর দত্ত বলেন—'সত্যিকারভাবে তাঁহার রাজত্বের আসল মাহাত্ম্য এই যে, ভারতে একটি জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয় সমস্ত গুণাবলি তাঁহার মধ্যে ছিল এবং তিনি একাধিকবার উজ্জ্বল আকবরী রাজত্বের পথ পরিষ্কার করেন।'[৬]

সেনাপতি

সেনাপতি হিসাবে শের শাহ খুবই দক্ষ ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অসম সাহসী, এবং ভাবপ্রবণতার ঝোঁকে তিনি কখনো যুদ্ধ পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার সমস্ত অভিযান অনেক বিবেচনা ও সুকৌশলে প্রেরিত হয়। তাঁহার সমস্ত কাজে তিনি খেঁকশিয়ালের ধূর্ততা ও সিংহের ন্যায় বীরত্বের পরিচয় দান করেন এবং এইভাবেই তিনি মুঘলদিগকে পরাজিত করিতে সক্ষম হন। আফগানদিগকে তিনি পুনর্জাগরিত করেন এবং তাহাদের সমরকুশলতাকে পুরাপুরি কাজে লাগান। তাঁহার সেনাপতিত্বে তিনি এতই আস্থাশীল ছিলেন যে, বাবর-এর অধীনে থাকাকালে তিনি মন্তব্য করেন—'যদি অদৃষ্ট আমায় সহযোগিতা করে এবং ভাগ্য আমার বন্ধুদের পাশে থাকে, আমি সহজেই মুঘলদিগকে হিন্দুস্তান হইতে বাহির করিয়া দিব।'[৭] যদিও একজন উঁচুমানের বিজয়ী, কিন্তু বিজয়ের পর শের শাহ কখনো তাঁহার সৈন্যদিগকে অযথা হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ করিতে দেন নাই।

রাজনীতিবিদ হিসাবে শের শাহ

শের শাহ একজন উঁচুমানের রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ভারতের সাবেক মুসলিম শাসকদের ইতিহাস পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া কোন সরকারই টিকিতে পারে না। সুতরাং তিনি ধর্মনিরপেক্ষভাবেই রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। যদিও তিনি অমুসলিমদের নিকট হইতে জিজিয়া কর আদায় করেন, কিন্তু এই করের গুরুত্ব প্রজাদিগকে বুঝাইতে তিনি সক্ষম হন। একমাত্র এই কর ছাড়া আর কোনকিছুই এই দুই জাতির মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে নাই। সমস্ত সরকারি অফিসে চাকুরি প্রার্থীর ধর্মের চাইতে তাহার গুণকেই অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়। ভারতের সমস্ত জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে তিনি সাফল্য অর্জন করেন; কিন্তু তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুর ফলে সমস্ত পরিকল্পনা ধ্বংস হইয়া যায়। কালী কিঙ্কর দত্ত বলেন ঃ "মাত্র পাঁচ বৎসর পর তাঁহার দুর্ঘটনায় মৃত্যু না হইলে মুঘলদের পুনর্বাসন অতো শীঘ্র সম্ভব হইত না।"[৮]

তাঁহার মহানুভবতা

মহানুভবতার জন্য শের শাহ খুব প্রসিদ্ধ। তাঁহার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা মুঘলদের জন্য অতি মূল্যবান সম্পদ। মুঘল শাসকবর্গ তাঁহার রাজস্বব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া ইহাকে পাকাপোক্ত করেন। সাম্রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলকে তিনি সুদীর্ঘ সড়ক ও সরাইখানা দ্বারা সংযুক্ত করেন। রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অনেক মাদ্রাসা ও মক্তব তিনি প্রতিষ্ঠা

করেন। তিনি সর্বদা বিদ্বানদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাঁহাদিগকে উপঢৌকনাদি দিয়া সন্তুষ্ট রাখেন।

এইসব জনহিতকর কার্যাবলি ও সংস্কার দ্বারা তিনি মুঘলদের উজ্জ্বল রাজত্বের পথ পরিষ্কার করেন। ভি. এ. স্মিথ মন্তব্য করেন : "শের শাহ্ বাঁচিয়া থাকিলে 'মহান মুঘলগণ' ইতিহাসের মঞ্চে আরোহণ করিতে পারিতেন না।"[৯]

শের শাহ্-এর উত্তরাধিকারিগণ

শের শাহ্-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আফগানদের খ্যাতি শেষ হইয়া যায়। তাঁহার পুত্র জালাল ইসলাম শাহ বা সাধারণ্যে পরিচিত 'সেলিম শাহ' উপাধি লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু আফগান প্রধানদের দুর্ব্যবহারের ফলে আফগান ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, বিদেশী আক্রমণের সময় প্রতিহত করিবার মত কোন সেনাবাহিনী ইহাতে আর পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, ইসলাম শাহ সেনাবাহিনীর যোগ্যতা এবং তাঁহার পিতার সংস্কারসমূহ বজায় রাখেন। তাঁহার অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা ছিল চমৎকার। কিন্তু ১৫৫৪ সালে তাঁহার মৃত্যুর সাথে সাথে দেশে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাঁহার শিশুপুত্র ফিরোজ শাহ্কে হত্যা করিয়া তাঁহার মামা মুবারক খান 'আদিল শাহ' উপাধি লইয়া সিংহাসন অধিকার করেন। 'হিমু' নামে রেওয়ারীর একজন সাধারণ বেনিয়া আদিল শাহ্-এর দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করেন এবং নিজেই শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ইব্রাহিম সূর নামে একজন আফগান আমির আগ্রা ও দিল্লীঅধিকার করেন। কিন্তু শীঘ্রই সিকান্দার সূর নামে আরেক জন আফগান আমির তাঁহাকে বহিষ্কার করেন। মুঘল সম্রাট হুমায়ুন সর্বদা এইসব বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করিয়া ১৫৫৫ সালে আফগানদিগকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। পুনরায় কয়েক শতাব্দীর জন্য মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাদটীকা

১. পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা— ২৬২।

২. No government, not even British has shown so much wisdom as this Pathan.

৩. If any one carried a purse full of gold (pieces) and slept in the desert (deserted places) for nights, there was no need for keeping watch.

৪. Sher Shah had more the spirit of a legislator and guardian of his people than any Prince before Akbar.

৫. It behoves the great to be always active.

৬. In fact, the real significance of his reign lies in the fact that he embodied in himself those very qualities which are needed for the building of a national state in India, and he prepared the ground for the glorious Akbaride regime in more ways than one.

৭. If luck aids me and fortune stands my friends I shall easily oust the Mughals from Hindustan.

৮. But for his accidental death after only five years' rule the restoratoin of the Mughals would not have been accomplished so soon.
৯. If Sher Shah had been spared the 'Great Mughals' would not have appeared on the stage of history.

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

Abbas Sarwani	:	*Tarikh-e-Sher Shahi*
Qanungo	:	*Sher Shah*
Ishwari Prasad	:	*The Life and Times of Humayun*
Beveridge	:	*Gulbadan Begum's Humayun Namah*
V. A. Smith	:	*Oxford History of India*
Haig and Burn	:	*Cambridge History of India, Vol— IV*
Lane Poole	:	*Medieval India*
Edwardes and Garrett	:	*Mughal Rule in India*

চতুর্থ অধ্যায়
মুঘল-শ্রেষ্ঠ আকবর
(১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিঃ)

সিংহাসনে আরোহণের সময় আকবর-এর বয়স ছিল মাত্র ১৩ বৎসর। তাঁহার পিতার একজন পুরাতন বন্ধু ও তাঁহার অভিভাবক বৈরাম খান-এর সঙ্গে আকবর তখন পাঞ্জাবে ছিলেন। ১৫৫৬ সালে যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহাকে সিংহাসনে বসানো হয়, কিন্তু ভারতে মুঘল আধিপত্য তখনও ছিল সুদূর পরাহত। ঐতিহাসিক ভি. এ. স্মিথ মন্তব্য করেন— 'সত্যিকার অর্থে বাদশাহ হইবার পূর্বে আকবরকে প্রমাণ করিতে হয় যে, সিংহাসনের অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের চাইতে, এবং অন্ততপক্ষে তাঁহার পিতার হৃত সাম্রাজ্য পুনর্জয় করিবার ব্যাপারে তিনি সুযোগ্যতর।"[১]

প্রাথমিক গোলযোগ ঃ

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতের অবস্থা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন ও গোলযোগপূর্ণ। হিন্দুস্থানের[২] সমস্ত প্রদেশ বিশৃঙ্খলায় পতিত এবং ভারতের বিভিন্ন অংশের স্বাধীন রাজত্বগুলি তখন ক্ষমতা লাভের জন্য মত্ত। শের শাহ-এর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিবাদের ফলে দেশবাসী তাঁহার সংস্কারসমূহের সুফল হইতে বঞ্চিত হয়। অধিকন্তু একটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ফলে দেশ তখন জর্জরিত। সাবেক সম্রাটকে আজীবন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। তাই সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করিবার সময় তিনি পান নাই। উত্তর-পশ্চিমদিকে কাবুলে ছিলেন আকবর-এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মির্জা মুহাম্মদ হাকিম। স্বাধীন কাশ্মীর ছিল একজন মুসলিম শাসকের অধীনে। সমগ্র হিমালয় অঞ্চলের রাজ্যসমূহও তখন স্বাধীন হইয়া পড়ে। শের শাহ-এর মৃত্যুর পর সিন্ধু ও মুলতান আলাদা হইয়া স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। উড়িষ্যা, মালব, গুজরাট ও গোন্দওয়ানীর অন্যান্য স্থানীয় প্রধানগণ কোন উপরস্থ আধিপত্য হইতে মুক্ত হইয়া পড়েন। দক্ষিণে ছিল হিন্দু শাসিত বিজয়নগর রাজ্য ও মুসলিম শাসিত খান্দেশ, বেরার, বিদার, আহমদনগর ও গোলকুণ্ডা সালতানাতসমূহ, যাহাদের সঙ্গে উত্তর ভারতের কোন যোগাযোগ ছিল না। গোয়া ও দিও ছিল পর্তুগীজদের উপনিবেশ এবং এইসব উপনিবেশের মাধ্যমে তাহারা সমগ্র পশ্চিম উপকূলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।

রাজ্যের অখণ্ডতা অভিন্ন

বাংলাদেশে তখন সূর বংশ অধিষ্ঠিত। ইব্রাহিম খান কর্তৃক দিল্লী হইতে বিতাড়িত হইবার পর মুহাম্মদ আদিল শাহ পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে তাঁহার দুঃসাহসিক মন্ত্রী হিমু আকবরকে তাঁহার পিতার রাজ্য অধিকারে বাধা প্রদানের জন্য এক

বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেন। অপরদিকে সিংহাসন প্রত্যাশী সূর বংশীয় সিকান্দার সূর ১৫৫৫ সালে সিরহিন্দ-এর যুদ্ধে পরাজয়ের পর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার একটি সুযোগের আশায় পাঞ্জাবে ঘুরিয়া বেড়ান। দিল্লীর পশ্চিমদিকে রাজপুতগণ তাহাদের পার্বত্য অঞ্চলে স্বাধীন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। এই ব্যাপারে ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন ঃ 'বস্তুত হুমায়ুন-এর রাজত্ব রাজপুত যুবরাজদিগকে তাহাদের প্রভাবের সীমানা বিস্তৃত করিতে সহায়তা প্রদান করিয়াছে; এবং যেহেতু দিল্লীর সরকারকে তাহাদের ভয় করিবার কোন কারণ ছিল না, তাহারা তাহাদের সামরিক সম্পদ এত উন্নত করে যে, তাহারা পরে এমনকি স্বয়ং সম্রাটের সঙ্গে বুঝাপড়া করিবার মত যথেষ্ট শক্তিশালী বলিয়া নিজেদের বিবেচনা করে।'[৩] অতএব আকবর-এর সম্মুখে যে সমস্যা দেখা দেয়, তাহা ছিল ভয়াবহ। কে. কে. দত্ত বলেন ঃ "সুতরাং আকবর-এর পৈতৃক বিষয় ছিল অনিশ্চিত স্বভাবের এবং একটি সাম্রাজ্য গঠনের কাজে তাঁহার দায়িত্ব ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি দুরূহ ব্যাপার।"[৪]

আফগান ও রাজপুতদের পুনর্জাগরণের মনোভাব

হিমু যখন আকবরকে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেন, তখনও আকবর পাঞ্জাবে অবস্থানরত। অতি দরিদ্র পরিবারে হিমু জন্মগ্রহণ করেন এবং নিছক যোগ্যতার বলে তিনি মুহাম্মদ আদিল-এর প্রধানমন্ত্রীর পদে উন্নতি লাভ করেন। তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি এত বৃদ্ধি পায় যে, তিনি 'রাজা বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করিয়া নিজের ইচ্ছা মত জায়গীর ইত্যাদি প্রদান করেন। প্রথমে দিল্লীর মুঘল শাসনকর্তা তারদি বেগকে পরাজিত করিয়া তিনি আগ্রা ও দিল্লী অধিকার করেন। অতঃপর ১৫০০ হস্তীবাহিনী যুক্ত এক বিরাট সেনাবাহিনী লইয়া ঐতিহাসিক পানিপথ-এর ময়দানে তিনি বৈরাম খান ও আকবর-এর সম্মুখীন হন। প্রথমে ঘটনাপ্রবাহ তাঁহার পক্ষেই ছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুঘল পক্ষের একটি তীর সরাসরি তাঁহার চোখে বিদ্ধ হয়। তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া মাটিতে পতিত হন এবং তাঁহার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। এইভাবে জ্ঞানশূন্য অবস্থাতেই তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬)

পানিপথ-এর দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলাফল সুদূরপ্রসারী। ইহা সূর বংশের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। বিজয়ীরা শীঘ্রই আগ্রা ও দিল্লী অধিকার করে। ১৫৫৭ সালে সিকান্দার সূর আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহাকে মধ্যপ্রদেশে একটি জায়গীর প্রদান করা হয়। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে বিতাড়িত করা হয় এবং পরে তিনি বাংলাদেশে একজন পলাতক হিসাবেই মৃত্যুবরণ করেন। ইব্রাহিম সূর স্থান হইতে স্থানান্তরে কিছুদিন ঘুরিয়া বেড়াইবার পর উড়িষ্যায় একটি আশ্রয় লাভ করেন। কিন্তু ১৫৬৮ সালে তাঁহাকে তথায় হত্যা করা হয়। ১৫৫৬ সালে বাংলার শাসনকর্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে মুহাম্মদ আদিল মুঙ্গের-এ প্রাণ ত্যাগ করেন।

ফলাফল

বৈরাম খান-এর পতন ঃ বৈরাম খান একজন পারস্যবাসী ও শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কর্মক্ষেত্রে তিনি একজন সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ লোক ছিলেন। তাঁহার প্রাক্তন প্রভু হুমায়ুন-এর প্রতি তাঁহার সেবাকার্য এত বেশি ছিল যে, ইহা শের শাহ-এর মত ব্যক্তির প্রশংসাও অর্জন করিতে সক্ষম হয়। এমনকি বাদাউনীও এই লোকটির খাঁটি চরিত্র, বিদ্যানুরাগ ও একাগ্রতার প্রশংসা করেন। হুমায়ুন পুত্র আকবরকে

পতনের কারণ

তাই বৈরাম খান-এর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান। সুতরাং ১৫৫৬ সাল হইতে ১৫৬০ পর্যন্ত তিনি সম্রাট আকবর-এর অভিভাবক হিসাবে কাজ করেন। তাঁহার রাজকীয় উপাধি ছিল 'খান-ই-খানান'। আকবর-এর সফলতার পথ পরিষ্কারকারী হিন্দুস্থানের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহ বৈরাম খানই জয় করেন। কিন্তু গর্বিতভাবে ক্ষমতা ব্যবহারের ফলে তিনি ইতোমধ্যে অনেকের শত্রু হইয়া দাঁড়ান। আবুল ফজল লিখেন— 'শেষ পর্যন্ত বৈরাম-এর কার্যাবলি ধৈর্যের সমস্ত সীমা অতিক্রম করে।'[৫] ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, খান-ই-খানান এমনকি কামরান-এর পুত্র আবুল কাশেমকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার চিন্তাও মনে স্থান দেন। অধিকন্তু তাঁহার অভিভাবকত্বে আকবর শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া পড়েন এবং নামে যেইরূপ সম্রাট, কার্যক্ষেত্রেও সেইরূপ সম্রাট হইতে তিনি মনস্থ করেন।

অতঃপর বৈরাম খানকে বিতাড়িত করিবার জন্য একটি ষড়যন্ত্র খাড়া করা হয়। এই ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বিধবা রাণী হামিদা বানু বেগম, আকবর-এর বিমাতা মাহাম আন্‌কাহ্, তাঁহার পুত্র আদম খান এবং তাঁহার আত্মীয় ও দিল্লীর শাসনকর্তা শিহাবুদ্দিন। এই কর্মসূচিটি আকবর-এর সঙ্গে আলোচনা করা হয়। তথাকথিত পীড়িতা মাতাকে দেখিবার জন্য আকবর দিল্লী গমন করেন। স্বহস্তে রাজক্ষমতা অধিকার করিবার কথা পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিয়া আকবর বৈরাম খান-এর নিকট একখানা বাণী প্রেরণ করেন। তিনি এই কথাও উল্লেখ করেন যে, বৈরাম খান যেন হজ্জ সমাপনার্থে মক্কা গমন করেন। তাঁহার ভরণ-পোষণের জন্য আকবর তাঁহাকে একটি জায়গীর দিতে চান, যাহার রাজস্ব সরাসরি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

তাঁহাকে বহিষ্কারের ষড়যন্ত্র

বৈরাম খান প্রসন্নভাবে বরখাস্তপত্র গ্রহণ করেন এবং আগ্রা ত্যাগ করিয়া তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি দেখিতে পান, তাঁহার শত্রু পীর মুহাম্মদকে 'খান' উপাধি দিয়া তাঁহার নির্গমন ত্বরান্বিত করিতে পাঠানো হয়। বৈরাম খান এখন বুঝিতে পারেন যে, দরবারে তাঁহার শত্রুরা তাঁহার চির সর্বনাশ করিতে বদ্ধপরিকর। ফলে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং উত্তরদিকে ফিরিয়া পাঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা করেন। তবে তিনি অকৃতকার্য হন এবং নিজেকে সম্রাটের দয়ার উপর ছাড়িয়া দেন। তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা মঞ্জুর করা হয় এবং মক্কার দিকে চলিয়া যাইতে অনুমতি দেওয়া হয়। গুজরাটের বাহিরে তিনি আর যাইতে পারেন নাই। কারণ, 'পট্টন' নামক স্থানে একজন আফগানের হাতে তিনি নিহত হন। বৈরাম খান সেই আফগানের পিতাকে হয়ত যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করিয়াছিলেন বা তাঁহার আদেশে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল।

বৈরাম খান নিহত

বৈরাম খান-এর পতনের সময় আকবর তখন অল্প বয়সের বালক মাত্র। ১৫৬০ হইতে ১৫৬২ সাল পর্যন্ত পরবর্তী দুই বৎসর রাষ্ট্রে প্রভাবান্বিত ছিলেন আকবর-এর বিমাতা মাহাম আন্‌কাহ্। সাধারণ অন্তপুরী প্রভাবের ন্যায় তাঁহার প্রভাবও ছিল খুবই মন্দ প্রকৃতির। তাঁহার পুত্র আদম খানকে তিনি এমন পদে বহাল করেন, যাহার জন্য তিনি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। ইহার ফল হয় হৃদয়বিদারক। সর্বপ্রথম পীর মুহাম্মদকে সহকারী সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া আদম খানকে পাঠানো হয় মালব-এর বাজ বাহাদুরের বিরুদ্ধে। অতি অল্প সময়ের যুদ্ধেই সংঘর্ষের মীমাংসা হইয়া যায়। বাজ বাহাদুর

তথাকথিত অন্তঃপুর প্রভাব (১৫৬০-১৫৬২)

গুজরাটে পলায়ন করেন এবং বিপুল লুণ্ঠিত দ্রব্য আদম খান-এর হস্তগত হয়। কিন্তু তিনি ইহার অতি সামান্য অংশ সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন। এই কারণে এবং মালবে আদম খান-এর বিভিন্ন আচরণের কথা শ্রবণ করিয়া আকবর ক্রুদ্ধ হইয়া যান এবং স্বয়ং আদম খান-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে সিদ্ধান্ত করেন। যাহা হউক, আকবর তাহাকে এইবারের জন্য ক্ষমা করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আদম খান-এর কার্যাবলি আকবর-এর ধৈর্যের সীমা ছাড়াইয়া গেলে তিনি তাহাকে স্বহস্তে হত্যা করেন। তাহার হত্যার পর মাহাম আন্‌কাহ্ মাত্র চল্লিশ দিন জীবিত ছিলেন এবং তারপর তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন।

উজবেকদের বিদ্রোহ ঃ আব্দুল্লাহ খান উজবেক ছিলেন আকবর-এর বিশ্বস্ত কর্মকর্তাদের অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে তিনিই বাজ বাহাদুরের হাত হইতে মালব জয় করেন। ১৫৬৪ সালের জুলাই মাসে তিনি বিদ্রোহ করেন এবং অন্যান্য উজবেক অভিজাতগণ তাঁহার সহিত মিলিত হন। ফলে বিদ্রোহটি খুবই জোরদার হইয়া উঠে। আকবর তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। আব্দুল্লাহ খান গুজরাটে পলাইয়া যান এবং সেইখান হইতে জৌনপুর গিয়া তিনি আরেকজন উজবেক নেতা খান জামান-এর সহিত মিলিত হন। খান জামান বা আলি কুলি খান ১৫৬৫ সালে বিদ্রোহ করেন। আকবর-এর অন্য এক বিশ্বাসী কর্মকর্তা আসফ খানও এইসব বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হন। খান জামান-এর বিরুদ্ধে প্রেরিত মুঘল বাহিনী পরাজয় বরণ করে। অতঃপর আকবর স্বয়ং বিদ্রোহ দমনে বাহির হন। উজবেকরা মৌখিক বশ্যতা স্বীকার করিলেও ব্যাপারটি সেইখানে শেষ হয় নাই।

আবদুল্লাহ খানের বিদ্রোহ
খান জামান
উজবেকদের বশ্যতা স্বীকার

সম্রাটের ভ্রাতা হাকিম মির্জার কার্যাবলি দ্বারা বাধ্য হইয়া আকবর উজবেকদের বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ করেন। ভ্রাতাকে দমন করিয়া আকবর ১৫৬৭ সালের মে মাসে জৌনপুর অভিমুখে অগ্রসর হন এবং একটি প্রাতঃকালীন যুদ্ধে বিদ্রোহীদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। খান জামান যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। তাহার ভ্রাতা বাহাদুর খানকে বন্দি করিয়া হত্যা করা হয়। এইভাবেই আকবর-এর সাহসিকতা ও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বিদ্রোহটি দমন করা সম্ভব হয়।

সম্রাট আকবর-এর বিভিন্ন যুদ্ধ ও বিজয় ঃ

আকবর একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ও বিজয়ী ছিলেন। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, ১৫৫৬ সালে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে তিনি হিমুকে পরাজিত করেন। ১৫৬১ সালে বাজবাহাদুরকে পরাজিত করিয়া মালব অধিকার করা হয়। কিন্তু পীর মুহাম্মদ শাসনকর্তা থাকাকালে বাজবাহাদুর ইহা পুনরাধিকার করেন। ইহা পুনরাধিকার করিবার জন্য আকবর আব্দুল্লাহ খান উজবেককে পাঠান এবং তদনুসারে বাজ বাহাদুরের হাত হইতে মালব পুনরায় জয় করা হয়।

গন্দওয়ানা বিজয় ঃ রাণী দুর্গাবতী নামক একজন বীরাঙ্গনা মহিলা ছিলেন গন্দওয়ানার রাণী। ১৫৬৪ সালে কারার শাসনকর্তা আসফ খান রাণী দুর্গাবতীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। অতি বীরত্বের সাথে রাণী তাঁহার রাজ্য রক্ষা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আধুনিক জব্বলপুর জেলার গড় ও মান্দাল-এর মধ্যবর্তী স্থানে এক যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ ঃ

রাজপুতদের সহিত আকবর একটি আপস নীতি গ্রহণ করেন। তিনি বুঝিতে পারেন, এই যোদ্ধা জাতিটির সহযোগিতা ছাড়া ভারতে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন সুদূর পরাহত। সুতরাং হিন্দুদের প্রতি তিনি উদার মনোভাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে কিছু সংখ্যক রাজপুত রাজন্যবর্গ তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হন। ১৫৬২ সালে আকবর জয়পুরের রাজা বিহারী মল-এর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৫৭০ সালে তিনি বিকানীর ও জয়সালমীর-এর রাজকুমারীদ্বয়কে বিবাহ করেন। ১৫৮৪ সালে যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে রাজা ভগবান দাস-এর কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়। এইসব বৈবাহিক সম্পর্ক আশ্চর্য ফল প্রদান করে। আকবর এইসব রাজপুত রাজন্যবর্গের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে সক্ষম হন এবং তাঁহারাও মুঘল সাম্রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

সম্রাট রাজপুত মহিলাদের বিবাহ করেন

কিন্তু রাজপুত ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের মধ্যে মেবার আকবর-এর শক্তির বিরোধিতা করে। সুতরাং ১৫৬৭ সালে আকবর মেবার-এর গর্বিত রাজধানী চিতোর-এর বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। আকবর ও মেবার-এর মধ্যে যুদ্ধের কারণ হিসাবে ঐতিহাসিক আবুল ফজল বলেন— 'বড় বড় দুর্গ ও পর্বত বেষ্টনীর গর্বে গর্বিত রানার ধৃষ্টতা ও একগুঁয়েমির শাস্তি প্রদান করাই ছিল আকবর-এর উদ্দেশ্য।' নিজামুদ্দিন ও বাদাউনীর মতানুসারে— '১৫৬২ সালে রানা কর্তৃক মালব-এর বাজ বাহাদুরকে আশ্রয় প্রদান করাই ছিল এই অভিযানের মূল কারণ।' যাহা হউক, রানা উদয় সিং ছিলেন মেবার-এর তৎকালীন রাজা। তিনি ছিলেন রানা সংঘ-এর পুত্র। আকবর-এর আগমনের সংবাদ পাইয়া জয়মলকে নগর রক্ষার ভার দিয়া রানা উদয় সিং পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জয়মল মুঘল বাহিনীকে চারি মাস ঠেকাইয়া রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৫৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চিতোর মুঘলদের হস্তগত হয়। এই যুদ্ধে প্রায় ৮০০০ রাজপুত নিহত হয়।

চিতোর অভিযানের কারণ

পরবর্তী লক্ষ্যবস্তু হয় রনথম্ভোর। চৌহান গোত্রীয় হর বংশের রাজপুতদের ইহা ছিল শক্তিশালী দুর্গ। রনথম্ভোর দুর্গের নিকটবর্তী অন্য একটি পর্বত চূড়ায় বসানো মুঘল কামানসমূহ এই দুর্গের জন্য মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। রাজা সূর্যন হর আত্মসমর্পণ করিয়া আকবর-এর অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। এই খবর পাইবার সঙ্গে সঙ্গে কালিঞ্জর-এর রাজাও আত্মসমর্পণ করেন। উত্তর ভারতে কালিঞ্জর দুর্গের সুকৌশল অবস্থিতির ফলে ইহার অধিকার আকবর-এর জন্য যথেষ্ট সামরিক সুযোগ-সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত করে।

রনথম্ভোর কালিঞ্জর

হলদিঘাট-এর যুদ্ধ (১৫৭৬) ঃ ১৫৭২ সালে মেবার-এর রানা উদয় সিং-এর মৃত্যুর পর রানা প্রতাপ সিং তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। সিংহাসনে আরোহণের পরই চিতোর পুনরাধিকার ও মুঘলদের হাত হইতে রাজপুতদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার জন্য রানা প্রতাপ সিং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। রাজপুতদের এই বীরপুরুষ সিকি শতাব্দী ধরিয়া মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। সম্রাট আকবর আসফ খান ও মানসিংকে এক বাহিনী সহকারে রানা প্রতাপ-এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। হলদিঘাট গিরিপথের নিকটবর্তী স্থানে এক তুমুল যুদ্ধ হয়। এই ভয়াবহ যুদ্ধে উভয়পক্ষের সৈনিকরা সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত হাতাহাতি যুদ্ধ

করে। একটি মারাত্মক আঘাত পাইয়া রানা প্রতাপ সিং পর্বতের মধ্যে পলাইয়া যান। পরদিন মুঘল বাহিনী গোগুণ্ডা পৌঁছিয়া পূর্ণ জয়ের গৌরব অর্জন করে।

পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও মুঘলদের হাত হইতে হৃত রাজ্য ফিরিয়া পাইবার জন্য রানা প্রতাপ তাঁহার সংকল্পে অটুট থাকেন। প্রবল বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় ব্যতীত সমগ্র মেবার তিনি অধিকার করেন। এই শ্রেষ্ঠ রাজপুত সেনানায়ক ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রাণ ত্যাগ করেন।

গুজরাট ঃ ঐতিহাসিক ভি. এ. স্মিথ-এর মতানুসারে— "গুজরাট বিজয় আকবর-এর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার নিদর্শন প্রদান করে।"[৬] গুজরাট জয় করিবার পক্ষে অনেকগুলি কারণ আকবরকে উৎসাহ প্রদান করে। ১৫৩৬ সালে সম্রাট হুমায়ুন ইহা অধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং মুঘল সাম্রাজ্যের একটি হৃত প্রদেশ হিসাবে আকবর ইহা দাবি করিতে পারেন। অধিকন্তু গুজরাটের সম্পদ ও সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধাদি আকবরকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করে। গুজরাটের সুলতান তৃতীয় মুজাফফর শাহ্-এর শক্তিশালী উপরাজাদের উপর তাঁহার কোন কর্তৃত্ব ছিল না। ইতিমাদ খান নামক জনৈক গুজরাটি অভিজাত ইহার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য আকবরকে আমন্ত্রণ জানান। ১৫৭২ সালের নভেম্বর মাসে আকবর আহমদাবাদ পৌঁছেন এবং বিনা বাধায় ইহা অধিকার করেন। শাসনকার্যের যাবতীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিয়া আকবর তাঁহার রাজধানী ফতেহপুর সিক্রিতে ফিরিয়া যান। তাঁহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে আকবর গুজরাটে গোলযোগের খবর পান। ৬০০ মাইল পথ মাত্র ৯ দিনে অতিক্রম করিয়া শীঘ্রই তিনি গুজরাটে পৌঁছেন। ১৫৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি এক চূড়ান্ত গৌরবের অধিকারী হন। ১৫৮৪ সালে পুরাপুরিভাবে গুজরাট জয় করা হয়।

তৃতীয় মুজাফফার শাহ্

গুজরাট অধিকারের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের অনেক সুবিধাদির দ্বার উন্মোচিত হয়। ইহার ফলে মুঘলরা সমুদ্রে সরাসরি প্রবেশের অধিকার লাভ করে। ইহা মুঘলদিগকে পর্তুগীজদের সংস্পর্শে আনয়ন করে। রাজা টোডরমল গুজরাটে তাঁহার প্রথম রাজস্ব ব্যবস্থা কার্যকর করেন। ঐতিহাসিক কেনেডি-এর মতানুসারে— 'দাক্ষিণাত্যে অভিযানের জন্য গুজরাটকে লম্ফ দিবার স্থল হিসাবে ব্যবহার করা হয়।'[৭]

বাংলাদেশ ঃ বাংলাদেশ ছিল সর্বদাই দিল্লী সাম্রাজ্যের একটি অবাধ্য প্রদেশ। দাউদ খান ছিলেন বাংলার তৎকালীন আফগান শাসনকর্তা। তিনি ছিলেন ১৫৬৪ সালে বাংলায় একটি নূতন বংশ স্থাপনকারী সুলেমান কররানীর পুত্র। সুলেমান কররানী আকবর-এর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু শাসনকার্যে অপরিপক্ক ও বাংলার সামরিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল তাঁহার পুত্র দাউদ খান আকবর-এর বশ্যতা অস্বীকার করেন। শুধু স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াই নহে, বরং জামানিয়া সীমান্ত ঘাঁটি আক্রমণ করিবার ফলে তিনি আকবর-এর অপ্রিয়ভাজন হন। তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য আকবর মুনিম খানকে পাঠান। কিন্তু দাউদ খান-এর পিতার সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া তিনি দাউদ-এর সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি করেন। আকবর এই চুক্তি অনুমোদন করেন নাই; বরং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য তিনি টোডরমলকে প্রেরণ করেন। ১৫৭৬ হইতে ১৫৮০ সালের মধ্যে টোডরমল বাংলাদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

দাউদ খানের ধৃষ্টতা

কাবুল ঃ হাকিম মির্জার জীবিতকালে কাবুল তাঁহার অধীনে ছিল। ১৫৭৯-৮০ সালে

তিনি পাঞ্জাব অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। এই বিপদের মোকাবেলা করিবার জন্য বাংলাদেশ হইতে আকবর স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করেন। মুঘল বাহিনীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে হাকিম মির্জা দ্রুত কাবুল চলিয়া যান। যুবরাজ মুরাদ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। কিন্তু সম্রাট যখন শুনেন, হাকিম উজবেকদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন এবং সম্রাটের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবার শর্তে তাঁহার রাজ্যে তাঁহাকে পুনর্বহাল করেন। ১৫৮৫ সালে তাহার মৃত্যুর পর কাবুল প্রদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া মানসিংকে উহার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

কাশ্মীর ঃ কাশ্মীরের শাসক ছিলেন ইউসুফ শাহ। হিন্দু প্রজাদের উপর তিনি ভীষণ নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেন। ইহাই কাশ্মীরের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য আকবরকে প্ররোচিত করে। রাস্তায় ভীষণ অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও রাজা ভগবান দাস ইহাকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কাশ্মীর অধিকার করিয়া ইহাকে কাবুল প্রদেশের একটি অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়। ১৫৮৯ সালে আকবর কাশ্মীর পরিদর্শন করেন এবং ইউসুফ শাহ ও তাঁহার পুত্রদিগকে জায়গীর ও মনসবদারীর পদ প্রদান করেন।

সিন্ধু ও কান্দাহার ঃ ১৫৯০ সালে মির্জা আব্দুর রহিমকে সিন্ধু জয় করিবার পরিকল্পনা দিয়া মুলতান-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। দুইটি যুদ্ধের পর সিন্ধুর শাসক মির্জা জানি বেগ আত্মসমর্পণ করেন। সিন্ধু ও বেলুচিস্তান বিজয় আকবর-এর জন্য কান্দাহার বিজয়ের পথ খুলিয়া দেয়। অধিকন্তু, তুর্কি ও উজবেকদের কার্যকলাপের ফলে পারস্যের শাহ ভয়াবহ বিপদের মধ্যে ছিলেন। ১৫৯০ সালে প্রেরিত আকবর-এর অভিযান ১৫৯৫ সালে সাফল্য লাভ করে। পারস্যের শাহ-এর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ না করিয়াই আকবর কান্দাহার অধিকার করেন। কান্দাহার বিজয় নিঃসন্দেহে আকবর-এর কূটনীতির একটি চূড়ান্ত বিজয়।

আকবর-এর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতির মূলকথা ঃ

দিল্লীর সমস্ত শাসকের নিকট উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যাটি ছিল এক ভয়াবহ ব্যাপার। কালী কিঙ্কর দত্ত বলেন—'এই অঞ্চলটি যুদ্ধ কৌশল ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের অধিকারী; এবং তাই ইহা ভারতের শাসকদের পক্ষে কার্যকর শাসনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।'[৮] এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানের মধ্য দিয়া বিদেশীরা কয়েকবার ভারত আক্রমণ করে। সুতরাং প্রতিরক্ষা ও ব্যবসার জন্য এই অঞ্চলকে উন্মুক্ত রাখিতে আকবর বদ্ধপরিকর হন।

দুর্ধর্ষ উজবেক ও ইউসুফজাই গোত্রের লোকেরা তাহাদের পার্বত্য এলাকায় খুবই মারাত্মক ছিল। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক বেষ্টনীসমূহ সর্বদাই এই অঞ্চলের লোকদিগকে বিদেশীদের বশ্যতা হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। স্বভাবতই আকবর-এর প্রতি এই এলাকার লোকজন খুবই বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। উজবেকদিগকে আকবর সম্পূর্ণরূপে দমন করেন। তারপর টোডরমল ও মুরাদ-এর অধীনে এক বিরাট বাহিনী ইউসুফজাইদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। তাহাদের বেশ কিছু সংখ্যককে হত্যা করা হয় এবং অনেককে তুরান ও পারস্যে বিক্রয় করা হয়। বায়েজিদ-এর সমর্থক রোমানীয়াদিগকে পরাজিত ও ধ্বংস করা হয়। এইভাবে আকবর এই অঞ্চলকে বিপদমুক্ত করেন। অতঃপর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় নাই।

উজবেক ও ইউসুফজাইগণ

আকবর ও দাক্ষিণাত্য ঃ

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা লইয়া আকবর অতঃপর সমগ্র উত্তর ভারতের অধীশ্বর হন। অতঃপর তিনি দাক্ষিণাত্যের দিকে মনোনিবেশ করেন। দাক্ষিণাত্যের ব্যাপারে আকবর তাঁহার পূর্ববর্তী উত্তর ভারতের মৌর্য, গুপ্ত, খিলজী ও তুঘলকদের নীতিই গ্রহণ করেন। একজন খাঁটি সাম্রাজ্যবাদী হিসাবে দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও খান্দেশ রাজ্য অধিকার করিয়া একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই ছিল আকবর-এর মূল উদ্দেশ্য।

পূর্বসূরীদের নীতি অনুসরণ

দ্বিতীয়ত, তিনি চাহিতেন না, পর্তুগীজরা এই দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের একটি অংশ লইয়া যাক। তাহা ছাড়া পর্তুগীজগণ কর্তৃক এই দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপও আকবর সহ্য করিতে পারেন নাই। সুতরাং পর্তুগীজদিগকে সমুদ্রে পুনরায় ঠেলিয়া দিবার জন্য তিনি দাক্ষিণাত্যকে মূল কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করিতে প্রয়াস পান।

বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিনিধিদল পাঠাইয়া দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রগুলিকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে প্ররোচনা দিবার মাধ্যমে আকবর তাঁহার দাক্ষিণাত্যের কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু একমাত্র খান্দেশ ব্যতীত সমস্ত রাজ্যই কঠোরভাবে এইসব প্রতিনিধিদলকে প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং সম্রাট আকবর যুদ্ধের পন্থাই অবলম্বন করেন। আহমদনগর সর্বপ্রথম রাজকীয় বাহিনীর আঘাত সহ্য করে। ১৫৯৫ সালে দ্বিতীয় বুরহান-এর মৃত্যুর পর আহমদনগরে তখন অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছিল। সুলতান ইব্রাহিম দ্বিতীয় বুরহান-এর উত্তরাধিকারী হন এবং অনতিকাল পরেই তিনি নিহত হন। দ্বিতীয় বুরহান-এর কন্যা চাঁদ সুলতানা ইব্রাহিম-এর শিশুপুত্র বাহাদুরকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের অভিভাবক হিসাবে চাঁদ সুলতানা সমস্ত কার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অভিজাতবর্গ অন্য একজনকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। দাক্ষিণাত্য অভিজাতবর্গের সুলতান কোন স্থান না পাওয়ায় তাঁহারা মুঘলদিগকে হস্তক্ষেপ করিবার আহ্বান জানান। ১৫৯৫ সালে আব্দুর রহিম খান-ই-খানান ও যুবরাজ মুরাদকে প্রেরণ করা হয়। চাঁদ সুলতানা অতি বীরত্বের সাথে মুঘলদের প্রতিরোধ করেন। এই দিকে খান-ই-খানান ও মুরাদ-এর মধ্যে একটি বিবাদের ফলে তাহাদের অভিযান সাফল্য লাভ করে নাই। মুঘলরা সন্ধি করে এবং শুধু বেরার অধিকার করিয়াই সন্তুষ্ট হয়। এইভাবেই ১৫৯৬ সালে আহমদনগরের বিরুদ্ধে অভিযান শেষ হয়।

আহমদনগর চাঁদ সুলতানা

শান্তিচুক্তি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। আহমদনগরের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ পুনরায় আরম্ভ হয়। এই গোলযোগে চাঁদ সুলতানা নিহত হন। অধিকন্তু, বালক সুলতান বাহাদুর শাহ বেরার পুনরাধিকার করিতে চেষ্টা করেন। 'আসথি' নামক স্থানে এক যুদ্ধ হয় এবং ইহাতে উভয় পক্ষই বিজয়ী বলিয়া দাবি করে। মুঘল ও আহমদনগরের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সামরিক যুদ্ধ চলিতেই থাকে। অতএব, আকবর স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে আকবর বুরহানপুর অধিকার করেন এবং আহমদনগর জয় করিবার জন্য যুবরাজ ড্যানিয়েল ও আব্দুর রহিম খান-ই-খানানকে পাঠান। মুঘলদের জন্য ইহা এখন খুবই সহজ ব্যাপার। দুর্গের ১৫,০০০ সৈন্য হত্যা করিয়া তাহারা আহমদনগর অধিকার করেন।

দ্বিতীয় অভিযান

আসিরগড় ঃ খান্দেশ-এর নূতন শাসক মিরান বাহাদুর মুঘলদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখিতে অস্বীকার করেন। তৎকালীন বিশ্বের সুদৃঢ় ও শ্রেষ্ঠ অস্ত্রাগারপূর্ণ দুর্গগুলির অন্যতম দুর্গ আসিরগড়-এর উপর নির্ভর করিয়া তিনি মুঘলদের বশ্যতা অস্বীকার করিতে মনস্থ করেন। মুঘল বাহিনী ছয় মাস পর্যন্ত আসিরগড় দুর্গ অবরোধ করে। শেষ পর্যন্ত দুর্গের মধ্যে এক ভয়াবহ মহামারীর ফলে ২৫,০০০ লোক নিহত হয়। মিরান বাহাদুর-এর অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায় এবং এইভাবে ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে আসিরগড় দুর্গ মুঘলদের হস্তগত হয়। অতঃপর মুঘল সীমান্ত নর্মদা নদী হইতে কৃষ্ণা নদীর উপরের দিকে বিস্তৃতি লাভ করে।

খান্দেশ-এর পতন
বিজিত এলাকায় তাঁহার নীতি

বেরার, আহমদনগর ও খান্দেশকে আকবর তিনটি সুবায় বিভক্ত করেন। এই তিনটি সুবার অধিকার ছিল নামে মাত্র। দাক্ষিণাত্যে সরাসরি আধিপত্য বিস্তারকে তিনি খুবই দুরূহ ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য হইতে দূরে থাকিতে প্ররোচনা দান করে। সুতরাং দাক্ষিণাত্যের বশ্যতা স্বীকার লইয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। পূর্ববর্তী বংশগুলির সাথে জড়িত স্থানীয় কর্মকর্তাগণ গোলমাল করিতে আরম্ভ করে। রাজধানী হইতে এই অঞ্চলের দূরত্বও তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করে এবং মুঘলদের অসুবিধার সৃষ্টি করে।

আকবর-এর শেষ জীবন ঃ সম্রাট আকবর-এর শেষ জীবন অশেষ দুর্যোগের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়। প্রথমদিকে সম্রাট যখন আসিরগড় দুর্গ অবরোধ লইয়া ব্যস্ত, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিম বিদ্রোহ করেন এবং এলাহাবাদে স্বাধীন সম্রাট হিসাবে একটি স্বতন্ত্র রাজধানী স্থাপন করেন। সম্রাট তখন ঊনষাট বৎসরের বৃদ্ধ। তাঁহার স্বাস্থ্যে ভাঙন ধরিতে আরম্ভ করে। অতএব, সেলিম-এর পক্ষে এই কথা চিন্তা করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, সেই সময় তাঁহার পিতা মারা গেলে যুবরাজ ড্যানিয়েল এবং আকবর-এর প্রিয়পাত্র ও সেলিম-এর নিজ পুত্র খসরুর সঙ্গে উত্তরাধিকারের জন্য একটি সংগ্রাম ছাড়া তিনি সিংহাসন পাইবেন না। তাই আকবর দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সেলিম এক বিরাট বাহিনী লইয়া আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন।

যুবরাজ সেলিম -এর বিদ্রোহ
আবুল ফজলকে হত্যা

আকবর দাক্ষিণাত্য হইতে আবুল ফজলকে ডাকিয়া পাঠান। রাজধানীর পথে সেলিম-এর স্বার্থে আবুল ফজলকে হত্যা করা হয়। অকৃত্রিম ও প্রিয় বন্ধুর হত্যায় আকবর ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত হন। যাহা হউক, ১৬০২ সালের শেষদিকে যুবরাজ মুরাদ-এর মাতা সুলতানা সেলিনা বেগম সেলিম-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন।

১৬০৪ সালের প্রথমদিকে যুবরাজ ড্যানিয়েল প্রাণ ত্যাগ করেন। কিন্তু খসরু তখনও একজন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে অবস্থান করেন। যাহা হউক, আকবর সেলিমকে খুবই তিরস্কার করেন এবং ক্রমে ক্রমে উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁহাকে প্রিয়পাত্র করিয়া নেন। ১৬০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আকবর আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। তাহার চিকিৎসার সময় সেলিম ও খসরুর পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে একটি বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। মৃত্যুগামী সম্রাট সেলিমকে রাজমুকুট ও হুমায়ুন-এর তরবারি পরিধান করিতে ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এইভাবে সেলিম জনসাধারণ কর্তৃক আকবর-এর উত্তরাধিকারী বলিয়া

আকবর অসুস্থ
মৃত্যু ১৬০৫

স্বীকৃতি লাভ করেন। সেলিম-এর প্রস্থানের অনতিকাল পরেই ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর সম্রাট আকবর তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আকবর-এর শাসনব্যবস্থা

শাসনকার্যের ধারা ঃ সম্রাট আকবর-এর শাসনব্যবস্থার ধারা ছিল সামরিক, যাহা তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে লাভ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাহা বলবৎ রাখেন। ভি. এ. স্মিথ বলেন—'সমগ্র বা আংশিক ভারতে তাঁহার রাজ্য বিস্তারের জন্য বিজয়, এবং কোন এককালে তাঁহার পিতামহ কর্তৃক অধিকৃত মধ্য-এশীয় রাজ্য পুনর্দখল করাই ছিল তাঁহার নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য।'[৯] তিনি বুঝিতে পারেন এবং স্বীকার করেন, ভারতের সমগ্র জনসাধারণের সহযোগিতা ছাড়া বিজিত রাজ্যগুলির উপর কার্যকর আধিপত্য ও সম্পূর্ণ পুনর্গঠন অসম্ভব। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন সুসংঘবদ্ধ রাজ্য উত্তরাধিকার সূত্রে না পাওয়া সত্ত্বেও তিনি একটি সাম্রাজ্য গঠন করেন। যে শাসনব্যবস্থা তিনি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইল সম্পূর্ণভাবে সামরিক। রাজকার্যের প্রায় সমস্ত কর্মকর্তাই ছিলেন মূলত এক-একজন সেনাপতি।

সরকারের সামরিক প্রকৃতি

সম্রাট ঃ স্বেচ্ছাচারী (autocrat) হিসাবে স্বীকৃত সম্রাট নিজের ইচ্ছানুযায়ী সবকিছুই করিবার অধিকারী ছিলেন। একজন মুসলমান হিসাবে তিনি তাঁহার ধর্মীয় কর্তব্য অনুযায়ী কোরআন ও হাদিস মানিয়া চলিতে বাধ্য; কিন্তু কোরআনী আদর্শের বিরোধী কিছু করিলে তাঁহাকে বাধা দিবার মত কেউ ছিল না। তাঁহার সমগ্র রাজত্বকালে আকবর সর্বদাই কোরআনী আইনের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাঁহার কার্যকলাপের ফলে ১৫৮১ সালে একবার তাঁহার রাজত্ব সংকটাপন্ন হইয়া উঠে, কিন্তু সেই সংকট হইতে রেহাই পাইবার পর অবশিষ্ট জীবনে তিনি নিজের ইচ্ছা মতই সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন।

কোরআনী আইনের সীমাবদ্ধতা

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রধান মন্ত্রিবর্গ ছিলেন—

(১) উকিল বা প্রধানমন্ত্রী,

(২) উজির বা অর্থমন্ত্রী, কখনও কখনও তাহাকে দিওয়ানও বলা হয়,

(৩) প্রধান বখসি, যাহার কাজ ছিল সৈন্য বিভাগে লোক ভর্তি করা, তালিকা সংরক্ষণ করা, রাজপ্রাসাদের প্রহরী নিযুক্ত করা এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে সেনাধ্যক্ষদের স্থান নির্বাচন করা,

(৪) সদর বা সদর-উস-সদূর যাহার কাজ ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করা।

রাজত্বের শেষভাগে আকবর সদরের কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া সেই কাজ ছয়জন প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হাতে ছাড়িয়া দেন। এই চারিজন কর্মকর্তা ছাড়াও আরও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ছিলেন, যাহারা অনেক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এই ধরনের কোন পদ তাঁহাদের ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আবুল ফজলের যদিও এই ধরনের কোন পদ ছিল না, তবুও তিনি রাষ্ট্রীয় সচিবের ন্যায় কাজ করিতেন।

মন্ত্রিবর্গ

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ ঃ এক একজন শাসনকর্তার অধীনে সাম্রাজ্যকে বারোটি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি সুবায় ১০০টি সরকার বা জিলা থাকে। প্রত্যেকটি সরকারকে কতকগুলি পরগনায় বিভক্ত করা হয়। পরগনাগুলিকে মহলও বলা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আগ্রা সুবায় ১৩টি সরকার ও ২০৩টি পরগনা ছিল।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা ঃ ১৫টি প্রদেশ বা সুবার প্রত্যেকটি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিচ্ছবি। সুবাদারগণ প্রকৃতপক্ষে অসীম ক্ষমতা ভোগ করেন। শাসনব্যবস্থার ধারা ছিল সামরিক, সুতরাং সুবাদারদিগকে পরবর্তী যুগে সিপাহ্‌সালার বা প্রধান সেনাপতিও বলা হয়।

সুবাদার

প্রদেশের সেনাবাহিনী ও জনসাধারণ তাঁহার আজ্ঞাধীন এবং তাঁহার ন্যায়পরায়ণ শাসনকার্যের উপর তাহাদের সুখ-সুবিধা নির্ভর করে। অনেক ফৌজদারী মামলা-মোকদ্দমা সুবাদার স্বয়ং শুনেন এবং দ্রুত ও সংক্ষেপে ঐগুলির বিচার করিয়া দেন। বিচার বিভাগীয় কার্যকলাপে শাসনকর্তা কাজীর সাহায্য লাভ করেন।

ফৌজদার

সরকারের শাসনকর্তাকে ফৌজদার বলা হয়। তিনি সুবাদারের প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার দায়িত্ব ছিল বিদ্রোহীদের দমন করা এবং উচ্ছৃংখল গ্রামবাসীদিগকে সরকারি খাজনা আদায় করিতে বাধ্য করা।

কোতয়াল

শহরে বিভিন্ন অপরাধ দমন করা, জনসাধারণের মধ্যে শৃঙ্খলা ও শালীনতা বজায় রাখা এবং আধুনিক পুলিশের যাবতীয় কার্যাবলির ভার ন্যস্ত করা হয় কোতওয়ালের উপর। কোতওয়ালের অবর্তমানে রাজস্ব আদায়কারী কর্মকর্তা পুলিশের ভার গ্রহণ করেন। আইন অমান্যকারীর শাস্তি হিসাবে কোতওয়াল বিভিন্ন শাস্তি প্রদান করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ করিতে পারেন। আকবরের নূতন আইন পালন লক্ষ্য করাও ছিল কোতওয়ালের কর্তব্য।

সামরিক শাসনব্যবস্থা ঃ রাষ্ট্রীয় খরচে আকবর একটি বৃহদাকারের নিয়মিত সামরিক বাহিনী পালন করেন নাই। তাঁহার সামরিক শক্তির উৎস ছিল স্বায়ত্তশাসিত রাজা বা উচ্চপদস্থ রাজকীয় পদের কোন কর্মকর্তার দ্বারা রক্ষিত ও পরিচালিত অনিয়মিত সেনাবাহিনীর দল। কিন্তু সেনাবাহিনী রক্ষা করিবার জন্য যেসব পদস্থ কর্মচারীদিগকে তিনি নিজে নিয়োগ করেন, সেইগুলির উপরই তিনি অধিক নির্ভর করেন। তাহাদের প্রত্যেককে হস্তীযূথ ছাড়াও একটি নিয়মিত সংখ্যার লোকজন সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিতে হইত এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি সরবরাহ করিতে হইত।

সশস্ত্রবাহিনী চারিভাগে বিভক্ত ছিল, যথা—পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও নৌবহর। পদাতিক বাহিনীর উপর প্রকৃতপক্ষে খুব বেশি নির্ভর করা হইত না। ইহার মধ্যে ছিল পায়ে চলা সৈনিক, যানবাহন বাহক, পল্টনের ভৃত্য প্রভৃতি। তাহা ছাড়াও ছিল দারওয়ান, খেদমতগার, পাহ্‌লোওয়ান ও পাল্কিবাহকগণ। তাহাদের মধ্যে যোদ্ধারা তরবারি ও ছুরিকা সঙ্গে রাখিত। সম্রাট বাবর উত্তর ভারতে বিপুল পরিমাণে গোলন্দাজ বা তোপখানা কার্যকর করেন। আকবর স্বয়ং কারিগরি বিদ্যায় একজন পারদর্শী ছিলেন এবং প্রাথমিক

পদাতিক
গোলন্দাজ
নৌবহর

মুঘল গোলন্দাজ বাহিনীর ভারি ভারি কামানগুলিকে তিনি অনেকাংশে হাল্কা করেন। অতি সহজে খুলিয়া ফেলা যায়—এই ধরনের কামান প্রস্তুত করিয়া গোলন্দাজ বাহিনীর তৎপরতা বহুলাংশে বর্ধিত করা হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ও অবরোধ কার্যে এইগুলির বহুল ব্যবহার সম্ভব করা হয়। গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তাকে বলা হয় 'মীর আতিশ' বা 'দারোগা-ই-তোপখানা। তিনি একজন পাঁচহাজারী মনসবদারও ছিলেন। মীর আতিশের সাহায্যকারী ছিলেন মুশরিফ। মুঘলদের কোন নৌ শক্তি ছিল না। তবুও জাহাজ ও নৌকা নিয়ন্ত্রণকারী একটি নৌবিভাগ (নৌবহর) মুঘলদের

আকবরের সাম্রাজ্য (১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ)
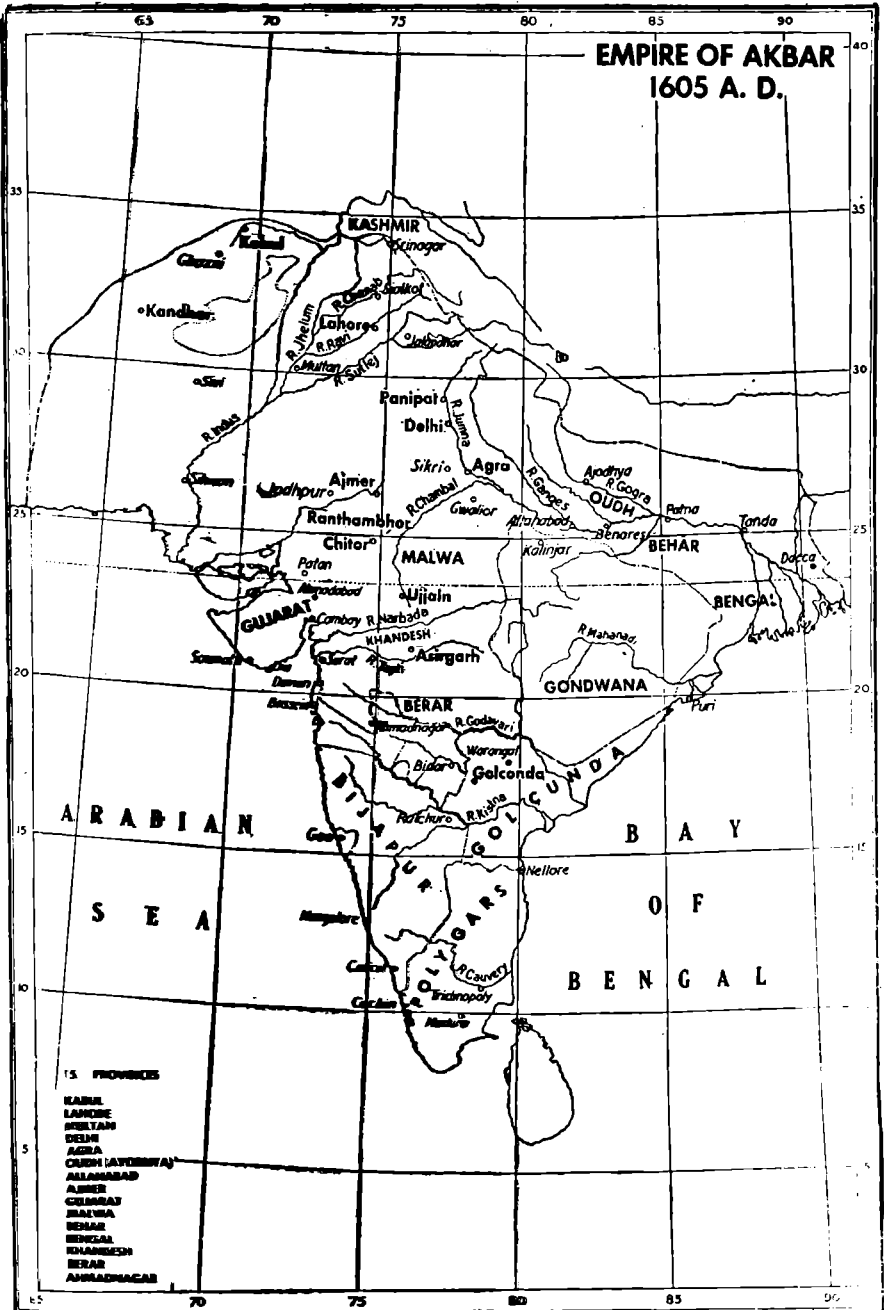
ছিল। যুদ্ধে লিপ্ত সেনাবাহিনীকে সাহায্য করাই ছিল ইহার কাজ। যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম বহন করা ছিল ইহার প্রধান কাজ। এই বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে বলা হইত 'আমির-ই বহর'।

মনসবদারী প্রথা ঃ

মনসবদারী প্রথাটি অশ্বারোহী বাহিনীর একটি সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহাই ছিল মুঘলদের সামরিক ও বেসামরিক শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি। পারস্য হইতে ধার করা এই প্রথাটি সম্রাট আকবর এই দেশে চালু করেন। 'মনসব' শব্দের অর্থ হইল পদ বা অফিস। ঐতিহাসিক ইরভিনের মতানুসারে, এই প্রথার উদ্দেশ্য ছিল অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও বেতন নিরূপণ করা।

ঘোড়সওয়ার বা অশ্বারোহী

আকবর তাঁহার কর্মকর্তাদিগকে ১০ হইতে ১০,০০০ মনসবদারের মধ্যে ৩৩টি পদে বিভক্ত করেন। ১০ এর মনসবদারের অর্থ হইল, যে মসনবদার ১০টি ঘোড়া পোষণ করেন। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে এই ধরনের মনসবদার বা কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল ১৬০০। তাঁহাদের নিয়োগ, কাজে বহাল, পদোন্নতি ও বরখাস্ত হওয়া সম্পূর্ণভাবে সম্রাটের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ১০,০০০ ও ৮,০০০-এর মনসবদারী রাজকীয় পদবীর যুবরাজদের জন্য সুনির্দিষ্ট করা হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর মনসবদারদের জন্য এইসব বাঁধাধরা হারের বেতন নির্দিষ্ট করা হয়, যাহার মধ্য হইতে সেই মসনবদার তাঁহার ভাগের ঘোড়া, হাতি, ভারবাহী জন্তু ও গাড়ির খরচ বহন করেন।

জাত ও সাওয়ার ঃ 'জাত' অর্থ হইল কেবল মনসবদারের পোষণ করা সত্যিকার অশ্বারোহীর সংখ্যা এবং 'সাওয়ার' অর্থ হইল সেই মনসবদারের সত্যিকার অশ্বারোহী পোষণ ছাড়াও যে সমস্ত বাড়তি অশ্বারোহী তিনি পোষণ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ ক ৫,০০০ অশ্বারোহীর মনসবদার। সুতরাং ৫,০০০ অশ্বারোহী পোষণ করা বাবদ খরচ তিনি পাইবেন। এই ৫,০০০ অশ্বারোহীকে বলা হয় 'জাত' বা মূল সংখ্যা। অতঃপর 'ক' যদি আরও ৫০০ অশ্বারোহী বাড়তি পোষণ করেন, তবে এই বর্ধিত সংখ্যাকে বলা হয় 'সাওয়ার'। কিন্তু 'ক' কে ৫,০০০ হাজারী মনসবদারই বলা হয়। বেতনের ব্যাপারে তিনি ৫,৫০০ অশ্বারোহীর বেতনই পান, যদিও তাঁহার পদ পাঁচ হাজারী মনসবদার। ভি. এ. স্মিথের মতানুসারে, কোন কর্মকর্তা তাঁহার আসন সংখ্যা বা 'জাত' এর বেতন ছাড়াও একটি বর্ধিত সংখ্যা বা 'সাওয়ার' যোগ করিতে ও বেতন নিতে পারিতেন।[১০] ব্লকম্যান বলেন, 'জাত' শব্দের দ্বারা বুঝায় যেই সংখ্যার অশ্বারোহী একজন মনসবদার কর্তৃক পোষ্য সত্যিকারের অশ্বারোহীর সংখ্যা।[১১] ইরভিন বলেন, সাধারণত একজন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত সৈন্যের সংখ্যার সঙ্গে 'সাওয়ার' পদের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা ছিল একটি সম্মানবিশেষ, এবং 'জাত' এর উপরি রক্ষিত অশ্বারোহীর সত্যিকার সংখ্যাই ইহা দ্বারা নির্ণয় করা হইত।[১২] ডঃ ত্রিপাঠীর মতামত আরও ব্যাপক। তিনি বলেন, সাওয়ার পদ দ্বারা একটি বর্ধিত সম্মান বুঝায় মাত্র এবং ইহার দ্বারা বর্ণিত সংখ্যক অশ্বারোহী পোষণ করা ঐ মনসবদারের জন্য অবশ্য কর্তব্য ছিল না।[১৩]

সম্রাট আকবরের সময় তিন শ্রেণীর মনসবদার ছিল। যদি কোন মনসবদারের জাত ও সাওয়ার পদের সৈন্যসংখ্যা সমান সমান হয়, তবে তাহাকে প্রথম শ্রেণীর মনসবদার বলা হয়। যদি সাওয়ার পদের সৈন্যসংখ্যা জাত পদের অর্ধেক হয়, তবে তাহাকে বলা হয় দ্বিতীয়

মনসবদারদের শ্রেণীবিভাগ

শ্রেণীর মনসবদার। যদি সাওয়ার পদের সংখ্যা জাত পদের অর্ধেকেরও কম হয় বা সাওয়ার পদ বলিতে কিছু থাকিত না, তবে তাহাকে বলা হয় তৃতীয় শ্রেণীর মসনবদার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঃ

জাত	সাওয়ার	শ্রেণী
১০০০	১০০০	প্রথম শ্রেণী
১০০০	৫০০	দ্বিতীয় শ্রেণী
১০০০	০০	তৃতীয় শ্রেণী

১০ হইতে ৫০০ পর্যন্ত পদের সরকারি উপাধি ছিল 'মনসবদার'। ৫০০ হইতে ২৫০০ পর্যন্ত পদের সরকারি উপাধি ছিল 'ওমারা' বা 'ওমরাহ্' এবং তাঁহাদের উপরের পদের উপাধি ছিল 'আমির-ই-আজম'। সময় সময় কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে 'আমির-উল-ওমারার' পদ প্রদান করা হইত।

সরকারি উপাধি

মনসবদারী প্রথার অনেক সুফল ছিল। এই ব্যবস্থার ফলে একটি ব্যাপক কেন্দ্রীয় সংস্থা ছাড়াই সম্রাট এক বিরাট বাহিনী রাখিতে সক্ষম হন। মনসবদারগণ তাঁহাদের বাহিনী লইয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া থাকেন। ফলে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা খুবই সহজ হইয়া উঠে। আঞ্চলিক গোলযোগসমূহ স্থানীয় মনসবদারদের দ্বারা অতি সহজে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। অধিকন্তু, জরুরি অবস্থার সময় অতি দ্রুত এক বিরাট বাহিনী জোগাড় করার জন্য শুধু একটি সরকারি আদেশপত্রের প্রয়োজন হয়। কর্মকর্তা ও সৈন্যদের যোগ্যতাও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। কারণ, উপাধি ও পদমর্যাদা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাদের বীরত্বের উপর নির্ভরশীল থাকে।

এই প্রথার দোষ গুণ

কিন্তু এই প্রথার কিছু কুফলও ছিল। ভি. এ. স্মীথ বলেন, "সমস্ত পদাধিকারিগণ আইনগতভাবে ফাঁকি দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।"[১৪] এ. এল. শ্রীভাস্তভ বলেন, "লক্ষণীয় যে, মনসবদার প্রথা প্রবর্তনের কয়েক বছর পর পর্যন্ত বিভিন্ন পদের মনসবদারগণ তাঁহাদের নির্ধারিত সংখ্যার অশ্বারোহী একত্র করিতে ব্যর্থ হন।"[১৫]

সম্রাটের প্রতি সৈন্যদের বশ্যতা ছিল পরোক্ষ। সুতরাং তিনি বিশেষভাবে মনসবদারদের উপরই নির্ভরশীল থাকেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কোন সেনাধ্যক্ষের মৃত্যু সৈন্যদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করে এবং পলায়নের জন্য ইহা একটি লক্ষণ হিসাবে পরিগণিত হয়। বিভক্ত সেনাপরিচালনার দ্বারা সৈন্যদের সাফল্য অনেকাংশে ব্যাহত হয়।

দাখিল ও আহাদিস সেনাদল ঃ রাষ্ট্র কর্তৃক কিছু সংখ্যক সৈন্য সরাসরি ভর্তি করা হয় এবং কোন কোন মনসবদারের অধীনে ঐগুলিকে ন্যস্ত করা হয়। এই সমস্ত সৈন্যদিগকে 'দাখিল' বলা হয়। তাহারা কোন বিশেষ মনসবদারের অধীনে থাকিলেও রাষ্ট্র হইতেই তাহাদিগকে বেতন দেওয়া হয়। আরেক শ্রেণীর সৈন্যদলকে রাষ্ট্র সরাসরি নিযুক্ত করে এবং আলাদা একজন আমিরের অধীনে ন্যস্ত করে, তাহাদিগকে বলা হয় 'আহাদিস'।

রাজস্ব শাসনব্যবস্থা ঃ "সমস্ত আদান-প্রদান অর্থের উপর নির্ভরশীল, অতএব কোষাগারের প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া উচিত"—ইহাই ছিল আকবরের রাজস্বব্যবস্থার মূলনীতি। সত্যিকারের রাজত্ব আরম্ভ করিবার পর হইতে সম্রাট আকবর তাঁহার মূল দায়িত্বসমূহ গভীরভাবে চিন্তা করেন। বলা বাহুল্য, ভূমি

শের শাহ্ আকবরের পথ প্রদর্শক

রাজস্বের ব্যাপারে শের শাহ্ আকবরের পথ প্রদর্শক ছিলেন। শের শাহ্ উৎপন্ন দ্রব্যের এক তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করেন এবং সমানভাবে ভূমি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন। প্রয়োজনীয় রদবদল দ্বারা আকবর এই নীতিই গ্রহণ করেন। সময়ের অভাবে শের শাহ্ তাঁহার ব্যবস্থাসমূহ শক্তিশালী করিতে পারেন নাই। আকবর এখন সেই নীতি উন্নত ও পূর্ণাঙ্গ করেন।

সর্বপ্রথম অর্থমন্ত্রীদ্বয় খাজা আবদুল মজিদ ও মুজাফ্ফর তুরবাতি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারের চেষ্টা করেন। রাজা টোডর মল শের শাহের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ভূমি রাজস্বের একটি উন্নত ধরনের বন্দোবস্ত বা কর নির্ধারণ করেন। জমির মাটির শ্রেণীবিভাগ, নূতন পত্তনি বা পুরাতন জমির সঠিক হিসাব লইয়া তিনি এই কর নির্ধারণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে কী পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইল এবং উহার বর্তমান মূল্য কি তাহাও বিবেচনা করা হয়। এইভাবে তিনি রাজকীয় রাজস্ব বৃদ্ধি করেন এবং চাষীদিগকে বেশ নিরাপত্তা প্রদান করেন। পূর্বে শণের দড়ি দিয়া জমি মাপা হইত। ইহার দ্বারা নির্ভুল মাপ পাওয়া যাইত না, তাই বাঁশের একটি মাপনি গ্রহণ করা হয় এবং বাঁশের প্রান্তগুলিকে লোহার আংটি দ্বারা বেড় বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

মাপনি

ভূমিগুলিকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। (১) যে জমি নিয়মিত চাষ করা হয় ও বাৎসরিক কর প্রদান করে, সেগুলিকে বলা হয় পোলাজ; (২) যে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিবার জন্য মাঝে মাঝে চাষ বন্ধ করা হয় সেগুলিকে বলা হয় পরোতি জমি; (৩) যে জমিতে তিন বা চারি বৎসর চাষ বন্ধ রাখা হয়, উহাকে বলা হয় চাছার জমি; (৪) যে জমিতে পাঁচ বা ততোধিক বৎসর চাষ বন্ধ রাখা হয়, উহাকে বলা হয় বান্‌জার জমি।

ভূমির শ্রেণীবিভাগ

আকবরের সময় তিন ধরনের রাজস্ব পদ্ধতি চালু করা হয়, যথা ঃ (১) গালাবক্স। শস্যের শ্রেণীবিভাগের দ্বারা কর নির্ধারণের এই নীতি হইল প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি। থাট্টা বা সিন্ধুর নিম্নভাগে এবং কাবুল ও কাশ্মীরের কিয়দংশে এই পদ্ধতি চালু ছিল। (২) জাবতি। এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্র চাষীদিগকে অগ্রিম ঋণ প্রদান করে এবং চাষীরা তাহা বাৎসরিক অতি সহজ কিস্তিতে আদায় করে। মন্দ মৌসুমে কৃষকদের কর মওকুফ করা হয়। রাজস্ব আদায়কারীরা তাহাদের নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের কার্যকলাপ, চরিত্র ও ন্যায়পরায়ণতার সার্বিক বিবরণী প্রদান করিতে হইত। প্রত্যেকবার পরিশোধের জন্য কৃষকদিগকে রসিদ প্রদান করা হইল কিনা, তাহাও তাহারা পরীক্ষা করিত। সমস্ত কৃষকদের যাবতীয় সম্পত্তি ও দায়িত্বসমূহের একটি তালিকা রাখিতে হইত। কৃষকদের স্বেচ্ছা পরিশোধকে উৎসাহ প্রদান করা হইত। পরগনার কাঙ্ক্ষিত সমস্ত জমির জরিপ করিয়া রাখা অবশ্য কর্তব্য ছিল। হিসাবপত্র ফারসি ভাষায় লিপিবদ্ধ রাখা হইত, হিন্দিতে নহে। এই ধরনের যাবতীয় পদ্ধতি বিহার, এলাহাবাদ, লাহোর, মুলতান, দিল্লী, আগ্রা, অযোধ্যা, মালব ও গুজরাটের কিয়দংশে প্রচলিত ছিল। (৩) নাসাক। এই পদ্ধতি অনুসারে রাজস্ব উসূল জরিপ বা উৎপন্ন দ্রব্যের মৌসুমী বিবরণীর উপর নির্ভর করে না। ইহার সঙ্গে জমিদারি প্রথার খুব সাদৃশ্য দেখা যায়। কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। এই পদ্ধতি বিশেষভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল।

রাজস্ব পদ্ধতি
১। গালাবক্সা
২। জাবতি
৩। নাসাক

চাষীরা বাৎসরিক নির্ধারিত কর আদায়ের জন্য দায়ী ছিল। উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় কর

আদায় করিবার পাঁচটি পন্থা ছিল এবং চাষীদিগকে যে কোন এক পন্থায় কর আদায় করিবার সুযোগ দেওয়া হইত। কিন্তু ইক্ষু ও পোস্তগাছের মত অধিক মূল্যবান দ্রব্যের জন্য নগদ কর আদায় করা হইত। শস্য কাটিবার সময় আসিলে শস্যের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য একজন সরকারি কর্মকর্তা সমস্ত এলাকা প্রদক্ষিণ করিতেন। প্রত্যেক জমির উৎপন্ন শস্য মাপিয়া 'বিতিখসি' নামক একজন কর্মচারী কর নির্ধারণ করিয়া দিতেন এবং কী অংকের রাজস্ব হইবে তাহাও স্থির করিয়া দিতেন। আকবরের রাজস্ব পরিমাণ যদিও কঠোর ছিল না, কিন্তু তাহা আবার অতি হাল্কাও ছিল না। তাহা সত্ত্বেও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত আকবরকে জনসাধারণের পিতা বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, তিনি ভারতের জনসাধারণকে এমন একটি রাজস্ব পদ্ধতি প্রদান করেন, যাহা শুধু স্থায়ীই ছিল না, বরং জনসাধারণ তাহা বুঝিতেও পারিত। রাষ্ট্রের দাবিকৃত কর নির্ধারিত থাকায় কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না এবং ফলে এই পদ্ধতি সাফল্য লাভ করে এবং জনগণের উন্নতি সাধন করে।

রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীবৃন্দ ঃ সহজ উপায়ে রাজস্ব আদায়ের জন্য মুঘল রাজ-সরকার অনেক কর্মচারী নিযুক্ত করে। আমিল ছিলেন রাজস্ব বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। তাঁহার কার্যে সহায়তা করিতেন বিতিখ্‌সি, পোদ্দার, কানুনগো, মুকাদ্দম ও পাটওয়ারী। তিনি সত্যিকারের চাষকৃত জমির গুণাগুণ নির্ধারণ করিতেন ও পতিত জমি আবাদ করিতেন। জমি জরিপের সময় এক বিঘা জমিও যাহাতে লুক্কায়িত বা অলক্ষে থাকিয়া না যায়, তাহা দেখাশুনা করা ছিল তাঁহার কর্তব্য। কোষাধ্যক্ষ চাষীদের নিকট হইতে কোন উপরি রোজগার করিতে পারিত না। পাটওয়ারী, মুকাদ্দম ও কারকুনদের তৈরি জরিপের তালিকা আমিল পরীক্ষা করিতেন।

আমিল

বিতিখ্‌সির মর্যাদা প্রায় আমিলের মতই। তিনি কানুনগোদের কার্য তদারক করিতেন। বিতিখসিকে একজন হিসাবনবীশ ও লেখক হওয়া এবং তাঁহার অধীনস্থ এলাকায় প্রচলিত আইন-কানুনের উপর দখল থাকাটা অবশ্য কর্তব্য ছিল। চাষাড়ে ও অনাবাদি জমি এবং জমির আয়-ব্যয়ের নির্ধারিত বিবরণী তিনি তৈরি করিতেন।

বিতিখ্‌সি

পোদ্দার বা মিজানদার কৃষকদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া উহার রসিদ প্রদান করিতেন। পরগনার কর্মকর্তাকে বলা হইত 'কানুনগো', যিনি গ্রামের সমস্ত রীতিনীতি ও কৃষকদের যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে অভিজ্ঞ থাকিতেন। স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, "কানুনগো ছিলেন প্রচলিত আইন ও প্রথার ভ্রাম্যমাণ অভিধান এবং জমির পূর্ব ইতিহাসের নিয়ম পদ্ধতি ও পূর্ব ব্যবস্থার তথ্যাবলির ভাণ্ডার।"[১৬] কানুনগোদের নিচে প্রত্যেক গ্রামের জন্য একজন মুকাদ্দম ও একজন পাটওয়ারী ছিলেন। মুকাদ্দম গ্রামের রাজস্ব আদায়ে সাহায্য করিতেন।

পোদ্দার
কানুনগো
মুকাদ্দম ও পাটওয়ারী

আকবরের ধর্ম ঃ

অবিশ্বাস ও সন্দেহের মধ্য দিয়া আকবরকে তাঁহার ধর্মনীতি নির্ধারণ করিতে হয়। তাঁহার রাজত্ব ছিল পুরাতন ও নূতন ব্যবস্থার মধ্যবর্তীকাল। ভারতের পূর্ববর্তী মুসলিম নৃপতিগণ একটি শিক্ষাব্যবস্থা রাখিয়া যান। ভারতে তাহাদের আধিপত্য ও সরকারকে অনেকটা ভাসমান মনে হয়। বংশগুলি সন্দেহজনকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও ভূলুণ্ঠিত। মুসলিম শাসকদের

নাম-ধাম সম্পর্কে হিন্দু জনসাধারণকে বেশ উদাসীন বলিয়া মনে হয়, কারণ তাহারা ইহাদিগকে বিদেশী বলিয়া মনে করে। অতএব, সুলতানদের উত্থান বা কোন বংশ পরিবর্তনে হিন্দুরা সাধারণত বিশেষ মাথা ঘামাইত না। এই ব্যাপারটি আকবরকে বিশেষভাবে মর্মাহত করে। আকবর অসাধারণ কল্পনা শক্তি ও কর্মক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, যে গুণ তাঁহার পূর্বপুরুষদের মধ্যে ছিল না। তাঁহার পিতামহ বাবরের ন্যায়, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে আকবর দুঃসাহসী কার্যকলাপ পছন্দ করিতেন এবং সরকারি ব্যবস্থায় বিভিন্ন পরিকল্পনায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে প্রস্তুত ছিলেন। তাহা ছাড়া আকবর একটি অদ্ভুত ধর্মীয় স্বভাব ও গভীর কৌতূহলী মনের অধিকারী ছিলেন। এই সংমিশ্রণ তাঁহাকে ধর্মীয় গোঁড়ামি হইতে রক্ষা করে। অপরদিকে শিয়া ও সুন্নিদের মতবিরোধ গোঁড়া সুন্নিদিগকে দুর্বল করিয়া দেয়, যাহার ফলে আকবরের ধর্মীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। হিন্দু রাজকুমারীদের সাথে তাঁহার বিবাহের ফলে তাঁহার উদার নীতির পথ সুগম হয়।

পূর্ববর্তী মুসলিম রাজাদের শিক্ষা
তাঁহার কল্পনা প্রবণতা ও দুঃসাহসিতা প্রীতি
তাঁহার কৌতূহলী মন

সম্রাট আকবরের কৌতূহলী স্বভাবও তাঁহাকে সহায়তা করে। তাঁহার পূর্বপুরুষদের ধর্মকে তিনি শুধু প্রচার ও কার্যকরী করিতেই চেষ্টা করেন নাই, বরং ইহাকে তিনি বুঝিতেও চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'উপাসনা ঘর' বা ইবাদতখানা স্থাপন করেন এবং সেখানে ধর্মীয় আলোচনার ব্যবস্থা করেন। ধর্মতত্ত্ববিদ, পণ্ডিত, আইনশাস্ত্রে বিদ্বান, সর্বশ্রেণীর সুফী ও তাঁহার কর্মকর্তাগণ সবাই এখানেই আসেন। আলোচনা আরম্ভ হইলে দেখা গেল, রক্ষণশীল আলেমগণ নিজেদের মধ্যে বিভক্ত। শুধু সিদ্ধান্তের ব্যাপারেই নহে, বরং মৌলিক ব্যাপারেও মতবিরোধ দেখা দেয়। একে অন্যের মতামতকে ভুয়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। মোল্লাগণ একে অপরকে বোকা ও ধর্মচ্যুত বলিয়া আখ্যায়িত করেন। নিজেদের কলহের ফলে মুসলমান আলেমগণ নিজেদেরকে অকাট্য বলিয়া স্বীকার করেন না। রক্ষণশীল দলের এই ধরনের প্রতিনিধিগণ স্বভাবতই সম্রাটকে মুগ্ধ করিতে ব্যর্থ হন এবং ফলে তাঁহারা নিজেদের একান্তভাবে রক্ষা করিবার দাবি করিতেও ব্যর্থ হন। যাহা হউক, এই ব্যাপারটি হয়ত প্রকটভাবে ধরা হইত না, যদি না আকবর শেখ মুবারক, আবুল ফজল ও ফৈজীর মধ্যে একজাতীয় তিনটি ব্যক্তির সন্ধান পাইতেন, যাহারা এইসব পণ্ডিতদিগকে তাহাদের নিজস্ব মতামতে মোকাবিলা করিতে পারিতেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভুলিলে চলিবে না, তাঁহারা হয়ত আকবরের এই নূতন পরিকল্পনায় উৎসাহ দান করেন। কিন্তু এই পথ তাঁহারা আকবরের জন্য নির্ধারিত করেন নাই। ইতোপূর্বেই আকবর তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে দরবারে আমন্ত্রণ জানাইবার পূর্বেই তাঁহার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন।

ইবাদত খানা

ভারতের তৎকালীন ধর্মীয় অবস্থাও আকবরের ধর্মনীতির উদ্ভাবনে সহায়তা করে। হিন্দু-ভারত তখন জীবনী শক্তিতে সতেজ। এক দেবতার উপাসনায় ধর্ম তখন কতিপয় বিশিষ্ট লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং তাহারা এই ধর্মমতের বহুল প্রচারে নিজেদেরকে নিয়োজিত করিয়াছেন। জনসাধারণের ধর্মীয় মতামত তখন বিগলিত হওয়ার পথে। ভক্তি আন্দোলনের নেতাগণ তখন এমন একটি স্বর্গীয় ভ্রাতৃত্ব গঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, যদ্দারা তাঁতী, পাচক, কৃষক ও ব্যবসায়ীরা উচ্চবর্ণের

ভারতের তৎকালীন ধর্মীয় অবস্থা

লোকদের সাথে কোলাকুলি করিবার সুযোগ পায়। এই ধরনের একটি অবস্থার মধ্যেই হিন্দু পণ্ডিতগণ সম্রাটের নিকট হিন্দু রাজকুমারীদের বিবাহে সম্মতি প্রদান করেন এবং হিন্দু রাজাদের সঙ্গে আকবরের আত্মীয়তার দ্বারা সকল মতামতের হিন্দু পণ্ডিতবর্গকে রাজকীয় দরবারে ধর্মীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে সহায়তা করে।

ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজদের অবস্থিতির ফলে সম্রাট তাহাদের ধর্মীয় প্রতিনিধি লাভ করেন। পারসী ধর্মাবলম্বীদিগকেও এই আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হয়।

পর্তুগীজগণ পারসীগণ

সম্রাটের উপস্থিতিতে হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান ধর্মশাস্ত্রবিদদের প্রাণখোলা আলোচনার ফলে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

উপরে বর্ণিত সমস্ত ঘটনাবলি আকবরের নূতন ধর্মীয় নীতি উদ্ভাবনে সক্রিয়ভাবে কাজ করে। এই সমস্ত কারণসমূহের অনেকগুলিই তাঁহার স্বাভাবিক উদারতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দ্বারা তিনি উত্থাপন করেন। এই কথা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই যে, একটি সমগ্র ভারতীয় সাম্রাজ্য গঠনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই তিনি তাঁহার ধর্মীয় নীতির নূতন রূপ দান করেন। তিনি যদিও মনে-প্রাণে ছিলেন একজন খাঁটি সাম্রাজ্যবাদী, কিন্তু তবুও তাঁহার প্রত্যেকটি কাজে তিনি যথেষ্ট উদারতার প্রশ্রয় দান করেন।

তাঁহার ধর্ম নীতি ছিল তাঁহার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা মাত্র

নীতি ঃ

(১) উদারনীতির অনুসারী হিসাবে ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে আকবর অমুসলিমদের উপর হইতে জিজিয়া কর উঠাইয়া দেন। জিজিয়া কর থাকাকালীন মুসলিমরাই ছিল দেশের সত্যিকারের নাগরিক। হিন্দুদের নাগরিকত্ব জিজিয়া কর প্রদানের উপর নির্ভর করে। এই করের বিনিময়ে তাহারা সাধারণ নাগরিকের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করে।

জিজিয়া কর রহিত

(২) অমুসলিমদের প্রকাশ্য ধর্মীয় কার্যাবলির উপর হইতে তিনি সমস্ত বিধি-নিষেধ উঠাইয়া দেন। ১৫৬৩ সালে তীর্থকর বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অমুসলিমদের সাধারণ উপাসনালয় নির্মাণের উপর হইতে সমস্ত নিষেধাজ্ঞাও তিনি প্রত্যাহার করেন। পূর্বে হিন্দুরা তাহাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহ কাহাকেও দেখাইত না, কিন্তু আকবর সেই প্রথা বাতিল করিয়া দেন। সমস্ত হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থগুলিকে ফার্সিতে অনুবাদ করিবার জন্য তিনি একটি অনুবাদ বিভাগ স্থাপন করেন।

অমুসলিমদের উপর হইতে ধর্মীয় কড়াকড়ি রহিত

(৩) পূর্ববর্তী সুলতান বা সম্রাটদের আমলে ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারীদের অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু আকবর এই আইন বর্জন করেন এবং হুকুম জারি করেন যে, জনগণ ইচ্ছা করিলে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য যে কোন ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে।

ধর্মান্তর আইন জারি

(৪) আকবর গরু জবাই করা নিষিদ্ধ করিয়া দেন, কারণ, ইহা সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের মর্মে আঘাত করে। একমাত্র হিন্দু জনগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই আকবর এই পন্থা অবলম্বন করেন। হিন্দুরাও এখন আকবরের সমর্থনে সবাই সংঘবদ্ধ হয়।

গরু জবাই নিষিদ্ধ

সামাজিক সংস্কার ঃ সম্রাট আকবর যদিও ধর্মীয় ব্যাপারে সহিষ্ণু ছিলেন, কিন্তু যে প্রথাকে তিনি মন্দ বলিয়া মনে করিতেন, উহা তিনি কিছুতেই বরদাশত করিতেন না। জনহিতকর কাজে এবং শাসনকার্যের উন্নয়নে তাঁহার কোন পরিকল্পনাকে

গোঁড়া হিন্দু বা মুসলিমরা তাহাদের ধর্মীয় কাজে হস্তক্ষেপ মনে করিলেও তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। এই উদ্দেশ্যে তিনি বাল্য বিবাহ বন্ধ করিয়া দেন, যদিও ইহা হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মেই বৈধ ছিল। হিন্দুদের মধ্যে তিনি বিধবা বিবাহ চালু করেন। যুবতী হিন্দু বিধবাগণ কর্তৃক তাহাদের স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জন দেওয়ার প্রথা তিনি বন্ধ করিয়া দেন। সতীদাহ প্রথা তিনি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিতে না পারিলেও আকবর ঘোষণা করেন, হিন্দু যুবতী বিধবাদিগকে এই ব্যাপারে বলপ্রয়োগ করা যাইবে না। চাচাত-মামাত ভাই-বোন ও নিকটআত্মীয়ের সাথে বিবাহ তিনি বন্ধ করিয়া দেন, যদিও মুসলিম আইনে ইহা বৈধ। অনুরূপভাবে অতি অল্পবয়সের ছেলেদের খত্‌না করাইবার প্রথাও তিনি নাকচ করিয়া দেন। মদ্যপানের অপকারিতা তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার পরিবর্তে ইহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ করিয়া এবং ইহার কুপ্রবৃত্তিকে পরিহার করিয়া তিনি মাঝামাঝি একটি পন্থা অবলম্বন করেন। মাতলামির জন্য শাস্তি ও বিশৃঙ্খলা কার্যকলাপের জন্য জরিমানার বন্দোবস্ত করা হয়। পতিতাবৃত্তি বন্ধ করিবার জন্যও তিনি অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করেন। এই উদ্দেশ্যে একজন কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয় এবং কেউ বেশ্যালয়ে গমন করিতে চাহিলে তাহার নাম-ধাম ঐ কর্মকর্তার নিকট প্রদান করিতে হইত। ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করিবার জন্যও আকবর যথেষ্ট চেষ্টা করেন। ইহাদের জন্য তিনি তিনটি মহল স্থাপন করিয়া বিনা পয়সায় খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ
বিধবা বিবাহের অনুমতি প্রদান
সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে
চাচাত ও মামাত বোন ও নিকটাত্মীয়ের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ
ভিক্ষাবৃত্তি রোধের চেষ্টা

অখণ্ডনীয় মীমাংসা (Decree of Infallibility) : ১৫৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেখ মুবারক একটি দলিল আকবরের নিকট পেশ করেন, যদ্দারা সম্রাট রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপের একচ্ছত্র কর্ণধার হইয়া যান। 'ইমাম-ই-আদিল' বা অন্য কথায় মুসলিম আইনের চূড়ান্ত মীমাংসাকারী হিসাবে তাঁহাকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। মখদুম-উল-মূলক, শেখ আবদুন নবী, সাম্রাজ্যের প্রধান মুফতি সদর জাহান, প্রধান কাজী জালালুদ্দিন, সেই যুগের প্রখ্যাত লেখক শেখ মুবারক ও গাজী খান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এই দলিলে স্বাক্ষর করেন। সুতরাং সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা দুইজন বিখ্যাত লেখকের দস্তখত সম্বলিত এই ঘোষণাপত্রটি যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হইয়া যায়। ভি. এ. স্মিথ ইহাকে "অখণ্ডনীয় মীমাংসা" বা 'Infallibility Decree' বলিয়া আখ্যায়িত করেন। একটি ক্ষমতাশালী আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করিবার জন্য এই রাষ্ট্রে তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী বরদাশত না করিবার স্বভাববশত আকবর এই দলিলটিকে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে একটি দরখাস্ত হিসাবে গ্রহণ করেন।

এই দলিলের যৌক্তিকতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। বাদাউনী সম্পূর্ণভাবে এই দলিলের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক আলেম সম্রাটের অনুগ্রহ লাভের আশায় এবং কিছু সংখ্যক আলেম রাজরোষের ভয়ে এই দলিলটিতে দস্তখত করেন। স্মিথ বলেন, "ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি (আকবর) একটি মধ্য রাস্তা অবলম্বন করিতে মনস্থির করেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম পণ্ডিতদের সমস্ত মতভেদের তিনি সর্বোচ্চ বিচারক হিসাবে শান্তি স্থাপন করিতে চান।"[১৭] বাদাউনীর মত তিনিও এই

মতের পৃষ্ঠপোষক যে, বিরোধী দলীয় আলেমদিগকে "তাঁহাদের আত্মা ঘৃণা করে এরূপ একটি ঘোষণায় দস্তখত করিতে হয়ত প্রলোভন দেওয়া হইয়াছে বা বাধ্য করা হইয়াছে।" স্যার লেনপুল বলেন, তাঁহার কার্যাবলি সমাধা করিবার জন্য তিনি মুক্ত হইতে চাহেন, কিন্তু আলেমগণ সর্বদাই তাঁহাকে বিরক্ত করেন, অতএব এই দলিলের দ্বারা তিনি ওলামাদের মুখ বন্ধ করিয়া দেন।[১৮]

বাদাউনী
স্মিথ
লেনপুল

ডঃ ত্রিপাঠী বলেনঃ ভারতের মুসলমানদের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, এইরূপ একটি ঘোষণাপত্রের প্রয়োজনীয়তা অবধারিত হইয়া পড়িয়াছিল। শিয়া, সুন্নি ও মাহ্দাবিরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে ও অমুসলিমদের সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকিত।[১৯] শ্রীরাম শর্মার মতানুসারে, "ধর্মীয় পণ্ডিতগণ একমত হইতে ব্যর্থ হইবার পূর্বে আকবর কোন ক্ষমতারই অধিকারী ছিলেন না। তারপরও আকবরের ক্ষমতা ছিল আইন ব্যাখ্যা করিবার, প্রণয়ন করিবার নহে।"[২০]

ডঃ ত্রিপাঠী
শ্রীরাম শর্মা

দ্বীন-ই-ইলাহী ঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আকবর কর্তৃক গৃহীত আরেকটি প্রকল্প হইল 'দ্বীন-ই-ইলাহী'। ইহার সরকারি নাম 'তৌহিদ-ই-ইলাহী'। ইহার বিশ্বাস ও নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে আইন-ই-আকবরী, বাদাউনী ও দাবিস্তান-ই মাজাহিব গ্রন্থে প্রাপ্ত ভাসা ভাসা তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ইহাকে একটি ধর্মের মর্যাদায় স্থান দেওয়া সম্পূর্ণ বাড়াবাড়ি। ইহার কোন ঐশীগ্রন্থ, পুরোহিত, আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রকৃতপক্ষে কোন ধর্মীয় বিশ্বাসই নাই। ধর্মের চেয়ে ইহা হইল একটি রাজকীয় আদেশ মাত্র। ডঃ স্মিথ ইহা ঘোষণার তারিখ নির্ণয় করেন ১৫৮২ সালের প্রথমদিকে। তবুও প্রথম জেসুইট মিশনের নেতা মুনসারেট ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে যখন ভারত ত্যাগ করেন, তিনি শুধু সন্দেহ করেন যে, আকবর হয়ত একটি নূতন ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করিতেছেন। ইহা নিশ্চয়ই একটি অদ্ভূত ধরনের ধর্ম, যাহার অস্তিত্ব সম্পর্কে তের বৎসর পরও প্রজাসাধারণের সন্দেহ ছিল। আরও মজার ব্যাপার, ডঃ স্মিথ দর্শনিয়াগণকে দ্বীন-ই-ইলাহীর অনুসারীদের সহিত তালগোল পাকাইয়া ফেলেন। দর্শনিয়াগণ ছিল এক ধরনের প্রজা, যাহারা প্রতিজ্ঞা করে যে, আকবরকে দৈনিক একবার না দেখিবার পূর্বে অন্নস্পর্শ করিবে না। আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীদের সাথেও তাহারা অনুরূপ ব্যবহার করে। অন্যস্থানে স্মিথ বলেন, "ঐশ্বরিক বিশ্বাসটি ছিল আকবরের বোকামির স্মৃতি চিহ্ন, তাঁহার জ্ঞানের নহে। সমগ্র রাজত্বে তাঁহার কার্যাবলিতে উভয় গুণের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।"[২১]

ম্যালেসন মনে হয় যথার্থই বলিয়াছেন—আকবরের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুস্থানকে একই শাসনের অধীনে একত্রিত করা, যাহা সমস্ত অনৈসলামিক ধর্মগুলিকে পীড়নের দ্বারা সম্ভব নহে। একতা আনয়ন করিবার জন্য আকবর পুরাপুরিভাবে বুঝিতে পারেন যে, "যতদিন তিনি ব্যাখ্যাকারী থাকিবেন, ততদিন পর্যন্ত প্রধান ধর্মটিকে অসির ধর্ম হওয়া উচিত নহে। অপরদিকে সমগ্র ভারতে একটি নিরাময়ী প্রভাব, পূর্বস্মৃতি মুছিয়া ফেলা ও একটি খাঁটি সহনশীলতা রক্ষা করা ইহার জন্য উচিত। এইরূপ একটি একতা আনয়ন করিবার জন্য প্রথমে প্রয়োজন ছিল বিজয়ের; দ্বিতীয়ত, সমস্ত বিবেক-বুদ্ধি এবং সর্বশক্তিমানকে পূজা করিবার সমস্ত প্রক্রিয়াকে সম্মান করা। এই পরিকল্পনা কার্যকর করিবার জন্য তিনি মুসলিম অনুষ্ঠান পদ্ধতির একটি ঈষৎ পরিবর্তিত রূপকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন মাত্র।"[২২]

দ্বীন-ই-ইলাহীর অনুসারিগণ চারিভাগে বিভক্ত। ঐ চারি শ্রেণীর লোকেরা সম্রাটের জন্য তাহাদের সম্পত্তি, জীবন, সম্মান ও ধর্ম বিসর্জন দিতে সদা প্রস্তুত থাকিত। মনে হয়, ইহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে বরং আকবরের কিছুসংখ্যক সভাসদকে তাহাদের শাসকের নিজস্ব পূজায় অর্পণ করা। দ্বীন-ই-ইলাহীর অনুসারীদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। আংশিকভাবে ইহার কারণ ছিল এই যে, আকবর কোন ধর্ম প্রচারক ছিলেন না। রাজা ভগবান দাস ও মান সিং এই ধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং আকবরও তাঁহাদের উপর বলপ্রয়োগ করেন নাই। বীরবলই ছিলেন একমাত্র হিন্দু, যিনি এই ধর্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আকবরের মৃত্যুর পর এই নূতন ধর্মমত সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়।

আকবর কি ইসলাম ত্যাগ করিয়াছিলেন? ঃ সম্রাট আকবর ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন কিনা তাহা আলোচনা করা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আকবর ছিলেন একজন খাঁটি সাম্রাজ্যবাদী; এবং তাঁহার সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তিনি যাচ্ছেতাই করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন—এই ধরনের কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। ডঃ স্মিথ ও ব্লকম্যানের মতানুসারে, আকবর সম্পূর্ণভাবে ইসলাম ধর্ম বর্জন করিয়াছিলেন। স্যার ডব্লিউ হেগও অনুরূপ মত পোষণ করেন। ব্যাভারিজ-এর মতানুসারে : "তিনি কখনও তঁহার প্রাথমিক ধর্মীয় বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই।"[২৩] মুহাম্মদ হোসাইন আজাদ বলেন, আকবর যাহা কিছু করিয়াছেন, সবই রাজনৈতিক বিবেচনা হইতে করিয়াছেন এবং যদিও তাঁহার কিছু সংস্কার ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী হইয়াছে, তবুও তিনি ধর্মত্যাগী ছিলেন না। এই কথা সত্য, জেসুইট ফাদারগণ আকবর ইসলাম ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহারা জনসাধারণ্যে প্রচলিত জনশ্রুতির কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না, তিনি একজন মুসলমান হিসাবেই জীবন যাপন করিয়াছেন এবং মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। এই মতামত সম্রাট জাহাঙ্গীরও ব্যক্ত করিয়াছেন। তৎসঙ্গে ইহাও সত্য কথা, তিনি একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন না। ইসলামের আচার-অনুষ্ঠাসমূহকে তিনি সম্পূর্ণভাবে পালন করেন নাই। ইসলামী আইন ভঙ্গ করিয়া এবং প্রায় সম্পূর্ণ অনৈসলামিক কিছু কার্যকলাপের অনুমোদন দিয়া তিনি ভয়ানক পাপের কাজ করিয়াছেন। কিন্তু এইসব পাপ কোন মুসলমানকে অমুসলিমে পরিণত করে না। ধর্মত্যাগ ও পাপের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। জেসুইট ফাদারগণ আকবরকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন এবং তাই তাঁহারা আকবরকে ধর্মত্যাগী বলিয়া অপবাদ দিয়াছেন। অপরদিকে বাদাউনীর প্রায় সমস্ত অভিযোগসমূহই পরস্পরবিরোধী। অধিকন্তু কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, সম্রাট কর্তৃক তাঁহার পদোন্নতি বন্ধ করিয়া দিবার ফলে বাদাউনী সম্রাটের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন। সুতরাং তাঁহার মন্তব্যগুলিকে পুরাপুরি বিশ্বাস করা যায় না। অতএব, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, আকবর ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেন নাই।

কতকগুলি রাজকার্যের সংস্কার ঃ সম্রাট আকবর একজন বড় সংস্কারক ছিলেন। মুসলিম চান্দ্র বৎসর, হিন্দু বৎসর ও অনেকগুলি স্থানীয় ভুল-ভ্রান্তির ফলে শাসনকার্যে অনেক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। চান্দ্র বৎসর রাজত্বের কার্যকলাপের জন্য সুবিধাজনক নহে, কারণ ইহার মাসগুলির সহিত শস্য কর্তন মৌসুমের যোগাযোগ নাই। অতএব ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে সূর্য

বৎসরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া 'ইলাহী বৎসর' নামে একটি নূতন কাল প্রবর্তন করা হয়। তবে হিজরী সন বাতিল করিবার উদ্দেশ্যে এই ইলাহী সন প্রবর্তন করা হয় নাই। রাজকার্যের দলিল পত্রে হিজরী সনের সহিত ব্যবহার করিবার জন্য ইহার প্রবর্তন করা হয়।

(১) ইলাহী কাল

আকবর সাহিত্য ও সকল শ্রেণীর বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিদ্বান পণ্ডিতবর্গ, ধর্মীয় কাজে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ, দরিদ্র, বিধবা, বৃদ্ধ'লোক ও বেকার সম্মানিত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করাটা রাষ্ট্রের জন্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করা হয়। আকবর লক্ষ্য করেন, সদর-উস-সদূর বিভাগের কার্যকলাপ সন্তোষজনক নহে। সুতরাং তিনি এই বিভাগের ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস করিয়া দেন।

(২) বিদ্বান ও গরিবদের সাহায্য

সম্রাট আকবরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হইল জায়গীরদারি প্রথার বিলোপ সাধন। আফগানদিগকে প্রদত্ত অনেক জায়গীর তিনি বাজেয়াপ্ত করিয়া ঐগুলিকে রাষ্ট্রীয় বা খালসা জমিতে পরিণত করেন। পরবর্তীকালে তিনি ওয়াকফ, ইনাম ও ইদারাত-এর নামে অনেক জমি প্রদান করিয়াছিলেন। আকবর শুধু জিজিয়া, যাকাত ও তীর্থকর রহিত করেন নাই, বরং ছাগল, ষাঁড়, লবণ, হাট-বাজার, পাগড়ি, চামড়া, তৈল ইত্যাদির করও রহিত করেন। তহশীলদার, দারোগা, কোষাধ্যক্ষ ও দালালদের উৎকোচ গ্রহণ তিনি বন্ধ করিয়া দেন। বাল্য বিবাহ ও শিশু হত্যাকে আকবর ঘৃণা করেন। তিনি একটি আইন করিয়া দেন যে, ১৬ বৎসরের নিচে কোন ছেলে এবং ১৪ বৎসরের নিচে কোন মেয়েকে বিবাহ দেওয়া চলিবে না। বিজিত দেশে স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে দাস-দাসীতে পরিণত করা তিনি বন্ধ করিয়া দেন। অশ্ব চিহ্নিত করিবার জন্য আকবর কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করেন। রাষ্ট্রের ঘোড়াগুলিকে রাজকীয় চিহ্নস্বরূপ নম্বর দিয়া চিহ্নিত করা হয়। অগ্নিদাহে শাস্তির ব্যবস্থা তিনি রহিত করেন।

(৩) জায়গীরদারি প্রথার বিলোপ সাধন
(৪) জিজিয়া, যাকাত, তীর্থকর ইত্যাদি রহিত
(৫) সবকটি কর্মচারীদের উৎকোচ বন্ধ
(৬) বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ
(৭) যুদ্ধবন্দিদের দাসত্ব রহিত
(৮) অগ্নিদাহ শাস্তির প্রচলন রহিত

রাজকীয় টাঁকশালের তিনি প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। বাংলা, লাহোর, জৌনপুর, গুজরাট ও পাটনার প্রাদেশিক টাঁকশালগুলিতে বিভিন্ন কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। আদর্শ-ওজনের মুদ্রাগুলিতে খাঁটি সোনা ব্যবহৃত হয়। ডঃ স্মিথ বলেন, প্রচলিত মুদ্রার অভিনবত্বের জন্য আকবর উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।"[২৪]

মুদ্রা সংস্কার

আকবরের কৃতিত্ব পর্যালোচনা ঃ জালালুদ্দিন মুহাম্মদ আকবর ভারতের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল তারকার ন্যায় দীপ্তিমান। ডঃ কালী কিংকর দত্ত বলেন—"একজন নির্ভীক সৈনিক, উপকারী ও জ্ঞানী শাসক, শিক্ষিত কল্পনাশক্তির অধিকারী এবং একজন সূক্ষ্ম চরিত্র বিশ্লেষণকারী হিসাবে আকবর ভারতের ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় আসনের অধিকারী।"[২৫]

ইতিহাসে তাঁহার আসন

আকবরের যুগ প্রসিদ্ধ শাসকদের যুগ। তাঁহার অতি নিকটবর্তী সমসাময়িক ছিলেন ইংল্যান্ডের রাণী এলিজাবেথ। কিন্তু ফ্রান্সের চতুর্থ হেনরী ও পারস্যের বিখ্যাত আব্বাস আকবরের রাজত্বের বেশ কিছু ভাগে রাজত্ব করেন। যদিও তিনি একমাত্র শাসক নন, তবুও

তিনিই প্রথম শাসক, যিনি একটি প্রধান জাতির নেতৃত্ব ছাড়িয়া ভারতের সম্মিলিত জাতিসমূহের নেতৃত্ব করিতে চেষ্টা করেন। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "শুধু ভারতের ইতিহাসে নহে, বরং সমগ্র বিশ্বে তিনি উল্লেখযোগ্য রাজাদের মধ্যে একজন।"[২৬] স্মরণ করিবার বিষয় যে, ইউরোপে যখন বিভিন্ন সম্প্রদায় বিবাদে লিপ্ত, সেই সময় আকবর শুধুমাত্র সম্প্রদায়গুলিতে নহে, বরং বিবদমান ধর্মগুলিতে পর্যন্ত শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর বর্ণনা করেন—"তাঁহার মহামহিম আকৃতিতে তিনি (আকবর) ছিলেন মধ্য অবয়বের, কিন্তু দেখিতে লম্বাই মনে হইত।"[২৭] শরীরের প্রতিটি ইঙ্গিতেই তাঁহাকে একজন রাজা দেখাইত এবং দর্শকগণ বিশেষ করিয়া তাঁহার চক্ষু দেখিয়া মুগ্ধ হইত। সম্রাটের একজন জেসুইট বন্ধু তাঁহার চক্ষুকে "সমুদ্রে সূর্যরশ্মির মত দোলায়মান"[২৮] বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতিগত কড়া মেজাজ তিনি সাধারণত আয়ত্তাধীন রাখেন। কিন্তু কোন কোন সময় রাগে ইহা জ্বলিয়া উঠে। আকবর প্রাণখোলা হাসি হাসেন, ঠাট্টা-তামাশা করেন এবং সরকারের আমোদ-আহ্লাদ উপভোগ করেন, কিন্তু কেউ কোন অপরাধ করিলে তিনি ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করেন। তাঁহার ব্যবহার নম্র ও মনোমুগ্ধকর। তিনি প্রজাদের সঙ্গে মহান এবং অভদ্রের সঙ্গে অভদ্র। এডওয়ার্ডস ও গ্যারেট মন্তব্য করেন—"তিনি মানুষের একজন জন্মগত নেতা ছিলেন এবং ইতিহাসে পরিচিত শক্তিমান নৃপতিগণের মধ্যে একজন বলিয়া সঠিকভাবে দাবি করিতে পারেন।"[২৯] আকবরের মনোভাব সম্পর্কে ঐতিহাসিক বার্টলী (Bartali) যথার্থভাবেই বলিয়াছেন—"প্রশিক্ষার বলেই হোক বা তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তির বলেই হোক, তিনি তাঁহার মনোভাব এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখেন যে, সম্পূর্ণ প্রফুল্ল ও শান্ত প্রকৃতি ব্যতীত তাঁহাকে কদাচ দেখা যাইত।"[৩০]

তাঁহার ব্যক্তিত্ব

আকবর একজন শ্রেষ্ঠ বিজয়ী ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের সময় একজন নামেমাত্র সম্রাট হিসাবে তাঁহার অধীনে ছিল শুধু দোয়াব অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং আধুনিক পাঞ্জাবের বৃহদাংশ। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সময় সরাসরি শাসনকর্তা হিসাবে বা সাধারণ রাজা হিসাবে তাঁহার ক্ষমতা বিস্তার লাভ করে উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত এবং পশ্চিমে আফগানিস্তান হইতে পূর্বে বাংলাদেশ পর্যন্ত। দেশের এই সুবিশাল এলাকায় তাঁহার ক্ষমতা থাকে সর্বপ্রধান। এডওয়ার্ড ও গ্যারেট বলেন, "তাঁহার জীবনের প্রথম অনুরাগ ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তাঁহার সমগ্র জীবনই অতিবাহিত হয় সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি সাধনে।"[৩১] স্বয়ং আকবরের মতানুসারে : "একজন রাজাকে সর্বদা বিজয়ে নিবিষ্ট থাকা উচিত, অন্যথায় তাঁহার প্রতিবেশীরা তাঁহার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হইবে। সৈন্যবাহিনীকে সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত রাখিতে হইবে, পাছে ট্রেনিংয়ের অভাবে তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে।" স্বীয় সাজ-সরঞ্জামের তুলনায় অধিক ক্ষমতাশালী অন্যান্য শত্রুদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী এই সম্রাট শুধু তাঁহার ক্ষমতাকে দৃঢ় করেন নাই; বরং একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

বিজয়ী হিসাবে

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আকবর। স্যার লেনপুলের অভিমত অনুসারে, "আকবরই ছিলেন সাম্রাজ্যের সত্যিকারের প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক।"[৩২] তিনি ভারতে এমন একটি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন যাহার অধিকার লইয়া প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নাই। এডওয়ার্ড এবং গ্যারেট মন্তব্য করেন—"তাঁহার রাজত্বের সময়

মুঘলগণ একটি সামরিক আক্রমণকারী দল হইতে একটি স্থায়ী ভারতীয় বংশে পরিবর্তিত হয়।"৩৩ একজন শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা ও যোগ্য সেনাপতির গুণাবলির সঙ্গে তিনি যুদ্ধে ও শান্তিতে একজন সংগঠকের বুদ্ধিমত্তার যোগসাধন করেন, যাহার ফলে তিনি সবার প্রশংসার পাত্র হন।

সংগঠক হিসাবে

আকবরের বিভিন্ন গুণাবলির সঙ্গে তাঁহার কার্যপরিচালনাও সমধিক উল্লেখযোগ্য। এইক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র, জাতি ও ধর্মের লোকজনকে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যে আবদ্ধ করিয়া তিনি তাঁহার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। আকবরের কার্য পরিচালনার নীতি এতই সুযোগ্য ছিল যে, পরবর্তীকালে বৃটিশরাও ভারতে সেই নীতি অনুসরণ করে। ভারতের তিনিই ছিলেন প্রথম শ্রেষ্ঠ মুসলিম নৃপতি, যিনি বিভিন্ন লোকদের মধ্যে সহযোগিতার প্রচেষ্টা চালান। যদিও জনসাধারণের জন্য তিনি খুবই উদার ছিলেন, কিন্তু যাহারা তাঁহার ক্ষমতার মোকাবিলা করিতে সাহস করিয়াছে, তাহাদিগকে আকবর কখনও ক্ষমা করেন নাই।

কার্যনির্বাহী হিসাবে

শাসক হিসাবে আকবর সর্বদাই তাঁহার প্রজাদের প্রতি কোমল ছিলেন। তাঁহার স্বীয় মতানুসারে—"প্রত্যেকের পক্ষে বিশেষ করিয়া যাহারা বিশ্বের রক্ষক, তাঁহাদের পক্ষে অত্যাচার বেআইনী।" সর্ব মানুষের জন্য মিথ্যাচার অনুচিত এবং রাজাদের জন্য ইহা নিন্দনীয়।৩৪ অন্য এক স্থানে তিনি বলেন : "রাজা হইলেন আল্লাহর প্রধান অভিপ্রায়। তাঁহার কার্যকলাপের উপর সমস্ত কাজের গতিবিধি নির্ভর করে। সুতরাং ন্যায়পরায়ণ সরকারের উচিত, গুণের সত্যিকারের কদর দিয়া তাঁহার প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা; প্রজাদের উচিত বাধ্যতা ও প্রশংসার দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।"৩৫ সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ দ্বারা তিনি শাসনকার্যের বিভিন্ন বিভাগের খুঁটিনাটি ব্যাপারে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেন। বিশাল রাজ পারিবারিক হউক বা রাজকীয় সরকারের হইক, প্রত্যেক বিভাগই তাঁহার সদাজাগ্রত দৃষ্টির আওতায় থাকে। তাঁহার প্রজাসাধারণের প্রতি আকবর সহনশীল ছিলেন এবং তাহাদের অন্তর জয় করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। সন্তুষ্টচিত্তে তাহাদের বিভিন্ন মামলা শ্রবণ করিবার জন্য তিনি সর্বদাই সময় পাইতেন।

শাসক হিসাবে তাঁহার স্বাক্ষরতা

আকবর কখনও লেখাপড়া করার সুযোগ পান নাই, তবুও তিনি অজ্ঞ ছিলেন না। স্যার ডব্লিউ হেগ বলেন : "নিরক্ষরতা তাঁহার ব্যাপক ও গভীর জ্ঞানে বাধা সৃষ্টি করে নাই। কারণ, তিনি আশ্চর্যজনক স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন।"৩৬ তাঁহাকে শব্দ করিয়া বই পড়িয়া শুনানো তিনি পছন্দ করেন এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের আলাপ-আলোচনায় তিনি গভীর আনন্দ উপভোগ করেন। ডঃ স্মিথ বলেন : "ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র, কবিতা ও অন্যান্য ধরনের গ্রন্থসমূহ তাঁহাকে পড়িয়া শুনানো তিনি ভালোবাসেন।"৩৭ এইভাবে তিনি সাহিত্যিক ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় এমনভাবে অংশগ্রহণ করিতেন যে, শ্রোতারা তাঁহার নিরক্ষরতার কথা বিশ্বাসই করিতে পারিত না।

আকবরের সুদীর্ঘ, সমৃদ্ধিশালী ও জয়যুক্ত রাজত্ব সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করে। আকবরের দরবারে এইগুলির খুবই কদর ছিল। আবুল ফজল, নিজামুদ্দিন, বাদাউনী ও অন্যান্য গ্রন্থকারগণ ফারসি ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস রচনা করেন। আবুল ফজল রচিত

"আইন-ই-আকবরী" আকবরের সাম্রাজ্যের একটি অদ্ভুত চিত্র প্রদান করে। ফৈজীকে এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ফারসি কবি বলিয়া গণ্য করা হয়। এই যুগে তুলসী দাস সংস্কৃত 'রামায়ণ' গ্রন্থকে হিন্দী 'রামচরিতনামা'য় অনুবাদ করেন। প্রাচীন ভারতীয় চিত্র শিল্প আকবরের নিকট হইতে নূতন ধারা লাভ করে এবং হিন্দু শিল্পীদিগকে তিনি ফারসি কায়দা ও ভাবধারা গ্রহণ করিবার জন্য অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। ফলে একটি ভারতীয় পারস্য (Indo-Persian) কেন্দ্র ক্রমশ গড়িয়া উঠে এবং অতি উন্নত ধরনের রঙিন চিত্রকলায় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে।

শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

আকবরের স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য হইল হিন্দু-মুসলিম উভয় রীতির সংমিশ্রণ। পাথরের মধ্য দিয়া ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত অনুভূতি ও বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। তাঁহার স্থাপত্য শিল্পের কৃতিত্বের অতি উত্তম নমুনা পাওয়া যায় ফতেহপুর সিক্রিতে। ফতেহপুর সিক্রির জামে মসজিদ, যাহাকে মক্কার কাবা শরীফের অনুকরণে নির্মাণ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, ১৫৭১ সালে সমাপ্ত হয় এবং ইহা মুঘল স্থাপত্য শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা। ফতেহপুর সিক্রির সর্ববৃহৎ কীর্তি হইল 'বুলন্দ দরওয়াজা', ১৫০ ফুট উঁচু মার্বেল ও পাথরের তৈরি বিশাল তোরণ বা মসজিদের প্রবেশ পথ। আকবর আরও অনেক সৌধ নির্মাণ করেন, যথা—সেকেন্দ্রার ইমারতসমূহ, আগ্রা দুর্গে আকবরী মহল, আটকের দুর্গ এবং এলাহাবাদ দুর্গ।

নির্মাতা হিসাবে

"তিনি (আকবর) একজন চতুর কারিগর ছিলেন এবং বন্দুক নির্মাণে ও কামান প্রস্তুত করিতে এবং নমুনা বানাইতে তিনি বিশেষ আনন্দ পাইতেন।"[৩৮] একই সময়ে বন্দুকের নল প্রস্তুত করিবার এক অভিনব পন্থা তিনি আবিষ্কার করেন। আরেকটি যন্ত্র তিনি উদ্ভাবন করেন, যাহাতে একটি দিয়াশলাই দ্বারা একই সাথে সতেরটি কামান দাগা যাইত। ইহা ছাড়া আরও অনেক কিছু তিনি তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা উন্নত করেন।

তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, বিজয়ী হিসাবে, রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে, শাসক হিসাবে সম্রাট আকবর সর্বশ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাটের মর্যাদা অর্জন করেন।

পাদটীকা

১। Before Akbar could become Padshah in reality as well as in name, he had to prove himself better than the rival claimants to the throne, and at least to win back his father's lost dominion. — V. A. Smith : *Akbar the Great Mughal.*

২। হিন্দুস্থান বলিতে প্রধানত উত্তর ভারতকেই বুঝায়।

৩। Indeed Humayun's reign had given the Rajput princes an opportunity of increasing the area of their influene, and since they had no reason to fear the Mughal government at Delhi, they had deve-loped their military resources to such an extent that they felt afterwards strong enough to try conclusions even with the emperor.— Ishwari Prasad: *A Short History of*

Muslim Rule in India.

৪। Thus Akbar's heritage was of a precarious nature, and his task of building up of an empire was indeed a very difficult one.—K. K. Datta: *An Advanced History of India.*

৫। At length Bairam's proceedings went beyond all endurance.

৬। The conquest of Gujrat marks an important epoch in Akbar's history.—V. A. Smith: *Akbar the Great Mughal.*

৭। Gujrat was used as a jumping off point for invasions of the Deccan.

৮। This region occupies a position of strategic as well as econommic importance; and it is, therefore, highly necessary for a ruler of India to maintain effective control over it.

৯। The primary object of his policy was conquest, directed to the establishment of his sovereignty over the whole or nearly the whole of India and to the reconquest of the central Asian Kingdoms once held by his grandfather.—V. A. Smith: *Akbar the Great Mughal*

১০। An officer was allowed to add and draw extra pay for a supplementary body of Sawar or horsemen besides his personal or Zat class rank.—V. A. Smith : *Akbar the Great Mughal.*

১১। The word Zat indicated the number of troops which a Mansabdar was expected to maintain while Sawar indicated the actual number of horses under the command of a Mansabdar.

১২। The Sawar rank had nothing to do with the actual number of troops normally commanded by an officer. It was an honour and it merely pointed out the actual number of horse over and above those of the Zat. —W. Inrvine : *Army of the Indian Mughals.*

১৩। The Sawar rank implied an additional honour but there was no obligation on the part of a Mansabdar to maintain the number of horsmen indicated by it. —Tripath : *Rise and Fall of Mughal Empire.*

১৪। All office holders, as a rule did their best to cheat the government. —V. A. Smith : *Akbar the Great Mughal.*

১৫। It appears that for several years after the establishment of the Mansabdari system, Mansabdars of various ranks failed to maintain and bring to muster the number of cavalry fixed for their several rank.—A. L. Sreevastava: *First two Nawabs of Oudh.*

১৬। Qanungo was walking dictionary of the prevailing rules and practices and a storehouse of information as to procedure and prece-

dents in the land history of the past. — J. N. Sarker : *Mughal Administration.*

১৭। Before he (Akbar) made up his mind definitely to renounce Islam, he tried to follow a middle path, and to seek peace by constituting himself the supreme judge of all differences between the rival Muslim doctors.—V.A. Smith : *Akbar the Great Mughal.*

১৮। Akbar wanted to be free in order to carry on his activities but he was always interrupted by the Ulamas. Thus he shut up the mouths of the Ulamas through this Decre. —S. Lane Pole: *Medieval India.*

১৯। The need for such a declaration of policy was obvious so far as the Mussalmans of India were concered. The Shites, Sunnis and Mahdavis had been frequently indulging in bloody conflits among themselves and the non-Muslims—Tripathi : *Rise and Fall of the Mughal Empire.*

২০। It gave Akbar no power until and unless the divines failed to agree. Even then he had the power to interpret the Muslim law and not to make it.—S. R. Sharma : *Religious policy of the Mughals.*

২১। The Divine Faith was a monument of Akbar's folly, not of wisdom. His actions throughout his reign exhibited many illustration of both qualities—V. A. Smith : *Akbar the Great Mughal.*

২২। Akbar's one foremost aim was the union of Hindustan under one head which was difficult to achieve had he persecuted all non-Islami religions. In order to bring about a unity, Akbar was fully convinced that the dominant religion should not be, as long as he was its interpretor, the religion of sword. It should carry, on the contrary, a healing influence throughout India, should wipe away reminiscence, should practice the most perfect toleration. To accomplish such a union it was necessary, first, to conquer, secondly, to respect all consciences and all methods of worshiping the Almighty. To carry out this plan he availed hiimself to a modified extent only of a Muhammadan ritual.—Malleson : *Indian Mutiny of 1857.*

২৩। He never divested himself of his early religious beliefs—Beveridge : *Comprehensive History of India,* 3 Vols.

২৪। Akbar deserves his credit for the excellence of his extremely barred coinage as regards purity of metal, fullness of weight and artistic execution.—V. A. Smith: *Akbar the Great Mughal.*

২৫। An intrepid soldier, a benevolent and wise ruler, a man of enlightened ideas and a sound judge of character, Akbar occupies a unique position in the history of India.—K. K. Datta : *An Advanced History of India.*

২৬। Akbar is one of the most remarkable kings not only in the history of India but of the whole world.—Dr. Ishwari Prasad : *A Short History of Muslim Rule in India.*

২৭। In his august personal appearance, he (Akbar) was of middle height but inclining to be tall.—*Tuzuk-i-Jahangiri.*

২৮। Vibrant like the sea in sunshine.

২৯। He was a born leader of man and can rightly claim to be one of the mightiest sovereigns known to history.—Edwardes and Garrett : *Muslim Rule in India.*

৩০। Whether by training or innate power, he was so completely master of his emotions that he could hardly ever be seen otherwise than a perfectly pleasant and serene. —Bartali.

৩১। The ruling passion of his life, however, was ambition. His whole career was devoted to territorial aggrandizement.—Edwardes and Garrett: *Mughal Rule in India.*

৩২। Akbar was the true founder and organizer of the Empire.—S. Lane Poole: *Medieval India.*

৩৩। His reign witnessed the final transformation of the Mughals from mere military invaders into a permanent. Indian dynasty — Edwardes and Garrett : *Mughal Rule in India.*

৩৪। "Tyrany is unlawful in everyone, specially in a sovereign who is the guardian of the world." Falsehood is improper in all men and most unseemingly in monarchs.—V. A. Smith: *Akbar the Great Mughal* হইতে উদ্ধৃত।

৩৫। A monarch is a pre-eminent cause of God. Upon his conduct depends the efficiency of any course of action. His gratitude to his Lord, therefore, should be shown in just Government and due recognition of merit, that of his people in obedience and praise. ঐ।

৩৬। His illiteracy was no obstacle to his being widely and deeply informed, for he was endowed with prodigious powers of memory.—Sir. W. Haig. *Cambridge History of India.* Vol-IV.

৩৭। He loved to have books of history, theology, poetry and other kinds

read to him.—V. A. Smith: *Akbar the Great Mughal.*

৩৮। He (Akbar) was a clever mechanic and found particular pleasure in making guns and in founding and modeling cannon.— Edwardes and Garrett : *Mughal Rule in India.*

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

Abul Fazl	:	*Ain-i-Akbari.*
Do	:	*Akbarnamah.*
Abdul Quader Badauni	:	*Muntakhab-ut-Tawarikh.*
V. A. Smith	:	*Akbar the Great Mughal.*
J.N. Sarkar	:	*Mughal Administration.*
Ibn Hassan	:	*The Central Structure of the Mughal Empire.*
Edwardes and Garrett	:	*Mughal Rule in India.*
Tripathi	:	*Rise and Fall of the Mughal Empire.*
S.R. Sharma	:	*Religious Policy of the Mughals.*
W. Irvin	:	*Army of the Indian Mughals.*
Burn and Haig	:	*Cambridge History of India Vol-IV.*
Henry Beveridge	:	*Comprehensive History of India, 3 vols.*

পঞ্চম অধ্যায়
জাহাঙ্গীর
(১৬০৫-১৬২৭ খ্রিঃ)

তাঁহার প্রাথমিক জীবন ঃ জাহাঙ্গীর অনেক প্রার্থনার সন্তান। একটি পুত্র সন্তানের জন্য সম্রাট আকবর স্বয়ং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন এবং দোয়ার জন্য অনেক দরবেশের শরণাপন্ন হন। ১৫৬৯ সালের আগস্ট মাসে তাঁহার জন্ম হয় এবং নাম রাখা হয় মুহাম্মদ সেলিম। তাঁহার শিক্ষাদীক্ষার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালানো হয়। তাঁহার উল্লেখযোগ্য শিক্ষক ছিলেন অনেক গুণের অধিকারী আবদুর রহিম খান-ই-খানান। পনের বৎসর বয়সে তিনি আম্বরের রাজা ভগবান দাসের কন্যাকে বিবাহ করেন। সম্ভবত সুদীর্ঘ সময় বিলম্বিত ও অনেক পরম কাঙ্ক্ষিত উত্তরাধিকার লাভের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে সেলিম বিদ্রোহ করেন। সম্রাট আকবর তখন আসিরগড় দুর্গ অধিকারে ব্যস্ত। এই কাজে আকবর এতই বিরক্ত হন যে, তিনি সেলিমের পুত্র খসরুকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিতে মনস্থির করেন। যাহা হউক, আকবর পুনরায় সেই ইচ্ছা ত্যাগ করেন। সেলিম আগ্রায় ফিরিয়া আসেন এবং সম্রাটের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। অতঃপর আকবর সেলিমকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর পর সেলিম নূরুদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর 'বাদশাহ গাজী' উপাধি লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাহাঙ্গীর নামেই তিনি ইতিহাসে সমধিক পরিচিত।

সিংহাসনে আরোহণ

প্রাথমিক ব্যবস্থা ঃ সিংহাসনে আরোহণের পরেই জাহাঙ্গীর অনেক বন্দিকে মুক্তি দেন এবং স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। ১২টি প্রসিদ্ধ বিধির মাধ্যমে তিনি তাঁহার নীতি ঘোষণা করেন। বিধিগুলি হইল ঃ

১। যাকাত নিষিদ্ধ করা।

২। ডাকাতি ও চুরির বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা।

৩। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির নিয়মিত উত্তরাধিকার নিয়োগ।

৪। ঘর-বাড়ি দখল ও অপরাধীদের নাক-কান কর্তন নিষিদ্ধ করা।

৫। মদ বিক্রয় এবং সব ধরনের মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করা।

৬। ধন-সম্পত্তি জোরপূর্বক অধিকার নিষিদ্ধ করা।

৭। হাসপাতাল নির্মাণ এবং পীড়িত ব্যক্তিদের শুশ্রূষার জন্য চিকিৎসক নিয়োগ করা।

৮। নির্দিষ্ট কয়েকদিনে পশু জবাই নিষিদ্ধ করা।

৯। রবিবারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

১০। মনসব ও জায়গীরসমূহের সাধারণ অনুমোদন প্রদান করা।

১১। আইমা[১] জমিসমূহের অনুমোদন প্রদান করা।

১২। দুর্গ ও বন্দিশালার সমস্ত বন্দিকে মুক্তিদান।

এই বিধি-বিধানের কার্যকর কোন ফলাফল ছিল বলিয়া মনে হয় না। সম্রাট একটি বিচারের শিকল স্থাপন করেন। এই শিকলের এক প্রান্ত বাধা ছিল আগ্রা দুর্গের ভিতরে এবং অন্য প্রান্ত ছিল যমুনার পারে অবস্থিত একটি পাথরের খামের সাথে। উৎপীড়িত ব্যক্তিরা যাহাতে সহজে সম্রাটের নিকট তাহাদের অভিযোগ পেশ করিতে পারে, সেইজন্য এই ব্যবস্থা নেয়া হয়।

যুবরাজ খসরুর বিদ্রোহ ঃ পাঁচ বৎসর অতিক্রম হইতে না হইতেই জাহাঙ্গীর তাঁহার বিদ্রোহী পুত্র খসরুর সাথে গোলযোগে লিপ্ত হন। সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষভাগে পিতা-পুত্রের সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। কতকগুলি গুণের দ্বারা খসরু অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী লাভ করেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন আবদুর রহিম খান-ই-খানান ও মান সিংহ। জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের পাঁচ মাস পর খসরু তাঁহার পিতামহের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগ্রা ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে তাঁহার অনুসারীদের সংখ্যা ১২,০০০ এ উঠে। তিনি শিখ নেতা অর্জুন সিংহের সাথে মিলিত হন এবং অর্থ ও লোকবল লাভ করেন। অতঃপর খসরু লাহোর দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু দিলওয়ার খান যোগ্যতার সাথে দুর্গ রক্ষা করেন। এই সংবাদে জাহাঙ্গীর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হন এবং এক বিরাট বাহিনী লইয়া স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করেন। বিদ্রোহী যুবরাজ কাবুলের দিকে পলায়ন করেন, কিন্তু শীঘ্রই বন্দি হন। লৌহ শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাঁহাকে আগ্রায় আনা হয়। তাঁহার প্রধান অনুসারীদিগকে কঠিন শাস্তির মাধ্যমে হত্যা করা হয়। অতঃপর যুবরাজকে অন্ধ করিয়া আগ্রা দুর্গে বন্দি করা হয়। ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে যুবরাজ খুররমের নিকট অর্পণ করা হইলে ১৬২২ সালে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। গুরু অর্জুনকে হত্যা করিয়া তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। শিখ গুরুর হত্যার প্রতিক্রিয়ায় মুঘল সাম্রাজ্যের পরবর্তী ইতিহাস সুদূর প্রসারী হইয়া দাঁড়ায়। শিখরা অতঃপর সাম্রাজ্যের শত্রু হইয়া উঠে।

খসরুর আগ্রা ত্যাগ লাহোর দুর্গ আক্রমণ খসরু ধৃত গুরু অর্জুনের হত্যা ও ইহার প্রতিক্রিয়া

যুদ্ধ ও বিজয় ঃ ১৫৯৭ সালে রানা প্রতাপ সিং-এর মৃত্যুর পর অমর সিং তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। অমর সিং ও আকবরের মধ্যে কোন সংঘাত হয় নাই। সিংহাসনে আরোহণের পর জাহাঙ্গীর রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং মুহব্বত খানকে অমর সিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। রাজপুতদের কঠোর প্রতিরক্ষার ফলে এই অভিযান ও পরবর্তী আবদুল্লাহ খানের অভিযান ব্যর্থ হয়। ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে যুবরাজ খুররমকে প্রেরণ করা হয়। তাঁহার দুর্দমনীয় অভিযানের ফলে রাজপুতরা সন্ধিতে আসিতে বাধ্য হয়। অমর সিং জাহাঙ্গীরের প্রভুত্ব স্বীকার করেন। জাহাঙ্গীরও অমর সিংহের সঙ্গে উদার ব্যবহার করেন এবং পরাজয়ের গ্লানি মোচন করিতে চেষ্টা করেন—স্বয়ং জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হইবার কাজ হইতে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু মুঘল দরবারে তাঁহাকে একটি রাজপুত সেনাদল নিয়মিত পাঠাইতে হয়। অমর সিংহের পুত্র করণ সিংকে পরে ৫,০০০ এর একটি মনসব প্রদান করা হয়।

মেবার

সম্রাট আকবর কাংরা দুর্গ জয় করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। জাহাঙ্গীর ইহা অধিকার

করিতে মনস্থ করেন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা মুর্ত্তাজা খানকে এই অভিযান পরিচালনা করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে প্রেরিত রাজপুতদের হিংসা ও বিরোধিতার ফলে এই অভিযান ব্যর্থ হয়। অতঃপর যুবরাজ খুররমকে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়। যুবরাজ খুররম কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত কাংরা দুর্গ অবরোধ করিয়া রাখেন। দুর্গের সমস্ত রসদ সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। দুর্গের সেনাবাহিনী ঘাস সিদ্ধ খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া চলে, কিন্তু তবুও আত্মসমর্পণ করে নাই। যুবরাজ অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী করিলে দুর্গের অধিবাসিগণ উপবাসে মৃত্যুবরণ করিতে আরম্ভ করে। অতঃপর ১৪ মাসের সুদীর্ঘ অবরোধের পর ১৬২০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে দুর্গ আত্মসমর্পণ করে। ১৬২১ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীর দুর্গটি পরিদর্শন করেন এবং তথায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

কাংরা বিজয়

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের অধিকাংশ সময় বাংলাদেশ বিশৃংখলায় নিমজ্জিত ছিল। ওসমান খান নামক একজন আফগান নেতা বাংলায় আফগান শাসন কায়েম করিবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিন্তু বাংলার শাসনকর্তা ইসলাম খানের সুযোগ্য সেনাপতি সুজায়াত খান তাঁহার বিদ্রোহ দমন করেন। সুজায়াত খান বাংলার রাজধানী গৌড় হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন এবং ঢাকার নাম জাহাঙ্গীরনগর রাখেন। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে সুজায়াত খান ওসমান খানকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। অবশিষ্ট আফগানরা আত্মসমর্পণ করে। বাংলায় আফগানদের ইহাই শেষ বিদ্রোহ।

বাংলায় বিদ্রোহ

আফগানদিগকে বাংলায় দমন করা হইলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ঘটনাবলী তখন ভিন্নরূপ ধারণ করে। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে দুর্ধর্ষ রৌশনিয়ারা সেখানে আহ্‌দাদ নামক একজন নেতার অধীনে পুনরায় বিদ্রোহ করে এবং শাসনকর্তা খান দাওরান-এর অনুপস্থিতিতে কাবুলে অতর্কিত আক্রমণ করে। কাবুল শহর কোনরূপে রক্ষা পায়, কিন্তু কর্তব্যে অবহেলার জন্য খান দাওরানের পদাবনতি হয়। কাবুলে রাজকীয় বাহিনীর দুর্বলতার সুযোগে রৌশনীয়ারা উৎসাহ লাভ করে। এই গোলমাল মিটমাটের সঙ্গে সঙ্গে কাবুলের নিকটবর্তী বাঙ্গাস জেলায় গোলযোগ দেখা দেয়। অনেক পরে ১৬১৭ সালে মুহাব্বত খানকে কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু এই ব্যাপারে বিশেষ লাভ হয় নাই। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের অবশিষ্ট সময়ে বাঙ্গাসে বিদ্রোহ থাকিয়াই যায়।

কাবুল বাঙ্গাস

সম্রাট আকবর কর্তৃক কাশ্মীর জয় করা সত্ত্বেও কিশ্‌ওয়ার জিলা স্বাধীন থাকিয়া যায়। ইহা জয় করিতে আকবরের অনেক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কাশ্মীরের শাসনকর্তা দিলওয়ার খান কিশ্‌ওয়ার-এর রাজাকে জাহাঙ্গীরের দরবারে আনয়ন করেন। কিন্তু রাজার প্রতি দুর্ব্যবহারের ফলে জনসাধারণ বিদ্রোহ করে। ইহা দমন করিবার জন্য জাহাঙ্গীর একজন শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন। শেষ পর্যন্ত ১৬২২ সালে কিশওয়ারকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার মাধ্যমে শান্তি স্থাপিত হয়।

কিশ্‌ওয়ার বিজয় (১৬২২)

আহমদনগরের সঙ্গে যুদ্ধ (১৬১০-১৬২০) ঃ আকবরের হাতে আহমদনগরের পতনের পর প্রথম বুরহান নিজাম শাহের একজন দৌহিত্রকে দ্বিতীয় মুর্ত্তাজা নিজাম শাহ উপাধি সহকারে সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। কিন্তু তিনি মালিক আম্বর নামে একজন সত্যিকারের শাসক ও একজন সুযোগ্য, কর্মদক্ষ, যুদ্ধবাজ আবিসিনীয় ক্রীতদাসের হাতের ক্রীড়নক হন। মালিক আম্বর বর্তমান আওরঙ্গাবাদের নিকটবর্তী খিড়কি নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত

করেন। তিনি মারাঠাদের হাল্কা অশ্বারোহী দলকে রাজকীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে কাজে লাগান। তিনি একজন সুযোগ্য সেনাপতি ছিলেন এবং বিশেষ কৃতকার্যতার সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেন। মুঘল ঐতিহাসিক মোতামাদ খান বলেন ঃ "যুদ্ধে, সেনাপতিত্বে, সূক্ষ্ম বিচার শক্তিতে এবং শাসনকার্যে তাঁহার (আম্বর) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমকক্ষ ছিলেন না ------। দেশের গোলযোগপূর্ণ উত্তেজনা তিনি দমন করেন এবং তাঁহার সমুন্নত মর্যাদা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রক্ষা করেন এবং সম্মানে স্বীয় জীবনের ইতি করেন।"[২] মালিক আম্বর এখন বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সহিত শান্তিচুক্তি করেন।

মালিক আম্বরের বিরোধিতা

দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা দানিয়েলের মৃত্যুর পর আহমদনগর রাজ্যের অবশিষ্টাংশ এবং মুঘল বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধাবস্থা চলিতে থাকে। মুঘল কর্মকর্তাগণ একে অপরের প্রতি হিংসা পোষণ করেন। বেরার, খান্দেশ ও রাজকীয় আহমদনগরের সামরিক ঘাঁটিগুলি প্রায়ই হাত বদল হয়। কিন্তু খিড়কিতে মালিক আম্বর শক্তভাবে তাঁহার আধিপত্য বজায় রাখেন। ১৬০৮ সালে খান-ই-খানানকে দাক্ষিণাত্যের সেনাপতিত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু তিনিও স্থানীয় কর্মকর্তাদিগকে দমন করিতে ব্যর্থ হন। ১৬১০ সালে জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র যুবরাজ পারভেজকে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হন। সেই বৎসরেই খান-ই-জাহান পীর লোদী খানকে প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে খান-ই-খানান এক শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন এবং মালিক আম্বর আহমদনগর অধিকার করেন। ১৬১১ সালে দাক্ষিণাত্যের সেনাবাহিনীকে সাহায্য করিবার জন্য গুজরাটের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ খানকে আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু শোচনীয় পরাজয় বরণ করিয়া তিনিও গুজরাটে ফিরিয়া যান। ১৬১২ সালে খান-ই-খানানকে পুনরায় দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত করা হইলে তিনি খিড়কি অধিকার করেন ও ইহাকে ভস্মীভূত করেন।

মুঘল কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা

খান-ই-খানানের ব্যর্থ প্রচেষ্টা

১৬১৬ সালে যুবরাজ পারভেজকে এলাহাবাদে স্থানান্তরিত করিয়া যুবরাজ খুররমকে দাক্ষিণাত্যের সেনাপতিত্ব প্রদান করা হয়। আহমদনগর অধিকার করিয়া যুবরাজ আংশিক সাফল্য অর্জন করেন। মালিক আম্বরকে তিনি শান্তিচুক্তি প্রদান করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন। আম্বর কর্তৃক অধিকৃত সমস্ত এলাকা মুঘলদের নিকট ফেরত দেওয়া হয়। এই সাফল্যের জন্য জাহাঙ্গীর যুবরাজকে 'শাহজাহান' বা 'বিশ্ব সম্রাট' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ত্রিশ হাজার অশ্বারোহীর সেনাপতিত্বে উন্নীত করেন। কিন্তু ইহার দ্বারা যুদ্ধ শেষ হয় নাই। ১৬২০ সালে রাজকীয় বাহিনী দাক্ষিণাত্যে পুনরায় বেকায়দায় পতিত হয়। যুবরাজ শাহজাহানকে পুনরায় সেখানে প্রেরণ করা হয়। আহমদনগরের সৈন্যবাহিনীকে তিনি নর্মদা নদী পার করিয়া দেন এবং তাহাদের অধিকৃত সমস্ত রাজকীয় ঘাঁটিসমূহ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন। দৌলতাবাদে মালিক আম্বর তাঁহার নিকট ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হন। ১৬২৬ সালে মালিক আম্বর প্রাণ ত্যাগ করেন।

যুবরাজ খুররমের নিযুক্তি ও তাঁহার সাফল্য

খুররমের 'শাহজাহান' উপাধি লাভ

দাক্ষিণাত্যে পুনরায় গোলযোগ ও শাহজাহান কর্তৃক দমন

কান্দাহার ঃ সম্রাট আকবরের সময় কান্দাহারকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়

কান্দাহারের ভৌগোলিক অবস্থান ভারত ও পারস্য উভয় দেশের শাসকদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কান্দাহারের প্রভু অতি সহজেই ভারত আক্রমণ করিতে পারেন। অপরপক্ষে ইহার শাসক নিশ্চিন্তে কাবুল ও ইহার পশ্চিমের অংশগুলি অধিকার করিতে পারেন। এই কারণে মুঘলরা কান্দাহারের উপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করে। অধিকন্তু ব্যবসার দিক হইতে ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কান্দাহারই একমাত্র স্থান, যেখানে ভারত, মধ্য এশিয়া, তুরস্ক ও পারস্যের ব্যবসায়িগণ মিলিত হন।

কান্দাহারের গুরুত্ব

১৬০৬ সালের প্রথমভাগে যুবরাজ খসরু যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, পারস্যের সাফাভি শাসক শাহ আব্বাস সেই সুযোগ গ্রহণ করেন এবং খোরাসানীদের মাধ্যমে কান্দাহারে একটি বিদ্রোহ দাঁড় করান। কিন্তু মুঘল শাসনকর্তার কঠোর প্রতিরক্ষার ফলে এই বিদ্রোহ নিষ্ফল হইয়া যায়। শাহ আব্বাস অতঃপর ভিন্নপথ ধরেন। তিনি খোরাসানের নেতৃবর্গকে খুব তিরস্কার করেন এবং অনেক উপঢৌকন সহকারে জাহাঙ্গীরের নিকট একটি দূত প্রেরণ করেন ও জাহাঙ্গীরের নিকট তোষামোদমূলক একটি পত্র প্রদান করেন। কান্দাহারকে জাহাঙ্গীরের প্রহরী মুক্ত করিবার জন্য শাহ্ আব্বাস ১৬১৫, ১৬১৬ ও ১৬২০ সালে তাঁহার নিকট তোষামুদি দূত প্রেরণ করেন। ইহার ফল শাহ্ আব্বাসের জন্য খুবই ফলপ্রসূ হয়। অতঃপর ১৬২১ সালে কান্দাহার অধিকার করিবার জন্য শাহ আব্বাস এক বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং পঁয়তাল্লিশ দিন অবরোধের পর কান্দাহার দুর্গ অধিকার করেন। কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য সম্রাট যুবরাজ শাহজাহানকে আদেশ করেন। শাহজাহান ইতোমধ্যে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ। সম্রাজ্ঞী তাঁহার জামাতাকে সিংহাসনে দিবার জন্য সুপারিশ করেন। যাহা হউক, শাহ্জাহান অগ্রসর হইয়া মান্দুতে থামিয়া যান। পাঞ্জাবের শাসন ক্ষমতা তাঁহার হাতে ছাড়িয়া না দেওয়া পর্যন্ত তিনি অগ্রসর হইতে অস্বীকার করেন। শাহ্জাহান ইহাও সন্দেহ করেন যে, নূরজাহানের উপদেশ অনুসারে তাঁহাকে কান্দাহার হইতে অতি সহজে ছাড়া হইবে না। ফলে কান্দাহার অভিমুখে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও তিনি মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অতঃপর জাহাঙ্গীর যুবরাজ পারভেজকে কান্দাহার অধিকার করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন, কিন্তু আসফ খানের প্ররোচনায় এই আদেশ নাকচ করা হয়। ফলে কান্দাহার পুনর্বিজয় আর সম্ভব হয় নাই।

শাহ্ আব্বাসের প্রচেষ্টা
কান্দাহার হস্তচ্যুত

শাহ্জাহানের বিদ্রোহ (১৬২৩)ঃ সম্রাটের শেষ বৎসরগুলি বিদ্রোহ ও দুর্ঘটনায় আচ্ছন্ন থাকে, তাঁহার স্বাস্থ্যে ভাঙন ধরে এবং তাঁহার পুত্রগণ উত্তরাধিকারের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতে থাকে। এইরূপ সময়ে অনুপস্থিত থাকা যেকোন জনের ভাগ্যে মারাত্মক। ইতোমধ্যে ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান কান্দাহার না গিয়া বিদ্রোহ করেন। আব্দুর রহিম খান-ই-খানান তাঁহার সহিত মিলিত হন। সম্রাট তাঁহার এই দলত্যাগের জন্য খুবই অনুশোচনা ভোগ করেন। শাহজাহানের মূল উদ্দেশ্য ছিল আগ্রা দুর্গে সঞ্চিত অর্থ অধিকার করা। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য যুবরাজ পারভেজ ও মুহাব্বত খানের নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয়। উভয় বাহিনী দিল্লীর দক্ষিণে বালুচপুরে মিলিত হইলে

আগ্রা দুর্গ অবরোধের প্রচেষ্টা ব্যর্থ
শাহ্জাহানের দাক্ষিণাত্যে পলায়ন
বাংলা অধিকার
পুনরায় দাক্ষিণাত্যে পলায়ন

শাহ্জাহান শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলে মুহাব্বত খান তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন; বৃদ্ধ খান-ই-খানান স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করা হয়। মালব ও দাক্ষিণাত্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া শাহজাহান বাংলাদেশ অধিকার করেন এবং অন্য একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন। কিন্তু মুহাব্বত খান তাঁহাকে পুনরায় পরাজিত করেন। যুবরাজ অতঃপর দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। পরবর্তী কয়েক বৎসর তিনি বন্ধু খুঁজিয়া বেড়ান, যাহার মধ্যে মালিক আম্বর উল্লেখযোগ্য।

শেষ পর্যন্ত ১৬২৫ সালে সম্রাট ও বিদ্রোহী যুবরাজের মধ্যে একটি সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা হয়। জামিন হিসাবে শাহজাহান তাঁহার পুত্রদ্বয় দারা শিকোহ ও আওরঙ্গজেবকে জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরণ করেন। পিতার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করেন।

সম্রাটের সঙ্গে সমঝোতা

জাহাঙ্গীরের মৃত্যু (১৬২৭) ঃ অত্যধিক মদ্যপানের ফলে জাহাঙ্গীরের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভাঙিয়া পড়ে। স্বাস্থ্য ঠিক করিবার জন্য তিনি কাশ্মীর ও কাবুল ভ্রমণে বাহির হন। কাবুল ও কাশ্মীর ভ্রমণ ত্যাগ করিয়া তিনি হঠাৎ লাহোর অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃতদেহ লাহোরে আনয়ন করা হয় এবং শাহদারার নিকটবর্তী জাহাঙ্গীরের সমাধিতে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

নূরজাহান ঃ ১৬১১ সালে নূরজাহানের সঙ্গে বিবাহের দ্বারা সম্রাট জাহাঙ্গীরের জীবন ও রাজত্ব গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়। নূরজাহানের প্রকৃত নাম মেহেরুন্নিসা। তিনি পারস্যবাসী অভিজাত মির্জা গিয়াস বেগের কন্যা। ভাগ্যান্বেষণে মির্জা গিয়াস বেগ সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ভারতে আগমন করেন। পথিমধ্যে কান্দাহারে মেহেরুন্নিসার জন্ম হয়। মালিক মাসুদ নামক একজন ধনী ব্যবসায়ীর দ্বারা মির্জা গিয়াস বেগ আকবরের নিকট পরিচিত হন। তাঁহার কঠোর পরিশ্রম ও সততার দ্বারা তিনি কাবুলের দিওয়ানের পদে উন্নীত হন। ১৭ বৎসর বয়সে মেহেরুন্নিসাকে আলী কুলি বেগ বা সাধারণ্যে পরিচিত শের আফগানের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বাংলার জায়গীর প্রদান করেন। জায়গীর পাইবার অনতিকাল পরেই শের আফগান সম্রাটের রোষানলে পতিত হন। তাঁহাকে বন্দি করিয়া দরবারে হাজির করিবার জন্য সম্রাট তাঁহার পালিত ভাই কুতুবুদ্দিনকে প্রেরণ করেন। শের আফগান বিরোধিতা করিলে উভয়েই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করেন। আকবরের একজন বিধবা পত্নী রোকেয়া সুলতানার হেফাজতে শের আফগানের বিধবা পত্নী মেহেরুন্নিসাকে প্রেরণ করা হয়।[৩]

গিয়াস বেগের পারস্য হইতে আগমনের সময় পথিমধ্যে মেহেরুন্নিসার জন্ম
শের আফগানের সঙ্গে বিবাহ
শের আফগানের মৃত্যু
রোকেয়া সুলতানার হেফাজতে

কিছুদিন তিনি অজ্ঞাতভাবেই মুঘল হেরেমে জীবন যাপন করেন। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের নওরোজ উৎসবে নূরজাহানের সৌন্দর্য জাহাঙ্গীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এমনভাবে বিমোহিত করে যে, তিনি শীঘ্রই তাঁহাকে তাঁহার মহিষীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে 'নূরমহল' বা 'প্রাসাদের আলো' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপাধি পরে 'নূরজাহান' বা 'বিশ্বের আলো' উপাধিতে পরিবর্তিত হয়।

জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নিসা দেখেন (১৬১১)
বিবাহ

নূরজাহানের চরিত্র একটি চিত্তাকর্ষক ইতিহাস প্রদান করে। তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, চঞ্চল প্রকৃতি, গভীর সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী এক মহিলা। যে কোন জটিল রাজনৈতিক সমস্যা তিনি অতি সহজে বুঝিতে পারেন। শক্তিশালী মন্ত্রিবর্গ ও রাজনীতিকগণ তাঁহার মীমাংসার নিকট মাথা নত করেন। ডঃ কালী কিংকর দত্ত বলেন, "কিন্তু তাঁহার চরিত্রের সবচাইতে প্রবল গুণ হইল তাঁহার অপরিমিত যশোলিপ্সা, যাহা তাঁহাকে স্বামীর উপর অসীম ক্ষমতা লাভে সহায়তা করে।"[৪] তাঁহার সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে সম্মানিত ও অর্থশালী করা হয়। দিন দিন তাঁহার প্রভাব ও মর্যাদা বাড়িতে থাকে। তাঁহার পিতা গিয়াস বেগ ওরফে ইতিমাদ উদ্দৌলা এবং তাঁহার ভ্রাতা আসফ খান দরবারের বিখ্যাত অভিজাতে পরিগণিত হন। তাঁহার প্রথম ঘরের কন্যাকে জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ার-এর সাথে বিবাহ দিয়া তিনি তাঁহার পদ আরও সুদৃঢ় করেন।

নূরজাহানের চরিত্র

নূরজাহান যথার্থই অসাধারণ সৌন্দর্য এবং ফার্সি সাহিত্য, কবিতা ও চিত্রকলায় চমৎকার রুচির অধিকারী ছিলেন। তিনি খুবই বলশালী ও সাহসী ছিলেন। সম্রাটের সঙ্গে তিনি শিকারে যান এবং হিংস্র ব্যাঘ্র শিকার করেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন এবং শাসনকার্যের কোন কিছুই তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে যাইতে পারিত না। তিনি খুবই দয়ালু ছিলেন এবং এতিম মুসলিম মেয়েদের জন্য তিনি টাকা-পয়সা প্রদান করেন। সমস্ত অত্যাচারিতের জন্য তিনি ছিলেন আশ্রয়স্থল। তাঁহার সময় প্রায় ৫০০ এতিমকে তিনি বিবাহ দিয়াছিলেন।

তাঁহার গুণাবলি

নূরজাহান জাহাঙ্গীরকে খুবই ভালবাসেন। নূরজাহানের অদ্বিতীয় 'ভালোবাসার দ্বারা' জাহাঙ্গীর পৃথিবীর সবকিছুই ভুলিয়া যান। জাহাঙ্গীর স্বয়ং মন্তব্য করেন ঃ "এক কাপ মদ ও এক পাত্র জুসের (সূপ) বিনিময়ে আমার প্রিয় সম্রাজ্ঞীর নিকট আমার সাম্রাজ্য বিক্রয় করিয়াছি।"[৫] জাহাঙ্গীরের উপর নূরজাহান এমন প্রভাব বিস্তার করেন যে, তিনি সাম্রাজ্যের মুদ্রা পর্যন্ত নূরজাহানের নামে খোদাই করেন। রাজকীয় স্বাক্ষর বহনকারী প্রত্যেক ফরমানে "সম্রাজ্ঞী বেগম নূরজাহান" নামও একত্রে দেওয়া হয়।

সম্রাটের উপর প্রভাব

অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নূরজাহান ভ্রমনীতিসম্পন্ন প্রতিভার অপরাধ হইতে মুক্ত ছিলেন না। তাঁহার সমস্ত প্রভাব রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক ছিল না। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ ইহাকে এইভাবে বর্ণনা করেন ঃ "ক্ষমতার জন্য তাঁহার অতিরিক্ত লিপ্সা" তাঁহার মেয়েলী গর্ব এবং সম্রাটকে ক্রীতদাস করিবার জন্য তাঁহার সুচতুর পন্থাসমূহ গোলযোগের সৃষ্টি করে, যাহা সাম্রাজ্যের শান্তিকে গভীরভাবে ব্যাহত করে .... । তাঁহার শত্রুদের সাথে ব্যবহারে তিনি অতি বাড়াবাড়ি করেন এবং পদ বা বংশ কোন লোককে তাঁহার প্রতিহিংসামূলক প্রকৃতি হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।"[৬] তিনি তাঁহার জামাতা শাহরিয়ারকে উত্তরাধিকারীর জন্য মনোনীত করেন, যদিও তিনি সম্যক অবগত ছিলেন যে, শাহজাহানের তুলনায় শাহরিয়ার সম্পূর্ণ অপদার্থ। তাঁহার চক্রান্তমূলক কার্যকলাপের জন্য শাহজাহান কান্দাহার পুনরাধিকারের জন্য অগ্রসর হইতে অস্বীকার করেন এবং ফলে কান্দাহার চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। নূরজাহানের জন্যই রাষ্ট্রের সুযোগ্য কর্মকর্তাগণ অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহ করেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার হাতের ক্রীড়নকবিশেষ

তাঁহার চরিত্রের মন্দ দিক

ছিলেন। সুতরাং তিনি যদিও প্রভাবশালী ছিলেন, কিন্তু তিনি রাষ্ট্রের কল্যাণের পথে একটি কাঁটাও ছিলেন বটে।

জাহাঙ্গীরের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ ঃ ভি. এ. স্মিথ জাহাঙ্গীরকে "কোমলত্ব, নিষ্ঠুরতা, ন্যায়পরায়ণতা ও খামখেয়ালি, শিষ্টাচার ও বর্বরতা, সুবুদ্ধি ও নির্বোধের একটি কঠোর সংমিশ্রণ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[৭] মুঘল ইতিহাসে জাহাঙ্গীর একটি চমৎকার চরিত্র।

মানুষ হিসাবে

তিনি বুদ্ধিমান ও চালাক, এবং অতি সহজেই তিনি রাষ্ট্রের ঘোরালো সমস্যাবলি বুঝিতে পারেন। তাঁহার সম্পর্কে ঐতিহাসিক টেরী লিখেন—"তাহাকে সব সময় আমার কাছে চরম প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়। কারণ, কোন কোন সময় তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর এবং অন্যান্য সময় তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে উদার ও ভদ্র বলিয়া মনে হয়।"[৮]

কার্যপরিচালনার ব্যাপারে জাহাঙ্গীর পুরাপুরিভাবে তাঁহার পিতা আকবরের পদাংক অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেন, যদিও কোন কোন সময় তিনি ব্যর্থ হন। স্মিথ মন্তব্য করেন ঃ "শাসনকার্য সাধারণত আকবরের দেওয়া নীতির উপর ভিত্তি করিয়া পরিচালনা করা হয়;

কার্য পরিচালক হিসাবে

এবং জাহাঙ্গীরের নিজস্ব নিকৃষ্টতার জন্য তাঁহার প্রসিদ্ধ পিতার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে কিছুটা অপকৃষ্টতা থাকা সত্ত্বেও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকে তাঁহার পিতার রাজত্বের অনুরূপই বলা চলে।"[৯] যদিও সম্পূর্ণ একজন স্বেচ্ছাচারী তবুও তিনি একজন সহৃদয় বন্ধু ও দয়ালু পৃষ্ঠপোষক।

শাসক হিসাবে সম্রাট জাহাঙ্গীর মনুষ্যত্ব, অমায়িক ব্যবহার ও খোলা হৃদয়ের জন্য উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন মন্তব্য করেন ঃ "রাজত্বের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত

শাসক হিসাবে

প্রজাদের প্রতি জাহাঙ্গীরের ব্যবহার প্রতিনিয়তই দয়ালু ও মান্যগণ্য বলিয়াই মনে হয়।" প্রফেসর জাফর বলেন, "জাহাঙ্গীর অত্যন্ত বলিষ্ঠ একজন বড় মাপের শাসক। তিনি যদি নিজেকে নূরজাহানের প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে পারিতেন, তবে তিনি তাঁহার পিতার সমকক্ষ একজন মহৎ শাসক হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করিতে পরিতেন।"

বিচার বিভাগে সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজেকে একজন কঠোর বিচারক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শক্ত হাতে তিনি অত্যাচার দমন করেন। সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশেও আইন-শৃঙ্খলা অবহেলিত ছিল না। শাস্তি প্রদান করিবার সময় দোষী ব্যক্তির পদমর্যাদার প্রতি তিনি

ন্যায় বিচারে

ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। ডঃ বেণী প্রসাদের মতানুসারে—"জাহাঙ্গীর ছিলেন একজন বুদ্ধিমান, দয়ালু ব্যক্তি এবং তৎসঙ্গে তাঁহার গভীর পরিবারিক স্নেহও ছিল; তাঁহার উদারতা ছিল সবার প্রতি অম্লান, অত্যাচারের প্রতি ছিল তাঁহার প্রবল ঘৃণা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি ছিল একান্ত আগ্রহ।"

জাহাঙ্গীর শিল্প ও সাহিত্যের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং নিজেও সুন্দর ও সুরুচির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত ইতিবৃত্ত 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' তাঁহার

শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

সাহিত্যিক জ্ঞানের পরিচায়ক। তিনি স্থাপত্য শিল্প ও চিত্রাংকন ভালবাসেন; এবং একটি চিত্রশিল্পের ভাল ও মন্দ দিক লইয়া সমালোচনা করিতে পারেন। চিত্রশিল্পীরা সাধারণত তাঁহার দরবারে পুরস্কৃত হন। কিন্তু এইসব মহৎ গুণাবলি

তাঁহার মদ্যপানের আসক্তির দ্বারা কিছুটা মলিন হইয়া যায়। সাধারণত তিনি দৈনিক বিশ কাপ মদ্য পান করেন। কিন্তু অপরিমিত সুরাপানের দ্বারা তাঁহার স্বাস্থ্য এমনভাবে ভাঙিয়া যায় যে, তিনি স্বহস্তে পান করিতে পারিতেন না এবং অন্যরা তাঁহাকে সাহায্য করিতে হইত।

বিদেশী পর্যটক ঃ সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল ইউরোপীয়দের সহিত সম্পর্ক। এক শতাব্দী পূর্বে কালিকটে আগমনকারী ভাস্কো ডি গামার নেতৃত্বে পর্তুগীজরা ইতোমধ্যে ভারত মহাসাগরে একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়। বিজাপুর রাজ্য হইতে তাহারা গোয়া ছিনাইয়া লয়। কিন্তু তাহাদের উগ্র অসহনশীলতার ফলে তাহারা মুঘলদের অপ্রিয়ভাজন হইয়া পড়ে। তাহাদের দেশ ছিল অত্যন্ত গরীব। অধিকন্তু স্পেন কর্তৃক সাময়িকভাবে কবলিত (১৫৮০-১৬৪০ খ্রি) হইবার ফলে ভারতে তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে ডাচ্ নামে আরেকটি ইউরোপীয় শক্তি প্রাচ্য সমুদ্রে অবতরণ করে। শীঘ্রই তাহারা স্পেন ও পর্তুগালের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়।

পর্তুগীজদের আগমন
ডাচ্

জাহাঙ্গীরের সময় ইংরেজগণ ভারতে আগমন করে। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয় এবং ১৬০৮ সালে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হ'কিন (William Hawkins') রাজা প্রথম জেম্‌স-এর নিকট হইতে একটি পত্র লইয়া ব্যবসার সুবিধাদির জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট আগমন করেন। পর্তুগীজরা হ'কিন্সের আগমনে অসন্তোষ প্রকাশ করিলেও ইংরেজরা সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করে এবং সম্রাট তাঁহাকে একটি রাজকীয় পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু পর্তুগীজদের ষড়যন্ত্রের ফলে হ'কিন্স সমস্ত অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ও পর্তুগীজদের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে ইংরেজরা কৃতকার্যতা লাভ করে এবং সম্রাট তাহাদের উপর খুবই সন্তুষ্ট হন। মুঘলদের কোন শক্তিশালী নৌবাহিনী না থাকায় ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজরা কয়েকটি রাজকীয় জাহাজ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিতে সাহস করে। ফলে ভারতে বসবাসকারী সমস্ত পর্তুগীজদিগকে বন্দি বা বহিষ্কার করা হয়। মুঘল পর্তুগীজ সম্পর্কের সুযোগ লইয়া ১৬১৫ সালে উইলিয়াম এডওয়ার্ডস্ পুনরায় প্রথম জেমস্-এর নিকট হইতে পত্র লইয়া মুঘল দরবারে উপস্থিত হন। একই বৎসর আরেকটি প্রতিনিধি দল আসে এবং থমাস রো (Thomas Roe) সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হন। এইবারে যদিও সত্যিকারের কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই, কিন্তু এই প্রতিনিধি দলটি নিঃসন্দেহে কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছিল।

ইংরেজগণ, উইলিয়াম হ'কিন্স
ইংরেজ ও পর্তুগীজদের মধ্যে দ্বন্দ্ব
পর্তুগীজদের বহিষ্কার
ইংরেজদের প্রতিনিধি দলের সাফল্য

পাদটীকা

১। প্রার্থনা ও প্রশংসার জন্য নির্ধারিত জমি।

২। In warfare, in command, in sound judgement and in administration, he (Amber) had no rival or equal -----. He kept down the turbulent spirits of the country and maintained his exal-ted position to the end of his life and closed his life in honour.

৩। এই কথা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই যে, মেহেরুন্নিসাকে বিবাহ করিবার জন্য জাহাঙ্গীর শের আফগানকে হত্যা করেন। ডঃ বেণী প্রসাদ এইমত পোষণ করেন যে, জাহাঙ্গীর ইতোপূর্বে মেহেরুন্নিসাকে কখনও দেখেন নাই, আকবরও তাহাদের বিবাহে অমত হন নাই, এবং ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নিসাকে সর্বপ্রথম দেখেন।

৪। But the most dominating tract of his character was her inordinate ambition, which led her to establish an unlimited ascend over her husband— K. K. Datta : *An Advanced History of India.*

৫। I have sold my Kingdom to my beloved Queen for a cup of wine and a dish of soup.

৬। Her inordinate love of power, her womanly vanity, and her subtle devices to make the emperor her slave led to troubles, which seriously threatened the peace of the empire ----- She went too far in dealing with her enemies, and neither rank nor births could shield a man against her revengeful spirit.

৭। A strong compound of tenderness, cruelty, justice and caprice, refinement and brutality, good sense and childhoodness.— V. A Smith : *Oxford History of India.*

৮। Now for the disposition of that King it ever seemed unto me to be composed of extremes : for sometime he was cruel and at other time he would seem to be exceedingly fair and gentle.

৯। The administration generally was conducted on the lines laid down by Akbar, and the reign of Jahangir may be regarded as a continuation of that of his father marked by a certain account of deterioration due to Jahangir's personal inferiority when compared with his illustrious parent.—V.A Smith. *Oxford History of India.*

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

Beni Prasad : *History of Jahangir.*

Rogers and Baveridge : *Memoirs Jahangir, Vol. I & II.*

Sir Thomas Roe : *The Embassy of Sir Thomas Roe to the Court of the Great Mughal (1615-1619) as narrated in his journal and correspondence edited by Forster.*

Mereland : *India from Akber to Aurangzib.*

Scott : *Firista's History of the Deccan.*

Zakaullah : *Tarikh-i-Hindustan.*

ষষ্ঠ অধ্যায়
শাহ্‌জাহান
(খ্রিঃ) ১৬২৭-১৬৫৮

প্রাথমিক জীবন ঃ তাঁহার আসল নাম খুররম। ১৫৯২ সালে তিনি লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের চারি পুত্রের একজন। বীরত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও দায়িত্বজ্ঞানের জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে অনেকগুলি অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব দেন। পনের বৎসর বয়সে তিনি ৮,০০০ জাত ও ৫,০০০ সাওয়ারের মনসব লাভ করেন। ১৬১১ সালে তাঁহাকে ১০,০০০ জাত ও ৫০০০ সাওয়ারের মনসব প্রদান করা হয়। ১৬১২ সালে তিনি আসফ খানের কন্যা মমতাজ মহলকে বিবাহ করেন। তৎসঙ্গে তাঁহাকে ৩০,০০০ জাত ও ২০,০০০ সাওয়ারের পদে উন্নীত করা হয়।

প্রায় প্রত্যেকেই ধরিয়া লইয়াছিল, যুবরাজ শাহ্‌জাহান সম্রাট জাহাঙ্গীর-এর উত্তরাধিকারী হইবেন। কিন্তু যুবরাজ শাহ্‌রিয়ারের সঙ্গে নূরজাহানের কন্যার বিবাহের পর শাহ্‌জাহানের ভাগ্য সাময়িকভাবে মন্দ হইয়া পড়ে। কারণ, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান তাঁহার জামাতার দাবি সর্বাগ্রে তুলিয়া ধরেন। এইজন্যই ১৬২২ সালে শাহ্‌জাহান বিদ্রোহ করেন। ১৬২৫ সালে যদিও পিতা-পুত্রের মধ্যে একটি শান্তিপূর্ণ চুক্তি সম্পাদিত হয়, তবুও নূরজাহান তাঁহার জামাতা শাহ্‌রিয়ারের দাবিতে অবিচল থাকেন। ১৬২৭ সালে জাহাঙ্গীর-এর মৃত্যুর পর নূরজাহান শাহ্‌রিয়ারকে সিংহাসনে স্থাপনের জন্য আগ্রা হইতে লাহোর লইয়া আসেন। অপরদিকে দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকারী শাহ্‌জাহানের জন্য তাঁহার শ্বশুর ও নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খান চেষ্টা করিতে থাকেন। আসফ খান খুব শক্তিশালী অভিজাত ছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে শাহ্‌জাহানের আগমন পর্যন্ত অস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসাবে যুবরাজ খসরুর পুত্র দাওয়ার খানকে তিনি সিংহাসনে স্থাপন করেন। এইভাবে নূরজাহান পরাজিত হইয়া রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৬২৮ সালে শাহ্‌জাহান দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। দাওয়ার খানকে পারস্যে চলিয়া যাইতে অনুমতি প্রদান করা হইলে অবশিষ্ট জীবন তিনি সেখানেই অতিবাহিত করেন। ১৬৪৫ সালে নূরজাহান প্রাণ ত্যাগ করেন।

উত্তরাধিকারে গোলযোগ

বান্দেলাদের বিদ্রোহ ঃ সম্রাট আকবরের সময় জাহাঙ্গীরের প্ররোচনায় রাজা বীর সিং শেখ আবুল ফজলকে হত্যা করিয়া বান্দেলখণ্ডের রাজা হন। তাঁহার পুত্র রাজা ঝুঝার সিং এখন বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য শীঘ্রই মুহাব্বত খানের অধীনে একটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়। ফলে রাজা আত্মসমর্পণ করেন এবং ১৫ লক্ষ টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা শাহ্‌জাহানের উপহার হিসাবে

প্রদান করিতে স্বীকার করেন। ইহা ছাড়া দাক্ষিণাত্য অভিযানে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য তিনি ৪০টি হাতি এবং ২০০০ পদাতিক ও ২০০০ অশ্বারোহীর একটি সেনাবাহিনী প্রদান করেন। কিন্তু প্রাকৃতিক পর্বত বেষ্টনীর সুযোগ গ্রহণ করিয়া ১৬৩৪ সালে রাজা ঝুঝার সিং পুনরায় বিদ্রোহ করেন। তাঁহার দুষ্কৃতিমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করিবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বান্দেলা দুর্গসমূহ একে একে অধিকার করা হয় এবং ঝুঝার সিং নিজের দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পলায়নের সময় তিনি গোণ্ডদের দ্বারা নিহত হন।

খান জাহান লোদীর বিদ্রোহ (১৬২৮) ঃ সম্রাট শাহ্জাহানের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসর খান জাহান লোদী নামে একজন আফগান অভিজাত আহমদাবাদের নিজাম-উল-মুলকের সঙ্গে মিলিত হইয়া বিদ্রোহ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের প্রধান সেনাপতি ও শাসনকর্তা ছিলেন। শাহ্জাহান চিন্তা করেন, খান জাহান যদি দাক্ষিণাত্যবাসীদের সহিত মিলিত হন, তবে সেখানে মুঘলদের অবস্থা সংকটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইবে। অতঃপর আজম খান নামে একজন মুঘল সেনাপতিকে খান জাহানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইলে খান জাহান স্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করেন। সাহায্যের জন্য তিনি বিজাপুর দরবারে হাজির হন, কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া রাজা ঝুঝারের পুত্র রাজা বিক্রমজিতের নিকট সাহায্যের জন্য তিনি বান্দেলখণ্ডে উপস্থিত হন। এইখানেও ভাগ্য তাঁহার সহায়তা করে নাই। ১৬৩০ সালে কালিঞ্জরের নিকট যুদ্ধাবস্থায় তিনি নিহত হন।

ভীষণ দুর্ভিক্ষ (১৬৩০–১৬৩২) ঃ প্রবল অনাবৃষ্টির ফলে দাক্ষিণাত্য, গুজরাট ও খান্দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। হাজার হাজার লোক অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। ঐতিহাসিক আব্দুল হামিদ লাহোরী জনসাধারণের দুর্ভোগের একটি বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন ঃ "একটি রুটির বিনিময়ে জীবন দান করা হইত। কিন্তু কেহই তাহা ক্রয় করিত না; একটি পিঠার পরিবর্তে পদ বিক্রয় হইত, কিন্তু কেহই উহার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিত না.....। অনেকদিন পর্যন্ত ছাগলের মাংসের পরিবর্তে কুকুরের মাংস বিক্রয় হয় এবং মৃত ব্যক্তির গুঁড়া হাড়গুলিকে আঠার সঙ্গে মিশাইয়া বিক্রয় করা হয়। ইহা যখন আবিষ্কার করা হয়, তখন বিক্রেতাদিগকে শাস্তি দেওয়া হয়।" মানুষের এই দুর্দশা দেখিয়া সম্রাটের খুবই সহানুভূতি হয়। অনতিবিলম্বে জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করিবার জন্য বোরহানপুর, আহমদাবাদ ও সুরাট প্রদেশে তিনি লঙ্গরখানা খোলার আদেশ দেন। প্রত্যেক সোমবার বোরহানপুরে জনসাধারণের মধ্যে ৫০০ টাকা বিতরণ করা হয়। শুধুমাত্র আহমদাবাদের জন্য সম্রাট ৫০,০০০ টাকা মঞ্জুর করেন। এছাড়া খাস জমিসমূহ হইতে প্রাপ্ত সরকারি খাজনা হইতে ৭০ লক্ষ টাকা পাঠানো হয়। এইভাবে খাদ্যাবস্থা আয়ত্তে আনা হয়।

মমতাজ মহলের মৃত্যু ঃ আরজুমন্দবানু বেগম উপাধিতে নবাব আলীয়া বেগম এবং সাধারণ্যে পরিচিত সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল আসফ খানের কন্যা। ১৬১২ সালে যুবরাজ শাহ্জাহানের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মমতাজ মহলের ঘরে শাহ্জাহানের ১৪টি সন্তানের জন্ম হয়। স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের প্রতি গভীর ভালোবাসায় আবদ্ধ ছিলেন। ১৯ বৎসর সুখের বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করিয়া ৩৯ বৎসর বয়সে সন্তান প্রসবের সময় মমতাজ মহল

১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে বোরহানপুরে প্রাণত্যাগ করেন।

সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন এবং অসামান্য রূপের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার জীবনকালে কোন কুকীর্তি শাহ্জাহানের চরিত্রকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। দরিদ্র ও পীড়িত ব্যক্তিদের জন্য তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করেন। সম্রাট শাহ্জাহান তাঁহাকে এতই ভালোবাসেন যে, তিনি সর্বান্তকরণে সম্রাজ্ঞীর স্মৃতি বজায় রাখেন এবং বাকি জীবনে পুনরায় বিবাহ করেন নাই। তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শাহ্জাহান সকল যুগের অতি আশ্চর্য ইমারত তাজমহল নির্মাণ করেন।

পর্তুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধ (১৬৩১–৩২) ঃ শাহজাহানের রাজত্বের প্রাথমিক যুগের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল পর্তুগীজদের দমন। পর্তুগীজরা তাহাদের উপনিবেশ হুগলির আশেপাশে হীন আচরণ আরম্ভ করে। তাহারা প্রায়ই হিন্দু ও মুসলিম নাগরিকদিগকে জোরপূর্বক খ্রিস্টান ধর্মে টানিয়া লইতে আরম্ভ করে। অধিকন্তু তাহারা ক্রীতদাস ব্যবসা এমনভাবে আরম্ভ করে যে, একবার তাহারা সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের দুইটি ক্রীতদাসী জোরপূর্বক ধরিয়া লইয়া যায়। ঐতিহাসিক ইলিয়ট ও ডাউসন (Elliot and Dowson) মন্তব্য করেন ঃ "এইসব ঘৃণ্য কার্যকলাপ শুধু তাহাদের কবলিত স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং নদীর দুইধারে যাহাকেই তাহারা পাইত ধরিয়া লইয়া যাইত।" সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই সম্রাট এইসব কার্যকলাপের আভাস পান। তাহাদিগকে উত্তম শিক্ষা দিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হন।

সিংহাসনে আরোহণের পর এইসব ঘৃণিত বিদেশীদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য ১৬৩১ সালে তিনি কাশিম খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। এতদুদ্দেশ্যে বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয়। পর্তুগীজদিগকে চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করা হয় এবং হুগলি অবরোধ তিন মাস স্থায়ী করা হয়। সুকৌশলে অবস্থানের ফলে তাহারা কঠোরভাবে বাধা প্রদান করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক ক্ষয়-ক্ষতির বিনিময়ে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। দশ হাজারেরও অধিক সংখ্যক পর্তুগীজকে হত্যা করা হয় এবং ইহার অধিক সংখ্যককে বন্দি করা হয়। পর্তুগীজদের ধর্মোন্মাদনাকে সম্রাট মনে প্রাণে ঘৃণা করেন। বন্দিদিগকে তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিবার বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিবার বা ক্রীতদাস হইয়া যাইবার শর্ত আরোপ করেন। তাহাদের অনেকেই বন্দিদশায় মৃত্যুবরণ করে। এইভাবে পর্তুগীজদের দমন করা হয়।

দাক্ষিণাত্যের ঘটনাবলি (১৬৩০–৫৬) ঃ সম্রাট আকবর খান্দেশ ও বেরারের কিছু অংশ জয় করিয়াছিলেন। আহমদনগর তিনি জয় করিলেও তাহা সুদৃঢ় ছিল না এবং যুবরাজ সেলিমের হঠাৎ বিদ্রোহের ফলে সমস্ত আকাঙ্খা অপূর্ণ রাখিয়া তাঁহাকে আগ্রায় ফিরিয়া যাইতে হয়। দাক্ষিণাত্যে আকবর অনুসৃত অগ্রবর্তী নীতি তাঁহার উত্তরাধিকারীদের সময়ও চালিতে থাকে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় আহমদনগরের নিজাম শাহী বংশ মুঘলদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। কিন্তু সুযোগ্য উজির মালিক আম্বর এই বংশকে মুঘলদের কবল হইতে রক্ষা করেন। ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে মালিক আম্বরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিজাম শাহী বংশের ভাগ্য বিড়ম্বনা আরম্ভ হয়।

দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা খান জাহান লোদীর সহিত সুলতান নিজাম-উল-মুলকের আঁতাতের ফলে সম্রাট শাহজাহান আহমদনগর আক্রমণের সূত্র খুঁজিয়া পান। আহমদ-

নগরের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা শাহ্জাহানের কাজ সহজ করিয়া দেয়। মালিক আম্বরের পুত্র ও আহমদনগরের তৎকালীন উজির ফতেহ্ খান সুলতানের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হন। সুতরাং উজির সুলতানের বিরুদ্ধে সম্রাটের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন। তিনি নিজাম-উল-মুলককে হত্যা করিয়া হোসাইন শাহ নামে দশ বৎসরের এক বালককে সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু ১৬৩১ সালে মুঘলরা বিজাপুরীদের হাত হইতে দৌলতাবাদ দুর্গ অধিকার করিতে অগ্রসর হইলে ফতেহ্ খান মত পরিবর্তন করেন এবং মুঘলদের নিকট দুর্গ আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত দুই মাস অবরোধের পর মুঘল সেনাপতি মহব্বত খান অনেক টাকা-পয়সার বিনিময়ে ফতেহ্ খানকে ক্রয় করেন এবং অতি সহজে দুর্গে প্রবেশ করেন। অতঃপর হোসাইন শাহ্কে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দি করা হয় এবং তাঁহার রাজত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ফতেহ্ খানকে মুঘলদের অধীনে চাকুরি প্রদান করা হয়।

মুঘলদের সঙ্গে প্রাথমিক সম্পর্ক

ভারতের পূর্ব উপকূলে উত্তরদিকে উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় গোলকুণ্ডা রাজ্য অবস্থিত। ১৬২৯ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার মুঘল শাসনকর্তা বাকের খান মনসুরগড় দুর্গ আক্রমণ করেন। গোলকুণ্ডা ও উড়িষ্যার মাঝামাঝি একটি সরু গিরিপথের উপর আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য গোলকুণ্ডা রাজ্য এই দুর্গটি নির্মাণ করে। অনেক সুবিধাদি থাকা সত্ত্বেও গোলকুণ্ডা বাহিনী মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করিতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তী বৎসর মুঘলগণ তেলিঙ্গানা আক্রমণকরত এই প্রদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধিকার করে। এইভাবে গোলকুণ্ডা রাজ্যে মুঘলদের অনধিকার প্রবেশ আরম্ভ হয়।

গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে

১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে মুঘল বাহিনী আহমদনগর আক্রমণ করিলে বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ্ আহমদনগরকে সমর্থন করেন। ফলে সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া বিজাপুরের রাজধানী অবরোধ করিবার জন্য আসফ খানকে প্রেরণ করেন। বিজাপুরীরা যোগ্যতার সহিত এই আক্রমণ প্রতিহত করিলে মুঘল বাহিনী অবরোধ তুলিয়া লইতে বাধ্য হয়। এইভাবে বিজাপুর রক্ষা পায়। মমতাজ মহলের মৃত্যুর জন্য সাময়িকভাবে অভিযান বন্ধ করা হয়। ১৬৩৫-৩৬ সালে আরো ব্যাপকভাবে অভিযান পরিচালনা করা হয়। কারণ, মারাঠা নেতা শাহ্জী ভোসলে তখন আহমদনগরের সিংহাসনে আরেকটি নিজাম শাহী বালককে স্থাপন করিয়া নিজেই রাজ্য পরিচালনা আরম্ভ করিয়া দেন। মুঘল আধিপত্য স্বীকার করা, মুঘলদিগকে কর প্রদান করা এবং শাহ্জীর প্রতি সমর্থন বন্ধ করিবার জন্য সম্রাট বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার নিকট লিখিত আদেশ প্রদান করেন। গোলকুণ্ডার সুলতান ইতোমধ্যেই মুঘল শক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। সুতরাং তিনি নীরবে সম্রাটের নিকট নতি স্বীকার করিয়া কর দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বিজাপুরের সুলতান সম্রাটের আদেশ মান্য করিতে অস্বীকার করেন। শাহ্জাহান দুই ডিভিশন সৈন্য প্রেরণ করেন—খান জামান-এর নেতৃত্বে এক ডিভিশন, শাহ্জীর বিরুদ্ধে, খান দাওরান-এর নেতৃত্বে এক ডিভিশন বিজাপুরের রাজধানীর বিরুদ্ধে। বিজাপুরীরা তাহাদের সাবেক নীতি— শত্রুদের রসদ বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং শত্রু ব্যবহৃত সমস্ত কূপ বিষাক্ত করিয়া দিবার নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু মুঘল বাহিনীর হাতে জনসাধারণের বিপুল সংখ্যক নিহত হইবার ফলে এই নীতি ব্যর্থ হয়। অতঃপর সুলতান শান্তি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন। এক চুক্তির ফলে আদিল শাহ বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে রাজি হন। তৎপরিবর্তে সুলতান আহমদনগরের কিয়দংশ লাভ করেন। খান জামান-

বিজাপুরের সঙ্গে যুদ্ধ

এর নেতৃত্বে আরেক ডিভিশন সৈন্যও অনুরূপ সাফল্য লাভ করে। অতিরিক্ত প্রতিরক্ষার আর প্রয়োজন নাই বুঝিতে পারিয়া শাহ্জী অতঃপর সম্রাটের নিকট নতি স্বীকার করেন।

ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড ও গ্যারেট মন্তব্য করেন—'মুঘলদের এই সাফল্যের ফল হইল, দাক্ষিণাত্যে বিশ বৎসরের জন্য তুলনামূলক নিস্তব্ধতা।'[১] আহমদনগর রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের শাসকগণ দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা গ্রহণ করিলেন।

দাক্ষিণাত্যে যুবরাজ আওরঙ্গজেব (১৬৩৬-৪৪) ঃ

১৬৩৬ সালে যুবরাজ আওরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করা হয়। দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের আধিপত্য ছিল তখন খান্দেশ, বেরার, তেলিঙ্গানা ও দৌলতাবাদ-এ। এই অঞ্চলের বাৎসরিক আয় ছিল আনুমানিক পাঁচ কোটি টাকা এবং এই আয় হইতেই তাঁহাকে সামরিক ও বেসামরিক সমস্ত খরচ বহন করিতে হয়। অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি প্রায় আট বৎসর অতি যোগ্যতার সহিত শাসনকার্য চালাইয়া যান। স্যার যদুনাথ সরকার বলেন—"১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে যুবরাজ (আওরঙ্গজেব) তাঁহার কার্যাবলিতে ইস্তফা দেন এবং তাঁহার কার্যকলাপে দারা শিকোর হিংসাত্মক হস্তক্ষেপ ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি শাহ্জাহান-এর পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদে তিনি নির্জন জীবন আরম্ভ করেন।"[২]

১৬৫৩ সালে আওরঙ্গজেবকে পুনরায় দাক্ষিণাত্যে রাজপ্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার আট বৎসরের অনুপস্থিতিতে এই দেশ পর পর অনেকগুলি অযোগ্য কর্মকর্তা দ্বারা শাসিত হয়। আওরঙ্গজেব খুবই সৌভাগ্যবান, তাই তিনি মুর্শিদ কুলি খান নামক একজন সুযোগ্য অর্থনীতিবিদের সহায়তা লাভ করেন। মুর্শিদ কুলি খান দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। টোডরমল-এর জরিপ ব্যবস্থাকে কিছুটা রদবদলের দ্বারা তিনি তাহা গ্রহণ করেন। অতঃপর যুবরাজ গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

দ্বিতীয় রাজপ্রতিনিধিত্ব অর্থনীতি পুনর্গঠন

গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিবার পিছনে অনেক কারণ রহিয়াছে। প্রথমত, ১৬৩৩ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে মুঘলদের নিকট বার্ষিক কর প্রদানে গোলকুণ্ডার সুলতানের ব্যর্থতা। তাহারা সর্বদাই "নানা অজুহাত দেখাইয়া রাজকীয় দাবি এড়াইয়া যায়"। সুতরাং বকেয়া খাজনার পরিবর্তে আওরঙ্গজেব সুলতানের রাজ্যের একটি অংশ দাবি করিলে সেই দাবি বাতিল করা হয়। দ্বিতীয়ত, গোলকুণ্ডার সুলতান কর্তৃক কর্নাটক বিজয় সম্রাট মঞ্জুর করেন নাই। অতএব, উল্লিখিত অপরাধের জন্য একটি মোটা অংক অবিলম্বে প্রদানের দাবি করা হয়। কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হয়। তৃতীয়ত, সুলতানের প্রতি বিশেষ কার্যাবলির বিনিময়ে তিনি মীর জুমলাকে কর্নাটকে একটি জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং এখন তিনি (সুলতান) মীর জুমলার জায়গীরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং মীর জুমলাকে অন্ধ করিতে গিয়া ব্যর্থ হন। মীর জুমলা পলাইয়া মুঘলদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। আওরঙ্গজেব এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে মনস্থ করেন এবং গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। কিন্তু বিজয়ের প্রাক্কালে যুবরাজ দারার প্ররোচনায় সম্রাট যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ প্রদান করেন। ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি দ্বারা গোলকুণ্ডার সুলতান ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটি মোটা

গোলকুণ্ডা অভিযানের কারণ ১৬৫৬ সালের চুক্তি

অঙ্ক প্রদান করিতে এবং তাঁহার রাজ্যের কিছু অংশ মুঘলদের নিকট ছাড়িয়া দিতে রাজি হন। মীর জুমলার জায়গীর পুনরায় প্রদান করিতে এবং তাঁহার পুত্র মুহাম্মদ আমিনকে ছাড়িয়া দিতেও সুলতান রাজি হন।

বিজাপুর-এর সুলতানের সঙ্গে সম্রাটের সম্পর্ক প্রথম হইতেই শত্রুভাবাপন্ন ছিল। অধিকন্তু, আওরঙ্গজেব-এর সঙ্গে শত্রুতা হইবার যথেষ্ট কারণও রহিয়াছে। বিজাপুরের মুহাম্মদ আদিল শাহ যুবরাজ দারা শিকোর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে আদিল শাহ্ প্রাণ ত্যাগ করিলে দ্বিতীয় আলী নামে ১৮ বৎসরের এক বালককে সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। সম্রাটের আদেশপত্র লইয়া আওরঙ্গজেব হঠাৎ বিজাপুরের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় সুলতান শান্তি প্রার্থনা করেন এবং এক চুক্তি অনুসারে তিনি বিদার, কল্যাণী ও পুরিন্দা মুঘলদের হাতে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হন। সেই চুক্তি অনুসারে সুলতান ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এক কোটি টাকা দিতেও রাজি হন। বিজাপুরের বিরুদ্ধে পুনরায় আক্রমণ আপাতত মুলতবি রাখিতে হয়। কারণ, আওরঙ্গজেব অতঃপর উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ব্যস্ত হইয়া পড়েন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ঃ

ভারত ও পারস্যের বাণিজ্য পথের মধ্যে কান্দাহার ছিল প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। তাই এই নগরী পারস্যের শাহ ও ভারতের সম্রাটের নিকট খুবই মূল্যবান। ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন এই প্রদেশটি তাঁহার ভ্রাতা আসকারী হইতে ছিনাইয়া নেন। কিন্তু তাঁহার নির্বাসনের সময় ইহা একটি পারস্য প্রদেশে পরিণত হয়। ১৫৯৫ সালে কান্দাহার-এর পারস্য শাসনকর্তার সৌজন্যে আকবর ইহা অধিকারে রাখেন। ১৬২৩ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীর-এর রাজত্বকালে ইহা পুনরায় পারস্যের হাতে চলিয়া যায়। ১৬৩৮ সালে কান্দাহার-এর পারস্য-শাসনকর্তা আলী মর্দান খানের সঙ্গে চুক্তি করিবার জন্য শাহজাহান কাবুলের শাসনকর্তাকে নির্দেশ দেন। তদনুসারে কাবুলের শাসনকর্তা আলী মর্দান খানকে এক লক্ষ টাকা বখশিশ প্রদান করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার পরিবারবর্গ সহকারে মুঘল রাজধানীতে প্রেরণ করেন। সম্রাট তাঁহাকে সম্মানিত করেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ অর্পণ করেন। এইভাবে কান্দাহার পুনরায় মুঘলদের হস্তগত হয়।

কান্দাহার

আলী মর্দান খান-এর বিশ্বাসঘাতকতার দরুন কান্দাহার প্রদেশ পারস্যের হস্তচ্যুত হইলেও পারস্যের দ্বিতীয় শাহ্ আব্বাস মুঘলদের হাত হইতে ইহা পুনরাধিকার করিবার শপথ গ্রহণ করেন। ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কান্দাহার ও প্রতিবেশী দুর্গ বাস্ত ও জমিন্দাওয়ার-এর বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযান প্রেরণ করেন। এইসব প্রতিবেশী দুর্গসমূহ বেশ কিছুদিনের জন্য টিকিয়া থাকে; কিন্তু কান্দাহারের অযোগ্য শাসনকর্তা দৌলত খান সাহস হারাইয়া ফেলেন। তিনি তাহার পরিবারের নিরাপত্তার জন্য খুবই ব্যস্ত হইয়া পড়েন। যুবরাজ আওরঙ্গজেব-এর নেতৃত্বে নূতন সৈন্য প্রেরণ করিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি আত্মসমর্পণ করেন এবং কান্দাহার চিরদিনের জন্য মুঘলদের হস্তচ্যুত হয়।

কান্দাহার পুনরাধিকার করিবার জন্য শাহ্জাহান বদ্ধপরিকর হন এবং আওরঙ্গজেবকে

৬০,০০০ অশ্বারোহী ও ১০,০০০ পদাতিক বাহিনী সহকারে তথায় প্রেরণ করেন। বিশ দিন পর্যন্ত অবরোধ স্থায়ী হয়; কিন্তু কোন সাফল্য দেখা গেল না। ভারী অবরোধ সামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া যুবরাজ আওরঙ্গজেবকে পুনরায় কান্দাহার প্রেরণ করা হয়। অবরোধ পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য সম্রাট স্বয়ং কাবুলে শিবির স্থাপন করেন। এইবারের অবরোধ দুই মাস আট দিনেরও অধিককাল স্থায়ী হয়। কিন্তু কোন সাফল্য অর্জিত হয় নাই। মুঘল গোলন্দাজ বাহিনী ও কামানের তুলনায় পারস্যের কামান ছিল উঁচুমানের। আওরঙ্গজেব-এর প্রতিবাদ সত্ত্বেও শাহ্‌জাহান অবরোধ তুলিয়া লইবার আদেশ প্রদান করেন এবং অহেতুক আওরঙ্গজেবকে এই অকৃতকার্যতার জন্য দোষারোপ করেন।

প্রথম কান্দাহার অবরোধ দ্বিতীয় অবরোধ (১৬৫২)

তৃতীয় অবরোধ পরিচালনা করেন যুবরাজ দারা শিকোহ, যিনি এক সপ্তাহের মধ্যে কান্দাহার অধিকার করিবেন বলিয়া অহংকার করেন। এইবার কান্দাহার অবরোধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় এবং এই ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়। কিন্তু "দারা সর্বদাই নির্বোধের স্বর্গে বাস করিয়া আসিতেছেন। সচরাচর তিনি তোষামোদে অভ্যস্ত। তাই সমাগত ভয়াবহ কর্তব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে তিনি ব্যর্থ হন।"[৩] — মন্তব্য করেন ঈশ্বরী প্রসাদ। অবরোধ সাত মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং শেষ পর্যন্ত মুঘল বাহিনী হতাশ হইয়া পড়ে। ফলে এই প্রচেষ্টা ত্যাগ করিতে হয়। ১৬৫৩ সালের পর কান্দাহার পুনরাধিকারের আর কোন প্রচেষ্টা চালানো হয় নাই।

তৃতীয় অবরোধ (১৬৫৩)

বল্‌খ্‌ ও বাদাখ্‌সান ঃ

বল্‌খ্‌ ও বাদাখ্‌সান আমির তৈমুর-এর রাজ্যের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই ঐগুলি দখল করিবার জন্য শাহ্‌জাহান-এর স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেই সময় বল্‌খের রাজপরিবারে একটি বিবাদ বিদ্যমান ছিল এবং শাহ্‌জাহান সেই দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ লইতে বদ্ধপরিকর হন। ১৬৪৬ সালে বল্‌খ্‌ জয় করিবার জন্য যুবরাজ মুরাদ ও আলী মর্দান খানকে এক বিরাট সেনাবাহিনী সহকারে পাঠানো হয়। মুঘল বাহিনী অতি সহজে বল্‌খ্‌ অধিকার করে। কিছুদিন পর সম্রাটের অনুমতি ছাড়াই মুরাদ বল্‌খ্‌ ছাড়িয়া চলিয়া যান। তৎপরিবর্তে আওরঙ্গজেব ও সুজাকে পাঠানো হয়। সৈন্য সংখ্যায় উজবেকেরা মুঘলদিগকে অতিক্রম করিয়া গেলেও আওরঙ্গজেব বল্‌খে প্রবেশ করিয়া মধু সিং হাদাকে ইহার শাসনকার্যে ন্যস্ত করেন। উজবেকদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য আওরঙ্গজেব বল্‌খ্‌ হইতে আকরায় যান। অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া তিনি অগ্রসর হন। কিন্তু বল্‌খ্‌ হইতে খবর আসে, বুখারা হইতে এক বিরাট বাহিনী বল্‌খ্‌ অধিকার করিতে অগ্রসর হইতেছে। এই খবরে তিনি বিচলিত হইয়া পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে বল্‌খে ফিরিয়া যান। বুখারার সেনাবাহিনী যুদ্ধ করে, কিন্তু মুঘল গোলন্দাজ বাহিনীর সামনে টিকিয়া থাকিতে ব্যর্থ হয়। মুঘল শক্তির প্রাধান্য উপলব্ধি করিয়া বুখারার সুলতান একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন এবং সন্ধির আলোচনা আরম্ভ করেন। আওরঙ্গজেব নিরাপদে বল্‌খ্‌ পৌঁছেন। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন— "প্রবল প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও মুঘলরা অতি সাহসের সহিত যুদ্ধ করে। অসীম ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে তাহারা সরাসরি কষ্টের সম্মুখীন হয় এবং ক্ষুধা ও দুর্বলতাকে কখনো তাহাদের কাজে বাধা সৃষ্টি

করিতে দেয় নাই। কিন্তু এই মরণাত্মক প্রতিরক্ষার মূল ব্যক্তি ছিলেন আওরঙ্গজেব স্বয়ং।"[৪] মুঘল সৈনিকরা স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। যুবরাজ স্বয়ং তাড়াতাড়ি সেই স্থান ত্যাগ করিতে উৎসুক হইয়া উঠেন এবং বল্‌খ্ শহর ও দুর্গ নাজ মুহাম্মদ-এর দৌহিত্রকে প্রদান করেন। ফিরিবার পথে মুঘল বাহিনী উজবেক ও হাজারাগণ কর্তৃক অনেক লাঞ্ছিত হয়।

উত্তরাধিকারের যুদ্ধ (১৬৫৭-'৫৮) ঃ

সম্রাট শাহ্‌জাহান-এর চারি পুত্র ছিলেন— দারা শিকোহ, শাহ সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ বখ্‌স্। ১৬৫৭ সালে উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইবার সময় তাঁহারা সবাই প্রাপ্তবয়স্ক। ১৬৫৭ সালের শরৎকালে শাহ্‌জাহান কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের গুজব ছড়াইয়া পড়ে। ইহা কোন ছেলেখেলা নহে, কারণ, চারি যুবরাজই প্রাপ্ত বয়স্ক, নির্ধারিত চরিত্র ও সঠিক আদর্শের ব্যক্তিবর্গ। প্রত্যেকেরই যুদ্ধক্ষেত্রের ও প্রদেশ শাসন করিবার অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। শাহ্‌জাহান-এর চারিটি পুত্র একই মায়ের সন্তান হইলেও কেহই সিংহাসনের জন্য সংগ্রাম করিবার মৌলিক দাবি ছাড়িয়া দিতে রাজি নহেন।

১৬৫৭ সালে দারার বয়স ৪৩ বৎসর, সুজার ৪১, আওরঙ্গজেব-এর ৩৯ এবং মুরাদ-এর বয়স ৩৩ বৎসর। দারা শিকোহ্ পাঞ্জাব ও কাবুলের শাসনকর্তা, সুজা বাংলার, আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের এবং মুরাদ বখ্‌স্ গুজরাটের শাসনকর্তা। প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসাবে প্রত্যেক যুবরাজের অধীনেই বিরাট সেনাবাহিনী প্রস্তুত।

দারা শিকোহ্ প্রায়ই সম্রাটের নিকটে থাকেন এবং তিনি পিতার খুব প্রিয়পাত্র। উত্তরাধিকারের জন্য তাঁহার যোগ্যতার ব্যাপারে এডওয়ার্ড ও গ্যারেট মন্তব্য করেন— "তাঁহার প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক যোগ্যতার সঙ্গে চারিত্রিক কিছু মারাত্মক দোষ ছিল, যাহা তাঁহার সাফল্যের ক্ষেত্রে বিরাট বাধার সৃষ্টি করে।"[৫] তাঁহাকে 'শাহ বুলন্দ ইকবাল' বা 'সর্বোচ্চ ভাগ্যের প্রভু' উপাধি প্রদান করা হয়। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য এই যে, রাজসিংহাসনের নিচে একটি সোনালি আসন তাঁহার জন্য স্থাপন করা হয় এবং রাজপরিবারের মধ্যে একমাত্র তিনিই সম্রাটের সামনে বসিবার অনুমতি লাভ করেন। স্যার লেন্‌পুল বলেন— "দরবারের পারিষদবর্গকে দেখাইবার জন্য ইহার চাইতে পরিষ্কার আর কোন চিহ্নের প্রয়োজন ছিল না যে, শাহ্‌জাহান তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উত্তরাধিকারী করিতে চান।"[৬]

যুবরাজদের চরিত্র

স্যার যদুনাথ সরকার বলেন—"যুদ্ধ ও শাসনকার্যের ক্ষেত্রে তাঁহার (দারা) কোন অভিজ্ঞতা ছিল না; বিপদ ও সংকটের অতি কঠিন পরীক্ষায় মানুষকে বিচার করিতে তিনি কখনও শিখেন নাই; এবং তিনি কর্মরত সেনাবাহিনীর সহিত যোগাযোগ হারাইয়া ফেলেন। অতএব, মুঘলদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগীর টিকিয়া থাকিবার বাস্তব পরীক্ষা হিসাবে প্রচলিত সেই উত্তরাধিকারের যুদ্ধে তিনি অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হন।"[৭]

অন্যত্র স্যার লেন্‌পুল বলেন— "দারা ছিলেন দুর্বল, অভিমানী ও হঠকারী লোক; সুন্দর মনোভাব ও বিচিত্র মানসিক ভাবধারায় পরিপূর্ণ, কিন্তু কখনও নিজের বা অন্যের উপর প্রভুত্ব অর্জন করিতে তিনি পারেন নাই এবং এমন মুহূর্তে নিজের ধৈর্য হারাইয়া ফেলেন, যখন ঠাণ্ডা

বিচারশক্তির খুবই প্রয়োজন। তিনি হয়ত একজন কবি বা অলৌকিক দার্শনিক হইতে পারিতেন, কিন্তু কখনও ভারতের শাসক হইতে পারিতেন না।"[৮] তাঁহার অহংকারী স্বভাবের দ্বারা দরবারে তিনি অনেকেরই শত্রুতে পরিণত হন।

দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজা চরিত্রগত দিক হইতে আরও নীচ প্রকৃতির লোক। মানুষ হিসাবে তিনি সাহসী এবং বাংলার একজন সফল শাসনকর্তা। কিন্তু আমোদ-প্রমোদের প্রতি তাঁহার ঝোঁক অত্যন্ত প্রবল। ইহা তাঁহার মানসিক গুণাবলিকে ধ্বংস এবং সঠিক মুহূর্তে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণে অসমর্থ করিয়া দেয়। মুঘল দরবারের ফরাসি চিকিৎসক বার্নিয়ার বলেন— "তিনি তাঁহার আমোদ-প্রমোদের খাস দাস ছিলেন; এবং একবার তিনি অসংখ্য নারী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে সারা দিন-রাত নাচে, গানে ও মদ্যপানে কাটাইয়া দিতেন।"[৯]

শাহ্ সুজা

তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব নিঃসন্দেহে সবার চাইতে উপযুক্ত। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সৈনিক ও সেনাপতি। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁহার অতুলনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি একজন খাঁটি মুসলমান এবং সাম্রাজ্যের সমস্ত গোঁড়া সুন্নী অভিজাতদের আস্থাভাজন। তাহা ছাড়াও তিনি একজন গভীর পরামর্শদাতা, কাজে সুনিপুণ এবং স্বভাবে শীতল ও ধীর-স্থির। ডঃ কালী কিঙ্কর দত্ত বলেন—"তিনি অসাধারণ শ্রমশীলতা এবং গভীর কূটনৈতিক ও সামরিক বুদ্ধিমত্তা এবং শাসনকার্যে অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।"[১০]

আওরঙ্গজেব

বার্নিয়ার-এর মতানুসারে—"তিনি ছিলেন একজন সফল কূটনীতিবিদ ও একজন সম্রাট; কিন্তু তিনি সুদক্ষ ও অতি বিরল প্রতিভায় অলঙ্কৃত ছিলেন।"[১১] তাঁহার কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক জ্ঞান দ্বারা তিনি অনেক শত্রুর হৃদয় জয় করেন। এইভাবেই সামুগড়ের যুদ্ধে তিনি গর্ব করিতে পারেন যে, দারা শিকোহ্‌র সেনাবাহিনীর মধ্যে ৩০,০০০ তাঁহার (আওরঙ্গজেব) সমর্থক।

সর্বকনিষ্ঠ মুরাদ বখ্‌স্ একজন সরল, উদার ও সিংহের ন্যায় সাহসী যুবরাজ। কিন্তু অত্যধিক মদ্যপান তাঁহাকে নেতৃত্বের জন্য অযোগ্য করিয়া তোলে। স্যার লেন্‌পুল বলেন—'যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রবল ভীতি, এবং বোতল-বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।'[১২] পরামর্শে তিনি বোকা এবং লাম্পট্যে সীমাহীন। মদ্যপান করিবার সময় তিনি পৃথিবীর সবকিছুই ভুলিয়া যান।

মুরাদ বখ্‌স্

১৬৫৭ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর সম্রাট শাহ্‌জাহান হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন। এক সপ্তাহ পর্যন্ত রাজ-চিকিৎসকগণ বৃথা চেষ্টা করেন; কিন্তু রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। দৈনিক দরবার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং সম্রাট দৈনিক 'ঝারোকা সালামী'[১৩] বা বেলকনি হইতে জনসাধারণকে তাঁহার চেহারা দেখানো ও সালাম গ্রহণ করা বন্ধ করিয়া দেন। সমগ্র সাম্রাজ্য গোলযোগ ও ভয়ে বিমর্ষ হয় এবং স্ব-স্ব প্রদেশে যুবরাজগণ সমাগত সিংহাসনের উত্তরাধিকারের যুদ্ধ-প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করেন। দারা শিকোহ রাজধানীতেই অবস্থানরত থাকেন এবং নিজেকে উত্তরাধিকারী বলিয়া সর্বত্র ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। দারার সমর্থকগণ সম্রাটের নিকট হইতে বিভিন্ন পদোন্নতি লাভ করেন এবং বিভিন্ন শাসন বিভাগীয় উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। ইতোমধ্যে সম্রাট কিছুটা আরোগ্য লাভ

সংগ্রাম

করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের কোন আশা দেখা গেল না।

কর্মক্ষেত্রে শাহ সুজাই অবতীর্ণ হন সর্বপ্রথম। তিনি ঘোষণা করেন, তাঁহার পিতাকে দারা বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়াছেন। অতঃপর নিজেকে তিনি সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন, বাংলার মুদ্রায় তাঁহার নাম খোদাই করেন এবং আগ্রার দিকে যুদ্ধাভিযান করেন। প্রায় একই সময় মুরাদ বখস নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন এবং গুজরাটের মুদ্রায় নিজের নাম খোদাই করেন। স্বীয় ক্ষমতা জাহির করিবার জন্য তিনি রাজকুমারী জাহান আরার জায়গীর সুরাট আক্রমণ করেন এবং ইহার দিওয়ান আলী নকী খানকে হত্যা করেন। অন্যান্য তিন ভ্রাতার ন্যায় আওরঙ্গজেব কোন রাজ উপাধি গ্রহণ করা হইতে নিজেকে বিরত রাখেন। এমনকি দারা দিল্লীতে তাঁহার প্রাসাদ ক্রোক করিয়া ইহার হিসাবরক্ষককে বন্দি করিলেও তিনি কিছুই বলেন নাই। স্যার লেনপুল বলেনঃ "কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন, তাঁহার অন্য যে কোন ভাইয়ের সিংহাসনে বসার অর্থই হইল তাঁহার নিজের মৃত্যু বা কারাগার, এবং এই ব্যাপারে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার মনস্থির করিয়া ফেলেন। আত্মরক্ষার জন্য ক্ষমতার সংগ্রামে লিপ্ত হইতে তিনি বাধ্য হন।"[১৪]

দিওয়ান আলী নকী খানের হত্যাকাণ্ড

স্বীয় ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে দারা শিকোহ খুব তড়িৎ পন্থা অবলম্বন করেন। অনতিবিলম্বে তিনি সুজা ও মুরাদের বিরুদ্ধে রাজকীয় সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। দারার পুত্র সোলায়মান শিকোহকে রাজা জয় সিং-এর অধীনে সুজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। অপরদিকে মহারাজা যশবন্ত সিংকে মুরাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া এই উপদেশ দেওয়া হয় যে, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে সমস্ত যোগাযোগ যেন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়। বেনারসের নিকটবর্তী বাহাদুর গড়ের যুদ্ধে সুজার বিরুদ্ধে সোলায়মান শিকোহ ও জয় সিং সাফল্য লাভ করেন। সামান্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরই দারার সেনাপতিদের হাতে সবকিছু ছাড়িয়া দিয়া সুজা পলায়ন করেন।

বাহাদুর গড়ের যুদ্ধ

ইতোমধ্যে আওরঙ্গজেব একটি সহকারী ভূমিকায় অংশ নেন। সাফল্যজনকভাবে সুরাট অধিকার করিবার জন্য তিনি মুরাদকে অভিনন্দন জানাইয়া ইঙ্গিত দেন যে, রাজধানীর দিকে অভিযানের ব্যাপারে তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। পরে তিনি নর্মদা নদীর উত্তর পাড়ে গুজরাটি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হইবেন বলিয়া ওয়াদা করেন। অক্ষম সম্রাট যুবরাজদিগকে পিছাইয়া যাইবার লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করেন না এবং দারা শিকোহ কর্তৃক প্রেরিত জালপত্র বলিয়া উড়াইয়া দেন। লেনপুল বলেন—"তাঁহারা (যুবরাজগণ) ঘোষণা করেন যে, তাঁহাদের পিতা হয়ত প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন কিংবা মৃত্যু শয্যায় শায়িত, এবং তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার নিকট নতি স্বীকার করিয়া তাঁহাকে স্বধর্মত্যাগীর হাত হইতে মুক্তি দিবেন বলিয়া তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করেন।"[১৫]

আওরঙ্গজেব ও মুরাদের সম্মিলিত সেনাবাহিনী রাজধানীর দিকে অগ্রসর হয়। মহারাজা যশবন্ত সিং-এর অধীনে দারা শিকোহ্‌র বাহিনীও অগ্রসর হয় এবং উভয় বাহিনী উজ্জয়নের নিকটবর্তী ধর্মতপুরে মিলিত হয়। আওরঙ্গজেব যশবন্ত সিং-এর নিকট একজন ব্রাহ্মণের মাধ্যমে এক পত্র পাঠান যে—"আমি আমার পিতার সঙ্গে দেখা করিতে

সামুগড়ের যুদ্ধ

চাই। যুদ্ধ আমি চাই না। হয়ত আমার সঙ্গে আসুন বা আমার পথ হইতে সরিয়া দাঁড়ান, যাহাতে কোন রক্তপাত না হয়।"[১৬]

রাজপুত মহারাজা একটি অপমানজনক উত্তর প্রেরণ করেন। ফলে উভয় পক্ষ যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করে। কিন্তু যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের যুদ্ধকৌশল যশবন্ত সিংকে বোকা বানাইয়া দেয়। ৮,০০০ রাজপুত সৈন্যের মধ্যে ৬০০ সৈন্য জীবিত থাকা পর্যন্ত রাজপুতরা প্রাণপণ যুদ্ধ করে। আওরঙ্গজেবের বাহিনী শুধু অক্ষত অবস্থায় সাফল্যই লাভ করে নাই, বরং "তাঁহার সামরিক সুনাম ভারতে সম্পূর্ণ অপরাজেয় হইয়া যায়।"[১৭]

বিজয়ী যুবরাজদ্বয় একটি উপেক্ষিত খেয়া দিয়া চম্বল নদী পার হইয়া আগ্রার আট মাইল পূর্বে সামুগড় প্রান্তরে উপনীত হন। এই সময় শাহজাহান সমঝোতার জন্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। কারণ, রাজকীয় সেনাবাহিনী তখন দারা শিকোহ্‌র নিয়ন্ত্রণে। সর্বনিম্ন গণনায় দারার সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় এক লক্ষ অশ্বারোহী, বিশ হাজার পদাতিক ও ৮০টি কামানে। ১৬৫৮ সালের ২৯শে মে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই ভীষণ যুদ্ধে উভয় পক্ষই বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে। দারার হাতি বর্শাঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হইলে তিনি দুর্ভাগ্যবশত ইহা হইতে নামিয়া একটি ঘোড়ায় আরোহণ করেন। প্রভুর হাতির হাওদা শূন্য দেখিয়া সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। হতাশ হইয়া দারা দিল্লী অভিমুখে পলায়ন করেন। তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য শাহজাহান অনেক অর্থ দিয়া ৫,০০০ অশ্বারোহী পাঠান।

সামুগড়ের যুদ্ধ

বিজয়ী সেনাবাহিনী আগ্রার দিকে অগ্রসর হয়। 'আলমগীর' নামে একখানা তরবারি উপহার দিয়া শাহজাহান আওরঙ্গজেবকে সম্মানিত করেন এবং তাঁহার বিজয়ী পুত্রকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শাহজাহানের একটি ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়া যায়। ষড়যন্ত্র অনুযায়ী আওরঙ্গজেব তাঁহার পিতাকে দেখিবার জন্য আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই তাঁহাকে বন্দি করিবার কথা। ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়া গেলে আওরঙ্গজেব সাবধান হইয়া যান এবং দুর্গ অবরোধ করেন। সামান্য বাধা প্রদানের পর ইহা অধিকার করা হয় এবং বৃদ্ধ সম্রাটকে দুর্গের ভিতর বন্দি করা হয়। সমস্ত ব্যাপার উত্তমরূপে পর্যালোচনা করিয়া রাজা জয় সিং ও মহারাজা যশবন্ত সিং নূতন ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

আগ্রাদুর্গ অধিকার ও শাহজাহান বন্দী

দারাকে গ্রেফতার করিবার জন্য আওরঙ্গজেব দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। কিছুসংখ্যক অভিজাত এখন আরওঙ্গজেবের বিরুদ্ধে মুরাদের হিংসা উদ্রেক করিতে সচেষ্ট হন। তাঁহারা বলিতে থাকেন প্রত্যেক কিছু আওরঙ্গজেবের নামেই হইতেছে এবং মুরাদ ক্রমশ পিছাইয়া যাইতেছেন। ইহা মুরাদের হিংসা উদ্রেক করে। তিনি অতঃপর প্রায় ২০,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করেন। তাঁহার শৃঙ্খলহীন আমুদে স্বভাব ও সীমাহীন উদারতার জন্য কিছুসংখ্যক লোক তাঁহার সান্নিধ্য পছন্দ করেন। সুতরাং এই সেনাবাহিনী লইয়া তিনি বিভিন্ন সময় আওরঙ্গজেবের অগ্রগমনে বাধা প্রদান করেন। নিরাপদে দারার পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য আওরঙ্গজেব মুরাদকে সেলিমগড় দুর্গে বন্দি করেন। পরবর্তীকালে ষড়যন্ত্র করিয়া পলায়ন করিবার সময় মুরাদ হাতেনাতে ধরা পড়েন। মুরাদের জীবিত থাকাটা আওরঙ্গজেব তাঁহার পক্ষে নিরাপদ মনে

মুরাদের হিংসা ও কারারুদ্ধ
মুরাদের মৃত্যুদণ্ড

করিলেন না। সুতরাং তাঁহার বিচার করা হয় এবং দেওয়ান আলী নকী খানকে হত্যা ও অত্যধিক মদ্যপানের অভিযোগে ১৬৬১ সালে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

আওরঙ্গজেব দারা শিকোহ্‌র পশ্চাদ্ধাবন করেন। অতঃপর দারা দিল্লী হইতে লাহোর গমন করেন। লাহোর হইতে তিনি মুলতান, থাট্টা ও কচ্ছের মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত কাটিয়াওয়াড়ে পৌছেন। সেই প্রদেশের শাসনকর্তা শাহ্ নাওয়াজ খান তাঁহাকে সুরাট অধিকার করিতে সাহায্য করেন। তিনি দারাকে দাক্ষিণাত্যের দিকে পলাইয়া যাইবার পরামর্শ দেন। কিন্তু পশ্চাদ্ধাবনকারী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তিনি বিরাট বোকামির পরিচয় দেন।

দারার মৃত্যুদণ্ড (১৬৫৯)

আজমীরের নিকটবর্তী স্থানে তিনি পরাজিত হন। সেইখান হইতে তিনি সিন্ধুর দিকে পলাইয়া যান এবং মালিক জীবন খানের নিকট আশ্রয় নেন। জীবন খান তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আওরঙ্গজেবের হাতে সমর্পণ করেন। অতঃপর একটি ময়লা হাতির উপর চড়াইয়া তাঁহাকে দিল্লীর রাস্তায় ঘুরান হয় এবং পরে ধর্মত্যাগী হিসাবে তাঁহার বিচার হয়। বিভিন্ন আলিম একমত হইয়া তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তদনুসারে ১৬৫৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

পূর্বাঞ্চলে শাহ্ সুজাকে সুলায়মান শিকোহ্ পরাজিত করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব এখন মীর জুমলাকে পাঠান তাঁহার বিরুদ্ধে। পরাজিত হইয়া সুজা আরকানের দিকে পলায়ন করেন। তাঁহার সম্পর্কে আর কিছু শুনা যায় নাই। অনেক ঐতিহাসিকের মতানুসারে, তিনি তথায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হইয়া পড়িলে আরাকানের মগরাজা কর্তৃক নিহত হন।

এদিকে সামুগড়ের যুদ্ধে পিতার পরাজয়ের খবর পাইয়া সুলায়মান শিকোহ্ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব কর্তৃক দিল্লী অধিকারের পূর্বে তিনি পৌছিতে পারেন নাই। অতঃপর সুলাইমান হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত গাড়ওয়াল রাজ্যে গিয়া ইহার রাজার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু লাদাকের দিকে অগ্রসর হইবার প্রাক্কালে রাজা তাহাকে আওরঙ্গজেবের হাতে সমর্পণ করেন। গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দি করা হইলে সুলায়মান সেইখানেই প্রাণ ত্যাগ করেন। দারা শিকোহ্‌র আরেক পুত্র সিফির শিকোহ্‌র সঙ্গে আওরঙ্গজেব তাঁহার কন্যার বিবাহ দেন।

আওরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহণ

অতঃপর আওরঙ্গজেবের সামনে আর কোন বিপত্তিই রহিল না। ইতোমধ্যে ১৬৫৮ সালে দিল্লীতে তিনি নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। দারার মৃত্যুর পর ১৬৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে আগ্রা দুর্গে তিনি সরকারিভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

শাহজাহানের মৃত্যু (১৬৬৬)

১৬৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে শাহজাহান আগ্রা দুর্গে মৃত্যুবরণ করেন।

শাহজাহানের সময় চিত্র ও স্থাপত্য শিল্প ঃ সম্রাট শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ্যাতি তাঁহার স্থাপত্য শিল্পে। তাঁহাকে যথাযথভাবেই 'স্থপতি যুবরাজ' বলা হয়। শাহজাহানের

তাজমহল

স্থাপত্যের নমুনা তাঁহার পূর্বপুরুষদের চাইতে ভিন্ন প্রকৃতির। এডওয়ার্ড ও গ্যারেট মন্তব্য করেন ঃ "বস্তুত শাহজাহানের আমলেই পারস্য-ভারতীয় নমুনার স্থাপত্য শিল্প সর্বোৎকৃষ্ট সৌন্দর্য লাভ করে।"[১৮] মুঘলগণ পারস্য-ভারতীয় নমুনার স্থাপত্য

শিল্প আবিষ্কার করে, এবং আকবর ও জাহাঙ্গীর কর্তৃক নির্মিত এই নমুনার স্থাপত্য শিল্পও যথেষ্ট সৌন্দর্যের অধিকারী। এইগুলি শাহজাহানের তুলনায় অনেক শক্ত গড়নের। কিন্তু যাবতীয় রমণীয় ছাপযুক্ত তাজমহলকে বিশ্ববাসী ইহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নমুনার তুলনায় অধিক পছন্দ করে। সম্ভবত ইহা বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট ইমারত। তাজমহল নির্মাণ করিতে ২০,০০০ লোক ২২ বছরে (১৬৩১-১৬৫৩) ইহা শেষ করে।

শাহজাহানের ইমারতসমূহের বৈশিষ্ট্য ইহার শক্ত গাঁথুনীর চাইতে ইহার অমায়িকতা ও অসাধারণ মূল্যবান কারুকার্যের সীমাহীন ব্যবহারে নিবদ্ধ। আকবর ও জাহাঙ্গীর প্রাধান্য দেন লাল পাথরকে, কিন্তু শাহজাহান গুরুত্ব দেন সাদা মার্বেল পাথরের। শাহজাহান পারস্য-ভারতীয় স্থাপত্য শিল্প হইতে হিন্দু প্রভাব সম্পূর্ণভাবে তুলিয়া দেন। আকবর ও জাহাঙ্গীরের ইমারতসমূহে হিন্দু প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে দৃষ্ট হয়।

সম্রাট শাহজাহান অনেক ইমারত নির্মাণ করেন। তন্মধ্যে তাজমহল, শাহজাহানাবাদ বা দিল্লীর লাল কিল্লা, মোতি মসজিদ, দিওয়ানে খাস, দিওয়ানে আম, দিল্লীর জামে মসজিদ, হজরত নিযামুদ্দিন আউলিয়ার মাজার এবং আগ্রার ঈদগাহ প্রসিদ্ধ। তাঁহার যুগ ছিল অনেক সম্পদশালী এবং তিনিও স্থাপত্য শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যয় করেন।

শাহজাহানের চরিত্র বিশ্লেষণ ঃ সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালকে মুঘল সাম্রাজ্যের সোনালি যুগ বলা হয়। এই সময়েই মুঘল ক্ষমতা ইহার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। কোন বিদেশী শক্তি কর্তৃক ভারত এই সময় আক্রান্ত বা বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়ায় নাই। উত্তরাধিকারের যুদ্ধের পূর্বে কেহই এত মারাত্মকভাবে সম্রাটকে মোকাবিলা করিতে সাহস করে নাই। পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গে রফতানি বাণিজ্য আরম্ভ করিবার ফলে বিদেশী ব্যবসা অতি দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে। ইউরোপের সঙ্গে রফতানি বাণিজ্যের দ্বারা ভারতের সম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ইহা ছিল একটি উন্নতির যুগ, জমি ছিল উর্বর এবং রাষ্ট্রের আয়ও ছিল প্রচুর। এই রাজত্ব সবিশেষ জাঁকজমকে উল্লেখযোগ্য, যাহার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় স্থাপত্য শিল্পের মনোমুগ্ধকর উদাহরণে।

মুঘল সাম্রাজ্যের সোনালি যুগ

শাহজাহান ভারতের সমস্ত শাসকদের মধ্যে একজন অসাধারণ গুণসম্পন্ন সম্রাট ছিলেন। বন্দি হইবার সময় তাঁহার বয়স ছিল ৬৬ বৎসর। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন—"ইতিহাসে অতি অল্প সংখ্যক লোকের ধৈর্যই মুঘল বংশের এই মহৎ শাসকের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার দুর্ভাগ্যসমূহ তাঁহার উপভোগগুলির ন্যায় অসাধারণ। অদ্বিতীয় উজ্জ্বল ও আমোদউল্লাসের দৃশ্যের মধ্য দিয়া সূচিত শাহজাহানের জীবনের নাটক একটি গ্রীক বিয়োগান্তের মতই শেষ হয়।"[১৯]

মানুষ হিসাবে

সেদিনের রাজকীয় যুবকগণ যেসব পুরুষোচিত অনুশীলনে আনন্দ উপভোগ করিতেন, উহার সবগুলিই তিনি অভ্যাস করেন। তিনি একজন সুযোগ্য যোদ্ধা ছিলেন এবং মেবার ও দাক্ষিণাত্যে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে তিনি তাঁহার সামরিক দক্ষতা প্রদর্শন করেন, যদিও তাঁহার পরবর্তী বৎসরের সাফল্যসমূহ তেমন উজ্জ্বল নহে।

শাহজাহান একজন শ্রেষ্ঠ কার্যনির্বাহী ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। শাসনব্যবস্থাকে বিশেষত মনসবদারী প্রথাকে তিনি সুনিয়ন্ত্রিত করেন। মনসবদারদের বেতন তিনি কমাইয়া দেন এবং

নির্ধারিত সংখ্যক সৈন্য পোষণ করিতে তাঁহাদিগকে বাধ্য করেন। বিজয়ী হিসাবে কঠোর, শাহজাহান ভারতের সিংহাসন অধিকার করিবার সময় কিছু অবাঞ্ছিত স্মৃতি রাখিয়া যান। কিন্তু নূরজাহানের অবৈধ হস্তক্ষেপের ফলেই সেইসব ঘটিয়াছে। কঠিন ন্যায়বিচার ও প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্য তাঁহার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি ঐসব স্মৃতির দোষ অনেকাংশে স্খালন করেন। "এইভাবে ১৬৩১-১৬৩২ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় জনগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি অনেক কিছু করেন, এবং শাসনব্যবস্থার কাজে যথেষ্ট শ্রম ব্যয় করেন"—মন্তব্য করেন কে. কে. দত্ত।[২০]

শাহজাহান তাঁহার ধর্মের রক্ষক এবং একজন ভক্ত মুসলমান ছিলেন। তীর্থকর তিনি পুনরায় চালু করেন এবং মুসলমানদিগকে ধর্মত্যাগে বাধা দিয়া তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। প্রকৃতিগতভাবে সম্রাট নির্দয় ছিলেন না। তিনি একজন স্নেহশীল পিতা এবং একজন অনুরক্ত স্বামী ছিলেন।

তাঁহার স্বভাবের ব্যাপারে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ খুবই সমালোচনামুখর। তাহারা তাঁহাকে নিষ্ঠুর, বিশ্বাসঘাতক ও অবিবেচক বলিয়া আখ্যায়িত করেন। কিন্তু তৎসঙ্গে তাঁহারা তাঁহার রাজত্বকালের ভূয়সী প্রশংসাও করেন। ভি. এ. স্মিথ বলেন—"শাহজাহানের ব্যক্তিগত চরিত্র বা তাঁহার শাসনকার্য সম্পর্কে যে মতামতই গ্রহণ করা হউক না কেন, এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাঁহার রাজত্বকালে মুঘল বংশ ও সাম্রাজ্য খ্যাতির চরম শিখরে আরোহণ করে। ৩০ বৎসরের (১৬২৮-১৫৫৮) ব্যবধানে সম্রাটের আধিপত্য বিপজ্জনকভাবে হুমকির সম্মুখীন হয় নাই এবং রাজ্য কোন বিদেশী শত্রু কর্তৃক কখনও আক্রান্ত হয় নাই। যদিও কান্দাহারের হস্তচ্যুতি এবং ইহা পুনরাধিকারের তিনটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা সামরিক অযোগ্যতা প্রমাণ করে এবং পারস্য গর্ব-অনুপ্রেরণা লাভ করে, কিন্তু এসব ঘটনা ভারতের কদাচ ক্ষতি সাধন করে, যেখানে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা রাজ-ব্যবস্থাকে অটুট রাখিতে যথেষ্ট ছিল।"[২১]

ঐতিহাসিক এলফিনস্টোনের মতানুসারে—"সেইযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কাফি খান তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিজয়ী ও আইন প্রণেতা হিসাবে আকবর যদিও সর্ববিখ্যাত ছিলেন, তবুও শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এবং অর্থ ও রাষ্ট্রের প্রত্যেক দপ্তরের উত্তম শাসনকার্যের জন্য তুলনামূলকভাবে শাহজাহানের ন্যায় কোন রাজা ভারতে রাজত্ব করেন নাই।"[২২]

শাহজাহান একজন শ্রেষ্ঠ স্থপতি ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাজমহল, দিওয়ানে আম, দিওয়ানে খাস, জামে মসজিদ ও মোতি মসজিদের ন্যায় অতি উত্তম ইমারতসমূহ সম্রাটের মনোমুগ্ধকর ইমারত নির্মাণের 'স্পৃহার জ্বলন্ত' প্রমাণ। তাঁহার রাজত্বকালে পারস্য-ভারতীয় নমুনার স্থাপত্য শিল্প উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। এই সমস্ত কাজের জন্য সম্রাট কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেন এবং সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান করেন।

সম্রাট সাহিত্যের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি অনর্গল তুর্কি, ফার্সি ও হিন্দি বলিতে পারিতেন। তিনি একজন সুন্দর ক্যালিগ্রাফি (Calligraphy) লেখক ছিলেন এবং গানে খুবই আনন্দ পাইতেন। চিত্রশিল্পে তিনি অসাধারণ আমোদ উপভোগ করিতেন। তিনি গানের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং স্বয়ং অনেক বাদ্যযন্ত্র কৌশলের সাথে বাজাইতে

পারিতেন। তাঁহার কারখানায় নির্মিত বিভিন্ন ধরনের অতি সুন্দর বাদ্যযন্ত্রসমূহ তাঁহার সৃজনীশক্তির পরিচায়ক। প্রকৃতিগতভাবে তিনি শিল্প, সৌন্দর্য ও সম্পদের পূজারী ছিলেন। শাহজাহান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা খুবই পছন্দ করিতেন এবং স্বয়ং প্রচুর সুগন্ধিদ্রব্য ব্যবহার করিতেন। এই ব্যাপারে তিনি এতই সুনিয়ন্ত্রিত ছিলেন যে, মণি-মুক্তা হাতে ধরিবার পরও তিনি হাত পরিষ্কার করিয়া নিতেন।

পাদটীকা

১। The sequal to the Mughal success was twenty years of comparative quiet in the Deccan. —Edwardes and Garrett: *History of India.*

২। In 1644 the Prince (Aurangazeb) gave up his duties and took to a life of retirement as a protest against Dara Shukuh's jealous interference with his work and Shah Jahan's partiality to his eldest son.— J. N. Sarkar, *History of Aurangzeb*, Vol— I.

৩। Dara had all along lived in a fool's paradise. Accustomed to the most fulsome flattery, he found it impossible to appraise exactly the magnitude of the formidable task that lay before him.— Ishwari Prasad: *A Short History of Muslim Rule in India.*

৪। The Mughals had put forth a strenuous fight against heavy odds. They faced the direct hardship with great composure and never allowed hunger or sicknesses to interfere with the progress of the operation. But the soul of this deadly resistance was Aurangzeb himself.— Ishwari Prasad, প্রাগুক্ত।

৫। His considerable natural abilities were associated with certain serious faults of character which greatly minimised his chance of success.— Edwardes and Garrett: *History of India.*

৬। No clearer sign was needed to show the court that Shah Jahan intended his eldest son to succed him.— S. Lane Poole: *Aurangeb.*

৭। He never acquired experience in the arts of war and government; he never learnt to judgemen by the crucial test of danger and difficulty; and he lost touch with the active army. Hence he was rendered unfit for that war of succession which among the Mughals served as a practical test for the survival of the fittest.— Sir J. N. Sarker: *History of Aurangzeb*, Vol— 1.

৮। Dara was nervous, sensitive, impulsive creature, full of fine feelings and vivid emotions, never master of himself or of others and liable to lose his self-control just when cool judgement was most necessary. He might have been a poet or a transcendental philosopher, he could never become a ruler of India. — S. Lane Poole: *Aurangzeb.*

৯। He was too much a slave to his pleasure; and once surrounded by his women, who were exceedingly numerous, he would pass whole days and nights in dancing, singing and drinking wine.— Bernier, *Travels in the Mogul Empire.*

১০। He (Aurangzeb) possessed uncommon industry and profound diplomacy and military skill and an unquestionable capacity for administration.—K. K. Datta: *An Advanced History of India.*

১১। He was a cousummate statesman and a great king; but endowed with a versatile and rare geneus. — Bernier.

১২। He was the terror of the battle field, and the best of good fellows over a bottle. — Lane Poole: *Aurangzeb.*

১৩। সম্রাট আকবর-এর সময় হইতে এই প্রথা চালু হয়। সকালে দুর্গের একপার্শ্বে যমুনা নদীর তীরে হাজার হাজার লোক ধর্ম নির্বিশেষে একত্রিত হয়। সম্রাট বেলকনির উপর দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া সাড়া দেন। জনতা তখন সমস্বরে ধ্বনি দেয় "দিল্লীশ্বরোবা, জগদিশ্বরোবা"—যিনি দিল্লীর প্রভু তিনি সমগ্র বিশ্বের প্রভু। অতঃপর জনতা নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে এবং পানাহার করে।

১৪। But he must have known that the accession of any of his brothers meant death or captivity for himself, and his mind must soon have been made up. In self defence he was bound to make his bid for power.—S. Lane Poole. *Aurangzeb.*

১৫। They declared that their father was either dead or dying, and they announced their determination, if he were still living, to throw themselves at his fit and deliver him from tyranny of the apostate.—Lane Poole : *Aurangzeb.*

১৬। I desire to visit my father. I do not wish war. Either come with me, or keep out of my way, that no blood be shed. —Lane Poole.

১৭। With his military reputations rendered absolutely unrivalled. in India—Lane Poole.

১৮। It was, however, in the reign of Shah Jahan that Indo- Persian architecture attained its supreme beauty.—Edwardes and Garret: *Mughal Rule in India.*

১৯। Few men in history have had their patience put to such a test as this magnificent ruler of the Mughal dynasty.The drama of Shàhjahan's life which began amidst scenes of unparalleled brilliance and enjoyment ended like one of the Greek tragedies.—Ishwari Prasad.

২০। Thus he did much to alleviate the sufferings of the people during severe famine of 1631-1632 and displayed considerable industry in the task of administration. —K. K. Datta.

২১। Whatever be the view taken of the personal character of Shahjahan or the efficiency of his administration, it can hardly be disputed that his reign marks climax of the Mughal dynasty and Empire. During the space of 30 years (1628-58), the authority of the Emperor was not seriously challanged and the realm was never invaded by any foreign foe. Although the loss of Kandahar and the failure of three attempts to retake it proved military inefficiency and encouraged Persian Pride, these events had little effect on India where the strength of the army sufficed to uphold the imperial system.—V.A. Smith: *Oxford History of India.*

২২। Khafi Khan, the best historian of those times, gives his opinion that although Akbar was pre-eminent as a conquerer and a law giver, yet for the order and arrangement of his territory and finance and the good administration of every department of the state, no prince ever reigned in India that could be compared to Shahjahan, —Elphinstone: *History of India.*

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

J. N. Sarkar : *History of Aurangzib*, Vol-I

Khafi Khan : *Muntakhab-ut Tawarikh.*

Elphinstone : *History of India*

S. Lane Poole : *Aurangzeb*

Qanungo	:	*Dara Shikoh*
Abdul Hamid Lahori	:	*History of India.*
Edwrdes and Garrett	:	*Mughal Rule in India*
Saxena	:	*History of Shahjahan of Delhi.*
Tripathi	:	*Rise and Fall of the Mughal Empire.*
V. A. Smith	:	*Oxford History of India.*
Ishwari Prashad	:	*Short History of Muslim Rule in India*
Majumder, Raychoudhury and Datta	:	*An Advanced History of India.*

সপ্তম অধ্যায়
শ্রেষ্ঠ মুঘল আওরঙ্গজেব আলমগীর
(১৬৫৮-১৭০৭ খ্রিঃ)

প্রাথমিক জীবন ঃ মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব ১৬১৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা তখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা। দুই বৎসর বয়সকালে তাঁহার পিতা পিতামহ জাহাঙ্গীরের বিরক্তিভাজন হন এবং তেলিঙ্গানা ও বাংলায় পলায়ন করিয়া তাঁহার চারি বৎসর বয়সে পুনরায় দাক্ষিণাত্যের পদে বহাল হন এবং সম্রাটের নিকট নতি স্বীকার করেন। অতঃপর ১৬২৫ সালে দারা ও আওরঙ্গজেবকে জামিনস্বরূপ সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট প্রেরণ করা হয়। ১৬২৮ সালে শাহ্জাহানের সিংহাসনে আরোহণের সময় তিনি মুক্ত হন এবং ১৬৩৬ সালে সতেরো বৎসর বয়সে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে যুবরাজ দারা শিকোহ্র প্ররোচনায় আওরঙ্গজেবকে সমস্ত পদাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় এবং ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে যুবরাজ্ঞী জাহান আরার সুপারিশে তাঁহাকে গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। সেখানে তিনি অসাধারণ সামরিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া একজন সফল সামরিক অধিনায়ক হিসাবে ফিরিয়া আসেন। দুই বৎসর গুজরাটে থাকাকালে তিনি শাসন ক্ষেত্রে তাঁহার অভূতপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেন। ১৬৪৮ হইতে ১৬৫২ সাল পর্যন্ত তিনি মুলতান ও সিন্ধুর শাসনকর্তা থাকেন। এই সময়েই তাঁহাকে কান্দাহার পুনর্বিজয়ে নিযুক্ত করা হয়। ইহাতে তিনি ব্যর্থ হইলেও সমস্ত ঐতিহাসিকগণ এই ব্যাপারে একমত যে, এই ব্যর্থতার জন্য অভিযান পরিচালক দায়ী নহেন। ১৬৫২ সালে তাঁহাকে পুনরায় দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা থাকাকালে ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারের সংগ্রামে অবতীর্ণ হন এবং ১৬৫৮ সালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সিংহাসনে আরোহণ ঃ আওরঙ্গজেবের সিংহাসন অভিষেক দুইবার অনুষ্ঠিত হয়। সামুগড়ের যুদ্ধে দারা শিকোহ্কে পরাজিত করিয়া ২১শে জুলাই ১৬৫৮ সালে তিনি অতি দ্রুত সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু সত্যিকারের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয় ১৬৫৯ সালের জুন মাসে। অতঃপর জুমার খুৎবায় তাঁহার নাম পাঠ আরম্ভ হয় এবং তিনি পিতা প্রদত্ত 'আলমগীর' উপাধি গ্রহণ করেন।

প্রাথমিক ব্যবস্থাবলি ঃ উত্তরাধিকারের সংগ্রামের ফলে শাসনব্যবস্থায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হইবার দরুন জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা চরমে উঠে। বিভিন্ন ধরনের করভারে জনগণের দৈনন্দিন জীবন বিষাইয়া উঠে। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা তথৈবচ। অধিকন্তু বিশাল সেনাবাহিনীর যাতায়াতের ফলে শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট হইয়া যায় এবং কোন কোন প্রদেশে

অনাবৃষ্টির ফলে জিনিসপত্রের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পড়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সিংহাসনে আরোহণের পর সম্রাট প্রজাসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা বিমোচনের চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। প্রথমেই তিনি অত্যাচারমূলক ৮০টি কর উঠাইয়া দেন। খাদ্যের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য তিনি শস্যের উপর হইতে কর উঠাইয়া দেন। তিনি যে সমস্ত কর উঠাইয়া দেন, তন্মধ্যে ছিল 'রাহদারী' বা রাজপথ ও ফেরী শুল্ক, 'পানদারী' বা এক ধরনের গৃহ শুল্ক, যাহা প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের উপর ধার্য করা হইয়াছিল। রহিত করা শুল্কের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদের তীর্থ শুল্ক উল্লেখযোগ্য। যদিও এই সমস্ত শুল্কের দ্বারা রাষ্ট্র বিপুল অর্থের মালিক হইত, তবুও জনগণের স্বার্থে তিনি এই সমস্ত কর রহিত করেন। কারণ, সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রজাসাধারণের স্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থান দেন। এই সমস্ত জনহিতকর কাজের দ্বারা তিনি জনসাধারণের আস্থাভাজন হইয়া উঠেন।

পূর্ববর্তী আমলের অব্যবস্থা ৮০ প্রকারের অত্যাচারমূলক কর রহিত

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঃ সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথমভাগে মুঘল সাম্রাজ্য বিভিন্ন দিকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তার লাভ করে। সর্বপ্রথম বিহারের শাসনকর্তা দাউদ খান ১৬৬২ সালে পালামৌ অধিকার করেন। পূর্ব সীমান্তে আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনী তাহাদের শৌর্যবীর্য প্রদর্শনের যথেষ্ট সুযোগ লাভ করে। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে আসামের অহমদের দমন করিবার জন্য বাংলার শাসনকর্তা মীর জুমলা বিরাট এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনী লইয়া এই সীমান্তের দিকে অগ্রসর হন। কুচবিহার ও আসামের রাজা মুঘলদের গৃহযুদ্ধের সুযোগ লইয়া উত্তর বাংলায় মুঘল ভূখণ্ড অধিকার করিয়াছিল। ঢাকা হইতে বাহির হইয়া মীর জুমলা কুচবিহার ও আসাম জয় করেন এবং ১৬৬২ সালের মার্চ মাসে আসামের অহম রাজত্বের রাজধানী গাড়গাঁও অধিকার করেন। অতঃপর অহমরা কোন প্রকার বাধা প্রদর্শন ছাড়াই তাহাদের রাজধানী ও সমস্ত ধন-সম্পত্তি মুঘল বাহিনীর হাতে ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন করে। বিপুল ধনভাণ্ডার মুঘলদের হস্তগত হয়। কিন্তু বর্ষাকাল আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বন্যার ফলে মীর জুমলা বহির্বিশ্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। তৎসঙ্গে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও শত্রুপক্ষের রাত্রিকালীন আক্রমণের দ্বারা মুঘল বাহিনী ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু প্রবল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মুঘল বাহিনী পুনরায় আক্রমণ চালাইয়া অহম রাজাকে তিপম ও নামরূপ পর্বত পর্যন্ত হটাইয়া লইয়া যায়। ১৬৬৩ সালের জানুয়ারিতে বিরাট ভূখণ্ড এবং প্রচুর স্বর্ণ ও হস্তী দিয়া অহম রাজা মুঘলদের সঙ্গে সন্ধি করেন। কিন্তু ঢাকায় ফিরিয়া আসিবার পথে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মীর জুমলা ১৬৬৩ সালের মার্চ মাসে প্রাণ ত্যাগ করেন। ১৬৬৭ সালে আসামীরা পুনরায় ধুবড়ী পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং গৌহাটি অধিকার করিয়া লয়। পরবর্তী মুঘল অভিযানগুলি মীর জুমলার ন্যায় সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। এতদসত্ত্বেও "সামরিক কার্য হিসাবে বিচার করিলে মীর জুমলার আসাম অভিযান সাফল্যজনক ছিল"[১] — মন্তব্য করেন স্যার যদুনাথ সরকার।

পালামৌ (১৬৬২) কুচবিহার আসাম অহম রাজধানী অধিকার

মীর জুমলার উত্তরাধিকারী শায়েস্তা খান ১৬৬৬ সালে চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া পূর্ব বাংলার জলপথে শান্তিশৃঙ্খলা আনয়ন করেন। প্রথমে তিনি পর্তুগীজ জলদস্যু ফিরিঙ্গিদিগকে হস্তগত করিয়া সন্দ্বীপ দখল করেন। অতঃপর

চট্টগ্রাম অধিকার (১৬৬৬)

মুঘল ও পর্তুগীজদের সম্মিলিত বাহিনী আরাকানীদিগকে পরাজিত করিয়া ১৬৬৬ সালের জানুয়ারিতে চট্টগ্রাম নগরী অধিকার করেন।

এই যুগের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল তিব্বত কর্তৃক মুঘল আধিপত্য স্বীকার। ১৬৬৫ সালে কাশ্মীরের মুঘল শাসনকর্তা তিব্বতের নিকট আধিপত্য দাবি করিয়া একটি পত্র প্রেরণ করেন। তিব্বতের রাজা ভয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন এবং প্রমাণস্বরূপ তিব্বতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং সম্রাটের নাম ও উপাধি তিব্বতী মুদ্রায় খোদাই করেন। মুঘল প্রতিনিধিদলকে সসম্মানে একটি স্বর্ণের চাবি সহকারে ফেরত পাঠানো হয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ঃ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবেচনার দ্বারা আওরঙ্গজেব উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অগ্রবর্তী নীতি গ্রহণ করেন। তথাকার দুর্ধর্ষ মুসলিম উপজাতিগুলি সর্বদাই মুঘলদের বিরুদ্ধে স্থায়ী বিপদস্বরূপ বিরাজমান ছিল। সেই অঞ্চলের অতি নগণ্য উৎপন্ন দ্রব্যের ফলে এইসব কঠোর আফগানগণ দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং নিকটবর্তী পাঞ্জাবের উর্বর জমি তাহাদিগকে উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবের নগরীগুলিতে হানা দিতে প্রলুব্ধ করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ ও উপত্যকাগুলিকে নিরাপদ রাখিবার জন্য আওরঙ্গজেব প্রথমে তাহাদিগকে টাকা-পয়সা দ্বারা শান্ত রাখিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তবুও তাহাদের নিকট হইতে আনুগত্য পাওয়া গেল না। ১৬৬৭ সালের প্রথমদিকে ইউসুফজাইরা তাহাদের নেতা ভাগুর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। তাহাদের এক বিরাট বাহিনী আটকের নিকটে সিন্ধু নদী অতিক্রম করিয়া হাজারা জেলা আক্রমণ করে এবং অন্যান্য দলগুলি পেশোয়ার ও আটক জেলা ধ্বংস করিতে থাকে। যাহা হউক, কয়েক মাসের মধ্যেই ইউসুফজাইদিগকে দমন করা হয়।

ইউসুফ জাইদের

কিন্তু ১৬৭২ সালে আফ্রিদীগণ তাহাদের নেতা আকমল খানের নেতৃত্বে ব্যাপক বিদ্রোহ আরম্ভ করে। আকমল খান শুধু নিজেকে রাজা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং সমস্ত পাঠানদিগকে সম্মিলিতভাবে মুঘলদের বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বান করেন। খাইবারের উপজাতিসমূহ ইতোমধ্যেই মুঘলদের উপর বিরক্ত ছিল। সুতরাং খাইবার গিরিপথ হইতে আলী মসজিদ পর্যন্ত আকমল খানের লোকেরা কাবুলের রাস্তা অধিকার করিয়া লয়। তিনি মুঘল বাহিনীকে আলী মসজিদের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে দশ হাজার মুঘল সেনা নিহত হয় এবং দুই কোটি টাকার নগদ দ্রব্য-সামগ্রী পাঠানগণ লুট করিয়া লয়। মুঘল সেনাপতি মুহাম্মদ আমিন খান কয়েকজন অনুচরসহ প্রাণ লইয়া দিল্লী পৌঁছেন। এই বিজয় আকমল খানের সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়াইয়া দেয় এবং দলে দলে পাঠানগণ তাহার পতাকাতলে জমায়েত হইতে আরম্ভ করে। ফলে অতি সত্বর আটক হইতে কান্দাহার পর্যন্ত সমগ্র পাঠান ভূখণ্ডও বিদ্রোহী হয়। পাঠানদের খাটক বংশও আফ্রিদীদের সঙ্গে মিলিত হয় এবং তাহাদের নেতা ও কবি খুশহাল খান এই বিদ্রোহের মূল প্রেরণাকারী হইয়া দাঁড়ান। ১৬৭৪ সালে এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য মহারাজা যশবন্ত সিং, মহব্বত খান ও শুজায়াত খানকে পাঠানো হয়। শুজায়াত খান কাবুলের দিকে অগ্রসর হইয়া গিরিপথে পৌঁছিলে বিদ্রোহীদের দ্বারা পরাজিত ও নিহত হন। তাঁহার অবশিষ্ট বাহিনীকে মহারাজা যশবন্ত সিং উদ্ধার করেন।

আফ্রিদীদের বিদ্রোহ

কারাপা গিরিপথের বিপর্যয়ের ফলে সম্রাট হৃদয়ঙ্গম করেন, রাজকীয় সম্মান রক্ষা

ভারত (আওরঙ্গজেবের ভারত-১৭০০ খ্রিস্টাব্দ)
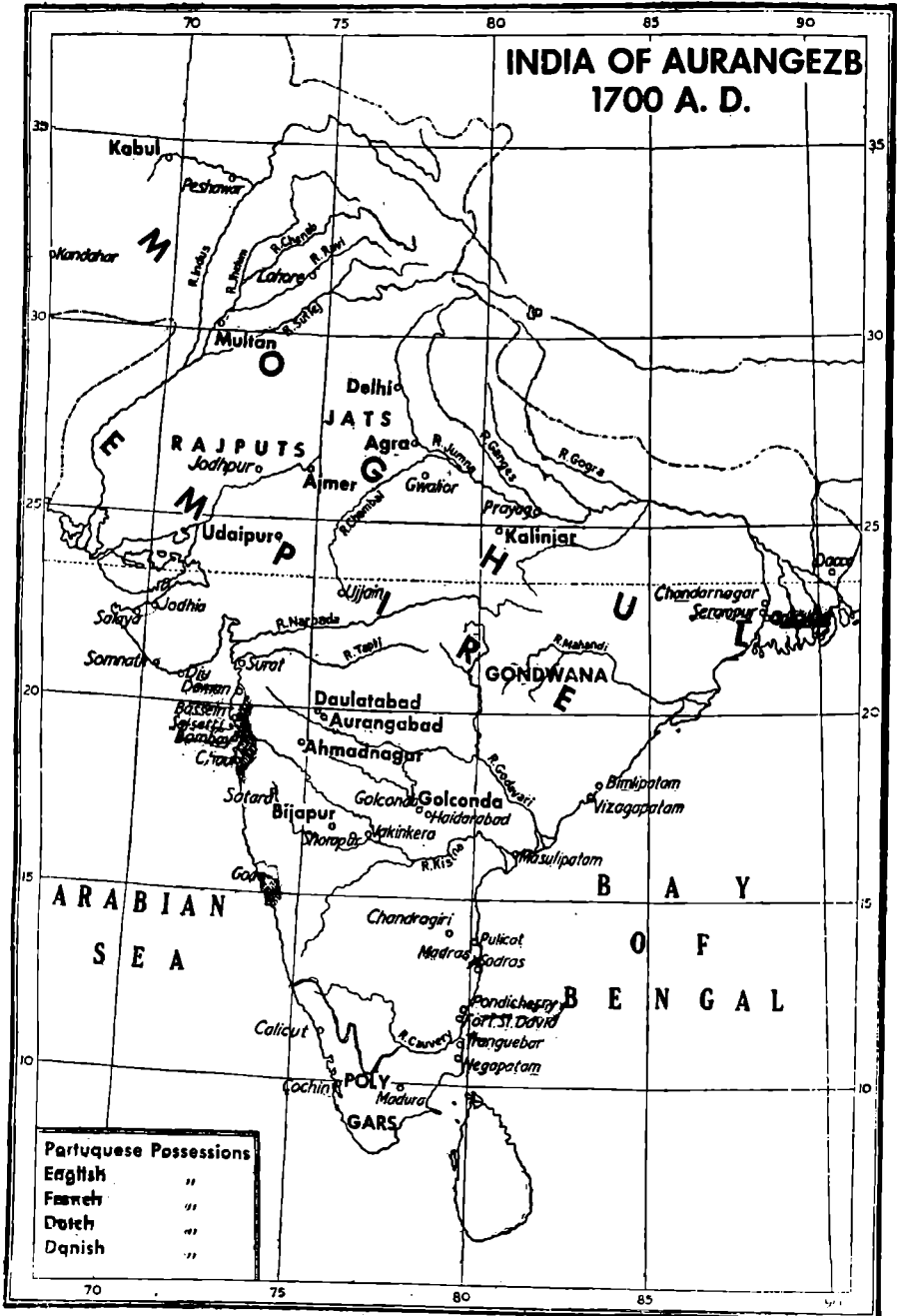
করিতে হইলে আরও ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন। সম্রাট স্বয়ং পেশোয়ারের নিকটবর্তী হাসান আবদালে যান এবং কূটনীতি ও শক্তির সুচতুর সমন্বয়ে তিনি বেশ সফলতা লাভ করেন। অনেকগুলি আফগান উপজাতিকে বিভিন্ন উপহার, জায়গীর ও পদমর্যাদা দিয়া খরিদ করিয়া লওয়া হয় এবং অন্যদিকে আপসহীন উপজাতিগুলিকে শক্তির সাহায্যে ধ্বংস করা হয়। অবস্থা বেশ উন্নতি লাভ করিলে সম্রাট ১৬৭৫ সালে দিল্লী ফিরিয়া যান। আফগানিস্তানের শাসনকর্তা আমীন খানের সুকৌশল নীতির ফলে আওরঙ্গজেবের সফলতা স্থায়িত্ব লাভ করে। সুতরাং "অর্থ সাহায্য বা এক গোত্রকে অন্য গোত্রের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়া বা তাহার নিজস্ব উপমা—হাড়ে হাড়ে আঘাত করিয়া উভয় হাড় ভাঙিয়া ফেলিবার নীতি[২] অবলম্বন করিয়া আরওঙ্গজেব আফগান বিদ্রোহ দমন করেন এবং রাজকীয় প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে সক্ষম হন। খাটক নেতা খুশহাল খান কয়েক বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া যান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার পুত্র তাঁহাকে মুঘলদের নিকট সমর্পণ করেন।

আওরঙ্গজেবের সাফল্য

আফগান যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকার বলেন—"আফগান যুদ্ধ রাজকীয় সম্পদের পক্ষে যেরূপ ধ্বংসাত্মক, ইহার রাজনৈতিক ফলাফল তেমনি আরও মারাত্মক। ইহা পরবর্তী রাজপুত যুদ্ধে আফগানদিগকে নিযুক্ত করা অসম্ভব করিয়া দেয়, যদিও আফগানরাই ছিল সেই রুক্ষ ও অনুর্বর দেশে জয়লাভ করিবার উপযুক্ত সৈন্য। অধিকন্তু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ করিবার জন্য দাক্ষিণাত্য হইতে সর্বোৎকৃষ্ট মুঘল সেনাবাহিনীগুলিকে সরাইয়া লইবার দরুন ইহা শিবাজীকে মুঘল চাপ হইতে রেহাই দেয়। মারাঠা-প্রধান শত্রুর এই দ্বিধা-বিভক্তির সুযোগ গ্রহণ করিয়া ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের পর ১৫ মাসের মধ্যে গোলকুণ্ডার মধ্য দিয়া কর্নাটক পর্যন্ত এবং পুনরায় মহীশূর ও বিজাপুরের মধ্য দিয়া রায়গড় পর্যন্ত ক্রমাগত উজ্জ্বল ঝটিকা বিজয় লাভ করেন। ইহা ছিল তাঁহার (শিবাজী) জীবনের সর্বোচ্চ স্তর। কিন্তু আফ্রিদী এবং খাটকরাই তাঁহার এই নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যকে সম্ভব করিয়াছে।"[৩] সুতরাং সীমান্ত যুদ্ধগুলি সাফল্যজনকভাবে শেষ করা হইলেও ইহার পরিণতি ছিল খুবই মারাত্মক।

ফলাফল

আওরঙ্গজেবের বৈদেশিক নীতি ঃ আওরঙ্গজেবই প্রথম মুঘল সম্রাট, যিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে বৈদেশিক মুসলিম রাষ্ট্র তথা বহির্বিশ্বের সঙ্গে প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান করেন। এইভাবে ১৬৬১ এবং ১৬৬৭ সালের মধ্যে তিনি মক্কা, পারস্য, বাল্‌খ্, বোখারা, কাশগড়, উরগঞ্জ (খিভা) ও শহর-এ-নও-এর রাজন্যবর্গ এবং বসরা, হাদ্রামাওত, ইয়ামান ও মোচার তুর্কি শাসনকর্তা এবং আবিসিনিয়ার রাজার নিকট হইতে প্রতিনিধি দল প্রাপ্ত হন। ১৬৯০ সালে কন্সট্যান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) হইতে একটি প্রতিনিধি দল তাঁহার দরবারে উপস্থিত হন। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, আওরঙ্গজেব তাঁহার ভাইদের প্রতি যে ব্যবহার করেন, তাহা হইতে নিজেকে দোষমুক্ত করিবার জন্য তিনি এই নীতি গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই মনোভাব সমালোচনার ঊর্ধ্বে নহে। প্রথমত, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ তাঁহার নীতি আদর্শ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিল। একজন ন্যায়নিষ্ঠ মুসলিম হিসাবে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ তাঁহার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করাটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, সেই যুগের নীতি অনুসারে আপন আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা

করিয়া সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করা কিছু অন্যায় ছিল না। কারণ, সেই যুগে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই যুগেও রাজধর্ম আত্মীয়তা মানে না (Kingship knows no kinship)।

আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতির ভিত্তি ঃ আওরঙ্গজেবের ধমনীতে একজন তুর্কি, একজন মোঙ্গল, একজন পারস্যবাসী, একজন ট্রান্স-অক্সিয়ান ও একজন হিন্দুর রক্ত প্রবাহিত এবং তাঁহার পৌরুষত্বের জন্য রক্তের সংমিশ্রণ কতটুকু দায়ী তাহা একমাত্র বংশতত্ত্ববিদগণই বলিতে পারেন। তবে সবার উপরে তিনি নীতিতে ও কর্মে একজন সত্যিকারের সুন্নি মুসলমান। তাঁহার ধর্মীয় নীতি কখনও পার্থিব উদ্দেশ্যে প্রভাবিত হয় নাই। তাঁহার ধর্মীয় কার্যাবলিতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। নামাজে সময়ানুবর্তিতা, ধর্মীয় রোজা ও ভোজে সঠিক, স্বীয় ধর্ম রক্ষার দায়িত্বে অটল আওরঙ্গজেব একজন খাঁটি মুসলমান; তবে কখনও কখনও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয়তা তাঁহাকে ভুলক্রমে তাঁহার পথ হইতে দূরে রাখে বটে। রাজপুতদের হাতের গুটি দারা শিকোহ্‌র হাত হইতে সুন্নি মতবাদের জন্য সিংহাসন অধিকার করিয়া তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে নির্ভুলভাবে কোরআনী আইন চালু করিতে চেষ্টা করেন।

আওরঙ্গজেব হিন্দুস্তানের সম্রাট থাকাকালে মুসলমান সমাজে এমন কোন কাজ করা যাইবে না, যাহা একেশ্বরবাদের পরিপন্থী— এই ছিল তাঁহার নীতি। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি তাঁহার জন্মদিন ও সিংহাসনের চিরাচরিত উৎসবসমূহ অনাড়ম্বর করিয়া দেন। 'ঝারোকা দর্শনে'র প্রথা তিনি রহিত করেন। এই প্রথানুযায়ী তাঁহার পূর্বপুরুষগণ জনগণের কুর্নিশ গ্রহণের জন্য প্রত্যেক প্রভাতে রাজপ্রাসাদের দেয়াল-বেলকনিতে উপস্থিত থাকিতেন এবং প্রজাসাধারণ বেলকনির নিম্নভূমিতে দণ্ডায়মান থাকিত। একই বৎসরে তিনি দরবারের বাদ্যসঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং পুরাতন সমস্ত সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়কদের তিনি বরখাস্ত করেন। পরবর্তী বৎসরে সম্রাটদের জন্মদিনে তাঁহাদিগকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্যের বিপরীত ওজন করিবার প্রথা তিনি রহিত করেন এবং রাজকীয় জ্যোতির্বিদদিগকে বরখাস্ত করেন। জনসাধারণের জীবনযাত্রা পবিত্র আইন মোতাবেক নির্বাহ করিবার জন্য তিনি 'মুহতাছিব' বা 'জনসাধারণের নৈতিকতা তদারককারী' নিযুক্ত করেন।

প্রজাসাধারণের নৈতিকতার উন্নতির জন্য আওরঙ্গজেব অনেকগুলি আইন জারি করেন। মদ ও ভাঙ-এর প্রস্তুত, বিক্রয় ও সাধারণ ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি একটি বিধি-নিষেধ জারি করেন। ঐতিহাসিক মানুক্কী বলেন, নর্তকী মেয়ে ও পতিতাদের প্রতি তিনি আদেশ জারি করেন, তাহারা যেন অবিলম্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যায় কিংবা রাজ্য ত্যাগ করে। শালীনতা বিবর্জিত গানের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর আদেশ জারি করেন, এবং ১৬৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।

একজন সুন্নি মুসলমান হিসাবে আওরঙ্গজেব বেদয়াত বা শরিয়তে নব সংযোজিত কার্যাবলি বিলুপ্তির চেষ্টা করেন। সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁহার প্রসিদ্ধ পূর্বপুরুষ মুঘল শ্রেষ্ঠ আকবর রাষ্ট্র শাসনে ধর্মনিরপেক্ষতা আনয়ন করেন। সম্রাট আকবর চাহিয়াছিলেন, ভারতের সমস্ত ধর্মাবলম্বী তাহাদের স্ব-স্ব ধর্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করুক। জনসাধারণের ন্যায় মুসলমানরাও তাই করিতে গিয়া ভারতের পূর্ববর্তী বসতিকারী আর্য, গ্রীক, শক, ইউ য়ে চি ও হুনদের মত ভারতীয় জাতিদের মধ্যে বিলীন হইতে আরম্ভ করে।

আকবর ইহার বীজ বপন করেন, রাজপুত ও অন্যান্য যোদ্ধা জাতিসমূহ ইহাকে লালন-পালন করে এবং যুবরাজ দারা শিকোহ ছিলেন ইহার কুঁড়ি স্বরূপ। কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন ইহার ঘোর বিরোধী। ভারতে মুসলিম শাসনের গোড়া হইতেই হিন্দুরা মুসলমানদের কখনও সহ্য করিতে পারে নাই, কিন্তু পূর্ববর্তী বসতিকারীদের ন্যায় সংমিশ্রণ হইয়া যাইবার আশায় তাহারা মুসলমানদিগকে মোটামুটি সমর্থন জানাইয়াছে। দারা শিকোহ ছিলেন তাহাদের শেষ আশার স্থল। সম্রাট আকবর যাহা উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, আওরঙ্গজেব হিন্দুদের এই মনোভাব বুঝিতে সক্ষম হন এবং কিছু বিধি-নিষেধের মাধ্যমে মুসলমানদিগকে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সহায়তা করেন। আওরঙ্গজেবের এই ধর্মীয় কার্যাবলি কথায় ও কাজে প্রকাশ করিতে দেখিলে হিন্দুরা তাহাদের মুখোশ খুলিয়া ফেলে এবং আওরঙ্গজেব কর্তৃক প্রজা-সাধারণের উপর হইতে আশি প্রকারের অত্যাচারমূলক কর উঠাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করে। তবে কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, আওরঙ্গজেবের দমনমূলক নীতি এবং গোঁড়া ধর্মীয় অনুভূতির কারণে রাজপুত, মারাঠা ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী বিদ্রোহ করে। এইসব বিদ্রোহের পিছনে অমুসলিমদের উপর চাপাইয়া দেওয়া 'জিজিয়া' নামক ধর্মীয় করও একটি বিশেষ উপসর্গ হিসাবে কাজ করিয়াছে।

বিদ্রোহ এবং তাহা দমন ঃ আগ্রার নিকটবর্তী জাঠরা মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দুর্বার জাঠদের জন্য মথুরার মুঘল ফৌজদার আবদুল নবী খান (১৬৬০-১৬৬৯) ছিলেন অতি কঠোর। তিলপতের জমিদার গোকুলের নেতৃত্বে জাঠরা বিদ্রোহ করিয়া ফৌজদারকে হত্যা করে এবং সাদাবাদ পরগনা লুণ্ঠন করে। কিন্তু মথুরার নূতন ফৌজদার হাসান আলী খানের নেতৃত্বে তাহাদিগকে দমন করা হয় এবং গোকুলকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ১৬৮৫ সালে জাঠরা পুনরায় রাজারামের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে এবং রাজধানী হইতে সম্রাটের অনুপস্থিতির সুযোগে সেকেন্দ্রায় অবস্থিত আকবরের সমাধি লুণ্ঠন করে (১৬৮৮)। অতঃপর রাজারাম পরাজিত ও নিহত হয় এবং ১৬৯১ সালে জাঠদের প্রধান কেন্দ্র ধ্বংস করা হয়। কিন্তু শীঘ্রই তাহাদের মধ্যে চুরামন নামে একজন শক্তিশালী নেতার উদয় হয়, যিনি আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর জাঠদিগকে একটি শক্তিশালী সামরিক জাতিতে পরিণত করেন।

জাঠ

বান্দেলাগণ ঃ মধ্যভারতের গহীন বন, স্রোতস্বিনী নদী ও খাড়া পাহাড়ের জন্য বান্দেলা রাজপুতগণ নিজেদেরকে বেশ নিরাপদ মনে করিত। ১৬০২ সালে বীর সিংহ বান্দেলা আকবরের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করেন। কিন্তু বান্দেলাদের গেরিলা যুদ্ধের জন্য সম্রাট আকবর তাহাদিগকে দমন করিতে ব্যর্থ হন। চম্পত রায় আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, কিন্তু প্রবলভাবে আক্রান্ত হইয়া তিনি আত্মহত্যা করেন। চম্পত রায়-এর পুত্র ছত্রসাল ও আঙ্গাদকে রাজা জয় সিং মুঘল বাহিনীতে ভর্তি করাইয়া দেন। শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযানের সময় তাহাদের অপূর্ব সামরিক কলাকৌশলের জন্য তাহাদিগকে উচ্চপদে উন্নীত করা হয়। দেবগড়ের বিরুদ্ধে মুঘল আক্রমণের সময়ও ছত্রসাল দিলওয়ার খানের অধীনে যুদ্ধ করেন।

বীর সিংহ
চম্পত রায়
ছত্রসাল

দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর উদাহরণ লইয়া ছত্রসালও রোমাঞ্চকর এক স্বাধীনতার জীবন যাপনের স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করেন। বান্দেলখণ্ড ও মালবের জনসাধারণ ছত্রসালকে

"হিন্দুধর্ম ও ক্ষত্রীয় সম্মানের পুরোধা হিসাবে" অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। মুঘলদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি যুদ্ধে তিনি জয়ী হন এবং ১৭৩১ সালে তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি পূর্ব মালবে পাউনায় রাজধানীসহ একটি স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করিতে সমর্থ হন।

সাতনামীগণ ঃ ১৬৭২ সালে সাতনামীগণ বিদ্রোহ করে। সাতনামীরা ছিল কোন একটি হিন্দু পূজারীর সমর্থকদের একটি অংশের অনুসারী। সংখ্যায় তাহারা প্রায় পাঁচ হাজার এবং কেন্দ্র ছিল নারনাউন ও মেওয়াট। ঐতিহাসিক খাফি খান তাহাদের সম্পর্কে লিখেন ঃ

তাহাদের আদি পরিচয়

"এইসব লোক পূজারীদের মত কাপড় পরিধান করে, কিন্তু তাহারা কৃষি কাজ এবং ব্যবসাও করে, অবশ্য ব্যবসা ছিল খুবই ছোট আকারের।"[৪] ধর্মীয় ব্যাপারে নিজেদেরকে সম্মানিত করিবার জন্য তাহারা 'ভালো নাম" (Good Name) উপাধি গ্রহণ করে। তাহাদের নিজস্ব ভাষায় 'সাতনামী' অর্থ উত্তম নামী। তাহাদের অনেকেই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চলাফেরা করে।

তাহাদের বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে বলা হয়, একদা একজন মুঘল শস্য পাহারাদার একজন সাতনামীর সঙ্গে প্রবল তর্কে লিপ্ত হয়। তর্কের এক পর্যায়ে উত্তেজিত হইয়া সে তাহার লাঠি দিয়া সাতনামীর মাথায় আঘাত করিয়া ফাটাইয়া ফেলে। ফলে সাতনামীরা সেই পাহারাদারকে হত্যা করে এবং প্রকাশ্য বিদ্রোহে নামিয়া পড়ে। কয়েকটি যুদ্ধের পর

বিদ্রোহের কারণ

সাতনামীরা মুঘল ফৌজদারকে হত্যা করিয়া নারনাউল দখল করে। রাজধানী হইতে রাজা বীষণ সিং ও হামিদ খানের নেতৃত্বে রাজকীয় বাহিনী প্রেরণ করা হয়। শীঘ্রই সাতনামীরা পরাভূত হয়। তাহাদের কয়েক সহস্রকে হত্যা করা হয় এবং অবশিষ্টগুলি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। এইভাবে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়।

জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন ঃ ১৬৮০ সালে আওরঙ্গজেব অমুসলিমদের উপর জিজিয়া বা নিরাপত্তা কর পুনঃপ্রবর্তন করেন। আরবদের সিন্ধু বিজয় হইতে আকবরের রাজত্বের প্রথমভাগ পর্যন্ত ভারতের অমুসলিম প্রজাদিগকে এই কর দিতে হইত। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিকোণ হইতে এবং হিন্দুদের সহযোগিতা ও সমর্থন পাইবার আশায় সম্রাট আকবর এই কর উঠাইয়া দেন। রাজত্বের প্রথমদিকে আওরঙ্গজেবও এই কর পুনঃপ্রবর্তন করেন নাই। কিন্তু তাঁহার রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসর পরেও যখন তিনি লক্ষ্য করিলেন, অমুসলিমরা মুঘল রাজত্বের বিরোধিতাই করিতেছে, অতঃপর তিনি এই কর পুনরায় চালু করেন। ঐতিহাসিক খাফি খান ব্যাপারটিকে এইভাবে বর্ণনা করেন ঃ "পৌত্তলিকদের ক্ষমতা খর্ব করিবার জন্য এবং বিশ্বাসীদের দেশকে পৌত্তলিকদের দেশ হইতে পৃথক করিবার জন্য সমস্ত প্রদেশগুলিতে অমুসলিমদের উপর জিজিয়া কর চালু করা হয়।"[৫]

রাজপুত বিদ্রোহ ঃ রাজপুতগণ রাজা যশোবন্ত সিং-এর মৃত্যুর (১৬৭৮) পর সরাসরি বিদ্রোহে ঝাঁপাইয়া পড়ে। যশোবন্ত সিং কাবুল গিয়াছিলেন সৈন্য সাহায্য লইয়া। খাফি খান বর্ণনা দেন, রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার বোকা ভৃত্যরা অজিত সিং ও দালাথামন নামে তাঁহার দুই সন্তানকে লইয়া যায়। সন্তান দুইটি তাঁহার মৃত্যুর পর ১৬৭৯ সালে লাহোরে জন্মগ্রহণ করে। আওরঙ্গজেবের অনুমতি ছাড়া, এমনকি সেই প্রদেশের সুবাদারের ছাড়পত্র গ্রহণ করা ছাড়াই তাহারা রাণী সমভিব্যাহারে রাজধানীর দিকে ধাবিত হয়। আটকের ফেরীতে পৌছার পর তাহারা ছাড়পত্র প্রদর্শনে ব্যর্থ হইলে নৌবহরের অধ্যক্ষ তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে বাধা

প্রদান করে। অগত্যা তাহারা ফেরীর লোকজনদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের কয়েকজনকে হতাহতকরত দিল্লীর দিকে অগ্রসর হয়।

"রাজা যশোবন্তের ব্যাপারে সম্রাটের মনে একটি অতি গভীর বেদনা ছিল, যাহা রাজপুতদের এইসব কঠোর কার্যাবলির দ্বারা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। কোতয়ালকে তিনি আদেশ দেন, তাহার লোকজন লইয়া, মনসবদারদের নিকট হইতে আরও কিছু লোক লইয়া, কিছু গোলন্দাজ বাহিনী সহযোগে সে যেন রাজপুতদের শিবির ঘিরিয়া ফেলে এবং উহার উপর কড়া নজর রাখে। কিছুদিন পর রাজপুতদের একটি দল নিজেদের দেশে যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করে। তাহাদের অনুরোধ আওরঙ্গজেবের গোচরীভূত করা হইলে তাহা তিনি মঞ্জুর করেন।

"ইতোমধ্যে রাজপুতরা রাজার পুত্রদ্বয় হিসাবে একই বয়সের দুইটি ছেলে যোগাড় করে। দুইজন পরিচারিকাকে তাহারা রাণীর বসনে ভূষিত করে এবং তাঁহাদের কৌশল যাহাতে আবিষ্কৃত না হয়, এইরূপ সব সাবধানতা অবলম্বন করিয়া তাহারা এইসব স্ত্রীলোক ও ছেলেগুলিকে তাহাদের শিবিরে পাহারাধীন রাখিয়া দেয়। (আসল) রাণীদ্বয় পুরুষের বেশে দুইজন বিশ্বস্ত চাকর ও একটি উৎসর্গীকৃত রাজপুত দলের হেফাজতে পূর্ণবেগে তাহাদের দেশের দিকে ধাবিত হয়। সাহসী ও ত্বরিতকর্মা যেইসব প্রধানগণ তাহাদিগকে বাধা দিতে বা ধরিয়া ফেলিতে পারিতেন, তাহারা তখন যে তাঁবুতে রাজার নকল পুত্রদ্বয় ছিল, সেখানে পাহারারত।"[৬] কিন্তু রাণীদের পলায়ন সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় নাই এবং নকল পুত্রদ্বয় রাজকীয় অন্তঃপুরে প্রেরণ করা হয় এবং সেখানেই তাহারা লালিত-পালিত হয়। "যে ছেলে দুইটিকে রাজপুতরা লইয়া যায়, সেগুলিকে আওরঙ্গজেব ততদিন পর্যন্ত যশোবন্ত সিং-এর পুত্র বলিয়া বরণ করিতে অস্বীকার করেন, যতদিন না চিতোরের রাজা অজিত সিং-এর (যশোবন্তের পুত্র) সঙ্গে তাহার পরিবারের একটি মেয়েকে বিবাহ দিয়া সন্দেহ খণ্ডন করিয়াছেন।"

রাজা যশোবন্ত সিং-এর পুত্র লইয়া এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে মেবার ও মাড়ওয়ারের রাজপুতগণ মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে এক যুদ্ধজোটে আবদ্ধ হয়। আওরঙ্গজেব অতঃপর এক বিরাট সৈন্য সমাবেশ করিয়া তিন যুবরাজ মোয়াজ্জেম, আজম ও আকবরকে তিনটি আলাদা সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিত্ব প্রদান করেন। সামরিক তৎপরতা জোরদার করিবার জন্য ১৬৭৯ সালের আগস্ট মাসে তিনি স্বয়ং আজমীর গমন করেন। জিজিয়া কর আদায় এবং যোধপুর হইতে রাজা যশোবন্ত সিং-এর তথাকথিত পুত্রদ্বয়কে সমর্পণ করিবার জন্য তিনি চিতোরের রানার প্রতি কঠোর ফরমান জারি করেন। "আজমীরে কয়েকদিন অবস্থানের পর যোধপুর ও অন্যান্য রাজপুত জেলাগুলি ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী অগ্রসর হয়। রানা নিজেকে বাধা দানে অপারগ বিবেচনা করিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা এবং জিজিয়ার ব্যাপারে তাঁহার আনুগত্য ঘোষণা করেন। কিন্তু কার্যত দুইটি বা তিনটি পরগনা (জেলা) হস্তান্তর করিয়া একখানা পত্র সহকারে তাঁহার প্রধানমন্ত্রীকে প্রেরণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, যশোবন্তের পুত্রদ্বয়কে তিনি সমর্থন করিতেছেন না। এবং পরিশেষে তাঁহার কৃত অপরাধের জন্য তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করেন।"—খাফি খান। কিন্তু শীঘ্রই রানা তাঁহার অঙ্গীকার পুনরায় ভঙ্গ করেন।

সঙ্গে সঙ্গে আওরঙ্গজেব মেবার আক্রমণ করেন। রানা মেবারের শহর ও গ্রামাঞ্চল ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং সমতল ভূমির সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করিয়া তাঁহার সমগ্র প্রজাবৃন্দ সহকারে দুর্গম পর্বতে আশ্রয় নেন। মুঘল বাহিনী সহজেই চিতোর অধিকার করে। রানার দুর্গম পর্বতের মধ্য দিয়া রাঠোরদের এলাকায় গিয়া রাজপুতদিগকে হত্যা, ধ্বংস ও বন্দি করিবার জন্য যুবরাজ মুহাম্মদ আজমের প্রতি আদেশ জারি করা হয়। রাজকীয় বাহিনীকে আক্রমণ ও তাহাদের রসদপত্রের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য মেবার ও মাড়ওয়ারের প্রায় পঁচিশ সহস্র রাজপুত একত্রিত হয়। সেই যুদ্ধে কয়েক হাজার মুঘল সৈন্য নিহত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা রাজপুতদিগকে হটাইয়া দিতে সমর্থ হয়। তাহা সত্ত্বেও পর্বতের অধিকাংশ পথ-ঘাট রাজপুতদের অধিকারে থাকিয়া যায় এবং মাঝে মাঝে তাহারা অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া যুবরাজের বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। যুবরাজের বাহিনীও অপূর্ব সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে এবং তাহাওয়ার খান ও অন্যান্য সেনাধ্যক্ষগণ শত্রুদের পশ্চাদগমনে সুনিপুণ কলাকৌশলের পরিচয় দেন। সমগ্র দেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। মন্দির ও ইমারতরাজি ধ্বংস করা, ফলের গাছ কাটিয়া ফেলা এবং শিশু ও নারীদের যাহারা গর্ত ও ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল তাহাদিগকে বন্দি করিবার কাজে মুঘল বাহিনী নিজেদের নিয়োজিত করে। ঐতিহাসিক খাফি খান বলেন, "যখন রানা প্রবল চাপে পড়েন, তাহার বন্ধুগণ অসমর্থ হইয়া পড়ে, যখন এক কণা শস্যও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে এবং চাষাবাদের কোন চিহ্নও দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন রানা ও রাঠোর রাজপুতগণ পুনরায় মিথ্যা ও শঠতার আশ্রয় নেন।"[৭]

প্রথমে রাজপুতগণ তাহাদের সমর্থনের জন্য ব্যর্থভাবে যুবরাজ মুয়াজ্জমকে প্ররোচনা দেয়। অতঃপর তাহারা যুবরাজ মুহাম্মদ আকবরকে তাঁহার স্বল্প বয়স ও কতেক বন্ধুর সহায়তার সুযোগ লইয়া প্ররোচনা দেয়। দুর্গাদাস ছিল তাহাদের মুখপাত্র। চল্লিশ সহস্র রাজপুত অশ্বারোহী এবং প্রচুর অর্থ সাহায্য দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাহারা যুবরাজকে সহজেই অভিভূত করিয়া ফেলে। এইসব পত্রালাপের কথা যুবরাজ মুয়াজ্জম জানিতে পারিয়া যুবরাজ আকবরকে ইহার করুণ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করিয়া দেন। তিনি সম্রাটকেও এই সম্পর্কে অবহিত করেন। কিন্তু সম্রাট যুবরাজ আকবরকে মোটেই সন্দেহ করেন নাই।

শীঘ্রই গোপন চুক্তি ফাঁস হইয়া পড়ে। দুর্গাদাসের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার রাজপুত যুবরাজের সঙ্গে যোগ দেন। সমস্ত প্রস্তুতি লইয়া যুবরাজ নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন, এবং সত্তর হাজার সেনাবাহিনী লইয়া ১৬৮১ সালের জানুয়ারি মাসে আকবর আজমীরের নিকট উপস্থিত হন। আওরঙ্গজেবের অবস্থা তখন শোচনীয়। কারণ, তাঁহার বাহিনীর দুইটি আসল ভাগ তখন চিতোর ও রাজসমুদ্রের (আনাসাগর) নিকট অবস্থান করিতেছে। যুবরাজ আজমীরের নিকট শিবির সন্নিবেশ করিয়া আনন্দে গা ভাসাইয়া দেন। আওরঙ্গজেবের হাতে তখন সাত হইতে আট শত সৈন্য, এবং এমতাবস্থায় তিনি একটি সুযোগ গ্রহণ করেন। আকবরের নিকট তিনি একটি পত্র লিখিয়া তাঁহার বন্ধুদের বিশ্বাস করাইতে চান যে, মুঘল যুবরাজ তাহাদের সঙ্গে ছল-চাতুরী করিতেছেন এবং পত্রখানি এমনভাবে পাঠানো হয়, যাহাতে তাহা রাজপুতদের হাতে পড়ে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক খাফি খান পত্রখানি পুরাপুরিভাবে বিশ্বাস না করিয়া বলেন, "এই পত্র তাহাদের (রাজপুত) মধ্যে তুমুল বিভেদের

কারণ হয়। এইরকম কাহিনীই আমি শুনিয়াছি, কিন্তু কোন বিশ্বস্ত লোকের মুখে নহে।" যাহা হউক, বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ কাটিয়া রাজপুতরা যুবরাজকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। যুবরাজও স্বীয় প্রাণ রক্ষার্থে রাজপুতদের পদানুসরণ করেন। পরবর্তীকালে দুর্গাদাস তাঁহাকে মারাঠা প্রধান শম্ভুজীর নিকট লইয়া যায়। সেইখানে ছয় বৎসর অবস্থানের পর হতাশ যুবরাজ পারস্যের পথে রওয়ানা হন এবং ১৭০৪ সালে সেখানেই ইহলোক ত্যাগ করেন।

১৬৮১ সালের জুন মাসে মেবারের রানার সঙ্গে সম্রাটের এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জিজিয়া করের পরিবর্তে রানা কয়েকটি জিলা ছাড়িয়া দেন এবং মুঘল বাহিনী মেবার হইতে সরিয়া আসে। ১৭০৯ সালে আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী প্রথম বাহাদুর শাহ কর্তৃক অজিত সিংকে মেবারের রানা বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া পর্যন্ত মাড়ওয়ারের রাঠোররা গেরিলা যুদ্ধ চালাইয়া যায়।

শিখ বিদ্রোহ ঃ শিখ জাতির উৎপত্তি হয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সময়। গুরু নানক এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি সমস্ত ধর্মের অন্তর্নিহিত মৌলিক সত্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহারই একজন শিষ্য আনজাদকে (১৫৩৮-১৫৫২) উত্তরাধিকারী মনোনয়ন দান করিয়া তিনি ১৫৩৮ সালে মারা যান। গুরু রামদাস (১৫৭৪-১৫৮১) হইতে গুরু পদবী বংশানুক্রমিক হইয়া যায়। সম্রাট আকবর তাঁহাকে অমৃতসরে একটি পুকুরসহ কিছু জমি দান করেন। শিখরা তথায় একটি প্রসিদ্ধ মন্দির নির্মাণ করে। পঞ্চম গুরু অর্জুন মল (১৫৮১-১৬০৬) একজন সুষ্ঠু পরিচালক ছিলেন। তিনিই আদি গ্রন্থ বা আসল ধর্মীয় গ্রন্থ হিসাবে শিখদের প্রথম পবিত্র গ্রন্থ প্রণেতা। 'মাসান্দ' নামীয় একটি অবশ্য দেয় চাঁদার সাহায্যে তিনি এই ধর্মের আর্থিক ভিত্তি দৃঢ় করিতে চেষ্টা করেন। প্রথমদিকের গুরুগণ ছিলেন ধর্ম প্রচারক, এবং রাজনীতিতে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু গুরু অর্জুন সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্রোহী যুবরাজ খসরুকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে সম্রাট জাহাঙ্গীর গুরু অর্জুনকে ১৬০৬ সালে মৃত্যুদণ্ড দেন। পরবর্তী গুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬-১৬৪৫) সম্রাট জাহাঙ্গীরের অধীনে চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁহার পিতার প্রতি ধার্যকৃত বকেয়া জরিমানা আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের ফলে তাঁহাকে বারো বৎসর কারাবরণ করিতে হয়। সম্রাট শাহজাহানের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইয়া কাশ্মীরের পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং সেইখানেই তিনি ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ষষ্ঠ গুরু তেগ বাহাদুর। প্রথমাবস্থায় তিনি মুঘলদের অধীনে চাকুরিতে নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সম্রাটের সঙ্গে বিরোধ ঘটে। গুরুকে অনমনীয় দেখিয়া সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁহাকে ১৬৭৫ সালে হত্যা করেন। তাঁহার পুত্র গুরু গোবিন্দ শিখদিগকে পুরাপুরিভাবে সংগঠিত করেন এবং একটি ছুরিতে পানি ছিটাইয়া দীক্ষা নিবার রীতি প্রচলন করেন। যাহারা নূতন প্রচলিত রীতিতে দীক্ষা গ্রহণ করিত, তাহাদিগকে সিংহ উপাধি দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে পাঁচটি 'ক' রাখিতে বলা হয় যথাঃ কেশ, কঙ্গা (চিরুণী), কৃপাণ, কাছা এবং কারা (ইস্পাতের বালা)। প্রতিবেশী কয়েকটি রাজার সঙ্গে তিনি অদ্ভুত সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করেন। কথিত আছে যে, সিংহাসনে উত্তরাধিকারের সংগ্রামে তিনি বাহাদুর শাহকে সাহায্য করেন এবং তাঁহার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে যাইবার পথে তিনি একজন

আফগান ধর্মান্ধ কর্তৃক ১৭০৮ সালে নিহত হন।

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি ঃ রাজত্বের শেষ ২৫ বৎসর (১৬৮২-১৭০৭) আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে অতিবাহিত করেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি কার্যত মোটেই বিশ্রাম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার দাক্ষিণাত্য যুদ্ধাবলির উদ্দেশ্য ছিল বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার রাষ্ট্রগুলি জয় করা এবং মারাঠাদের শক্তি খর্ব করা।

বিজাপুর বিজয় (১৬৮৬ খ্রিঃ) ঃ

বিজাপুরের সুলতান ছিলেন সিকান্দর আলী শাহ। যুবরাজ আজমের নেতৃত্বে ১৬৮২ সালে তাঁহার বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সেই অভিযান ব্যর্থ হয় এবং যুবরাজকে রাজধানীতে ডাকিয়া পাঠানো হয়। পরবর্তী দুই বৎসর আওরঙ্গজেব মারাঠা ও বিদ্রোহী যুবরাজ আকবরকে লইয়া ব্যস্ত থাকেন। বিজাপুরের সুলতান এই দুই বৎসরের সুযোগ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার মন্ত্রী শারজা খানের সহায়তায় সেনাবাহিনীকে পুনরায় সুসংঘবদ্ধ করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব শারজা খানের বরখাস্তের দাবি করেন। তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার অপরাধে সম্রাট স্বয়ং বিজাপুরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং ১৬৮৫ সালের এপ্রিল মাসে উহা অবরোধ করেন। শহরের প্রাচীরে একটি ফাটল সৃষ্টি করা হয়। অবশ্য ইহা সত্য কথা যে, দুর্গের সেনাবাহিনী অসীম সাহসের সহিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলে এবং মারাঠা বাহিনীও বিজাপুরের লোকদিগকে সাহায্য করে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অবরোধ বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই। ১৬৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিজাপুরের পতন হয়। সিকান্দার শাহ্ আদিলকে বন্দি করা হয়। ১৬৮৬ সালে তাঁহার রাজত্ব মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং তাঁহাকেও মুঘল বাহিনীতে নিযুক্ত করা হয়। তাঁহাকে একজন মনসবদার হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং এক লক্ষ টাকা বেতন নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীকালে তাঁহাকে দৌলতাবাদ দুর্গে বন্দি করা হয় এবং সেইখানেই তিনি ১৭০০ সালে প্রাণ ত্যাগ করেন।

অবরোধ ও পতন

গোলকুণ্ডা বিজয় (১৬৮৭) ঃ ১৬৬৫-৬৬ সালে রাজা জয় সিং-এর নেতৃত্বে, এবং ১৬৭৯ সালে দিলির খানের নেতৃত্বে মুঘলদের বিজাপুর অভিযানের সময় গোলকুণ্ডার সুলতান প্রকাশ্যে বিজাপুরের সাহায্যার্থে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। অধিকন্তু ১৬৬৬ সালে আগ্রা দুর্গ হইতে শিবাজীর পলায়নের সময় গোলকুণ্ডার সুলতান তাঁহাকে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দিয়া সাহায্য করেন, যদ্দারা তিনি মুঘলদের হাত হইতে তাঁহার হারানো দুর্গগুলি পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হন। ১৬৭৭ সালে শিবাজীকে তিনি হায়দ্রাবাদে বিপুল অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁহার অনুগত প্রজার মত রত্ন ভূষিত একটি হার তাঁহার ঘোড়ার গলায় বাঁধিয়া দেন। তাঁহার রাজ্যের প্রতিরক্ষার জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা নজরানা স্বরূপ প্রদান করিতে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন।

গোলযোগের কারণ

ফলে মুঘল সাম্রাজ্য ও গোলকুণ্ডার সুলতান আবুল হাসানের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়ে। মুঘল-গোলকুণ্ডার যুদ্ধ বেশ কিছুদিন পর্যন্ত চলিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৬৮৭ সালের জানুয়ারিতে আওরঙ্গজেব স্বয়ং গোলকুণ্ডা গিয়া প্রবল অবরোধ সৃষ্টি করেন। বিস্ফোরক দ্বারা দুর্গ ধ্বংস করা এবং অতর্কিত আক্রমণ উভয়ই ব্যর্থ হয়। একমাত্র আব্দুর রাজ্জাক লারী,

যাহার উপাধি ছিল মুস্তাফা খান, এবং আবদুল্লাহ খান পনি আফগান ব্যতীত সুলতান আবুল হাসানের বেশ কিছু সংখ্যক সামরিক নেতা আওরঙ্গজেবের পক্ষে চলিয়া আসেন। দীর্ঘ আট মাস পর্যন্ত অবরোধ চলে। কিন্তু সুলতানের বাহিনী অপ্রতিহতভাবে প্রতিরক্ষা চালায়। অতঃপর আবদুল্লাহ খান আওরঙ্গজেবের সঙ্গে একটি গোপন চুক্তি করেন এবং মুঘল বাহিনীর প্রবেশের জন্য নগরের একটি দ্বার গোপনে খুলিয়া দিতে সম্মত হন। "শেষ পর্যন্ত আলমগীরের ভাগ্য প্রসন্ন হয় এবং আট মাস দশ দিন অবরোধের পর স্থানটি তাঁহার করতলগত হয়, তবে সৌভাগ্যের জোরে, তরবারি বা বর্শার জোরে নহে"[৮]—মন্তব্য করেন খাফি খান। দুর্গ রক্ষা করিতে গিয়া আবদুর রাজ্জাক লারী গুরুতরভাবে আহত হন। মুঘলগণ তাঁহাকে সেবা-শুশ্রুষা করিয়া আরোগ্য করেন। পরে তিনি সম্রাটের অধিনে একটি উচ্চ পদমর্যাদার চাকুরি গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ বৎসরগুলি অতিক্রম করিবার জন্য বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার টাকার বৃত্তি দিয়া আবুল হাসানকে দৌলতাবাদ দুর্গে পাঠানো হয় এবং ১৬৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গোলকুণ্ডা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মারাঠা ঃ

মারাঠাদের দেশ মহারাষ্ট্রের পশ্চিম ঘাটের পূর্বদিকে অবস্থিত এবং উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম ভূভাগ লইয়া গঠিত। এই দেশের বৈশিষ্ট্য হইল বিশাল পর্বতশ্রেণী। পর্বতশ্রেণী এই এলাকাকে দুইদিকে বেষ্টন করিয়াছে—উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত শাহ্‌ইয়ার্দি পর্বতশ্রেণী এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত সাতপুরা ও বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণী। পর্বতগুলির চূড়ায় অবস্থিত পার্বত্য দুর্গসমূহ এই প্রাকৃতিক উপায়ে সংরক্ষিত দেশের পক্ষে একটি বাড়তি রক্ষাকবচের সৃষ্টি করিয়াছে এবং ইহার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে। অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত ও দেশের কংকরময় প্রকৃতির দরুন ইহার মাটি অনুর্বর এবং তাই জনবসতি খুবই বিরল। দেশের এই আবহাওয়া সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা, সাহস, অধ্যবসায় ও সরলতা ইত্যাদি কতকগুলি উত্তম স্বভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। সাহিত্য ও ভাষা তাহাদের ঐক্যের পথ আরও সহজ করিয়াছে। কারণ, ধর্মীয় সংস্কারকগণ তাঁহাদের ধর্মীয় গীতসমূহ রচনা করিয়াছেন মারাঠী ভাষায়। পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে বেশ কিছু সংখ্যক মারাঠা সাহিত্যেরও সৃষ্টি হইয়াছে।

ভৌগলিক অবস্থান

সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে ভাষা, আদর্শ ও জীবন-পদ্ধতি সম্বলিত একটি উল্লেখযোগ্য জাতির সৃষ্টি হয়; এবং তাহা শিবাজীর রাজনৈতিক ঐক্য প্রচারের পূর্বেই। রাজনৈতিক শিক্ষায় তাহারা দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাজ্যগুলির অধীনে সামরিক ও বেসামরিক উভয় দিকে বেশ অভিজ্ঞতা অর্জন করে। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের সুলতানদ্বয় তাঁহাদের রাজস্ব ও অর্থনীতি বিভাগে বেশ কিছু সংখ্যক মারাঠাকে নিয়োগ দান করেন। কোন কোন সময় এমনকি সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রশাসনিক পদ দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণরাই পূরণ করেন। মদন পণ্ডিত, মাসু পণ্ডিত এবং এইরূপ অনেকেই বিজাপুরের আদিল শাহী দরবারে যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে কাজ করেন। দাক্ষিণাত্যের মুসলিম শাসকগণ এইসব অনভিজ্ঞ পরিশ্রমী মারাঠীদিগকে সৈন্য বিভাগে ভর্তি করিয়া প্রশিক্ষণ দিয়া বিপুল সংখ্যায় কাজে লাগান। দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলে ইহারা নিজেদেরকে সুদক্ষ সৈনিকের পরিচয় দেয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে

দিল্লীর মুঘল সম্রাটগণ যখন নদীর অপর পারে তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন, তখন দাক্ষিণাত্যের শাসকগণ এইসব মারাঠাদিগকে আরও অধিক সংখ্যায় নিয়োগ করিতে আরম্ভ করেন, বিশেষত তাহাদের ঘাটগুলিতে অবস্থিত পার্বত্য দুর্গের প্রতিরক্ষার জন্য। তাহাদের জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারে মারাঠারা এইসব সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে থাকে। মারাঠা রাজনীতিবিদ ও মারাঠা সৈনিকগণ এখন আহমদনগর, বিদার, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের ন্যায় মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনা করিতে থাকেন।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই শিবাজী ১৬২৭ সালের এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শাহজী ভোঁসলা। আহমদনগরের সুলতানের সেনাবাহিনীতে শাহজী একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে চাকুরি গ্রহণ করেন এবং ক্রমশ তিনি বেশ কিছু জমির অধিকারী হন। পরবর্তীকালে তিনি বিজাপুর রাজ্যের অধীনে চাকুরি নেন এবং আহমদনগরের সুলতানের অধীনে থাকাকালে অর্জিত পুনার সম্পত্তি ছাড়াও তিনি কর্নাটে বিশাল এক জায়গীরের অধিকারী হন। এই পুনাতেই শিবাজী লালিত-পালিত হন।

শিবাজীর জন্ম (১৬২৭)

উনিশ বৎসর বয়সে শিবাজী তাঁহার রাজ্য বিজয় ও উন্নতির জীবন আরম্ভ করেন। ১৬৪৩ সালে বিজাপুরের সুলতান আলী শাহ্ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বেশ কিছুদিন রোগ ভোগ করেন এবং ফলে তাঁহার রাজ্যে খুবই বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। শিবাজী বিজাপুরের এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করেন এবং ১৬৪৬ সালে তোর্না দুর্গ অধিকার করেন। এরপর তিনি রায়গড় দুর্গ জয় করিয়া উহার পুনর্নির্মাণ করেন। অতঃপর তাঁহার চাচার নিকট হইতে তিনি সূপা ছিনাইয়া লন। তারপর তিনি তাঁহার পিতার পুনাার জমিদারি এবং বড়মতি, ইন্দাপুর, পুরন্দর ও কোন্দানা দুর্গসমূহ অধিকার করেন। বিজাপুরের সুলতান শিবাজীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত লন। কিন্তু ব্যাপারটিকে ধামাচাপা দেওয়া হয় এই বলিয়া যে, দুর্গগুলি অধিকার করা হইয়াছে তাঁহার পিতার জায়গীরের প্রতিরক্ষার্থে। এরপর শিবাজী কোনকানের দিকে মনোযোগ দেন। তাঁহার অনুচরেরা গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ অধিকার করে ও সুদূর দক্ষিণের কলাবা জিলা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। শিবাজী অতঃপর পার্বত্য দুর্গের সুদীর্ঘ রেখা দ্বারা সুরক্ষিত বেশ বড় জমিদারির মালিক হন।

বিজাপুর দরবারের পক্ষে ইহা ছিল তাহাদের ধৈর্যের বাহিরে। বিজাপুরের সুলতান অতঃপর পুত্রের কার্যকলাপে সহযোগিতার অপরাধে শাহজীকে গ্রেফতার করেন। সাময়িকভাবে শিবাজী তাঁহার আক্রমণাত্মক কার্যাবলি বন্ধ করেন। শরযা খান ও বান্দুলা খানের মধ্যস্থতায় ১৬৪৯ সালে শাহজীকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৬৪৯ হইতে ১৬৫৫ সাল পর্যন্ত শিবাজী চুপচাপ থাকেন। ১৬৫৫ সালের দিকে বিজাপুরী ও দাক্ষিণাত্যের তৎকালীন মুঘল শাসনকর্তা আওরঙ্গজেবের মধ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। কিন্তু শীঘ্রই শান্তি স্থাপিত হইলে আওরঙ্গজেব উত্তরাধিকারীর সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য উত্তর ভারতের দিকে চলিয়া যান। ইতোমধ্যে শিবাজী পুনরায় গোলযোগ আরম্ভ করিয়া দেন। উত্তর ভারতে উত্তরাধিকারের সংগ্রামের দরুন বিজাপুরের সুলতান মুঘল ভীতি হইতে নিষ্কৃতি পান এবং তাই শিবাজীকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে আফজাল খানকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

শিবাজী ও আফজাল খান ঃ মুঘলদের দিক হইতে আপাতত ভীতির কোন কারণ না থাকিবার ফলে বিজাপুর সরকার শিবাজীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। বিজাপুরের

সেনাপতিদের মধ্যে সবচাইতে খ্যাতিসম্পন্ন ও সাহসী সেনাপতি আফজাল খানকে এক বিরাট সেনাবাহিনী সহকারে এই বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। প্রবল চাপে পড়িয়া শিবাজী তাঁহার কিছু লোককে কলাকৌশলে সন্ধি করিবার জন্য প্রেরণ করেন। পরে সিদ্ধান্ত লওয়া হয়, শিবাজী আফজাল খানের সঙ্গে তাঁহার দুর্গের অদূরে সহচরহীন ও নিরস্ত্র অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবেন। আফজাল খানেরও অনুরূপভাবে সাক্ষাৎ করিবার কথা। তদনুযায়ী তিনি তাঁহার অনুচরদিগকে বেশ দূরে ত্যাগ করেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক খাফি খান বর্ণনা করেন ঃ "পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছিবার পর প্রতি তিন চারি কদম অন্তর তিনি (শিবাজী) তাঁহার দোষ স্বীকার করেন এবং দীনহীনভাবে কম্পিত চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি প্রার্থনা করেন, আফজাল খানের পালকিবাহী লোকজন সৈনিকগণ যেন আরও দূরে সরিয়া যায়। শিবাজীর আস্তিনের মধ্যে লুকানো তাহার আঙ্গুলে ছিল একটি মারাত্মক অস্ত্র যাহাকে দাক্ষিণাত্যের ভাষায় বলা হয় বিছুয়া (ব্যাঘ্র নখর)। তাহা এমনভাবে রাখা হয়, বাহ্যত তাহা যেন দৃষ্টিগোচর না হয়।" ঐতিহাসিক আরও বলেন, আফজাল খান যখন শিবাজীকে আলিঙ্গন করেন, শিবাজী তাঁহার পেটে সেই বিছুয়া বা ব্যাঘ্র নখর দিয়া এমন কঠিনভাবে আঘাত করেন যে, তিনি (আফজাল) শব্দহীনভাবে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার পূর্ব নির্দেশমত ঘোষণাকারীরা বিজয়সূচক ধ্বনি করে এবং লুক্কায়িত সৈনিকরা বাহির হইয়া আসে। অতঃপর বিজাপুরের সৈন্যগণ নির্দয়ভাবে নিহত হয়।

আফজাল খানের শঠতাপূর্ণ হত্যার পর শিবাজীর বিরুদ্ধে বিজাপুরের চারিটি অভিযানই ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত বিজাপুর সরকার শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। শিবাজী অতঃপর তাঁহার অধীনস্থ এলাকাসমূহের একচ্ছত্র অধিপতি বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করেন।

শিবাজী ও মুঘল শক্তি ঃ বিজাপুরের সঙ্গে মারাঠাদের সংঘর্ষ সমাপ্ত হয় শান্তিচুক্তির মাধ্যমে। ইহার ফলে তাহারা এখন মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত এলাকায় লুণ্ঠনকার্য চালাইবার সুযোগ লাভ করে। কিন্তু আওরঙ্গজেব এইসব কার্যকলাপ হজম করিবার মত সম্রাট নন। ১৬০০ সালে শিবাজীর বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের গভর্নর শায়েস্তা খানকে পাঠানো হয়, এবং কয়েক জায়গায় মারাঠা বাহিনী পর্যুদস্ত হয়। শিবাজীর কতকগুলি দুর্গও শায়েস্তা খানের হস্তগত হয়।

শায়েস্তা খান ও শিবাজী

অনেকগুলি সংঘর্ষের পর শায়েস্তা খান বর্ষাকালটি শিবাজীর বাল্যস্থান পুনায় কাটাইবার সিদ্ধান্ত নেন। মারাঠা-প্রধান একটি দুঃসাহসিক অভিযানে অবতীর্ণ হন। বরযাত্রীর বেশে ৪০০ সহচর লইয়া তিনি পুনা শহরে প্রবেশ করেন এবং গভীর নিদ্রায় মগ্ন অবস্থায় শায়েস্তা খানের আবাসস্থল আক্রমণ করেন। একটি ছোটখাট সংঘর্ষে গভর্নরের পুত্র নিহত হন এবং তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্টি কাটা যায়। কিছু সংখ্যক ঘুমন্ত মুঘল সেনা ও গুটিকতেক স্বীয় সৈন্য নিহত হইবার পর শিবাজী পলায়ন করেন। রাজা যশোবন্ত সিং-ও তখন পুনায় অবস্থান করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি সূর্যোদয়ের পূর্বে আর আসেন নাই। রাজাও এই আক্রমণে উস্কানি দিয়াছেন বলিয়া কেউ কেউ সন্দেহ করেন। অতঃপর দাক্ষিণাত্য হইতে শায়েস্তা খানকে বদলি করা হয় এবং ১৬৬৩ সালে তাঁহাকে বাংলার সুবাদার হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। শাহজাদা মুয়াজ্জমকে দাক্ষিণাত্যের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।

দিন দিন আরও সাহসী হইয়া শিবাজী প্রতিদিন মুঘল এলাকা ও কাফেলা আক্রমণ করিতে থাকেন। সুরাটের নিকটবর্তী জীবল, পাবাল ও অন্যান্য দুর্গগুলি তিনি অধিকার

করেন এবং মক্কাভিমুখী হজযাত্রীবাহী জাহাজ আক্রমণ করেন। সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় তিনি কতকগুলি দুর্গ নির্মাণ করিয়া সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যে রীতিমতো বাধা দিতে আরম্ভ করেন। রাজা যশোবন্ত সিং মারাঠাদিগকে বাধা দিতে গিয়া ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত অনেকগুলি সামরিক অফিসারসহ রাজা জয় সিংকে পাঠানো হয় এবং রাজা যশোবন্ত সিংকে ১৬৬৫ সালে রাজধানীতে ডাকিয়া পাঠানো হয়।

শিবাজীর আত্মসমর্পণ ঃ রাজা জয় সিং অতি তেজস্বী আক্রমণ পরিচালনা করিয়া শিবাজীকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলেন। এমনকি তাঁহার রাজধানী রায়গড়ের পতনও অনিবার্য হইয়া পড়ে। মুঘল সেনাবাহিনী মারাঠা গ্রাম-গঞ্জ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে থাকে। নিজেকে সম্পূর্ণ বিপন্ন দেখিয়া শিবাজী রাজা জয় সিং-এর সঙ্গে সন্ধি করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তদুদ্দেশ্যে তিনি রাজা জয় সিং-এর শিবিরে আসিয়া ১৬৬৫ সালের জুন মাসে পুরন্দরের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী শিবাজী তাঁহার ২৩টি দুর্গ মুঘলদের ছাড়িয়া দেন এবং মাত্র ১২টি দুর্গ নিজের হাতে রাখেন। শিবাজী সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং রাজা জয় সিং-এর সুপারিশে তাঁহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। শিবাজীর জন্য একটি রাজকীয় ফরমান ও একটি পোশাক প্রেরণ করা হয়। শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীকে পাঁচ হাজারী মনসব দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানে সহায়তা করিবেন বলিয়া শিবাজী অঙ্গীকার করেন। ১৩টি কিস্তিতে ৪০ লক্ষ টাকা আওরঙ্গজেবকে ক্ষতিপূরণ দিবেন বলিয়াও তিনি স্বীকার করেন। আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, তিনি তাঁহার পরিবারবর্গ লইয়া পার্বত্য অঞ্চলে বাস করিবেন এবং তাঁহার লুণ্ঠিত দেশের সংস্কার সাধনে মনোনিবেশ করিবেন।

পুরন্দরের চুক্তি

পুরন্দর-এর সন্ধিকে মুঘলদের একটি বৃহৎ কূটনৈতিক জয় বলিয়া গণ্য করা হয়। বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় শিবাজী মুঘলদের পক্ষ অবলম্বন করেন। মুঘল দরবারে গমন করিবার জন্য রাজা জয় সিং শিবাজীকে উৎসাহ প্রদান করেন। ১৬৬৬ সালের মে মাসে শিবাজী ও তাঁহার পুত্র আগ্রায় উপনীত হন। তিনি ও তাঁহার পুত্র উভয়কে পাঁচ হাজারী মনসব প্রদান করা হয়। কিন্তু এই ব্যবহারে শিবাজী নিরাশ হন এবং ফলে তাঁহার চলাফেরায় সম্রাটের প্রতি অসম্মান প্রকাশ পায়। শিবাজীর এই অসম্মান প্রকাশে সম্রাট খুবই রাগান্বিত হইয়া দুই-চারিটি মামুলী বাক্যালাপের পর সাক্ষাৎকার সমাপ্ত করেন। নগরের বাহিরে একটি প্রাসাদে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেইখানে তিনি নিজেকে কার্যত বন্দি অবস্থায় পান। কিন্তু তিনি আশা ত্যাগ করেন নাই এবং তাঁহার ইচ্ছায় ব্রাহ্মণদের জন্য প্রেরিত বিরাটকায় মিষ্টির ঝুড়ির ভিতর আত্মগোপন করিয়া তিনি ও তাঁহার পুত্র পলায়ন করেন। সম্পূর্ণ একটি বিপরীত পথ ঘুরিয়া তিনি মহারাষ্ট্রে পৌঁছেন।

দিল্লীতে শিবাজী
শিবাজীর কারাবরণ ও পলায়ন

সেই সময় শিবাজীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অবসর মুঘলদের ছিল না। কারণ তাঁহারা তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত লইয়া ব্যস্ত, "যাহা এক বৎসরের অধিক সময় পর্যন্ত মুঘল শক্তির ক্ষতি সাধন করে।" শিবাজীকে রাজা উপাধি ও বেরারে একটি জায়গীর প্রদানের জন্য রাজা যশোবন্ত সিং ও যুবরাজ মুয়াজ্জম সম্রাটের নিকট অনেক সুপারিশ করেন। কিন্তু ১৬৭০ সালে মারাঠাদের সঙ্গে পুনরায় বিরোধ আরম্ভ হয়। সবদিক

শিবাজীর মৃত্যু (১৬৮০)

হইতে মুঘল বাহিনী পর্যুদস্ত হয় এবং মারাঠারা পূর্বে সমর্পিত অনেকগুলি দুর্গ মুঘলদের হাত হইতে ছিনাইয়া লয়। ১৬৭৪ সালে শিবাজী রায়গড়ে নিজের রাজ্যাভিষেক করেন। কিন্তু তাঁহার শ্রমের ফল ভোগ করিবার জন্য তিনি বেশি দিন বাঁচেন নাই। ১৬৮০ সলে মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল কল্যাণ ও গোয়ার মাঝামাঝি পশ্চিম ঘাটসমূহ এবং কোনকান এবং পর্বতের পূর্বদিকের কিছু জিলাসমূহ। দক্ষিণের প্রদেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল বিলগাঁও হইতে তুঙ্গভদ্র পর্যন্ত পশ্চিম কর্নাটক।

দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেব ঃ বিদ্রোহী যুবরাজ আকবর পলাইয়া গিয়া মারাঠা রাজা শম্ভুজীর নিকট আশ্রয় লইবার ফলে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সম্পূর্ণ সামরিক নীতি বদলাইয়া যায় এবং উভয় বিদ্রোহীকে শাস্তি দিবার জন্য সম্রাট ১৬৮১ সালে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। প্রথম চারি বৎসর কাটে যুবরাজ আকবর ও মারাঠাদের বিরুদ্ধে কতকগুলি ব্যর্থ অভিযানে। মারাঠাদের কতকগুলি দুর্গ মুঘলরা দখল করে; কিন্তু তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে দমন করা সম্ভব হয় নাই। অতঃপর ক্ষয়িষ্ণু সালতানাতগুলির বিজয়ের দিকে সম্রাট মনোনিবেশ করেন এবং বিজয় সম্পন্ন করেন ১৬৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

দাক্ষিণাত্য অভিযানের দুইটি উদ্দেশ্যের একটিতে সাফল্য লাভের পর, অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের সালতানাতগুলি জয় করিবার পর আওরঙ্গজেব অন্য উদ্দেশ্যের প্রতি মনোনিবেশ করেন, অর্থাৎ মারাঠা দমনে নিজেকে তিনি নিযুক্ত করেন। তাঁহার প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করে। মুঘল বাহিনী অতি সহজেই শম্ভুজী ও তাঁহার পরিবারবর্গকে বন্দি করে। ১৬৮৯ সালে শম্ভুজীকে হত্যা করা হয়। অতঃপর আওরঙ্গজেব আরও দক্ষিণে তাঁহার অভিযান পরিচালনা করেন এবং সাময়িকভাবে তাঞ্জোর ও ত্রিচিনোপল্লীর ন্যায় সুদূর দক্ষিণের এলাকা হইতে তিনি কর আদায় করেন।

শম্ভুজী গ্রেফতার ও মৃত্যুদণ্ড

আওরঙ্গজেবের রাজত্বের সর্বোচ্চ শিখর (Zenith of his Power) ঃ "সত্যিকারভাবে ১৬৯০ সালে আওরঙ্গজেব তাঁহার ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষের—কাবুল হইতে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মীর হইতে কাবেরী—তিনি একচ্ছত্র অধিপতি হন।"[৯]—মন্তব্য করেন ঐতিহাসিক কালী কিংকর দত্ত। "আওরঙ্গজেব যাহা লাভ করেন, সত্যিকারার্থে ঐগুলি তিনি হারান। ইহাই তাঁহার সমাপ্তির সূচনা। এক ব্যক্তি বা এক কেন্দ্র হইতে শাসন করিবার পক্ষে মুঘল সাম্রাজ্য খুবই বিশাল হইয়া পড়ে ....। তাঁহার শত্রু মাথাচাড়া দিয়া উঠে সবদিক হইতে। তিনি তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সক্ষম হন, কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ খর্ব করিতে তিনি পারেন নাই"[১০] —স্যার যদুনাথ সরকার।

পরবর্তী সতের বৎসরের ইতিহাস (১৬৯০-১৭০৭) একটি সুদীর্ঘ বিরক্তিকর কাহিনী, একটি নিরর্থক খণ্ডযুদ্ধ, দীর্ঘ ক্লান্তিজনক অবরোধ, বিরাট এলাকা বিজয় কিন্তু অল্পমাত্র অধিকার এবং ক্রমশ মুঘল শক্তি ক্ষয় হইয়া যাইবার ইতিহাস। শম্ভুজীর ভ্রাতা রাজারাম মুঘলদের হাতে পড়িবার পূর্বেই পলাইয়া যান এবং সুদূর দক্ষিণের জিঞ্জি দুর্গ অধিকার করিয়া মারাঠা সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। জুলফিকার খান ও যুবরাজ কাম বখসকে পাঠানো হয় জিঞ্জির বিরুদ্ধে। অনেক ব্যর্থতার পর শেষ পর্যন্ত ১৬৯৮ সালে দুর্গটি জয় করা হয়। মারাঠা-প্রধান সাতারার দিকে পলায়ন করেন। দুইজন মারাঠা নেতা—শান্তা ঘুরুপা ও ধানিয়া যাদু—মুঘল সেনাবহর ধ্বংস করিয়া এবং প্রত্যেক জায়গায় ভীতি ও

মারাঠা কার্যাবলি

শংকা ছড়াইয়া তাহারা দেশকে ছারখার করিতে থাকে। আওরঙ্গজেব ৮১ বৎসর বয়সে স্বয়ং সাতারা দুর্গ অবরোধ করিয়া ১৭০০ সালে তাহা অধিকার করেন। এই ঘটনার এক মাস পূর্বে রাজারাম মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁহার বিধবা স্ত্রী তারা বাঈ নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যান। মুঘলরা একদিনে যাহাই জয় করে, তাহাই আবার মারাঠারা পরদিন পুনরাধিকার করিয়া লয়, ফলে যুদ্ধের মেয়াদ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও বন্যা মুঘল বাহিনীর ভীষণ ক্ষতি সাধন করিতে থাকে।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যু (১৭০৭) ঃ ১৭০৫ সালের অক্টোবর মাসে সম্রাট রোগাক্রান্ত হন। তাঁহার মন্ত্রিবর্গের অনেক অনুরোধের পর তিনি আহমদনগরে ফিরিয়া আসেন। কঠোর পরিশ্রম ও অবহেলায় বিনষ্ট শরীর ও মন লইয়া সম্রাট ১৭০৭ সালের ৩রা মার্চ সকালবেলায় কলেমা পাঠ করিতে করিতে আহমদনগরে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার দেহ দৌলতাবাদে লইয়া যাওয়া হয় এবং প্রসিদ্ধ মুসলিম মনীষী বুরহানুদ্দীন (রঃ)-এর মাজারের আঙ্গিনায় তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

সর্বভারতীয় রাষ্ট্র

আওরঙ্গজেবের কৃতিত্ব ঃ সম্রাট আওরঙ্গজেবের ইতিহাস লেখক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার বলেনঃ "আওরঙ্গজেবের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের ষাট বৎসরের ইতিহাস। তাঁহার নিজের রাজত্ব (১৬৫৮-১৭০৭) সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ জুড়িয়া রহিয়াছে এবং আমাদের দেশের ইতিহাসে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যুগ হিসাবে ইহা প্রতিভাত। তাঁহার সময় মুঘল সাম্রাজ্য ইহার সর্ববৃহৎ সীমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে এবং ইতিহাসের আদিকাল হইতে ব্রিটিশ শক্তির উদয় হওয়া পর্যন্ত সময়ের সর্ববৃহৎ পরিচিত একক রাষ্ট্র হিসাবে ইহা স্থান লাভ করে। গজনী হইতে চট্টগ্রাম, কাশ্মীর হইতে কর্নাটক পর্যন্ত ভারত মহাদেশ একটি মাত্র রাজদণ্ড মান্য করে। এই রাজত্বকালেই ভারতবর্ষে ইসলাম ইহার শেষ অগ্রগামী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আকারে পূর্বের কোন তুলনাহীন এইভাবে গঠিত সাম্রাজ্য আবার মাত্র একটি রাজনৈতিক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রদেশসমূহ কোন উপরাজা কর্তৃক শাসিত নহে; বরং সরাসরি সম্রাটের অনুচরদের দ্বারাই শাসিত। এইদিক হইতে আওরঙ্গজেবের ভারত সাম্রাজ্য অশোক বা সমুদ্রগুপ্ত বা হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের চাইতেও বৃহৎ। (*History of Aurangzib*, Vol-I, পৃঃ-১)

মানুষ হিসাবে

আওরঙ্গজেব আলমগীর অতি সাধারণ ও ধার্মিক লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার রিপুর দাস ছিলেন না এবং নিষিদ্ধ খাদ্য, পানীয় বা পোশাক হইতে মার্জিতভাবে নিজেকে বিরত রাখেন। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেনঃ "সরকারি তহবিলকে তিনি পবিত্র আমানত মনে করেন এবং নিজস্ব খরচপত্র বহনের জন্য নিজ হাতে টুপি সেলাই করেন।"[১১] তাঁহার পবিত্র দরবারে কোন আজেবাজে আলোচনা, কোন প্রকার পরনিন্দা বা মিথ্যা আলোচনা ছিল নিষিদ্ধ। কোন লোক অধিক কথা বলিলে বা অসৌজন্যমূলক আচরণ করিলেও তিনি অসন্তুষ্ট হন না বা ভ্রু-কুঞ্চন করেন না। তাঁহার পরিবারবর্গ প্রায়ই লোকদিগকে এরূপ প্রগলভতা দেখাইতে বারণ করিতে চাহিলে তিনি মন্তব্য করেন—"তাহাদের কথা শুনিয়া এবং তাহাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়া তিনি সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের অভ্যাস করেন..... । রাগ বা উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া কখনও তিনি মৃত্যুদণ্ড দেন না।"[১২] তাঁহার পিতার সময় যুবরাজ হিসাবে তিনি ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন এবং শাহজাহান স্বয়ং তাঁহার যোগ্যতা, সাহসিকতা ও

রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দেখিয়া মুগ্ধ হন। সম্পূর্ণ রমজান মাসে আওরঙ্গজেব রোজা রাখেন এবং শেষ দশ দিন তিনি আল্লাহর আরাধনায় মসজিদে অতিবাহিত করেন। হজ্বে গমন করিবার তাঁহার খুবই আগ্রহ ছিল, কিন্তু সমসাময়িক গোলযোগের দরুন তিনি সেই আগ্রহ দমন করিতে বাধ্য হন। হাজীদিগকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়া এবং হযরতের রওজায় ও কাবা শরীফে বিভিন্ন উপঢৌকন পাঠাইয়া তিনি সেই ক্ষতি কিছুটা পূরণ করেন।

ঈশ্বরী প্রসাদ মন্তব্য করেন ঃ "আওরঙ্গজেব মুঘল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে একজন।"[১৩] গরিব শ্রেণীর প্রজাদের প্রতি তাঁহার উদার ও কোমল ব্যবহার এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। সুচতুর শাসক হিসাবে তিনি অনুধাবন করেন, একজন সম্রাটের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে তাঁহার জনহিতৈষিতার উপর। এই জন্য তিনি জনসাধারণকে অনেক পীড়াদায়ক ও বিরক্তিকর কর হইতে রেহাই দেন। "সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই তিনি দেখেন, পূর্বে যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর বিধ্বংসী চলাফেরার সহিত একটি অনাবৃষ্টির মৌসুম মিলিয়া দেশে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিনামূল্যে আহার্য বিতরণের অনেকগুলি গৃহ নির্মাণ করেন এবং বিরক্তিপূর্ণ সড়ক ও ফেরী খাজনা এবং গৃহ ও দোকানপাট ইত্যাদির উপর ভূমিকরসহ প্রায় আশিটি কর রহিত করেন।"[১৪] ধর্মনির্বিশেষে প্রজাসাধারণের প্রতি আওরঙ্গজেবের হৃদয় কোমল ছিল। পক্ষপাতদুষ্ট কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাকে একজন নিষ্ঠুর শাসক হিসাবে অংকিত করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু "তাঁহার সুদীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের শাসনামলে একটি নিষ্ঠুর কাজও তাঁহার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয় নাই। এমনকি তাঁহার শুদ্ধাচার স্বভাবের একটি কাজ হিসাবে পরিগণিত হিন্দুদের জ্বালাতনও মৃত্যুদণ্ড অথবা যন্ত্রণামূলক ছিল না।"[১৫] পাদটীকায় একই ঐতিহাসিক বলেন, শম্ভুজীর নৃশংস হত্যা হয়ত একটি ব্যতিক্রম, কিন্তু তাহাও সংঘটিত হয় রাজবন্দির ভয়ানক উগ্রতার জন্য।

"একমাত্র কোরআনী আইনের নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যতীত তিনি কখনও শাস্তির ব্যবহার করেন নাই, এবং শাস্তি ছাড়া কোন দেশের শাসন পদ্ধতি চালু রাখা যায় না। রেষারেষির দরুন তাঁহার ওমরাহদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়, তাই তাঁহার সৃষ্ট প্রায় প্রত্যেকটি প্রস্তাবনাই ব্যর্থ হয়। তাঁহার অনুসৃত প্রত্যেকটি মহোদ্যম সুদীর্ঘ সময়ে কার্যকর হয়, ফলে ইহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।"[১৬] খাফি খান আরও বলেন ঃ

শাস্তির ব্যবহার ও হ্রাস

"সম্রাটের শাসন এত কোমল ছিল যে, সমগ্র রাজকীয় আধিপত্যে প্রাদেশিক ও জেলা কর্তৃপক্ষের অন্তরে শাস্তির কোন ভীতি বা ভয়বহতা থাকে নাই এবং ফলে শাসন কার্যে এমন একটি দুর্নীতি ও অত্যাচারী অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাহা শাহজাহানের পিতৃতুল্য কিন্তু সদা জাগ্রত শাসনের চাইতেও নিকৃষ্ট ধরনের ছিল।"[১৭]

পরিণতিতে আওরঙ্গজেব তাঁহার উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা মন্ত্রিদের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলেন। তাঁহার বংশের ইতিহাস যে বিশ্বাসঘাতকতার শিক্ষা তাঁহাকে দিয়াছে এবং উত্তরাধিকারের সংগ্রামে তিনি নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করেন, তাহা তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করে। ওয়াকা-ই-নভিস নামে আওরঙ্গজেবের একটি বিরাট সরকারি গোয়েন্দা বিভাগ ছিল। এই বিভাগের অসংখ্য কর্মচারী প্রদেশসমূহের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হইতে পত্রাদি দিয়া সম্রাটকে সাম্রাজ্যের সুদূর ও নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের বিভিন্ন অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত করে। তাহারা স্থানীয় পদস্থ কর্মচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ শাসকদের একটি

ওয়াকা-নভিস

হিতকর বাধা হিসাবে কাজ করে এবং জমিদারগণ তাহাদিগকে ভীতির চোখে দেখেন। ইহাদের সাহায্যে আওরঙ্গজেব শাসন কার্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়সমূহ পরীক্ষা করিতে পারেন এবং সামান্য কেরানি নিযুক্তির স্তর পর্যন্ত তাঁহার আনুকূল্য প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন। সম্রাট তাঁহার পদস্থ কর্মচারীদিগকে সর্বদা বদলিতে রাখেন এবং যতদূর সম্ভব তাহাদের দেশ হইতে দূরে রাখেন।

"নির্ভীক সাহসিকতা, উদ্দেশ্য সাধনে ভয়ানক স্থির প্রতিজ্ঞ এবং অশেষ কর্মতৎপরতা তাঁহার প্রসিদ্ধ গুণাবলির কয়েকটি মাত্র। তাঁহার সামরিক অভিযানসমূহ তাঁহার অসাধারণ বীরত্বের যথেষ্ট প্রমাণ দেয় এবং যেভাবে তিনি তাঁহার শত্রুদের ছলচাতুরী ব্যর্থ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে কূটনীতি ও রাজনীতিবিদ্যার একজন সুপরিপক্ব লোক হিসাবে প্রতিভাত করে।"[১৮] আওরঙ্গজেব নিঃসন্দেহে তৈমুর বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি। স্যার লেনপুল তাঁহার বীরত্ব সম্পর্কে বর্ণনা দিতে যাইয়া বলেনঃ "তাঁহার বীরত্ব সাধারণ ছিল না। শারীরিক দিক হইতে তাঁহাকে সাহসী বলিলে মাত্র এইটুকু বলা হইবে যে, তিনি পুরাতন সিংহবিক্রমশালী বংশের একজন মুঘল যুবরাজ। কিন্তু তিনি এমনকি তাহাদের নির্ভীক শ্রেণীর মধ্যে সবচাইতে সাহসী।"[১৯] বড় বড় সেনাপতি ও সৈনিকগণ তাঁহার যুদ্ধের কলাকৌশলে বিমুগ্ধ হইয়া যান এবং তাঁহার সমরাভিযানগুলির কৌশল ও কার্যকারিতার প্রশংসা করেন। তরুণ বয়সে তিনি সামরিক নেতা হিসাবে তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তুমুল যুদ্ধে চতুর্দিকে শত্রুবেষ্টিত অবস্থায় তিনি যেরূপ শান্ত ও ধীরস্থির থাকেন, এরূপ আর কখনও তিনি থাকেন না—মন্তব্য করেন ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ।

সেনাপতি হিসাবে

একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ও শাসক হওয়া ছাড়াও আওরঙ্গজেব একজন বিদ্বান ব্যক্তিত্ব। তিনি ইসলামী ধর্মীয় শাস্ত্রের একজন একনিষ্ঠ ছাত্র এবং অতি সুন্দর হস্তলিপির অধিকারী। ন্যায়শাস্ত্র, ইসলামী আইন শাস্ত্র ও ফার্সি সাহিত্যে তিনি অগাধ জ্ঞানের ভাণ্ডার। ইসলামী আইন শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফতওয়ায়ে আলমগীরী' তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত। "কোরআন তিনি মুখস্থ করেন এবং নিজের হাতে লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার সাধুতা ও একনিষ্ঠতার নিদর্শন হিসাবে মদিনায় প্রেরণ করেন"—ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ।

একজন বিদ্বান ব্যক্তিত্ব

পাদটীকা

১। Judged as a military exploit, Mir Jumla's invasion of Assam was a success—Sir J.N. Sarker: *History of Bengal.*

২। ".... by following the policy of paying subsidies, or by setting up one clan against another,—or, to use his own metaphor, breaking two bones by knocking them together."

৩। Ruinous as the Afghan war was to the imperial finances, its political effect was even more harmful. It made the employment of the Afghans in the ensuing Rajput war impossible, though the Afghans were just the class of soldiers who could have won victory in that

rugged and barren country. Morevover, it relieved the pressre on Shivaji by draining the Deccan of the best Mughal troops for service on the north-west frontier. The Maratha Chief took advantage of this division of his enemy's strength to sweep in a dazzling succession of triumphs through Golkunda to the Karnatik and back again through Mysore and Bijapur to Raigarh during the fifteen months following December 1675. It was the climax of his career but the Afridis and the Khattaks made his unbroken success posible— J. N. Sarker: *History af Aurangzib.*

৪ । These men dress like devotees, but they nevertheless carry on agriculture and trade, though their trade is on a small scale. —Khafi Khan: *Muntakhab ul Lubab*, Vol II, p. 252.

৫ । With the object of curbing the infidels and of distinguishing the land of the faithful from an infidel land, the Jizya or poll tax was imposed upon the Hindus throughout all the Provinces:— Khafi Khan.

৬ । খাফি খান ঃ প্রাগুক্ত খণ্ড ২ পৃঃ ২৫৯ ।

৭ । When the Rana was hard pressed and his allies were crippled, when not a scrap of grain was left, and not a trace of cultivation was to be found, the Rana and the Rathor Rajputs had recourse again to lies and stratemge. — Khafi Khan.

৮ । But the fortune of Alamgir at length prevailed; after a seige of eight months and ten days, the place fell into his hands, but by good fortune not by force of sword and spear—Khafi Khan.

৯ । In fact by the year 1690 Aurangzib had already reached the zenith of his power and was the lord paramount of almost the whole of India—from Kabul to Chittagong and from Kashmir to Kaveri— K.K. Datta: *An Advanced History of India.*

১০ । As a matter of fact all seemed to have been gained by Aurangzib now; but in reality all was lost. It was the beginning of his end. The Mughal Empire had become too large to be governed by one man or from one centre ..... His enemies rose from all sides; he could defeat but not crush them for ever—Sir J.N. Sarker: *History of Aurangzib* Vol-V.

১১ । He regarded the public treasury as a sacred trust, and stitched caps with his own hands to derfray his personal expenses, —Ishwari Prasad: *A Short History of Muslim Rule in India.*

১২। Mirat-i-Alam, Elliot and Dowson কর্তৃক *History of India* গ্রন্থে অনূদিত Vol VII পৃঃ ৫৬-১৬২।

১৩। Aurangzib is one of the greatest rulers of the Mughal dynasty.

১৪। স্ট্যানলি লেনপুল ঃ *Aurangzib*

১৫। ঐ।

১৬। খাফিখান ঃ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৪৭।

১৭। খাফি খান ঃ প্রাগুক্ত, লেনপুল কর্তৃক Aurangzib গ্রন্থে উদ্বৃত।

১৮। Undaunted bravery, grim tenacity of purpose, and ceaseless activity, were some of his prominent qualities. His military campaigns give sufficient proof of his unusual courage, and the manner in which he baffled the intrigues of his enemies shows him to have been a post master of diplomay and statecraft.—K.K. Datta: প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০৯।

১৯। His was no ordinary courage. That he was physically brave is only to say he was a Mughal Prince of the old lion-hearted stock. But he was among the bravest even in their valiant rank.—S. Lane Poole.

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

Khafi Khan	:	*Muntakhab ul Lubab*
J.N. Sarker	:	*History of Aurangzib.* 5 Vols.
—Do—	:	*Anecdotes of Aurangzeb*
—Do—	:	*India of Aurangzeb*
S. Lane Poole	:	*Aurangzeb*
Bernier	:	*Travels in the Mogul Empire*
Terry	:	*A Voyage to East Indies*
S.R. Sharma	:	*Religious Policy of the Mughal Empire*
Elliot & Dowson		*History of India,* Vol VII
		Alamgir Namah
V.A. Smith		*Oxford History of India*
Ishwari Prasad		*A Short History of Muslim Rule in India*
Majumdar, Raychoudhury and Datta		*An Advanced History of India.*

অষ্টম অধ্যায়
পরবর্তী মুঘলগণ
মুঘল সাম্রাজ্যের পতন
(১৭০৭-১৮৫৭ খ্রিঃ)

সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারের জন্য পুত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত লক্ষ্য করিয়া আওরঙ্গজেব একটি বন্টকনামা বা উইলের মাধ্যমে সাম্রাজ্যকে তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেন। উইল করা সত্ত্বেও তাঁহার তিন পুত্র মুয়াজ্জম, আজম ও কাম বখস্ সিংহাসনের জন্য ভীষণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময় যুবরাজ মুয়াজ্জমের শাসনাধীন ছিল কাবুল ও পাঞ্জাব; মুহাম্মদ আজমের হাতে মালব এবং কাম বখসের হাতে ছিল দাক্ষিণাত্য।

উত্তরাধিকারের সংগ্রাম

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময় যুবরাজ মুয়াজ্জম ছিলেন আফগানিস্তানে। তাঁহার পুত্র মুনিম খানকে লইয়া শীঘ্রই তিনি দিল্লীতে উপনীত হন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আজিম-উশ-শানও দ্রুত আগ্রা অধিকার করেন। ১৭০৭ সালের জুন মাসে দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া মুয়াজ্জম নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে যুবরাজ আজম নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন এবং দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু অচিরেই তিনি মুয়াজ্জম কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। অতঃপর যুবরাজ মুয়াজ্জম 'বাহাদুর শাহ্' উপাধি গ্রহণ করেন। যুবরাজ কাম বখ্স্ও তাঁহার ভাগ্য পরীক্ষা করেন। কিন্তু হায়দ্রাবাদের নিকটে একটি যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং ১৭০৮ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এইভাবে যুবরাজ মুয়াজ্জম তাঁহার পথ পরিষ্কার করিয়া সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হন।

যুবরাজ মুয়াজ্জম কর্তৃক বাহাদুর শাহ উপাধি গ্রহণ

প্রথম বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১৭১২) ঃ সম্রাট হইবার সময় বাহাদুর শাহের বয়স ৬৩ বৎসর, সুতরাং কোন কাজ করিবার উৎসাহ তাঁহার ছিল না। ঐতিহাসিক ইরভিনের মতানুসারে—বাহাদুর শাহ ছিলেন একজন "কোমল ও ন্যায়পরায়ণ স্বভাবের ব্যক্তি, জ্ঞানী, মহিমান্বিত এবং প্রত্যেক দোষের প্রতি ক্ষমাশীল।"[১] তাঁহার রাজত্বের সময়েই দরবারে চক্রান্ত বৃদ্ধি পায় এবং এইগুলি দমন করিবার ক্ষমতা তাঁহার মোটেই ছিল না। তুরানী, পারস্যবাসী ও হিন্দুস্থানী নামে তিনটি দলের উৎপত্তি হয়। এইসব দল বাহাদুর শাহের উত্তরাধিকারীদের রাজত্বের সময় যথেষ্ট গোলযোগের সৃষ্টি করে।

সিংহাসনে আরোহণের পর বাহাদুর শাহকে অনেকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। মারাঠা নেতা শম্ভুজীর পুত্র সাহুকে তিনি মুক্তি দেন এবং দাক্ষিণাত্যের ছয়টি প্রদেশে তাঁহাকে 'চউথ' নামক এক প্রকার খাজনা আদায়ের অধিকার প্রদান করেন। এই খাজনা মুঘল

কর্মচারীরা প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া সাহুর হাতে অর্পণ করে। সাহুর মুক্তি প্রদান একটি বিরাট কূটনৈতিক চাল। ইহার ফলে মারাঠাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। রাজারামের বিধবা পত্নী তারা বাঈ সাহুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। মারাঠাদের মধ্যে অতঃপর গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং বাহাদুর শাহের পরবর্তী রাজত্বের সময় তাহারা নিজেদের গৃহযুদ্ধে ব্যস্ত থাকে।

মারাঠা নেতার মুক্তি
চউথ খাজনা
মারাঠা গৃহযুদ্ধ

রাজপুতদের ব্যাপারে বাহাদুর শাহ্ সমঝোতার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি জিজিয়া কর রহিত করেন এবং মেবার ও মাড়ওয়ারের স্বাধীনতা মানিয়া লন। আম্বরের রাজার সঙ্গে তিনি বন্ধুভাব গড়িয়া তোলেন।

এই সময় শিখরা গোলযোগের সৃষ্টি করে। গুরু গোবিন্দ সিং-এর মৃত্যুর পর হাজার হাজার শিখ তাহাদের নূতন নেতা বান্দা বাহাদুরের পতাকাতলে সমবেত হয়। শিখরা দিল্লীতে সম্রাটের অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে এবং সরহিন্দের শাসনকর্তা উজির খানকে হত্যা করিয়া তাহা অধিকার করে। সাহারানপুর এবং কর্নালও তাহাদের হস্তগত হয়। ঐসব এলাকায় শিখরা যথেচ্ছভাবে মুসলিম হত্যা অভিযান আরম্ভ করে। শিখদের দমন করিবার জন্য বাহাদুর শাহ্ অগ্রসর হন এবং লোহাগড় দুর্গ অবরোধ করিয়া তাহা অধিকার করেন। বান্দা বাহাদুর দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। লাহোর প্রত্যাবর্তন করিয়া সম্রাট ১৭১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রাণ ত্যাগ করেন।

শিখ গোলযোগ

জাহান্দার শাহ্ (১৭১২-১৭১৩) ঃ প্রথম বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারের সংগ্রাম আরম্ভ হয় এবং শেষ পর্যন্ত জুলফিকার খানের সহায়তায় জাহান্দার শাহ্ জয়লাভ করেন। তাঁহার তরুণ অবস্থায় জাহান্দার শাহ্ একজন কর্মঠ যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি অলসতা ও কুপ্রবৃত্তিতে ডুবিয়া যান। তিনি উন্নাসিকের ন্যায় চলাফেরা করেন এবং রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি এমন কিছু লোকের হাতে ছাড়িয়া দেন, যাহাদের না ছিল কোন যোগ্যতা, না ছিল কোন অভিজ্ঞতা। এগারো মাস রাজত্বের পর ১৭১৩ সালে ফররোখ সিয়ারের আদেশে দিল্লীর দুর্গে তাঁহাকে গলা টিপিয়া হত্যা করা হয়।

ফররোখ সিয়ার (১৭১৩-১৭১৯) ঃ সিংহাসনে আরোহণের সময় ফররোখ সিয়ার ত্রিশ বৎসরের এক যুবক ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ দুর্বল ও চিন্তাহীন, এবং তাঁহার না ছিল শারীরিক শক্তি, না ছিল নৈতিক বল। সিংহাসনে আরোহণের পিছনে তাঁহার শক্তি ছিলেন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়—সৈয়দ হোসাইন আলী, পাটনার সহকারী শাসনকর্তা এবং সৈয়দ আবদুল্লাহ্, এলাহাবাদের শাসনকর্তা। অতঃপর সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় একের পর এক যুবরাজকে সিংহাসনে বসাইতে থাকেন। সৈয়দ আবদুল্লাহ্ হন প্রধান উজির এবং সৈয়দ হোসাইন আলী সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। কিছু সংখ্যক বন্ধুর প্রভাবে ফররোখ সিয়ার সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে গিয়া ব্যর্থ হন। যাহা হউক, কোন ষড়যন্ত্রই কাজে লাগানো হয় নাই। কিন্তু দেশের শাসনকার্যের উপর এইগুলির কুপ্রভাব গভীরভাবে বিস্তার লাভ করে।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়

মুঘলদের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ লইয়া শিখ, জাঠ ও রাজপুতরা এই সময় বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে। শিখরা বান্দা বাহাদুরের নেতৃত্বে নিজেদের অবস্থা শক্তিশালী করিয়া লয়। শিখদের দমন করিবার জন্য লাহোরের শাসনকর্তা আবদুস সামাদকে আদেশ

দেওয়া হয়। এই সময় বান্দা বাহাদুরের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির ব্যাপারে শিখদের মধ্যে বিভিন্ন সমালোচনা আরম্ভ হয়, ফলে বেশ কিছু সংখ্যক শিখ বান্দার দলত্যাগ করে। অতঃপর মুঘল বাহিনী বান্দা বাহাদুরকে স্থান হইতে স্থানান্তরে তাড়া করে। শেষ পর্যন্ত ১৭১৫ সালে ৭৪০ জন শিখসহ বান্দা আত্মসমর্পণ করেন। তাহাদের সবাইকেই হত্যা করা হয়।

শিখদের দমন

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাব সম্রাটের নিকট অসহ্য হইয়া ওঠে। তাহাদিগকে সরাইবার জন্য তিনি উঠিয়া-পড়িয়া লাগেন। কিন্তু এই ব্যাপারে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন আরও শক্তিশালী। শেষ পর্যন্ত তাহারা সম্রাটকে পদচ্যুত করিয়া অন্ধ করিয়া ফেলেন এবং অতঃপর নৃশংসভাবে হত্যা করেন।

রফি-উদ দরাজাত এবং রফি-উদ-দৌলা ওরফে দ্বিতীয় শাহজাহান (১৭১৯) ঃ ফররোখ সিয়ায়ের হত্যার পর সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় একের পর এক সম্রাট রফি-উদ-দরাজাত ও সম্রাট রফি-উদ-দৌলাহকে সিংহাসনে বসান। তাহারা সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতের পুতুল ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। ১৭১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রফি-উদ-দৌলা প্রাণ ত্যাগ করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় মুহাম্মদ শাহকে সিংহাসনে বসান।

মুহাম্মদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৮) ঃ মুহাম্মদ শাহ যদিও একজন ক্রীড়নক ছিলেন তাহা সত্ত্বেও তিনি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন এবং এই কাজে তিনি সফল হন ১৭২২ সালে। এক বিরাট ষড়যন্ত্র করিয়া উভয় ভ্রাতাকে হত্যা করা হয়। মুহাম্মদ শাহের রাজত্ব সুদীর্ঘ ছিল; কিন্তু তিনি রাষ্ট্রের কার্যাবলিতে কোন মনোযোগ দিতেন না। ইহার পরিণতি হয় ভয়াবহ। একের পর এক প্রদেশ স্বাধীন হইতে আরম্ভ করে। আলীবর্দী খান নিজেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীন শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। দাক্ষিণাত্যে নিজাম-উল-মুলক নিজেকে স্বাধীন করিয়া লন। সায়াদাত খান বুরহান উল হক নিজেকে অযোধ্যার স্বাধীন শাসক হিসাবে ঘোষণা করেন। এই সুযোগে ১৭৩৯ সালে পারস্যের নাদির শাহও ভারত আক্রমণ করেন।

নাদির শাহের আক্রমণ (১৭৩৯) ঃ পারস্যের নাদির শাহ একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৩২ সালে শাহ তামাস্প-এর হাত হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া তিনি সম্মুখভাগে আসিয়া যান। ১৭৩৬ সালে তিনি জোরপূর্বক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া পারস্যের সম্রাট হন। ঐতিহাসিক ইরভিনের মতানুসারে—"নাদির শাহ শুধুমাত্র একজন যোদ্ধা বা কোন বর্বর দলের বর্বর নেতা ছিলেন না, বরং সুনিপুণ অস্ত্রধারীর ন্যায় কূটনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় একজন দক্ষ লোক ছিলেন। তাঁহার কূটনীতির গভীরতার তুলনায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁহার সুদক্ষ সেনাপতিত্ব এবং যুদ্ধে জয়লাভের পর বিজিত জাতির প্রতি তাঁহার বিজ্ঞ নীতি কোন অংশে কম উল্লেখযোগ্য ছিল না।"[২]

মুঘল সম্রাট কর্তৃক কিছু সংখ্যক পারস্যবাসী পলাতককে আশ্রয়দানের অজুহাতে ১৭৩১ সালে নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন। কর্নাল-এর নিকটে নাদির শাহ ও মুঘলদের মধ্যে একটি যুদ্ধ হয় এবং ইহাতে মুঘলরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। নাদির শাহের দিল্লী প্রবেশ হত্যাকাণ্ড, ধ্বংস ও অগ্নিকাণ্ডের জন্য কুখ্যাত। দুর্গে রক্ষিত সমস্ত রাজকীয় অলংকার ও সম্পত্তি এবং খাজাঞ্চিখানার সমস্ত টাকা-পয়সা পারস্যবাসী বিজয়ীর হস্তগত হয়।"[৩]

সংক্ষেপে ৩৪৮ বৎসরের সঞ্চিত ধনরাশি মুহূর্তে হস্ত পরিবর্তন করে। নাদির শাহ কর্তৃক লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসনও অন্তর্ভুক্ত।

৫৭ দিন অবস্থানের পর নাদির শাহ দিল্লী ত্যাগ করেন। ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি মুহাম্মদ শাহকে সিংহাসনে রাখিয়া যান, এবং বিনিময়ে মুঘল সম্রাট সিন্ধু নদীর পশ্চিমের প্রদেশগুলি পারস্যের নিকট ছাড়িয়া দেন। এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত হইল কাশ্মীর হইতে সিন্ধু পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ এবং থাট্টা প্রদেশ ও উহার অধীনস্থ দুর্গগুলি। নাদির শাহের আক্রমণের আঘাতে মুহাম্মদ শাহ ও তাঁহার পারিষদবর্গ হতবুদ্ধি হইয়া যান। দুই মাস পর্যন্ত সাম্রাজ্যের কার্যাবলিতে কোনকিছুই করা হয় নাই। এই আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যে মৃত্যু আঘাত হানে এবং ইহার পতন ত্বরান্বিত করে। ইহা মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও হীনতা প্রকাশ করে। ইহার ফলে ১৭৩৯ সালের পর হইতে আফগানরা বার বার মুঘল সাম্রাজ্য আক্রমণ করিবার অনুপ্রেরণা লাভ করে। মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরব বিনষ্ট হয়। ১৭৪৭ সালে নাদির শাহ প্রাণ ত্যাগ করেন।

আহমদ শাহ (১৭৪৮-১৭৫৪) ঃ মুহাম্মদ শাহের মৃত্যুর পর আহমদ শাহকে সিংহাসনে বসানো হয়। তিনি ২১ বৎসরের একজন অনভিজ্ঞ ও অকর্মণ্য যুবক। শাসনব্যবস্থার সবকিছুই তিনি জাবেদ খানের হাতে ছাড়িয়া দেন এবং জাবেদ খান উজির সাফদার জঙ্গের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠেন। ফলে শাসনব্যবস্থায় গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

আহমদ শাহ আবদালীর ভারত আক্রমণ (১৭৪৮)

আহমদ শাহ আবদালী বা দুররানী নাদির শাহের একজন সুযোগ্য সেনাপতি ছিলেন। নাদির শাহ নিহত হইবার পর আহমদ শাহ আবদালী নিজেকে কান্দাহারের বাদশাহ্ বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি কাবুলও অধিকার করেন। ১৭৪৮ হইতে ১৭৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতে অনেকগুলি অভিযান পরিচালনা করেন। এইসব অভিযান শুধুমাত্র সামরিক অভিযানই নহে, বরং আফগানরা ভারতের কোন কোন জায়গায় মুঘলদের ধ্বংসাবশেষের উপর নিজদিগকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করে। ১৭৪৮ সালে আবদালীর প্রথম অভিযান ব্যর্থ হয়। কিন্তু ১৭৫১ সালের মধ্যে তিনি পাঞ্জাব ও কাশ্মীর জয় করেন। ১৭৫৭ সালে আরেকটি অভিযানের মধ্য দিয়া আবদালী দিল্লীর সন্নিকটে পৌঁছেন এবং জাঠদের মধ্যে লুটতরাজ করিয়া তৈমুর শাহকে লাহোরে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া তিনি ভারত ত্যাগ করেন।

প্রথম অভিযান

তৈমুর শাহের শাসনব্যবস্থা অরাজকতার জন্য কুখ্যাত হইয়া পড়ে। শিখ সম্প্রদায় সর্বদিকে বিদ্রোহ করে। জলন্ধর দোয়াব-এর শাসনকর্তা আফগানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া মারাঠাদের আহ্বান করেন। উত্তর ভারতে আধিপত্য অর্জনের জন্য মারাঠারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং পাঞ্জাব হইতে আফগানদিগকে বহিষ্কার করে। এই বহিষ্কারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য আহমদ শাহ আবদালী ভারত আগমন করেন এবং ১৭৬১ সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। মারাঠা যুদ্ধজোট ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া যায়। মারাঠা শক্তি অতঃপর এমন শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয় যে, পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিতে তাহাদের আরও দশ বৎসর কাটিয়া যায়। দ্বিতীয় শাহ আলমকে সম্রাট নিযুক্ত করিয়া ১৭৬২ সালে আহমদ শাহ আবদালী কাবুল ফিরিয়া যান।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১)

দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-১৭৫৯) ঃ আহমদ শাহ পারিষদবর্গ কর্তৃক বহিষ্কৃত হন এবং তাঁহার স্থলে জাহান্দার শাহ-এর দ্বিতীয় পুত্র আজিজুদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। তিনি 'দ্বিতীয় আলমগীর' উপাধি গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে শাসনকার্যে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। কারণ জীবনের প্রায় সমস্ত ভাগই তিনি জেলখানায় কাটান। তিনি ইতিহাসের পুস্তক ভালবাসেন। রীতিমতো নামাজ আদায় করেন এবং ভোগ-বিলাস অপছন্দ করেন। তিনি উজির ইমাদ-উল-মুলকের হাতের ক্রীড়নক হইয়া পড়েন। উজির প্রায় সমস্ত রাজস্ব পকেটস্থ করেন এবং রাজকীয় পরিবারকে আর্থিক দুর্গতির মধ্যে রাখেন। ১৭৫৯ সালে দ্বিতীয় আলমগীরের মৃত্যুর পর তৃতীয় শাহজাহানকে সম্রাট বানানো হয়। কিন্তু দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র আলী গওহর নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন এবং 'দ্বিতীয় শাহ আলম' উপাধি গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় শাহ্ আলম (১৭৫৯-১৮০৬) ঃ নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিবার সময় দ্বিতীয় শাহ্ আলম বিহারে ছিলেন। দিল্লীর রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি আর সেইদিকে যাইবার সাহস হারাইয়া ফেলেন। ১৭৬০ হইতে ১৭৭১ সাল পর্যন্ত তিনি ইংরেজদের কর্তৃত্বাধীন থাকেন। এই সময় তিনি বিহার ও বাংলা ইংরেজদের হাত হইতে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ১৭৭২ সালে তিনি দিল্লি গমন করেন। ১৭৬৪ সালে দ্বিতীয় শাহ আলম বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দি হন। পরবর্তী বৎসর তিনি ইংরেজদিগকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রদান করেন এবং বিনিময়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁহাকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা নজরানা দিতে স্বীকৃত হয়। ইংরেজ কোম্পানি দ্বিতীয় শাহ আলমকে মুঘল সম্রাট বলিয়া স্বীকার করে।

ইংরেজদেরকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও দেওয়ানী প্রদান

সুদীর্ঘ রাজত্বকালে শাহ আলম তাঁহার মন্ত্রিবর্গ ও মারাঠাদের হাতের ক্রীড়নক হইয়া থাকেন। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ তাঁহার রাজত্বের সময়েই সংঘটিত হয়। ১৭৮৮ সালে তাঁহাকে অন্ধ করিয়া ফেলা হয় এবং ১৮০৬ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। জীবনের অনেক উত্থান-পতনের মধ্যে তিনি কালাতিপাত করেন। ১৮০৩ সালে ব্রিটিশগণ দিল্লী অধিকার করে এবং শাহ্ আলম তাহাদের বেতনভোগীতে পরিণত হন।

দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬-১৮৩৭) ঃ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় আকবর সিংহাসনে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। পিতার ন্যায় তিনিও ইংরেজদের বেতনভোগী ছিলেন। তাঁহার কার্যকলাপ দিল্লীর লাল কেল্লায় সীমাবদ্ধ থাকে এবং রাজকীয় উপাধি তিনি সম্মানস্বরূপ উপভোগ করেন। ১৮৩৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ (১৮৩৭-১৮৫৭) ঃ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ তাঁহার পিতা দ্বিতীয় আকবরের উত্তরাধিকারী হন। ভারতবর্ষে তিনিই শেষ মুঘল সম্রাট। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি, এবং 'জাফর' ছদ্মনামে তিনি কবিতা রচনা করেন। তাঁহার রাজত্বের সময়েই ভারতের জনগণ "প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ" আরম্ভ করে, যাহাকে ব্রিটিশ সরকার "সিপাহী বিদ্রোহ" নামে অভিহিত করে।

প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাহাদুর শাহ্ একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ব্রিটিশদের বেতনভোগী হইয়াও তিনি জনসাধারণকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করিবার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। সেই সময় ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এই ব্যাপারে তিনি যেসব পত্রাদি আদান-প্রদান করেন, উহাতে তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ পায়। ভারত শাসন করিবার তাঁহার কোন অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু তিনি চাহিয়াছিলেন, ব্রিটিশ ইংরেজদিগকে এই দেশ হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে এবং ভারতের লোকেরাই এই দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে। যাহা হউক এই সংগ্রাম ব্যর্থ হইবার পর ইংরেজদের সমস্ত আক্রোশ বাহাদুর শাহের উপর পতিত হয়। তাঁহাকে বন্দি করা হয় এবং তাঁহার সমস্ত পুত্রদিগকে তাঁহার চোখের সামনে হত্যা করা হয়; ইংরেজরা তাঁহার চোখের সামনে তাঁহার কন্যাদের স্তন কাটিয়া হত্যা করে। স্বয়ং তাঁহাকে রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গুন) নির্বাসিত করা হয় এবং সেইখানে ১৮৬২ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার সঙ্গেই ভারতবর্ষে মুঘল শাসনের অবসান হয়।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ঃ

সাম্রাজ্য ও রাজ্যসমূহের উত্থান ও পতন মানবিক ইতিহাসের একটি সাধারণ নিয়ম। একটি বংশ বা সাম্রাজ্য কার্যকরভাবে এক শতাব্দী বা ঐরকম কিছু সময় বিদ্যমান থাকে এবং তারপর তাহা ধ্বংসের স্বাভাবিক নিয়মে পতিত হয়। সেই পতনের যুগে প্রত্যেক বাদশাহ ও সভাসদ আলাদাভাবে রাষ্ট্রের স্বার্থের কথা চিন্তা করেন, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে চিন্তা ও কাজের যোগসূত্র রক্ষা করিতে ব্যর্থ হন। যাহার ফলে প্রায়ই গৃহযুদ্ধ, ষড়যন্ত্র ও শঠতা দেখা দেয় এবং পরিশেষে এইগুলি জাতীয় সম্পদের সমূহ ক্ষতি সাধন করে। জনসাধারণ তাহাদের শাসকদের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলে। স্বার্থান্বেষী প্রাদেশিক দুঃসাহসী ব্যক্তিবর্গ বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে এবং সীমান্ত বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। এই ধরনের কার্যাবলি একটি জাতির পতনের সূচনা করে। মুঘল সাম্রাজ্যও এই ইতিহাসের ধারা হইতে আলাদা ছিল না।

সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের লিখিত ইতিবৃত্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ না করিয়া কিছু সংখ্যক পক্ষপাতদুষ্ট আধুনিক ঐতিহাসিক সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরকে অযথা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী করেন। বলা হয় যে, এই উপমহাদেশের অন্যান্য ধর্মের প্রতি অনমনীয় মনোভাব পোষণ করিবার ফলে এই ধার্মিক সম্রাট কোটি কোটি রাজভক্ত প্রজাদিগকে মুঘল সাম্রাজ্যের বিরোধী শক্তিতে পরিণত করেন। জাঠ, শিখ, রাজপুত, মারাঠা ও সাতনামীদের বিদ্রোহের জন্য এইসব ঐতিহাসিক আওরঙ্গজেবকে দায়ী করেন। কার্যত আওরঙ্গজেব এইসব বিদ্রোহের সূত্রপাত করেন নাই, বরং এইসব রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে তিনি পর্বত-প্রমাণ অটল থাকেন। বস্তুত মুঘল শ্রেষ্ঠ আকবরের সময়েই এইসব বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং সম্রাট শাহজাহান উভয়কে এইসব বিদ্রোহ দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। সম্রাট শাহজাহানের উত্তরাধিকারের সংগ্রামে মুঘল বিরোধী শক্তিবর্গ দারা শিকোহ্কে তাহাদের মনোনীত প্রার্থী নির্বাচন করে। কারণ, তিনি এমন এক মুঘল যুবরাজ, যাহাকে সহজেই চমকিত করা যায়। দারা শিকোহ্র দুর্বল চরিত্রের জন্য স্যার লেনপুল মন্তব্য করেন—"যদি দারা শিকোহ এই উত্তরাধিকারের সংগ্রামে সফলতা অর্জন করিতেন, তবে তাহা হইত রাজপুতদের জয়, মুঘলদের নহে।[৪] হিন্দু পুনর্জাগরণের শেষ

আশা ব্যর্থ হইবার পর আওরঙ্গজেবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য তাহারা চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নাই। কিন্তু আওরঙ্গজেব তাহাদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলে তাহারা ইতিহাসে আওরঙ্গজেবকে কলংকিত করিবার জন্য ইতিহাস বিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে।

ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন ও স্মিথের মতানুসারে, দাক্ষিণাত্যের সালতানাতগুলির ধ্বংস সাধন করা আওরঙ্গজেবের পক্ষে অবিবেচকের কাজ হইয়াছে। তাঁহারা মনে করেন—ইহা "মারাঠা-প্রধানকে স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর ভার হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছে"[৫] যাহাকে মুঘল সম্রাট হয়ত মারাঠাদের বিরুদ্ধে তাঁহার সুবিধানুযায়ী ব্যবহার করিতে পারিতেন। কিন্তু সালতানাতগুলি ও তাহাদের উপর হামলাকারী মুঘল সম্রাটের মধ্যে কোন অকপট সন্ধি করা সম্ভব কিনা এবং সালতানাতগুলি মারাঠা শক্তিকে রোধ করিতে পারিত কিনা, ইহা বিতর্কের বিষয়। স্যার যদুনাথ সরকার বলেনঃ "আকবর কর্তৃক বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রমের পর হইতে দাক্ষিণাত্যের সালতানাতগুলি কখনও ভুলিতে পারে নাই যে, মুঘল সম্রাটদের বিনিদ্র আকাঙ্ক্ষা হইল তাহাদের সমস্ত রাষ্ট্রগুলির পুরাপুরি ধ্বংস সাধন ও করায়ত্ত করা।"[৬] তিনি আরও মন্তব্য করেন, মারাঠাদের উত্থান রোধ করা ঐসব পতনশীল সুলতানদের পক্ষে ছিল অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, তাহারা (মারাঠা) ইতোমধ্যে একটি প্রগতিশীল জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করিয়া ফেলিয়াছে।

সুতরাং মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য আওরঙ্গজেবকে দায়ী করা অযৌক্তিক ও অন্যায়। সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ নিহিত বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কার্যাবলির মধ্যে, যেগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে সংক্ষেপে বলা যায়—

১। আওরঙ্গজেবের দুর্বল উত্তরাধিকারিগণ ঃ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হইল পরবর্তী মুঘলদের অধঃপতন। মুঘল সম্রাটদের যোগ্যতা সম্রাট আওরঙ্গজেব-এ শেষ হয়। আওরঙ্গজেব হিন্দু পুনর্জাগরণের পথে বিরাট বাধা। মুঘলদের শত্রুবাহিনীকে তিনি পরাজিত করেন, কিন্তু তাহাদের শক্তি চিরতরে ধ্বংস করিবার সময় তিনি পান নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারীদের একটি সুযোগ ছিল ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতার ভিত মজবুত করা। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারীরা ছিলেন কেউ কেউ হৃতবল, আর কেউ কেউ অকর্মণ্য ও অযোগ্য। ইহারা অধিকাংশ সময় ও উদ্যোগ ব্যয় করেন উত্তরাধিকারের যুদ্ধে। ইহাদের মধ্যে যদি দ্বিতীয় কোন আরওঙ্গজেবের উদয় হইত, তবে মুঘল ইতিহাস হয়ত ভিন্নভাবে লেখা হইত। মুঘল সরকার কেন্দ্রমুখী একটি স্বেচ্ছাচারী সরকার, যেখানে রাষ্ট্রের উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে সম্রাটের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর। কথিত আছে, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বাবর ভারত আক্রমণ করিতে আসিবার সময় পথিমধ্যে সমস্ত নদী তিনি সাঁতরাইয়া পার হন। তিনি এত শক্তিশালী ছিলেন যে, দুই বাহুতে দুইজন লোক লইয়া তিনি দুর্গের দেওয়ালের উপর দিয়া অনায়াসে দৌড়াইতে পারিতেন। হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব সবাই শক্তিশালী চরিত্রের অধিকারী। কিন্তু আওরঙ্গজেব-এর পরবর্তী সম্রাটগণ হন আরামপ্রিয় ও ভীতু স্বভাবের। তাঁহারা যাতায়াত করেন পাল্কিতে চড়িয়া, এবং তরবারির জোরে যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভরশীল, সেই ধরনের একটি রাষ্ট্রের পক্ষে তাঁহারা ছিলেন সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

২। অভিজাত শ্রেণীর অধঃপতন ঃ মুঘল অভিজাত শ্রেণীর চরিত্রে অবনতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের আরেকটি প্রধান কারণ। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে আগত

অভিজাতবর্গ ছিলেন কতকগুলি শক্তিশালী ব্যক্তির সমষ্টি। কিন্তু সীমাহীন সম্পদ, ভোগ-বিলাস ও আরামপ্রিয়তা তাঁহাদের চরিত্র নরম করিয়া তোলে। তাঁহারা হাতের কাছে পান যথেষ্ট পরিমাণ মাদকদ্রব্য, ঘরভর্তি উপপত্নী যাহা শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের কঠোর চরিত্রকে এমন কোমল করিয়া দেয় যে, পরবর্তীকালে তাঁহারা পাল্কিতে চড়িয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করেন। মুঘল অভিজাত শ্রেণী খুব দ্রুত অবনতি লাভ করে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ, শক্তি ও একত্রীভূত করিবার ক্ষমতা হ্রাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজদরবারের ভিতরেই কোন্দল আরম্ভ হয়। স্ব-স্ব স্বার্থ রক্ষার অনুভূতি তাঁহাদের মধ্যে জাগিয়া উঠে, এবং তাই নিজেদের বংশানুসারে দল গঠন করিয়া শাসনকার্যকে নিজেদের মধ্যে বিভক্ত করিয়া নেন এবং কিছু ব্যক্তিত্বহীন যুবরাজ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তার সহায়তায় স্ব-স্ব ক্ষমতা শক্তিশালী করেন। যদুনাথ সরকারের মতানুসারে—"কোন মুঘল অভিজাত স্বীয় গুরুত্ব দুই-এক পুরুষের অধিক রক্ষা করিতে পারেন নাই। কোন অভিজাত ব্যক্তির কৃতিত্ব বর্ণনা করিতে যদি তিন পৃষ্ঠা লাগে তবে তাঁহার পুত্রের কৃতিত্ব অধিকার করে মাত্র এক পৃষ্ঠা এবং তাঁহার দৌহিত্রের কৃতিত্ব কয়েক লাইনে এই বলিয়া শেষ হয় যে, এইখানে উল্লেখ করিবার মত কোন কাজই তিনি করেন নাই।" অন্যত্র স্যার সরকার মন্তব্য করেনঃ "আবদুর রহিম ও মহব্বত, সাদুল্লাহ এবং মীরজুমলা, ইব্রাহিম ও ইসলাম খান রুমী, যাঁহারা সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের অর্ধেক গুণসম্পন্ন কোন পুত্র বা কোন দৌহিত্র রাখিয়া যান নাই।"[৭] অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ লওয়া হয় তুর্কি, আফগান ও পারস্যবাসীদের মধ্য হইতে এবং ভারতের আবহাওয়া ইহাদের উৎকর্ষ সাধনের পক্ষে মোটেই উপযোগী ছিল না। এই উপমহাদেশে থাকিতে থাকিতে তাঁহারা অধঃপতনে নিমজ্জিত হন।

৩। **মুঘল সশস্ত্র বাহিনীর নীতিভ্রষ্টতাঃ** ভারতবর্ষের প্রাচুর্য, মাদকদ্রব্যের অজস্র ব্যবহার এবং আরাম-আয়েস মুঘল সশস্ত্র বাহিনীর উপর অত্যন্ত দূষিত প্রভাব বিস্তার করে। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সামরিক অভিজাতদের দলে দলে অন্তর্ধান গৃহযুদ্ধসমূহ দ্বারা বর্ধিত ও নিশ্চিত হয়, যাহা নাদির শাহের আক্রমণের পূর্ববর্তী ত্রিশ বৎসরের ইতিহাসকে কলংকিত করিয়াছে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর এক যুগের কিছু অধিক সময়ের মধ্যে রাজকীয় উত্তরাধিকারের জন্য সাতটি ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাহাতে বহু সংখ্যক যুবরাজ, অভিজাত ও সুশিক্ষিত সৈন্যদল নিহত হয়। অপরদিকে নেতৃস্থানীয় অভিজাতদের সশস্ত্র সংঘর্ষের ফলে আরও অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লোকক্ষয় হয়। "সামরিক অভিজাত শ্রেণীর পতনই হইল মোটামুটিভাবে মুঘল সেনাবাহিনীর অধঃপতনের স্বাভাবিক পরিণতি, বা যেভাবেই হউক এই অধঃপতন হয় উত্তম শ্রেণীর মুঘল অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ধানের ফলে।"[৮]

যে সেনাবাহিনী বাবর ও বৈরাম খানের নেতৃত্বে প্রথম ও দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, তাহারা তাহাদের সেনাপতিদের মৃত্যুর পরও স্বস্ব লাইন ভঙ্গ করে নাই বা পলায়ন করে নাই। কিন্তু একমাত্র রাজপুতগণ ব্যতীত দারা শিকোহ্‌র নেতৃত্বে বিশাল রাজকীয় বাহিনী একটি বিশৃঙ্খল জনতার চাইতে কিছু ভাল বলিয়া প্রমাণ করে। তাহা সত্ত্বেও, কর্মক্ষমতা অনেক পরিমাণ হ্রাস হইবার পরও আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুঘল বাহিনী ভারতের অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার কাজে যথেষ্ট শক্তিশালী বলিয়া নিজেদের প্রমাণ

করে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ইহার অধঃপতন হয় অতি দ্রুত ও চূড়ান্তভাবে। স্যার ডব্লিউ হেগের মতানুসারে—"সাম্রাজ্যের পতনের জন্য সেনাবাহিনীর নীতিভ্রষ্টতাই একটি প্রধান কারণ। বাবর ও আকবরের সিংহাসনকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যাহারা অপমানিত করে, ঐসব ক্রীড়নকদের উপর বা আওরঙ্গজেবের উপর এই পতনের দোষ চাপানো যায় না। দুর্বলতার মূল কারণ সেনাবাহিনী, যাহা প্রধানত গঠিত হয় এই উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত ভূমি রাজস্বের মালিক ও বড় বড় অভিজাতশ্রেণী কর্তৃক পোষ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনা দল দ্বারা।"[৯]

৪। নৌশক্তির প্রতি উপেক্ষা ঃ একটি সুদক্ষ নৌবাহিনীর গুরুত্ব মুঘল সরকার কখনও উপলব্ধি করে নাই। এই শক্তি হয়ত ভারতে ইউরোপীয়দের শক্তি বিস্তারের পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করিতে পারিত। ১৭৮৬ সালের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমর নীতির ফলে বাংলাদেশ হইতে ইংরেজদের জোরপূর্বক স্থান ত্যাগের দ্বারা যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহা মোটেই ঈর্ষা উদ্দীপক নহে। কিন্তু সেই অবস্থা হইতে তাহারা পরিত্রাণ লাভ করে একমাত্র নৌশক্তির দ্বারা। এই নৌশক্তির দুর্বলতার জন্যই ১৬৯০ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেব ইংরেজদের ক্ষমা করিতে ও ব্যবসার নূতন ফরমান দিতে বাধ্য হন। মুঘল সাম্রাজ্য যদি সমুদ্রে শক্তিশালী হইত, তবে ইহা হয়ত ইউরোপীয়দের অগ্রগতি বন্ধ করিতে পারিত, মারাঠাদের বিরুদ্ধে হয়ত আরও সাফল্য অর্জন করিতে পারিত এবং স্বীয় ধ্বংস সৃষ্টিকারী ক্ষমতাগুলিকে বানচাল ও কোণঠাসা করিতে পারিত।"[১]

৫। অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঃ মুঘল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয় অপূরণীয়ভাবে। প্রজাদের উপর সরকারি দাবি-দাওয়া এত বেশি যে সাধারণ উৎপাদনকারীদের পক্ষে ইহা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহার ফলে তাহাদের জীবন ধারণ করাটাই হইয়া পড়িয়াছিল প্রায় অসহনীয়। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল ঐশ্বর্যশালী ইমারতের জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু এরূপ মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় দেশের সম্পদরাজির উপর ছিল একটি বিরাট বোঝা। অপরদিকে অভিজাত শ্রেণী ও স্থানীয় শাসনকর্তাদের অপরিমিত ব্যয় বিলাসের খরচপত্র সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি করে। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে কর নিরূপণ করা হয় অর্ধেক ভাগ এবং রাজস্ব নির্ধারণ করা হয় প্রায় অনুরূপ। সংক্ষেপে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের শেষে অর্থনৈতিক অবস্থা চরম পর্যায়ে উপনীত হয় এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর জাতীয় অর্থনৈতিক বিপর্যস্ততা পুরাপুরিভাবে অনুভূত হয়।

৬। স্থায়ী উত্তরাধিকারের আইনের অভাব ঃ শান্তিপূর্ণভাবে উত্তরাধিকার দিবার মত কোন আইন মুঘল সাম্রাজ্যে ছিল না। প্রত্যেকটি সম্রাটের মৃত্যুর পর একেকটি বিরাট ও ভয়াবহ ভ্রাতৃযুদ্ধের সৃষ্টি হয়। রাজত্বের যুবরাজগণ উত্তরাধিকারের সংগ্রামে সমর্থন আদায়ের জন্য যে কোন পরিমাণের অর্থ ব্যয় করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। ফলে একদিকে অযথা অর্থের অপব্যয় হয়, অপরদিকে ঘন ঘন যুদ্ধে রাজ্যের ফসলাদিরও ক্ষতি সাধিত হয়।

৭। সাম্রাজ্যের বিশালতা ঃ সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানা এত ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, মাত্র একটি কেন্দ্র হইতে সমস্ত প্রশাসন পরিচালনা করা একজন সম্রাটের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। তখনকার দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থা পরবর্তীকালের বৃটিশদের ন্যায় অত উন্নত ছিল না। সাম্রাজ্যের পরিধি ছিল

আফগানিস্তান হইতে আসাম এবং কাশ্মীর হইতে মহীশূর পর্যন্ত। সুতরাং বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে একই সময়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ও দাক্ষিণাত্যে সৈন্য পাঠানো সম্রাটের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। ফলে পরবর্তী মুঘলদের সময় প্রাদেশিক শাসনকর্তারাও স্বাধীন সরকার গঠন করিয়া ফেলেন।

৮। **বৈদেশিক আক্রমণ ঃ** পারস্যের নাদির শাহ্ ও আফগানিস্তানের আহমদ শাহ্ আবদালীর বৈদেশিক আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেয়। "নাদির শাহের ভারত ত্যাগের পর বৈদেশিক আক্রমণের আঘাতে মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা রহিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।"[১১] যেসব প্রদেশে শক্তিশালী শাসনকর্তা ছিল না, সেখানকার শান্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়, কারণ ভয় করিবার মত শাসনব্যবস্থা বৈদেশিক অভিযাত্রীরা সম্পূর্ণভাবে নাজেহাল করিয়া দেয়। যে সমস্ত বন্য স্বভাবকে মুঘল শাসন ব্যবস্থা বা রাজকীয় মান-সম্ভ্রম এতদিন দমন করিয়া রাখিয়াছিল, সেগুলি এখন সাম্রাজ্যের অন্তঃস্থলে দেখা দিতে আরম্ভ করে। এইভাবে চাহার গুলজারের বর্ণনানুসারে, নাদিরের আক্রমণের পরের বৎসর এক বিরাট সংখ্যক জাঠ ও শিখ একত্রিত হইয়া সারহিন্দের দিকে ধাবিত হয় এবং সেখানে ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করে। অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় বাংলায়, বিহারে, অযোধ্যায় এবং গঙ্গা-যমুনা দোয়াবে। শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয়গণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং একজন ভারতীয়কে অপরজনের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়া তাহারা এই উপমহাদেশের ক্ষমতা গ্রাস করে।

পাদটীকা

১। .... man of mild and equitable temper, learned, dignified and generous to a fault. —Irvine: *The Later Mughals.*

২। Nadir Shah was no mere soldier, no savage leader of a savage horde, but a master of diplomacy and statecraft as well as of the sword. The profoundness of his diplomacy was no less remarkable than the greatness of his generalship in war, and the wisdom of his policy to the vanquished after his victories in the field. —Irvine : *The Later Mughals.*

৩। All the regal jewels and property and the contents of the treasury, were seized by the Persian conquerer in the citadel. —Irvine.

৪। .. had Dara Shikoh come out successful in the contest for the throne, it would be a Rajput victory and not Mughal. —Lane Poole. *Aurangzib.*

৫। ..... freed the Maratha Chief from any fear of local rivalry.

৬। Since Akbar had crossed the Vindhyas, the Deccan Sultans could never forget that the sleepless aim of the Mughal Emperors was the final extinction and annexation of all their territories.— J. N. Sarker.

Historry of Auangzib.

৭। Abdur Rahim and Mahabat, Saadullah and Mir Jumla, Ibrahim and Islam Khan Rumi, who had made the history of India in the seventeenth century were succeeded by no son, certainly by no grandson, even half as capable as themselves. — J. N. Sarker.

৮। The deterioration of the Mughal army was to some extent the natural corollary of the decline of the military nobility, or at any rate was accelerated by the disappearance of the better type of Mughal nobles.—Edwardes and Garrett: *Mughal Rule in India.*

৯। The demoralization of the army was one of principal factors in the disintegration of the empire. It cannot be attributed to the puppets who during the first half of the eighteenth century disgraced the throne of Babur and of Akbar, or even to Aurangzib. The source of the weakness was the composition of the army which consisted chiefly of contingents maintained by the great nobles from the revenues of assignments held by them for the purpose. —Sir W. Haig: *Cambridge History of India:* Vol IV P. 374

১০। Had the Mughal Empire been powerful at sea, it probably could have checked the advance of the Europeans, might have made greater headway against the Maratha power, and have retarded and circumscribe the influence directed towards its own ruin. —Edwardes and Garrett. —*Mughal Rule in India.*

১১। When Nadir Shah left India the administration of the Mughal Empire seemed to have been dissolved by the shook of the foreign invasion. — J. N. Sarker: *Fall of the Mughal Empire.*

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

Danishmand Khan : *Bahadur Shahnama*

J. N. Sarker : *Fall of the Mughal Empire,* 4 vols

Irvine : *The Later Mughals* 2 vols.

Edwardes and Garrett : *Mughal Rule in India.*

H. G. Keene : *The Fall of the Mughal Empire.*

Tripathi : *Rise and Fall of the Mughal Empire.*

নবম অধ্যায়
মুঘল শাসনের সাধারণ আলোচনা

ভূমিকা ঃ পুরাতনই নূতনের ভিত্তি। আমাদের অতীতের মধ্যে রহিয়াছে বর্তমানের মূল। তাই মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার বিবরণ একটি নিছক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের চাইতেও অধিক প্রয়োজনীয়। এই ধরনের শাসনব্যবস্থা, ইহার শ্রেণীবিন্যাস, কার্যপ্রণালী, কাঠামো এবং এমনকি উপাধিসমূহ পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতি অনুগত হিন্দু শাসিত রাষ্ট্রগুলিতে চালু করা হয়। বৈরিতা সত্ত্বেও সমসাময়িক কতকগুলি স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্রের জন্যও মুঘল শাসন ছিল একটি আদর্শ ব্যবস্থা। মারাঠারা মুঘল শাসনব্যবস্থা এমন আমূলভাবে গ্রহণ করে যে, তাহারা উপাধি ও পদগুলিতেও ফার্সি শব্দ ব্যবহার করে। "এইভাবে এক সময় মুঘল ব্যবস্থা বস্তুত ভারতবর্ষের সমগ্র সভ্য ও সুগঠিত অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল।"[১] বৃটিশ শাসকরাও মুঘল শাসনব্যবস্থার অনুকরণ করে। আধুনিক বৃটিশ ভারতের প্রশাসনিক ইমারতে মুঘল মূল কাঠামো অতি সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে একটি ইংরেজ বণিক ও কেরানি সংঘের হাতে আশাতীতভাবে একটি অপরিচিত দেশ ও জাতির শাসনব্যবস্থা ন্যস্ত হইলে তাহারা অতি স্বাভাবিকভাবেই এদেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত মুঘল শাসন ব্যবস্থাই গ্রহণ করে। ইহার মধ্যে শুধু অতি প্রয়োজনীয় রদবদল করে এবং ইহার পুরাতন কাঠামো ঠিক রাখিয়া তাহারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং আরও ধীরে ধীরে এমন সব নূতন ব্যবস্থা চালু করে, যাহা সময়োপযোগী এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও উন্নতির জন্য ছিল অতি প্রয়োজনীয়। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময় বাংলা ও বিহারের ইঙ্গ-ভারতীয় শাসনব্যবস্থার ইহাই ছিল প্রকৃত রূপ।

সরকারের স্বরূপ ঃ মুঘল শাসন প্রধানত সামরিক শাসন। অতএব, স্বভাবতই ইহা কেন্দ্রীভূত স্বেচ্ছাতন্ত্র। কিন্তু স্বেচ্ছাতান্ত্রিক হইলেও ইহা একটি জনহিতৈষী সরকার। যেমন, সম্রাট আওরঙ্গজেবের একটি বক্তৃতা হইতে দেখান যায়—"আপনারা জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে নিশ্চয়ই মাত্র একটি মতই হইতে পারে যে, একজন নৃপতির কর্তব্য হইল দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের সময় তাঁহার জীবনের ঝুকি লওয়া এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহার হেফাজতে ন্যস্ত জনসাধারণের রক্ষাকল্পে তরবারি হাতে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া।"[২]

মুসলিম জনগণের জন্য সম্রাট পার্থিব ও অপার্থিব নেতা। কিন্তু অমুসলিম প্রজাদের ব্যাপারে সরকারের নীতি হইল ব্যক্তিগত ধর্মীয় কার্যাবলির উপর ন্যূনতম হস্তক্ষেপ। জনসাধারণের শিক্ষার ব্যয় বহন করা রাষ্ট্রের কর্তব্য নহে। বস্তুত এমনকি ইংল্যান্ডেও ইহাকে একটি জাতীয় কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করা হয় মাত্র ১৮৭০ সালে। হিন্দু ও মোহাম্মদীয় উভয় রাজনৈতিক মতানুসারে, শিক্ষা হইল ধর্মের অধীন।[৩] অনুরূপভাবে শিল্প ও সাহিত্যে উৎসাহ

প্রদান করাটা সম্পূর্ণভাবে রাজার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ভারতবর্ষের বাহির হইতে আগত মুঘলগণ যে শাসনব্যবস্থা আনয়ন করেন, তাহা ভারতের বাহিরে মুসলিম দেশসমূহে দীর্ঘদিন হইতে বেশ কার্যকর ব্যবস্থা বলিয়া প্রমাণিত; যথাঃ বাগদাদে আব্বাসীয় খেলাফতের শাসনব্যবস্থা। "মুঘল শাসন উপস্থাপন করে একটি ভারতীয় ও অভারতীয় ব্যবস্থাবলির সংমিশ্রণ অথবা আরও ভালভাবে বলিতে গেলে ইহা ভারতীয় কাঠামোর উপর একটি পারস্য-আরবি ব্যবস্থা।"[৪] মুঘল শাসনের তিনটি বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিতভাবে সংক্ষেপে বলা যায়।

প্রথমত, তাহাদের সরকারের আদর্শ, তাহাদের ধর্ম, রাজস্ব আদায়ের আইন-কানুন বিভাগীয় ধারা-পদ্ধতি এবং তাহাদের রাজকর্মচারীদের উপাধিসমূহ অভারতীয়, কিন্তু আমদানিকৃত ও দেশীয়গুলির মধ্যে একটি সমঝোতা সৃষ্টি করা হয়। দেশীয় আইনের মধ্যে যেগুলি সমস্ত মুসলিম দেশসমূহের মৌলিক আদর্শের পরিপন্থী নহে, তাহা বলবৎ রাখা হয়। শাসনব্যবস্থাকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করিবার ব্যাপারেও ভারতের বাহিরের মুসলিম দেশসমূহকে আদর্শ হিসাবে রাখা হয়।

দ্বিতীয়ত, সরকার মূলত সামরিক, এবং যদিও সময়মত ইহা এই দেশের মাটির মধ্যে শিকড় গাড়িয়াছে, তবুও ইহা শেষ পর্যন্তও ইহার সামরিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। মুঘল সরকারের প্রত্যেকটি রাজকর্মচারীকে সামরিক খাতায় তালিকাভুক্ত হইতে হয়। কতকগুলি অশ্বারোহীর নামেমাত্র সেনাপতি হিসাবে তাহাকে একটি 'মনসব' দেওয়া হয় যাহা তাহার বেতন ও মর্যাদার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। "বেসামরিক রাজকর্মচারী, ধর্মীয় আইনের বিচারকমণ্ডলী, ডাক, শুল্ক ও আবগারি বিভাগের কর্মকর্তাগণ এমনকি উর্ধ্বতন পদের কেরানি ও মুহরী সবাইকে মনসবদারী পদ দেওয়া হয়। অর্থাৎ, ইহারা সামরিক বিভাগের লোক।"[৫] যদুনাথ সরকার আরও উল্লেখ করেন যে, মুঘলদের সময় কোন বেসামরিক ট্রেজারী ছিল না এবং প্রকৃতপক্ষে বখ্‌সিগণ বা সামরিক বেতন প্রদানকারিগণই বেতন প্রদান করেন। কিন্তু তিনি ইহাও উল্লেখ করেন যে, একমাত্র কোন অভিযানের সময় সমরক্ষেত্রের সেনাবাহিনীকে ছাড়া, প্রকৃতপক্ষে বেতন প্রদান করেন দিওয়ান, যাহাকে একজন বেসামরিক রাজকর্মচারী হিসাবেই গণ্য করা হয়।

তৃতীয়ত, রাজস্ব ব্যবস্থার ব্যাপারে মুঘলগণ সব সময়ই ভারতের পুরাতন রীতি-ব্যবস্থা, এমনকি ঐতিহ্য পর্যন্ত অনুকরণ করেন। প্রাথমিক মুসলিম বিজয়ীগণ পুরাতন রাজস্ব ব্যবস্থা চালু রাখেন, রাজস্ব বিভাগের হিন্দু কর্মচারীদের বহাল রাখেন এবং যতদিন পর্যন্ত ভূমি রাজস্ব সঠিকভাবে আদায় হয়, ততদিন পর্যন্ত কদাচ তাহারা এই বিভাগের কার্যাবলিতে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্যান্য উৎসের ব্যাপারে ইসলামী আইন এবং ভারতের বাহিরের অন্যান্য পুরাতন রাষ্ট্রসমূহের ব্যবস্থাবলি চালু করা হয়। এইভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের সমগ্র রাজস্বব্যবস্থা দুই ধরনের চালু থাকে—পুরাতন ভারতীয় ব্যবস্থা এবং ইসলামী আইনের অনুশাসন।

কেন্দ্রীয় সরকার ঃ একজন মুঘল সম্রাট সমস্ত ক্ষমতার মূল কেন্দ্র। কোন খলিফাকে তিনি তাঁহার উপরে উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে স্বীকার করেন না। মুসলিম জনগণের নিকট তিনি সাধারণভাবে দায়ী। তাঁহার ক্ষমতার উপর কোন বিধি-নিষেধ নাই। কিন্তু কার্যত

বিদ্রোহের ভয়ে তাঁহার স্বেচ্ছাতন্ত্র কিছুটা কোমল স্বভাবের। দেশের চিরাচরিত প্রথাসমূহও তাঁহার স্বেচ্ছাতান্ত্রিক কার্যাবলিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সম্রাট ইসলামের মৌলিক বিধানের পরিপন্থী কোন কাজ করিলে আলিমগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু মুঘল সম্রাটের হাতে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী থাকিলে আলিমদের ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত একটি পত্রখণ্ড বিশেষে পরিণত হয়। শান্তিপূর্ণভাবে এক সম্রাটকে পদচ্যুত করিয়া আরেক সম্রাটকে সিংহাসনে বহাল করিবার মত কোন সাংবিধানিক পরিষদ ছিল না। সম্রাট বিভিন্ন ব্যাপারে পারিষদবর্গের সহিত আলোচনা করেন এবং কার্যতঃ সম্রাট যখন গোপনীয় আলাপ-আলোচনা করেন, তখন সাধারণত অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণও উজির সমভিব্যাহারে সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের মতামতকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলির ব্যাপারে অন্যান্য মন্ত্রিবর্গের অগোচরে প্রধানমন্ত্রী বা উজিরকে লইয়া সম্রাট স্বয়ং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আধুনিক শব্দে কেবিনেট বা মন্ত্রিপরিষদ বলিতে যাহা বুঝায়, অনুরূপ কোন পরিষদ মুঘল সাম্রাজ্যে ছিল না। সম্রাটের মন্ত্রিবর্গ অনেকটা আধুনিক সচিবের ন্যায়, যাহারা সম্রাটের আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্যকর করেন। কিন্তু মৃদু প্ররোচনা বা পর্দার আড়াল হইতে সাবধান বাণীর মাধ্যমে ছাড়া তাঁহারা কখনও তাঁহার নীতির পরিবর্তন করিতে পারেন না। সাধারণত সম্রাটকে দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। যথা— প্রথমত, সম্রাট হিসাবে সাম্রাজ্যের সমস্ত নাগরিকের শাসন পরিচালনা করা এবং দ্বিতীয়ত, তাঁহার প্রজাদের এক অংশের ধর্মের প্রচারক, প্রতিরক্ষক ও প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা। কিন্তু কার্যত ধর্ম বা ধর্ম রক্ষা করিবার ব্যাপারকে তিনি মোটেই গ্রাহ্য করেন না। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাহাদের মধ্যে ব্যতিক্রম। তিনি তাঁহার ধর্মের রক্ষাকর্তা হিসাবেও কাজ করেন। তাঁহার পিতা সম্রাট শাহজাহানের নিকট লিখিত আওরঙ্গজেবের একটি উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য—"তিনিই সত্যিকারের মহান নৃপতি, যিনি তাঁহার প্রজাদিগকে ন্যায়ভাবে শাসন করাটাকে স্বীয় জীবনের প্রধান কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেন।"[৬] সম্রাট আকবর একদা মন্তব্য করেন, কোন নৃপতি "এই উচ্চ পদের উপযুক্ত হইতে পারেন না, যদি না তিনি সার্বজনীন শান্তির দ্বার উন্মুক্ত করেন এবং সর্বশ্রেণীর মানুষকে ও সর্ব প্রকারের ধর্মকে সুবিধাদির ব্যাপারে এক দৃষ্টিতে দেখেন।"[৭]

সম্রাট

প্রধান প্রধান বিভাগ ও উহাদের কর্মকর্তাগণ ঃ নির্বিঘ্ন শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সম্রাটের নিচে বিভিন্ন কর্মকর্তাগণের অধীনে অনেকগুলি বিভাগ থাকে। নিম্নলিখিত বিভাগসমূহ তন্মধ্যে প্রধান—

(১) প্রধান দিওয়ানের অধীনে রাজকোষাগার ও রাজস্ব বিভাগ।
(২) রাজকীয় বখসির অধীনে সামরিক বেতন ও হিসাব-নিকাশ বিভাগ।
(৩) প্রধান বিচারপতি বা কাজীর অধীনে বিচার বিভাগ।
(৪) প্রধান সদর বা সদর আস সদূর-এর অধীনে ধর্মীয় বৃত্তি (Religious endowments) ও দানপত্র বিভাগ।
(৫) মুহ্‌তাসিব বা নৈতিক চরিত্রের তত্ত্বাবধায়ক-এর অধীনে জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র বিধান বিভাগ।

(৬) খান-ই-সামান বা প্রধান তত্ত্বাবধায়কের অধীনে রাজকীয় পারিবারিক বিভাগ।

প্রধান দিওয়ান বা উজির ঃ সম্রাটের নিচের স্থান দিওয়ান বা উজিরের। তিনি প্রধান-মন্ত্রীর ন্যায় কাজ করেন। তিনি সর্বদাই রাজস্ব বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ হিসাবে থাকেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রধানমন্ত্রীর উপাধি ছিল 'উকিল' এবং অর্থমন্ত্রীর উপাধি ছিল 'উজির'। সর্বপ্রথম উজির ছিলেন অর্থমন্ত্রী এবং কালক্রমে তিনি অন্যান্য বিভাগও পরিচালনা করেন। দুর্বল সম্রাটের বেলায় উজির সামরিক বিভাগও পরিচালনা করেন এবং যদিও এই পদটি বেসামরিক, কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি সামরিক বিভাগের কাজও হাতে নেন। অনেকগুলি শিষ্টাচারী (Ceremonial occasion) অনুষ্ঠানে তিনি সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবেও কাজ করেন। টাকা-পয়সা প্রদানের সমস্ত আদেশপত্রে উজির দস্তখত করেন। রাজস্ব সংক্রান্ত সব ব্যাপারে তিনিই মীমাংসা করেন এবং শুধু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলিতে তিনি সম্রাটের পরামর্শ নেন। এই পদটি এত ক্ষমতাশালী যে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উজিরই হইয়া যান রাষ্ট্রের সত্যিকারের শাসক।

মীর বখসি বা রাজকীয় বখসি (Imperial Pay Master) ঃ আইনত সমস্ত রাজকর্মচারীদের বেতনের বিলসমূহের হিসাব-নিকাশও পাস করা হয় মীর বখসির দ্বারা। কারণ, সমস্ত সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী সামরিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত বেতন সহজে প্রদান করিবার জন্য এই ব্যবস্থা লওয়া হয়। কিন্তু কার্যত সমস্ত বেসামরিক বিলসমূহে দস্তখত করেন দিওয়ান। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এইসব বখসিদের সংখ্যাও বাড়ানো হয়। কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষের দিকে মাত্র একজন প্রধান বখসি থাকেন, যাহাকে বলা হয় 'মীর বখসি'। ইহা ছাড়া ছিলেন তিনজন সহকারী, যাহাদিগকে বলা হয় দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বখসি। বখসিদের দায়িত্ব হইল সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তি করা, সৈন্যদিগকে যুদ্ধের উপযোগী করিয়া প্রতিপালন করা, বিভিন্ন সামরিক পরীক্ষা লওয়া, অশ্বগুলির তদারক করা, একটি সময়ের ব্যবধানে তাহাদিগকে একত্রিত করা এবং বিভিন্ন অভিযানের জন্য তাহাদের রসদপত্রের ব্যবস্থা করা।

প্রধান কাজী বা বিচারপতি ঃ আইনত সম্রাট 'যুগের খলিফা' হিসাবে সর্বোচ্চ বিচারক, এবং তিনি প্রতি বুধবার বিচারের জন্য বসেন এবং বাছাই করা কিছু মামলার স্বয়ং বিচার করেন।"[৮] তবে সম্রাটের বিচারালয় আপীলের দরবার। অপরাধমূলক মামলায় কাজী

কাজীর দায়িত্ব হইলেন প্রধান বিচারপতি এবং সেইগুলি তিনি মুসলিম আইনানুসারে বিচার

মুফতীর দায়িত্ব করেন। "শুধু মুসলমানদের সমস্ত মামলায় নহে, সমস্ত অপরাধমূলক মামলায়, যেখানে দুই পক্ষের একপক্ষ মুসলিম, সেগুলিও কাজীর বিচারালয়ে বিচার করিতে হয়।"[৯] মুফতী আরবি আইন শাস্ত্র পর্যালোচনা করিয়া নির্দিষ্ট মামলার রায় বলিয়া দেন এবং ঐগুলির উপর ভিত্তি করিয়া কাজী মামলার রায় ঘোষণা করেন। সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ কাজীকে বলা হয় 'কাজীউল কোজাত' বা প্রধান কাজী। "প্রত্যেক নগরের এমনকি বড় বড় গ্রামগুলিতেও স্থানীয় কাজী থাকেন, যিনি প্রধান কাজী কর্তৃক নিযুক্ত হন।" স্যার যদুনাথ সরকার নবনিযুক্ত কাজীর দায়িত্ব সম্পর্কে দিওয়ানের পরামর্শ উদ্ধৃত করেন—"আপনি ন্যায়পরায়ণ হইবেন, সত্যপ্রিয় হইবেন, পক্ষপাতহীন হইবেন। উভয়পক্ষের সামনে এবং দরবার কক্ষে ও রাজধানীতে (মহকুমা) বিচার করিবেন। আপনি যেখানে নিযুক্ত আছেন,

সেইখানকার জনসাধারণের নিকট হইতে কোন উপহার গ্রহণ করিবেন না, কিংবা যে কোন লোক বা প্রত্যেক ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ভোজে অংশগ্রহণ করিবেন না। আপনার রায়সমূহ, বিক্রয়ের কবলাপত্র, বন্ধকের খত এবং অন্যান্য মামলা সম্পর্কিত দলিলপত্র সাবধানে লিখিবেন, যাহাতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ঐগুলির মধ্যে কোন ছুতা বাহির করিয়া আপনাকে লজ্জায় ফেলিতে না পারে। দারিদ্র্যতাকে আপনার সম্মান বলিয়া জানিবেন।"[১০] মুফতীর দায়িত্ব রাত-দিন আইন সম্পর্কীয় গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করা এবং উদাহরণ শিক্ষা করিবার জন্য পূর্ববর্তী মামলার রায়সমূহ পর্যালোচনা করা। যদি কোন কাজী পূর্ববর্তী কোন রায়ের বিরুদ্ধে একটি রায় প্রদান করেন, তবে মুফতীর দায়িত্ব হইল কোমলভাবে তাঁহাকে তাহা অবহিত করা।

সদর আস সদূর ঃ সদর একজন বিচারক, যাঁহার কর্তব্য হইল সম্রাট বা শাহজাদাগণ কর্তৃক ধার্মিক লোক, বিদ্বান এবং সাধু-দরবেশদের প্রদত্ত ভূমি বৃত্তির তদারক করা। তাঁহার দায়িত্ব হইল বৃত্তিসমূহ সার্বিকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে কিনা, তাহা দেখাশুনা করা। বৃত্তির জন্য নূতন দরখাস্তসমূহের সত্যতা যাচাই করাও তাঁহার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। 'লাখেরাজ' বা নিষ্কর ভূমিসমূহকে তুর্কি ভাষায় বলা হয় 'সয়ূরগাল', আরবিতে বলা হয় 'মদদ-ই-মাস' এবং 'আইমা' ইত্যাদি। রমজান মাসে বা অন্যান্য পবিত্র উৎসব উপলক্ষে সম্রাট কর্তৃক দানপত্র হিসাবে প্রদত্ত টাকা-পয়সাও সদর বণ্টন করেন। প্রধান সদরকে বলা হয় 'সদর আস সদূর' বা সদর-ই-কুল। প্রত্যেক প্রদেশে স্থানীয় সদর থাকেন। বস্তুত সদর সম্পূর্ণভাবে একজন বেসামরিক বিচারক, কিন্তু সমস্ত মামলার জন্য নহে। কাজী ও সদরের পদের জন্য আরবিতে উচ্চ শিক্ষিত এবং নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী যেখানেই পাওয়া যায়, তাঁহাদিগকে নিয়োগ করা হয়।

মুহ্তাসিব ঃ মুসলিম আইন অনুসারে জনসাধারণের জীবন পুরাপুরি ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালনার জন্য একজন পরিদর্শক বা সাধারণ মানুষের নৈতিক চরিত্র তত্ত্বাবধায়ক (মুহ্তাসিব) নিযুক্ত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। সুতরাং মুঘলদের রাজত্বের সময় মুহতাসিব-এর কর্তব্য হইল মুসলমানদের উপর ধর্মীয় বিধি-নিষেধ পুরাপুরি কার্যকর করা— জনসাধারণকে মদ্যপান, জুয়াখেলা এবং যৌন-নীতিভ্রষ্টতা হইতে বিরত রাখা। বেদাত বা নিত্য-নূতন ধর্মীয় আবিষ্কার, মহানবীর (সাঃ) বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও রমজানের রোজার ব্যাপারে অলসতা দেখানোর জন্য শাস্তি প্রদান করাও মুহতাসিব-এর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। মুহতাসিবগণ জিনিসপত্রের মূল্যও নির্ধারণ করেন এবং ওজন ও মাপের ব্যাপারে সততা রক্ষা করিবার জন্য কড়া নজর দেন।

মুহতাসিব এর কর্তব্য

খান-ই-সামান ঃ মুঘল আমলে 'খান-ই-সামান' একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ। কারণ 'খান-ই-সামান' সম্রাটের পারিবারিক সাজ-সরঞ্জামের সর্বোচ্চ কর্তা এবং বিভিন্ন ভ্রমণ ও অভিযানের সময় তিনি সম্রাটের সঙ্গে থাকেন। সম্রাটের সমস্ত নিজ চাকর-বাকর এই রাজকর্মচারীর অধীন এবং তিনি সম্রাটের যাবতীয় দৈনিক খরচপত্র-পানাহার, তাঁবু, সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি দেখাশোনা করেন। স্বভাবতই খান-ই-সামান যথেষ্ট বিশ্বাস ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী। অনেক উজিরকে খান-ই-সামান পদ হইতে উন্নীত করা হইয়াছে এইরূপ উদাহরণ যথেষ্ট রহিয়াছে।

খান-ই-সামানের গুরুত্ব

পূর্বোল্লিখিত রাজকর্মচারীদের চাইতে সম্মানের দিক হইতে কিছুটা নিচু স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে রহিয়াছে 'মীর আতিশ' বা 'দারোগা-ই-তোপখানা' (গোলন্দাজ বাহিনীর অধিকর্তা); ডাক চৌকির দারোগা বা গুপ্তচর ও ডাক বিভাগের অধ্যক্ষ, টাঁকশালের দারোগা, মীর-ই-মাল বা রাজমুদ্রার অধ্যক্ষ, মুসতাউফি বা প্রধান হিসাব পরীক্ষক, নাজির-ই-বয়ূতাত বা রাজকীয় কারখানার তত্ত্বাবধায়ক; মুশরিফ বা রাজস্ব বিভাগের কোষাধ্যক্ষ; মীর বাহরী বা নৌবিভাগের অধ্যক্ষ; মীর-ই-বার বা বনবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক; ওয়াকা-ই-নাভিস বা সংবাদদাতা; মীর আরজ বা সম্রাটের নিকট প্রেরিত দরখাস্তসমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী; মীর মনযিল বা সৈন্যবাহিনীর রসদপত্র বন্দোবস্তকারী প্রধান কর্মচারী এবং মীর তোজাক বা উৎসবাদির অধ্যক্ষ।

বিভিন্ন নিচুস্তরের বিভাগ ও উহাদের তত্ত্বাবধায়ক

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা : মুঘল সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। প্রদেশের উচ্চ রাজকর্মচারীদের মধ্যে রহিয়াছেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা, যাহার সরকারি উপাধি হইল 'নাজিম' এবং যিনি 'সুবাদার' নামেই পরিচিত। আরও আছেন দিওয়ান, বখসি, কাজী, সদর এবং মুহতাসিব। প্রাদেশিক বখসিগণ ভৌগোলিক সীমা অনুযায়ী কোন সুবাহ বা প্রদেশের পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে যুক্ত থাকেন না বরং বিভিন্ন সুবাদারদের সঙ্গে মোতায়েন সেনাবাহিনীর সঙ্গে থাকেন। ১৫৭৯-১৫৮০ সালে সম্রাট আকবর তাঁহার সাম্রাজ্যকে বারোটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে তাহা পনেরটি প্রদেশে দাঁড়ায়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে প্রদেশের সংখ্যা দাঁড়ায় সতেরটিতে এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে প্রদেশের সংখ্যা একুশে বৃদ্ধি পায়।

প্রাদেশিক উচ্চ রাজকর্মকর্তা প্রদেশের সংখ্যা

শাসনব্যবস্থা প্রাদেশিক রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত থাকে। প্রাদেশিক সরকার গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে নিম্নলিখিত উপায়ে—

গ্রামাঞ্চলের খবর সংগ্রহের উৎস

(১) মহকুমায় নিযুক্ত ফৌজদারদের মাধ্যমে,

(২) রাজস্ব বিভাগের নিম্নস্তরের কর্মচারীদের মাধ্যমে। এইসব কর্মচারিগণ চাষীদের নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে রাজস্ব আদায় করেন,

(৩) সুবাদারের দরবারে জমিদারদের আগমনের মাধ্যমে এবং

(৪) সুবাদারের গ্রামাঞ্চল পরিদর্শনের মাধ্যমে।

প্রত্যেক প্রদেশ অনেকগুলি সরকার ও জিলায় বিভক্ত থাকে। ফৌজদার হইলেন সরকারের প্রধান কর্মকর্তা। প্রত্যেক সরকার অনেকগুলি পরগনা বা মহলে বিভক্ত থাকে। শিকদার হইলেন পরগনার শাসনকর্তা। পরগনার শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা তাঁহার কর্তব্য।

রাজস্ব শাসনব্যবস্থা : মুঘল সাম্রাজ্য ইহার রাজস্ব আদায় করে দুইটি খাতে—কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক। কেন্দ্রীয় রাজস্বের প্রধান উৎসসমূহ হইল ভূমি রাজস্ব, শুল্ক, টাঁকশাল, উত্তরাধিকার, যুদ্ধে শত্রু পরিত্যক্ত দ্রব্য এবং জিজিয়া। সম্রাট আকবর তাঁহার ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যের অর্থনীতি পুনর্গঠনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া নূতন অর্থ-কমিশন নিয়োগ করেন। ১৫৭০-৭১ সালে রাজা টোডরমলের সহায়তায় মুজাফফর খান তুরবাতি ভূমি রাজস্বের একটি নূতন খসড়া প্রণয়ন করেন। ১৫৮২ সালে রাজা টোডরমলকে দিওয়ানে

ভূমির শ্রেণী বিন্যাস

আশরফ পদে নিযুক্তির পর গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব সংস্কার সাধিত হয়। তিনি রাজস্ব আদায়ের একটি আধুনিক পদ্ধতি চালু করেন, যাহার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল— (১) ভূমি জরিপ ও পরিমাণ নির্ধারণ; (২) ভূমির শ্রেণী বিভক্তি; (৩) খাজনার হার নির্ধারণ।

চাষের উপযুক্ততা অনুসারে ভূমিকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা হয়—(ক) পোলাজ বা যে জমি বাৎসরিক চাষের উপযুক্ত; (খ) পারাওটি বা যে জমি উহার উর্বরাশক্তির জন্য কিছুদিন অনাবাদি রাখা হয়; (গ) চাষার বা যে জমি তিন-চারি বৎসর অনাবাদি পড়িয়া থাকে এবং (ঘ) বানজার বা যে জমি পাঁচ বৎসরেরও অধিককাল অনাবাদি থাকে। শুধুমাত্র চাষ করা ভূমির জরিপ করা হয়। রাষ্ট্রের দাবি বা খাজনা নির্ধারিত হয় উৎপন্ন দ্রব্যের এক-তৃতীয়াংশ, যাহা নগদ টাকা বা উৎপন্ন দ্রব্য দিয়া আদায় করা হয়।

আমাল গুজার বা একটি জিলার রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিম্নপদস্থ অনেক কর্মচারীর সহায়তা পান। গ্রামের মোকদ্দম এবং পাটওয়ারী ছাড়াও এই ব্যবস্থায় রহিয়াছে ভূমি জরিপকারী ও কারকুন, যাঁহারা মৌসুমের শস্যের আয়-ব্যয় সম্বন্ধীয় তথ্যাবলি প্রস্তুত করেন। কানুনগো, যিনি গ্রাম কর্তৃক দেয় রাজস্বের তালিকা রাখেন। বিতিক্‌ছি বা হিসাব-নিকাশ রক্ষক এবং পোদ্দার বা জিলা খাজাঞ্চি। খুব সাবধানতা ও মনোযোগ সহকারে রাজস্ব আদায়ের জন্য এইসব কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়। সম্রাট সর্বদাই রাজস্ব কর্মচারীদিগকে ন্যায়পরায়ণ হইবার জন্য এবং সমস্ত অন্যায় কর বন্ধ করিবার জন্য ও স্থানীয় দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। "শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব-এর সময় সম্রাটের নিকট জনসাধারণ কর্তৃক অভিযোগের দরুন অত্যাচারী রাজস্ব কর্মচারী এবং এমনকি প্রাদেশিক শাসনকর্তাকেও বরখাস্ত করিবার উদাহরণ রহিয়াছে।"[১১] রাজস্ব আদায়কারী পদস্থ কর্মচারী রসিক দাস ক্রোড়ির প্রতি প্রদত্ত সম্রাট আওরঙ্গজেবের ফরমান বা আদেশ এখানে প্রণিধানযোগ্য—"হিসাবী ও ইসলামের প্রতি অনুগত রসিক দাস, রাজকীয় অনুগ্রহের প্রতি আশা পোষণ কর এবং জানিয়া রাখ সম্রাটের সমস্ত ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য নিয়োজিত রহিয়াছে চাষাবাদ বৃদ্ধির প্রতি এবং চাষী ও সাধারণ মানুষের উন্নতির প্রতি। ইহারাই স্রষ্টার (তাঁহার নাম উজ্জ্বল হউক) মহান সৃষ্টি এবং দায়িত্ব............ ।"[১২]

সশস্ত্র বাহিনী ঃ মুঘল সেনাবাহিনীর ইতিহাস হইল বহুলাংশে মনসবদারী প্রথার ইতিহাস, যাহা চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। রাষ্ট্র কর্তৃক সরাসরি কোন পোষ্য সেনাবাহিনী রাখা হয় না। কিন্তু কাগজে-কলমে রাষ্ট্রের সমস্ত কর্মক্ষম ব্যক্তিই রাজকীয় বাহিনীর সৈনিকবৃন্দ। সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে রহিয়াছে— (১) অশ্বারোহী বাহিনী, (২) পদাতিক বাহিনী, (৩) গোলন্দাজ বাহিনী ও (৪) নৌবাহিনী।

এইগুলির মধ্যে অশ্বারোহী বাহিনী সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। পদাতিক বাহিনী গঠিত বিশেষত শহরের সাধারণ লোকজন ও চাষীদের দ্বারা। গোলন্দাজ বাহিনীর কামান প্রস্তুত হয় এই দেশেই এবং আওরঙ্গজেব-এর গোলন্দাজ বাহিনী তাঁহার পূর্বপুরুষ বাবর, হুমায়ুন ও আকবরের বাহিনীর চাইতে উন্নতমানের। নৌবাহিনী তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। তবে একটি নৌবিভাগ ছিল, কিন্তু ইহা যুদ্ধের উপযোগী নহে। তবে মগ ও আরাকান জলদস্যুদের হাত হইতে বাংলার উপকূল রক্ষার্থে ঢাকায় মোতায়েন ৭৬৮টি যুদ্ধ-জাহাজের বহর ইহার ব্যতিক্রম।

সাম্রাজ্যের পতনের যুগে মুঘল সেনাবাহিনীর যোগ্যতা নষ্ট হইয়া যায়। সম্রাট যদিও সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান সেনাপতি, কিন্তু তাঁহার আধিপত্য কাজ করে পরোক্ষভাবে। অপরদিকে সেনাপতিদের নিজস্ব প্রতিযোগিতার দরুন বিভিন্ন অভিযানে তাঁহাদের সফলতার সুযোগ নষ্ট করিয়া দেয়। অধিকন্তু, অভিযানের সময় মুঘল ছাউনি আকারের দিক হইতে একটি নগরীর রূপ ধারণ করে, যাহা সৈনিকদের সহজ গমনাগমন, দ্রুত আদেশ প্রদান ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধধারা কার্যে পরিণত করিবার পথে বাধা সৃষ্টি করে। এইভাবে যে মুঘল বাহিনী উপমহাদেশে প্রবেশ করে বিজয়ী বেশে, সেই বাহিনী উহার যোগ্যতা কালক্রমে হারাইয়া ফেলে। যদিও আকার ও অস্ত্রশস্ত্রের দিক হইতে ইহার ব্যাপকতা অনেক বৃদ্ধি লাভ করে।

পাদটীকা

১। Thus the Mughal system at one time spread over practically all the civilized and organized parts of India.— J. N. Sarker: *Mughal Administration.*

২। There can surely be but one opinion among you wise men as to the obligation imposed upon a sovereign in seasons of difficulty and danger to hazard his life, and, if necessary to die sword in hand in defence of the people committed to his care— Berner : *Travels.* পৃষ্ঠাঃ ১২৯-১৩০।

৩। যদুনাথ সরকারঃ Mughal Administration.

৪। The Mughal administration presented a combination of Indian and extra-Indian element; or more correctly it was the Perso- Arabic system in Indian setting.— J. N. Sarker: ঐ।

৫। যদুনাথ সরকার ঃ ঐ।

৬। He is the truly great king who makes it the chief business of his life to govern his subjects with equity. — Bernier: *Travels.* পৃঃ ১৬৭, ১৬৮।

৭। Any king cannot be fit for this lofty office if he does not inaugurate universal peace, and if he does not regard all classess of men and all sets of religions with a single eye for favours.—*Akbarnamah.*

৮। The Emperor as the 'Khalifa of the Age', was theoretically the highest judge and used to hold courts of justice and try select cases personally on Wednesday.—Sarker: *Mughal Administration.*

৯। Not only all cases between Muhammadans, but also all important criminal cases in which one of the parties was a Muhammadan, had to be instituted in the Qazi's court.—Sarker: প্রাগুক্ত।

১০। যদুনাথ সরকার : Mughal Administration.

১১। There are instances in the reigns of Shah Jahan and Aurangzib of

extortionate revenue officials and even provincial governors being dissmissed on complaints being made against them by the subjects to the Emperor কালী কিংকর দত্ত *An Advanced History of India* পৃ: ৫৬২।

১২। সরকারঃ Mughal Administration. পৃঃ ২১৩।

গ্রন্থপঞ্জি

Abul Fazl	:	*Ain-i-Akbari*
Ibn Hasan	:	*Central Structure of the Mughal Empire*
J. N. Sarker	:	*Mughal Administration*
M. L. Raychowdhury	:	*Religious Policy of the Mughals*
Abdul Aziz	:	*The Mansabdari System and the Army of the Mughals*
Irvine	:	*Army of the Indian Mughals*
Edwardes & Garrett	:	*Mughal Rule in India.*

দশম অধ্যায়
মুঘল আমলে গণজীবন

সামাজিক জীবন ঃ মুঘল আমলে সমাজের কাঠামো ছিল সামন্ত প্রতিষ্ঠানের ন্যায়, যাহার সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী সম্রাট। মুঘল সম্রাটগণ এই দেশেরই রাজা। তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহা এই দেশ ও এই দেশের জনসাধারণের জন্যই করিয়াছেন। তবুও একদিক হইতে মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসকে লাহোর, দিল্লী ও আগ্রা—এই তিনটি নগরের শাসকদের ইতিহাসের চাইতে কিছু অধিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

সম্রাটের নিচে সমাজ সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত, যথা—অভিজাত শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণী। মুঘল অভিজাত শ্রেণী অমিতব্যয়ী এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তাঁহারা সাধারণত তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকদের অনুকরণ করেন। তাঁহারা প্রকাণ্ড ও ব্যয়বহুল জীবন প্রণালী রক্ষা করিয়া চলেন এবং এই কর্মে তাঁহাদের সমস্ত আয় নিঃশেষ করিয়া দেন। নিজস্ব ব্যয়বহুল জীবন প্রণালী ছাড়াও তাঁহাদিগকে দরবারে অনেক যৌতুক প্রদান করিতে হয়। এই প্রথা তাঁহাদের মধ্যে সবচাইতে ধনীকেও দরিদ্র করিয়া দেয়। তাঁহারা আমদানিকৃত দ্রব্যের যথেচ্ছ ব্যবহার করেন, ফলে বিদেশী ব্যবসা বেশ প্রসার লাভ করে। মদ ও মেয়েলোকের প্রতি অত্যধিক আসক্তি অভিজাত শ্রেণীর একটি অতি সাধারণ অপরাধ। তাঁহারা সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদে বাস করেন এবং ঘরের ও বাহিরের খেলাধুলায় চিত্তবিনোদন করেন। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, অভিজাত শ্রেণী মূলত যথেষ্ট গুণাবলিরও অধিকারী, ফলে যতদিন তাঁহারা স্বীয় তেজস্বিতা রক্ষা করিতে পারেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা রাষ্ট্রের সুযোগ্য অমাত্য থাকেন। একজন অভিজাত নির্বাচনের মাপকাঠি তাঁহার নিজস্ব গুণাবলি, এবং তাঁহার বংশ এই ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্য মাত্র—একমাত্র গুণ নহে। সুতরাং নিজস্ব গুণাবলির দ্বারা অনেক অমুসলিম প্রজাও মুঘল দরবারের অভিজাত শ্রেণীতে স্থান পান। মুঘল অভিজাত শ্রেণীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল, সম্পদের মধ্যে গা ভাসাইয়া থাকিলেও তাঁহারা দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করেন না। কারণ, দেশের সম্পদ বিদেশে লইয়া যাইবার জন্য কোন অভিজাতকেই অনুমতি দেওয়া হয় না। একজন অভিজাতের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি রাষ্ট্র কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করিবার আইনের দ্বারা অভিজাতদের মধ্যে মিতব্যয়িতার অভ্যাস গড়িয়া উঠে নাই। ফলে উদ্বৃত্ত টাকা জমা না করিয়া সেই টাকা নিজস্ব আরাম-আয়েসে তাঁহারা খরচ করিয়া ফেলেন বা রাজা ভগবান দাসের মত প্রচুর উপঢৌকনের মাধ্যমে ব্যয় করেন। অতএব, অভিজাতদের অর্থ যেভাবে আসে ঠিক সেইভাবেই ব্যয় হয়।

অভিজাত শ্রেণী

আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী মুঘল আমলে কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণী নাই কিন্তু তবুও অভিজাত

শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর মাঝামাঝি একটি আলাদা শ্রেণীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তাঁহাদের জীবন জাঁকজমক হইতে মুক্ত। তাঁহারা তাঁহাদের স্ব-স্ব পদ ও পেশানুযায়ী আদর্শ জীবিকা নির্বাহ করেন। এই শ্রেণীতে থাকেন দরবারের নিম্নপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ এবং ব্যবসায়ী শ্রেণী। তাঁহাদের বেতন বা আয় নির্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু এতটুকু পরিষ্কার যে, তাঁহাদের অবস্থা সহজ বা সমৃদ্ধিশালী নহে। "বিভিন্ন (রাজত্বকারী) বংশের আমলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মন্তব্য প্রমাণ করে যে, সাধারণত মধ্যবর্তী শ্রেণীর ঐতিহাসিকদের জীবন খুবই কঠোর ছিল।"[১] ব্যবসায়ীরা সাধারণত অনাড়ম্বর ও সংযত জীবনযাপন করেন। কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় লেখকের মতানুসারে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচুর টাকা-পয়সা উপার্জন করিবার ফলে পশ্চিম উপকূলের ব্যবসায়ীরা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করেন এবং আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকেন। কিন্তু ব্যবসায়ীরা সাধারণত তাঁহাদের সম্পদ লুকাইয়া রাখেন পাছে স্থানীয় গভর্নর বা ফৌজদার কর্তৃক তাঁহাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী

উচ্চশ্রেণীর লোকদের তুলনায় নিম্ন শ্রেণীর লোকদের জীবন কঠোর। দুর্ভিক্ষের সময় ছাড়া তাহাদের মধ্যে কোন খাদ্য ঘাটতি হয় না। ফলে সাধারণ অবস্থায় খাদ্যাভাবে মৃত্যুর কোন নজির পাওয়া যায় না। তাহাদের কাপড়-চোপড় সামান্য এবং জীবিকা নির্বাহের প্রায় সমস্ত উপকরণ অত্যন্ত সাধারণ। চাষী শ্রেণী কঠোর ও উৎপীড়িত জীবনযাপন করিয়াছে, এমন কোন নজির সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে নাই। রাষ্ট্রের দাবি বা খাজনা ছিল নির্ধারিত এবং সম্রাটের উচ্চ শ্রেণীর কর্মচারিগণ একান্ত জনহিতৈষী উদ্দেশ্য লইয়া বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হন। হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ প্রথা এবং বাল্যবিবাহ তখনও প্রচলিত। সোনার গহনাপত্র এবং ধাতব অলংকারাদি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা পরিধান করে। সম্রাট শাহজাহানের আড়ম্বরপূর্ণ রুচি পরিশ্রমী শ্রেণীর মানুষের জন্য যথেষ্ট কাজকর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং বেশ কিছু বৎসর তাহাদের ঘরে উত্তম পারিশ্রমিক আসে। কিন্তু তারপর তাহাদের অবস্থার অবনতি ঘটে।

নিম্ন শ্রেণী

জনসাধারণের শ্রেণীবিভাগ ঃ মুঘল আমলে হিন্দুদের মধ্যে সাধারণত তিনটি প্রধান শ্রেণী বিদ্যমান। যথা—ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও বেনিয়া। সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি পাহাড়িয়া গোত্রসমূহ সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা যায়; কারণ বিশ্বজনীনভাবে তাহাদিগকে সেইযুগে সভ্য লোকের আওতার বাহিরে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের শিকার অভিযানের বর্ণনায় উইলিয়াম ফিঞ্চ (William Finch) নিশ্চয় এইসব পাহাড়িয়া গোত্রের লোকদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের মুসলমানেরা সাধারণত বিভক্ত ছিল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মুসলমান ও উপকূলের মুসলমান হিসাবে। প্রথমোক্ত শ্রেণীতে শুধু সম্রাট বাবর ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের সময় ভারতে আগত মুঘল ও পারস্যবাসীরাই অন্তর্ভুক্ত ছিল না বরং দিল্লী সালতানাতের সময় আগত মোহাজেরদের বংশধরদের এক বিরাট সংখ্যক মুসলমানও অন্তর্ভুক্ত। উপকূলের মুসলমানরা ছিল মূলত ব্যবসায়ী। ইহারা আরব ও পারস্য উপসাগর অঞ্চল হইতে আগমন করে। মুসলমানদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক আবিসিনিয়াবাসীও অন্তর্ভুক্ত, যাহাদের অধিকাংশকে আনা হয় দাস হিসাবে।

হিন্দুশ্রেণী বিভাগ

মুসলিম শ্রেণী বিভাগ

মুঘল আমলের ভারতবর্ষ বাকি বিশ্বের জন্য নিষিদ্ধ এলাকা ছিল না। স্থায়ী জনসাধারণ

ছাড়াও ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপ, আরব, পারস্য, আর্মেনিয়া, চীন ও জাপান হইতে আগত পর্যটকদিগকে উপকূলীয় এলাকায় এবং কোন কোন সময় অভ্যন্তরীণ শহরগুলিতেও দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছিল স্থায়ী বসবাসকারী, যথাঃ আর্মেনিয়ান ও ইহুদিরা। পার্শি সম্প্রদায় সংখ্যায় নগণ্য হইলেও সম্রাট আকবরের সময় তাহারা বেশ গুরুত্ব অর্জন করে। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের শেষভাগে তাহারা ব্যবসায়ী ও চাষী সম্প্রদায় হিসাবে বেশ খ্যাতি লাভ করে। ইউরোপীয়দের মধ্যে শুধুমাত্র পর্তুগীজরাই ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বেশ বর্ধিত সংখ্যায় ইংরেজ, ডাচ, দিনেমার এবং অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে জলপথে ও অভ্যন্তরীণ ব্যবসার অনুমতি প্রার্থনা করে। ইউরোপীয়রা তৎসঙ্গে মুঘলদের অধীনে গোলন্দাজ সেনা ও কামান পরিচালক হিসাবেও কাজ করে।

বিদেশী জনগণ

মুসলমান ও অমুসলমানদের অবস্থা ঃ ইসলাম ইহার অনুসারীদের এই শিক্ষা দেয় যে, সে প্রথমত একজন মুসলমান। ইসলামের হজ্ব প্রথা সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি মিলন সূত্র। আরবের সামাজিক ব্যবস্থাকেও ইহার মধ্যে খাপ খাওইয়া লইবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হয় নাই। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গার মুসলমান শাসকবৃন্দ ইসলামী সংস্কৃতিকে অমুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা প্রায়ই অন্য ধর্মাবলম্বীদিগকে সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়াছেন। মুঘলদের অবস্থাও অনুরূপ। "......... তাঁহারা ভারতবর্ষে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন এবং অনুভব করেন যে, তাঁহারা শুধু ভারতবর্ষের শাসক নহেন, বরং তাঁহারা ভারতবর্ষেরই লোক। মুঘলরা তাঁহাদের অনেক তুর্কি-আফগান পূর্বপুরুষের ন্যায় হিন্দুস্থানকে তাঁহাদের নিজস্ব দেশ বলিয়া মনে করেন।"২

স্বভাবতই মুঘলদের রাজত্বের সময় আওরঙ্গজেব কর্তৃক অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত শতকরা পাঁচ হইতে দশ ভাগ শুল্ক কর ছাড়া ব্যবসা ও শুল্কের ব্যাপারে কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন বিপত্তিজনক আইন খুব কমই ছিল। কিন্তু অপরদিকে একজন মুসলমান অভিজাতের মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আইন মুসলমানদের গায়ে বিঁধিত। এই আইন অমুসলিম অভিজাতদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না।

"সার্বজনীন শাসন সংক্রান্ত আইনের ব্যবস্থা মুঘল শাসনব্যবস্থার একটি মহান ঐক্যগ্রন্থি।" 'দাসতুর আল আমাল' ও 'আহকাম'সমূহ জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে প্রযোজ্য। আইনগুলি (Regulations) সমস্ত প্রজাসাধারণের জন্য রচিত। ঐক্য স্থাপনের আরেকটি গ্রন্থি হইল দেওয়ানী আইন (Civil law)। সমস্ত চুক্তি ও সাক্ষ্য সংক্রান্ত মুসলিম দেওয়ানী আইন হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। "তবে ইহা হিন্দুদের পক্ষে একটি আইন সংক্রান্ত অপারগতা। কিন্তু এই ব্যবস্থায় সৃষ্ট ঐক্য স্থাপনের মধ্যেই ইহার পরিশোধনীয় বৈশিষ্ট্য নিহিত।"৩ উত্তরাধিকার, বিবাহ বা সতীদাহ, দেবদাসী, বিধবা ইত্যাদি সামাজিক আইনের ব্যাপারে হিন্দুদিগকে তাহাদের নিজস্ব আইন অনুযায়ী চলিবার অনুমতি দেওয়া হয়। গ্রামে বর্ণ প্রথা, সমাজ ও পঞ্চায়েতের ন্যায় সামাজিক ব্যবস্থাসমূহ যথাযথ চালু রাখা হয়। মুঘলরা সজ্ঞানে সাধারণ মানুষের অন্তঃকরণ বা প্রতিভা বিনাশকারী কোন প্রচেষ্টা চালায় নাই। ইহা ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে সাধারণ মুসলিম দণ্ডবিধি (Penal code) প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু হিন্দুদের উপর ধর্মীয় দিক হইতে

হিন্দু সামাজিক আইন

এই আইন প্রয়োগে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হইলে ইহাকে পুনর্বিন্যাস বা কিছু রদবদল করিবার চেষ্টা করা হয়। ক্রমে ক্রমে হিন্দু সামাজিক আদর্শসমূহ মুঘল আইন ব্যবস্থায় মুঘল আইন ও আদর্শের সঙ্গে স্থায়ী আসন করিয়া লয়।

হিন্দুদের প্রতি শাসকদের মনোভাব প্রায় সর্বদাই ছিল আন্তরিক। চিতোরের রাণীর সঙ্গে 'রাখী ভাই' সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করাটাকে সম্রাট হুমায়ুন একটি সম্মানের কাজ বলিয়া মনে করেন। সম্রাট আকবর সাম্রাজ্যের ছুটির তালিকার মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পূজাপার্বণকে অন্তর্ভুক্ত করেন। "হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান রাখী, বৈশাখী, দশেরা, শিবরাত্রী, হোলী, বসন্ত, পঞ্চমী; মুসলমানদের অনুষ্ঠান ঈদ, রমজান, শব-ই-বরাত, চেহলাম, ফাতেহা-ই-দোয়াজদাহম, পারস্যবাসীদের মিনাবাজার, নওরোজ, আবান; পার্শি সম্প্রদায়ের আরদিবিশ্‌ত (Ardibisht), খোরদাদ (Khordad), বাহমান (Bahman); খ্রিস্টানদের খ্রিস্টমাস, ঈস্টার (Easter) এবং মাইকেল মাস (Michael Mass) উৎসবসমূহ সাম্রাজ্যের জনসাধারণ উপভোগ করে এবং মুঘল সম্রাটগণ এইগুলিকে সামাজিক পুনর্মিলন ও মজলিস হিসাবে ব্যবহার করেন।"[৪]

হিন্দুদের প্রতি শাসকদের মনোভাব

ঈদের দিনগুলিতে রাজকীয় দানসদকা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে মোটামুটি পার্থক্যহীনভাবে বিতরণ করা হয়। কোন বিশেষ বিজয়ের পর জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পুরস্কার বিতরণ, সম্মানজনক উপাধি প্রদান এবং পদোন্নতি প্রদান করা হয়। বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় যে, মুসলমানরা হিন্দু শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করিয়াছে। হিন্দুস্থানি ভাষা রাজকীয় ভাষা হইলেও সাধারণ রাষ্ট্রভাষা ছিল ফার্সি। মুসলিম নৃপতিগণ প্রায়ই মারাঠি, হিন্দি ও বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন করেন। বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ ফার্সি ভাষার পরিবর্তে হিন্দি ভাষাকে দরবারি ভাষার মর্যাদা দান করেন। উত্তর ভারতে উর্দু বা হিন্দুস্থানি ভাষাই ছিল হিন্দু মুসলমান উভয়ের সাধারণ ভাষা।

অতএব, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক কোন্দল থাকা সত্ত্বেও অনেক নজির রহিয়াছে যে, এই দুই সম্প্রদায়ের অবস্থা ছিল মোটামুটি একইরূপ। এই দুই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে কদাচ কোন পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইত। সাধারণ মানুষের ভাগ্য ছিল একইরূপ। অবশ্য মুঘল রাজত্বে উচ্চ শ্রেণীর মানুষ ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল, কিন্তু সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। মুঘল-ভারতে বাস করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত ছিল রাজত্বকারী শাসক ও তাঁহার বংশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন—তাঁহার ধর্মের প্রতি নহে।

অর্থনৈতিক জীবন ঃ বাবর ও হুমায়ুনের রাজত্ব মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার যুগ। ভারতের মুঘল শাসনকে দৃঢ় ও সুচারু করিবার মত যথেষ্ট সময় তাঁহারা মোটেই পান নাই। সুতরাং সাম্রাজ্যের এই দুই প্রতিষ্ঠাতার সময়কালীন জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার কোন ইতিহাস খুব একটা পাওয়া যায় না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাবর জনসাধারণের একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু সেই বর্ণনার সঙ্গে গুলবদন বেগম রচিত 'হুমায়ুননামা'র যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। আফগান শাসক শের শাহ্ সূর একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। শের শাহের পর জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়, যাহার প্রমাণ

'আইন-ই-আকবরী'তে পাওয়া যায়। সমসাময়িক ইউরোপীয় বণিক, পর্যটক ও লেখকদের বিবরণ হইতে এবং ভারতের ইউরোপীয় কুঠিগুলির দলিলপত্র (Factory records) হইতে জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। তাহাদের বিবরণ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়, প্রবল পরাক্রান্ত মুঘলদের রাজত্বকালে দেশের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে উন্নতি ও প্রাচুর্য বিদ্যমান ছিল। "আগ্রা ও ফতেহ্‌পুর দুইটি বড় বড় নগরী। ইহাদের যে কোন একটি লন্ডন হইতে অনেক বড় ও অত্যন্ত জনবহুল। আগ্রা ও ফতেহ্‌পুরের মধ্যে বারো মাইলের ব্যবধান এবং রাস্তাটি খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসের বাজারে এত পরিপূর্ণ যে, মনে হয় ইহা শহর এবং এত লোকজন যে, মনে হয় একজন লোক বাজারের মধ্যেই রহিয়াছে।"[৫] মশোরেট (Monserrate) দাবি করেন যে, ১৫৮১ সালে লাহোর, ইউরোপ বা এশিয়ার কোন নগরের দ্বিতীয় স্থানে ছিল না। পূর্ব ভারতের বেনারস, পাটনা, রাজমহল, বর্ধমান, হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি নগরসমূহ ছিল অত্যন্ত সম্পদশালী।

বর্তমানের ন্যায় মুঘল আমলেও কৃষি ছিল প্রধান শিল্প এবং রাজকীয় রাজস্বের প্রধান উৎস। "কৃষিব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন শস্যের রীতি বর্তমানের চাইতে অনেক ক্ষেত্রেই ছিল অভিন্ন প্রকৃতির।"[৬] যেহেতু কৃষিকাজই ছিল জনসাধারণের প্রধান পেশা এবং রাজস্ব আদায়ের প্রধান উৎস, সুতরাং মুঘল শাসকগণ কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ নজর দেন। বর্তমান যুগের কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থা ছাড়া কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য সম্রাট আকবর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাবলি এবং আধুনিক কালের গৃহীত ব্যবস্থাবলির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আকবরের উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে কৃষি-

কৃষি আওরঙ্গজেবের ফরমান

ব্যবস্থার নীতি অপরিবর্তিতই ছিল, কিন্তু উদ্বৃত্ত আয় হ্রাস করিবার ফলে চাষীদের উৎপাদন করিবার উৎসাহে কিছুটা ভাটা পড়ে। কৃষির উৎপন্ন দ্রব্য বৃদ্ধির জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেব বিশেষ যত্ন নেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন রাজস্ব আদায়কারীর নিকট ফরমান বা আদেশ জারি করেন। রসিক দাস ক্রোড়ির নিকট লিখিত এইরূপ একটি আদেশ এখানে উল্লেখ করা যায়। "উৎপন্ন শস্য এবং প্রত্যেক গ্রামের চাষীদের সঠিক অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া যদি তাহারা (রাজস্ব আদায়কারিগণ) মিতব্যয়িতার সহিত কাজ করে (বা সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি নজর দেয়) এবং যদি সমস্ত কৃষি উপযোগী জমিতে চাষাবাদ করে, চাষ বৃদ্ধির প্রতি এবং মোট স্থায়ী রাজস্বের প্রতি তাহাদের ক্ষমতা ব্যবহার করে, যাহাতে পরগনাগুলিতে চাষাবাদ বৃদ্ধি পায়, জনগণের উন্নতি হয়, তবে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিপতিত হইলে প্রচুর কৃষিকাজ বিরাট আকারের রাজস্ব ঘাটতিকে বাধা প্রদান করিবে।"[৭] কৃষকদের হিত সাধনের উদ্দেশ্যে আওরঙ্গজেব তাহাদের ব্যাপারে গভীরভাবে অনুসন্ধান করেন এবং ফরমানের মাধ্যমে আদেশ দেনঃ "যেখানে পরিত্যক্ত কূপ পাইবে, সেগুলিকে মেরামত করিবে, এবং নূতন একটি খনন করিতে সচেষ্ট হইবে। প্রজাদের রাজস্ব এমনভাবে নির্ধারণ করিবে যাহাতে সাধারণ রায়তগণ তাহাদের প্রাপ্য অংশ পায় এবং সরকারি রাজস্ব সঠিক সময়ে আদায় করা হয় এবং কোন রায়ত যাহাতে অত্যাচারিত না হয়।" (স্যার যদুনাথ সরকার)।

সচরাচর ফলনশীল শস্য ছাড়াও বাংলা, বিহার, জম্মু ও কাশ্মীরে ইক্ষু ও নীলের চাষ হইত। বিপুল পরিমাণ উৎপাদনের চাহিদা মিটাইবার জন্য ভারতের কোন কোন জায়গায়

সুতা ও রেশম উভয়টিরই চাষ হইত। ১৬০৪ বা ১৬০৫ সাল হইতে এই দেশে তামাকের চাষ আরম্ভ হয়। দেশের অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ছিল খনিজ পদার্থ, লবণ, চিনি, আফিম, মদ, তামা ও লোহা।

উৎপন্ন দ্রব্য

রাস্তা ও নদীপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। দেশের মধ্যে বিপুল আকারের ব্যবসা বিস্তৃতির ফলে জিনিসপত্রের মূল্য বিশেষত যেগুলিতে সাধারণ মানুষের চাহিদা বেশি যথা চাউল, তরকারি, মসলা, মাংস, গৃহপালিত জন্তু ও দুধ ইত্যাদির মূল্য খুবই কম ছিল। যদি কোন প্রদেশে কোন জিনিসের অভাব হইত, তবে অতি দ্রুত তাহা অন্য প্রদেশ হইতে আনয়ন করা হইত। মোরল্যান্ড ও ডঃ স্মিথ উভয়ে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, একজন সাধারণ শ্রমিক বর্তমান দিনের চাইতে সম্রাট আকবরের সময় আরও অধিক খাবার পাইত এবং বর্তমান যুগের তাহার সমপর্যায়ের লোকের চাইতে অধিক সুখী ছিল।

ব্যবসা বাণিজ্য

ভারতের বিদেশী ব্যবসা-বাণিজ্য, যাহার সূত্রপাত করে পশ্চিম উপকূলের মুসলমান শ্রেণী এবং যাহা পূর্ব সাগরে পর্তুগীজদের আগমন পর্যন্ত তাহাদের হাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা মুঘল আমলে যথেষ্ট প্রসারতা লাভ করে। আকবর স্বয়ং বাণিজ্যিক লাভের জন্য খুব উৎসুক ছিলেন। স্থলপথে রপ্তানি ব্যবসা চলিত দুইটি প্রধান পথ ধরিয়া, যথাঃ লাহোর হইতে কাবুল এবং মুলতান হইতে কান্দাহার। কিন্তু যাতায়াত ছিল সীমাবদ্ধ, অনিয়মিত ও বিপদসংকুল। জলপথের ব্যবসা ছিল সমধিক নিরাপদ। ভারতের প্রধান বন্দরগুলি ছিল সিন্ধুর লাহোরী বন্দর, সুরাট, ব্রোচ, ক্যাম্বে, বেসিন, চউল, দেবল, গোয়া এবং মালাবার বন্দরসমূহ। সবচাইতে ব্যস্ত বন্দর ছিল কালিকট, কোচিন, নেগারপটম, মসূলিপত্তম, সাতগাঁও, শ্রীপুর, চট্টগ্রাম ও সোনারগাঁও। শুল্ককর শতকরা সাড়ে তিনের অধিক কখনও ছিল না। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রথমদিকে প্রধান রপ্তানিকৃত দ্রব্য ছিল কার্পাস বস্ত্র, মরিচ, নীল, আফিম প্রভৃতি। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ছিল মাদ্রাজের চিত্রিত কার্পাস বস্ত্র, বিহারের অগ্নি বারুদ এবং বাংলার রেশম ও চিনি। ভারতে ইউরোপীয় মালের চাহিদা খুবই কম ছিল। দেশের আমদানিকৃত দ্রব্যের মধ্যে ছিল সোনা-রূপার কাঠি, ঘোড়া, কাঁচা রেশম, ধাতব দ্রব্য, হস্তীদন্ত নির্মিত দ্রব্য, প্রবাল, তৈলস্ফটিক, মূল্যবান পাথর, ঔষধ এবং চীনামাটির জিনিসপত্র। সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ব্যবসার মূল্য বৈশিষ্ট্য হইল ডাচ ও ইংরেজদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ। পূর্ব আফ্রিকার উপকূল ও এশিয়ার সঙ্গে তাহারা ভারতের ব্যবসার মোড় ঘুরাইয়া দেয় এবং পূর্ব ও পশ্চিমের বাজারের মধ্যে সরাসরি বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন করে।

বিদেশী ব্যবসা
স্থলপথ
জলপথের বন্দরসমূহ
রফতানি দ্রব্য
আমদানি দ্রব্য

"আলোচ্য সময়ের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল জনসাধারণের সুবিস্তৃত ও বিভিন্ন প্রকারের শিল্পজাত কার্যকলাপ, যাহা স্থানীয় অভিজাত শ্রেণী ও ব্যবসায়ীদের চাহিদা মিটাইবার পরও ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল হইতে আগত ব্যবসায়ীদের চাহিদা পূরণ করিতে সক্ষম হয়।"[৮] রাষ্ট্র উহার কারখানাগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। ঐগুলিতে অতি মূল্যবান জিনিসপত্র তৈয়ার হয়। "মুঘল সরকার প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুর স্বয়ং উৎপাদনকারী হইয়া স্বীয়

শিল্প ও কারিগরি

চাহিদা সরবরাহ করিতে বাধ্য হয়।"[৯] আবুল ফজল লিখিয়াছেন—"মহামান্য সম্রাট বিভিন্ন দ্রব্যের প্রতি যথেষ্ট নজর দেন এবং নবাগতদের শিক্ষার জন্য ও উৎপন্ন দ্রব্যের গুণ বৃদ্ধির জন্য সুনিপুণ শিক্ষক ও কারিগর নিয়োগ করেন। যদিও উৎপাদন ও যানবাহনের আধুনিক ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান ছিল খুবই স্বল্প সংখ্যার, কিন্তু সরকার উহার প্রজাদের প্রতি কিছুটা পিতৃসুলভ নীতি গ্রহণ করে। আবুল ফজলের উক্তি অনুসারে আকবরের রাজত্বকালে রাজকীয় পরিবারে ছিল "একশতেরও অধিক অফিস ও কারখানা, প্রত্যেকটিকে দেখিতে একেকটি নগর বা বরং একটি ছোটখাট রাজ্যের মত দেখাইত।"[১০] সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইউরোপীয় চিকিৎসক বার্নিয়ার লিখিয়াছেনঃ দুর্গের মধ্যে কারিগরদের জন্য কারখানা বা শিল্পালয় নামে বড় বড় ভবন দেখা যায়। এক ভবনে একজন তত্ত্বাবধায়কের পরিচর্যায় সূচিকর্মকাররা অতি ব্যস্ততার সঙ্গে কাজে নিযুক্ত। আরেকটিতে আপনি দেখেন স্বর্ণকারদিগকে, তৃতীয়টিতে চিত্রশিল্পীদের, চতুর্থটিতে বার্নিশকারীদিগকে বার্নিশের কাজে, পঞ্চমটিতে সূত্রধর, কুন্দকার মিস্ত্রী, দর্জি, মুচিকে; ষষ্ঠটিতে সিল্ক, বুটিদার রেশমী বস্ত্র এবং ঐসব সুন্দর মসলিন প্রস্তুতকারী, যেগুলি দিয়া তৈরি হয় পাগড়ি, সোনালি ফুলের নক্সা করা কটিবন্ধ এবং সুন্দর মহিলাদের পরিধান করিবার পাজামা .... যেগুলির উপর নিখুতভাবে সুচিকাজ করা হইয়াছে।"[১১]

"মুঘল আমলে ভারতবর্ষে সবচেয়ে ব্যাপক শিল্প ছিল সুতিবস্ত্রের উৎপাদন, যেগুলি স্থানীয়ভাবে ও বিদেশে বিক্রয় হইত।"[১২] উড়িষ্যা হইতে পূর্ববাংলা পর্যন্ত সমগ্র দেশকে একটি সুতিবস্ত্রের কারখানার মত মনে হয় এবং ঢাকা জিলা বিশেষ করিয়া প্রসিদ্ধ ইহার সুকোমল মসলিন কাপড়ের জন্য। স্বীয় বাজারের চাহিদা মিটানো ছাড়াও ভারত উহার উৎপন্ন দ্রব্য এশিয়া, আফ্রিকার পূর্ব উপকূল এবং ইউরোপের বাজারগুলিতে রপ্তানি করে।

শিল্প উৎপন্ন দ্রব্য

সিল্কবস্ত্র বয়ন এক শ্রেণীর জনগণের জন্য ছিল একটি বিশেষ শিল্প। সিল্ক উৎপাদনের কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলাদেশ। লাহোর, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি এবং গুজরাটেও সিল্ক উৎপাদন হইত। শাল ও কার্পেট বয়নের শিল্প বিশেষভাবে উন্নত ছিল কাশ্মীর ও লাহোরে। পোতাশ্রয়গুলিতে ছোটখাট জাহাজও নির্মাণ করা হইত। এইদেশ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল গোলা-বারুদ প্রস্তুত ও রপ্তানির জন্য। মুঘল আমলে প্রধান কারিগরি উৎপাদন ছিল কাঠের খাট, সিন্ধুক, টুল, বাক্স, চামড়ার মালপত্র, কাগজ, মৃৎপাত্র এবং ইটের কাজ। কিন্তু মধ্যস্থ দালালদের জন্য উৎপাদনকারীরা ন্যায্য মূল্য পাইত না।

শিক্ষা ও সাহিত্য ঃ

"মধ্যযুগীয় ইউরোপের ন্যায় মুঘল ভারতেও শিক্ষা ছিল ধর্মের একটি অংশ এবং রাষ্ট্রের শিক্ষার খরচ বহন করা হইত দান-খয়রাতের তহবিল হইতে এবং রাজকীয় দান-খয়রাত বিতরণকারী কর্মকর্তার (Sadr-us-Sadur) মাধ্যমে।"[১৩] মুঘল আমলের শিক্ষাব্যবস্থা যদিও আধুনিককালের মত ছিল না, কিন্তু শাসকগণ সর্বদাই ব্যাপক জনশিক্ষার স্বপক্ষে ছিলেন। রাজা ও অভিজাত শ্রেণী সাধারণত মসজিদ, মন্দির ও ধর্মীয় লোকদিগকে প্রায়ই মুক্ত হস্তে দান করিতেন। ফলে মসজিদ ও মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া উহাদের পাশে মক্তব এবং হিন্দু সংস্কৃত ও মাতৃভাষার বিদ্যালয়সমূহ গড়িয়া

শিক্ষাব্যবস্থা উহার ব্যয় বহন

উঠে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথমদিকে তিনি একটি ফরমান জারি করেন, যদ্বারা তিনি গুজরাটের দিওয়ানকে আদেশ দেন যে, প্রত্যেক বৎসর প্রদেশের সদরের (Sadr) সুপারিশক্রমে এবং শিক্ষকের সিলমোহরযুক্ত সাক্ষ্য প্রদানের দ্বারা রাষ্ট্রীয় খরচে যেন শিক্ষক নিয়োগ করা হয় এবং ছাত্রদিগকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এই টাকা প্রদান করা হইত সরকারি ট্রেজারী হইতে। খানকাহ্‌সমূহ সরকার হইতে মোটা অংকের ভাতা পাইত এবং তাহাদের দায়িত্ব ছিল জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা বিস্তার করা।

মুঘল সম্রাটের শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা

সমস্ত মুঘল সম্রাট শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সম্রাট বাবরের পূর্ত বিভাগের দায়িত্বের মধ্যে একটি ছিল স্কুল ও কলেজ ভবন নির্মাণ করা। হুমায়ুন সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে একটি বাছাই করা পুস্তকাগার বহন করেন। ফতেপুর সিক্রি, আগ্রা ও অন্যান্য স্থানে সম্রাট আকবর অনেক স্কুলগৃহ নির্মাণ করেন। এমনকি সম্রাট আকবর হিন্দু ছাত্রদের মুসলমান মাদ্রাসায় পড়িবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর এই মর্মে একটি আইন চালু করেন যে, যদি কোন ধনীলোক বা পর্যটক কোন উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মারা যান, তবে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি মাদ্রাসা ও খানকাহ্‌-এর জন্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে। সম্রাট শাহ্‌জাহান স্বয়ং একজন বিদ্বান ব্যক্তি এবং দিল্লীতে তিনি অনেক স্কুল-কলেজ নির্মাণ করেন ও 'দারুল বাকা' নামক কলেজটি মেরামত করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবও একজন বিদ্বান ব্যক্তি এবং জনসাধারণের শিক্ষার জন্য তিনি বিপুল অর্থ ব্যয় করেন।

সাহিত্য ঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুঘল আমলের অবদান অপরিসীম। সাহিত্যের ভাষা ফার্সি, হিন্দি ও বাংলা। বাবর স্বয়ং একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি আরবি, ফার্সি ও তুর্কি ভাষায় পারদর্শী। তিনি যে শুধু অন্যের লেখা পড়িতে ভালবাসেন তাহাই নহে, বরং নিজেও ইহাতে যথেষ্ট অবদান রাখিয়া যান। তুর্কি ভাষায় স্বহস্তে লিখিত তাঁহার আত্মজীবনীর জন্য তাঁহাকে "আত্মজীবনী লেখকদের রাজকুমার" বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। ঐতিহাসিক লেন

বাবরের আত্মজীবনচরিত

পুল বলেনঃ "যদি কখনও এমন হয় যে, অন্য কোন সাক্ষ্য ছাড়া মাত্র একটি ঐতিহাসিক প্রমাণই যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তবে তাহা বাবরের আত্মজীবনচরিতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।"[১৪] সম্রাট হুমায়ুন বেশ কিছুসংখ্যক কবি, দার্শনিক ও ধর্মীয় উপদেষ্টাদের তাঁহার দরবারে স্থান দেন এবং তাহাদের সাহচর্যে তিনি বেশ আনন্দ উপভোগ করেন।

আকবরের সমকালীন সাহিত্য

সম্রাট আকবরের রাজত্ব ফার্সি সাহিত্যের জন্য একটি অতি উল্লেখযোগ্য যুগ। তাঁহার সময় অনেক সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থরাজি প্রকাশিত হয়। তাঁহার রাজত্বকালে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে 'তারিখ-ই-আলফি', 'আইন-ই-আকবরী', 'আকবরনামা', 'মাসীর-ই-রহিমী', 'তবাকাত-ই-আকবরী', মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ' এবং ফৈজী লিখিত 'আকবরনামা'। এই সময় অনেক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বাদাউনী হিন্দুদের রামায়ণ গ্রন্থটিকে ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেন। মহাগ্রন্থ মহাভারতেরও কিয়দংশ অনুবাদ করা হয়। 'অথর্ববেদ' মহাগ্রন্থটিকে ইব্রাহিম সারাহিন্দী অনুবাদ করেন। 'লীলাবতী' নামক অংকশাস্ত্রের পুস্তকটিকে ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেন ফৈজী। প্রসিদ্ধ সূফী গিজালী একজন প্রসিদ্ধ গদ্য লেখক। তিনি রচনা করেন 'ইসরার-ই-মকতুব', 'মিরাত-উল-কায়েনাত' এবং 'নাসী বারিদ'।

সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বয়ং একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও লেখক ছিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার স্বহস্তে লিখিত আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' একটি সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তিনি কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। একটি শিক্ষিত ব্যাঘ্র কিভাবে একটি বন্য মহিষকে কাবু করিল, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সম্রাট জাহাঙ্গীরের সম্মুখে আবৃত্ত চারি লাইনের একটি ক্ষুদ্র কবিতার জন্য একজন কবি দশ সহস্র টাকার একটি থলি উপহার হিসাবে লাভ করেন। তাঁহার রাজত্বের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থরাজির মধ্যে রহিয়াছে 'মাছিরে জাহাঙ্গীরী', 'ইকবাল নামা-ই-জাহাঙ্গীরী' এবং 'জুবদাত-উত-তাওয়ারিখ'। সম্রাট শাহজাহান বিখ্যাত গ্রন্থকার আবদুল হামিদ লাহোরী, আমিন কাজউইনী, ইনায়েত খান ও মুহাম্মদ সালেহ প্রমুখ-এর পৃষ্ঠপোষক। আব্দুল হামিদ লাহোরী বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাদশাহনামা'র প্রণেতা। মুহাম্মদ সালেহ লিখিয়াছেন 'আমাল-ই-সালেহ'। ইনায়েত খান লিখেন 'শাহজাহান নামা।'

জাহাঙ্গীর
শাহজাহান

সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন বড় বিদ্বান ও সাহিত্যিক ছিলেন। প্রসিদ্ধ মুসলিম আইন ব্যবস্থা সংকলিত আইন পুস্তক 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী' তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় সংকলন করা হয়। তাঁহার স্বীয় কৃতিত্ব ও রাজত্বের ইতিহাস রচনা তিনি পছন্দ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার রাজত্বের উপর ভিত্তি করিয়া বিখ্যাত ঐতিহাসিক খাফী খান তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মুনতাখাব-উল-লুবাব' গোপনে লিপিবদ্ধ করেন। এই যুগের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে 'আলমগীরনামা', 'মাসির-ই-আলমগীরী', 'রুকাত-ই-আলমগীরী', 'খোলাসাত-উত-তাওয়ারিখ' ইত্যাদি। তাঁহার কন্যা শাহজাদী জেবুন্নেছা লিখেন 'দিওয়ান-ই-মাখ্‌ফি'।

আওরঙ্গজেব

সম্রাট আকবরের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি মুঘল আমলে হিন্দি সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করে। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ মির্জা আবদুর রহিম খান-ই-খানান, রাজা টোডরমল, ভগবান দাস ও মানসিং হিন্দিতে কবিতা রচনা করেন। রাজা বীরবল সম্রাট আকবরের নিকট হইতে 'কবি রায়' উপাধি লাভ করেন। আব্দুর রহিমের বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হইল 'রহিম সাতসাই'। ইহা কতকগুলি দোহার সংকলন। করণ ও নরহরি আকবরের সভাকবি। সম্রাট আকবরের নিকট হইতে নরহরি 'মহাপাত্র' উপাধি লাভ করেন। মহাকবি তুলসি দাস আকবরের সমসাময়িক কবি। তাঁহার প্রধান সংকলনের নাম 'রামকৃতমনাস' বা 'রামের কার্যাবলির হ্রদ'। সুরদাস হিন্দি সাহিত্যের আরেকজন উল্লেখযোগ্য লেখক। তিনি সম্রাটের সভায় নিযুক্ত একজন সাহিত্যিক। 'সুরসাগর' নামক গ্রন্থে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ছেলেবেলার খেলাধুলার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। অন্যান্য হিন্দি লেখকদের মধ্যে রহিয়াছেন নন্দ দাস, পরমানন্দ দাস, কুম্ভন দাস প্রমুখ। রাস খান নামে আরেকজন সুপ্রসিদ্ধ হিন্দি লেখক একজন মুসলমান। 'দশোঁ বৈষ্ণব কি বার্তা'র মধ্যে তাঁহার নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্রাট শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের সুপ্রসিদ্ধ হিন্দি সাহিত্যিকবৃন্দ হইলেন সুন্দর, সেনাপতি ও ত্রিপাঠি ভ্রাতৃত্রয়। সুন্দর সম্রাট শাহজাহানের নিকট হইতে 'কবিরায়' ও 'মহাকবিরায়' উপাধি লাভ করেন। ঐ যুগের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ হিন্দি সাহিত্যিকদের মধ্যে রহিয়াছেন মতিরাম ত্রিপাঠী, দেব কবি ও বিহারী লাল চৌথ। সেই যুগের অধিকাংশ কবিতা ধর্মীয়। এইগুলির ভাব লওয়া হয় কৃষ্ণ ও রামের ধর্মমত হইতে।

হিন্দি সাহিত্য
রামকৃতমনাস

"এই যুগে উত্তর ভারতে লিখিত যথেষ্ট উর্দু কবিতা আমরা পাই না"—ঈশ্বরীপ্রসাদ। উর্দু সাহিত্যের প্রকৃত উৎপত্তি হয় দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানগণের পৃষ্ঠপোষকতায়, যাহাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক উন্নত রুচিশীল সংস্কৃতিবান শাসক রহিয়াছেন। আওরঙ্গাবাদের গভর্নর একজন প্রসিদ্ধ কবি। তিনি ১৬৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত সরল, স্বাভাবিক ও মার্জিত ভঙ্গিতে তিনি বিভিন্ন গজল, মসনভি ও রুবাইয়াত রচনা করেন। কথিত আছে, তিনি দুইবার দিল্লী গমন করেন। তাঁহার রচিত 'দিওয়ান মুঘল' রাজধানীতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং এইভাবে উর্দু কবিতার ভিত্তি স্থাপন করে। অনেক কবি তাঁহার রচনার অনুকরণে কবিতা রচনা করেন, যাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন হাতিম (১৬৭৯-১৭৯২), খান আরজু, (১৬৮৯-১৭৫৬) এবং আব্রা ও মাযহার (১৬৯৮-১৭৮১)। তাঁহাদিগকে ন্যায়ত উত্তর ভারতে উর্দু কবিতার জন্মদাতা বলা হয়।

উর্দু সাহিত্য

বাংলাদেশ এই যুগে একটি উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব সাহিত্য আত্মপ্রকাশের জন্য প্রসিদ্ধ। এই সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা, যথাঃ কর্চা বা টিকা, পদ, গীত ও চৈতন্যদেবের জীবনী জনসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। সুবিখ্যাত বৈষ্ণব লেখকবৃন্দের মধ্যে রহিয়াছেন 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের প্রণেতা কৃষ্ণ দাস কবিরাজ, 'চৈতন্য ভগবতে'র 'গ্রন্থকার বৃন্দাবন দাস, 'চৈতন্য মঙ্গলের' গ্রন্থকার জয়ানন্দ, অন্য একটি 'চৈতন্য মঙ্গলে'র গ্রন্থকার ত্রিলোচন দাস এবং 'ভক্তিরত্নাকর'-এর গ্রন্থকার নরহরি চক্রবর্তী। এই যুগে বিখ্যাত মহাকাব্য 'ভগবত' এবং চন্ডি দেবী ও মনসাদেবীর প্রশংসায় লিখিত মহাকাব্যগুলি অনুবাদ করা হয়। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'কবিকংকন চণ্ডি'।

বাংলা সাহিত্য
বৈষ্ণব সাহিত্য
মহাভারত

সমস্ত মুঘল সম্রাটগণই বইপুস্তক ভালবাসেন, যাহার ফলে বড় বড় পুস্তাকাগারের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং পুস্তকাগারগুলি অসংখ্য ও মূল্যবান পাণ্ডুলিপিতে ভর্তি। আকবরের গ্রন্থাগার ছিল বিভিন্ন গ্রন্থ সম্বলিত, যেগুলিকে বিভিন্ন ভাগে সাজাইয়া রাখা হয়। সম্রাট বাবর হইতে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত, আকবর ব্যতীত, সমস্ত প্রাথমিক সম্রাটগণই বিখ্যাত সাহিত্যিক।

মুঘলদের
গ্রন্থাগার

স্থাপত্য শিল্প ও চিত্র শিল্প

মহান ফার্সি কবি শেখ সাদী কোন এক সময় মন্তব্য করেন, "যে ব্যক্তি জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য মসজিদ, পুল, জলাধার ও সরাইখানা-জাতীয় বৃহৎ কার্যাবলি রাখিয়া যান, তিনি অমর।" শ্রেষ্ঠ মুঘলগণ কর্তৃক নির্মিত মসজিদ, সুরম্য কবর, রাজপ্রাসাদ ও তোরণ প্রভৃতি অট্টালিকাসমূহের ক্ষেত্রে কবির মন্তব্য এমনকি আরও জোর দিয়া প্রয়োগ করা যায়। তাঁহারা (মুঘলগণ) এবং তাঁহাদের সাম্রাজ্য তাঁহাদের সামরিক ও শাসন সংক্রান্ত ধারা পুনরাবৃত্তির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব-প্রকাশক তাঁহাদের স্থাপত্য শিল্পের কৃতিত্ব তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।"[১৫] অন্যান্য দেশের মুসলিম পদ্ধতির ন্যায় ভারতের মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের সহিত আব্বাসীয় খলিফাদের যুগে বাগদাদে প্রচলিত তৎকালীন পদ্ধতির পুরাপুরি মিল রহিয়াছে। অর্ধ গোলাকৃতি খিলানের (Arch) ন্যায়

গম্বুজ, যাহা মুঘল ইমারতের সুপ্রসিদ্ধ একটি বৈশিষ্ট্য এবং যাহা হিন্দু স্থাপত্য শিল্পে ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাহা বাগদাদে ছিল খুবই সুপরিচিত। ভারতে মুসলমানদের প্রথম আগমনের সময় অট্টালিকা নির্মাণের কাজে তাহারা স্থানীয় রাজমিস্ত্রিদের কাজে লাগাইতে বাধ্য হয়। ঐসব রাজমিস্ত্রি মুসলিম পদ্ধতিতে অর্ধ গোলাকৃতি খিলানের সত্যিকারের মধ্য প্রস্তর (Keystone) নির্মাণে ব্যর্থ হয়। ক্রমে ক্রমে দেশীয় রাজমিস্ত্রিরাও সেই পদ্ধতি শিখিয়া ফেলে।

বাগদাদের স্থাপত্য শিল্পের সহিত সমতা ভারতীয় ছাপ

অপরদিকে ভারতীয় স্থাপত্য শিল্প পদ্ধতির সঙ্গে যোগাযোগের ফলে মুঘল আকৃতিগুলিতে ধীরে ধীরে কিন্তু প্রকটভাবে ভারতীয় ছাপ ফুটিয়া উঠে। সম্ভবত এই জন্যই ভারতের বিভিন্ন জায়গায় নির্মিত মুঘল ইমারতগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের পদ্ধতি গড়িয়া উঠে। মুঘল ইমারতসমূহের নিচু স্তম্ভ, চতুষ্কোণ স্তম্ভ, অলংকারযুক্ত দেওয়াল গিরির ডাল ও অন্যান্য কারুকার্য খচিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের ছাপ পুরাপুরিভাবে ফুটিয়া উঠে।

সমস্ত মুঘল সম্রাটই স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। সম্রাট বাবর যদিও ইমারত নির্মাণের জন্য ভারতে অল্প সময়ই লাভ করেন, কিন্তু তবুও তিনি অনেক অট্টালিকা নির্মাণ করেন। একমাত্র আগ্রাতেই ইমারত নির্মাণের কাজে বাবর দৈনিক ৬৮০ জন মিস্ত্রি নিযুক্ত করেন। আগ্রা, সিক্রি, বিয়ানা, ঢোলপুর, গোয়ালিয়র ও কোয়েলে বাবর দৈনিক ১৪৯১ জন পাথর কাটিবার মিস্ত্রি নিয়োগ করেন। সম্রাট বাবর অনেকগুলি ইমারত নির্মাণ করেন, কিন্তু তন্মধ্যে যে দুইটি আজও টিকিয়া আছে, সেইগুলি হইল পানিপথে ১৯৯৫ সালে হিন্দু ধর্মান্ধ করসেবকদের দ্বারা ধ্বংসকৃত কাবুলবাগ-এর মসজিদ সম্ভলে অবস্থিত জামে মসজিদএবং অযোধ্যার বাবরী মসজিদ। দেশীয় স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে বাবর খুবই খারাপ ধারণা পোষণ করেন এবং সেইজন্য তাঁহার ইমারত নির্মাণের কাজে তিনি তুরস্ক হইতে রাজমিস্ত্রি আনাইতে চান।

বাবরের স্থাপত্যশিল্প

হুমায়ুন ঃ ভারতে সম্রাট হুমায়ুনের জীবন ঝড়-ঝাপটার জীবন। তবুও তিনি বেশ কয়েকটি ইমারত রাখিয়া যান, তন্মধ্যে একটি হইল পাঞ্জাবের হিসার জিলায় অবস্থিত ফতেয়াবাদের মসজিদ। পারস্য পদ্ধতিতে কলাই করা টালি দ্বারা ইহা সুসজ্জিত। যদিও অতি তাড়াতাড়ি নির্মিত, তবুও 'দ্বীন পানাহ্' নামে দিল্লীতে অবস্থিত হুমায়ুনের প্রাসাদ ইমারত নির্মাণের প্রতি তাঁহার উৎসুক্যতার স্বাক্ষর বহন করে।

দ্বীন পানাহ্

শেরশাহ ঃ পাঞ্জাব, রোটাস ও মানকোটের সুবৃহৎ দুর্গগুলি ছাড়াও সূর বংশীয়গণ মধ্য যুগীয় স্থাপত্য শিল্পের কতকগুলি অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ রাখিয়া যান। শের শাহের রাজত্বকালের দুইটি উল্লেখযোগ্য ইমারত হইল দিল্লীর নিকট পুরানা কিল্লা বা কিল্লা কোহনায় অবস্থিত মসজিদ এবং সাসারামে অবস্থিত তাঁহার সমাধি, মসজিদের কুলুঙ্গিযুক্ত দ্বার। গম্বুজের চতুষ্পার্শ্বের ছোট ছোট মিনার এবং ইহার চমৎকার রাজকীয় কাজের মধ্যে পারস্য পদ্ধতির ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আড়ম্বর ও সম্ভ্রমের দিক হইতে কবরটি এই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ নক্শা করা ও সুন্দর ইমারতগুলির মধ্যে একটি।

পুরানা কিল্লার মসজিদ সাসারামের সমাধি

আকবর ঃ "ইমারত নির্মাণের প্রতি আকবর বিশেষ মনোযোগ দেন এবং আবুল ফজলের মতানুসারে তিনি কাজ কারবারে সুবিন্যস্ততা ও উপযুক্ততার বড় বন্ধু এবং গৃহ নির্মাণের মাল-মসলার মূল্য ও কারিগরদের পারিশ্রমিকের উপর নজর রাখেন এবং সঠিক মূল্য নিরূপণের

জন্য প্রমাণ জোগাড় করেন।"[১৬] সম্রাট আকবরের রাজনৈতিক মতবাদ তাঁহার স্থাপনাগুলির নক্‌শার মধ্যে অনেকটা ফুটিয়া উঠে। আগ্রা দুর্গ ও ফতেপুর সিক্রির তাঁহার প্রাসাদসমূহে মুঘল পদ্ধতির সহিত ভারতীয় পদ্ধতির সংমিশ্রণ লক্ষ্যণীয়। হুমায়ুনের সমাধি আকবরের রাজত্বের সর্বপ্রথম ইমারত, যাহার নির্মাণ কাজ ১৫৬৫ সালে শেষ হয়। নকশার দিক হইতে ইহা পারস্য পদ্ধতির এবং ইহার প্রধান মাধুর্য রহিয়াছে মূল ইমারতের চারি কোনায় নির্মিত চারিটি মিনার ও চিকন গলাবিশিষ্ট গম্বুজের মধ্যে, যেগুলির বৈশিষ্ট্য শাহজাহানের রাজত্বকালে পূর্ণতা লাভ করে। আকবরের রাজত্বকালের সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন ইমারত হইল শেখ সেলিম চিস্তির সম্মানে নির্মিত ফতেহপুর সিক্রিতে অবস্থিত তাঁহার প্রাসাদসমূহ। জামে মসজিদ ও বুলন্দ দরওয়াজা ফতেহপুর সিক্রির ইমারতগুলির মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার। রাস্তা হইতে বুলন্দ দরওয়াজার মোট উচ্চতা ১৭৬ ফুট এবং ভারতের মধ্যে ইহা এখন সর্বোচ্চ প্রবেশদ্বার এবং বিশ্বের সর্বোচ্চ প্রবেশদ্বারগুলির মধ্যে অন্যতম। ফতেহপুর সিক্রির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ইমারতগুলির মধ্যে রহিয়াছে শেখ সেলিম চিস্তির মাজার, বীরবলের গৃহ, সোন্‌হালা মাকান, তুর্কি সুলতানার প্রাসাদ, খওয়াবগাহ, দিওয়ানে খাস বা ইবাদতখানা। এইগুলি আকারে ছোট, কিন্তু নক্‌শা ও কারুকার্যের দিক হইতে অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম। অফিস ও সভাগৃহের জন্য ব্যবহৃত ইমারতগুলিও সমভাবে নমনীয়। ফতেহপুর সিক্রির সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া ভিনসেন্ট স্মিথ ইহাকে প্রস্তরের উপকথা, যাহা অন্য কোন যুগে বা অন্য কোন অবস্থায় অচিন্তনীয় ও অসম্ভব বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু আকবরের ইমারতগুলির মধ্যে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইল আগ্রার অদূরে সেকেন্দ্রায় নির্মিত তাঁহার সমাধি, যাহা এশিয়ার সমাধি-ইমারতগুলির মধ্যে অতুলনীয়। আকবর তাঁহার রাজধানী আগ্রাকে ঐশ্বর্যশালী অট্টালিকাসমূহ দ্বারা সজ্জিত করেন। আগ্রা দুর্গের ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৫৬৪ সালে এবং আট বৎসরে ইহার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। দুর্গের মধ্যে রহিয়াছে 'দিওয়ান-ই-আম', 'দিওয়ান-ই-খাস' এবং সচরাচর কথিত 'জাহাঙ্গীরী মহল'।

হুমায়ুনের সমাধি
আগ্রা দুর্গ

জাহাঙ্গীর : সম্রাট জাহাঙ্গীর স্থাপত্য শিল্পের চাইতে চিত্রশিল্পের প্রতি অধিক অনুরাগী। এমন কি তিনি তাঁহার পিতার সমাধি সৌধের উপর একটি গম্বুজ স্থাপন করিয়া ইহাকে সম্পূর্ণ করিবার প্রতি নজর দেন নাই। কিন্তু তাঁহার পত্নী নূরজাহান পিতা ইতেমাদ-উদ-দৌলার সমাধির উপর একটি মনোরম সৌধ নির্মাণ করেন। এই সৌধ সম্পূর্ণভাবে মার্বেল পাথর দ্বারা নির্মাণ করা হয় এবং ইহাই সর্বপ্রথম ইমারত, যেখানে বিভিন্ন রঙের মূল্যবান পাথর খোদাই করিয়া লাগান হয়। নূরজাহান কর্তৃক নির্মিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য ইমারত লাহোরে অবস্থিত জাহাঙ্গীরের সমাধি।

ইতেমাদ-উদ-দৌলার সমাধি

শাহজাহান : সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালেই মুঘল-ভারতীয় পদ্ধতির স্থাপত্য শিল্প ইহার পূর্ণ মাধুর্য লাভ করে। শাহজাহানের সমস্ত প্রধান ভবনসমূহের নির্মাণ পদ্ধতি মূলত পারস্য ধাঁচের। কিন্তু তৎসঙ্গে পারস্য পদ্ধতি হইতে ইহার পার্থক্য পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় ইহাতে ব্যবহৃত শ্বেত মর্মরের প্রাচুর্যতা ও অতুলনীয় কারুকার্য দ্বারা। "প্রস্তরের উপর কারুকার্য যাহা সবচাইতে সুন্দর ইমারতগুলিকে অলংকৃত করে এবং প্রায় রমণীয় সৌন্দর্যযুক্ত বিস্তৃত নক্‌শার সুসংমিশ্রণ তাঁহার রাজত্বকালের কার্যাবলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যও।"[১৭]

প্রস্তরের উপর কারুকর্ম

শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত একটি অত্যাশ্চর্য ইমারত হইল তাজমহল। তাঁহার অতি প্রিয় পত্নী সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের স্মরণার্থে সম্রাট ইহা নির্মাণ করেন। "অনেক প্রশংসাকারী কর্তৃক বর্ণিত এবং নিশ্চয়ই এই বিশ্বের একটি অতুলনীয় সৌন্দর্যের অন্যতম **তাজমহল** নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় ১৬৩১ সালে, সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের মৃত্যুর কয়েক মাস পর এবং ১৬৫৩ সালের পূর্বে ইহার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় নাই।"[১৮] ইহার নির্মাণ কাজে দৈনিক বিশ সহস্র লোক নিযুক্ত করা হয় এবং ইহাতে তিন কোটি টাকা খরচ হয়। তাজমহলের নক্সা প্রণয়নকারী লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। মুঘল ঐতিহাসিকদের মতানুসারে, ঈসা আফেন্দী নামক একজন তুর্ক-ভারতীয় ইহার নক্‌শাকারী। ভিনসেন্ট স্মিথ ইহার নক্‌শার গৌরব দিয়াছেন ফরাসি বা ইটালিয়ান এক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে। কিন্তু মুঘল আমলের সমসাময়িক অন্য কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এই কথা কখনও উল্লেখ করেন নাই যে, তাজের নকশা অংকন করেন কোন বিদেশী স্থপতি। ইমারতটিকে বিশদভাবে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ইহাতে ইউরোপীয় পদ্ধতির চাইতে মুঘল- ভারতীয় পদ্ধতির অনুকরণই বেশি।

তাজমহল

আগ্রা ও দিল্লীতে শাহজাহান যে দুইটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন, তন্মধ্যে প্রথমটি, ফারগুসনের (Fergusson) মতে, অতি সুরুচিপূর্ণ। অপরদিকে দিল্লীর প্রাসাদটি যদি সামগ্রিকভাবে বিচার করা হয়, তবে তাহা শাহজাহানের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে। যেমন ফতেহপুর সিক্রি আকবরের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে। কিন্তু শাহজাহানের রাজত্বকালের স্থাপত্য শিল্পের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন মনে হয় আগ্রা দুর্গে অবস্থিত 'মোতি মসজিদ'। সেই অতুলনীয় ইমারতে শ্রেষ্ঠ মুঘলগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতি নিখুঁত ও সৌন্দর্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। রাজপ্রাসাদসমূহ, উদ্যানসমূহ, মোতি মসজিদ, তাজমহল, দিওয়ান-ই-খাস, দিওয়ান-ই-আম, ঈদগাহ ও দিল্লীর জামে মসজিদ ছাড়াও শাহজাহান লাহোরে রাজপ্রাসাদ ও উদ্যানসমূহ, কাবুলে একটি দুর্গ, প্রাসাদ ও মসজিদ, কাশ্মীরে রাজকীয় ইমারতসমূহ, আজমীর, আহমদাবাদ ও অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন ভবনাদি, মুখলিশপুরের প্রাসাদসমূহ এবং কান্দাহার ও অন্যান্য স্থানের দুর্গসমূহ নির্মাণ করেন। এই সমস্ত ইমারত নির্মাণ করিবার জন্য শাহজাহান যথেষ্ট টাকা-পয়সা খরচ করেন।

আওরঙ্গজেব ঃ স্থাপত্য শিল্পের প্রতি নজর দিবার মত সময় সম্রাট আওরঙ্গজেবের ছিল না। তাঁহার পূর্ব-পুরুষের সহিত তুলনামূলকভাবে তিনি অনেক কম ইমারতই নির্মাণ করেন। তাঁহার রাজত্বের সময় নির্মিত উল্লেখযোগ্য ইমারতগুলির মধ্যে সবচাইতে উত্তম বোধ হয় লাহোরের বাদশাহী মসজিদ, যাহাকে মুঘল পদ্ধতির স্থাপত্য শিল্পের সর্বশেষ নমুনা বলিয়া মনে করা হয়। আরেকটি উল্লেখযোগ্য ইমারত দিল্লিতে অবস্থিত জিনাত-উন-নেসার মসজিদ। এইগুলি ছাড়াও আওরঙ্গজেব কর্তৃক নির্মিত বিশেষ ভবনগুলির মধ্যে রহিয়াছে দিল্লী দুর্গের ভিতরে নির্মিত ছোট মার্বেল মসজিদ, বেনারসের মসজিদ এবং মথুরার মসজিদ। নিজের কবরের জন্য তিনি কোন সৌধ নির্মাণ করেন নাই। কারণ, তিনি ইহাকে ইসলাম কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ বলিয়া মনে করেন।

বাদশাহী মসজিদ

মুঘল চিত্রশিল্প ঃ মুঘল আমলের চিত্রশিল্পের ইতিহাস সেই আমলের স্থাপত্য শিল্পেরই অনুরূপ। যতদিন সাম্রাজ্য সমৃদ্ধিশালী ছিল, ততদিন এই শিল্পও সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং পতনের সঙ্গে ইহারও পতন ঘটে। মুঘল ইমারতসমূহের পদ্ধতি ও নক্‌শা যেরূপ প্রথমত

সম্রাট আকবর কর্তৃক পারস্য হইতে উদ্ভাবিত হয় এবং পরে ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে মিশিয়া একটি পারস্য ভারতীয় বা মুঘল পদ্ধতির সংমিশ্রণ হয়, ঠিক তেমনি মুঘল আমলের চিত্রশিল্পও যদিও মূলত পারস্য পদ্ধতির, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল পারস্য ও হিন্দু ভাবধারার সংমিশ্রণ। যাহার ফলে ভারতে মুঘল ও রাজপুত নামে দুইটি চিত্রশিল্প শাখা গড়িয়া উঠে, যাহাদের প্রত্যেকটিই তাহাদের উন্নয়নের জন্য তৈমুরের বংশধরদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার নিকট ঋণী। মুঘল শাখাটি "ইহার কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখে দরবারের কিছুটা বস্তুতান্ত্রিক জীবনের ছবি অংকন, ইহার রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি, শোভাযাত্রা, শিকার অভিযান এবং প্রাচ্যের একটি সমৃদ্ধিশালী বংশের সমস্ত নয়নাভিরাম, যদিও পৈশাচিক জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্যের ছবি অংকনে"; অপরদিকে ভারতীয় চিত্রশিল্পীরা "শারীরিক ও মানসিক দিক হইতে আর অধিক একটি জটিল পারিপার্শিকতায় থাকিয়া এবং হিন্দু পৃষ্ঠপোষকদের জন্য কাজ করিয়া ভারতীয় পৌরাণিক ব্যক্তিগত বিষয়ের এবং তাহাদের মাতৃভাষার জীবন ও চিন্তাধারা এবং ইহার আদর্শের চিত্র অংকন করে।"[১৯]

সম্রাট বাবর যদিও নকশা বা ছবি আঁকিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহার অতি গভীর পর্যালোচনা শক্তি এবং প্রকৃতির প্রতি তাঁহার একাগ্র আকর্ষণের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, তিনিও একজন জন্মগত শিল্পী। ভারতে চিত্রশিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বাবর কোন চেষ্টা চালান বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাঁহার আত্মজীবনচরিতের আলওয়ার পাণ্ডুলিপির ফার্সি অনুবাদ হইতে মনে হয় যে, তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু সংখ্যক চিত্রশিল্পী কাজ করেন। সেই পাণ্ডুলিপির চিত্রগুলিকে তাঁহার রাজত্বের সময় প্রচলিত পদ্ধতির অনুরূপ বলিয়া মনে করা যায়।

বাবর

সম্রাট হুমায়ুনের ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবন তাঁহাকে ভারতে চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে দেয় নাই, কিন্তু পারস্যে নির্বাসিত থাকাকালে তাঁহার মধ্যে চিত্রশিল্পের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়া যায়। কাবুলে পুনরায় ফিরিয়া যাইবার পর ১৫৫০ সালে তিনি মীর সৈয়দ আলী ও খাজা আব্দুস সামাদকে নিমন্ত্রণ করেন। এই দুই চিত্রশিল্পী হুমায়ুন ও বাল্যকালের আকবরকে চিত্রশিল্প সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করেন। এই দুইজন চিত্রশিল্পীকে 'দাস্তান-ই-আমীর হামজা' গ্রন্থের চিত্ররূপ দিতে বলা হয়। কিন্তু সম্রাট হুমায়ুনের অকাল মৃত্যুর ফলে চিত্রশিল্পের এই মহান কাজ পূর্ণ সমাধা করা সম্ভব হয় নাই।

হুমায়ুন

মুঘল চিত্রশিল্প উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে। তিনি চিত্রশিল্পের একটি আলাদা বিভাগ খুলিয়া ইহাকে খাজা আব্দুস সামাদের তত্ত্বাবধানে দেন। তিনি এই বিভাগের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হইতে চিত্রশিল্পীদিগকে আহ্বান করা হয় এবং যদিও তাহারা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, কিন্তু উত্তম প্রকৃতির চিত্রশিল্প প্রস্তুত করাই ছিল তাঁহাদের আদর্শ। খাজা আবদুস সামাদকে 'শিরিন কলম' বা 'মধুর কলম' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আগ্রায় তাঁহাকে অতি উচ্চ 'টাঁকশালের তত্ত্বাবধায়ক' পদ প্রদান করা হয় এবং পরে দিওয়ান বা রাজস্ব আদায়কারীর পদ দিয়া তাঁহাকে মুলতানে পাঠান হয়।

আকবর

চিত্রশিল্পের প্রতি আকবরের উৎসাহের ব্যাপারে আবুল ফজল বলেন, তাঁহার সময় অনেক চিত্রশিল্পী যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। প্রত্যেক সপ্তাহে চিত্রশিল্পের কাজগুলি সম্রাটকে

দেখান হয় এবং এ চিত্রের গুণ অনুযায়ী তিনি শিল্পীদের বেতন বৃদ্ধি করেন এবং পুরস্কৃত করেন। চিত্রশিল্পীদের প্রয়োজনীয় মাল-মসলার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। রঙের সংমিশ্রণ বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করে, যাহার ফলে চিত্রগুলি এই পর্যন্ত কল্পনাতীত পূর্ণতা লাভ করে। এক শতেরও অধিক চিত্রশিল্পী এই শিল্পের বিখ্যাত শিল্পবিদ হন, অপরদিকে যাহারা পূর্ণ শিল্পীর পর্যায়ে উন্নীত হন, তাহাদের সংখ্যা অনেক বেশি। আকবরের দরবারে বিদেশী চিত্রশিল্পীদের সংখ্যা খুব বেশি নহে এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু। প্রধান মুসলিম শিল্পবিদ হইলেন আব্দুস সামাদ, মীর সৈয়দ আলী ও ফারুক বেগ। হিন্দু শিল্পীদের মধ্যে রহিয়াছেন দশবন্ত, সান্যাল দাস, তারা চান্দ, জগন্নাথ ও অন্যান্য। আকবরের রাজত্বকালে চেঙ্গিসনামা, রামায়ণ, কলিলা ওয়া দিমনা, আয়ারদানিশ, জাফরনামা, নলদমন ও রাজাম্‌নামাহ্ গ্রন্থাবলির চিত্ররূপ দেওয়া হয়।

জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীর স্বয়ং একজন চিত্রশিল্পী এবং চিত্রশিল্পের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। তিনি চিত্রশিল্পীদের এত বড় প্রশংসাকারী যে, কোন চিত্র তাঁহাকে দেখানো হইলে শিল্পীর নাম না দেখিয়াই তিনি বলিয়া দিতে পারেন উহা কাহার অংকিত চিত্র। অনেক শিল্পীর দ্বারা অংকিত কোন ছবিতে যদি অনেকগুলি চিত্র থাকে, তবে তিনি সহজেই বলিয়া দিতে পারেন কোন চিত্র কোন শিল্পীর কর্তৃক অংকিত। এমনকি যদি কোন চিত্রের চক্ষুর ভুরুদ্বয় অন্য একজন শিল্পী অংকিত, তবুও তিনি বলিয়া দিতে পারেন আসল চিত্র কে অংকন করিয়াছে এবং ভুরুদ্বয় কে অংকন করিয়াছে।

ফারুক বেগ, মুহাম্মদ নাদের ও মুহাম্মদ মুরাদ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের বড় চিত্রশিল্পী। আকা রেজাকে সম্রাট জাহাঙ্গীর 'নাদের উজ-জামান' উপাধিতে ভূষিত করেন। ওস্তাদ মনসুরের উপাধি 'নাদের উল আসার'। হিন্দুদের মধ্যে বীষণ দাস, কেশব ভ্রাতৃদ্বয়, মনোহর, মাধব ও তুলসী প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী। জাহাঙ্গীরের সময় চিত্রশিল্প পুরাপুরি ভারতীয় রূপ ধারণ করে। ক্ষুদ্র চিত্রশিল্পে মুঘল শাখা জাহাঙ্গীরের সময় ইহার উৎকর্ষতার চরম শিখরে আরোহণ করে। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুঘল চিত্রশিল্পের উৎসাহও অন্তর্হিত হয়।

শাহ্‌জাহান

সম্রাট শাহ্‌জাহানের সময় চিত্রশিল্পের তেমন বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই। কারণ, তিনি চিত্রশিল্পের চাইতে স্থাপত্য শিল্পের প্রতি অধিক নজর দেন। তাঁহার রাজত্বকালে কিছু সংখ্যক অভিজাত চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তন্মধ্যে আসফ খান অন্যতম। যুবরাজ দারা শিকোহও চিত্রশিল্পের একজন বড় ভক্ত এবং ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে চেষ্টা করেন। শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী মীর হাসান, অনূপা চিত্র ও চিত্রমণি।

আওরঙ্গজেব

সম্রাট আওরঙ্গজেবও চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষক নহেন। কারণ, তিনি ইহাকে একটি অনৈসলামিক কাজ বলিয়া মনে করেন। পূর্বেকার শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় অংকিত অনেক মুখাবয়ববিশিষ্ট চিত্র তিনি বিকৃত করিয়া দেন। তাহা সত্ত্বেও চিত্রশিল্পীরা তাঁহাদের কাজ চালাইয়া যান। বর্তমানে অনেক চিত্রকর্ম দেখা যায়, যেখানে আওরঙ্গজেব কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতেছেন।

সঙ্গীত বিদ্যা ঃ মুঘল আমলে সঙ্গীত বিদ্যার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব ব্যতীত সমস্ত মুঘল সম্রাটই এই সুকুমার বিদ্যায় উৎসাহী ছিলেন। বাবর

শুধুমাত্র গায়কদের প্রশংসাই করেন নাই, বরং নিজেও সঙ্গীতের একজন বড় ভক্ত। তিনি শুধু সঙ্গিত পছন্দ করেন নাই, বরং কবিতাও লেখেন। সম্রাট হুমায়ুনও সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়কদের ভক্ত ছিলেন। তিনি সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞের এতবড় প্রেমিক ছিলেন যে, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত যুদ্ধবন্দিদের মধ্য হইতে সঙ্গীতজ্ঞদিগকে তিনি মুক্তি দিয়া দিতেন। আকবরও সঙ্গীতের একজন বড় ভক্ত। তাঁহার দরবারে বিভিন্ন ভাষাবিদ সঙ্গীতজ্ঞদের সমাগম হয়; যথা হিন্দু, ইরানী, তুরানী, কাশ্মীরি—নর ও নারী উভয় শ্রেণীর। দরবারের সঙ্গীতজ্ঞদিগকে সপ্তাহে এক ভাগ হিসাবে সাত ভাগে ভাগ করা হয়। আবুল ফজল ৩৬ জন গায়ক ও বিভিন্ন যন্ত্রের সঙ্গীতজ্ঞদের তালিকা প্রস্তুত করেন। আকবর নিজেও একজন সঙ্গীতজ্ঞ, বিশেষ করিয়া 'নাকারা' রাগে। আকবরের রাজত্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক মিয়া তানসেন। অন্যান্য বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে বাবা রামদাস, বৈজু বাওলা এবং সুরদাস অন্যতম। আকবরের সময় বিভিন্ন প্রকারের সঙ্গীতের সংমিশ্রণ ঘটাইয়া একটি নূতন ভারতীয় সঙ্গীতের উদ্ভাবন করা হয়।

পিতার ন্যায় সম্রাট জাহাঙ্গীরেরও সঙ্গীতের প্রতি ঝোঁক ছিল। তাঁহার দরবারে তিনি বিপুল সংখ্যক সঙ্গীতজ্ঞ রাখেন। তিনি নিজেও অনেক হিন্দি গান রচনা করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মুহাম্মদ সালেহ ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ হিন্দি গানের শ্রেষ্ঠ গায়ক। জগন্নাথ ও বিকানীরের জনার্দন ভট্ট বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। সম্রাট শাহজাহানও সঙ্গীতের একজন বড় ভক্ত। তিনি মৌখিক ও যান্ত্রিক উভয় প্রকৃতির সঙ্গীত শ্রবণ করেন এবং আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁহার গলার সুর এত মধুর ও আকর্ষণীয় যে, "অনেক খাঁটি আত্মার সূফী ও পবিত্র ব্যক্তিবর্গ, যাহাদের অন্তর বিশ্ব হইতে উঠিয়া গিয়াছে এবং যাহারা বৈকালিক এইসব আসরে উপস্থিত থাকেন, তাঁহার (শাহজাহান) গানের উদ্দীপ্ত উল্লাসে জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন।"[২০] রামদাস ও মহাপাত্র ছিলেন প্রধান গায়ক, যাহারা শাহজাহানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব সঙ্গীতশিল্পে যথেষ্ট জ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু যেহেতু ইসলামে ইহা নিষিদ্ধ, সুতরাং তিনি তাহার দরবার হইতে গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞদিগকে বিদায় করিয়া দেন।

পাদটীকা

১। The chroniclers who generally belonged to the middle classes found life hard, as is evidenced by their observations regarding the price of food under different dynasties. —Ishwari Prasad.

২। ...... they settled down in India and felt that they were not only rulers of India, but that they also belonged to India. The Mughals like many of their Turki-Afghan predecessors looked upon Hindustan as their own land. —M.L. Raychoudhury: *The State and Religion in Mughal India.* পৃঃ ৩১৩, ৩১৪।

৩। Of course, it was a legal disability to the Hindus, but its redeeming feature lay in the unifying effect which the system produced. —M. L. Raychudhury : প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৫।

৪। The Hindu festivals of Rakhi, Baisakhi, Dashera, Shivaratri, Holi,

Basanta, Panchami; the Muslim, 'Id, Ramzan, Shab-i-Barat, Chehlam, Fatiha-i-Doazdaham; the Persian Minabazar, Naw-ruz, Aban; the Parsee Ardibisht, Khordad, Bahman; the Christian Christmas, Easter and Michael Mass were enjoyed by the people of the empire, and the Mughal Emperors utilized them as occasions for social reunion and meetings. —M. L. Raychoudhury: *Religious policy of the Mughals.* পৃঃ ৩১৫।

৫। Agra and Fatehpore are two very great cities, either of them much greater than London and very populous. Between Agra and Fatehpore are twelve miles, and the way is a market of victual and other things, as full as though a man were still in a town, and so many people as if a man were in a market.—K. K. Datta: quoted from Fitch: *An Advanced History of India:* পৃঃ ৫৭০.

৬। The main features of the agricultural system and the character of the crops grown in different parts of the country differed little from those of today. —Edwardes and Garret: *Mughal Rule in India.*

৭। If they (revenue collectors) act economically (or with attention to minute details) after inquiry into the true state of the crops and cultivators of every village, and exert themselves to bring all the arable lands under tillage and to increase the cultivation and the total standard revences so that the parganas may become cultivated and inhabited, the people prosperous and the revenue increased, then if any calamity does happen, the abundane of cultivation will prevent any great loss of revenue occurring. Quoted from J. N. Sarker. Mughal Administraton. পৃঃ ২১৪, ২১৫.

৮। One of most important factors in the economic history of India during the period under review was the extensive and varied industrial activity of the people which besides supplying the needs of the local aristocracy and merchants could meet the demands of traders coming from Europe and other parts of Asia. —*An Advanced History of India.* Page 572.

৯। The Mughal Government was forced to supply its own wants by becoming a producer of nearly everything it required—J.N. Sarkar: *Mughal Administration.*

১০। ...... more than a hundred offices and workshops, each resembling a city or rather a little Kingdom.— আইন-ই-আকবরী ১ম খণ্ড পৃঃ ১২।

১১। Within the fortrees large halls are seen in many places called Karkhana or workshop for the artisans. In one hall embroiders are busily employed, superintended by a master. In another you see goldsmiths; in a third painters, in a fourth Varnishers in lacquer work, in fifth joinners, turners, tailors, shoe-makers; in a sixth manufacturers of silk, brocade, and those fine Muslins of which are made turbans, girdles and golden flowers, and (the fine) drawers worn by females ... beautifully embroidered with needle work.— Bernier: *Travels*, পৃঃ ২৫৯।

১২। By far the most extensive industy in India during the Mughal period was the manufacture of cotton goods, which were sold both locally and abroad. —Edwardes and Garrett: *Mughal Rule in India.*

১৩। In Mughal India, as in medieval Europe education was a branch of religion and the educational expenditure of the State was defrayed out of the Alms Fund and through the hands of the imperial Almoner (Sadur us Sadur)—Sarkar: প্রাগুক্ত।

১৪। If ever there was a case when the testimony of a single historical document, unsupported by any other evidence should be accepted as sufficient proof, it is the case with Babar's Memoirs —S. Lane Poole: *Babar*।

১৫। They (the Mughals) and their empire, their military and executive arrangements have passed beyond recall, but their architectural achievements, expressive of their genius and personality, have rendered them immortal.—Edwardes and Garrett : *Mughal Rule in India.*

১৬। Akbar took a keen interest in buildings, and according to Abul Fazl, he was a great friend of good order and propriety in business and kept control over the price of building materials, the wages of craftsmen and collected data for framing proper estimates.—Ishwari Prasad: *A Short History of Muslim Rule in India.*

১৭। A salient feature also of the work of his reign is the open work tracery which ornaments the finest buildings, and the apt combination of spacious design with an almost feminine elegance.—Edwardes and Garrett. প্রাগুক্ত।

১৮। The Taj Mahal which has been described by so many admirers and is certainly one of the unrivalled beauties of this world, was commenced in 1631, a few months after the death of the empress

Mamtaj Mahal and was not finally completed until 1653,—Edwardes and Garrett: প্রাগুক্ত।

১৯। "The Mughal school continued itself to portraying the somewhat materialistic life of court, with the State functions, processions, hunting expedetions, and all the picturesque although barbaric pageantry of an affluent Oriental dynasty," while the Hindu artists, "living mentally and bodily in another and more abstract environments, and working for Hindu patrons, pictured scenes from the Indian classics, domestic subjects and illustrations of the life and thought of their motherland and its creed"—Percy Brown: *Indian Paintings under the Mughals.*

২০। যদুনাথ সরকার : প্রাগুক্ত।

গ্রন্থপঞ্জি

Abul Fazl : *Ain-i-Akbari*

J.N. Sarkar : *Mughal Administration*

M.L. Raychoudhury : *Religious Policy of the Mughals*

Percy Brown : *Indian Painting under the Mughals*

Fergusson : *History of Indian and Eastern Architecture*

Richmand : *Moslem Architecture*

Bernier : *Travels*

Edwardes & Garrett : *Mughal Rule in India*

Ishwari Prasad : *A Short History of Muslim Rule in India.*

তৃতীয় খণ্ড

ব্রিটিশ শাসন

(ভারতীয় মুসলমানগণ)

প্রথম অধ্যায়
ইউরোপীয় বণিকদের আগমন

পর্তুগীজদের আগমন ঃ খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ইউরোপীয় বণিকগণ আরবদের মধ্যস্থতা উপেক্ষা করিয়া ভারতের সহিত প্রত্যক্ষ বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উৎসুক হইয়া উঠে। ভারতের নূতন সমুদ্রপথ আবিষ্কার করিবার জন্য পর্তুগালের রাজ-সরকার নাবিকদের যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিয়া যান। ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দে বার্থোলোমীয় ডাজ (Bartholomew Diaz) নামে জনৈক পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার উপকূল বাহিয়া অবশেষে ভারত মহাসাগরের উত্তমাশা অন্তরীপে পৌছেন। ইতালীয় নাবিক কলম্বাস স্পেন রাজের আনুকূল্যে ভারতের বাণিজ্য পথ আবিষ্কার করিতে বার বার প্রয়াস পান এবং ঘটনাক্রমে আমেরিকা আবিষ্কার (১৪৪২ সাল) করিয়া উহার নাম দেন 'ইন্ডিজ'। পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা (Vasco-Da-Gama) আসিয়া ভারত আবিষ্কার করিলে আমেরিকার নূতন নাম হয় 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ' (West Indies) এবং দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-খণ্ডকে 'ইস্ট ইন্ডিজ' (East Indies) লেখা শুরু হয়। ডাজের পথ অনুসরণ করিয়া ১৪৯৮ সালে বিশ্ববিশ্রুত পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের উপকূলে আসিয়া উপনীত হন এবং কালিকটে অবতরণ করেন। ১৫০০ সালে কাব্রাল (Cabral) নামে আরেকজন পর্তুগীজ নাবিক কালিকটে এক বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। আরবগণ পর্তুগীজদের বিরোধিতা করায় কালিকটের হিন্দু রাজা সামুদ্রিন বা জামেরিনও তাহাদের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠেন। ১৫০৪ সালে পর্তুগীজগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, তাঁহারা ভারত ভূখণ্ড আবিষ্কারের চেষ্টা করিবেন না। শুধু ব্যবসার নিরাপত্তার খাতিরে যেখানে প্রয়োজন দুর্গ স্থাপন করিবেন, কিন্তু মালাবার উপকূলে যত বড় সম্ভব একটি নৌবাহিনী মোতায়েন রাখিবেন এবং ভারতে তিন বৎসর থাকিবার জন্য একজন শাসনকর্তা পাঠাইবেন। ফ্রান্সিসকো-দ্যা-আলমেডাকে (Franchisco-de-Almeida) অতএব ভাইসরয় উপাধি দিয়া নিযুক্ত করা হয়। তিনি ভারতে ১৫০৯ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন।

বার্থোলোমীয় ডাজ
ভাস্কো ডা গামা
(১৪৯৮)
প্রথম ভাইসরয়

১৫০৯ সালে আলবুকার্ক (Albuquerque) এই দেশে পর্তুগীজদের গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনিই ভারতে পর্তুগীজ শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ১৫১০ সালে তিনি গোয়া বন্দর আধিকার করিয়া লন। ভারতে তাহাই হইল ইউরোপীয় অধিকারের সূত্রপাত। দাক্ষিণাত্যের শিয়াদের সহিত উত্তরের সুন্নীদের এবং সাধারণভাবে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ক্রমান্বয় সংঘর্ষের ফলে মুষ্টিমেয় পর্তুগীজদের আধিপত্য বাড়িতে থাকে। সাল-সেটি, বেসিন, দমন, দিউ, বোম্বাই, সানথোম (মাদ্রাজের নিকটে) ও সিংহলের বহু স্থানে এবং বাংলাদেশের

হুগলি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বন্দরে তাহারা বাণিজ্য কুঠি এবং উপনিবেশ স্থাপন করে। এইজন্য বাংলা ভাষায় অনেক পর্তুগীজ শব্দ মিশিয়া যায়। কিন্তু পর্তুগীজদের পরধর্ম-বিদ্বেষ, দুর্নীতি ও অকথ্য অত্যাচারের ফলে ভারতীয় রাজা ও প্রজারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন। এই দোষেই এশিয়ার বিরাট পর্তুগীজ সাম্রাজ্য শীঘ্রই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। অথচ পারস্য উপসাগর হইতে সুদূর চীন ও জাপান পর্যন্ত বিরাট ভূ-ভাগে তাহারা অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। এদিকে পর্তুগীজরা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিকেও ভারতবর্ষে আসিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে দিত না। তখন একদিকে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির জলপথে প্রতিকূলতা এবং স্থলপথে ভারতীয় রাজাদের সহিত সংঘর্ষের ফলে অধিকাংশ বন্দর হইতে পর্তুগীজদিগকে বিদায় লইতে হয়। ভারতের স্বাধীনতার সময় তাহাদের হাতে কেবল গোয়া, দমন ও দিউ অবশিষ্ট থাকে।

আলবুকার্ক
উপনিবেশ স্থাপন
পর্তুগীজদের
অধিকারের অবসান

অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি : পর্তুগীজদের দেখাদেখি অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিও ভারতে বাণিজ্য করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৬০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রানী এলিজাবেথের নিকট হইতে 'পূর্ব সমুদ্রে' বাণিজ্যের এক অনুমতিপত্র লাভ করে। ইহার কিছু পূর্বে উক্ত রানীর রাজত্বকালে ইংরেজ নাবিকগণ স্পেন রাজের নৌবহর ধ্বংস করিয়া স্পেনীয় রাজ্যের ভিত্তি কাঁপাইয়া তোলে এবং ড্রেক (Drake) প্রমুখ ইংরেজ নৌবীরগণ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া বিশ্বব্যাপী বৃটিশ সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পান। ১৬০২ সালে ওলন্দাজ ডাচগণ ইউনাইটেড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করেন। ১৬১৬ সালে দিনেমার বা ডেনগণ ভারতে বাণিজ্যার্থে আরেকটি কোম্পানি গঠন করেন। ১৬৬৪ সালে ফ্রেঞ্চ ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়। তারপর ১৭২২ সালে বেলজিয়ামের ফ্লেমিশ বণিকগণ অস্টেণ্ড কোম্পানি নাম দিয়া নিজেদের এক বণিক সংঘ গঠন করেন এবং সর্বশেষ ১৭৩১ সালে সুইডেনের বণিকগণ আরেকটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করেন। এই সকল বণিক সংঘের মধ্যে ফ্লান্ডার্সের অস্টেণ্ড কোম্পানি ব্যবসায় কখনই বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই, আর সুইডেনের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য চলে প্রধানত চীন দেশের সঙ্গে। অন্যান্য কোম্পানিগুল ভারতেই নিজেদের কার্যক্ষেত্র প্রসারের চেষ্টা শুরু করে।

ইংরেজ কোম্পানি ১৬০০
ডাচ কোম্পানি (১৬০২)
ডেনিশ কোম্পানি (১৬১৬)
ফ্রেঞ্চ কোম্পানি (১৬৬৬৪)
অস্টেণ্ড কোম্পানি (১৭২২)
সুইডেনের কোম্পানি (১৭৩১)

ক্যাথলিক ফরাসি ও পর্তুগীজদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয় প্রটেস্টান্ট ডাচ (ওলন্দাজ) ও ইংরেজগণ। ডাচগণ মাদ্রাজের উত্তরে পলিকট নামক স্থানে তাহাদের প্রথম বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে (১৬০৯)। পরে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির নাগাপত্তন (Nagapatan) নামক স্থানে তাহাদের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয় (১৬৬০)। কিন্তু ভারতে ডাচদের ক্ষমতা খুব বেশি ছিল না। তাহাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, সেলিবিস এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের (East Indies) অন্যান্য দ্বীপে। ১৬১৯ সালে তাহারা জাভার অন্তর্গত বাটাভিয়ায় (Batavia) কুঠি স্থাপন করে। উহাই ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজধানী। এইখানে ডাচ পণ্ডিতগণ এশিয়ার সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক গবেষক সমিতি (Batavia Samity) প্রতিষ্ঠা করেন (১৭৭৮)।

ডাচদের
অধিকার

১৬৭৬ সালে কলিকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুরে দিনেমারদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়। কিন্তু ব্যবসায়ে সুবিধা না হওয়ায় ১৮৪৫ সালে তাহারা বৃটিশ সরকারের নিকট তাহাদের কুঠিগুলি বিক্রয় করিয়া চলিয়া যায়। রেভারেন্ড কেরী (Rev. Carey), ডাঃ মার্শম্যান (Dr. Marshman) প্রমুখ ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের বিখ্যাত শ্রীরামপুর ছাপাখানা, কাগজের কল ও কলেজ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় শ্রীরামপুরে স্থাপিত হয়। কাগজের দলিলে ডেন রাজের দানপত্র উদ্ধৃত আছে।

দিনেমারগণ

পর্তুগীজদের পর ডাচ, ইংরেজ ও ফরাসি এই তিনটি জাতিই পূর্ব সমুদ্রে আধিপত্য করিতে থাকে। একই কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির বণিকগণ বাণিজ্য করিতে থাকায় তাহাদের মধ্যে কলহ ও বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। ডাচগণ সিংহল ও বিশাল প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত থাকায় ভারতে ইংরেজ ও ফরাসিগণ পরস্পর বিরোধিতা করিতে থাকেন। সমুদ্রে পর্তুগীজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের গতি প্রতিহত করিবার চেষ্টা একমাত্র ভারতীয় নাবিক ও বণিক সংঘই বিভিন্ন ক্ষেত্রে করিয়াছিল। তবে সমবেতভাবে কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। সেই সময় গুজরাটি, মালাবারি, মারাঠা এবং বাংলার রণপোত ও বাণিজ্য জাহাজের কর্মতৎপরতায় ও দৌরাত্ম্যে ইউরোপীয় বণিক রাষ্ট্র সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রনীতির অভাবে এবং স্থানীয় রাজাদের উদাসীনতার জন্য ভারতীয় নাবিক সংঘ ঐক্যবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিবার সুযোগ পায় নাই। ভারতীয় নাবিকদের এত শৌর্য সাহস ও রণদক্ষতা মুঘল সম্রাটগণ কোন কাজেই লাগাইতে পারেন নাই। ফলে দলে দলে এদেশীয় নাবিকগণ ইউরোপীয় জাহাজে কর্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদেরই শক্তি বৃদ্ধি করে। নৌশক্তি বিবর্জিত ভারত এই প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতা হারায়।

ইউরোপীয়গণ পূর্ব সমুদ্রে কিভাবে আধিপত্য বিস্তার করে

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঃ পর্তুগীজদের পদাংক অনুসরণ করিয়া ইংরেজগণও প্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে উৎসাহী হয়। ১৫৮০ সালে ফ্রান্সিস ড্রেন সমুদ্রপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া ইংল্যান্ড পৌছেন। পুনরায় রাল্‌ফ ফিচ্ (Ralph Fitch) ভারত ও বার্মা সফর করিয়া যখন ইংল্যান্ড পৌছেন, ইংরেজগণ প্রাচ্যের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। ইতোমধ্যে স্পেনীয় নৌবহরের বিরুদ্ধে এক নৌযুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভের ফলে ইংরেজ নাবিকগণ আরও উৎসাহিত হইয়া উঠেন। ১৫৯৯ সালে জন মিল্ডেন হল্ (John Mildenhall) স্থলপথে ভারত পৌছেন। ১৬০৮ সালে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিন্স (Captain William Hawkins) ইংরেজ রাজ প্রথম জেমসের নিকট হইতে একটি পত্র লইয়া মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সামনে উপনীত হন। সম্রাট জাহাঙ্গীর হকিন্সকে সমাদরে গ্রহণ করেন এবং ইংরেজদিগকে সুরাটে একটি বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতএব ১৬১২ সালে ইংরেজগণ গুজরাটের মুঘল শাসনকর্তার নিকট হইতে সুরাট, ক্যাম্বে ও অন্যান্য দুইটি স্থানে বাণিজ্যের অনুমতি লাভ করেন। ঐ বৎসরই এক জল-যুদ্ধে পর্তুগীজদিগকে পরাজিত করিয়া ইংরেজ বণিকগণ সুরাটে এক কুঠি স্থাপন করেন। তারপর ১৬১৫ সালে আরেকটি নৌযুদ্ধে

ইংরেজ নাবিকের জলপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ
সুরাটে কুঠি স্থাপন
পর্তুগীজদের পতন
মাদ্রাজ (১৬৩৯)
বোম্বাই (১৬৬৮)
কলিকাতা নগরির পত্তন

ইংরেজদের হাতে পর্তুগীজদিগকে আবার পরাজয় স্বীকার করিতে হয় এবং ১৬২২ সালে ইংরেজগণ পর্তুগীজদের নিকট হইতে পারস্য উপসাগরে ওরমুজ বন্দর অধিকার করেন। এই পরাজয়ের পর পূর্ব সমুদ্রে পর্তুগীজদের প্রভুত্ব চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৬৩৯ সালে ফ্রান্সিস ডে নামের জনৈক ইংরেজ স্থানীয় মালিকের নিকট হইতে করমণ্ডল উপকূলে কিছু জমি ইজারা লাভ করেন। সেখানে একটি বাণিজ্য কুঠি এবং সেন্ট জর্জ নামে এক দুর্গ স্থাপিত হয়। কালক্রমে এখানেই মাদ্রাজ শহরটি গড়িয়া উঠে। ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগাল রাজকুমারী ক্যাথারিনকে বিবাহ করিয়া যৌতুক স্বরূপ বোম্বাই দ্বীপ লাভ করেন (১৬৬১)। চার্লস বাৎসরিক মাত্র দশ পাউন্ড খাজনায় উহা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ইজারা দিয়া দেন (১৬৬৮)। ধীরে ধীরে পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হইয়া উঠে। ১৬৯০ সালে জব চার্নক নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মচারী ভাগীরথী নদীর তীরে সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কালিঘাট প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম লইয়া কলিকাতা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে একটি দুর্গ স্থাপিত হয় এবং ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামানুসারে দুর্গের নাম রাখা হয় 'ফোর্ট উইলিয়াম'। "ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে যে দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহাই কোম্পানির সুযোগ"—সুচতুর, কর্মপটু ও দূরদর্শী ডিরেক্টর স্যার যোশিয়া চাইল্ড ইহা বুঝিতে সক্ষম হন। সেই কালে নাদির শাহের আক্রমণে মুঘল শক্তি বিধ্বস্ত, বাজিরাও-এর মৃত্যুতে মারাঠা জাতি বিচ্ছিন্ন ও লুণ্ঠনপরায়ণ এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গ দুর্বল ও পরস্পর বিবদমান। এই অপূর্ব সুযোগে ভারতে ইংরেজদের প্রভুত্ব ও অধিকার বিস্তার লাভ করে। ভারতে ইউরোপীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কথা প্রথম পর্তুগীজ গভর্নর আলবুকার্ক, পরে ডাচ গভর্নর সোয়েন এবং ফরাসি গভর্নর দুপ্লে ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের স্বপ্নই অবশেষে সত্যে পরিণত হয়। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত-বাণিজ্যে কল্পনাতীত লাভ দেখিয়া ১৬৯৮ সালে আরেকটি ইংরেজ কোম্পানি রাজার নিকট হইতে বাণিজ্যের সনদ লইয়া ভারতে আসিয়া উপস্থিত হয়। একই দেশের দুইটি কোম্পানির মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ায় উভয় কোম্পানি একত্রে সংযুক্ত হইয়া (১৭০২) 'ইউনাইটেড কোম্পানি' নামে ব্যবসা চালাইতে থাকে।

ইংরেজ কোম্পানির ডিরেক্টার যোশিয়া চাইল্ডের ভবিষ্যৎ দর্শন ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা ইউনাইটেড কোম্পানি

ফরাসিদের ইন্ডিয়া কোম্পানি ঃ ফরাসিরা ইংরেজদের অনেক পরে 'পূর্ব সমুদ্রের' ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করে। ১৬৬৪ সালে রাজা চতুর্দশ লুইয়ের অর্থমন্ত্রী কলবার্টের সক্রিয় উদ্যোগে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৬৮ সালে ভারতের সুরাটে ফ্রান্সিস ক্যারন কর্তৃক প্রথম ফরাসি বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। পরবর্তী বৎসর গোলকুণ্ডার নিকট হইতে সনদ লইয়া মারকারা নামে ফরাসি শাসনকর্তা মসুলীপত্তমে আরেকটি ফরাসি কুঠি নির্মাণ করিতে সমর্থ হন। ১৬৭৩ সালে ফ্রান্সিস মার্টিন ও লেস্‌পিনে নামে দুইজন বণিক মাদ্রাজের নিকট কিছু জমি খরিদ করেন। এইভাবে অত্র জায়গায় সাধারণভাবে পণ্ডিচেরীর ভিত্তি স্থাপিত হয় (১৬৭৩–৭৪)। বাংলাদেশে নবাব শায়েস্তা খান ১৬৭৪ সালে ফরাসিদিগকে একটি স্থান মঞ্জুর করেন এবং সেইস্থানে তাহারা প্রসিদ্ধ চন্দননগর ফরাসি কুঠি স্থাপন করে (১৬৯০–৯২)।

প্রথম ফরাসি বাণিজ্য কুঠি পণ্ডিচেরী স্থাপিত ফরাসি অবস্থার পরিণতি বাংলাদেশ কোম্পানির পুনর্গঠন

ডাচ ও ফরাসিদের মধ্যে ইউরোপীয় বিবাদের ফলে ভারতে ফরাসিদের অবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ফরাসিরা তাহাদের ব্যাণ্টাম, সুরাট ও মসুলীপত্তমের কুঠিগুলি পরিত্যাগ করে।

ফরাসী অবস্থার অবনতি

ততদিনে ফরাসি কোম্পানির অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া পড়ে এবং ১৭২০ সাল পর্যন্ত তাহাদের অবস্থা অবনতির চরম শিখরে উঠে।

কিন্তু ১৭২০ সালে কোম্পানির পুনর্গঠনের পর ১৭২০ হইতে ১৭৪২ সালের মধ্যে লেনোয়ের ও ডুমাস এর সুশাসনের ফলে ইহাতে পুনরায় উন্নতি ফিরিয়া আসে। ফরাসিরা ১৭২১ সালে মরিশাস, ১৭২৫ সালে মালাবারের উপকূলে অবস্থিত মাহে এবং ১৭৩৯ সালে কারিকল অধিকার করে। এই সময় ফরাসিদের সম্পূর্ণ অভিপ্রায় ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল। ১৭৪২ সালের পর বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের তলায় চাপা পড়িয়া যায় এবং ফরাসি গভর্নর ডুপ্লে ভারতে ফরাসি সাম্রাজ্য গঠনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে থাকেন। কিন্তু অচিরেই তাহারা ইংরেজগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়।

ফরাসী কোম্পানীর পুনর্গঠন

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

W. Haig : *Cambridge History of India, Vol-V*

P. E. Roberts : *History of British India*

Rushbrook Williams : *History of India (Br. Period)*

John Bruce : *Annals of East India Company, 3 Vols.*

J. N. Sarkar : *Aurangzib and His Times*

H.G. Rawlinson : *British Beginning in Western India.*

C.R Wilson : *Early Annals of the English in Bengal, 3 Vols*

W. Foster : English Factories in India 1618—1669

ইনাম উল হক : বাংলার ইতিহাস : ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনাপর্ব (১৬৮৯–১৭২০)

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইঙ্গ-ফরাসি সংঘর্ষ ও বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয়

দাক্ষিণাত্যে সংঘর্ষ ঃ ফরাসিরা যে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছিল, উহার মূলে ছিলেন ডুপ্লে (Duplex)। চন্দননগরের গভর্নর হিসাবে তিনি ভারতে তাঁহার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। সেখানকার ডুপ্লে কলেজ এখনও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। ১৭৪২ সালে তাঁহাকে পণ্ডিচেরীর গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। ইংরেজ ও ফরাসিদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরী। পণ্ডিচেরীর কিছু দক্ষিণে অবস্থিত সেন্ট ড্যাভিড দুর্গও ছিল ইংরেজদের হাতে। এই তিনটি শহরই সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। নিজ নিজ দেশ হইতে নূতন রসদপত্র আনয়ন ও নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সমুদ্রের উপর তাহাদের নির্ভরশীল থাকিতে হয় প্রবলভাবে। ডুপ্লে ভারতীয় রাজন্যবর্গের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কথা জানিতেন। তিনি বুঝেন, একদল ভারতীয় সৈন্যকে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিয়া লইলে অনায়াসে এই উপমহাদেশে ফরাসি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। সুতরাং তিনি তদনুযায়ী কাজ করিতে লাগিয়া যান। কিন্তু ইহা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ইউরোপে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যায় (১৭৪২)। এই যুদ্ধ "অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ (War of the Austrian Succession) নামে পরিচিত। সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া যায়।

ফরাসি গভর্নর ডুপ্লে
ইউরোপের অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ (১৭৪২)

প্রথম কর্নাট যুদ্ধ (প্রথম ইঙ্গ-ফরাসি সংঘর্ষ) ঃ স্থানীয় ভারতীয় কর্মকর্তাদের হাতে কোন নৌশক্তি ছিল না এবং অচিরেই তাঁহারা স্থলপথের উপর হইতেও কর্তৃত্ব হারান। রাজনৈতিকভাবে সমগ্র কর্ণাট বা করমণ্ডল উপকূল তখন একটি বিশৃঙ্খল অবস্থায় নিপতিত। দাক্ষিণাত্যের মুঘল সুবাদারের অধীনে ইহা একটি প্রদেশ হিসাবে বিদ্যমান ছিল, এবং আর্কটে রাজধানী লইয়া নবাব উপাধিধারী একজন গভর্নরের দ্বারা ইহা শাসিত হইত। কিন্তু যেহেতু দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিজাম-উল-মুলক নিজেকে পুরাপুরিভাবে স্বাধীন করিয়া লইয়াছেন, তাই আর্কটের নবাবও একজন স্বাধীন নৃপতির ন্যায় কার্যকলাপ চালাইতে থাকেন। উত্তর ভারতের ঘটনাবলি ও মারাঠাদের লইয়া নিজাম এতই ব্যস্ত থাকেন যে, তিনি কর্ণাট সফরের কোন সময়ই পান না। এই সুযোগে ১৭৪০ সালে মারাঠারা কর্ণাটে প্রবেশ করিয়া লুটতরাজ করে, ইহার নবাব দোস্ত আলীকে হত্যা করে এবং নবাবের জামাতা চান্দা সাহেবকে যুদ্ধবন্দি হিসাবে সাতারায় লইয়া যায়। দোস্ত আলীর পুত্র সফদর আলী মারাঠাদিগকে এক কোটি টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়া নিজেকে ও রাজ্যকে রক্ষা

কর্ণাটকের বিশৃঙ্খল অবস্থা
চান্দা সাহেব
আনোয়ার উদ্দিনকে নবাব ঘোষণা

করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি তাঁহার একজন চাচাতো ভাই কর্তৃক নিহত হন এবং যাহার ফলে তাঁহার কিশোর পুত্রকে কর্নাটের নবাব বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই সমস্ত কার্যাবলির দ্বারা শান্তি স্থাপনের জন্য নিজাম কর্ণাট সফর করিতে বাধ্য হন। কিন্তু অবস্থা তখন তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে। যদিও নিজাম রাষ্ট্রের একজন বিশ্বস্ত কর্মকর্তা আনোয়ার উদ্দিন খানকে নবাব হিসাবে নিযুক্ত করেন, কিন্তু নবাব দোস্ত আলীর অতি ক্ষমতাশালী আত্মীয়-স্বজনগণ কর্তৃক তাঁহাকে অনধিকার প্রবেশের দায়ে দোষী করার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, স্থানীয় শাসকবর্গের এইসব বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ লইয়া ইউরোপীয়গণ অতি সহজেই তাহাদের ছল-চাতুরী ও ব্যবসা-বাণিজ্য উভয়ই পরিচালনা করিতে থাকে।

ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া গেলে ভারতে ইংরেজগণ পণ্ডিচেরী আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করে (১৭৪৫)। কর্ণাটের নবাব আনোয়ার উদ্দিন তাঁহার রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে ইংরেজগণকে নিষেধ করিয়া পাঠান। নবাব আনোয়ার উদ্দিন খানকে ইতোমধ্যে ফরাসি কূটনীতিক ডুপ্লে হাত করিয়াছিলেন। কিন্তু সংঘর্ষ ইতোমধ্যে বাধিয়া যায়, যখন বার্নেটের অধীনস্থ্ ইংরেজ নৌবাহিনী ফরাসি জাহাজসমূহ অধিকার করিয়া লয়। যেহেতু ভারতের জলপথে ফরাসিদের কোন নৌবহর ছিল না, তাই ডুপ্লে মরিশাসের ফরাসি গভর্নর ও নৌ সেনাপতি মাহে-দ্য-লা-বুরদনের নিকট তাঁহার উদ্ধার কার্যের জন্য অতি জরুরি বার্তা পাঠান। লা বুরদনে শীঘ্রই আসিয়া পড়েন এবং সমুদ্র হইতে অতর্কিতে গোলাবর্ষণ করিয়া মাদ্রাজ অধিকার করিয়া লন (১৭৪৬)। ইংরেজ নৌবহর হুগলির দিকে পলায়ন করে। তিনি ইংরেজদের নিকট হইতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ চার লক্ষ পাউন্ড পাইলে মাদ্রাজ ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু ডুপ্লে তাহাতে সম্মত হইলেন না। এই পর্যন্ত নবাব আনোয়ার উদ্দিন ইংরেজ ও ফরাসি উভয় পক্ষের ব্যবসার স্বার্থ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। মাদ্রাজ অধিকারের পর ডুপ্লে নবাবকে এই বলিয়া প্রতারণা করিতেছিলেন যে, তিনি মাদ্রাজ নবাবের হাতে ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু নবাবকে মাদ্রাজ সমর্পণ করিবার কোন অভিপ্রায় কূটনীতিক ডুপ্লের নাই দেখিয়া আনোয়ার উদ্দিন ফরাসিদের বিরুদ্ধে দশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু ডুপ্লে মাত্র পাঁচশত সৈন্যের সহায়তায় মাদ্রাজের নিকট মৈলাপুর নামক স্থানে কর্ণাট বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। ইতোমধ্যে একটি সামুদ্রিক ঝড় ফরাসি নৌবহরের সমূহ ক্ষতি সাধন করে এবং লা-বুরদনেকে তাহার নৌবহর লইয়া ভারতের সমুদ্র ত্যাগ করিতে বাধ্য করে।

ইঙ্গ ফরাসী সংঘর্ষ
লা-বুরদনে
ডুপ্লে কর্তৃক
নবাবের বাহিনী
পরাজিত

লা-বুরদনের পশ্চাদপসারণের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজগণ পুনরায় সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। এই পরিবর্তনের প্রথম পরিণতি হইল দীর্ঘ আঠার মাস অবরোধের পরও ডুপ্লে কর্তৃক ইংরেজদের সেন্ট ডেভিড দুর্গ অধিকারে ব্যর্থতা। মাদ্রাজ অধিকারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য ইংল্যান্ড হইতে রিয়ার এডমিরাল বসকাবেনের (Boscawen) নেতৃত্বে এক বিরাট নৌবহর পাঠান হয় এবং অতঃপর ১৭৪০ সালে ইংরেজগণ জল ও স্থল উভয় দিক হইতে পণ্ডিচেরী অবরোধ করে। ডুপ্লের ভাগ্য পুনরায়

লা-বুরদনের পশ্চাদপসারণ এবং
সমুদ্রে ইংরেজদের আধিপত্য
আয়-লা শাপেলের চুক্তি (১৭৪৮)

সুপ্রসন্ন হল। ইংরেজদের সামরিক কৌশলের অভাবে পণ্ডিচেরী বাঁচিয়া যায়। মৌসুমী বায়ু আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বসকাবেন অবরোধ তুলিয়া লইতে বাধ্য হন। সেই বৎসরেই ইউরোপের আয়-লা-শাপেল (Aix la Chapelle)-এর চুক্তির ফলে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে সন্ধি হইলে ইংরেজগণ মাদ্রাজ ফিরিয়া পায় এবং বসকাবেন পুনরায় ইংল্যান্ডে ফিরিয়া যান।

দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ ঃ প্রথম কর্ণাট যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কোন লাভ না হইলেও এবং ইংরেজ ও ফরাসিরা তাহাদের পূর্ব অবস্থানে থাকিলেও ফরাসিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক গুণে বাড়িয়া যায়। এই যুদ্ধ উভয় পক্ষের নিকট এই শিক্ষাই দেয় যে, সমুদ্রের উপর আধিপত্যই সাফল্যের চবিকাঠি। সুতরাং এই ব্যাপারে ইংরেজদের স্বতঃসিদ্ধ প্রাধান্য ফরাসিদের নিকট একটি নৈরাশ্যময় ভবিষ্যতের বার্তা বহন করে। অধিকন্তু, ফরাসি শক্তি মূলত কর্ণাটেই সীমাবদ্ধ, অথচ ইংরেজদের নিকট বোম্বাই ও বাংলায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি বিদ্যমান। এই অবস্থা যে কোন ফরাসি নেতাকে হতবুদ্ধি করিয়া দিবার মত, কিন্তু ডুপ্লের বুদ্ধি তাঁহাকে এই অসুবিধা হইতে বাহির হইবার একটি পথেরই নির্দেশ দেয়। মাদ্রাজের নিকট নবাব আনোয়ার উদ্দিনের পরাজয়ের ঘটনা তাঁহার আরেকদিকে প্রচুর সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। একদল স্থানীয় সৈন্যবাহিনীকে ইউরোপীয় কায়দায় সামরিক শিক্ষা দিবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য তিনি ঘোরতরভাবে চেষ্টা করিতে থাকেন এবং ইহাই তাঁহাকে কর্ণাট এবং নিজাম রাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য করে। পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে কর্ণাটের নবাব হিসাবে আনোয়ার উদ্দিনের নিযুক্তির ফলে মৃত নবাব দোস্ত আলীর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। ১৭৪১ সালে দোস্ত আলীর জামাতা চান্দা সাহেব মারাঠাদের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আনোয়ার উদ্দিনের হাত হইতে তাঁহার শ্বশুরের সিংহাসন ফিরিয়া পাইবার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। সেই সময় হায়দ্রাবাদের সিংহাসন লইয়াও অনুরূপ একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আসফ'জাহ্ নিজাম-উল-মুলক ১৭৪৮ সালে মারা গেলে তাঁহার পুত্র নাসির জঙ্গ উত্তরাধিকার লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার দৌহিত্র মুজাফ্ফর জঙ্গ সিংহাসনের দাবি করেন এই মর্মে যে, মুঘল সম্রাট তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করিয়াছেন।

সংঘর্ষের পূর্বাবস্থা
কর্ণাটের নবাবী লইয়া ষড়যন্ত্র
নিজাম-এর পদ লইয়া ষড়যন্ত্র

স্থানীয় নবাব ও নিজামের পদ লইয়া এইসব ঘরোয়া বিবাদ ফরাসি ও ইংরেজদের জন্য সুবর্ণ সুযোগের দ্বার উন্মোচন করে। ডুপ্লে নিজামের পদের জন্য মুজাফ্ফর জঙ্গের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং নবাবের পদের জন্য চান্দা সাহেবকে সমর্থন করেন। অপরদিকে ইংরেজগণ নাসির জঙ্গ ও আনোয়ার উদ্দিনকে যথাক্রমে নিজাম ও নবাবের পদের জন্য সমর্থন করেন। ফরাসীদের সাহায্য লইয়া মুজাফ্ফর জঙ্গ ও চান্দা সাহেব নবাব আনোয়ার উদ্দিনকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং আনোয়ার উদ্দিনের পুত্র মুহাম্মদ আলী ত্রিচিনোপলির দিকে পলায়ন করেন। কিন্তু ইংরেজগণ মুহাম্মদ আলীকে কর্ণাটের নবাব বলিয়া স্বীকৃতি দেন এবং কর্ণাটে আসিয়া তাঁহার শত্রুদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য নাসির জঙ্গকে জরুরি বার্তা পাঠান। কিন্তু ডুপ্লের নেতৃত্বে গঠিত সংঘের বিরুদ্ধে তাঁহারা অনুরূপ

দাক্ষিণাত্যের ঘরোয়া বিবাদে ফরাসি ও ইংরেজদের ভূমিকা
ডুপ্লের সাফল্য

কার্যকর একটি সংঘ গঠন করিতে ব্যর্থ হন। ইহার ফল হইল এই যে, যদিও প্রথমাবস্থায় নাসির জঙ্গ মুজাফ্ফর জঙ্গকে একটি যুদ্ধে বন্দি করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একজন আততায়ীর হাতে তিনি প্রাণ হারান। ১৭৫০ সালে মুজাফ্ফর জঙ্গ হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দাক্ষিণাত্যে সাময়িকভাবে ফরাসি প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করে। মুজাফ্ফর জঙ্গ ডুপ্লেকে সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং মসুলীপত্তম ফরাসীদের নিকট হস্তান্তর করেন। তিনি ফরাসিদিগকে পণ্ডিচেরীর নিকটবর্তী ও উড়িষ্যার উপকূলীয় অঞ্চলসমূহও ছাড়িয়া দেন। তাহা ছাড়া ডুপ্লে স্বয়ং একটি জায়গীর ও নগদ দুই লক্ষ পাউন্ড লাভ করেন। মুজাফ্ফর জঙ্গের অনুরোধে ডুপ্লে তাঁহার একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ব্যুসিকে (Bussy) একটি ফরাসি বাহিনীসহ প্রদান করেন।

মুজাফ্ফর জঙ্গের মৃত্যু ও সালাবত জঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ

চান্দা সাহেবের নবাবী লাভ

কিছুদিন পর বিদ্রোহীদের হাতে মুজাফ্ফর জঙ্গের মৃত্যুর পর ফরাসি সেনাপতি ব্যুসি নিজাম-উল-মুলকের তৃতীয় পুত্র সালাবত জঙ্গকে সিংহাসনে বসান এবং স্বয়ং তাঁহার সেনাবাহিনী লইয়া হায়দ্রাবাদে অবস্থান করেন। অপরদিকে আনোয়ার উদ্দিনের মৃত্যুর পর কর্ণাটের নবাব হিসাবে চান্দা সাহেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। শীঘ্রই তিনি মুহাম্মদ আলীকে ত্রিচিনোপলিতে অবরোধ করেন। ফরাসিরা দাক্ষিণাত্যে যখন তাহাদের সাফল্য প্রায় পূর্ণ করিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ একজন বিচক্ষণ সেনাপতি উদয় হইয়া দাক্ষিণাত্যের কার্যাবলির সুর সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করিয়া দেয়। সেই সেনাপতির নাম রবার্ট ক্লাইভ।

রবার্ট ক্লাইভ ঃ ১৭৪২ সালে রবার্ট ক্লাইভ নামে অষ্টাদশ বর্ষীয় এক ইংরেজ যুবক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে নিম্নতম কেরানির একটি পদ লইয়া ভারতে আগমন করেন। লা-বুরদনে যখন মাদ্রাজ অধিকার করেন, তখন ক্লাইভ কিছু সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। পরে যখন চান্দা সাহেব ত্রিচিনোপলিতে মুহাম্মদ আলীকে অবরোধ করেন, তখন ক্লাইভ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া মাত্র তিনশত ভারতীয় সিপাহী আর দুইশত

কর্ণাটে ইংরেজ প্রাধান্য

ইংরেজ সৈন্যসহ চান্দা সাহেবের রাজধানী আর্কট আক্রমণ করিয়া অনায়াসে তাহা দখল করেন। চান্দা সাহেবের পুত্র রাজা সাহেব আর্কট উদ্ধার করিতে আসিয়া ক্লাইভের বিক্রমে যখন ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন অতর্কিত আক্রমণে ক্লাইভ তাঁহার সৈন্যদল ছিন্নভিন্ন করিয়া দেন এবং ত্রিচিনোপল্লির দিকে অগ্রসর হন। চান্দা সাহেব এবং ফরাসীদের মিলিত বাহিনী তাহার হস্তে পরাজয় স্বীকার করে। চান্দা সাহেব আত্মসমর্পণ করিলে তাহাকে হত্যা করা হয়। আর্কট অধিকার এই যুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সাহসিক কার্য যোদ্ধা হিসাবে ইংরেজদের সুনাম বাড়াইয়া দেয় এবং ফরাসীদের মান-সম্মানে বিরাট আঘাত হানে। মুহাম্মদ আলী আর্কটের নবাব হন (১৭৫২)। কর্ণাটে ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ডুপ্লের শেষ জীবন ঃ ডুপ্লের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা অতঃপর ভূলুণ্ঠিত হয়। তাঁহার সেনাপতিদের অবিশ্বাস্য বোকামি ও অযোগ্যতার জন্য তাঁহার হাতের নাগালের পুরস্কার তিনি হারাইয়া ফেলেন। তবুও বিগত পরাজয়ের দ্বারা হতোদ্যম না হইয়া তিনি কাজ করিয়া যান এবং ত্রিচিনোপল্লীর অবরোধ তিনি পুনরায় আরম্ভ করেন। সমগ্র ১৭৫৩ সালে ছোটখাট যুদ্ধ

চলিতে থাকে, যেগুলিতে উভয় পক্ষই জয়-পরাজয় লাভ করে। কিন্তু স্বদেশের ফরাসি কর্মকর্তাগণ ডুপ্লের কার্যাবলিতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ফ্রান্সে ডাকিয়া পাঠান। ১৭৫৪ সালে তিনি ভগ্নহৃদয়ে ফ্রান্সে ফিরিয়া যান। ভারতে ফরাসি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ডুপ্লে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীদের প্রশংসা অর্জন করিতে ব্যর্থ হন। প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে তিনি তাঁহার যোগ্যতা প্রদর্শন করেন। ফরাসী সরকার তাহাদের এই অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন গভর্নরের সুনিপুণ পরিকল্পনাসমূহের ভাব বুঝিতে ব্যর্থ হন এবং ফরাসী সৈন্যদের পরাজয় ও তাঁহার পরিকল্পনায় অর্থব্যয়ে শংকিত হইয়া পড়েন। ফরাসি সরকারের অজ্ঞতা, অদূরদর্শিতা এবং সমরোপকরণ ও অর্থের অভাবই হইল তাঁহার ব্যর্থতার মূল কারণ। ক্লাইভের ন্যায় তিনি যদি অবস্থানুযায়ী সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও স্বদেশবাসীদের সাহায্য পাইতেন, বলা যায় না পরবর্তী ইতিহাস কিভাবে লিখিত হইত। ফরাসি সরকার গড়চো (Godcheu) নামে একজন গভর্নর প্রেরণ করেন স্থানীয় অবস্থাদি অনুসন্ধানের জন্য এবং অবস্থার উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য। ১৭৫৪ সালের ১লা আগস্ট গড়চো ভারতে আগমন করেন, ডুপ্লের উপরে ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া ফেলেন। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে একটি সন্ধিতে আবদ্ধ হন। ইংরেজ ও ফরাসি উভয়ে স্বীকৃত হয় যে, স্থানীয় রাজাদের ঘরোয়া ব্যাপারে তাহারা আর হস্তক্ষেপ করিবে না, এবং উভয় পক্ষ সন্ধির সময় যে যেখানে ছিল, সেসব এলাকার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এইভাবে ডুপ্লে যাহা লাভ করিয়াছিলেন, উহার প্রায় সবগুলোই ফরাসিরা হারাইয়া ফেলে।

ডুপ্লের অকৃতকার্যতার কারণ

তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধ—ইঙ্গ-ফরাসি সংঘর্ষের দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

১৭৫৬ সালে ইউরোপে সপ্তবর্ষের মহাযুদ্ধ (Seven Years' War) আরম্ভ হয় এবং ইহার দ্বারা গড়চো কর্তৃক সম্পাদিত কর্ণাট ইঙ্গ-ফরাসি চুক্তি ভাঙ্গিয়া যায় এবং ভারতে ফরাসি ও ইংরেজগণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ১৭৫৮ সালে কাউন্ট লালী (Count Lally) নামে জনৈক অভিজাত ব্যক্তিকে ফরাসি সরকার গভর্নর নিযুক্ত করিয়া ভারতে প্রেরণ করে। ইতোমধ্যে ইংরেজগণ ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কার্যত বাংলাদেশে নিজেদের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ইউরোপের ইঙ্গ-ফরাসি সংঘর্ষের খবর এই দেশে পৌঁছিবা মাত্রই ক্লাইভ ও ওয়াটসনের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী চন্দননগর আক্রমণ করে। লালী এই দেশে আসিয়াই ইংরেজদের সেন্ট ডেভিড দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলেন (১৭৫৮)। কিন্তু তাঁহাকে নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করিতে হয়। সমুদ্রপথে ইংরেজগণ ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অথচ ডুপ্লের ন্যায় লালীও স্বদেশ হইতে কোনরূপ সাহায্য পান নাই। তবুও সেন্ট ডেভিড দুর্গের পতনের পর লালী বিপুল বিক্রমে তাঞ্জোর আক্রমণ করেন। তাঞ্জোরের পতনও প্রায় নিশ্চিতই ছিল। কিন্তু যথাসময়ে ইংরেজ নৌবহর আসিয়া পড়ায় লালীর চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। নিরুপায় হইয়া লালী হায়দ্রাবাদ হইতে ব্যুসিকে আহ্বান করেন। ব্যুসি হায়দ্রাবাদ ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেখান হইতে ফরাসি প্রভাব চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়া যায়। ক্লাইভ বাংলাদেশ হইতে কর্নেল ফোর্ডকে মসুলীপত্তম আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন (১৭৫৯)। মসুলীপত্তম

ব্যুসির হায়দ্রাবাদ ত্যাগ

ইংরেজদের অধিকারে আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে হায়দ্রাবাদের নিজাম ইংরেজদের সহিত সন্ধি করিয়া যে সকল স্থান পূর্বে ফরাসিদের উপহার দিয়াছিলেন, সেইগুলি এইবার ইংরেজদের দান করেন। তারপর ক্লাইভ কর্ণাট প্রদেশে স্যার আয়ার কূটকে (Sir Ayer Coot) সেনাপতি নিয়োগ করিয়া পাঠান।

আয়ার কূট তাঁহার সেনাবাহিনী লইয়া মাদ্রাজে পৌঁছার পর লালী কর্তৃক অবরুদ্ধ বন্দিবাস দুর্গের নিকট একটি বড় আকারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় (জানুয়ারি, ১৭৬০)। ফরাসি বাহিনী এই যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় এবং তাহাদের ভাগ্য সামগ্রিকভাবে মীমাংসা হইয়া যায়। বাংলাদেশে পলাশীর যুদ্ধের ন্যায় দাক্ষিণাত্যের বন্দিবাসের যুদ্ধ একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা। অতঃপর একটি একটি করিয়া ফরাসী উপনিবেশগুলি ইংরেজদের হস্তগত হইতে থাকে। তিন মাসের মধ্যে ফরাসিরা জিঞ্জি ও পণ্ডিচেরী ব্যতীত কর্ণাটের সমস্ত এলাকা হারাইয়া ফেলে। তারপর ইংরেজ বাহিনী পণ্ডিচেরী অবরোধ করে। সম্পূর্ণভাবে নিরুপায় হইয়া লালী তখন তৎকালীন মহীশূরের সর্বময় কর্মকর্তা হায়দর আলীর সঙ্গে চুক্তি করেন। ফরাসিদের সাহায্যের জন্য হায়দার আলী একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন, কিন্তু উত্তম পরিকল্পনার অভাবে সেই বাহিনীকে সঠিকভাবে কাজে লাগান সম্ভব হয় নাই এবং তাই হায়দার আলীর বাহিনী ফিরিয়া যায়। দীর্ঘ নয় মাস অবরোধের পর ১৭৬১ সালে পণ্ডিচেরী নগরীর পতন হয়। পণ্ডিচেরীর পতনের কিছুদিন পর জিঞ্জি ও মালাবার উপকূলে অবস্থিত ফরাসি উপনিবেশ মাহেরও পতন হয়। এইভাবে ফরাসিগণ ভারতে তাহাদের সমস্ত কিছু হারাইয়া ফেলে। ১৭৬৩ সালে ইউরোপ প্যারিসের সন্ধি (Treaty of Paris) অনুসারে সপ্তবর্ষের মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। ফরাসিরা তাহাদের উপনিবেশগুলি ফিরিয়া পায়, কিন্তু ভারতে ফরাসিদের প্রভুত্ব চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হইয়া যায়।

বন্দিবাসের যুদ্ধ
পণ্ডিচেরীর পতন (১৭৬১)
প্যারিস সন্ধি (১৭৬৩)
ফরাসি প্রাধান্য অবসান

ফরাসিদের ব্যর্থতার কারণ ঃ ভারতে ফরাসিদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ইউরোপে ফরাসি কর্তৃপক্ষের ভারতের ব্যাপারে উদাসীনতা ও অজ্ঞতা এবং ইংরেজদের প্রবলতর নৌশক্তি। এই দেশে ইংরেজগণ স্বদেশ হইতে যেরূপ সাহায্য পায়, ফরাসিরা সেরূপ তো পায়ই নাই, বরং অনেক সময় কর্তৃপক্ষ তাহাদের বিরোধিতা করে। পক্ষান্তরে ইংল্যান্ডের সরকার ভারতীয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে স্বাধীনভাবে কাজ করিবার সুযোগ দেয়। এইজন্য তাহারা অবস্থানুযায়ী নীতি অবলম্বন করিয়া কর্মক্ষেত্রে অসামান্য সফলতা লাভে সক্ষম হন। উপনিবেশগুলির উপর ফরাসি সরকারের সর্ববিষয়ে হস্তক্ষেপের ফলে ফরাসি সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হয়। অধিকন্তু বাণিজ্যেরও প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। জলপথে ইংরেজদের নৌবহর উৎকৃষ্টতর ছিল, আর ইউরোপ হইতে সুদূর ভারতবর্ষে আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখিতে হইলে জলপথে প্রাধান্য স্থাপন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ইংরেজ শক্তি প্রয়োজনানুসারে ইংল্যান্ড হইতে ভারতে সৈন্য ও রণ সম্ভার পাঠাইয়া ভারতীয় ইংরেজদিগকে সাহায্য করে। কিন্তু ইংরেজ নৌবহরের প্রতিকূলতায় ফরাসিরা স্বদেশ হইতে আবশ্যক মত সাহায্য পায় নাই। এইদিকে তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধের পূর্বেই ইংরেজরা সমগ্র বাংলাদেশে আধিপত্য স্থাপন

ফরাসিদের দুর্বল নৌশক্তি
পলাশী যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভ
ফরাসিদের আবির্ভাব

করে। তাই যুদ্ধের সময় তাহাদের কখনও অর্থাভাব হয় নাই। অথচ কাউন্ট লালী কখনও প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তাই কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, ইংরেজ পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের জন্যই বন্দিবাসের যুদ্ধে ফরাসিদের পরাজয় ঘটিয়াছিল। ইহা স্মরণ করিতে হইবে যে, ধন-সম্পদপূর্ণ বাংলাদেশ হইতেই ইংরেজদের প্রভুত্ব সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় পরিব্যাপ্ত হয়।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

Lawrence	:	*Narrative of Anglo-French Conflicts*
Sir Alfred Lyall	:	*Rise and Expansion of the British Dominion in India*
V.A.Smith	:	*Oxford History of India*
W. Haig	:	*Cambridge History of India, Vol-V*
Col Maleson	:	*History of the French in India*
Dodwell	:	*Duplex and Clive*
Richmond	:	*The Navy in India*
Ghulam Hussain Salim	:	*Riyaz us Salatin (Eng Trans)*
Ghulam Hussain	:	*Siyar-al-Mutakhirin (Eng. Trans.)*

তৃতীয় অধ্যায়
দক্ষিণ এশিয়ায় বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার

(ক) বাংলাদেশে ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপন

মুর্শিদ কুলি খান ও বাংলার নবাবগণ ঃ সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুর্শিদ কুলি খান বাংলার দেওয়ান হন। ১৭০৩-১৭০৪ সালে তিনি দেওয়ানী দফতর ঢাকা হইতে মকসুদাবাদে স্থানান্তর করেন। তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম হয় 'মুর্শিদাবাদ'। পরে তিনি বাংলার সুবাদার হন এবং স্বাধীন নবাবী চালু করেন। ১৭২৫ সালে মুর্শিদ কুলি খানের মৃত্যু হইলে বাদশাহী ফরমানের বলে তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন বাংলার নবাব হন। সুজাউদ্দিন ন্যায়পরায়ণতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৭৩৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সরফরাজ খান নবাব হন। কিন্তু পিতার ন্যায় তাঁহার যোগ্যতা ছিল না। কয়েক মাসের মধ্যেই বিহারের শাসনকর্তা আলীবর্দী খান তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাংলা অধিকার করেন, এবং সম্রাট মুহাম্মদ শাহকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়া তাঁহার নিকট হইতে এক ফরমান আদায় করিয়া লন। আলীবর্দী খান একজন কর্মঠ ও যোগ্য লোক ছিলেন এবং এইভাবেই তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় স্বাধীন রাজত্ব চালাইতে থাকেন। "তিনি একজন চালাক, বিচক্ষণ ও নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন। খুব অল্প গুণই আছে, যেগুলি তাঁহার নিকট ছিল না।"[১] ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি তাঁহার মনোভাব কঠোর কিন্তু পক্ষপাতহীন ছিল এবং শুধু বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সময় সময় তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে কোন সন্তান ছিল না। তাঁহার রাজত্বের অধিকাংশ সময় প্রতি বৎসর মারাঠা বর্গীর হামলা বাংলাদেশে একটি স্থায়ী উদ্বেগ সৃষ্টি করে এবং বিহারের দ্বারভাঙ্গার আফগানদের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহার আফগান সেনাপতিগণ তাঁহার আধিপত্যের উপর ভীষণ হুমকির সৃষ্টি করে। যদিও আলীবর্দী খান ভাস্কর পণ্ডিত নামে একজন মারাঠা সেনাপতিকে হত্যা করিতে সমর্থ হন, কিন্তু তবুও বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের পর মারাঠাদের হাতে উড়িষ্যার একাংশ ছাড়িয়া দিয়া এবং বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ দিবার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তিনি মারাঠাদের সহিত সন্ধি করেন (১৭৫১)। বাংলাদেশ অতঃপর মারাঠা বর্গীর অত্যাচার হইতে রক্ষা পায়। নবাব আলীবর্দী খান ১৭৫৬ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সুজাউদ্দিন
সরফরাজ খান
আলীবর্দি খান

সিরাজ উদ্দৌলাহ ঃ আলীবর্দী খানের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁহার তিনটি কন্যাকে তিনটি ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ কন্যার পুত্র সিরাজ উদ্দৌলাহ তাঁহার মনোনীত উত্তরাধিকারী। কিন্তু এই বন্দোবস্ত স্বভাবতই তাঁহার অন্য দুই জামাতার মনঃপুত হইল না। অন্য দুই জামাতার একজন ঢাকার গভর্নর এবং অপরজন পূর্ণিয়ার গভর্নর।

আলীবর্দী খানের রাজত্বের শেষের দিকে এই দুই জামাতার মৃত্যু হওয়ায় এই সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। কিন্তু আলীবর্দী খানের বিধবা পত্নী ঘসেটি বেগম ও তাঁহার পুত্র শওকত জঙ্গ এবং দেওয়ান রাজবল্লভ সিরাজের জন্য বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেন। যাহা হউক, ১৭৫৬ সালের এপ্রিল মাসে আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর আপাতত নির্বিঘ্নেই সিরাজ উদ্দৌলাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ যদিও বাধাহীনভাবেই সংঘটিত হয়, তাঁহার সমস্যাবলি ছিল প্রচুর। রাজবল্লভ ও শওকত জঙ্গের শত্রুতামূলক কার্যাবলি ছাড়াও তিনি নিজেকে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে এক বিরাট গোলযোগের মধ্যে পান। ইংরেজদের সঙ্গে গোলযোগের প্রধান কারণ হইল ইংরেজগণ কর্তৃক কলিকাতায় অধিকতর দুর্গ নির্মাণ। যেভাবে এই দুর্গ নির্মাণের কাজ চলিতেছিল, তাহা নবাবের রোষ আরও বৃদ্ধি করে। নবাব সিরাজ উদ্দৌলাহ্ সহজ ভাষায় তাঁহার মতামত কাশিম বাজার কুঠির ইংরেজ প্রধান কর্মকর্তা ওয়াটকে জানাইয়া দেন। নবাব জানাইয়া দেন যে, তিনি ইংরেজদিগকে একদল ব্যবসায়ী হিসাবেই জ্ঞান করেন এবং সেই হিসাবে তাঁহারা স্বাগত। কিন্তু তাহাদের ইদানীং দুর্গ নির্মাণের কাজ তিনি অনুমোদন করেন না এবং সেইগুলির ধ্বংস সাধনের উপর জোর দিতেছেন। অনুরূপ আদেশ দিয়া নবাব কলিকাতাতেও দূত পাঠান এবং রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে নবাবের হাতে সোপর্দের দাবি জানান। কৃষ্ণদাস ইতোপূর্বে নবাবের অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু এইগুলিকে ইংরেজ গভর্নর অতি সামান্য উত্তর দিয়া বিদায় করেন। ইংরেজগণ এই অসম্মান এই বিশ্বাসে দেখান যে, ঘসেটি বেগম, রাজবল্লভ ও শওকত জঙ্গের ষড়যন্ত্র হয়ত কার্যকর হইবে। কিন্তু নবাব যখন বিনা রক্তপাতে ঘসেটি বেগমকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন, ইংরেজগণ তাহাদের ভুল বুঝিতে পারেন এবং তাহাদের ব্যাবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠান। তবুও তাহারা তাহাদের কুঠিগুলির দুর্গ ধ্বংস করিবার কোন লক্ষণ দেখাইলেন না। অতঃপর নবাব ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিতে মনস্থ করেন।

ঘসেটি বেগম ও রাজবল্লভের বিরোধিতা

ইংরেজদের সঙ্গে গোলযোগ

ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভিযানের কারণ

১৭৫৬ সালের ৪ঠা জুন নবাব ইংরেজদের কাশিম বাজার কুঠি অধিকার করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওয়ানা হন। প্রধান সেনাপতি ও অন্যান্য ইংরেজ কর্মকর্তাগণ দূর্গ পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের জাহাজে আশ্রয় লন এবং ২০শে জুন ফোর্ট উইলিয়াম নবাব সিরাজ উদ্দোলার নিকট আত্মসমর্পণ করে। সেনাপতি মানিক চাঁদকে কলিকাতার ভার দিয়া নবাব মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া যান। ইতোমধ্যে শওকত জঙ্গ ক্ষমতাহীন মুঘল সম্রাটের নিকট হইতে বাংলার সুবাদার হিসাবে একটি সরকারি 'সনদ' লন এবং নবাবের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার পূর্বেই শওকত জঙ্গ নবাব কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। যুবক নবাবের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নয় যে, সিংহাসনে আরোহণের তিন মাসের মধ্যে তিনি তাঁহার তিনটি শক্তিশালী শত্রুর কবলমুক্ত হন।

ইংরেজগণ তাহাদের প্রথম পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ ত্যাগ করিবেন, ইহা চিন্তা করা হাস্যকর। কারণ যদিও তাহারা সংখ্যায় নগণ্য কিন্তু সমুদ্রের উপর কর্তৃত্ব তাহাদিগকে নবাবের বিরুদ্ধে যে কোন যুদ্ধে সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করে, যেহেতু কঠোর চাপে পড়িলে ইহা

তাহাদের পশ্চাদপসারণের পথ উন্মুক্ত রাখে এবং ইংল্যান্ড বা ভারতের অন্যান্য কুঠি হইতে নূতনভাবে রসদপত্র সংগ্রহের সুযোগ প্রদান করে। এমতাবস্থায় নবাবের কর্তব্য ছিল কলিকাতার উপর তাঁহার আধিপত্য বজায় রাখা, যাহাতে ইংরেজগণ পুরাপুরিভাবে আয়ত্তাধীন থাকে। কিন্তু সেই সময় তাহা সম্ভব ছিল না। কারণ, তাঁহার স্বগৃহই তখন ছিল আয়ত্তের বাহিরে। চতুর ইংরেজগণ অভ্যন্তরীণ অবস্থা ভালভাবে জানিতেন এবং তাই তাহারা বাংলার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগকে উৎকোচ দিয়া স্বপক্ষে আনিবার জন্য সুনিপুণ পন্থা অবলম্বন করেন। সর্বপ্রথম তাহারা স্বপক্ষে আনেন কলিকাতার ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি মানিক চাঁদকে, অত্র নগরের একজন ধনি ব্যবসায়ী উমিচাঁদকে, বিখ্যাত মহাজন জগৎশেঠকে এবং নবাবের দরবারের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোকদিগকে। তৎসঙ্গে কলিকাতায় তাহাদের পূর্বেকার ব্যবসায়িক অধিকার ফিরাইয়া দিবার জন্য তাহারা নবাবের নিকট আপিল করেন। এই আপিল স্বার্থান্বেষী পরামর্শদাতাদের সমর্থনপুষ্ট হইয়া নবাবকে পুনরায় ইংরেজদের সঙ্গে আপোস করিবার জন্য প্ররোচনা দেয়।

বাংলার পদস্থ কর্মচারীদের ইংরেজদের পক্ষে যোগদান

ইতিমধ্যে কলিকাতার পতনের সংবাদ পাইয়া মাদ্রাজ হইতে ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটসনের অধীনে একটি অভিযান প্রেরণ করা হয়। বাংলায় পৌঁছিয়া নবাবের নিকট এক পত্রে ওয়াটসন শুধু ইংরেজদের পুরানো অধিকার ও সুবিধাদি নহে, বরং তাহাদের সম্পত্তি বিনষ্ট ও হতাহতের যথেষ্ট ক্ষতিপূরণও দাবি করেন। ইহার জবাবে নবাব একটি শান্তিপূর্ণ উত্তর প্রদান করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ক্লাইভ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মানিক চাঁদ যুদ্ধের ভান করেন মাত্র এবং অতঃপর মুর্শিদাবাদের দিকে পলায়ন করেন। ১৭৫৭ সালের ২রা জানুয়ারি একরকম বিনা যুদ্ধে ক্লাইভ কলিকাতা অধিকার করেন। অতঃপর ইংরেজগণ হুগলি লুণ্ঠন করে। তাহা সত্ত্বেও কলিকাতায় আসিয়া নবাব ইংরেজদের সঙ্গে আলীনগরের সন্ধি করেন (৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৫৭) এবং ইংরেজ কোম্পানির সমস্ত দাবি মানিয়া লন। খুব সম্ভবত তাঁহার সুপরিচিত স্বীয় কর্মচারীদের বিশ্বাঘাতকতামূলক কার্যাবলি এবং উত্তর-পশ্চিম হইতে একটি অভিযানের আশঙ্খার দ্বারাই নবাব ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

আলীনগরের সন্ধি

পলাশীর যুদ্ধ ঃ ইতোপূর্বে ইউরোপে সপ্তবর্ষের মহাসমর (১৭৫৬) আরম্ভ হওয়ায় বাংলায় নিত্য-নূতন ঘটনাবলির সূচনা হয়। ইংরেজগণ এখন ফরাসি কুঠি চন্দননগর অধিকার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু সিরাজ উদ্দোলাহ সম্পূর্ণ যৌক্তিকভাবে ইংরেজদিগকে অনুরূপ কাজ করিতে নিষেধ করেন এবং তবুও ইংরেজগণ যখন চন্দননগর আক্রমণ করেন, নবাব তাহাদিগকে আলীনগরের সন্ধি স্মরণ করাইয়া দেন এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, তিনি ফরাসিদিগকে ইংরেজদের হাতে ছাড়িয়া দিবেন না। নবাবের বাণীর প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াটসন ১৭৫৭ সালের মার্চ মাসে অতি সহজেই ফরাসি চন্দননগর অধিকার করেন। যাহা হউক, নবাব পলাতক ফরাসিদিগকে তাঁহার দরবারে আশ্রয় প্রদান করেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী কর্তৃক বাংলাদেশ আক্রমণের হুমকির মুখে ইংরেজদের সামরিক সাহায্য প্রদানের বিনিময়েও তিনি ফরাসিদিগকে বাহির করিয়া দেন নাই। নবাবের এই সুদৃঢ় মনোভাবের মধ্যে ইংরেজগণ আশু বিপদ দেখিতে পান। কারণ,

ইংরেজ কর্তৃক ফরাশি কুঠি অধিকার

নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

ইংরেজদের সঙ্গে যে কোন যুদ্ধে ফরাসিদের সমর্থন নবাবকে অমূল্য সহায়তা প্রদান করিবে। নবাব সিরাজ উদ্দৌলাহকে পদচ্যুত করিয়া তদস্থলে তাহাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন একজন নবাবকে বসাইবার জন্য ইংরেজগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগে। সুতরাং অসন্তুষ্ট উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সহায়তায় এক ষড়যন্ত্র প্রণয়ন করা হয়। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসান হইবে। নবাবের দুই সেনাপতি মীরজাফর ও রায় দুর্লভ এবং ধনী মহাজন জগৎশেঠ এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন। একটি সম্পূর্ণ চুক্তি রচনা করা হয় এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সামরিক সাহায্যের জন্য ইংরেজদিগকে কী পুরস্কার দেওয়া হইবে, তাহাও সিদ্ধান্ত করা হয়। সংযোগ স্থাপনকারী শিখ ব্যবসায়ী উমিচাঁদ লুণ্ঠিত অর্থের এক বিরাট অংশ দাবি করিয়া বসেন। উমিচাঁদ-এর দাবি মানিয়া লওয়া হয়, এরূপ একটি জাল চুক্তিপত্র দেখাইয়া ক্লাইভ তাহাকে নিরস্ত করেন। ওয়াটসন এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে ক্লাইভ তাঁহার স্বাক্ষরও জাল করেন। অতঃপর সন্ধি ভঙ্গের মিথ্যা অভিযোগে ইংরেজগণ নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই সংকটময় মুহূর্তে নবাব নিস্তেজভাবে কাজ করেন। ফরাসি পলাতকগণ নবাবকে এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক করেন, কিন্তু তবুও নবাবের চক্ষু খোলে নাই। তিনি মীরজাফরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আলীবর্দীর নামে তাঁহার নিকট করুণভাবে আবেদন করেন। মীরজাফর তাঁহাকে সমর্থন করিবার শপথ করেন এবং নবাব আপাতদৃষ্টিতে সন্তুষ্ট হন। মীরজাফরকে প্রধান সেনাপতি মনোনীত করিয়া তিনি অতি দ্রুত যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকেন।

ইংরেজ সেনাবাহিনী নবাবের বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযানে ইতোমধ্যে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে। ১৭৫৭ সালের ২২শে জুন রাত্রিবেলা রবার্ট ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ হইতে তেইশ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর তীরে পলাশীর আম্রকাননে উপস্থিত হন। ইতোপূর্বে নবাব তাঁহার সেনাবাহিনী লইয়া তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। ২৩শে জুন সকালবেলা যুদ্ধ আরম্ভ হয়। নবাবের পক্ষে মীরজাফর, রায় দুর্লভ তাহাদের বিপুল বাহিনী লইয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন। শুধু মোহন লাল ও মীর মদন একজন ফরাসি সেনানায়কের সমর্থনে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়া যুদ্ধে অবতরণ করেন। মীরজাফর যদি নবাবের পক্ষে বিশ্বস্ততার সহিত যুদ্ধ করিতেন, তবে ইংরেজ বাহিনীকে অতি সহজেই পরাজিত করা সম্ভব হইত। এমনকি একটি ক্ষুদ্র অগ্রগামী বাহিনী ইংরেজদের অবস্থা শোচনীয় করিয়া তোলে। অর্ধঘণ্টা যুদ্ধের পর ক্লাইভ তাঁহার সেনাদলকে আম্রকাননের পিছনে সরাইয়া নিতে বাধ্য হন। দুর্ভাগ্যবশত একটি নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে মীর (মর্দান) নিহত হন এবং ইহা নবাবকে এতই বিচলিত করিয়া তোলে যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে মীরজাফরকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাহার বিশ্বাসঘাতকতামূলক উপদেশ গ্রহণ করিয়া মোহন লালের অধীনে একমাত্র সেনাদল, যাহারা তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাদিগকে যুদ্ধ বিরতির আদেশ দেন। মোহন লালের পশ্চাদপসারণের সঙ্গে সঙ্গে নবাবের সেনাবাহিনী বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়া পলায়ন করে। শেষ পর্যন্ত একরূপ বিনা যুদ্ধে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়া ২৪শে জুন সকালবেলা সিরাজ উদ্দৌলাহ্ মুর্শিদাবাদে পৌঁছেন। সৈন্যদিগকে পুনরায় একত্রিত করিবার জন্য তিনি বৃথা চেষ্টা করেন। কারণ তাহাদের প্রায় সবাই ইতোমধ্যে পলায়ন করিয়াছে। নিরুপায় হইয়া নবাব তাঁহার স্ত্রী ও একজন বিশ্বস্ত চাকর

মীরজাফর নবাব হন
সিরাজ উদ্দৌলাহ্ নিহত
পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল

সমভিব্যাহারে পলায়ন করেন। পরদিন মীরজাফর মুর্শিদাবাদ পৌছেন এবং কয়েকদিন পর ক্লাইভও তথায় উপস্থিত হন। মীরজাফরকে বাংলার নবাব বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিছুদিন পর সিরাজ উদ্দৌলাহ ধৃত হন এবং মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। এইভাবে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতামূলক ষড়যন্ত্র বিজয়সূচক সমাপ্তিতে উপনীত হয়। ক্লাইভ ও তাঁহার সহকর্মিগণ চব্বিশ পরগনার জমিদারি এবং কোম্পানির জন্য মোটা অংকের পুরস্কার ছাড়াও নিজেরা বিরাট পুরস্কার লাভ করেন।[২] পলাশীর যুদ্ধ ইংরেজদের বাংলাদেশ জয় ও পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতে আধিপত্য বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করে। যদিও এই যুদ্ধ ছিল শুধুমাত্র একটি খণ্ডযুদ্ধের প্রদর্শনী, কিন্তু ইহার গুরুত্ব বিশ্বের অনেকগুলি বড় বড় যুদ্ধের চাইতেও অধিক সুদূরপ্রসারী। ভারতের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ তারাইন ও পানিপথের যুদ্ধের ন্যায়ই উল্লেখযোগ্য। নবাবের পরাজয়ের মূলে ছিল তাঁহার প্রধান সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা। ছোট ইংরেজ বাহিনীকে বেষ্টন করিয়া মীরজাফর ও রায় দুর্লভের বিরাট বাহিনী নিষ্ক্রিয়ভাবে দণ্ডায়মান থাকে। অপরদিকে ক্লাইভ কোন অসাধারণ সামরিক কৌশল বা রাজনীতিজ্ঞের দাবি করিতে পারেন না। ফরাসিদের সঙ্গে কোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদে যাইতে তিনি রাজি ছিলেন না এবং ইহাই ছিল নবাব সিরাজ উদ্দৌলাহ সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের মূল কারণ। একমাত্র ওয়াটসনের একগুঁয়েমির ফলেই তিনি এই বিবাদে পা দেন। এমনকি যুদ্ধ চলাকালেও তিনি ইতস্তত করিতে থাকেন। পলাশীর যুদ্ধের দুইদিন পূর্বে কাটওয়ায় সংঘটিত যুদ্ধ সভায় তিনি পশ্চাদপসারণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। স্বয়ং পলাশীতে সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিবার কারণে তিনি মেজর কিলপ্যাট্রিককে (Major Kilpatrick) যথেষ্ট শাস্তি প্রদান করেন। যাহা হউক, পলাশীর যুদ্ধ নিশ্চিতভাবে বাংলায় ইংরেজদের সামরিক আধিপত্য স্থাপন করে। তাহাদের ঘৃণিত প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসিগণ বহিষ্কৃত হয় এবং সুসজ্জিত সামরিক বাহিনী রাখিবার জন্য তাহারা একটি জায়গীর প্রাপ্ত হয়।

মীরজাফর আলী খান ঃ মীরজাফর শুধু বিশ্বাসঘাতক নহে, অত্যন্ত অপদার্থও বটে। কলিকাতার উপর তিনি ইংরেজদের আধিপত্য স্বীকার করেন এবং নবাবের দরবারে ইংরেজ প্রতিনিধি স্থাপনের দাবিও মানিয়া লন। মৌখিকভাবে মীরজাফরের আসন পূর্ববর্তী নবাবের মতই রহিল। কিন্তু কার্যত সমস্ত কাজকর্মের সর্বময় কর্তৃত্ব ক্লাইভের হাতে চলিয়া যায়। কারণ, এই সদ্য প্রাপ্ত ক্ষমতা রক্ষা করিবার জন্য নূতন নবাব সর্বদাই তাঁহার সমর্থনের মুখাপেক্ষী থাকেন। অপরদিকে ইংরেজগণ তাহাদের প্রতিশ্রুত অর্থের জন্য তাঁহার উপর চাপ দিলে তিনি কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ক্রমশ তাহাদের দাবি অসহ্য হইয়া উঠে। অতঃপর নবাব চুঁচূড়ার ডাচদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে আরম্ভ করেন। ফলে ইংরেজ ও ডাচদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। জলপথে ডাচদের জাহাজ আটক করা হয়, আর স্থলপথে ক্লাইভ তাহাদিগকে পরাজিত করেন (১৭৫৯)। বাংলায় ইংরেজ প্রাধান্য সুদৃঢ় হইয়া উঠে। ১৭৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ক্লাইভ বিজয়ী বীরের মত স্বদেশে ফিরিয়া যান। তাঁহার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসী তাহাকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করে।

ডাচদের সঙ্গে নবাবের চক্রান্ত

মীর কাশিম ঃ নবাব মীরজাফরের প্রতারণা ও অযোগ্যতা এবং কোম্পানির প্রাপ্য টাকা প্রদানে ব্যর্থতার ফলে তিনি এবং তাঁহার পরিবার ইংরেজদের নিকট অসহ্য হইয়া

উঠেন। কার্যরত গভর্নর হলওয়েল (Halwell), স্থায়ী গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট (Vansittart) এবং কউন্সিলের অন্যান্য সদস্যগণ নবাবের জামাতা মীর কাশিমকে মীরজাফরের উত্তরাধিকারী হিসাবে সমর্থন করেন। একটি গোপন সন্ধি অনুযায়ী মীর কাশিম ইংরেজদের প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম—এই তিনটি জেলা ইংরেজদিগকে প্রদান করিতে রাজি হন। অতঃপর ইংরেজগণ মীর কাশিমকে বাংলার ডেপুটি সুবাদার হিসাবে ঘোষণা করেন, কিন্তু মীরজাফর ইহা অস্বীকার করেন। এই ঘটনার পর নবাবের প্রাসাদ জবর-দখল করিবার জন্য ইংরেজ সেনাবাহিনীকে আদেশ দেওয়া হয়। অগত্যা ১৭৬০ সালে মীরজাফর আলী খান মীর কাশিমের নামে পদত্যাগ করেন। এইভাবে বিনা রক্তপাতেই মীর কাশিম বাংলার মসনদ অধিকার করেন।

কোম্পানীর কর্মচারীদের যথেচ্ছাচার

মীর কাশিম তাঁহার শ্বশুরের ন্যায় অপদার্থ ছিলেন না। ইংরেজদের প্রভাব এড়াইবার জন্য তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গের-এ রাজধানী স্থানান্তর করেন। সেইখানে গিয়া তিনি শাসনকার্যে মিতব্যয়িতা প্রবর্তন করিয়া শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিয়া যান। একদল সৈন্যকে দুইজন আর্মেনীয় সেনাধ্যক্ষের অধীনে পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। কিন্তু আরদ্ধ কাজ সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই ইংরেজদের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধিয়া যায়। ক্রমান্বয়ে পরিষ্কার হইয়া উঠে যে, নবাব স্বাধীন শাসক হিসাবেই কাজ চালাইতে চান। কিন্তু বাংলায় ইংরেজ কর্মকর্তাদের ব্যবহার নবাবের ক্ষমতার পরপন্থী হইয়া চলে। ক্রমশ প্রতীয়মান হয় যে, কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপারটি তুমুল আকার ধারণ করিবে। কিন্তু এই গোলযোগ আশাতীত সময়ের পূর্বেই আসিয়া পড়ে।

মীর কাশিমের প্রকৃত ক্ষমতা লাভের প্রয়াস

একটি রাজকীয় ফরমান অনুযায়ী ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলাদেশে বাণিজ্যের জন্য কোনরূপ শুল্ক দিতে হইত না। কোম্পানির কর্মচারীরাও ব্যক্তিগতভাবে সেই সুবিধার সুযোগ লইতে আরম্ভ করেন। নবাবগণ পূর্ব হইতেই ইহার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু কাউন্সিলের সদস্যবর্গের স্বার্থও ইহাতে জড়িত থাকিবার দরুন এই কাজ অবাধে চলিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ইহা মীর কাশিম ও ইংরেজদের মধ্যে ভীষণ গোলযোগের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত ১৭৬২ সালের শেষের দিকে ইংরেজ গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট মুঙ্গেরে মীর কাশিমের সহিত মিলিত হইয়া এই ব্যাপারে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কিন্তু কলিকাতায় ইংরেজ কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে। অতঃপর নবাব বাণিজ্য শুল্ক সম্পূর্ণভাবে উঠাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু ইংরেজগণ এই সিদ্ধান্তের ঘোর প্রতিবাদ করে এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের তুলনায় বিশেষ সুবিধা দাবি করে। পাটনায় ইংরেজ কুঠির প্রধান কর্তা এলিস (Ellis) ইংরেজদের এই তথাকথিত অধিকার জোরপূর্বক আদায় করিতে থাকেন এবং এমনকি পাটনা নগরী অবরোধ করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং তাঁহার দুর্গরক্ষী সৈন্যদল নবাব কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনাবলি ইংরেজ ও মীর কাশিমের মধ্যে বৃহত্তর যুদ্ধের সূচনা করে।

বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪) ঃ ১০ই জুন, ১৭৬৩ ইংরেজগণ প্রায় ১১০০ ইউরোপীয় ও ৪০০০ দেশী সিপাহি লইয়া মীর কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। নবাব ১৫০০০

সৈন্যের এক শক্তিশালী বাহিনী একত্রিত করেন। ইহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় কায়দায় শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈন্যও অন্তর্ভুক্ত। সৈন্য সংখ্যার এই বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ইংরেজগণ কাটওয়াহ, মুর্শিদাবাদ, গিরি, উদয়নালা, সূতী এবং মুঙ্গেরে একের পর এক জয়লাভ করে। দারুণ আক্রোশে ক্ষিপ্ত হইয়া নবাব প্রায় দুইশত ইংরেজ বন্দির প্রাণনাশ করেন এবং অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাহ্‌র নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ পুনরুদ্ধার করিবার জন্য মীর কাশিম নবাব সুজাউদ্দৌলাহ্‌ ও দিল্লীর মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমের সাহায্য প্রার্থনা করেন। নবাব সুজাউদ্দৌলাহ ও মীর কাশিমের সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। বক্সারের একটি চূড়ান্ত যুদ্ধে নবাবদের সম্মিলিত বাহিনী মেজর হেক্টর মনরোর (Hector Monroe) নেতৃত্বে ইংরেজ সেনাবাহিনীর হাতে ২২শে অক্টোবর ১৭৬৪ সালে পরাজয় বরণ করে। সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট শাহ্‌ আলম ইংরেজ পক্ষে যোগদান করেন এবং কিছুদিন পর তাহাদের সাথে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। মীর কাশিম পলায়ন করেন এবং ১৭৭৭ সালে দিল্লীর নিকটবর্তী স্থানে প্রাণ ত্যাগ করেন।

নবাবের প্রাথমিক পরাজয়

বক্সারের যুদ্ধ বাংলাদেশে ইংরেজ সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে। এই ব্যাপারে ডঃ আর. সি. মজুমদার মন্তব্য করেন—"মীর কাশিমের বিরুদ্ধে এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু চূড়ান্ত অভিযানের গুরুত্ব সাধারণত উপেক্ষা করা হয়। পলাশীর যুদ্ধ ইংরেজ শক্তির মৌলিক শ্রেষ্ঠত্বের চাইতে বিশ্বাসঘাতকার দ্বারাই মীমাংসা করা হইয়াছে এবং বাংলায় ইংরেজদের অধিকার একমাত্র সেই যুদ্ধের উপরই সীমাবদ্ধ ছিল। তাহাদের বাংলাদেশ বিজয় কোন পরিষ্কার যুদ্ধের চাইতে একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের উপরই ন্যস্ত ছিল। কিন্তু মীর কাশিমের পরাজয়কে সিরাজ উদ্দৌলাহর ন্যায় হঠাৎ ও আশাতীত ষড়যন্ত্রের মত করিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। আধিপত্যের জন্য ইহা ছিল দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে সোজাসুজি যুদ্ধ। ইহাদের প্রত্যেকেই তাঁহার সম্ভাবনা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন এবং পরিণতি সম্পর্কেও সতর্ক ছিলেন। মীর কাশিম ভালভাবেই জানিতেন ইংরেজদের সঙ্গে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধই তাঁহার নীতির নির্ধারিত পরিণতি এবং তিনি সেনাবাহিনীকে তাঁহার সাধ্যানুযায়ী সেইভাবে সজ্জিত করিয়াছিলেন ও সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যোগ্যতার দিক হইতে তিনি তৎকালীন কোন ভারতীয় শাসকের চাইতে নিকৃষ্টতর ছিলেন না। তাঁহার পরপর এবং চূড়ান্ত পরাজয়গুলি শুধু বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর শাসনযন্ত্রের মৌলিক দুর্বলতা প্রকাশ করে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি যে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা সেই যুগের অনেক অগ্রগামী একটি সুচতুর রাষ্ট্রনীতিই প্রকাশ করে এবং ইহার ব্যর্থতা ছিল আবার ভারতীয় সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মৌলিক গোলযোগের দরুন।"[৩] বক্সারের যুদ্ধে বিজয় লাভের পর ইংরেজগণ এলাহাবাদ পর্যন্ত গোটা দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। মীর কাশিমের সমস্ত আশা-ভরসা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

বক্সারের যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য

বাংলার নবাবী ঃ

বাংলার নবাবী লইয়া বহুদিন হইতেই ইংরেজদের চক্রান্ত এবং ব্যবসা দুই-ই চলিতেছিল। মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধ বাধিলে তাহারা আবার মীরজাফরকেই নবাব বলিয়া ঘোষণা

করিয়া দেয়। ১৭৬৫ সালে মীরজাফর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ইংরেজগণ নজ্‌মউদ্দৌলাহ নামে মীর জাফরের এক অপদার্থ পুত্রকে নবাবী দিয়া পুরস্কার স্বরূপ কয়েক লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লয়। কোম্পানির সকল কর্মচারীই অবাধে উৎকোচ গ্রহণ করিতে থাকে। এইরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় কোম্পানির কাজেরও অনেক ক্ষতি হইতে থাকে।

পুনরায় মীরজাফর নজ্‌মউদ্দীন

ক্লাইভের প্রত্যাবর্তন এবং বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ ঃ এইসব বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য কোম্পানির ডিরেক্টরগণ ১৭৬৫ সালে ক্লাইভকে পুনরায় বাংলাদেশে পাঠান। কোম্পানির কর্মচারীরা উৎকোচ-উপঢৌকন লইয়া ব্যস্ত থাকায় তখনও অযোধ্যার নবাবের সহিত বিরোধের অবসান হয় নাই। ক্লাইভ আসিয়া তাঁহার সহিত এক সন্ধি করেন। সুজাউদ্দৌলাহ্‌র নিকট হইতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়। এলাহাবাদ ও কোরা—এই দুইটি জেলাও তিনি কোম্পানির হাতে ছাড়িয়া দেন। অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে সদ্য প্রাপ্ত জেলা দুইটি বাদশাহ্‌ শাহ্‌ আলমকে দান করা হয়। আর বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বৃত্তির বিনিময়ে ক্লাইভ কোম্পানির পক্ষ হইয়া বাদশাহ্‌র নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন (১৭৬৫)। উড়িষ্যা বলিতে তখন কেবল মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলার একাংশ বুঝাইত। 'উত্তর সরকার' প্রদেশটি ইতোপূর্বেই ইংরেজদের অধিকারে আসিয়াছিল; বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানীর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বাদশাহের নিকট হইতে উহারও ফরমান আদায় করে। ক্লাইভ বাংলার নবাবের জন্যও বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকার বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দেন, আর দেশরক্ষার জন্য বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বন্দোবস্ত করেন।

অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি

দ্বৈত শাসন প্রণালী (The Dual Government) ঃ

রবার্ট ক্লাইভের প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থার ফলে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে আসে দেওয়ানি, অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ভার। পূর্ব প্রথায় দেওয়ান দেশ রক্ষার জন্য দায়ী থাকিতেন না। সেই কাজ ছিল সুবাদার বা নবাবের। দেওয়ানীর সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানি দেশরক্ষার কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করে। এইরূপে কোম্পানি যুগপৎ রাজস্ব বিভাগ ও সমর বিভাগের কর্তা হইয়া দাঁড়ায়। বিচার ও প্রশাসনের ভার রহিল নবাবের উপর। এই ব্যবস্থার ফলে প্রকৃতপক্ষে নবাব কোম্পানির বৃত্তিভোগী হন, অথচ আইনের দিক হইতে নবাবই রহিলেন দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্য দায়ী। আবার বাংলা ও বিহার—এই প্রদেশ দুইটির শাসনের জন্য যে দুইজন নায়েব নাজিম (ডেপুটি নবাব) নিযুক্ত করা হয়, তাহাও ছিল কোম্পানির অনুমোদন সাপেক্ষে। নবাবের রহিল দায়িত্ব, কিন্তু ক্ষমতা নহে। আর কোম্পানির হাতে রহিল ক্ষমতা, কিন্তু দায়িত্ব নহে। ব্রুক এ্যাডাম (Brook Adam) নামক জনৈক ইংরেজ স্বীকার করেন যে, পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশের লুণ্ঠিত ধন-দৌলত প্রবল বন্যার ন্যায় লন্ডনে আসিয়া পৌঁছিতে থাকে এবং ফলে বিলাতে শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) ঘটিয়া যায়। যে মেকলে সাহেব (Maculay) ভারতীয়দিগকে গালাগালি দিবার জন্য স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, তিনিই ইংরেজদের সম্বন্ধে ক্ষোভে-রোষে বলিয়াছেন ঃ "যে কোম্পানির কার্যকরী

ফলাফল

সভার সদস্যরা শুধু ষড়যন্ত্র, নীচতা ও অর্থসম্পত্তির বলে নির্বাচিত হয়, তাহাদের কাছে ভাল কী আশা করা যাইতে পারে।"

অনাচার নিয়ন্ত্রণ
সৈন্যদলের দ্বিগুণ ভাতা লোপ
ক্লাইভের শেষ জীবন

ক্লাইভকে পুনরায় এই দেশে পাঠাইবার উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে অনাচার ও বিশৃঙ্খলা দূর করা। এইজন্য তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের অধিকার লোপ করিয়া দেন। অধিকন্তু তাহারা কাহারও নিকট হইতে উপহারের নামেও যাহাতে উৎকোচ গ্রহণ করিতে না পারে, সেইজন্য তিনি তাহাদের নিকট হইতে লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। এই সকল ক্ষতির জন্য ক্লাইভ প্রস্তাব করেন যে, কোম্পানি এই দেশের লবণের যে একচেটিয়া ব্যবসায় করিতেছিল, তাহার লভ্যাংশ কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু ডিরেক্টরগণ উহার পরিবর্তে কর্মচারীদের বেতন বাড়াইয়া দেন। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে সৈন্যদিগকে শান্তির সময়ও 'দ্বিগুণ ভাতা' দেওয়া হইত। ক্লাইভ তাহা তুলিয়া দেন। সৈন্যরা ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু ক্লাইভের অনমনীয় দৃঢ়তায় তাহারা কোন অশান্তি বা বিদ্রোহ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ১৭৬৭ সালে ক্লাইভ স্বদেশে ফিরিয়া যান। অতঃপর তাঁহার শত্রুরা তাঁহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনেন, কিন্তু পার্লামেন্টের বিচারে তাঁহাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করা হয় (১৭৭৩)। কিন্তু ইংল্যান্ডের জনমত তাঁহার ক্রটি ক্ষমা করে নাই। শেষে লোকনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া ১৭৭৫ সালে ক্লাইভ আত্মহত্যা করেন।

ক্লাইভের শেষ জীবন

ক্লাইভের কৃতিত্ব

রবার্ট ক্লাইভ এদেশে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠাতা। অথচ তাঁহার চরিত্রে অনেক অমার্জনীয় দোষ-ক্রটিও ছিল। কেহ কেহ তাঁহাকে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মনে করিলেও বাস্তবিক পক্ষে তিনি সেইরূপ ছিলেন না। সামরিক ব্যাপারে বা শাসন কার্যে কোথাও তিনি অসাধারণ প্রতিভা দেখাইতে পারেন নাই। অথচ অদৃষ্ট বলে তিনিই এই দেশে বৃটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, কর্মকৌশল প্রভৃতিতে ডুপ্লের তুলনায় ক্লাইভ হীন ছিলেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল ডুপ্লের প্রতিকূল, আর ক্লাইভের অনুকূল। তখন বাংলাদেশে নবাবের যে নিদারুণ অধঃপতন হইয়াছিল, তাহার ফলে ক্লাইভ অপ্রত্যাশিত সফলতা লাভ করেন। ব্যক্তিগত জীবনেও ক্লাইভ ছিলেন নিতান্ত সাধারণ মানুষ। অনেকে তাঁহার সাহস ও ধৈর্যের প্রশংসা করেন। কিন্তু ঠিক বীরের মত সাহস ক্লাইভের ছিল না। তিনি ছিলেন দুঃসাহসী। আর ক্লাইভের নীতি-জ্ঞান বলিয়া কিছুই বোধ হয় ছিল না। কার্যসিদ্ধির জন্য কোন অন্যায়কেই তিনি অন্যায় মনে করেন না। তাঁহার যে অপরিমেয় ধনলিপ্সা ছিল, সেকথা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাঁহার হস্তক্ষেপ কতটা স্বদেশের জন্য, আর কতটা নিজের এবং অনুচরদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, তাহা সঠিক নির্ণয় করা এখন কঠিন। সে যাহাই হউক, তিনিই যে ভারতে ইংরেজ শক্তি প্রতিষ্ঠাতার গৌরব লাভের অধিকারী, এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। এই জন্যই তিনি ইংল্যান্ডের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। সমষ্টিগতভাবে ইংরেজ জাতির স্থিরবুদ্ধি, একাগ্র লক্ষ্য, নিয়মানুবর্তিতা ও উচ্চাভিলাষের উদ্দীপনা ক্লাইভের সাফল্যে সহায়তা করিয়াছে। ক্লাইভ সম্পর্কে ডঃ আর. সি. মজুমদার বলেন—"তাঁহার দক্ষতা, ধৈর্য, পরিশ্রম ও পরিণামদর্শন ছিল উচ্চমানের এবং তিনি সর্বদা পরিণতি সম্পর্কে অনমনীয় ও পরিষ্কার ভাবধারা লইয়া কাজ করিতেন।"

বাংলাদেশের শাসন বিভ্রাট ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঃ
রবার্ট ক্লাইভের পর ভেরেলস্ট (Verelst) (১৭৬৭-৬৯) এবং কার্টিয়ার (Cartier) (১৭৭০-৭২) পরপর কোম্পানির গভর্নর নিযুক্ত হন। ক্লাইভের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের শাসনকালে তাঁহার দ্বৈত শাসনের কুফল পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায় এবং দেশ অত্যাচার, দুর্নীতি ও দুঃখ-দুর্দশায় নিষ্পেষিত হইতে থাকে। এই দুঃখ-দুর্দশা ১৭৭০ (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) খ্রিস্টাব্দের নিদারুণ দুর্ভিক্ষের দ্বারা আরও প্রকট হইয়া উঠে। আজও সেই দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। অনাহারে ও মহামারীর আক্রমণে বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারায়। কিন্তু এই দুর্দিনেও কোম্পানির রাজস্ব আদায় সমানভাবেই চলিতে থাকে। ১৭৬৯ সালের ২৪শে মে রিচার্ড বেচার নামে কোম্পানির এক কর্মচারী বর্ণনা করেন—"একজন ইংরেজকে এই কথা চিন্তা করিবার কারণ আছে বলিয়া দুঃখ দিবে যে, কোম্পানি কর্তৃক দেওয়ানী গ্রহণ করিবার পর হইতে জনসাধারণের অবস্থা পূর্বের চাইতে খারাপ হইতে থাকে। তবুও আমার ভয় হইতেছে ব্যাপারটি সন্দেহাতীত... । এই সুন্দর দেশ, যাহা অত্যন্ত অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী সরকারের অধীনে উন্নতিশীল ছিল, তাহা আজ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে।"[৪] এইরূপে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার দোষ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিলে সকল বিশৃঙ্খলা নির্ধারণের জন্য বিলাতের কর্তৃপক্ষ ওয়ারেন হেস্টিংস (Warren Hastings) নামে একজন কর্মচারীকে বাংলাদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন (১৭৭২)। তিনি নিজে স্বীকার করিয়া যান যে, ১৭৭১ সালে ১৭৬৮ সাল অপেক্ষা অধিক রাজস্ব আদায় হইয়াছিল।

(খ) মহীশূর

হায়দার আলী ঃ
ইংরেজগণ যখন ধীরে ধীরে বাংলাদেশে তাহাদের আধিপত্য বিস্তারে লিপ্ত এবং মধ্য ভারতে মারাঠা শক্তি খর্ব করিতে উদ্যত, সেই সময় দাক্ষিণাত্যের মহীশূরে একজন জাতীয় নেতার আবির্ভাব হয়; তিনিই হায়দার আলী। কর্ণাটের গোলযোগের মধ্যে—কখনও ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে এবং কখনও ইংরেজ ও হায়দ্রাবাদের নিজাম মুহাম্মদ আলীর মধ্যে—হায়দার আলী দৃঢ়ভাবে মহীশূরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার পরিবার নিজদিগকে আরবের কোরাইশ বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করেন। তাঁহাদের বর্ণনা অনুসারে, হায়দার আলীর একজন পূর্বপুরুষ বাগদাদ হইতে ভারতে আগমন করেন। একজন সৈনিকের পুত্র হায়দার আলী ১৭৪৯ সালে মহীশূরের হিন্দু রাজার চাকুরিতে বহাল হন। স্বীয় যোগ্যতা বলে তিনি শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী হন এবং রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। দক্ষিণের বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি রাজাকে সহজেই ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং ১৭৬৬ সালে নিজেকে মহীশূরের রাজা হিসেবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। নিজাম ও মারাঠা রাষ্ট্রের বেদনোর, সুন্দা, সেরা, গুটি এবং এরূপ আরও কতকগুলি এলাকা জয় করিয়া তিনি স্বীয় রাষ্ট্রের সীমারেখা বর্ধিত করেন। এইভাবে হায়দার আলী দক্ষিণ ভারতে একজন প্রতাপশালী এবং শক্তিশালী শাসক হিসাবে সফলতা লাভ করেন।

বংশ পরিচয়
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৬৭) ঃ

১৭৬৬ সালের নভেম্বর মাসে মাদ্রাজের ইংরেজ সরকার হায়দার আলীর বিরুদ্ধে নিজামকে সহায়তা করিতে সম্মত হয় এবং এই সহায়তার বিনিময়ে 'উত্তর সরকার' নামক প্রদেশটি ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করা হইবে বলিয়াও সাব্যস্ত হয়। শেষ পর্যন্ত মারাঠা, নিজাম ও ইংরেজ সরকার হায়দার আলীর বিরুদ্ধে একটি ত্রিপক্ষীয় যুদ্ধজোটে চুক্তিবদ্ধ হয়। কিন্তু শীঘ্রই মারাঠাদিগকে হায়দার আলী স্বপক্ষে ক্রয় করিয়া লন। ১৭৬৭ সালের এপ্রিল মাসে একটি ইংরেজ কোম্পানির সহায়তায় হায়দ্রাবাদের নিজাম মহীশূর আক্রমণ করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি ইংরেজদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হায়দার আলীর পক্ষ অবলম্বন করেন। এই সম্মিলিত বাহিনী চাঙ্গামা গিরিপথ ও ত্রিঙ্কোমালিতে ইংরেজদের হাতে পরাজিত হয়। নিজাম পুনরায় হায়দার আলীর পক্ষ ত্যাগ করেন এবং ১৭৬৮ সালেই ইংরেজদের সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি করেন। এই চুক্তি দ্বারা নিজাম তাঁহার পুরাতন সন্ধির শর্তাবলি মানিয়া লন এবং হায়দার আলীকে জোরদখলকারী ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে শায়েস্তা করিবার জন্য ইংরেজ ও কর্ণাটের নবাবের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে সম্মত হন। এই খামখেয়ালি নিজামের সঙ্গে যুদ্ধ জোটের ফলে হায়দার আলীর ক্রোধ ইংরেজদের উপর পতিত হয়। ইংরেজ ডাইরেক্টরগণ ভারতে বৃটিশ শক্তি আরও অধিক বিস্তার করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না, বরং যাহা অধিকার করা হইয়াছে, তাহা কুক্ষিগত ও আয়ত্তাধীন রাখিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন।

হায়দার আলীর বিরুদ্ধে জোট

নিজাম যদিও হায়দার আলীর পক্ষ ত্যাগ করিয়া ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করেন, তবুও হায়দার পূর্ণ তেজে যুদ্ধ চালাইয়া যান। ইংরেজ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করিয়া তিনি মাঙ্গালোর অধিকার করেন এবং ১৭৬৯ সালের মার্চ মাসে মাদ্রাজ নগরের পাঁচ মাইলের মধ্যে চলিয়া যান। অতঃপর এপ্রিল মাসে ইংরেজগণ হায়দার আলী কর্তৃক প্রদত্ত ও আরোপিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করিতে বাধ্য হয়। এই চুক্তির ফলে যুদ্ধবন্দি বিনিময় হয় এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হয়। ইহাকে একটি প্রতিরক্ষামূলক চুক্তিও বলা যায়। কারণ, ভবিষ্যতে কোন শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হইলে হায়দার আলীকে সাহায্য করিবার জন্য ইংরেজগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

হায়দার কর্তৃক আরোপিত শান্তিচুক্তি

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৮০) ঃ

শীঘ্রই ইংরেজগণ প্রথম ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধের পর উভয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করে। ১৭৭১ সালে মারাঠাদের বিরুদ্ধে হায়দার আলী যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং সেই যুদ্ধে ইংরেজগণ তাঁহাকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলে তিনি ইংরেজদের উপর ক্ষিপ্ত হন। এই ব্যাপারটি ইংরেজদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে হায়দারকে সন্দেহযুক্ত করিয়া তোলে। এইভাবে মহীশূর প্রধান সর্বদাই ইংরেজদিগকে পুনরায় আঘাত হানিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে থাকেন। অপরদিকে ইংরেজদের কর্কশ ব্যবহারে হায়দ্রাবাদের নিজাম অত্যন্ত বিরক্ত হন। অতঃপর বোম্বাইয়ের ইংরেজদের সহিত যুদ্ধরত মারাঠাদের সঙ্গে নিজাম একটি মহৎ জোট গঠন করেন এবং ১৭৭৯ সালে হায়দার আলীও এই জোটে যোগদান করেন। ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ

ইংরেজ কর্তৃক চুক্তি ভঙ্গ

ইংরেজদের পরাজয় (১৭৮০)

চলাকালীন ১৭৭৮ সালে ইউরোপে পুনরায় ইঙ্গ-ফরাসি সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। ইউরোপীয় সংঘর্ষের পরিণতি হিসাবে ইংরেজগণ একে একে ফরাসিদের ভারতীয় বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহ অধিকার করিতে থাকে। ফরাসি বাণিজ্য কেন্দ্র মাহে (Mahe) ছিল মহীশূর রাজ্যের আওতাধীন। হায়দার আলীর প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া ইংরেজগণ ১৭৭৯ সালে মাহে অধিকার করিলে তিনি ধরিয়া লন যে, ইঙ্গ-ফরাসি সংঘর্ষে তাঁহার নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করা হইয়াছে। সুতরাং তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণার পর মুহূর্তেই নিজাম ও মারাঠাগণ ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তি করেন। নির্ভীক হায়দার ৮০,০০০ সৈন্য লইয়া মৃত্যু ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা সহকারে কর্ণাটের সমতল ভূমিতে অবতরণ করেন। ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে কর্নেল বেইলীর নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনীকে পরাজিত করিয়া তিনি আর্কট অধিকার করেন। সমগ্র পরিস্থিতি ইংরেজদের জন্য খুবই গুরুতর আকার ধারণ করে। স্যার আলফ্রেড লাইলের (Sir Alfrad Lyall) ভাষায় ঃ **"ভারতবর্ষে ইংরেজদের ভাগ্য** সর্বনিম্ন মানে পতিত হইয়াছিল।[৮]

হায়দার আলী ভাগ্য বিপর্যয়

এই পরাজয়ের গ্লানি পরিশোধ করিবার জন্য ভারতের ইংরেজ প্রধান সেনাপতি স্যার আয়ার কূটকে হায়দর আলীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস বেরারের রাজা ও মহাদাজী সিন্ধিয়াকে হায়দার আলীর পক্ষ হইতে ছিনাইয়া লন। এই সমস্ত দুর্ঘটনায় অবিচলিত হায়দার আলী তাঁহার চিরাচরিত উদ্যম ও সাহস লইয়া কার্য চালাইয়া যান, কিন্তু অনতিবিলম্বে তিনি পোর্টো নভো (Porto Novo) নামক স্থানে ১৭৮১ সালে আয়ার কূট কর্তৃক পরাজিত হন। যাহা হউক, কর্নেল ব্রেইথওয়েটের (Col Braithwaite) নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনী মহীশূর বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়। অতঃপর ইংরেজ ও মহীশূর বাহিনীর মধ্যে সংঘটিত কতকগুলি অমীমাংসিত

হায়দার আলীর মৃত্যু (১৭৮২)

যুদ্ধের পর বর্ষাকাল আগমনের সাথে সাথে সম্মুখ যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যায়। হায়দার আলী আর যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে পারেন নাই। কঠিন ক্যান্সার রোগের আক্রমণে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া যায় এবং ১৭৮২ সালের ৭ই ডিসেম্বর তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। অপরদিকে ইংরেজপক্ষে স্বাস্থ্যভঙ্গের দরুন জেনারেল স্টুয়ার্টকে ইংরেজ বাহিনীর প্রধান সেনাপতির ভার অর্পণ করিয়া আয়ার কূট অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৭৮৮ সালের এপ্রিল মাসে মাদ্রাজে প্রাণ ত্যাগ করেন।

হায়দার আলীর কৃতিত্ব ঃ

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর যেসব দেশপ্রেমিক ভারতে শক্তিশালী প্রতিভা হিসাবে ইতিহাসে স্থান পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হায়দার আলী সর্বশ্রেষ্ঠ। একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি হইয়াও স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি একজন সাধারণ সৈনিকের পদ হইতে ক্রমে মহীশূরের সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হন। ডঃ আর. সি. মজুমদার বলেন ঃ "সম্পূর্ণ একজন স্বপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি হিসাবে তিনি দৃঢ় সংকল্প, প্রশংসনীয় সাহস, একটি তীক্ষ্ণ মেধা ও একটি ধারণাক্ষম স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন, যাহা অনেকাংশে তাঁহার অশিক্ষিত দিককে সমভার দিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে শান্ত, বিচক্ষণ ও নির্ভীক, তিনি শাসনকার্যের ব্যাপারে ছিলেন উল্লেখযোগ্য, বুদ্ধিমান ও তেজস্বী এবং রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যকলাপ ও যোগাযোগ নিজের চক্ষুর সামনে

নিয়মিত ও তাড়াতাড়ি সম্পাদন করিতেন।"[৬] হায়দার আলী রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যকলাপে উপস্থিত থাকেন। অতি সরল ও অকপট স্বভাব এবং প্রতিজ্ঞা পালনের প্রতি তাঁহার দৃঢ় মনোভাবের দ্বারা তিনি সমস্ত দলের সম্মান লাভে সমর্থ হন। তাঁহার ন্যায় কঠোর পরিশ্রমী শাসক এবং নির্ভীক ও সুচতুর সেনানায়ক সবদেশেই বিরল। তিনিই মহীশূরের মত অতি ছোট একটি রাজ্যকে সমগ্র ভারতের একটি প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত করেন। "একজন মুসলমান তৎসঙ্গে বিদেশী, কোন প্রকার রাজনৈতিক স্থান ছাড়াই হায়দার আলী স্বীয় গুণাবলি দ্বারা নিজেকে মহীশূর রাজ্যে অজ্ঞাতনামা হইতে সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং তাঁহার উদ্যম ও শক্তির দ্বারা সেই ছোট ও অজ্ঞাত রাষ্ট্রকে ইতিহাসের আলোতে তুলিয়া লন। তবুও তিনি প্রধানত স্মরণীয় থাকিবেন বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে একজন শক্তিশালী যোদ্ধা হিসাবে।"[৭]

হায়দর আলী সর্বদা আইন-শৃঙ্খলা পছন্দ করিতেন এবং এইজন্যই তিনি দেশে উপযুক্ত শাসনব্যবস্থা চালু করিলে মহীশূর অতি তাড়াতাড়ি উন্নতির পথে আগাইয়া যায়। ডঃ আর. সি. মজুমদার বাওরিংয়ের উদ্ধৃতি দেন এইভাবে ঃ "... তিনি ছিলেন একজন সাহসী, মৌলিক এবং একজন দুঃসাহসিক সেনানায়ক, যুদ্ধ কৌশলে সুনিপুণ এবং সম্ভাবনায় ভরপুর, সদা উদ্যমশীল, এবং পরাজয়ে কখনও তিনি হতাশ হইতেন না। অঙ্গীকার পূরণে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, এবং ব্রিটিশদের ব্যাপারে তাঁহার নীতি ছিল খোলাখুলি। অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে তাঁহার কঠোরতা, এবং যে ভীতি তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও মহীশূরে তাঁহার নাম প্রশংসার সহিত না হইলেও সম্মানের সহিত স্মরণ করা হয়। কখনও কখনও যে নিষ্ঠুরতা তিনি দেখাইয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া তাঁহার নির্ভীকতা ও কৃতকার্যতা জনসাধারণের মনে স্থায়ী আসন লইয়া রহিয়াছে।"[৮]

টিপু সুলতান

টিপু সুলতান হায়দার আলীর একজন সুযোগ্য সন্তান এবং পিতার ন্যায় তিনিও উপমহাদেশের একজন সাহসী, উদ্যমশীল ও সমরকুশলী নেতা। ডঃ মাহমুদ হোসেনের মতানুসারে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে টিপু সুলতানই একমাত্র ভারতীয়, যিনি ব্রিটিশদের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতি হুমকি পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষ করেন এবং এই হুমকিকে বিনষ্ট করিবার জন্য তাঁহার সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তাঁহার জীবন হইল ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে একটি অবিরাম সংগ্রাম; ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের মূল আদর্শ।[৯] হায়দার আলীর মৃত্যুর পর টিপু সুলতান ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন এবং পরবর্তী বৎসর (১৭৮৩) ইংরেজ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার ম্যাথুসকে তাঁহার সমস্ত লোকজনসহ গ্রেফতার করেন। সেই বৎসরেই ইউরোপের ইঙ্গ-ফরাসি শান্তি-চুক্তির খবর ভারতে পৌছে। মাদ্রাজের নূতন গভর্নর ম্যাকার্টনি টিপুর সহিত শান্তিচুক্তি করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার উদ্যোগে ইংরেজ ও টিপু সুলতানের মধ্যে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় (মার্চ, ১৭৮৪)। এই চুক্তির বৈশিষ্ট্য হইল উভয় পক্ষে ভবিষ্যৎ দেশজয় রোধ এবং যুদ্ধবন্দি বিনিময়। টিপু সুলতান তাঁহার সমস্ত এলাকা ফিরিয়া পান এবং ইংরেজগণ তাহাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ হারায়। ওয়ারেন

ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি

হেস্টিংস এই চুক্তিতে সম্মতি প্রদানে অক্ষমতা প্রকাশ করেন এবং তাঁহার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলেন, 'কি ধরনের লোক এই লর্ড ম্যাকার্টনি! আমি তবুও বিশ্বাস করি যে এই শান্তিচুক্তি সত্ত্বেও তিনি কর্ণাট পুনরুদ্ধার করিয়া লইবেন।" ডঃ স্মিথ বলেন, "দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ইংরেজদের অপমানের সহিত সমাপ্ত হয়।"[১০]

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৯০) ঃ

ম্যাঙ্গালোরের চুক্তি লইয়া ইংরেজগণ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর হইতে তাহারা টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধের অভিসন্ধি করিতে শুরু করে এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য শক্তি, বিশেষ করিয়া নিজাম ও মারাঠাদের সঙ্গে জোট পাকাইতে থাকে। তাহারা টিপু সুলতানের রাজ্যে বিদ্রোহের জন্য উস্কানি দিতে থাকে এবং তাঁহার বিদ্রোহী প্রজাদিগকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতে থাকে। শেষ মহীশূর-মারাঠা বিবাদে ইংরেজগণ কোন পক্ষই অবলম্বন করে নাই। কারণ, তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল উভয় পক্ষই যাহাতে দুর্বল হইয়া যায়। কিন্তু টিপু সুলতান কর্তৃক প্যারিস ও কন্সট্যান্টিনোপলে সামরিক ও বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যাপারে তাহারা খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া মহীশূরের সঙ্গে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য সামগ্রিক প্রস্তুতি আরম্ভ করে। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস মারাঠা ও নিজামের সঙ্গে টিপুর বিরুদ্ধে আপসমূলক কথাবার্তা আরম্ভ করেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, মহীশূরের পরাজয়ের পর কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্র নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র ভূ-ভাগ যাইবে মারাঠাদের হাতে এবং নিজামের যে এলাকা হায়দার আলী দখল করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ফেরৎ পাইবেন। এইভাবে সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করিয়া কর্নওয়ালিস টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যুদ্ধের জন্য শুধুমাত্র প্রয়োজন রহিল কিছু ছলছুতার।

যুদ্ধের কারণ

শীঘ্রই যুদ্ধের যৌক্তিকতা আসিতে লাগিল। ১৭৮৯ সালে টিপু ত্রিবাংকুরের রাজাকে তাহার কুকীর্তির জন্য শাস্তি প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত দেশ আক্রমণ করেন। ইংরেজ কোম্পানি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার সিদ্ধান্ত নেয়, যদিও যুদ্ধ ছাড়াই টিপু ত্রিবাংকুরের রাজার সঙ্গে তাহার গোলমাল মিটাইয়া ফেলিতে রাজি ছিলেন। ১৭৯০ সালে কর্নওয়ালিস মারাঠা প্রধান নানা ফার্নাভিস ও নিজামের সঙ্গে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং অন্যান্য সমস্ত আশ্রিত রাষ্ট্র ও ছোট ছোট রাজাদিগকে টিপুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য ইংরেজগণ প্রেরণা দান করে। মহীশূরের রাণী আম্মানীর সঙ্গেও চুক্তি সম্পাদিত হয় এই মর্মে যে, টিপুর পরাজয়ের পর মহীশূরকে ইহার আইনানুগ শাসকের হাতে অর্পণ করা হইবে। এইভাবে টিপু সুলতানকে পরাভূত করিবার জন্য ইংরেজ কোম্পানি এক বিরাট যুদ্ধ জোট গঠন করে। ইতোমধ্যে টিপু ভারতের বাহিরের শক্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফ্রান্সের নিকট তিনি সাহায্যের জন্য পত্র লিখিয়া ব্যর্থ হন। কারণ, ফরাসি সরকার ইংরেজদের অসন্তুষ্টি উৎপাদন করিতে প্রস্তুত ছিল না। নিজাম ও মারাঠাদিগকে স্বপক্ষে টানিতেও টিপু ব্যর্থ হন। সুতরাং দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের ন্যায় তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধও টিপুকে একলা পরিচালনা করিতে হয়।

টিপুর বিরুদ্ধে ত্রিপক্ষীয় যুদ্ধ জোট

এই যুদ্ধ তিনটি অভিযানে প্রায় দুই বৎসরকাল স্থায়ী হয়। মেজর জেনারেল মেডোসের

অধীনে প্রথম অভিযানটি কোন চূড়ান্ত ফল প্রদানে ব্যর্থ হয়। কারণ, মেডোসের চাইতে টিপু অনেক উচ্চ মানের সমর কৌশল প্রদান করেন। অতঃপর ১৭৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড কর্নওয়ালিস সৈন্য পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। বেল্লোর ও আম্বরের মধ্য দিয়া বাঙ্গালোরে অভিযান করিয়া ১৭৯১ সালের মার্চ মাসে ইহা তিনি অধিকার করেন এবং টিপুর রাজধানী সেরিঙ্গাপটমের নয় মাইল পূর্বে অবস্থিত আরিকারায় পৌছেন। কিন্তু এইবারও টিপুর সুকৌশল যুদ্ধ নৈপুণ্যের নিকট কর্নওয়ালিস নতি স্বীকার করেন এবং বর্ষাকাল আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ম্যাঙ্গালোর প্রত্যাবর্তন করেন। ১৭৯১ সালের গ্রীষ্মকালে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং নভেম্বরে টিপু কোইম্বাটোর অধিকার করেন। কিন্তু শীঘ্রই কর্নওয়ালিস টিপুর সেরিঙ্গাপটমের পথের মধ্যবর্তী পার্বত্য দুর্গগুলি অধিকার করেন এবং টিপুর রাজধানীর পার্শ্ববর্তী এলাকসমূহ আক্রমণ করেন। তাঁহার সামরিক ও কূটনৈতিক বুদ্ধি দ্বারা টিপু একটি সম্পূর্ণ ধ্বংস এড়াইয়া যান। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারেন ভবিষ্যৎ প্রতিরক্ষা অসম্ভব।

সংঘর্ষ

দীর্ঘকাল আলোচনার পর উভয় পক্ষ একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং ১৭৯২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি সেরিঙ্গাপটমের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে টিপু সুলতান মিত্রতাকারী পক্ষকে তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা আদায় করিতে সম্মত হন। টিপু সুলতানের রাজ্যের অর্ধেক ভাগ তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দিতে হয়। কৃষ্ণা হইতে পানার নদীর অপর পাড় পর্যন্ত একটি বিশাল এলাকা নিজামকে দেওয়া হয়। একটি অংশ দেওয়া হয় মারাঠাদিগকে, যাহার পরিধি হইল মারাঠা সীমানা হইতে তুঙ্গভদ্র নদী পর্যন্ত। ইংরেজগণ লাভ করে কুর্গের রাজার উপর আধিপত্য, মালাবার, ডিণ্ডিগাল ও দক্ষিণ দিকে ইহার পার্শ্ববর্তী জিলাসমূহ এবং পূর্বে বড়মহল জিলা। নিঃসন্দেহে ইহা একটি কঠোর সন্ধি। ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল, যতদূর সম্ভব, এলাকা দখল করিয়া এবং টাকা আদায় করিয়া টিপু সুলতানের পক্ষ হইতে আগত বিপদ এড়াইয়া যাওয়া।

সেরিঙ্গাপটমের পতন ১৭৯২

এই চুক্তির দ্বারা টিপু সুলতান ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। ইহা তাঁহার অর্থনৈতিক ও সামরিক কাঠামো ধ্বংস করিয়া দেয়। অনেকগুলি পর্বত প্রমাণ অসুবিধার সম্মুখে তিনি সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তিনি যদি শুধু ইরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন, তবে ইহা হইত সম্পূর্ণ একটি আলাদা ইতিহাস। অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহ তাঁহার রাষ্ট্রের সম্পদরাজির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অধিকন্তু মিত্রপক্ষকে দেয় বিরাট অংকের বোঝা তাঁহার ঘাড়ে ভীষণভাবে চাপিয়া থাকে। মারাঠা সেনাবাহিনী কর্তৃক ধ্বংসকৃত তাঁহার রাজ্য শ্মশানে পরিণত হয়।

টিপুর উপর সন্ধির পরিণতি

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৯৯) ঃ

সেরিঙ্গাপটমের সন্ধির অপমান সহজে হজম করিবার মত ব্যক্তি টিপু সুলতান নহেন। মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনীর সেরিঙ্গাপটম ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিগত যুদ্ধের ধ্বংসাবলির সংস্কার সাধনে এবং অবাধ্য পলিগার ও অন্যান্য দুষ্কৃতিকারী লোকদিগকে শায়েস্তা করিতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। টিপুর একান্ত প্রচেষ্টা ছিল কর্নওয়ালিস কর্তৃক তাঁহার বিরুদ্ধে সৃষ্ট সুদীর্ঘ নিঃসঙ্গতা

বিগত যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি নির্ধারণে টিপুর প্রচেষ্টা

ভঙ্গ করা। তিনি শুধু প্রতিবেশী শক্তিগুলির সঙ্গেই ভাল সম্পর্ক স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন নাই, বরং ফ্রান্সের নেপোলিয়ান ও তুরস্কের সুলতান সেলিমের সঙ্গেও পত্রালাপ করেন। স্যার জন শোর গভর্নর জেনারেল থাকাকালীন ইংরেজগণ ১৭৮৪ সালের পিট-এর ইন্ডিয়া এ্যাক্ট (Pitt's India Act, 1784) অনুসারে ভারতে অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু ১৭৯৮ সালে ওয়েলেস্‌লি ভারতে আসিয়া আক্রমণাত্মক ও রাষ্ট্রীয় সীমা বর্ধনকারী নীতি অবলম্বন করেন। এই নীতি-পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া টিপু সুলতানও তাঁহার রাজধানীর প্রতিরক্ষা দৃঢ়করণে অশ্বারোহী বাহিনী সজ্জিত করেন। পদাতিক বাহিনীতে লোক ভর্তি ও সুশৃঙ্খল করিতে এবং একটি নৌবাহিনী গঠন করিতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। স্বদেশে তিনি কৃষি কাজের জন্য উৎসাহ প্রদান করেন এবং শীঘ্রই ইহা তাহার পূর্ব উন্নতি লাভ করে।

মহীশূরের উন্নতি ইংরেজদিগকে টিপু সুলতানের প্রতি পুনরায় ঈর্ষাপরায়ণ করিয়া তোলে। তাহাদের ভয় হইল, তাঁহার উদ্যম, যোগ্যতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা তিনি পুনরায় তাহাদের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতে পারেন। সুতরাং ওয়েলেসলি টিপু সুলতানের শক্তি চিরতরে ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর হন। যুদ্ধের কারণ হিসাবে ইংরেজগণ টিপুকে ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে। কিন্তু প্রশ্ন হইল, ইংরেজগণ যদি টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিতে পারে, তবে টিপু কেন অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিতে পারিবেন না? যাহা হউক, পরিষ্কার আক্রমণাত্মক কর্মসূচি লইয়া ১৭৯৯ সালের ১৯শে জানুয়ারি লর্ড ওয়েলেসলি স্বয়ং মাদ্রাজে উপস্থিত হন। একটি সাহায্যকারী চুক্তির মাধ্যমে তিনি নিজাম ও মারাঠাদের সমর্থন আদায় করেন।

মহিশূরের বিরুদ্ধে ইংরেজদের ঈর্ষা ওয়েলেসলির যুদ্ধ পাঁয়তারা

ওয়েলেস্‌লি ১৭৯৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি টিপু সুলতানকে চিরতরে ধ্বংস করিবার জন্য জেনারেল হ্যারিসের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। ইংরেজদের প্রস্তুতি পাকাপোক্ত হয়। সেনানায়কের হাতে সম্পূর্ণ শক্তি অর্পণ করা হয়। ব্রিটিশ রণতরীগুলি সাগরে থাকিয়া ফরাসি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কড়া প্রহরায় নিযুক্ত থাকে। নিজাম ও মারাঠাদের সেনাবাহিনীকে হাতের কাছে পাইবার আশ্বাস নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়। কর্ণাট সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত। সর্বোপরি ওয়েলেসলি স্বয়ং মাদ্রাজে থাকিয়া প্রত্যেক পদক্ষেপ অগ্রিম পরিচালনা করিতে থাকেন। ৩রা ফেব্রুয়ারি জেনারেল স্টুয়ার্ট কেনানোর হইতে অগ্রসর হন। ৮ই মার্চ স্টুয়ার্ট সেফাশোরের নিকট টিপু সুলতানকে পরাজিত করেন। মল্লভেলিতে টিপু পুনরায় হ্যারিসের হাতে পরাজিত হন। হায়দ্রাবাদ হইতে আগত সেনাবাহিনীর ভার ছিল ওয়েলেসলির উপর। টিপু সুলতান বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং সুনিপুণ যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শন করেন। কিন্তু স্বীয় সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাঁহার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং তিনি অতঃপর তাঁহার রাজধানীর দিকে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। ইংরেজ বাহিনী সেরিঙ্গাপটমের সম্মুখে আগমন করিয়া ইহা অবরোধ করে। ১৭৯৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল ইংরেজ বাহিনী ইহা অধিকার করে। রাজধানী রক্ষা করিতে যাইয়া টিপু সুলতান বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর ইংরেজ বাহিনী শহরটিকে সম্পূর্ণভাবে লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করে। "এইভাবে

ইংরেজদের সর্বাত্মক প্রস্তুতি টিপুর পরাজয়

টিপুর পরাজয়

ভারতবর্ষের একটি নেতৃস্থানীয় শক্তি এবং ইংরেজদের অত্যন্ত প্রবল ও ভয়াবহ দুশমনদের মধ্যে একজনের পতন ঘটে।"[১১] সেরিঙ্গাপটমের পতনের পর মহীশূর রাজ্য ইংরেজদের পদাশ্রিত হয়। টিপু সুলতানের পুত্রদিগকে নির্বাসিত করা হয় এবং রাজ্যটিকে ভাগাভাগি করিয়া ইংরেজগণ মোটা অংশ গ্রহণ করে। নিজাম অতি অল্প অংশ লাভ করেন। মধ্য মহীশূর পুরাতন শাসক পরিবারের একজনের হাতে অর্পণ করা হয়।

টিপ সুলতানের কৃতিত্ব ঃ

টিপু সুলতান ঐতিহাসিকদের ব্যাপারে বিশেষভাবে দুর্ভাগ্যবান। একজন শাসককে হেয় প্রতিপন্ন করিতে ইতিহাস কদাচ এইরূপ বিকৃত হইয়াছে। অনেক দিক হইতে টিপু ভারতের ইতিহাসে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ভারতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুদৃঢ় বাধা। ইংরেজদিগকে বিরোধিতা করিবার ব্যাপারে তাঁহার নীতি ছিল আপসহীন। একজন কঠোর চরিত্রের অধিকারী, স্বীয় শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন পাপাচার হইতে মুক্ত, আল্লাহর প্রতি তাঁহার ছিল কঠোর বিশ্বাস। তিনি বেশ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। ফার্সি, কানারী ও উর্দু তিনি অনর্গল বলিতে পারিতেন এবং একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থাগারের অধিকারী ছিলেন।

ভারতীয় ইতিহাসে টিপুর স্থান তাঁহার চরিত্র

একটি উদ্ভাবনী মনের অধিকারী টিপু সুলতান সরকারি প্রচেষ্টায় অনেকগুলি কার্যকরী সংস্কার উদ্ভাবন করেন। রাজা হিসেবে তাঁহার প্রতিপত্তি অনুযায়ী তিনি একটি সর্বোচ্চ শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইন পরিষদ গঠন করেন। চাষাবাদের জমি বৃদ্ধি করিবার ব্যাপারে তিনি সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকেন এবং এই উদ্দেশ্য সফলের জন্য তিনি সমস্ত সম্ভাব্য উৎসাহ প্রদান করেন। পতিত জমি অতি সহজ শর্তানুসারে চাষীদের প্রদান করা হয়। শিল্পোন্নতির গুরুত্ব তিনি অনুধাবন করেন এবং তাঁহার বিভিন্ন সমস্যা ও সামরিক ব্যাপারে ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি স্থানীয় শিল্প কারখানায় উন্নতি ও উৎকর্ষতার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

তাঁহার সংস্কারসমূহ

আঠারো বৎসরের কর্মব্যস্ত ও ঘটনা প্রবাহে পরিপূর্ণ টিপু সুলতানের রাজত্ব পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি যাহা বলেন, তাহাই করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতি তাঁহার মনোভাবই তাঁহার নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। টিপু সুলতান এই কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, মুঘল সাম্রাজ্য স্বাধীন শক্তি হিসাবে ইহার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। দাক্ষিণাত্য যদিও অনেকগুলি শক্তিতে বিভক্ত, বিশেষ করিয়া নিজাম ও মারাঠাদের মধ্যে, তবুও তিনি পরিষ্কারভাবে দেখিতে পান, ইংল্যান্ড ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় শক্তিই শত্রু নহে। বৈদেশিক নীতিতে তিনি দুইটি সুস্পষ্ট পন্থা অবলম্বন করেন, যদিও উভয় পন্থাই একই লক্ষ্যে পরিচালিত। ইউরোপে ব্রিটিশদের অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ শত্রু ফরাসিদের সঙ্গে মিত্রতা করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত থাকেন এবং মুসলিন শক্তিবর্গ, যথা—তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্তানের সঙ্গেও তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। এইসব রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হইলে ইহা ইংরেজদের বিরুদ্ধে টিপু সুলতানের হাত দৃঢ় করিত। কিন্তু টিপুর প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। টিপু সুলতানের মূল্য ও কৃতিত্বের মহত্ত্ব

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতি তাঁহার মনোভাব ইংল্যান্ডই একমাত্র শত্রু

ইংরেজদের হাতে তাঁহার পরাজয়ের মাপকাঠিতে বিচার করা উচিত নহে। তাঁহার প্রকৃত মহত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে তাঁহার উদ্দেশ্যকে ইহার যুক্তিযুক্ত পরিসমাপ্তিতে লইয়া যাইবার প্রতি তাহার দৃঢ় সংকল্পের মধ্যে। তিনি জানিতেন, অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া তিনি লড়াই করিতেছেন এবং ইহাও জানিতেন ব্রিটিশ, নিজাম ও মারাঠাদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিবার আশা অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু এইসব কোন যুক্তিই তাঁহার সংকল্পে এতটুকু আঁচড় দিতে পারে নাই। একটি মহৎ কর্মের জন্য জীবন দান করিয়া টিপু সুলতান নিজেকে অমর করিয়া রাখেন।

(গ) সিন্ধু (১৮৪৩)

আফগানিস্তানের প্রসিদ্ধ অভিযাত্রী আহমদ শাহ আবদালীর পর বেলুচী আমির বা তালপুরা গোত্রের মীরদের অধীনে সিন্ধুতে তিনটি রাজ্য স্থাপিত হয়। এইগুলি হইল— হায়দ্রাবাদ, (বর্তমান পাকিস্তানে) খয়েরপুর ও মীরপুর। বহুদিন হইতে সিন্ধুতে ইংরেজদের বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িত ছিল। ১৭৫৮ সালে থাট্টায় স্থাপিত একটি কুঠি ১৭৭৫ সালে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং ১৭৯৯ সালে তালপুরা মীরদের নিকট প্রেরিত তাহাদের বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দলও কোন গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সফল করিতে ব্যর্থ হয়। সিন্ধু হইতে ফরাসি প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করিবার জন্য ১৮০৯ ও ১৮২০ সালে লর্ড মিন্টু সিন্ধুর আমিরদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। ১৮৩১ সালে আলেকজান্ডার বার্নস্ সিন্ধু নদী পরিদর্শন করেন এবং রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক হইতে সিন্ধুর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। সিন্ধুর প্রতিবেশী শিখ নেতা রণজিৎ সিং-এর সিন্ধুর উপর

শিখদের উদ্দেশ্য

লোলুপ দৃষ্টি ছিল, কিন্তু ইংরেজগণ শিখদের উদ্দেশ্য এই পর্যন্ত ব্যর্থ করিয়া আসিয়াছে এবং এখন ইংরেজগণ সিন্ধুর উপর স্বীয় কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করে। সিন্ধুকে বিভক্ত করিবার জন্য রণজিৎ সিং-এর একটি প্রস্তাবে ১৮৩১ সালে লর্ড বেন্টিংক বাধা প্রদান করেন। কিন্তু ১৮৩২ সালের একটি চুক্তি অনুসারে সিন্ধুর আমিরগণ ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য তাহাদের নদীসমূহ খুলিয়া দিতে বাধ্য হন। তবে শর্ত রহিল, এইসব নদী দিয়া কোন সামরিক মালপত্র এবং সশস্ত্র জাহাজ বা নৌকা গমনাগমন করিতে পারিবে না। ব্রিটিশগণ সিন্ধুতে শিখদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে বাধা প্রদান করে—এই অজুহাতে ১৮৩৮ সালে লর্ড অকল্যান্ড পুরস্কার হিসাবে সিন্ধুতে একজন ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি স্থাপন করেন। শিখগণ যদিও সিন্ধুতে প্রবেশ করিতে ব্যর্থ হয়, কিন্তু অতি শীঘ্রই ইংরেজদের অফিসারগণ বিভিন্ন আপত্তিজনক উপায়ে সিন্ধীদের নিকট হইতে তাহাদের স্বাধীনতা ছিনাইয়া লয়।

প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের প্রারম্ভে ইংরেজগণ সিন্ধুর ভিতর দিয়া একটি সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করে। ইহা ছাড়াও আফগানিস্তানের নির্বাসিত আমির ও একজন ব্রিটিশ ক্রীড়নক শাহ শুজার ভরণ-পোষণের নিমিত্ত নগদ অর্থ প্রদান করিবার জন্য লর্ড অকল্যান্ড সিন্ধুর আমিরদিগকে বাধ্য করেন। তাহাদের সংকোচ উপলব্ধি করিয়া ইংরেজগণ আমিরদিগকে এই মর্মে সাবধান করে যে, ব্রিটিশ সরকারের নিকট "তাহাদিগকে ধ্বংস ও নির্মূল করিবার মত শক্তি আছে......।" অতঃপর আমিরগণ ব্রিটিশ দাবিতে সম্মতি প্রদান করেন। অধিকন্তু, ১৮৩৯ সালের একটি সদ্য সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে সিন্ধুতে ভরণ-পোষণের নিমিত্ত বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা আদায় করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করা হয় এবং

সিন্ধুকে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ আশ্রয়ে অর্পণ করা হয়। লর্ড অকল্যান্ডের উত্তরাধিকারী লর্ড এ্যালেনবরা আফগান যুদ্ধের অত্যন্ত সংকটাপূর্ণ বৎসরে সিন্ধুকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করেন। তবুও আমিরগণ ব্রিটিশদের প্রতি অনুগত থাকেন। এতদসত্ত্বেও ইংরেজগণ সিন্ধুর আমিরদিগকে অবাধ্যতার জন্য দোষী সাব্যস্ত করিয়া সিন্ধুতে রাজপ্রতিনিধি মেজর জেমস আউটরামকে বদলি করে, এবং তদস্থলে চার্লস নেপিয়ারকে সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতা অর্পণ করিয়া নিযুক্ত করা হয়। নেপিয়ার স্বেচ্ছাচারীরূপে খয়েরপুরে একটি উত্তরাধিকারী সংগ্রামে হস্তক্ষেপ করেন এবং তাহাদের উপর একটি চুক্তি চাপাইয়া দিয়া আমিরদিগকে টাকা তৈয়ার করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন এবং সিন্ধু নদীতে ব্যবহৃত ব্রিটিশ জাহাজের জ্বালানি যোগাইবার জন্য সিন্ধুর কিছু অংশ ছিনাইয়া লন। তিনি এমনভাবে কাজ করিতে থাকেন, যেন সিন্ধু ইতোমধ্যেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে এবং "যেন ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী ইহাকে বিকাইয়া দিবার অধিকার প্রশ্নাতীত ও নিঃসন্দেহ।" অপরদিকে চুক্তির কথা বলিয়া নেপিয়ার আমিরদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে খয়েরপুর ও হায়দ্রাবাদের মধ্যবর্তী একটি মরুদুর্গ ইমামগড়ের দিকে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই ১৮৪৩ সালের প্রথমদিকে ইহাকে ধ্বংস করেন।

ব্রিটিশ কর্তৃক টাঁকশালের ভার গ্রহণ

সিন্ধুর জনগণ বেশ কিছু বৎসর ব্রিটিশ অত্যাচার সহ্য করে। কিন্তু অতঃপর তাহারা বিদ্রোহ করিয়া ১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ রেসিডেন্সী আক্রমণ করে। ইংরেজ ও বেলুচীদের মধ্যে তখন প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সিন্ধুর অগণিত সাধারণ মানুষ সুশৃঙ্খল অথচ স্বল্প সংখ্যক ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়। ফলে শুধু "মীরপুরের ব্যাঘ্র" শের মুহাম্মদ ব্যতীত সমস্ত বেলুচী আমিরগণ আত্মসমর্পণ করেন। শের মুহাম্মদ বেশ কিছুদিন বাধা প্রদান করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হায়দ্রাবাদ হইতে ছয় মাইল দূরবর্তী দাদু নামক স্থানে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন এবং তারপর যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। ১৮৪৩ সালের আগস্ট মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে সিন্ধুকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং আমিরদিগকে নির্বাসিত করা হয়। পরবর্তীকালে এই বেআইনী অন্তর্ভুক্তিকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করিবার জন্য ইংরেজগণ আমিরদিগকে সিন্ধুতে শাসন সংক্রান্ত অরাজকতা সৃষ্টির জন্য দায়ী করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমিরদের অধীনে জনসাধারণ বেশ সুখীই ছিল।

চূড়ান্ত সংঘর্ষ ও সিন্ধু অধিকার

(ঘ) অযোধ্যা (১৮৫৬)

উপমহাদেশে দ্রুত সম্প্রসারণশীল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত অযোধ্যার মত একটি বৃহৎ প্রদেশের অন্তর্ভুক্তি এমন একটি আগ্রাসী দৃষ্টান্ত যাহা কোন যুগের কোন আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেই স্বীকৃত নহে। 'শাসিতদের মঙ্গলার্থে' বলিয়া উল্লিখিত বুলির দ্বারা ইংরেজ কর্তৃক ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহের করায়ত্ত করিবার ব্যাপারে অযোধ্যার অন্তর্ভুক্তি একটি সঠিক উদাহরণ। ১৮০১ সালে স্বাক্ষরিত লর্ড ওয়েলেসলির চুক্তি অনুযায়ী অযোধ্যাকে একটি করদ রাজ্য হিসাবে রাখা হয়, যদ্দারা অযোধ্যার নবাবকে ক্ষমতাহীন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই ধরনের দ্বৈত শাসনের ফলে দেশে অরাজকতা এবং প্রজাসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা একটি সাধারণ ব্যাপার। অযোধ্যার প্রশাসনের এই দোষ লর্ড বেন্টিংক ও লর্ড হার্ডিঞ্জ

উভয়েই অনুভব করেন। কিন্তু ইংরেজ উদ্ভাবিত এই শাসনব্যবস্থার মৌলিক ত্রুটি দূরীকরণার্থে তাঁহারা কিছুই করিয়া যান নাই।

লর্ড ওয়েলেসলির ১৮০১ সালের চুক্তি

১৮৪৮ সাল হইতে অযোধ্যায় পরপর নিযুক্ত ব্রিটিশ প্রতিনিধি কর্নেল স্লীম্যান এবং কর্ণেল আউটরাম এই অবস্থা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁহারা ইংরেজদের এই বেআইনি অন্তর্ভুক্তি নীতির বিরোধিতা করেন। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাদের নিকট সাম্রাজ্যের মধ্যখানে অবস্থিত এই বিশাল স্বাধীন রাষ্ট্র একটি চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়ায় এবং তাই ইহাকে যত শীঘ্র সম্ভব মুছিয়া ফেলিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর হন। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ অধিকার করিবার জন্য উত্তম শাসনব্যবস্থার লোভ দেখানোই ছিল সর্বোত্তম কৈফিয়ত; এবং কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ও (Court of Director) ইহার পুরাপুরি অন্তর্ভুক্তির আদেশ দেন। এইভাবে ১৮৫৬ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি কর্নেল আউটরাম অযোধ্যার পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি ঘোষণা করেন। অযোধ্যার সর্বশেষ শাসক ওয়াজেদ আলী শাহকে বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা ভাতা দিয়া কলিকাতায় নির্বাসিত করা হয়।

ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে এবং কুশাসনের ধুয়াটি মূলত স্থানীয় আইনগত শাসকদের মুখ বন্ধ করিবার একটি অজুহাত মাত্র। অযোধ্যায় কুশাসন প্রবর্তনের জন্য ইংরেজগণ নিজেরাই সর্বোতভাবে দায়ী। করদ ব্যবস্থা এবং বিভিন্নভাবে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার বস্তুত অযোধ্যার শাসনব্যবস্থাকে ধ্বংসই করিয়া দেয়। স্যার হেনরী লরেন্স সঠিকভাবেই মন্তব্য করেন, "অযোধ্যার ব্যাপারে

সমালোচনা

প্রত্যেক লেখক কর্তৃক পরিবেশিত ঘটনাবলি একটি কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, সেই প্রদেশে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ ইহার সভাসদবর্গ ও জনসাধারণের জন্য যেরূপ অনিষ্টকর, ঠিক তদ্রূপ ব্রিটিশ সুনামের জন্যও লজ্জাজনক ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে।" অযোধ্যার অন্তর্ভুক্তির দ্বারা "একটি জাতির অবস্থার স্পষ্ট লঙ্ঘন" প্রকাশ পায়, যা দ্বারা একটি পুরাতন চুক্তির প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করা হইয়াছে।

(ঙ) পাঞ্জাব (১৮৪৯)

রণজিৎ সিং কর্তৃক প্রবর্তিত পাঞ্জাবের শিখদের সামরিক রাজত্ব ১৮৩৯ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। এই ধরনের অন্যান্য রাজত্বের ন্যায় শিখ রাজত্বও ইহার নেতা রণজিৎ সিং-এর নেতৃত্ব ও কঠিন ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল। অতএব রণজিৎ সিংয়ের মৃত্যুর পর শিখগণ ব্রিটিশ অন্তর্ভুক্তি নীতির ক্রমবর্ধমান লোভের সামনে দাঁড়াইয়া থাকিতে ব্যর্থ হয়। ১৮৩৯ সালে রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র খর্গ সিং শিখদের নেতৃত্ব লাভ করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি পদচ্যুত হন এবং একের পর এক দুর্বল শাসকগণ

১৮৩৯ সালের রণজিৎ সিং-এর মৃত্যু এবং দেশে অরাজকতা

পদচ্যুত হইতে থাকেন। ১৮৪৩ সালে দিলীপ সিং নামে একটি ক্ষুদ্র বালক শিখদের রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন এবং তাঁহার মাতা রাণী ঝিন্দান শাসনকারী হন। দেশের চরম অরাজকতার দরুন বেসামরিক সরকারের পতন ঘটে এবং পরিণামে খালসা সেনাবাহিনী সমগ্র ক্ষমতা গ্রাস করে। লাল সিং ও তাজ সিং নামক দুইজন মন্ত্রী রাণীকে তাঁহার শাসন পরিচালনায় সহায়তা করেন। কিন্তু শীঘ্রই বাধা-বন্ধনহীন খালসা সেনাবাহিনী দুর্দমনীয় হইয়া উঠে। সেনাবাহিনীকে দমন করিতে

অপারগ হইয়া লাহোর দরবার তাহাদিগকে দিয়া ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রচেষ্টা চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। লাহোর দরবারের বিশ্বাস ছিল, ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করিতে যাইয়া খালসা বাহিনী হয়ত সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, অথবা দেশ বিজয়ের পথে তাহারা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িবে এবং অতঃপর দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার মত উৎসাহ তাহাদের থাকিবে না। এইভাবে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রাক্কালে শিখদের মামলা প্রায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায়। অপরদিকে কূটনৈতিক ইংরেজদের কিছু কার্যকলাপ শিখদের মধ্যে তাহাদের ইংরেজ প্রতিবেশীদের সাধুতা ও বন্ধুত্বের ব্যাপারে সন্দেহের উদ্রেক করে। অতএব শিখ সেনাবাহিনী শতদ্রু নদী অতিক্রম ও ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হয়। অতঃপর ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য রাণী ঝিন্দান এবং তাঁহার মন্ত্রিগণ অনুমতি দেন। ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ষাট হাজার শিখ সেনা শতদ্রু অতিক্রম করিয়া দিল্লী আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হয়। এইভাবে ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথম সংঘর্ষ হয় মুদ্‌কি নামক স্থানে। এই যুদ্ধে যদিও ইংরেজগণ কল্পনাতীত ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তবুও শেষ পর্যন্ত শিখ সেনাপতি লাল সিংহের ভুলের দরুন ব্রিটিশ বাহিনী জয়লাভ করে।

যুদ্ধের কারণ

প্রথম সংঘর্ষ এবং শিখদের পরাজয়

কিছুদিন পর শতদ্রু নদী হইতে বারো মাইল দূরবর্তী ফিরোজ শাহ নামক স্থানে আরেকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ প্রধান সেনাপতি স্যার হুঘ গাফ (Sir Hugh Gough) এবং গভর্নর জেনারেল স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। শিখগণ শক্তিশালী ও সুকঠিন প্রতিরক্ষা গড়িয়া তোলে। ইংরেজগণ ভীষণ ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং তাহাদের অবস্থান খুবই সঙ্গিন আকার ধারণ করে। কিন্তু শিখ যোদ্ধাগণ পুনরায় তাহাদের সেনাপতি তেজ সিং কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক পরিত্যক্ত হয়। তেজ সিং হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন। অতএব শিখগণ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতি দিয়া শতদ্রু নদী অভিমুখে পশ্চাদপসারণ করে। ১৮৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে শিখগণ রঞ্জর সিংয়ের নেতৃত্বে পুনরায় শতদ্রু অতিক্রম করিয়া সীমান্তবর্তী শহর লুধিয়ানা আক্রমণ করে। বুদ্দেয়ালের নিকট আরেকটি যুদ্ধে ইংরেজগণ পরাজিত হয়। সদ্যাগত সেনাবাহিনী দ্বারা বল বৃদ্ধি করিয়া ইংরেজগণ শিখদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও তাহাদিগকে লুধিয়ানার পশ্চিমে অবস্থিত আলীওয়ালে পরাজিত করে। শেষ যুদ্ধ সংঘটিত হয় শতদ্রু নদীর উপর সোরবাঁও নামক স্থানে। এই যুদ্ধে একমাত্র শ্যাম সিং ব্যতীত প্রায় সমস্ত শিখ সেনাপতির উদাসীন মনোভাব ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মূল শিখ বাহিনী পরাজিত হয় (ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৬)। শতদ্রু অতিক্রম করিবার সময় ইংরেজগণ বহুসংখ্যক শিখদিগকে হত্যা করে।

ফিরোজ শাহে যুদ্ধ
শতদ্রুর দিকে শিখদের পশ্চাদপসারণ
সোরবাঁওয়ে শেষ যুদ্ধ (১৮৪৬)

সোরবাঁও-এ ইংরেজদের বিজয় চূড়ান্ত। গভর্নর জেনারেল বিজয়ী ব্রিটিশ সেনাবাহিনী সমভিব্যাহারে শতদ্রু অতিক্রম করিয়া ১৮৪৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি লাহোর অধিকার করেন। ৯ই মার্চ ইংরেজগণ শিখদের উপর 'লাহোর চুক্তি' চাপাইয়া দেয়। এই চুক্তি অনুসারে শিখগণ শতদ্রু নদীর দক্ষিণ তীরের সমগ্র এলাকা, তৎসঙ্গে শতদ্রু ও বিয়াস নদীর মধ্যবর্তী বিশাল জলন্দর দোয়াব এলাকা ইংরেজদের হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ লাহোর দরবারের উপর এক বিরাট ঋণের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয়,

যাহার পরিমাণ দেড় কোটি টাকা, এবং এই টাকার কিছু অংক দেওয়ার কথা নগদ, আর কিছুর পরিবর্তে বিয়াস ও সিন্ধু নদীর মধ্যবর্তী পার্বত্য জেলাসমূহ, তৎসঙ্গে কাশ্মীর ও হাজারা এলাকা ইংরেজদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া। শিখ সেনাবাহিনীর সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হয়।

ব্রিটিশদের লাহোর অধিকার
লাহোর চুক্তি ৯ মার্চ ১৮৪৬
জম্মু ও কাশ্মীর বিক্রয়
দ্বিতীয় লাহোর চুক্তি

বালক দিলীপ সিংকে 'মহারাজা' বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং রাণী ঝিন্দানকে মহারাজার শাসক এবং লাল সিংকে তাঁহার মন্ত্রী বানানো হয়। ইংরেজগণ হেনরী লরেন্সকে ব্রিটিশ প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করে। অমৃতসরে সম্পাদিত অন্য একটি চুক্তি অনুসারে ইংরেজগণ সত্তর লক্ষ টাকার বিনিময়ে গোলাব সিং নামক লাহোর দরবারের একজন সর্দারের নিকট কাশ্মীর বিক্রয় করে। গোলাব সিংকে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজা বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিছুদিন পর শিখ নেতা লাল সিংকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অজুহাতে পাঞ্জাব হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। ফলে ১৮৪৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর 'দ্বিতীয় লাহোর চুক্তি' সম্পাদিত হয় যদ্বারা পাঞ্জাবের উপর ব্রিটিশ কর্তৃত্ব আরো সুদৃঢ় করা হয়। এই চুক্তির ফলে পাঞ্জাবে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে পাকাপাকিভাবে রাখিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং দেশের শাসন পরিচালনার ভার ব্রিটিশ প্রতিনিধি স্যার হেনরী লরেন্সের হাতে অর্পণ করা হয়। বালক দিলীপ সিং যদিও নামে মাত্র রাজা হইয়া রহিলেন, কিন্তু কার্যত পাঞ্জাবে পুরাপুরি ব্রিটিশ রাজত্ব কায়েম হয়।

ব্রিটিশ শাসনকর্তার গর্বিত আচরণ শীঘ্রই শিখদের নিকট অসহনীয় হইয়া উঠে। অধিকন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অজুহাতে লাহোর হইতে রাণী ঝিন্দানের বহিষ্কার ক্ষিপ্ত শিখদের জ্বলন্ত অগ্নিতে ইন্ধন যোগায়। মুলতানের শাসনকর্তা দিওয়ান মুলরাজের পদত্যাগ দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের সূচনা করে। মূলরাজ লাহোর দরবারের নিকট খাজনা বাবদ সত্তর লক্ষ টাকা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইয়া ১৮৪৮ সালের মার্চ মাসে পদত্যাগ করেন। লাহোর দরবার সর্দার খান সিংকে মুলতানের গভর্নর নিযুক্ত করিয়া আরও দুইজন ইংরেজ

দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ
সংঘর্ষের কারণ
শিখ-আফগান জোট

অফিসার সহকারে মুলতানে পাঠায়। মুলতানে পৌঁছার পর ইংরেজদ্বয় নিহত হন। ব্রিটিশ মুলরাজকে এই ঘটনার জন্য দায়ী করে এবং তাহাকে দমন করিবার জন্য শের সিংকে পাঠায়। কিন্তু সিংও মুলতানের বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করেন। শীঘ্রই সমগ্র পাঞ্জাব-মুলতান বিদ্রোহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি গণজাগরণের রূপ ধারণ করে। এই আন্দোলনে আফগানরাও শিখদের পক্ষ সমর্থন করে।

তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল ডালহৌসিও পাঞ্জাবিদের এই হুমকির মোকাবিলা করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প হন এবং ১৮৪৮ সালের ১০ই অক্টোবর যুদ্ধ ঘোষণা করেন। লর্ড গাফ রবী নদী অতিক্রম করেন এবং শের সিং-এর নেতৃত্বে পরিচালিত শিখ বাহিনীর সঙ্গে চেনাব নদীর তীরে রামনগরে একটি অমীমাংসিত যুদ্ধে মিলিত হন। চিলিয়ানওয়ালায় শিখগণ ঘাঁটি করিয়া অবস্থান করে এবং পরে সেই স্থানে এক তুমুল সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে ব্রিটিশ বাহিনী বিরাট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ১৮৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে মুলতানে সংঘটিত আরেকটি সংঘর্ষে শিখগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ইতোমধ্যে চিলিয়ানওয়ালার পরাজয়ের জন্য চার্লস নেপিয়ার লর্ড গাফের স্থলাভিষিক্ত হন। নেপিয়ার ক্ষমতা হাতে লইবার পূর্বেই লর্ড গাফ

চেনাবের নিকটবর্তী গুজরাটে শিখদিগকে ভীষণভাবে পরাজিত করেন। গুজরাটের যুদ্ধ ছিল চূড়ান্ত। মার্চ মাসে শের সিং, ছাত্তার সিং ও অন্যান্য শিখ নেতাগণ ও সেনাবাহিনী অস্ত্রসংবরণ করেন এবং আফগানদিগকে খাইবার পাস ও কাবুল অভিমুখে ধাওয়া করা হয়। পাঞ্জাবিগণ আর স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই। ১৮৪৯ সালের ৩০শে মার্চ এক ঘোষণার দ্বারা লর্ড ডালহৌসী পাঞ্জাবকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা ভাতার পরিবর্তে নিরাপরাধ দিলীপ সিংকে পদচ্যুত করা হয়। তাঁহার মাতার সঙ্গে তাঁহাকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয় এবং তথায় উভয়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন।

চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ (১৮৪৯) ১৮৪৯ সালে চূড়ান্ত অন্তর্ভুক্ত

পাঞ্জাব অন্তর্ভুক্তির ফলে ব্রিটিশ সীমারেখা আফগানিস্তানের পর্বতের পাদমূল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। "অগ্রের সফলতায় পাঞ্জাবে ব্রিটিশ রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের সাথে সাথে স্যার হেনরী লরেন্স, তাঁহার ভ্রাতা জন লরেন্স, হার্বার্ট এডওয়ার্ডস, জন নিকলসন, রিচার্ড টেম্পল এবং আরো অনেক সুযোগ্য ব্রিটিশ অফিসারের একটি দল গভর্নর-জেনারেলের পরিচালনায় শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন শাখায় যথা ঃ সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিচার বিভাগ, রাজস্ব, শিল্প, কৃষি ইত্যাদিতে সংস্কার সাধন করেন।"[১২] পাঞ্জাবিরা অতঃপর ইংরেজদের প্রতি খুবই অনুগত হইয়া যায় এবং নূতন প্রভুদের সন্তুষ্টিমত চাকুরি গ্রহণ করে। কিন্তু পাঞ্জাব অন্তর্ভুক্তির ফলে ইংরেজ ও ওয়াহাবীদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। কারণ, ওয়াহাবিগণও পাঞ্জাবের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। এই পর্যন্ত তাঁহাদের শত্রু ছিল শিখগণ; এবং বিশেষত রণজিৎ সিং-এর সময় পেশোয়ার ও লাহোর অধিকার লইয়া তাঁহারা আপ্রাণ যুদ্ধ করেন এবং ইহারই এক পর্যায়ে ১৮৩০ সালে বালাকোটের যুদ্ধে ওয়াহাবী নেতা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী নিহত হন।[১৩] কিন্তু ইংরেজগণ পাঞ্জাব অধিকার করিলে ওয়াহাবীদের সঙ্গে তাহাদের সরাসরি সংঘর্ষ বাধে, যাহার ফলে ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে শিখগণ অনুগতভাবে ব্রিটিশদের পক্ষ অবলম্বন করে।

ফলাফল ইংরেজগণ উত্তম শাসন প্রবর্তন করে ইংরেজ ওয়াহবী সংঘর্ষ

(চ) ব্রিটিশদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ও আফগান যুদ্ধ

১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত উপমহাদেশের ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের মনে দুররানী আক্রমণের ভীতি অহরহ ত্রাসের সৃষ্টি করে। কলিকাতাস্থ কোম্পানির সরকার অযোধ্যা এবং পরে বাংলাদেশের উপর একটি আফগান অভিযানের আশংকা করে। মূলত ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষের উপর রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের প্রত্যাশী আফগান এবং একই উদ্দেশ্যের জন্য চেষ্টারত ইংরেজদের সহিত একটি যুদ্ধ ১৭৬১ সালের মারাঠা-আফগান যুদ্ধের ন্যায় ইতিহাসের একটি চিরসত্য যুক্তির মধ্যে নিহিত। যাহা হউক, ইংরেজদের জন্য সৌভাগ্যই বলিতে হইবে যে, ১৭৭৩ সালে আহমদ শাহ্ আবদালীর মৃত্যুর পর ভারতে আফগানদের অগ্রগতি বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু আহমদ শাহ আবদালীর পৌত্র জামান শাহ ১৭৯৮ সালে লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং নাদির শাহ্ ও আহমদ শাহ্ আবদালীর ন্যায় হিন্দুস্থানের অন্তঃস্থলে আক্রমণ পরিচালনা করিবার আকাঙ্ক্ষা

পোষণ করেন। তাঁহার সমসাময়িক কেহ কেহ ইহাকে হাল্কাভাবে গ্রহণ করিলেও ইংরেজ কোম্পানি ইহাকে গুরুতরভাবে গ্রহণ করে। মহীশূরের টিপু সুলতান, অযোধ্যার নবাব ওয়াজির আলী ও বাংলার নবাব নাসির উল-মুলকের নিকট হইতে জামান শাহ্ ভারত আক্রমণ করিবার আমন্ত্রণ পান। স্বভাবতই স্যার জন শোর ও লর্ড ওয়েলেসলির শাসনামলে ইংরেজগণ সর্বদাই জামান শাহের আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত থকে। গভর্নর জেনারেল আফগান আক্রমণের হাত হইতে অযোধ্যা রক্ষা করিবার জন্য তথায় বিরাট ব্রিটিশ বাহিনী মোতায়েন করেন। আফগানিস্তানের সঙ্গে শত্রুভাবাপন্ন পারস্যের নিকটও ইংরেজগণ দুইটি বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। এশিয়া মহাদেশে ফরার্সি আধিপত্যের বিরোধিতা করিবার জন্য ইংরেজদের পক্ষে পারস্যের বন্ধুত্ব প্রয়োজন ছিল। পারস্যের চাপের ফলে শেষ পর্যন্ত জামান শাহ্ লাহোর ত্যাগ করিয়া পেশোয়ারে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। পরিশেষে স্বদেশের একটি অভ্যন্তরীন বিদ্রোহের ফলে জামান শাহ ক্ষমতাচ্যুত হন।

দুররানী আক্রমণের ভীতি
জামান শাহ

জামান শাহের মৃত্যুর পর আফগানিস্তানে সাদোজায়ী (রাজকীয় পরিবার লোকজন) ও বারাকজায়ীদের মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে। ১৮০৩ সালে শাহ্ শুজা নামে আহমদ শাহ্ আবদালীর একজন পৌত্র কাবুলের সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তিনিও দেশে আইন-শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে ব্যর্থ হন। ১৮০৯ সালের মধ্যে বারাকজায়িগণ মাহমুদ শাহকে সিংহাসনে স্থাপন করে। শাহ্ শুজা লুধিয়ানায় পলায়ন করেন এবং ইংরেজদের আশ্রয়ে কালাতিপাত করেন। শীঘ্রই মাহমুদ শাহ বারাকজায়ীদের আধিপত্যে অতিষ্ঠ হইয়া পারস্যে পলায়ন করেন। ইতোমধ্যে ১৮২৬ সালে বারাকজায়ী বংশের একজন সুযোগ্য নেতা দোস্ত মুহাম্মদ কাবুলের বাদশাহ হন।

আফগানিস্তানে দীর্ঘস্থায়ী বিশৃঙ্খলা

দোস্ত মুহাম্মদ

রণজিৎ সিংয়ের শিখ-রাষ্ট্র ব্রিটিশ-ভারতের সীমান্ত ও আফগানিস্তানের মধ্যখানে অবস্থিত। তাহা সত্ত্বেও ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা মধ্য এশিয়ায় রুশ প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ-ভারতের ভবিষ্যৎ লইয়া অতিশয় শংকিত হইয়া পড়ে। ১৮৩৪ সালে পারস্যের দরবারে রুশ প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ঠিক সেই কারণেই লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক সিন্ধুর আমিরদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের জন্য উদগ্রীব হইয়া পড়েন। রাশিয়ার প্ররোচনায় ১৮৩৭ সালে আফগান অধিকারভুক্ত এলাকা হিরাতের উপর আক্রমণ করিবার জন্য পারস্য প্রস্তুত হয়। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার বৈদেশিক মন্ত্রী পালমারস্টোন আফগানিস্তানে রুশ প্রভাব রোধ করিবার জন্য ভারতের গভর্নর-জেনারেলের প্রতি এক নির্দেশ জারি করেন। ঐ নির্দেশ মোতাবেক লর্ড অকল্যান্ড আফগানিস্তানের আমির দোস্ত মুহাম্মদের মিত্রতা প্রার্থনা করেন। দোস্ত মুহাম্মদ ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে উৎসাহী ছিলেন। যাহা হউক দোস্ত মুহাম্মদ ইংরেজদের আহ্বানে সাড়া দেন। কিন্তু বিনিময়ে পেশোয়ার দাবি করেন। পেশোয়ার তখন ইংরেজদের মিত্রপক্ষ রণজিৎ সিংয়ের হাতে এবং তাই ইংরেজগণ আফগানিস্তানের নিকট পেশোয়ার সমর্পণ করিবার জন্য রণজিৎ সিংকে অনুরোধ করিতে অক্ষম। ব্রিটিশের অনিচ্ছা লক্ষ্য করিয়া দোস্ত মুহাম্মদ রুশ প্রতিনিধিকে তাঁহার দরবারে সাদরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

আফগানিস্তানের উপর রুশ প্রভাবের ব্যাপারে ইংরেজদের আশংকা

ইতোপূর্বে শিখদের নিকট হইতে পেশোয়ার অধিকার করিবার জন্য দোস্ত মুহাম্মদ ইংরেজদের সহযোগিতা দাবি করিলে লর্ড অকল্যান্ড অন্য রাষ্ট্রের ব্যাপারে তাঁহার হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি উত্থাপন করেন। কিন্তু এখন দোস্ত মুহাম্মদ অনুরূপভাবে ব্রিটিশ প্রার্থনা গ্রহণ না করায় ইংরেজগণ দোস্ত মুহাম্মদকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার পন্থা অবলম্বন করে এবং রণজিৎ সিংয়ের সাহায্যে নির্বাসিত শাহ্ শুজাকে কাবুলের সিংহাসনে স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করে। ১৮৩৮ সালের জুন মাসে শাহ্ শুজা, রণজিৎ সিং ও ইংরেজদের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়।

প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ
আফগান বিদ্রোহ

গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড অতঃপর আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং সেনাবাহিনীর একটি দলকে বেলুচিস্তান ও বোলান গিরিপথ দিয়া আফগানিস্তান অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ দেন, এবং শিখ বাহিনীর অপর একটি দলকে খাইবার গিরিপথ ধরিয়া অগ্রসর হইবার আদেশ দেওয়া হয়। প্রথম অবস্থায় মিত্রপক্ষ সফলতা লাভ করে। ১৮৩৯ সালের আগস্ট মাসে তাহারা কান্দাহার, গজনী ও কাবুল অধিকার করিয়া শাহ্ শুজাকে কাবুলের সিংহাসনে স্থাপন করে। কিছুদিন পর ১৮৪০ সালে দোস্ত মুহাম্মদ আত্মসমর্পণ করেন, এবং তাঁহাকে বন্দি হিসাবে কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়। কিন্তু শাহ্ শুজাকে আফগানগণ কখনও পছন্দ করিতে পারে নাই কারণ তাঁহার শক্তির একমাত্র উৎস ইংরেজ সেনাবাহিনী। বিরাট অংকের ব্যয়ভারের দ্বারা ইংরেজ বাহিনীকে আফগানিস্তানে রাখা হয়, যদ্বারা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ফলে ধনী-দরিদ্র সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বাধীনতাপ্রিয় আফগানদের দেশে রক্ষিত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন দুষ্কর্মের দ্বারা বিদেশী আধিপত্যের প্রতি তাহাদের গণবিক্ষোভ আরও ধূমায়িত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮৪১ সালে কাবুলের বিক্ষোভকারী উন্মত্ত জনতার হাতে জেনারেল আলেকজান্ডার বার্নস নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। এইভাবে দোস্ত মুহাম্মদের পুত্র আকবর খানের নেতৃত্বে আফগানগণ বিদ্রোহ প্রদর্শন করে। আফগানিস্তানে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাজনৈতিক কর্মকর্তা ম্যাকনাটেন নিহত হইবার ভয়ে আকবর খানের সহিত একটি অতি অপমানজনক চুক্তি সম্পাদন করেন। সিদ্ধান্ত হয় যে, যত শীঘ্র সম্ভব ব্রিটিশ সেনাবাহিনী কাবুল ত্যাগ করিবে, দোস্ত মুহাম্মদ কাবুলে ফিরিয়া যাইবেন এবং শাহ্ শুজা হয়ত একটি বৃত্তি লইয়া আফগানিস্তানে থাকিবেন অথবা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে ভারতে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু ম্যাকনাটেন আকবর খানের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং পুরস্কার হিসাবে তিনিও আফগানদের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। অতঃপর যত শীঘ্র সম্ভব ভীত-সন্ত্রস্ত ব্রিটিশ বাহিনীর কাবুল ত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। তাহারা বন্দুক, কামান ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্রের সাজ-সরঞ্জাম আফগানদের হাতে সমর্পণ করে, এবং ১৮৪২ সালের ৬ই জানুয়ারি মোট ১৬,৫০০ 'ভঙ্গুর, মস্তকবনত ও হতাশ' ব্রিটিশ সৈন্যদল ও পল্টনের ভৃত্যদল ভারত অভিমুখে রওয়ানা হয়। আকবর খানের অধীনে ১২০ জন বন্দি এবং এই বিয়োগান্ত ও বেদনাদায়ক পশ্চাদপসারণ বর্ণনা করিবার জন্য জীবিত একমাত্র ডাঃ ব্রাইডন ছাড়া অবশিষ্ট সবাইকেই আফগানরা পথে হত্যা করে। সেই সময় কান্দাহার রক্ষার্থে নিয়োজিত ইংরেজ নট ও রওলিন্‌সন্ (Nott এবং Rawlinson) এবং জালালাবাদের সেইল ও ব্রডফুটই (Sale and Broadfoot) রহিল ইংরেজদের একমাত্র ভরসাস্থল।

এইরূপ এক শোচনীয় অবস্থায় লর্ড অকল্যান্ডকে ইংল্যান্ডে ডাকিয়া পাঠান হয় এবং তদস্থলে ১৮৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড এলেনবরা নূতন গভর্নর-জেনারেল হইয়া ভারতে আগমন করেন। ক্ষমতা হাতে লইয়া তিনি আফগানিস্তানে তখনও অবরুদ্ধ ব্রিটিশ সৈন্যদের উদ্ধারের জন্য নট ও পোলক নামক দুইজন ইংরেজ অফিসারকে আফগানিস্তানে প্রেরণ করেন। এই অভিযানে ইংরেজ বাহিনী জয়লাভ করে। তাহারা গজনী অধিকার করিয়া সেই নগর ও দুর্গ ধ্বংস করে। ইংরেজ সেনাবাহিনী কাবুল শহরও ধ্বংস করে। এই ধ্বংস সাধন হয়ত তাহাদের পূর্ববর্তী পরাজয় ও শোচনীয় দুর্দশার ক্ষোভ কিছুটা লাঘব করিতে পারে, কিন্তু ইহাতে ফল কিছুই হইল না। লর্ড এলেনবরা আফগানিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন মনে করেন নাই। ইতোমধ্যে শাহ্ শুজা নিহত হন এবং দোস্ত মুহাম্মদকে ইংরেজগণ বিনা শর্তে মুক্তি প্রদান করে। অতঃপর তিনি পুনরায় আফগানিস্তানের আমির হন।

এলেনবরা লর্ড অকল্যান্ডের স্থলাভিষিক্ত (১৮৪২)

আফগানগণ কখনও তাহাদের পরবর্তী আমির হাবিবুল্লাহর ব্রিটিশ ঘেঁষা নীতি সমর্থন করিতে পারে নাই। অতএব, ১৯১৯ সালে তাহারা আমির হাবিবুল্লাহকে হত্যা করে। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আমানুল্লাহ্ আফগানিস্তানের আমির হন। আমানুল্লাহ্ একজন দেশপ্রেমিক যুবক। ব্রিটিশ কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য তিনি ইংরেজ বিরোধী নীতি অবলম্বন করেন এবং পাঞ্জাবে রাউলাট এ্যাক্ট (Rawlat Act)-কে কেন্দ্র করিয়া যে গোলযোগের সূত্রপাত হয়, সেই সুযোগে তিনি ভারত আক্রমণ করেন। কিন্তু আফগানগণ ইংরেজ কর্তৃক পরাজিত হয় এবং ১৯১৯ সালের ৮ই আগস্ট 'রাউলপিন্ডি চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে আফগানগণ বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে স্বাধীনতা লাভ করে।

পরবর্তী ইতিহাস রাউলপিন্ডি চুক্তি

পাদটীকা

১। He was a prudent, keen and a valorous soldier. There are hardly any qualification which he did not possess.

২। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস

৩। ঐ।

৪। It must give pain to an Englishman to have reason to think that since the accession of the Company to the Dewani, the condition of the people of this country has been worse than it was before; yet I am afraid the fact is undoubted... This fine country which flourished under the most despotic and arbitrary government, is verging towards ruin. —*An Advanced History of India*, পৃঃ ৬৭৫।

৫। The fortunes of the English in India had fallen to their lowest water mark.

৬। A completely self-made man, he was endowed with strong determination, admirable courage, a keen intellect and a retentive memory, which more than counterbalanced his lack of the ability to read and

write. Cool, sagacious, and intrepid in the field, he was remarkably tactful and vigorous in matters of administration and had all business of the State transacted before his eyes with regularity and quickness.—R.C. Majumdar: *An Advanced History of India.*

৭। A Muslim as well as a foreigner without any political footing whatsoever, Hyder Ali raised himself, by sheer merit from obscurity to the supreme position in the Hindo kingdom of Mysore and through his vigour and energy brought that small and obscure state into the lime light of history yet he will chiefly be remembered as a stubborn fighter against foreign domination : *History of the Freedom Movement.*

৮। আর. সি. মজুমদার ঃ *An Advanced History of India.*

৯। মাহমুদ হোসেন ঃ *History of the Freedom Movement.*

১০। ভি.এ. স্মিথ ঃ *Oxford History of India.*

১১। আর.সি. মজুমদার ঃ প্রাগুক্ত (Thus fell a leading Indian power and one of the most inveterate and dreadful foes of the English.)

১২। রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ প্রাগুক্ত।

১৩। ইনাম-উল-হক ঃ ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন পৃঃ ২০। আরও দ্রষ্টব্য ডব্লিও হান্টার রচিত ঃ *Our Indian Musalmans.*

গ্রন্থপঞ্জী

আব্দুল করিম : *Murshid Quli Khan and His Times*

সি.আর. উইলসন : *Early Annals of the English in Bengal,* 3 vols

এস.সি.হিল : *Bengal in* 1756-1757

ডব্লিও. ডব্লিও. হান্টার : *History of British India.* 2 Vols.

ঐ : *Our Indian Musalmans*

চার্লস্ স্টুয়ার্ট : *History of Bengal*

বওরিং (Bowring) : *Hyder Ali and Tipu Sultan*

বেভারিজ : *Trial of Nand Kumar*

এন.কে.সিনহা : *Hyder Ali*

এ.এ্যালান, ক্যাপ্টেন : *Account of the Campaign in Mysore.*
Selection from the History of Freedom Movement, relevant Articles.

স্যার উইলিয়াম নেপিয়ার : *Conquest of Sindh*

এইচ. এল. নেভিল : *Campaign of North-West Frontier*

লতিফ : *History of the Punjab*

ইনাম উল হক : ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন

ঐ : বাংলার ইতিহাস ঃ ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনাপর্ব।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রিটিশ শাসনামলে বেসামরিক ও রাজস্ব পরিচালনা এবং শাসনতন্ত্র বিষয়ক পরিক্রমা

প্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসা করিবার জন্য ইংল্যান্ডের রাণী এলিজাবেথ কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত এক সনদ অনুসারে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সমিতিভুক্ত হয়। এই সনদ মোতাবেক কোম্পানি ইহার বাণিজ্যিক কার্যাবলি পরিচালনা করিবার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করে। ব্রিটিশ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করিলে ১৬৬১ ও ১৬৭৬ সালের সনদ মোতাবেক কোম্পানিকে বিভিন্ন দেশ বিজয়, দুর্গ নির্মাণ, ইহার স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলন, সেনাবাহিনী রক্ষা করা এবং ইহার নামে ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রজা-সাধারণের শাসন পরিচালনা করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। পরে ব্যবসা-বাণিজ্য আরও বিস্তৃতি লাভ করিলে সুশাসন পরিচালনা এবং সৈনিকদের শৃংঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য কোম্পানি আরও অধিক সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন রাখিবার ক্ষমতা লাভ করে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী

কোম্পানির কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণের জন্য ইংল্যান্ডে 'হাউজ অব প্রোপ্রাইটরস' (House of Proprietors) বা 'মালিকদের সভা' এবং 'কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্' (Court of Directors) বা পরিচালকদের সভা নামে দুইটি সমিতি ছিল। ডিরেক্টর সভায় মোট ২৪ জন সভ্য ছিলেন এবং তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির যাবতীয় কার্য পরিচালনা করিতেন।

কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ

১৬০১ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় আগমনের পর কোম্পানি প্রথমে বাণিজ্য বিস্তারের দিকে মনোনিবেশ করিলেও ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিবার ফলে বিশাল বাংলাদেশের শাসন কর্তৃত্ব প্রকৃতপক্ষে ইংরেজগণেরই হস্তগত হয়; এবং ১৭৬৭ সালে কোম্পানি নিযুক্ত বাংলাদেশের গভর্নর ররার্ট ক্লাইভ দিল্লীর মুঘল সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের দেওয়ানী লাভ করেন। ইহার ফলে উপরিউক্ত প্রদেশের রাজস্ব সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা কোম্পানির হাতে আসে। সৈন্য বিভাগ এবং রাজ্য রক্ষার ভারও কোম্পানি ইতোপূর্বেই গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং কেবলমাত্র শাসন ও বিচারাদির ভার নবাবের হাতে থাকে। এই ব্যবস্থা 'দ্বৈত শাসন' নামে প্রসিদ্ধ।[১] নবাব নামে মাত্র শাসনকর্তা, আর ইংরেজ বাংলাদেশের সর্বময় প্রভুত্ব লাভ করে। এইভাবে শুধুমাত্র কোম্পানির ব্যবসা যে করমুক্ত হয় তাহাই নহে, বরং কোম্পানির কর্মচারীরা তাহাদের বেআইনি ব্যবসায় যাহা লাভ করে তাহাও করমুক্ত থাকে। এই সমস্ত অসাধারণ সুযোগ-সুবিধার দ্বারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির

পলাশীর যুদ্ধ দেওয়ানী লাভ দ্বৈত শাসন

কর্মচারীদের চরিত্রহানি হইবার সমূহ সম্ভাবনা, এবং বস্তুত কোম্পানির কর্মচারিগণ দুর্নীতির সর্বনিম্নস্তরে নামিয়া যায়। দ্বৈত শাসনের কু-ব্যবস্থার ফলে শাসন কার্যে নানা বিশৃঙ্ক্ষলা দেখা দিলে ওয়ারেন হেস্টিংস উহার প্রতিকারের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা (১৭৭২-৭৩) অবলম্বন করেন।

এতদিন ভারতে কোম্পানির শাসন কার্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হস্তক্ষেপ করে নাই। ডিরেক্টর সভাই ভারত সংক্রান্ত সকল কার্য স্বাধীনভাবে নির্বাহ করে। কিন্তু ভারতে কোম্পানির রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শাসন কার্যে নানা বিশৃঙ্ক্ষলা ঘটিতেছে মর্মে সংবাদ পাইয়া পার্লামেন্ট ভারতের শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক মনে করে। পার্লামেন্টে এই লইয়া বিতর্ক হয় যে, ব্রিটেনের রাজার স্বপক্ষে কোম্পানি মুঘল সম্রাটের আজ্ঞানুসারে বাংলার রাজস্ব আদায়ের সুবিধা ভোগ করিতে পারে না। কোম্পানির উদ্যোগীগণ স্বভাবতই পার্লামেন্টের সদস্যদের এই ধরনের যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা সম্পর্কে বিতর্কের সূত্রপাত করেন এইজন্য যে, তাঁহারা ভারতের বিধিসম্মত রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্ট (Regulating Act) ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস হয় এবং ইহাই হইল এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজ্যের প্রথম সাংবিধানিক আইন। "ভারতবর্ষ ও ইউরোপে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যাবলি সুচারুরূপে পরিচালনা করিবার নিমিত্ত কিছু সংবিধান প্রতিষ্ঠা" করিবার জন্য ইহা বিধিবদ্ধ হয় (ব্যানার্জী)। এই আইন পাস হইবার কাল হইতেই পার্লামেন্ট সরাসরিভাবে ভারতের শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করিতে থাকে এবং ব্রিটিশ শাসিত ভারতের প্রজাবৃন্দের শুভাশুভের দায়িত্ব ক্রমশ গ্রহণ করে। এই এ্যাক্ট অনুসারে ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ সরকার একজন গভর্নর-জেনারেল এবং চারিজন পরামর্শদাতা বা কাউন্সিলর (Councillor) নিয়োগ করে। অধিকন্তু, এই আইন রাজাকে একজন প্রধান বিচারপতি (Chief Justice) ও তিনজন বিচারক সম্বলিত একটি সুপ্রিম কোর্ট বা সর্বোচ্চ বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা প্রদান করে। এই আইন ইহাও বিধিবদ্ধ করে যে, কোম্পানির ডিরেক্টরগণ ভারতের সহিত রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত যোগাযোগ ব্রিটিশ সরকারের নিকট পেশ করিবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যাইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এই আইন ভাঙিয়া যায়। পার্লামেন্টের সংখ্যাগুরু সদস্যদের নিকট গভর্নর-জেনারেলের অধীনতা কেন্দ্রীয় সরকারের এমন দুর্বলতা ও টলটলায়মান অবস্থার সৃষ্টি করে, যাহা হয়ত শেষ পর্যন্ত ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইত।

এই এ্যাক্টের দুর্বলতা

দশ বৎসর পর্যন্ত রেগুলেটিং এ্যাক্ট চালু থাকে এবং এই সময়ের মধ্যে ইহার স্পষ্ট দোষসমূহ বাহির হইয়া পড়ায় আরও উপযোগী পন্থা অবলম্বন করিবার চেষ্টা চলে। ১৭৮৪ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পিট (Pitt the Younger) "ইন্ডিয়া এ্যাক্ট" নামে আরেকটি ভারত শাসন আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস করেন। এই আইনানুসারে বোর্ড অব কন্ট্রোল (Board of Control) নামে ইংল্যান্ডের রাজা কর্তৃক মনোনীত ছয়জন সভ্যবিশিষ্ট একটি পরিষদের উপর ভারতের শাসনভার ন্যস্ত হয়। এই পরিষদ বোর্ড অব ডাইরেক্টরদের উপর সরাসরি ও কার্যকর কর্তৃত্ব লাভ করে। কোম্পানির সমস্ত কাগজপত্রের উপর ইহার আধিপত্য থাকে এবং একমাত্র ব্যবসা সংক্রান্ত পত্রাদি ছাড়া কোনকিছুই ইহার মঞ্জুরি ছাড়া পাঠান যাইবে না—এই মর্মে একটি বিধান সন্নিবেশিত হয়।

পিটের ইন্ডিয়া এ্যাক্ট (১৭৮৪)

কোর্ট অব প্রোপ্রাইটর্স-এর ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা হয়। এইভাবে সর্বোচ্চ ক্ষমতা পরিষদের হাতে চলিয়া যায় এবং ডাইরেক্টরদের হাতে থাকে শুধু তাহাদের নিজস্ব কর্মচারীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত। তৎসঙ্গে উপমহাদেশের শাসনব্যবস্থায়ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করা হয়। গভর্নর-জেনারেলের পরিষদ সদস্যদের সংখ্যা তিনে সীমাবদ্ধ করা হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ব্যাপারে সপারিষদ গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা স্পষ্ট ও কার্যকরী করিয়া দেওয়া হয়। ১৭৮৬ সালে অনূদিত একটি বর্ধিত বিল (Supplimentary Bill) অনুসারে বিশেষ ক্ষেত্রে পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামতের বিরুদ্ধে কাজ করিবার এবং প্রধান সেনাপতির কার্যনির্বাহ করিবার ক্ষমতা গভর্নর-জেনারেলের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত পিটের ইন্ডিয়া এ্যাক্ট মোতাবেক রচিত সংবিধানের মধ্যে কোন মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন করা হয় নাই। উল্লেখ করা যাইতে পারে এই সময়ের মধ্যে সমস্ত আইন সংক্রান্ত পরিবর্তন সর্বদাই ১৭৯৯, ১৮১৩ ও ১৮৫৩ সালের কোম্পানির সনদ মোতাবেক পাল্টানো হয়।

সাপ্লিমেন্টারি বিল (১৭৮৬)

১৮১৩ সালের সনদ আইন (Charter Act) উপমহাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার রহিত করে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তির উপর রাজার নিঃসন্দেহ অধিকার অর্পণ করে। ১৮৩৩ সালের অন্য একটি সনদ আইন (Charter Act) অনুসারে বাংলাদেশের গভর্নর-জেনারেলকে সমগ্র ভারতের গভর্নর জেনারেল বলিয়া ঘোষণা করে। এই আইন বলে তিনি অধীনস্থ প্রেসিডেন্সীগুলির উপর সর্বময় কর্তৃত্ব করিবার অধিকার লাভ করেন এবং সপারিষদ গভর্নর জেনারেল সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পান। অতঃপর কিছু প্রয়োজনীয় ব্যতিক্রম ব্যতীত সপারিষদ গভর্নর-জেনারেল এবং কাউন্সিল, ব্রিটিশ হউক বা ভারতীয় এবং সমস্ত বিচারালয় মহামহিমান্বিতের সনদের দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করেন। গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলে একজন আইন সদস্যও (Law Member) নিযুক্ত করা হয়।

সনদ আইন (১৮১৩)
সনদ আইন (১৮৩৩)

১৮৫৩ সালের সনদ আইন ১৮৩৩ সালের সনদ আইন দ্বারা প্রণীত বিভিন্ন সংসদ বিষয়ক শাখার যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করে। ডাইরেক্টরদের সংখ্যা আঠারতে কমানো হয়, যাহার মধ্যে তিনজন নিয়োজিত হইবেন রাজা কর্তৃক। ইহার দ্বারা তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষমতা, অর্থাৎ কোম্পানির লোকবল নিয়োগ-বাতিলের ক্ষমতা রহিত করা হয়। এই উদ্দেশ্যে বেসামরিক লোক (Civil Servants) নিয়োগের জন্য একটি খোলামেলা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আইন সদস্যদের গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের একজন সাধারণ সদস্য করা হয় এবং গভর্নর-জেনারেলের সম্মতি ছাড়া কোন আইন পাস না করিবার ব্যবস্থা রাখা হয়। কাউন্সিল পুনর্গঠন করা হয় এবং সদস্য সংখ্যা গভর্নর জেনারেল, প্রধান সেনাপতি এবং বাংলার প্রধান বিচারপতিসহ বারো সদস্যে সীমিত করা হয়। কাউন্সিলের কাঠামো প্রকাশ করা হয় এবং ইহার সভাসমূহের কার্যবিবরণী প্রকাশ করা হয়। উপমহাদেশের আইনসমূহকে বিধিবদ্ধ করিবার জন্য লণ্ডনে একটি আইন কমিশন (Law Commission) নিয়োগ করা হয় এবং ইহার দ্বারাই দণ্ডবিধি (Penal Code), অপরাধ দণ্ডবিধি (Criminal Procedural Code) এবং দেওয়ানী কার্যবিধি (Civil Procedural Code) আইন রচিত

সনদ আইন (১৮৫৩)

হয়। ১৮৫৩ সালের সনদ আইন অনুযায়ী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রশাসনিক দায়িত্ব একজন ছোট লাটের (Lt Governor) উপর ন্যস্ত হয়।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর 'গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট ১৮৫৮, নামে একটি নূতন আইন পাস করা হয়। এই আইনের দ্বারা উপমহাদেশের শাসন কর্তৃত্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হইতে ব্রিটিশ রাজার নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং সুদূরপ্রসারী সাংবিধানিক পরিবর্তন সাধন করা হয়। অতঃপর ভারতীয় উপমহাদেশ সরাসরি রাজার দ্বারা এবং তাঁহার নামে শাসিত হইবে। ভারতের জন্য একজন সচিব নিয়োগ করা হয় এবং তিনি 'কোর্ট অব ডাইরেক্টরস' এবং 'বোর্ড অব কন্ট্রোল' এর স্থলাভিষিক্ত হন। ভারত সচিবকে ভারতীয় কাজে পরামর্শ দিবার জন্য ষোল সদস্যের একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়। ভারতীয় কাউন্সিলের (Council of India) জন্য ভারতীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। পূর্ণ সহযোগিতা দান সাপেক্ষে কাউন্সিলের সদস্য নিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং তাঁহাদিগকে অপসারণের জন্য পার্লামেন্টের উভয় হাউজে একটি প্রতিবেদনের মধ্যে সীমিত রাখা হয়। তাঁহাদিগকে সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং ভারতের রাজস্ব আদায় এবং ব্যয়ে তাঁহাদের সম্মতি বাধ্যতামূলক রাখা হয়। তবে ভারত সচিবকে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার কাউন্সিলের পরামর্শের উপর সীমাবদ্ধ রাখা হয় নাই। জরুরি এবং গোপনীয় বিষয়ে তাঁহার নিজেকে সিদ্ধান্ত লইবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৮৫৮ সালের আইন অনুযায়ী গভর্নর-জেনারেলের অপর নাম হয় 'ভাইসরয়' (Viceroy) বা রাজ প্রতিনিধি।

গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট (১৮৫৭)

১৮৬১ সালের ১লা আগস্ট 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৮৬১' আইনে পরিণত হয়। দেশের আইনসভার ক্রমবিকাশে এই আইন পরবর্তী মাইলফলকে পরিণত হয়। এই আইন অনুযায়ী, গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলে পাঁচজন সাধারণ বেসরকারি সদস্য এবং প্রধান সেনাপতিকে (Commander-in-Chief) বিশেষ সদস্য হিসাবে রাখিবার ব্যবস্থা হয়। গভর্নর জেনারেলকে কাউন্সিলের কার্যপ্রণালী প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই সমস্ত সদস্যবৃন্দ ছাড়াও আইন অধ্যাদেশ প্রণয়নের নিমিত্ত ন্যূনতম ছয়জন এবং সর্বোচ্চ বারো জন কাউন্সিলের সদস্য মনোনয়নের জন্য গভর্নর-জেনারেলকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই মনোনীত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ন্যূনতম অর্ধেক সদস্য বেসরকারি ব্যক্তি হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। এই ধরনের সদস্যদের মেয়াদকাল রাখা হয় দুই বৎসর। গভর্নর জেনারেল বা তাঁহার মনোনীত কাউন্সিলের সভাপতির অনুপস্থিতিতে বরিষ্ঠ সাধারণ সদস্যকে সভাপতিত্ব করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। কাউন্সিল কর্তৃক এইভাবে প্রণীত যে কোন আইনের প্রতি গভর্নর-জেনারেলের সম্মতি বাধ্যতামূলক করা হয়। তবে রাজাকে এইভাবে প্রণীত আইন অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই আইনের দ্বারা গভর্নর-জেনারেলকে অধ্যাদেশ জারি করিবার ক্ষমতাও দেওয়া হয়।

ইন্ডিয়া কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৮৬১

গভর্নর-জেনারেলকে যেভাবে কেন্দ্রে আচরণবিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়, অনুরূপভাবে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গভর্নরদিগকেও তাঁহাদের পরিষদের আচরণবিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। অবশ্য এই ক্ষমতাও গভর্নর-জেনারেলের পরিষদের ন্যায় সীমাবদ্ধ। ইহা ছাড়াও প্রাদেশিক পরিষদ বা কাউন্সিলগুলিকে আইন প্রণয়ন করিবার ব্যাপারে

মুদ্রা, গ্রন্থস্বত্ব, ডাক ও তার, দণ্ডবিধি ইত্যাদি সমগ্র ভারতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে গভর্নর-জেনারেলের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। আইন প্রণয়নের জন্য গভর্নরের নির্বাহী পরিষদকে প্রধান সরকারি উকিল (Advocate General) এবং গভর্নর কর্তৃক মনোনীত চারিজন এবং সর্বাধিক আটজন, তন্মধ্যে অন্তত অর্ধেক বেসরকারি সদস্য যোগ করিয়া বৃদ্ধি করা হয়। ১৮৬১ সালের এ্যাক্ট সপরিষদ গভর্নর জেনারেলকে অনুরূপ আইন পরিষদ শুধু অবশিষ্ট প্রদেশগুলি, যথা—বাংলাদেশ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশসমূহ (বর্তমান যুক্তপ্রদেশ) এবং পাঞ্জাবেই নহে, বরং নূতন প্রদেশগুলিতেও, যদি থাকে, গঠন করিবার ক্ষমতা প্রদান করে। এই ধারা অনুযায়ী তিনটি প্রদেশে যথাক্রমে ১৮৬২, ১৮৮৬ ও ১৮৯৮ সালে এক-একটি আইন পরিষদ গঠন করা হয়।

গভর্নরের ক্ষমতা

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয় ১৮৯২ সালে, যখন 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস এ্যাক্ট' বা 'ভারত পরিষদ আইন' নামে একটি আইন পাস করা হয়। উপমহাদেশে সাংবিধানিক বিবর্তনের ইতিহাসে ইহা আরেকটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। নূতন আইন অনুযায়ী গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিল বর্ধিত করা হয় এবং গভর্নর-জেনারেল সুপ্রিম কাউন্সিল বা উচ্চ পরিষদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ষোলো জন সদস্য, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিশজন, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহ ও অযোধ্যার জন্য পনের জন সদস্য নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা লাভ করেন। অযোধ্যায় ইতোমধ্যে ১৮৮৬ সালে একটি আইন পরিষদ গঠন করা হয়। সদস্য মনোনয়ন সংক্রান্ত বিধি রচনা করিবার ক্ষমতা সপারিষদ গভর্নর-জেনারেলের হাতে ন্যস্ত করা হয়। এই এ্যাক্টের সন্নিহিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হইল, আইন পরিষদের সদস্যবৃন্দ বাজেট সম্পর্কে আলোচনা এবং জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা লাভ। বর্ধিত সদস্যদের শূন্যস্থান পূরণ করিবার ক্ষমতা যথাক্রমে সপারিষদ গভর্নর-জেনারেল, গভর্নর বা লেফটেন্যান্ট গভর্নরদের হাতে দেওয়া হয়। কোন আইন বা বিধি প্রয়োজনানুসারে বাতিল করিবার ক্ষমতাও ভারতীয় আইন পরিষদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তবে ইহাতে গভর্নর-জেনারেলের পূর্ব সম্মতি লাভ করিতে হইবে।

ইন্ডিয়া কাউন্সিল এ্যাক্ট (১৮৯২)

১৯০৯ সালে সরকার কতকগুলি সাংবিধানিক রদবদলের পরিকল্পনা করে, যেগুলিকে মোর্লে-মিন্টু সংস্কার (Morley-Mintu Reforms) নামক আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই সময় লর্ড মোর্লে ছিলেন ভারত সচিব এবং লর্ড মিন্টো ছিলেন ভারতের গভর্নর-জেনারেল। এই সংস্কারসমূহ জনসাধারণের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে সুযোগ্য ভারতীয়দের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে। সুতরাং গভর্নর-জেনারেলের নির্বাহী পরিষদে একজন ভারতীয় সদস্যের আসন প্রকৃত প্রস্তাবে সংরক্ষিত রাখা হয়। পাঞ্জাব, বার্মা, পূর্ববাংলা ও আসাম আইন পরিষদ গঠন করা হয়। পাঞ্জাব ও বার্মায় সদস্য সংখ্যা রাখা হয় ত্রিশ এবং পূর্ববাংলা ও আসামে রাখা হয় পঞ্চাশ। গভর্নর-জেনারেলের পরিষদে ঊর্ধ্বতন সদস্য সংখ্যা রাখা হয় ষাট। বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যায় ঊর্ধ্ব সংখ্যা রাখা হয় পঞ্চাশ। নির্বাহী পরিষদের সদস্যবর্গ পদাধিকার বলে আইন পরিষদের সদস্য হন। এই পরিষদের বেসরকারি সদস্য সংখ্যাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

মোর্লে মিন্টো সংস্কার

গভর্নর জেনারেল কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে কতকগুলি বিশেষ সম্প্রদায়কে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য তিনজন বেসরকারি ব্যক্তিকে মনোনয়ন দানের ক্ষমতা রাখেন এবং আরও দুইটি আসন তাঁহার মনোনয়নের জন্য শূন্য রাখা হয়। অবশিষ্ট সাতাশটি আসন বেসরকারি নির্বাচিত সদস্য দ্বারা পূরণীয়। ইহাদের কয়েকজন প্রতিনিধিত্ব করেন কয়েকটি বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীকে, যথা—সাতটি প্রদেশে জমিদার শ্রেণীকে, পাঁচটি প্রদেশে মুসলমানদিগকে এবং কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বণিক সমিতিকে (Chamber of Commerce)। অন্য তের জন সদস্য নির্বাচিত হন নয়টি প্রদেশিক আইন পরিষদের বেসরকারি সদস্যগণ দ্বারা। প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলিতে সরকারি ও মনোনীত বেসরকারি সদস্যগণের সমষ্টি নির্বাচিত সদস্যদের উপর একটি ছোটখাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন, কিন্তু বাংলাদেশে নির্বাচিত সদস্যগণ পুরাপুরি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। এই সমস্ত অতিরিক্ত সদস্যগণের অধিকাংশ জমিদার শ্রেণী, বণিক সমিতিসমূহ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় স্থানীয় সমবায়সমূহের দ্বারা নির্বাচিত হন। মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত পৃথক প্রতিনিধিত্বের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের দাবি মানিয়া লইয়া ১৯০৯ সালে সংস্কারসমূহ পৃথক নির্বাচনের সূচনা করে।

মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন

১৯০৯ সালের মোর্লে-মিন্টু সংস্কারসমূহ যদিও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন করিবার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, কিন্তু তবুও ভারতে এইগুলি পার্লামেন্টারী সরকার প্রদান করে নাই। ১৯০৮ সালে ইংল্যান্ডের উচ্চ পরিষদে লর্ড মোর্লে স্বয়ং ইহা স্বীকার করিয়া বলেন—"যদি বলা যাইত যে, এই সংস্কারাবলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের সহায়তা করিয়াছে, তবে আমি এককভাবে বলিব ইহাতে আমার করিবার মত কিছুই ছিল না।"[২] প্রকৃতপক্ষে এই উপমহাদেশের শাসনব্যবস্থা তখনও পুরাপুরি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রতি দায়িত্বের উপর চলিতেছিল। বেসরকারি সদস্যবৃন্দ তখন দায়িত্বপূর্ণভাবে কাজ করিতে অক্ষম, কারণ তাঁহারা যাহা হয়ত বলিতে পারিতেন তদ্বারা সুরকারের মৌলিক নীতির কোন পরিবর্তন হইত না।

১৯০৯ সালে সংস্কারসমূহের সমালোচনা

মোর্লে-মিন্টু সংস্কারসমূহ ভারতীয় জনগণের আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় নাই। জনসাধারণের অসন্তোষ বাড়িতেই থাকে। ইতোমধ্যে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, যাহাতে ব্রিটিশ সরকারও জড়াইয়া পড়ে। উপমহাদেশের জনগণ এই যুদ্ধে ব্রিটিশদিগকে জীবন ও সম্পদ দ্বারা সাহায্য করে এবং তৎসঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন তাহাদের স্বাধীনতার দাবিও নবরূপে উত্থাপন করে। 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' এবং 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' যুক্তভাবে সরকারের নিকট একটি পরিকল্পনা পেশ করে। ভারতীয়দের সাংবিধানিক সংস্কারসমূহের ব্যাপক দাবিতে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এবং যুদ্ধের সময় গ্রেট ব্রিটেনের প্রতি তাহাদের অনুগত সেবার স্বাক্ষর হিসাবে ভারত সচিব এডউইন মন্টাগু ১৯১৭ সালের ২০শে আগস্ট তাঁহার প্রদত্ত প্রসিদ্ধ ঘোষণায় বলেন—"মহামান্য সরকারের নীতি হইল, যাহার সহিত ভারত সরকারও একমত, শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরে ভারতীয়দের সম্পৃক্তকরণ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রম-উন্নতি, যদ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে

মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট বা ভয়াবহ শাসন আইন-১৯১৯

ভারতে দ্রুত দায়িত্বশীল সরকার গঠন করা যায়।"[৩] মন্টাগু ভারতে আগমন করেন এবং জনসাধারণের মতামত যাচাই করিয়া 'মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট" নামে সুপরিচিত ভারতের সাংবিধানিক প্রস্তাবের উপর একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্ট ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের ভিত্তি রচনা করে এবং ইহা ১৯২১ সালের প্রথম দিকে কার্যকরী হয়।

১৯১৯ সালের 'ভারত শাসন আইন' কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কার্যাবলি যতদূর সম্ভব পরিষ্কারভাবে ভাগ করিয়া দেয়। বিভিন্ন আয়ের উৎস ও রাজস্বের খাতসমূহের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সীমানাও নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এই আইন কেন্দ্রীয় সরকারে দ্বৈত শাসন (Diarchy) প্রচলন করে নাই, এবং গভর্নর-জেনারেল পূর্বের ন্যায় 'ভারতীয় আইন পরিষদে'র পরিবর্তে সরাসরি ভারত সচিব ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকিয়া পরিষদকে সম্পূর্ণভাবে পুনর্বিন্যাস ও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করা হয়, যাহার একটির নাম হয় 'রাষ্ট্রীয় পরিষদ' (Council of State) এবং অন্যটির নাম হয় 'আইন পরিষদ' (Legislative Assembly)। নির্বাহী পরিষদের (Executive Council) সদস্যবৃন্দ গভর্নর-জেনারেলের মনোনয়নে যে কোন একটি পরিষদের সদস্য হইতে পারেন। রাষ্ট্রীয় পরিষদ বা উচ্চ কক্ষ (Upper Chamber) প্রধানত পুনরালোচনা করিবার সভা। ইহার সদস্য সংখ্যা ঊর্ধ্বতন ৬০ জন, তন্মধ্যে ৩৪ জন নির্বাচিত। ঊর্ধ্ব সংখ্যা ২০ জন সরকারি কর্মচারী। আইন পরিষদ বা নিম্ন (Lower Chamber) জনবহুল কক্ষ গঠিত ১৬০ জন সদস্য দ্বারা। পরে এই সংখ্যা ১৪৫ জনে কমাইয়া আনা হয়। তন্মধ্যে ১০৫ জন হয় নির্বাচিত, ২৬ জন মনোনীত সরকারি কর্মচারী এবং ১৪ জন মনোনীত বেসরকারি ব্যক্তিবর্গ। উভয় পরিষদের নির্বাচন প্রত্যক্ষ (Direct), এবং ভোটাধিকার উচ্চ ভূম্যাধিকারীর ভিত্তিতে (High property qualification), তবে নিম্ন পরিষদের ভোটাধিকার উচ্চ পরিষদের চাইতে অনেকটা ব্যাপক। রাষ্ট্রীয় পরিষদের আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করা হয় পাঁচ বৎসরে এবং নিম্ন পরিষদের করা হয় তিন বৎসরে। কিন্তু গভর্নর-জেনারেলের নিকট যে কোন পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতা, বা বিশেষ ক্ষেত্রে এইগুলির মেয়াদ বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। উভয় পরিষদের ক্ষমতা দেওয়া হয় সমভাবে, তবে অর্থদানের (Grant) আবেদন প্রথমে নিম্ন পরিষদে দাখিল করিবার ব্যবস্থা করা হয়। উভয় পরিষদের অচলাবস্থার ক্ষেত্রে গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক একটি যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিবার ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রীয় পরিষদে সদস্যদের মধ্য হইতে গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক একজন সভাপতি মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হয়। আইন পরিষদেও অনুরূপভাবে ইহার একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম চারি বৎসরের জন্য সভাপতি গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তারপর পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

উভয় পরিষদের গঠনতন্ত্র

১৯১৯ সালের আইন প্রাদেশিক শাসন বিভাগে দ্বৈত শাসন (Diarchy) প্রবর্তন করে। সমস্ত প্রদেশ গভর্নরের প্রদেশ হইয়া যায়, যাহার উপরে থাকেন মহামান্য রাজা কর্তৃক নিযুক্ত এক একজন গভর্নর। এক একটি প্রদেশের গভর্নর অসীম ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা সহকারে ইহার আইনসঙ্গত ক্ষমতাধর থাকেন। গভর্নর ও তাঁহার শাসন বিভাগীয় পরিষদকে

কতকগুলি সংরক্ষিত বিষয়ের (Reserve List) উপর ক্ষমতা দেওয়া হয়, যেগুলির প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য তাঁহাকে আইন পরিষদের পরিবর্তে গভর্নর জেনারেল ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী রাখা হয়। হস্তান্তরিত বিষয়সমূহকে (Transferred list) গভর্নর ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গের হাতে অর্পণ করা হয়। মন্ত্রিবর্গ গভর্নর কর্তৃক প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন এবং উহাদের সংখ্যা এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে বিভিন্ন রূপ হয়। গভর্নরের ইচ্ছামাফিক মন্ত্রিবর্গ কাজে নিযুক্ত থাকেন। নির্বাচনে বিভিন্ন দল, যথা—জমিদার শ্রেণী, বণিক সমিতি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং মুসলিম, ইউরোপীয়, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় খ্রিস্টান ও পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়কে তাহাদের নিজস্ব নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রাদেশিক শাসন বিভাগ দ্বৈত শাসন প্রচলন পৃথক নির্বাচন

"ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ১৯১৯ সালের 'ভারত শাসন আইন' জনগণের প্রতিনিধিদিগকে প্রকৃত দায়িত্ব দিয়াছে শাসনব্যবস্থার অতি সীমাবদ্ধ গণ্ডির ভিতরে মাত্র; এবং একটি সত্যিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিক হইতে বিচার করিতে গেলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকারেই ইহার কিছু ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।"[৪] তাহা সত্ত্বেও ইহাকে সাংবিধানিক সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় মনে করিতে হইবে। প্রথম বারের মত ব্রিটিশ সরকার ভারতে সাংবিধানিক উন্নয়নের লক্ষ্য হিসাবে সরকারিভাবেই শুধু ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনই (Dominion status) নহে, বরং দায়িত্বশীল সরকারেরও সূচনা করে। প্রথমবারের মত তুলনামূলকভাবে ব্যাপক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন একটি উল্লেখযোগ্য অনুগ্রহ। অধিকন্তু রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণ এবং সরকারের কার্যাবলিকে প্রভাবিত করিবার জন্য জনগণকে ইহা একটি মূল্যবান সুযোগ দান করে।

সমালোচনা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও দায়িত্বশীল সরকার

১৯১৯ সালের সংস্কারসমূহ ভারতের জনগণের জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সন্তুষ্ট করিতে ব্যর্থ হয়। ফলে তাহাদের রাজনৈতিক অগ্রগতির দাবি ক্রমশ অধিক ব্যাপকতা লাভ করে। জনগণ অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২২) শুরু করে এবং সেই আন্দোলন প্রতিহত করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকারও কঠোর নীতি অবলম্বন করে। শেষ পর্যন্ত সংস্কারসমূহের কার্যকারিতার উপর রিপোর্ট দিবার জন্য স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন প্রেরণ করা হয়। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এই কমিশন বর্জন করেন। কারণ, সাত সদস্যবিশিষ্ট এই কমিশনের সবাই ব্রিটিশ। ভারতের অতি দুরূহ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্যার জন সাইমন একটি গোল টেবিল বৈঠকের সুপারিশ করেন। ১৯৩০ সালের মে মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। প্রদেশগুলিতে ইহা পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকারের সুপারিশ করে, এমনকি আইন পরিষদের নিকট দায়ী মন্ত্রিবর্গের হাতে পুলিশ ও বিচার বিভাগ ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব দেওয়া হয়। আইন পরিষদ আরও ব্যাপক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠন করা এবং সরকারি মহলটির উচ্ছেদের সুপারিশ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কমিশন পূর্ণ মাত্রায় ব্রিটিশ ক্ষমতা ও আধিপত্য বজায় রাখিবার সুপারিশ করে। এই রিপোর্ট দেশীয় রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে যোগাযোগের গুরুত্ব উল্লেখ করে এবং রাজাদিগকে লইয়া একটি

সাইমন কমিশন (১৯৩০) কমিশনের সুপারিশ গোল টেবিল বৈঠক (১৯৩১-৩৩)

সর্বভারতীয় ফেডারেশন গঠনের উপর জোর দেয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদীগণ এই সুপারিশগুলিকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর ব্রিটিশ সরকার লন্ডনে একটি গোল টেবিল বৈঠক (Round Table Conference) আহ্বান করে। ইহাতে তিনটি ব্রিটিশ রাজনৈতিক দল হইতে ১৬ জন প্রতিনিধি, ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ (Princely states) হইতে ১৬ জন, ব্রিটিশ ভারত হইতে ৫৭ জন প্রতিনিধি এবং আরও কয়েকজন ভারতের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে ভারতের সাংবিধানিক প্রশ্ন বিবেচনার জন্য আহ্বান করা হয়।

গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই কমিটির অনুমোদন অনুসারে ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইন' নামে একটি খসড়া আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপন করা হয় এবং কিছু রদবদল সহকারে ১৯৩৫ সালের ২রা আগস্ট ইহা আইনে পরিণত হয়। ১৯৩৫ সালের আইন দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে রচিত—(১) গভর্নর শাসিত প্রদেশ, চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ এবং সম্মিলিত (Federating) ভারতীয় রাষ্ট্রগুলি লইয়া একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং (২) প্রত্যেক গভর্নর শাসিত প্রদেশে এক-একটি নির্বাচিত আইন পরিষদের নিকট দায়ী স্বায়ত্তশাসন দান। ইংল্যান্ডের রাজা কর্তৃক ভারতের সম্রাটের নামানুসারে শাসন পরিচালনা করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ভারত সচিবের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি এই দায়িত্ব সম্পাদন করিবেন। ভারত সচিব ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার একজন অসাধারণ সদস্য থাকিবেন।

ভারত শাসন আইন (১৯৩৫)

১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইন' অনুসারে ভারত সচিবকে এই দেশের শাসন-ব্যবস্থার প্রধান করা হয়। গভর্নর-জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নরগণকে অনেকগুলি ব্যাপারে তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। কয়েকজন পরামর্শদাতা তাঁহাকে শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ দিবেন। পরামর্শদাতাদের সংখ্যা হইবে ঊর্ধ্বতন ছয়জন এবং নিম্নসংখ্যা তিনজন। ভারতের শাসন ব্যাপারে ভারত সচিব ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকিবেন।

১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ ও দেশীয় রাজ্য সমন্বয়ে একটি ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। প্রস্তাবিত ফেডারেশনে যোগদান করা বা না করা দেশীয় রাজ্যদের স্ব স্ব এখতিয়ারে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং কিছু নির্ধারিত বিষয় ছাড়া যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যগুলি বিভিন্ন ব্যাপারে বিশেষ অধিকার পাইবেন। ভাইসরয় হিসাবে গভর্নর-জেনারেল ফেডারেশনে যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহের সর্বময় কর্তা হইবেন। শাসন বিভাগীয় কার্যাবলি দুই ভাগে ভাগ করা হয় এবং দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, খ্রিস্টান ধর্ম বিষয়ক কার্যাবলি ইত্যাদি সমন্বয়ে গঠিত একটি ভাগকে সরাসরি গভর্নর-জেনারেলের হাতে দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি ঊর্ধ্ব সংখ্যা তিনজন পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিতে পারেন। শাসনব্যবস্থার অন্যান্য কার্যাবলিতে গভর্নর জেনারেলকে সাহায্য ও পরামর্শ করিবার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদের ব্যবস্থা করা হয়। মন্ত্রিদের সংখ্যা ঊর্ধ্বতন ১০ জন এবং আইন পরিষদের মধ্য হইতে গভর্নর-জেনারেল তাহাদিগকে মনোনীত করিবেন। মন্ত্রিবর্গ তাঁহাদের কার্যাবলির জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন এবং তাহাদের কোন কার্য আইন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে তাহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ফেডারেশন শাসনব্যবস্থা

১৯৩৫ সালের আইনে কিছু বিভাগকে গভর্নর-জেনারেলের বিশেষ দায়িত্ব বলিয়া নির্ধারণ করা হয় এবং ঐগুলির শাসনভার সম্পূর্ণভাবে তাঁহার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বৈদেশিক কার্যাবলি, প্রতিরক্ষা এবং দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তার ন্যায় নির্ধারিত বিভাগের পরিচালনার জন্য গভর্নর-জেনারেলকে যে কোন বিভাগের কার্যাবলিতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার দেওয়া হয়। এইসব ব্যাপারে তাঁহাকে শুধু ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী করা হয়। বিশেষ দায়িত্বসমূহের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য গভর্নর-জেনারেলকে ইচ্ছা ও ক্ষমতা অনুসারে কাজ করিতে বিশেষ ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়।

গভর্নর জেনারেলের বিশেষ দায়িত্ব

ফেডারেল আইন সভাকে 'ফেডারেল পরিষদ' বা নিম্নকক্ষ এবং 'রাষ্ট্রীয় পরিষদ' বা উচ্চ কক্ষের সমন্বয়ে গঠিত দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট করা হয়। ফেডারেল পরিষদের সদস্য সংখ্যা করা হয় ২৫০ জন ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ এবং উর্ধ্বসংখ্যা ১২৫ জন দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিবৃন্দ। ফেডারেল পরিষদের সদস্যগণ প্রদেশসমূহের আইন পরিষদ দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। এমনকি এই পরোক্ষ নির্বাচনেও হিন্দু, মুসলমান ও শিখ আসনসমূহ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনের জন্য আলাদাভাবে ভোট প্রদান করিয়া এইসব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দ্বারা পূরণ করিবার ব্যবস্থা হয়। রাষ্ট্রীয় পরিষদ বা উচ্চ কক্ষের সদস্য সংখ্যা করা হয় ১৫৬ জন ব্রিটিশ ভারতীয় সদস্যবৃন্দ, এবং সম্মিলিত রাষ্ট্রবর্গের জন্য উর্ধ্ব সংখ্যা ১০৪ জন। দেশীয় রাজ্যের সদস্যগণ তাহাদের স্ব-স্ব শাসকগণ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। ব্রিটিশ ভারতীয় সদস্যদের ছয়জনকে গভর্নর-জেনারেল মনোনয়ন দান করিবেন, যাহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, অনুন্নত সম্প্রদায় ও মহিলাগণ তাহাদের সঠিক প্রতিনিধিত্ব লাভ করেন এবং অবশিষ্ট সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন প্রত্যক্ষভাবে, কোন কোন ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে একটি উচ্চ পর্যায়ের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। ফেডারেল পরিষদের মেয়াদ পাঁচ বৎসর করা হয়। কিন্তু গভর্নর-জেনারেল তাঁহার ক্ষমতাবলে ইহাকে মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বেই ভাঙিয়া দিতে পারিবেন। রাষ্ট্রীয় পরিষদকে স্থায়ী সংগঠন করা হয়, যাহাকে ভাঙিয়া দেওয়া যাইবে না। প্রত্যেক সদস্যের মেয়াদ নয় বৎসরের অধিক হইতে পারিবে না এবং মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ প্রতি তিন বৎসর পর পর অবসর গ্রহণ করিবেন।

রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও ফেডারেশন পরিষদ ফেডারেশন বা নিম্ন কক্ষ

১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইন' অনুসারে ভারতকে এগারোটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। যথা—বাংলাদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, সিন্ধু, পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, যুক্তপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। বার্মাকে (মায়ানমার) ভারত হইতে পৃথক করা হয়। প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা হয়। এই এগারোটি প্রদেশ ছাড়াও ছয়টি প্রদেশ ছিল চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ। চীফ কমিশনারের প্রদেশগুলি গভর্নর জেনারেল তাঁহার স্বীয় ইচ্ছায় নিযুক্ত চীফ কমিশনার দ্বারা শাসন করেন।

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা

১৯৩৫ সালের আইন মোতাবেক একটি প্রদেশের শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা রাজার প্রতিনিধি হিসাবে গভর্নরের হাতে ন্যস্ত করা হয়। এই আইনে প্রদত্ত তাঁহার কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য করিবার জন্য গভর্নরের হাতে একটি মন্ত্রিপরিষদ দেওয়া হয়। এই মন্ত্রিপরিষদ আইন

ও শৃঙ্খলা ছাড়া প্রদেশের সব ব্যাপারেই তাঁহাকে পরামর্শ দান করেন। আইন ও শৃঙ্খলার জন্য গভর্নরের হাতে বিশেষ ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়, যেগুলি তিনি ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার করিতে পারেন। প্রয়োজন হইলে আইন পরিষদের সম্মতি ছাড়াই গভর্নর অধ্যাদেশ (Ordinance) বা আইন পাস করিতে পারেন। সাধারণত স্থানীয় আইন পরিষদের সদস্যবৃন্দ হইতে গভর্নর মন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং মন্ত্রিবর্গ সেই আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিবার সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্তব্য করা হয়। সাধারণত গভর্নর মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। মন্ত্রিপরিষদের কোন কাজ আইন পরিষদ কর্তৃক পাস করাইতে না পারিলে তাহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য থাকেন। এই আইন মন্ত্রিদের কোন সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া দেয় নাই।

গভর্নর ও মন্ত্রিদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

প্রাদেশিক আইন পরিষদ রাজপ্রতিনিধি হিসাবে গভর্নর এবং একটি বা দুইটি কক্ষের সমন্বয়ে গঠিত। বাংলাদেশ, বিহার, মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ ও আসামের আইন পরিষদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। একটির নাম 'আইন সভা' (Legislative Council) এবং অপরটির নাম 'আইন পরিষদ' (Legislative Assembly)। অবশিষ্ট প্রদেশসমূহ এক কক্ষবিশিষ্ট। 'আইন পরিষদ' বা নিম্ন কক্ষের সদস্য সংখ্যা ৫০ হইতে ২৫০ জনে উঠানামা করে এবং সবাই নির্বাচিত হন। ইহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর, অবশ্য গভর্নর ইচ্ছা করিলে ইহাকে পূর্বেই ভাঙিয়া দিতে পারেন। আইন পরিষদের প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য প্রত্যেক প্রদেশের নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয় সম্প্রদায় ও স্বার্থ সমন্বয়ে এবং ১৯৩২ সালের ৪ঠা আগস্টের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (Communal Award) অনুযায়ী। 'আইন পরিষদ' আইন প্রণয়ন ও শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। অবশ্য ইহা গভর্নরের সম্মতি সাপেক্ষে।

প্রাদেশিক আইন পরিষদ

জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ও ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৭ সালের মধ্যে সংঘটিত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শেষ পর্যন্ত ভারতকে বিভক্ত করিয়া দেয় এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

পাদটীকা

১। Dual Government এবং Diarchy এক কথা নহে যদিও বাংলা ভাষায় উভয়কে দ্বৈত শাসন বলা হয়। ১৭৬৭ সালে রবার্ট ক্লাইভ দেওয়ানী লাভ করিলে যে ব্যবস্থা চালু হয় ইহাকে বলা হয় Dual Government বা দ্বৈত শাসন। অপরদিকে ১৯১৯ সালের ইন্ডিয়া এ্যাক্টে যে ব্যবস্থা কেন্দ্রে চালু করা হয় উহাকে Diarchy বলা হয় যাহার বাংলা প্রতিশব্দও দ্বৈত শাসন।

২। If it could be said that this chapter of reforms led directly or indirectly to the establishment of a parliamentary system in India, I, for one, would have nothing at all to do with it. Speech delivered by Lord Morely in the House of Lords, December, 1908.

৩। The policy of his Majesty's Government with which the Government of India are incomplete accord, is that of increasing association of India

in every branch of the administration, and the gradual development of self-governing institutions with a view to the progressive realisation of responsible government in India as an integral part of British Empire.

৪। কালীকিংকর দত্ত-*An Advanced History of India.*

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী

Selections from the History of the Freedom Movement Vol-II; Pakistan Historical Society published.

Sir J. W. Kaye : *Administration of the East India Company*

G. N. Joshi : *Indian Administration*

P. Mukherjee : *Indian Constitutional Documents.*

Archbold : *Indian Constitutional History*

Reports of the Round Table Conference;

Montagu-Chelmsford Report 1919.

পঞ্চম অধ্যায়
ব্রিটিশ শাসনামলে দক্ষিণ এশিয়ায় পাশ্চাত্য ছাপ

দক্ষিণ এশিয়ায় পাশ্চাত্য শক্তির আগমন এই দেশে উন্নতি ও প্রগতির এক নবযুগের সূচনা করে। এই কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, ইংরেজ জোরপূর্বক ও অন্যায়ভাবে এবং সুপরিকল্পিতভাবে এই দেশের ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু ক্ষমতা হাতে লইয়া এই দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগে যথেষ্ট উন্নয়নের ছাপ রাখিয়া যায়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে ঃ এই দেশের শাসনভার গ্রহণ করিবার বহুকাল পরেও দেশবাসীর শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের প্রতি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি ছিল না। তবে প্রাচ্য-প্রতীচ্য এই দুই সভ্যতার অবাধ সংমিশ্রণে দেশের শিক্ষার কিছু বিকাশ হয়—যদিও শতকরা দশজনের অধিক শিক্ষা লাভ করে নাই। ১৭৮৪ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনামলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মনীষী স্যার উইলিয়াম জোন্‌স ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনার জন্য কলিকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় কোম্পানির প্রশাসনিক প্রয়োজনে আরবি ও ফার্সি ভাষা শিক্ষার জন্য কলিকাতা মাদ্রাসাও স্থাপিত হয় এবং সংস্কৃত ভাষা চর্চার জন্য কাশীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৩ সালে প্রাচ্য ভাষাসমূহ শিক্ষাদানকল্পে সরকার প্রথমে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যবস্থা করে। কিন্তু এত বড় দেশ এবং তাহা হইতে বিপুল আয়ের তুলনায় ইহা নগণ্য। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ কর্তৃক 'সমাচার দর্পণ' নামক বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় এবং ইহার কিছুকাল পূর্বেই রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার প্রমুখ মনীষীদের চেষ্টায় 'হিন্দু কলেজ' স্থাপিত হওয়ায় দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলনও আরম্ভ হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা (১৭৮৪)

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের শাসনকালে ডেভিড হেয়ার, রাজা রামমোহন রায় ও মেকলে প্রমুখ শিক্ষাব্রতীগণের প্রচেষ্টায় এই দেশবাসীকে পাশ্চাত্য ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষাদানের কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ (১৮৩৫) প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় কিছু সংখ্যক ভদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারে শিক্ষার প্রসার হয়। ১৮৫৪ সালে 'বোর্ড অব কন্ট্রোলে'র সভাপতি স্যার চার্লস উডের শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশপত্রের (Education despatch) নীতি অনুসারে লর্ড ডালহৌসী শিক্ষা বিভাগের সংস্কার সাধন করেন এবং শিক্ষার জন্য সরকারি সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৮৪ সালে লর্ড রিপন প্রাথমিক

শিক্ষা ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য 'হান্টার কমিশন' নিযুক্ত করেন। এই সকল ব্যবস্থার ফলে সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার আরম্ভ হয়। লর্ড কার্জন এক নূতন আইন দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংস্কার করেন। ১৯০১ সালে ভারতের প্রাচীন কীর্তিসমূহ আবিষ্কার ও রক্ষাকল্পে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠাও তাঁহার শাসনকালের স্মরণীয় কীর্তি। ইহার ফলে ঐতিহাসিক গবেষণার পথ সুগম হয়। এই সময় 'ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি' নামক কেন্দ্রীয় পুস্তকাগার কলিকাতায় স্থাপিত হয়। ১৯১৭ সালে লর্ড চেমসফোর্ডের শাসনামলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য 'স্যাডলার কমিশন' নিযুক্ত হয়। ইহার প্রদত্ত রিপোর্ট অনুসারে ভারতের কয়েকটি প্রদেশে শিক্ষা সংস্কার সাধিত হয়। ১৯১৯ সালে 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারে'র ফলে শিক্ষা বিভাগের ভার দেশীয় মন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত হয়। ১৯৩৫ সালের নূতন 'ভারত শাসন আইন' অনুসারেও শিক্ষা বিভাগের ভার দেশীয় মন্ত্রীর হাতেই অর্পিত হয় এবং কয়েকটি প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়।

উইলিয়াম বেন্টিংকের সময়
(১৮৩৫)
(১৮৫৭)
(১৯০১)
(১৯১৯)
(১৯৩৫)

শিক্ষা বিভাগের কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রীর অধীনে 'ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' (ডি. পি. আই) নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। তিনি তাঁহার বিভাগীয় কর্মচারিগণের সাহায্যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের কার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন।

ডি. পি. আই

জ্ঞানের তারতম্য অনুযায়ী শিক্ষাকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। পাঠশালা ও প্রাইমারি বিদ্যালয়সমূহে মাতৃভাষায় অংক, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় সাধারণভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাই প্রাথমিক শিক্ষা। তারপর মধ্য বাংলা, মধ্য ইংরেজি ও উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হয় এবং প্রবেশিকা শ্রেণীতে উঠিয়া এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষার্থীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে উপনীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষা দান করা হয়। কলেজ ও অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিতে যৎসামান্য সরকারি সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হয়। চিকিৎসাবিদ্যা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও আইন প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার জন্যও বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এত বড় দেশের তুলনায় ঐগুলির সংখ্যা নিতান্ত অল্প এবং চারু শিল্প ও চিত্রবিদ্যা শিক্ষার কিছু ব্যবস্থাও করা হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে কতকগুলি সরকারি এবং অধিকাংশই বেসরকারি। ইহা ব্যতীত সামরিক শিক্ষার জন্য দেরাদুনে একটি সামরিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং নৌযুদ্ধ ও বিমানযুদ্ধ শিক্ষারও আয়োজন চলে। উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী না থাকিলে শিক্ষাদানকার্যে বহু ত্রুটি থাকে। সেইজন্য ট্রেনিং কলেজ ও নর্ম্যাল স্কুল স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাইমারি শিক্ষা
মাধ্যমিক ও
উচ্চ শিক্ষা

স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তাও সরকার ক্রমশ উপলব্ধি করে। মেয়েদের জন্য কয়েকটি কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হয়। প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে নারী শিক্ষাব্রতী বেথুন সাহেবের নামে বেথুন কলেজ স্থাপিত হয় (১৮৪৯)। নারীদের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পুনা শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নারী শিক্ষা

নানা বিষয়ে জ্ঞানের প্রসারকল্পে এবং গবেষণার সুবিধার জন্য প্রাদেশিক লাইব্রেরি,

যাদুঘর ও পশুশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরকারি ব্যয়ে পরিচালিত হয়। ইহা ব্যতীত মেধাবী শিক্ষার্থীগণকে উৎসাহ্ দিবার জন্য এবং বিলাতে পাঠাইয়া বিশেষজ্ঞ বানাইবার জন্য সরকারি বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা হয়।

ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন ঃ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুধর্ম ও সমাজে সংস্কারের এক কঠোর ছাপ পরিলক্ষিত হয়। এই স্পৃহার পথ সুগম করেন রাজা রামমোহন রায়। সমাজ ও ধর্মের প্রচলিত দোষ-ত্রুটিগুলি সবাই স্বীকার করে। কিন্তু সচরাচর যাহা দেখা যায়, সংস্কারের উৎসাহ বিভিন্ন পথে অগ্রসর হয়। কেউ কেউ পাশ্চাত্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া একটি অতি প্রগতিশীল নীতি অবলম্বন করে, আবার কেউ কেউ এই নীতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে ধর্মীয় গোঁড়ামিকে আরও কঠোরভাবে আঁকড়াইয়া ধরে। এই দুইটি অতি বাড়াবাড়ি দলের মধ্যখানে মৃদু সংস্কারকের আবির্ভাব হয়। এই মধ্যপন্থী সংস্কারকের দল স্বল্প বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া অতি সাবধানে অগ্রসর হয়। ফলে ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্য সমাজ, দাক্ষিণাত্যের শিক্ষা সমিতি, ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক সমিতি (Thiosophical Society) এবং রামকৃষ্ণ মিশন গড়িয়া ওঠে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ১৯০৫ সালে গোখলে 'ভারতীয় সেবক সমিতি' (Servants of India Society) নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য "ভারতের সেবার নিমিত্ত জাতীয় মিশনারী দল গড়িয়া তোলা এবং সর্বপ্রকার নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতীয় জনসাধারণের সত্যিকারের স্বার্থ উন্নত করা।" এই সমিতি বিশেষ কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমিতি নহে, বরং এই সমিতির মাধ্যমে এক শ্রেণীর লোকদিগকে এরূপ বিভিন্ন শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহাতে ইহার সদস্যবৃন্দ মাতৃভূমির যে কোন সেবায় লাগিতে পারে।

ভারতীয় সেবক সমিতি (১৯০৫)

এই সমিতির সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন প্রকারের কার্যাবলিতে নিজদিগকে নিয়োজিত করে এবং স্ব-স্ব সংগঠন গড়িয়া তোলে। যথাঃ বোম্বাইয়ে সমাজ সেবা লীগ (১৯১১); সর্ব ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (১৯২০); এলাহাবাদে সেবা সমিতি (১৯১৪); এবং সেবা সমিতি বয়স্কাউট এসোসিয়েশন (১৯১৪)। ভারতীয় সেবা সমিতি তিনটি পত্রিকা পরিচালনা করে—"সারভেন্ট অব ইণ্ডিয়া" (Servant of India) একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক "নয়ন প্রকাশ" (Dnyan Prakash), সর্ব পুরাতন মারাঠী দৈনিক এবং "হিতাবাদ" একটি সাপ্তাহিক।

এই সংস্কারের ঢেউ ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, যথা—পার্সী ও শিখ সম্প্রদায়কেও প্রভাবান্বিত করে। পার্সী সম্প্রদায় তাহাদের বিখ্যাত সংস্কারক বেহ্‌রাওজী এম. মালাবারীর নিকট অনেকাংশে ঋণী। ইনি ভারতের মহিলা, ছেলেমেয়ে, শিক্ষা ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অতি মূল্যবান সংস্কার সাধন করেন। অগ্নি উপাসক সম্মেলন (Zoroastrian Conference) পার্সী সম্প্রদায়ের জন্য অনেক উপকারী কাজ সমাধা করে। প্রধান খালসা দিওয়ান অমৃতসরে ইহার কেন্দ্রস্থল এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা-প্রশাখা লইয়া সমাজ ও কৃষির ক্ষেত্রে অতি উদার সংস্কারের ভূমিকা গ্রহণ করে। অমৃতসরের খালসা কলেজ শিখ জাগরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রদান করে।

পার্সী ও শিখ সম্প্রদায়

প্রধানত আলীগড় আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের মুসলমানগণ নবচেতনায় উত্থিত হয়। এই উদ্দীপনার পুরোধা মৌলভী চেরাগ আলী, সৈয়দ আমীর আলী, স্যার মুহাম্মদ ইকবাল, অধ্যাপক এস. খোদা বখ্স ও অধ্যাপক এ. এম. মৌলভী। মুসলিম জাতির সেবার জন্য অনেকগুলি 'আঞ্জুমান' বা সমিতি এবং একটি অতি শক্তিশালী সাংবাদিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। পাঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুর জেলার 'কাদিয়ান' নামক স্থানের মির্জা গোলাম আহমদ কর্তৃক পরিচালিত আহমদিয়া আন্দোলনও এই সময় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনেক সমর্থন লাভ করে।

মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ

১৯০১ সালের "বাল্য বিবাহ দমন আইন", (Infant marriage Prevention Act, 1901) এবং ১৯৩০ সালের "বাল্য বিবাহ বিল" (Child Marriage Bill, 1930)-এর মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজ সংস্কারকগণ বাল্যবিবাহের কুপ্রথা উঠাইয়া দিতে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। হিন্দুদের 'বিধবা বিবাহ আন্দোলন' ভারতের অনেক সুপ্রসিদ্ধ সমাজসেবীদের লইয়া বিধবাদের পুনরায় বিবাহের জন্য বিরাট আকারের প্রচেষ্টা পরিচালনা করে। অবশ্য তবুও বিধবা বিবাহ অতি বিরল রহিয়া যায়। বিধবাদের অবস্থার উন্নতির জন্য মহীশূরের মহারাণীর স্কুল আর্য সমাজ ও পাঞ্জাবের পিউরিটি সোসাইটি (Purity Society) এবং লক্ষ্ণৌ-এর 'হিন্দু বিধবা সংস্কার লীগ' (Hindu Widow Reform League) যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালায়। মহিলারাও তাহাদের ভাগ্যের উন্নতির জন্য অতি উৎসাহ সহকারে কাজ করে। ১৯২৮ সালে অনেকগুলি শাখা লইয়া একটি 'ভারতীয় মহিলা সমিতি' (Women's Indian Association) গঠিত হয় এবং এই সমিতি মাদ্রাজে একটি শিশু নিবাসও স্থাপন করে। ১৯২৪ সালে বোম্বাইয়ে 'গর্ভ নিরোধক লীগ' নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। ১৯২৫ সালে সরোজীনী নাইডু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সভায় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে ১৯১৭ সালের মহিলা ভোটাধিকারের আন্দোলনের (Women Suffrage Movement) সফলতার দ্বারা। ভারতের মহিলাদিগকে ভোটাধিকার দিবার সমর্থনে মহিলা নেতৃবৃন্দ ১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইনের যুক্ত নির্বাচনী কমিটির (Joint Select Committee) নিকট সাক্ষ্য প্রদান করেন। ভারতের মহিলা প্রতিনিধিদল লন্ডনের গোল টেবিল বৈঠকেও যোগদান করেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতের মহিলাদিগকে পূর্বের চাইতে অধিক পরিমাণে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে।

বাল্য বিবাহ দমন আইন (১৯০১) মহিলা জাগরণ

আধুনিক ভারতের সামাজিক ইতিহাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল তথাকথিত অনুন্নত বা অস্পৃশ্য শ্রেণীর ক্রম পরিবর্তন। অনুন্নত সম্প্রদায়ের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির জন্য ১৯০৬ সালে বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত 'অনুন্নত সম্প্রদায় মিশন সমিতি' (Depressed Classes Mission Society) যথার্থভাবে ইহার কর্তব্য সম্পাদন করে। সমাজ সেবার কাজে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক পরিচালিত হরিজন আন্দোলনের প্রভাব একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অনুন্নত সম্প্রদায়

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নে বেশ উৎসাহী হইয়া উঠে। ১৯১৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞানের ভারতীয় প্রতিষ্ঠান (Indian

Institution of Political and Social Sciences) যথেষ্ট প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পাদন করে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধারণভাবে রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞানের ধারাবাহিক অধ্যয়নের উন্নতি এবং বিশেষভাবে সর্বস্তরের ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সমস্যাগুলির অধ্যয়নের উন্নতি।

রাজনীতি শিক্ষা

অর্থনৈতিক ঃ

ভারতের অধিকাংশ জনসাধারণ দরিদ্র চাষী। অতএব, জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতির সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হইল কৃষি বিভাগের উন্নতি সাধন করা। 'রাজকীয় কৃষি কমিশনে'র সভাপতি হিসাবে লর্ড লিনলিথগো (Lord Linlithgow) এই বিভাগে কিছু উন্নয়নের সুপারিশ করেন। কৃষি গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে একটি ইম্পেরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (Imperial Council of Agricultural Research) খোলা হয়। আধুনিক কৃষি পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকটি কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমান কৃষি বিভাগ ইহার প্রতিষ্ঠার জন্য লর্ড কার্জনের নিকট ঋণী। তাঁহার প্রসিদ্ধ ১৯০৩ সালের প্রেরিত রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯০৫ সালে কৃষি বিভাগের পুনর্গঠন আরম্ভ হয়। প্রাদেশিক সরকারগুলিকে একটি অপরটির সহিত যোগাযোগের উদ্দেশ্যে এবং ভারত সরকারের নিকট উপযুক্ত সুপারিশ করিবার জন্য ১৯০৫ সালে 'সর্ব ভারতীয় কৃষি বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯০৮ সালে পুনায় একটি পৃথক কলেজ খোলা হয়।

কৃষির উন্নতি

১৯১৯ সালের সংস্কার প্রবর্তনের দ্বারা কৃষিকার্যকে একজন মন্ত্রীর অধীনে হস্তান্তরিত বিষয় (Transferred list) হিসাবে গণ্য করা হয়, যদিও কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং গাছ ও গৃহপালিত জন্তুর রোগ ও পোকা-মাকড় সম্পর্কীয় বিশেষ কতকগুলি কাজের জন্য ভারত সরকারের হাতে দায়িত্ব রাখা হয়। সরকারের সেচ বিভাগ কূপ খনন ও খাল কাটিয়া শস্য ক্ষেত্রে পানি সরবরাহের বন্দোবস্ত করে। উত্তম শ্রেণীর বীজ সরবরাহ, কৃষি ব্যাংক ও যৌথ সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য উপায়েও সরকার দরিদ্র চাষী ও কৃষিকার্যের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

হস্তান্তরিত বিষয় হিসাবে কৃষিকার্য

শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্যও বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেশীয় লোকদের চাইতে বিদেশী লোকেরাই অধিক লাভবান হয়। জনগণের শিল্পকার্যে শিক্ষা গ্রহণের জন্য অতি স্বল্প সংখ্যক শিল্প বিদ্যালয় খোলা হয়। প্রত্যেক প্রদেশে এক-একটি শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ স্থাপন করা হয় এবং এইগুলির দায়িত্ব এক-একজন মন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিদেশী ব্যবসায়ীদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিয়া যায়। বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় শিল্পগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য সরকার শুল্ক দপ্তর (Tariff Board) গঠন করে। পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য সরকার নূতন 'ফ্যাক্টরী আইন' প্রবর্তন করে। গ্রামের কুটির শিল্পের প্রতিও সরকার নজর দেয় এবং গ্রাম্য কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য সরকার বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে।

শিল্প বাণিজ্য
শুল্ক দফতর
কুটির শিল্প

ভাষা ও সাহিত্য ঃ

বিভিন্ন কারণ, যথা—বহির্বিশ্বের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান যোগসূত্র, পূর্ব সাংস্কৃতিক ভাণ্ডার

পুনরুত্থানের আকুল আগ্রহ, জীবনের সর্বস্তরে সংস্কার সাধনের ইচ্ছা এবং সাধারণ সুখ-দুঃখের সমস্যাদির বিবেচনা গভীরভাবে ভারতের চিন্তা ধারাকে উদ্রিক্ত করে এবং একটি ছোটখাট সাংস্কৃতিক নবজাগরণ আনয়ন করে, যাহার প্রভাব ভারতের সাহিত্য ও চিত্রশিল্পে দৃষ্টিগোচর হয়। সত্যিই ভারতের আঞ্চলিক সাহিত্যসমূহ—বাংলা, উড়িয়া, হিন্দি, উর্দু, মারাঠী ভাষায় এক নবযুগের সূচনা করে। প্রত্যেকটি আঞ্চলিক ভাষা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সংমিশ্রণ প্রদান করে। বিভাগ-পূর্ব এক শতাব্দীর মধ্যে সাহিত্য, উপন্যাস, নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধের বিভিন্ন শাখায় অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাজ করা হয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরগুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব ও অবদান অতুলনীয়। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জীর দানও অপরিসীম। বাংলা নাটক মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ডি. এল. রায়, অমৃত লাল বসু ও অন্যান্যদের লেখায় সমৃদ্ধী হয়। এই যুগে অতি উচ্চ শ্রেণীর জীবন-চরিত ও আত্মজীবন-চরিতও পরিলক্ষিত হয়, এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখার প্রচেষ্টায়, বিশেষভাবে স্যার আশুতোষ মুখার্জীর দান অপরিসীম।

বাংলা সাহিত্য

উর্দু, হিন্দি ও উড়িয়া সাহিত্যেও অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে পাঞ্জাবের স্যার মুহাম্মদ ইকবাল এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেন।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

Sir John Kaye : *Administration of the East India Company*

Arthur Mathew : *Education of India*

D. C. Sen : *History of Bengali Language and Literature*

F. W. Thomas : *History and Prospects of British Education in India.*

Babu Ram Saksena : *History of Urdu Literature*

ষষ্ঠ অধ্যায়
মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ নীতি

ইহা কোন অত্যুক্তি নহে যে, ইংরেজগণ মুসলমানদের চাকুরে হিসাবে ভারতে আগমন করে; কিন্তু মুসলমানগণ সাম্রাজ্য হারাইলে তাহারা সেই পুরাতন মুনিবদের প্রতি কোন অনুকম্পাই প্রদর্শন করে নাই। স্বভাবতই সাম্রাজ্যচ্যুতি মুসলমানদিগকে কঠোরভাবে বিপদগ্রস্ত করে। ইংরেজগণ কখনও ভুলিতে পারে নাই যে, অধঃপতনের চূড়ান্তে পৌঁছিলেও রাজনৈতিক দিক হইতে মুসলমানরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ইংরেজদের দৃঢ় বিশ্বাস, মুসলমানদিগকে কখনও ইংরেজ শাসনের বশীভূত করা যাইবে না এবং তাহারা স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবে না। প্রত্যেক পাশ্চাত্য শিশুকে ধর্মযুদ্ধের (Crusades) ইতিহাস পড়ানো হয়, যাহাতে প্রতিরক্ষাকারী মুসলমানদিগকে, যাহাদের মাতৃভূমি খ্রিস্টানগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়, ইতিহাসের দুষ্টগ্রহ হিসাবে অঙ্কিত করা হয়। অতএব, এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের উল্লসিত যুগে ইসলাম ও মুসলমানগণ তিরস্কার ও মিথ্যা বর্ণনা ছাড়া কিছুই পায় নাই।

প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৮৫৭) শেষ হইবার এক যুগেরও অধিককাল পর, যখন মুসলমানগণ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস ও অপমানিত হয়, ইংরেজ সিভিলিয়ান উইলিয়াম হান্টার লিখেনঃ "ভারতবর্ষের মুসলমানগণ এখনও এবং অনেক বৎসর হইতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পথে এক দীর্ঘস্থায়ী বিপদের উৎস হইয়া রহিয়াছে। যে কোন কারণেই হউক তাহারা আমাদের ব্যবস্থা হইতে নিজেদেরকে দূরে রাখিয়াছে এবং যেসব পরিবর্তনে আরও নমনীয় হিন্দুগণ সম্মতি প্রদান করিয়াছে, ঐগুলিকে তাহারা গভীর ত্রুটি বলিয়া মনে করে।" ইহার কারণ নির্ণয়ও সুদূর পরাহত নহে। উপরিউক্ত ইতিহাসবিদই উল্লেখ করেন যে, মুসলমানগণ এই রাজনৈতিক ক্ষমতা হারাইবার অবস্থার সঙ্গে নিজদিগকে খাপ খাওয়াইতে খুবই বেগ পায়। যখন খ্রিস্টান মিশনারিগণ ঘোষণা করিতেছিলেন, পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রভাবে সবাই খ্রিস্টান হইয়া যাইবে, সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের তাহাদের সাংস্কৃতিক সম্পদ দূরে ফেলিয়া দেওয়াকেও কম গুরুতর মনে করে নাই। অবশ্য ইহা সত্য যে, এইসব ধর্মান্তরকরণ হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা মুসলমানদিগকে কোন নিশ্চয়তা প্রদানে ব্যর্থ হয়।

ইংরেজদের শিক্ষানীতির সঙ্গে মুসলমানগণ নিজদিগকে খাপ খাওয়াইতে অক্ষম হয়। তাহারা উপলব্ধি করে যে, তাহাদের ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি শেষ পর্যন্ত তাহাদের সন্তানদিগকে স্বীয় ধর্ম হইতে দূরে নিক্ষেপ করিবে। মুসলমানদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নহে। সরকারি কর্মচারীদের খ্রিস্টান ধর্মীয় উৎসাহ মুসলমানদিগকে এই নূতন শিক্ষা পদ্ধতিতে আস্থা স্থাপনে বাধা প্রদান করে। তাহা সত্ত্বেও মুসলমানদের

মনোভাব সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল না। একজন মুসলমান ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করেন এবং ফলে কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু সেই মাদ্রাসা ঠিকমত কাজ না করিলে বা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইহার নীতি পরিবর্তন করিলে এবং মাদ্রাসা নূতন প্রভুদের অধীনে মুসলমানদিগকে চাকুরির শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হইলে মুসলমানদিগকে দায়ী করা যায় না। স্বাধীনতা যুদ্ধের (১৮৫৭) পর ব্রিটিশ শক্তি মুসলমানদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং সেই হত্যাকাণ্ডের পর মুসলমানগণ কর্তৃক শাসক বা তাহাদের শিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করাটা আশ্চর্যের বিষয় নহে।

ইংরেজদের শিক্ষানীতি

মুসলমানগণ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি কোন গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, কিন্তু ইংরেজগণও তাহাদের মতামত অনুধাবনের কোন চেষ্টা করে নাই। ১৮৫৭ সালের সেই রক্তস্নানের পর কিছু সংখ্যক ব্রিটিশ নিজেদেরকে প্রশ্ন করে, মুসলমানদের মন হইতে এই বিরূপ ভাব দূর করিবার জন্য কিছু করা যায় কিনা। ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজদের খোলাখুলি নীতি ছিল মুসলমানদের ধ্বংস করা এবং এইভাবে তাহারা খ্রিস্টান ধর্ম ও ব্রিটিশদের শত্রুদের নিপাত করিতেছিল। অপরদিকে আপসহীন ও 'গোঁড়া' মুসলমানদের বিনিময়ে আরও নমনীয়, ভারতে ব্রিটিশ-শক্তির উত্তম বন্ধু ও নরম হিন্দুগণ উন্নতি লাভ করে। "এই উপমহাদেশের সমস্ত অধিবাসীদের জন্য পরাধীনতার বোঝা যেরূপ ভারী ছিল, তাহা আরও দ্বিগুণ ধ্বংসাত্মক ছিল মুসলমানদের জন্য, যাহারা নূতন শাসকগণ কর্তৃক ছিল গুরুতরভাবে অপছন্দনীয়।"

মুসলমানদের উপর ইংরেজ শাসনের সুস্পষ্ট ছাপ ফুটিয়া উঠে রাজনীতি ক্ষেত্রে। ইহা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর ব্যাপারই নহে, মুসলমান আমলে তাহারা উচ্চপদসমূহ এককভাবে দখল করে নাই, তবে বড় অংশ তাহাদের হাতে থাকে। ব্রিটিশগণ ভারতীয়দের হাতে কোন দায়িত্ব দিবার ব্যাপারে অবিশ্বাসের নীতি গ্রহণ করে এবং উচ্চপদ এমনকি জেলার উচ্চ পদগুলিও তাহাদের স্বজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত রাখে। রাজস্ব বিভাগের সমস্ত নীচ পদগুলিতে ইতোমধ্যেই যাহারা ছিল, তাহাদিগকে অতি শীঘ্রই বাহির করিয়া দেওয়া

রাজনীতি ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল

হয়। মুসলমান আমলে কোন কোন এলাকায় খাজনা আদায়কারী বা জমিদার হিসাবে মুসলমানগণ যদিও উচ্চপদ দখল করে, কিন্তু হিন্দুগণই প্রকৃতপক্ষে নায়েব ও গোমস্তা হিসাবে কৃষকদের হাত হইতে রাজস্ব আদায় করে। লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) দ্বারা ইংরেজরা ঐসব মুসলমানকে সরাইয়া তদস্থলে হিন্দু নায়েব ও গোমস্তাদিগকে জমিদার হিসাবে স্থাপন করে। অতঃপর বিপুল সংখ্যক মুসলমান জমিদার ও তাহাদের পোষ্য দিন দিন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়।

সামরিক বিভাগেই মুসলমানগণ সমধিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। মুসলমান আমলে তাহারা বিভিন্ন সেনাপতির পদ দখল করে। কিন্তু তদস্থলে বর্তমানে ব্রিটিশ অফিসারদিগকে নিয়োগ করা হয়। মুসলমানদের নিকট সৈনিকের চাকুরি অতি জনপ্রিয় একটি পেশা; ইহাও এখন চলিয়া গেল। সিপাহী বাহিনীতে এখন হিন্দুরা এককভাবে শতকরা ষাট ভাগেরও অধিক স্থান দখল করে। দুই কারণে মুসলমানরা এই চাকুরি হারানের ব্যথা অনুভব করে—প্রথমত, তাহারাই ছিল সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত কারণ ইহার উপরেই তাহারা ছিল অধিক নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত, দেশীয় লোকদের জন্য সংরক্ষিত অন্যান্য ছোটখাট পদক্ষেপ প্রায় সব অংশই

প্রাধান্যতা হিসাবে হিন্দুদের দ্বারা পূরণ করা হয়। এইভাবে অন্যান্য চাকুরি হইতেও মুসলমানদিগকে হটাইয়া দেওয়া হয়। 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' শীর্ষক রিপোর্টে উইলিয়াম হান্টার অনেক উদাহরণ সহকারে প্রমাণ করেন, কিভাবে সমস্ত লাভজনক চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমানদিগকে বঞ্চিত করা হয় এবং কিভাবে এমনকি ছোটখাট চাকুরিগুলিতেও হিন্দুদিগকে শুধু প্রাধান্য হিসাবেই দেওয়া নয়, বরং মুসলমানদিগকে ঐগুলির ধারেও ঘেঁষিতে দেওয়া হয় নাই। এমন কি কখনও কখনও কোন পদের সরকারি প্রচার পত্রগুলিতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়, শুধুমাত্র হিন্দুরাই ঐসব পদের জন্য দরখাস্তের যোগ্য।

সামরিক বিভাগে মুসরমানদের চাকুরি হইতে বঞ্চিত

মুসলমানদের বঞ্চিত করিবার আরেক স্থান কোর্ট-কাছারী। প্রথমাবস্থায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কোর্ট-কাছারীতে বিভিন্ন আইনের পরামর্শদাতা হিসাবে মুসলমানদিগকে নিয়োগ দান করে। কারণ, তখন ইসলামী শরিয়া আইনানুযায়ী দেশ শাসিত হইত এবং তাই আইনের ব্যাখ্যার জন্য মুসলমানদের সহযোগিতা একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল। কোম্পানির ক্ষমতা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সেই বিধি বাতিল করিয়া ১৮৩৫ সালের দিকে নিজেদের আইন প্রয়োগ করে এবং ফলে মুসলমান উকিল-মোখতার এবং এই পেশার সাথে জড়িত সবাই নিষ্প্রয়োজনীয় হইয়া যান। মুসলমানগণ এই পরিবর্তনের জন্য মর্মাহত হয়, কারণ ইহা যে তাহাদিগকে শুধু জীবিকা হইতে বঞ্চিত করে তাহাই নহে, বরং এই আইনের পরিবর্তন তাহাদের নিকট বিরক্তিকরও বোধ হয়। অধিকন্তু, কোম্পানি কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা মহান মুঘলদের আইন বাতিল করিবার বিষয়টি সরাসরি বিশ্বাসভঙ্গের দোষেও দুষ্ট। কারণ, কোম্পানি কর্তৃক দেওয়ানী গ্রহণের সময় শর্ত ছিল, দেশে প্রচলিত আইন পুরাপুরি রক্ষা করা হইবে।

ব্রিটিশদের বিশ্বাস ভঙ্গ

মুসলমানদের উপর গুরুতর আঘাত হানা হয় তাহাদের শিক্ষার মাধ্যম বিলুপ্ত করিবার দ্বারা। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তন করিবার ফলে ফার্সি ভাষার অর্থনৈতিক গুরুত্ব কমিয়া যায় এবং এই একটি নীতিতে জনসাধারণের একটি বিরাট শিক্ষিত অংশ শুধুমাত্র ইংরেজি না জানিবার দরুন আধা শিক্ষিতের পর্যায়ে নামিয়া যায়। এই নীতি ইংরেজদের দুই উদ্দেশ্য সফল করে। প্রথমত, ইহার দ্বারা ইংরেজি ভাষাকে জনপ্রিয় করা হয়। দ্বিতীয়ত, মুসলমান প্রভাবের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। রাষ্ট্রভাষা পরিবর্তনের ফলে সমস্ত মুসলমান রাতারাতি তাহাদের চাকুরি হইতে বঞ্চিত হয়।

রাষ্ট্রভাষা ফার্সি হইতে ইংরেজিতে পরিবর্তন

ইহাই যথেষ্ট নহে, মুসলমানদের শিক্ষা প্রণালী ধ্বংস করিবার জন্য আরও কঠোর পন্থা অবলম্বন করা হয়। মুসলমান শাসনামলে সরকারি ও ধনী লোকজন জনশিক্ষার জন্য বিভিন্ন যৌতুক প্রদান করেন। রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে স্কুল ও কলেজের জন্য জমি প্রদান করা হয়। শিক্ষার কাজে নিয়োজিত লোকদের জন্যও জমি প্রদান করা হয়। এই সমস্ত জমি দেওয়া হয় 'নিষ্কর' বা 'লা-খারাজ' হিসাবে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সমস্ত নিষ্কর বা 'লা-খারাজ ভূমির স্বত্বাধিকারের কড়াকড়ি অনুসন্ধান কার্য চালাইয়া অনেক জমির স্বত্ব বিলোপ করিতে আরম্ভ করিলে ইহা মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর বিরাট আঘাত হানে। ব্রিটিশ শাসনে মুসলমান শিক্ষিতদের হার প্রবলভাবে নামিয়া যায়।

লা-খারাজ দানের পুনর্গ্রহণ

প্রত্যেক মসজিদ সংলগ্ন এক-একটি বিদ্যালয় ছিল; স্বত্ব বিলোপ নীতির ফলে এইগুলির পরিচালনা অসম্ভব হইয়া যায়। ইহাতেই যেন যথেষ্ট নহে, তাই কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমান ধনীদের প্রদত্ত যৌতুকের টাকাও সরকার আত্মসাৎ করিয়া ঐগুলির টাকা এমন সব কাজে ব্যয় করে, যাহা সম্পূর্ণভাবে দানকারীদের ইচ্ছার বাহিরে।

ব্রিটিশ কর্তৃক মুসলমান রাজ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিবার নীতি কোন দৈব ঘটনা নহে। ইতোমধ্যে ইংরেজগণ বিভিন্ন পন্থায় মুসলমানদিগকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। কিন্তু অন্তর্ভুক্তির পন্থা ছিল অতি ক্ষতিকারক। ব্রিটিশ অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া শেষ হইবার পর মুসলমান বংশীয় কোন রাজ্যেরই আর অস্তিত্ব রহিল না, যদিও মুসলমানগণ এই উপমহাদেশে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া শাসন পরিচালনা করে। "অবশ্য ইহার কারণসমূহের একটি হইল কখনও কখনও মুসলমান শাসনাধীন কোন কোন এলাকা ব্রিটিশদের রোষের কারণ হইয়াছে।" অযোধ্যা ইহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সমস্ত ঐতিহাসিকগণ এই ব্যাপারে একমত যে, ব্রিটিশ কর্তৃক ইহার শাসকের উপর একটি সহকারি বাহিনী স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত এই দেশ খুবই উন্নতিশীল ছিল। টিপু সুলতান তাঁহার রাজ্য অতি সুচারুরূপেই শাসন করিতেছিলেন এবং তাঁহার উপর কতকগুলি যুদ্ধ চাপাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহার রাজ্য খুবই সমৃদ্ধিশালী ছিল। আর্কট স্বভাবতই ধনী ছিল এবং মুহাম্মদ আলী যদিও অযোগ্য শাসক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অসুবিধাসমূহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ফলে আরও ভারাক্রান্ত হইয়া যায়। তবুও তিনি ব্রিটিশদের অতি বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। সিরাজ উদ্দৌলাহর বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্র ছিল ইংরেজদের জন্য খুবই মূল্যবান। কারণ, বাংলাদেশ ছিল একটি মহামূল্যবান পুরস্কার। পরবর্তী বাংলার ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে, কিভাবে ইংরেজদের প্রতি নবাবদের আনুগত্য সত্ত্বেও তাহারা এই দেশ ছাড়িয়া দেয় নাই।

অন্তর্ভুক্তি নীতি

ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উপমহাদেশের বহির্বাণিজ্য ছিল মুসলমানদের হাতে। মুঘল নৌশক্তির অভাবে মুসলমান ব্যবসায়িগণ ইংরেজ জলদস্যুদের নিকট সেই ব্যবসা হারাইয়া ফেলে এবং অতঃপর মুসলমান ব্যবসায়িগণ দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করে। বাংলার নবাবগণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে আমদানি-রফতানির জন্য মঞ্জুরীকৃত নিষ্কর অধিকার স্বীকার করিয়া লন। অথচ দেশীয় ব্যবসায়িগণকে সরকারের নিকট মোটা অংকের কর দিতে হইত। কোম্পানির কর্মচারিগণও তাহাদের ব্যবসায়ের চালানি কর মওকুফের দাবি করে। কোম্পানির ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে কর্মচারিগণ পূর্বের নিষিদ্ধ দ্রব্যসমূহের ব্যবসা করিতে আরম্ভ করে এবং দেশের কার্যাবলিতে হস্তক্ষেপ করিতে থাকে। ইংরেজগণ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য তাহাদের এজেন্টদিগকে বাজারে পাঠায় এবং এজেন্টগণ নাগরিকদিগকে তাহাদের মালপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বাধ্য করে। এই ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করিলে তাহাদিগকে অকুস্থলেই বেত্রাঘাত শুরু করে বা বন্দি করিয়া নানারূপ যন্ত্রণা দেয়। এই প্রক্রিয়ায় ব্যবসায় প্রতিযোগিতা রহিত হয় এবং স্থানীয় ব্যবসায়িগণ তাহাদের ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। তাহা ছাড়া যেহেতু অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য চলিত, সুতরাং সেই প্রদেশের ব্যবসায় মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ ছিল।

ব্যবসা বাণিজ্য

অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য ধ্বংস হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের মুসলমান ব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

দেশের কৃষককুল অধিকাংশই মুসলমান। ইহা বিশেষভাবে সত্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, যেখানে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। ব্রিটিশ শাসনাধীনে চাষীদের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করে। প্রাথমিক অবস্থায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ এবং তাহাদের এজেন্টদের দৌরাত্ম্যে চাষীদের অবস্থা চরম আকার ধারণ করে। কারণ, তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারায় চাষীদের শিল্প উৎপাদনে আয় বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। এই শিল্প অধিকাংশই কুটির শিল্প এবং ক্ষেতে যখন কাজ থাকে না তখন চাষীরা এই শিল্পে মনোনিবেশ করে। সমসাময়িক লেখকগণ মন্তব্য করেন—তাহাদের (ব্রিটিশ) শাসনে সর্বস্থানেই জনগণ কষ্ট ভোগ করে এবং দুঃখ-দারিদ্র্যে নিপতিত হয়।

মুসলমান কৃষকদের দুরবস্থা

শ্রমশিল্পীগণ অনেকস্থানেই প্রায় সম্পূর্ণভাবেই মুসলমান। তাঁত শিল্পের সব উত্তম শ্রেণীর দ্রব্য, যথা ঢাকাই মসলিন এবং কাশ্মীরী শাল মুসলমান শিল্পীগণ বুনিয়া থাকেন। কার্পেট তৈয়ারি মুসলমানদের একচেটিয়া ব্যবসা। অতি উত্তম শ্রেণীর অলংকার তৈয়ার, সোনা ও রূপা খোদাইয়ের কাজ, সোনা-রূপার কিংখাব তৈয়ারি এবং এই ধরনের শত প্রকারের বিভিন্ন অতি নিখুঁত শ্রমশিল্প মুসলমানদের হাতে ছিল। জনসাধারণ ও শাসক বংশগুলির অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সাথে সাথে এইগুলির চাহিদাও কমিয়া যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নীতি কিভাবে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস করে তাহা কিছু পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার সঙ্গে কারখানাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মুসলিম রাজদরবারে এবং জমিদার, সরকারি উচ্চ কর্মচারী ও ব্যবসায়ী সম্বলিত মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়, যাহারা ছিলেন এইগুলির আসল খরিদ্দার, তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। ফলে রফতানি কমিয়া গিয়া দেশে একটি অতি শোচনীয় শ্রমশিল্পীগোষ্ঠী রহিয়া যায়।

শ্রমশিল্পী ধ্বংসপ্রাপ্ত

সংক্ষেপে ইহাই ছিল এই উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ নীতি। ইহা হইল মুসলমানদিগকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিবার নীতি, যাহাতে তাহারা উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মস্তক উত্তোলন করিতে না পারে। এই ব্যাপারে আই. এইচ. কোরেশী বলেন, "পরাধীনতার নাগপাশে যে জাতিকে শাসকগোষ্ঠী কুদৃষ্টির লক্ষ্যস্থল এবং সর্বদাই দুর্ব্যবহার করে, এরূপ কোন জাতি কখনও অধিককাল মস্তক তুলিয়া রাখিতে সক্ষম হয় না। যদিও ব্রিটিশ জাতি উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুসলমানদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য এই নীতি অবলম্বন করে নাই, বরং মুসলমানদের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং তাহাদের রাজনৈতিক আত্মসচেতনতার ভয় হইতে এই নীতির উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানদের উপর এইগুলির প্রতিক্রিয়া সমানই রহিয়াছে। ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে এবং এমন গভীর ক্ষতি সাধন করিয়াছে যে, স্বাধীনতার পরও এইগুলির কবল হইতে মুক্তি পাইতে তাহাদের অনেকদিন লাগিবে। অশিক্ষা, দারিদ্র্য, কুশলী হারানো এবং সাংস্কৃতিক নিশ্চলতা সহজে বা স্বল্প সময়ে দূর করা যায় না। ভারত ও পাকিস্তানে ইসলামের গায়ের এই ক্ষত অনেকদিন বহন করিতে হইবে।"[১]

উপসংহার

পাদটীকা

১। I. H. Qureshi ed : *A Short History of Pakistan* Vol. IV

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

A. R. Mallik : *British Policy and the Muslims in Bengal.*

Pakistan Historical Society ed : *Selections from the History of the Freedom Movement* Vol-II

W. Hunter : *Our Indian Mussalmans*

Sir Syed Ahmed Khan : *Causes of the Indian Revolt.*

I. H. Qureshi ed : *A Short History of Pakistan* Vol. IV

সপ্তম অধ্যায়
স্বাধীনতা আন্দোলন

(ক) উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম আন্দোলন ঃ

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ্দৌলাহর পরাজয়ের পর মুসলমানগণ ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং ইহা দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ আধিপত্যের সূচনা করে। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা তাহাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হইতেও বঞ্চিত হয়। মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট বিভিন্ন পাপাচার ও কুপ্রথা দূরীকরণার্থে মুসলমানগণ অতি সুযোগ্য নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় অনেকগুলি সমাজ সংস্কারমূলক ও বৈপ্লবিক আন্দোলন পরিচালনা করে। এই উপমহাদেশে মুসলমানদের হৃত ক্ষমতা ও সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের মানসে পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলন ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরিলক্ষিত হয়।

১। ফরায়েজী আন্দোলন ঃ

ভারতীয় উপমহাদেশের গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষিত মুসলমানেরা অনেকগুলি বিধর্মী আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার গ্রহণ করে। ইহা বিশেষভাবে সত্য বাংলার মুসলমানদের ব্যাপারে, যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রভূমি হইতে দূরে সরিয়া পড়ায় স্বভাবতই তাহাদের প্রতিবেশীদের সাংস্কৃতিক প্রভাবের আওতায় পতিত হয়। হিন্দু ধর্ম হইতে ধর্মান্তরিত বাংলার অসংখ্য মুসলমান স্থানীয় ধর্মীয় পদ্ধতি ও দেবদেবীর প্রতি তাহাদের সম্প্রীতি বজায় রাখে। তাহাদের কেউ কেউ সর্পদেবী মনসা, ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণা রাও এবং বসন্তদেবী শীতলার পূজাকে নব নব রূপায়ণে বাস্তবে পরিণত করে। কোন কোন মুসলমানের মধ্যে শিবের পূজাও পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম ও ইহার শিক্ষা সম্পর্কে এই প্রধান অজ্ঞতার কারণ হইল, জনসাধারণের অনেকাংশের মধ্যে উপযুক্ত ধর্মীয় শিক্ষার অভাব।

বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধঃপতন

ভারতের মুসলমানদের অর্ধ-শতাব্দীরও অধিককাল অতিবাহিত হয় শুধু ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে যে, তাহারা সত্যিকারের ইসলাম হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে এবং তাহারা শিক্ষাগতভাবে পশ্চাদগামী, সংস্কৃতিগতভাবে নীতিভ্রষ্ট, ধর্মগতভাবে অধঃপতিত এবং রাজনীতিগতভাবে একটি নৈরাশ্য সম্প্রদায়ে অবনতি লাভ করিয়াছে। হাজী শরিয়তউল্লাহই সেই মহাপুরুষ, যিনি নিম্ন ও পূর্ববাংলার মুসলমানদিগকে তাহাদের আত্মসচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করেন। হাজী শরিয়তউল্লাহ ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে মক্কায় গমন করেন। তথায় তিনি শেখ তাহেরের নিকট অধ্যয়ন করেন এবং বিশ বৎসর পর ১৮০২ সালে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন

হাজী শরিয়তউল্লাহ

করেন। কথিত আছে, মক্কায় তাঁহার দীর্ঘ অবস্থানের সময় হাজী শরিয়তউল্লাহ্ আরবের ওয়াহাবীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। পবিত্র নগরীগুলিতে তাঁহার অবস্থানের সময় ওয়াহবিগণ প্রাথমিক যুগের ইসলাম হইতে সমস্ত বিচ্যুতির বিরুদ্ধে আরবে তুমুল সংগ্রাম পরিচালনা করেন। তবে তিনি তাহাদের মতাদর্শের অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন—এইরূপ কোন প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি যে ওয়াহাবীদের সংস্কারক ভাবাদর্শ হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কৃষক ও কারিগরদের ন্যায় মুসলমানদের অতি অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই হাজী শরিয়তউল্লাহ তাঁহার আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি অনুধাবন করেন, এই সমস্ত লোককে সংস্কার করিবার সর্বোত্তম পন্থা হইল তাহাদের সঙ্গে একাত্ম হইয়া বসবাস করা। শীঘ্রই তিনি দরিদ্র কৃষকদের মন জয় করিয়া ফেলেন। তাহারা অনৈসলামিক রীতিনীতি ও ভাবধারা পরিত্যাগ করিতে তাঁহার ডাকে সাড়া দেয়। তাহারা ফরায়েজ বা অবশ্য কর্তব্য নামে কথিত ধর্মের বিধি-নিষেধ অনুসারে কার্যকলাপ করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং তাঁহার অনুগামী দল 'ফরায়েজী' নামে অভিহিত হয়। হাজী শরিয়তউল্লাহ্ মূলত, ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপার লইয়াই থাকেন এবং তাঁহার জীবদ্দশায় এই আন্দোলন আদতে একটি ধর্মীয় আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়। ফরায়েজীগণ কোরআনের অক্ষরে অক্ষরে চলেন এবং ইহা কর্তৃক অননুমোদিত সব অনুষ্ঠানই তাঁহারা পরিহার করিয়া চলেন। তাঁহারা বিভিন্ন পর্বসমূহ নিষিদ্ধ করেন এবং ইমাম হাসান ও হোসাইনের শাহাদতকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত মুহররম পর্ব অনুষ্ঠান দর্শনকেও নিষিদ্ধ করেন। বিবাহ অনুষ্ঠানকে তাঁহারা অনাড়ম্বর করিয়া তোলেন এবং কবরে ফল-ফুল প্রদান করা ও বিভিন্ন ফাতেহা অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেন। তাঁহাদের কবর জমির সমতা হইতে উচ্চে তোলা হয় না বা কোন প্রকার দালান বা পাথর বা ইট দ্বারা চিহ্নিত করা হয় না। তাঁহাদের স্বধর্মীয় অন্যান্য মুসলমান ভাইদের চাইতে তাহারা অধিক দৃঢ় নৈতিক বলের অধিকারী।

তাঁহার অনুগামীদের স্বীয় আদর্শে উৎসাহ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে হাজী শরিয়তউল্লাহ 'পীর', 'মুরিদ' ইত্যাদি পদবী উঠাইয়া দেন। এই সমস্ত পদবী মুরিদ কর্তৃক পীরের প্রতি অত্যধিক নির্ভরশীলতা ও আত্মসমর্পণ জ্ঞাপন করে। তিনি নিজেকে ওস্তাদ বা শিক্ষক হিসাবে বর্ণিত হইতে পছন্দ করেন, যদ্বারা শিক্ষা ও শৃঙ্খলার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

পীর মুরিদ বাইআত ইত্যাদি পদবী নিষিদ্ধ

একজন শিষ্যের উদ্যোগে তিনি 'বাইআত' শব্দ উঠাইয়া দেন। কিন্তু 'তওবা' বা অনুশোচনা ও সৎ জীবন যাপনের প্রতিজ্ঞার প্রতি তিনি জোর দেন। কোন জীবিত পীর বা মৃত দরবেশের প্রতি অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন তিনি নিষিদ্ধ করেন, এবং হিন্দু পালা-পর্ব অনুষ্ঠান ও হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবে যোগদান করাকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। মুসলমানদিগকে মুসলমান হিসাবে নিজের অবস্থা উপযোগী জীবন যাপনের নীতি অতি সঙ্গোপনে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই কাজ করিতে যাইয়া তিনি এলাকায় জমিদার ও সরকারের বিরাগভাজন হন এবং বহু মামলা-মোকদ্দমায় জড়াইয়া পড়েন। ১৮৪০ সালে তিনি ৫৯ বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

হাজী শরিয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মুহাম্মদ মুহসিন ওরফে দুদু মিয়া ফরায়েজীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দুদু মিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব। তাঁহার সুনিপুণ

নেতৃত্বে ফরায়েজীগণ একটি অতি সুগঠিত ও সংঘবদ্ধ দলে পরিণত হয়। তিনি নিজেকে পীর হিসাবে আখ্যায়িত করেন, যদিও ইহা তাঁহার পিতার আদর্শের পরিপন্থী। এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করিবার জন্য এবং ইহার জন্য অর্থ সংগ্রহের নিমিত্তে তিনি পূর্ব বঙ্গকে বিভিন্ন প্রতিনিধির অধীনে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন। তিনি অতি অসাধারণ গুণের পরিচয় দেন এবং চাষীদের স্বার্থের জন্য আন্দোলন করিয়া বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর ও পাবনা জেলার মুসলিম চাষীদের মধ্যে জনপ্রিয় হইয়া উঠেন এবং তাহাদের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। এই প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালী ভ্রাতৃত্ব বোধের মাধ্যমে তিনি ফরায়েজীদের সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তির জন্য ব্রিটিশ বিচারালয়ে না যাইয়া তাঁহার নিকট যাইতে অনুপ্রেরণা দেন।

পীর দুদু মিয়া

জমিদারদের অন্যায় কর আরোপের বিরুদ্ধে পীর দুদু মিয়া আপসহীন ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, দুর্গা-প্রতিমা সাজাইবার জন্য এবং হিন্দু জমিদারদের পৌত্তলিক পূজা-পার্বণের ব্যয় বহনের জন্য মুসলমানদের নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে চাঁদা আদায় করা একটি অসহনীয় অত্যাচার। তিনি আরও ঘোষণা করেন, মাটির মালিক আল্লাহতা'লা, সুতরাং ইহার উপর কর বসাইবার অধিকার কাহারও নাই। এই আন্দোলনের প্রসারে জমিদার ও নীল চাষীগণ প্রমাদ গুনিলেন। কারণ, ইহার ব্যাপকতা তাঁহাদের শক্তির বিরুদ্ধে বিরাট হুমকিস্বরূপ। অতঃপর জমিদারগণ প্রজাদিগকে সাবধান করিয়া দেন, এবং পরে তাহাদের উপর বিভিন্ন উৎপীড়ন ও শাস্তির ব্যবস্থা করেন। বাধ্যবাধকতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং পরিণামে ইহা কৃষকদের সংকল্পে অনুপ্রেরণা প্রদান করে। দুদু মিয়ার শিক্ষায় তাহারা নূতন আশার আলো দেখিতে পায়। ইহা শেষ পর্যন্ত জমিদার ও নীলচাষীগণ একদিকে এবং অপরদিকে দুদু মিয়ার মধ্যে সরাসরি স্বার্থের সংঘর্ষ ডাকিয়া আনে। এই আন্দোলনকে প্রতিহত করিবার জন্য জমিদারগণ পীর দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে অনেকগুলি মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। ১৮৩৬ সাল হইতে অনেক বাধা-বিপত্তি ও ব্যর্থতার পর জমিদারগণ শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে আলীপুর কেন্দ্রীয় জেলখানায় রাজবন্দি হিসাবে আটক করিতে সমর্থ হন। এইভাবে ফরায়েজী আন্দোলনের সৃজনশীল ও সক্রিয় যুগ শেষ হয়।

জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুদু মিয়ার আন্দোলন

আরেকটি সমসাময়িক সংস্কারমূলক আন্দোলন পরিচালনা করেন মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর। ইহা ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হইতে একটি ব্যাপক চাষী আন্দোলনের জন্য উল্লেখযোগ্য, যাহা ১৮৩১ সালে শেষ হয়। তিতুমীর সৈয়দ আহমদ শহীদের শিষ্য। সুতরাং এই পুস্তকে তাঁহার কার্যাবলি সৈয়দ আহমদ শহীদের পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

২. তথাকথিত ওয়াহাবী আন্দোলন ঃ

ভারতের তথাকথিত ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রায় বেরেলীর সৈয়দ আহমদ শহীদ। যদিও এই ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে আরবের ওয়াহাবী মতবাদের কোন সম্পর্কই ছিল না, তবুও ব্রিটিশ সরকার ইহাকে অনুরূপ নামে আখ্যায়িত করে। ১৭৮৬ সালে সৈয়দ আহমদ রায় বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি চাকুরির অন্বেষণে দিল্লী গমন করেন। তথায় তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ ও সূফী শাহ

সৈয়দ আহমদ শহীদ

আব্দুল আজিজের সংস্পর্শে আসেন। সৈয়দ আহমদ শাহ আব্দুল আজিজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং দুই বৎসর ধর্মীয় অধ্যয়নে দিনাতিপাত করেন। দিল্লীতে অবস্থানকালে (১৮০৭-১৮০৯) তিনি কোরআন ও হাদীসের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ আয়ত্ত করেন। কিছু ফার্সি ভাষা শিক্ষা করেন এবং শাহ আব্দুল আজিজ তাঁহাকে সূফীবাদের গূঢ়তম বিষয়ে পাঠদান করেন। অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ আমির খান পিণ্ডারীর অধীনে তিনি অশ্বারোহীর চাকুরি গ্রহণ করেন। সাত বৎসর কঠোর জীবন যাপনের পর ১৮১৭ সালের শেষ দিকে তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। একজন ধর্ম প্রচারক হিসাবে তিনি ফিরিয়া আসেন এবং মুসলিম সমাজের সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

পাঞ্জাবে রণজিৎ সিং-এর নেতৃত্বে শিখদের উদীয়মান ক্ষমতা মুসলমানদের পক্ষে এক বিরাট দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। রামপুরে তাঁহার ধর্ম প্রচারণী ভ্রমণের সময় কিছু সংখ্যক আফগানের নিকট হইতে সৈয়দ আহমদ শিখদের মুসলিম উৎপীড়নের খবর প্রাপ্ত হন। এই ঘটনা তাঁহার স্পর্শকাতর হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং অনেক সুদূর প্রসারী পরিবর্তন সাধন করে। সমগ্র ১৮২০ সালে সৈয়দ আহমদ শিষ্যের সংখ্যা বাড়াইয়া এবং তাঁহার উপর আস্থা আরও জোরদার করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। পাটনায় একটি দীর্ঘস্থায়ী ভ্রমণ বিরতিতে তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা এত বৃদ্ধি লাভ করে যে, সেখানে রীতিমত একটি সরকার চালু করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। পথিমধ্যে অবস্থিত শহরসমূহ হইতে তিনি খাজনা আদায় করেন। মুসলমান সম্রাটদের ন্যায় যথারীতি ফরমান দ্বারা তিনি চারিজন খলিফা মনোনয়ন দান করেন। পাটনায় একটি স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করিয়া শিষ্যের সংখ্যা বাড়াইতে বাড়াইতে তিনি কলিকাতার দিকে অগ্রসর হন। কলিকাতায় ভিড় এরূপ বাড়িয়া যায় যে, তিনি তাঁহার পাগড়ি খুলিয়া লোকদিগকে দীক্ষা দিতে বাধ্য হন। ১৮২২

জিহাদের প্রাথমিক পর্যায়

সালে তিনি হজ্ব উপলক্ষে মক্কায় গমন করেন এবং এক বৎসর পর বোম্বাইর পথে ফিরিয়া আসেন। এখানেও ধর্ম প্রচারক হিসাবে তাঁহার সাফল্য ছিল কলিকাতার ন্যায়ই ব্যাপক। উত্তর ভারতের দিকে ফিরতি পথে তিনি বেরিলীতে অনেক অনুগামী তালিকাভুক্ত করেন। ১৮২৪ সালে পাঞ্জাবের সমৃদ্ধিশালী শিখ শহরগুলির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার উদ্দেশ্যে তিনি পেশোয়ার সীমান্তের দুর্ধর্ষ পাহাড়িয়া লোকদের নিকট উপস্থিত হন। পাঠান গোত্রসমূহ উন্মত্ত উৎসাহের সহিত তাঁহার আহবানে সাড়া দেয়। সৈয়দ আহমদ যুদ্ধে জীবিতদিগকে গাজী হিসাবে যুদ্ধলব্ধ মালামাল এবং মৃতদিগকে শহীদ হিসাবে স্বর্গের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। সমগ্র দেশ জাগরিত করিয়া এবং সুনিপুণ কৌশলে গোত্রগুলির সংযোগ স্থাপন করিয়া প্রভাব বিস্তার করিতে করিতে তিনি কান্দাহার ও কাবুলের মধ্য দিয়া সফর করেন। শিখদের ধ্বংস সাধনের জন্য তাঁহাকে আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া তিনি তাহাদিগকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন। উচ্চ শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাদের নিকট তিনি শিখ দমনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। এইভাবে অবস্থা সুবিন্যস্ত করিয়া তিনি আল্লাহর নামে জিহাদে যোগদান করিবার জন্য সমস্ত মুসলমানকে সরাসরি আহবান করেন। ১৮২৬ সালের ২১শে ডিসেম্বর শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ আরম্ভ হয়। ইতোমধ্যে উত্তর ভারতে মুসলিম যোদ্ধাদিগকে সেনাদলে ভর্তি করা আরম্ভ হয়।

শিখদের বিরুদ্ধে অসম সাফল্যের একটি কঠিন যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সর্বত্র জ্বালা-পোড়া ও হত্যা করিতে করিতে মুজাহিদগণ বিভিন্ন সময় সমতল ভূমির শিখদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করিয়া পাহাড় হইতে অবতরণ করে। অপরদিকে শিখগণ সশস্ত্রভাবে দলবদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আঘাত করিতে করিতে পর্বতে ঠেলিয়া দেয়। যুগের হিংস্র ভাবাবেগ এক ভয়াবহ প্রকৃতির স্বত্ব পিছনে ফেলিয়া যায়—ইহা রক্তের স্বত্ব। ১৮২৭ সালে সৈয়দ আহমদ তাঁহার মুজাহিদ বাহিনী লইয়া শিখদের একটি সুরক্ষিত ঘাঁটি আক্রমণ করিয়া বিপুল ক্ষতি বরণ করিয়া পশ্চাদপসারণ করেন। কিন্তু শিখ সেনাপতিও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে সাহসী হন নাই। অতঃপর মুসলমানরা গেরিলা পদ্ধতির যুদ্ধ আরম্ভ করে, এবং শিখ প্রধানও অর্থের বিনিময়ে অতি অগ্রগামী মুসলিম গোত্রের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৮২৯ সালে মুজাহিদদের হাত হইতে পেশোয়ার রক্ষা করিবার জন্য শিখগণ সৈয়দ আহমদকে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা করে। এই কাজে মুজাহিদগণ অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। তাহারা শিখদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে, তাহাদের বহু সংখ্যক যোদ্ধা হত্যা এবং শিখ সেনাপতিকে মারাত্মকভাবে আহত করে। শিখগণ পেশোয়ার রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেও সৈয়দ আহমদের আধিপত্য সুদূর কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। মুজাহিদগণ উত্তর ভারত ও বাংলাদেশ হইতে দলে দলে জিহাদে যোগদান করে। ১৮৩০ সালে মুজাহিদগণ সমতল ভূমি দখল করে এবং বছর অতিক্রমের পূর্বেই পেশোয়ার মুসলমানদের করতলগত হয়।

শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ
পেশোয়ার অধিকার

পেশোয়ার শহর অধিকার সৈয়দ আহমদের জীবনের চূড়ান্ত পর্যায় জ্ঞাপন করে। তিনি নিজেকে খলিফা হিসাবে ঘোষণা করেন এবং নিজের নামে মুদ্রা চালু করেন। সম্মুখ যুদ্ধে শিখদের পরাজয়ের পর রণজিৎ সিং স্বীয় কূটনীতি প্রয়োগ করেন এবং ছোটখাট মুসলিম রাজ্যসমূহের নিকট তাহাদের স্বার্থের ব্যাপারে পৃথকভাবে আবেদন করিয়া ঐগুলিকে সৈয়দ আহমদের দল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। ফলে শিখদের নিকট হইতে প্রচুর ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া সৈয়দ আহমদ পেশোয়ার ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অন্তর্কলহ শীঘ্রই নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যায়। উত্তর ভারত ও বাংলাদেশের তাঁহার নিয়মিত মুজাহিদগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। কিন্তু একদা পাঠানগণ যুদ্ধের প্রাক্কালে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে এবং মুজাহিদগণও পরে ইহার কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। সীমান্তের অনুগামীদের নিকট হইতে সৈয়দ আহমদ জমির উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ কর আদায় করিতেন। কিন্তু এখন তাহারা এই কর প্রদানে ইতস্তত করে এবং শীঘ্রই দল ত্যাগের চিহ্ন প্রদান করে। সম্পূর্ণ শরিয়তের প্রথানুযায়ী গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা ও দোষীদের শাস্তির জন্য কাজী নিয়োগের ব্যাপারটি পাঠানদের জন্য কিছুটা বাড়াবাড়ি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অনেক সমাজ সংস্কারমূলক কার্যাবলি বিশেষত মেয়েদের বিবাহ সংক্রান্ত আইনটি জনপ্রিয়হীন হইয়া দাঁড়ায়। এই সমস্ত কারণ একত্রিত হইয়া এই আন্দোলনের অগ্রগতির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় এবং যাহার চূড়ান্ত পর্যায়ে বালাকোটের পরাজয়ে পর্যবসিত হয়। হাজারা জেলার 'বালাকোট' নামক স্থানে একজন সেনাপতিকে সহযোগিতা করিতে যাইয়া সৈয়দ আহমদ এক শিখ সেনাদল কর্তৃক অতর্কিতে আক্রান্ত হন এবং ১৮৩১ সালে শহীদ হন।

আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়
সৈয়দ আহমদের মৃত্যু (১৮৩১)

কিন্তু সৈয়দ আহমদ শহীদ এক বৃহত্তর সংখ্যক লোককে এমন এক ধরনের শিক্ষা প্রদান করেন যে, তাহারা এই আন্দোলনে কঠিন আঘাতের সম্মুখীন হইলেও তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। কলিকাতায় সৈয়দ আহমদ শহীদের শিষ্যদের মধ্যে তিতুমীর একজন শক্তিশালী সংগ্রামী। তিতুমীর মক্কায় হজ্বযাত্রা করেন; সৈয়দ আহমদ শহীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ইসলামের একজন শক্তিশালী সংস্কারক হিসাবে ফিরিয়া আসেন। কলিকাতার উত্তর ও পূর্ব জেলাসমূহ হইতে তিনি দলে দলে শিষ্য জোগাড় করেন। ১৮৩০ সালে সৈয়দ আহমদ কর্তৃক পেশোয়ার অধিকৃত হইলে তিতুমীর একটি চাঁষী বিপ্লব পরিচালনা করিতে কৃতসংকল্প হন। সৈয়দ আহমদের একই মতবাদ অনুসারে তিতুমীর মুহররমের অনুষ্ঠানাদি, মৃত্যুর পর একটি নির্ধারিত সময়ে আচার অনুষ্ঠান পালন এবং পীর-দরবেশদের মাজারে চিরাচরিত নিয়মে নৈবেদ্য দেওয়ার কঠোর সমালোচনা করেন। এই দলের নিজস্ব ভাবধারা ইহার প্রতিবেশীদের সমালোচনা ও বাদানুবাদের সম্মুখীন হয়। এই আন্দোলনের দ্বারা জমিদারদের স্বার্থহানি হয় বিধায় তাহারা অতি অপমানজনক দাড়ির কর (Beard Tax), খাজনা বকেয়ার জন্য বন্দি করা এবং বিভিন্ন ধরনের দুর্ব্যবহারের দ্বারা তাহারা সংস্কারবাদীদিগকে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। সংস্কারবাদীগণ জমিদারদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি মামলা দায়ের করেন। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হয় নাই। এই সমস্ত অত্যাচারের প্রতিবাদ হিসাবে অনেকগুলি চাষী বিপ্লব সংঘটিত হয়। জমিদারদের আদেশ অমান্য করা হয়, তাহাদিগকে প্রহার করা হয় এবং ইংরেজ কর্মকর্তাদের কিছু সংখ্যককে হত্যা করা হয়।

জমিদারদের বিরুদ্ধে তাঁহার সংগ্রাম

কলিকাতার উত্তর ও পূর্ব এলাকা জুড়িয়া সমগ্র দেশ তিতুমীরের পদানত হয়। যাহারা তাঁহার কর্মসূচি গ্রহণ করে নাই, তাহাদিগকে হামলা করিয়া হত্যা করা হয় এবং তাহাদের ঘর-বাড়ি জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। ১৮৩১ সালের ২৩শে অক্টোবর তাহারা মূল ঘাঁটির জন্য একটি সুরক্ষিত গ্রাম বাছিয়া লইয়া ইহার চতুর্দিকে বাঁশের প্রাচীর বানাইয়া লয়। ইহাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা'। একটি শহর অধিকার করিয়া তাহারা ইংরেজ রাজত্বের পরিসমাপ্তি ও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে। ইংরেজ ও হিন্দু জমিদারগণ তিতুমীরের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হন। জেলা কর্মকর্তাদের কিছু নিষ্ফল চেষ্টা-তদবিরের পর ১৮৩১ সালের ১৪ই নভেম্বর কলিকাতাস্থ অনিয়মিত সেনাবাহিনীর একটি অংশকে তিতুমীরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। ইংরেজ সেনাবাহিনীকে তিতুমীর অতি বীরত্বের সাথে মোকাবিলা করিয়া অনেক ইংরেজ সৈনিক হত্যা করেন। এই অবস্থায় নিয়মিত সেনাবাহিনীর প্রয়োজন দেখা দেয়। মুসলমানগণ দুর্গের বাহির হইতে প্রতিরক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। সুরক্ষিত দুর্গ ইংরেজ বাহিনী জোরপূর্বক অধিকার করে। যুদ্ধ ক্ষেত্রেই তিতুমীর শহীদ হন এবং অন্যান্যদিগকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাবাস প্রদান করা হয়।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাঁশের কেল্লা

তিতুমীরের পর পাটনাস্থ সৈয়দ আহমদ শহীদের অন্যান্য অনুগামী দল সাহায্যার্থে আগাইয়া আসেন। কিন্তু সৈয়দ আহমদের অনুপস্থিতিতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। যাহা হউক, সৈয়দ আহমদ নিহত হন নাই, কিন্তু মেঘমালায় তিনি অদৃশ্য হইয়াছেন এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিবেন—এই অজুহাতে তাঁহার অনুগামীদিগকে একত্রিত করা হয়। মোল্লা কাদির এবং

অন্যান্যগণ সৈয়দ আহমদের ইট প্রতিকৃতি নির্মাণ করিয়া ইহার সাহায্যে লোকদিগকে উৎসাহ প্রদান করেন। দক্ষিণ ভারতে তাঁহারা এমন এক উৎসাহের ঝড় তোলেন, যাহার ফলে এমনকি মহিলারাও সাধারণ তহবিলে তাঁহাদের গহনাপত্র দান করেন।

এই অসাধারণ উৎসাহের মূল প্রেরণা জোগাইয়াছিলেন সৈয়দ আহমদ শহীদ। তিনি তাঁহার জীবন আরম্ভ করেন দুইটি প্রসিদ্ধ আদর্শের উপর জোর দিয়া, যাহাকে ভিত্তি করিয়া সমস্ত ধর্মপ্রচারকগণ কাজ করিয়া যান। সেই আদর্শ হইল আল্লাহর একত্ব এবং মানুষের সাম্য। তাঁহার দেশবাসীর আত্মার মধ্যে অনেকদিন হইতে লুক্কায়িত ধর্মীয় অনুভূতির নিকট তিনি প্রায় আল্লাহর প্রভাবে অনুপ্রাণিত বিশ্বাসের সঙ্গে আবেদন করেন। রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দিক হইতে ভারতের মুসলমানদের অধঃপতন দেখিয়া সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী খুবই মর্মাহত হন। এক পত্রে তিনি উল্লেখ করেন, খ্রিস্টান ও মূর্তিপূজারীগণ ভারতের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া জনসাধারণের উপর উৎপীড়ন চালাইতেছে। দুঃখে তিনি দেশত্যাগ করিতে বা জিহাদ পরিচালনা করিতে উদগ্রীব হন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল ভারতে একটি সত্যিকারের ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করা এবং এইজন্যই তিনি জিহাদের পথ বাছিয়া লন। তাঁহার সম্মুখে ছিল দুইটি সমস্যা—একটি হইল শিখ এবং অপরটি হইল ইংরেজ। প্রথম সমস্যা প্রথমে সমাধান করিবার জন্য তিনি শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতরণ করেন। দ্বিতীয় সমস্যা, অর্থাৎ ইংরেজ বিতাড়নের কাজটি তিনি পরে সমাধা করিতে মনস্থ করেন। এইজন্য আন্দোলনের প্রথমদিকে ইংরেজদিগকে নিশ্চুপ রাখিবার জন্য সৈয়দ আহমদের অনুগামী দল ইংরেজ বিরোধী নীতি গ্রহণ করে নাই। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পাঞ্জাব অধিকারের পরেই মাত্র তাহারা ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই আন্দোলন একমাত্র নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যেই ব্যাপক জনপ্রিয় হয় এবং অতি নিম্নস্তরে নিক্ষিপ্ত সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধেই ইহা একটি অতি জোরালো ও সুসংবদ্ধ প্রতিবাদ হিসাবে গড়িয়া উঠে। ইহা হইল আধুনিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রথম মূল অংশের চূড়ান্ত পর্যায়। ইহা হইল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রথম হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সম্প্রসারিত ব্যবসায়ী পুঁজিবাদের যুগ, যখন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং বিদেশী ব্যবসায়ীদের দ্বারা ভারতের অর্থ-সম্পদ বিদেশে পাচার হয় এবং ক্রমশ ইহাকে একটি অবিশ্বাস্যরূপ শক্তিহীন দেশে পরিণত করে।

আন্দোলনের মূলকথা

এই আন্দোলনের সূচনা হয় ধর্মীয় দোষ-ক্রটির উপর একটি আক্রমণ হিসাবে, যাহা পরবর্তীকালে রূপ ধারণ করে সত্যিকারের ইসলামে প্রবিষ্ট সমস্ত নূতন অনৈসলামিক অনুষ্ঠানাদি (বেদাত) পরিত্যাগ এবং ইসলাম হইতে দূরীভূত সমস্ত অনুষ্ঠানাদি পুনঃপালন করিয়া ধর্মের সরলতায় এবং মহানবী (স) যুগের আরব সমাজে ফিরিয়া যাইবার আগ্রহ লইয়া। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অমুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের দ্বারা ইহা উন্নতি লাভ করে। ইহার সঙ্গে মিলিত হয় হিন্দু বা মুসলমান জমিদারদের বিরুদ্ধে চাষীদের ভয়াবহ সশস্ত্র বিপ্লব। উত্তরদিকে এই বিপ্লবের সঙ্গে সংযুক্ত হয় বেকারত্বের মুখোমুখি দণ্ডায়মান উৎপীড়িত হস্তশিল্পীবৃন্দ কর্তৃক পরিচালিত নূতন কলকারখানা ও ইহাদের মালিকের বিরুদ্ধে হিংস্র আক্রমণ। এইরূপ একটি শ্রমিক ও চাষী আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করিলে ইহাকে অনুরূপ উৎসাহের সঙ্গে দমন করা হয়। কিন্তু

আন্দোলনের ধারা

এই আন্দোলনের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে এবং পুরাতন বিপ্লবী শক্তিসমূহ এই উদ্যম ব্যবহার করে "স্বাধীনতার যুদ্ধে"—এবং যে সমাজ তাহাদিগকে সম্মান দিয়াছে, সেই সমাজ পুনঃ প্রতিষ্ঠার শেষ প্রচেষ্টায়।

(খ) স্বাধীনতার যুদ্ধ—১৮৫৭

১৮৫৬ সালের প্রথমভাগে লর্ড ডালহৌসী ভারত ত্যাগ করেন এবং তদস্থলে ভাইকাউন্ট ক্যানিং উপমহাদেশের গভর্নর জেনারেল হিসাবে আগমন করেন। তাঁহার শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল, সমগ্র ভারতে সংঘটিত 'প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' যাহাকে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে অভিহিত করেন। স্বাধীনতার যুদ্ধ হইল এই দেশের সমগ্র জনসাধারণের প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, যাহা ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ্, ফরায়েজীগণ এবং সৈয়দ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে তথাকথিত ওয়াহাবী আন্দোলনের মাধ্যমে আরম্ভ হয়। ইহা পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলিরই পরিণতি এবং একটি বিদ্রোহ, যদ্বারা এই দেশের জনগণ একত্রিতভাবে ব্রিটিশ রাজের পতন ঘটাইয়া বিভিন্ন অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের নেতৃত্বে সমগ্র দেশকে একত্রিত করিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু আলীগড়পন্থী মুসলমানগণ ইহাকে 'মুসলমানদের ক্ষমতা লাভের শেষ বৃহত্তম আন্দোলন' বলিয়া অভিহিত করেন।

প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ অনেকগুলি কারণের পরিণতি, যথা—রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামরিক। উপমহাদেশের জনসাধারণের প্রতি ব্রিটিশদের নীতি ছিল দেশীয় কৃষ্টি ও সভ্যতাকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং মুসলমানদিগকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা।

কারণসমূহ
রাজনৈতিক কারণ
সম্রাটের বংশধরদের লাল কিল্লাহ্ হইতে বহিষ্কারের পরিকল্পনা

তাহারা মনে করে, মুসলমানগণ সর্বদাই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এক বিরাট বিদ্রোহের প্রস্তুতি লইতেছে। খ্রিস্টান ধর্ম ও ইহার সংস্কৃতির উন্নতির জন্য ইংরেজ সরকার সর্বদাই হিন্দু-মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলিকে অপমান করে। রাষ্ট্রভাষা ফার্সি হইতে ইংরেজিতে রূপান্তরের সময় শিক্ষা কর্মকর্তা লর্ড মেকলের উক্তি এই ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—"একটি ইংরেজি পুস্তক সমগ্র প্রাচ্যদেশীয় পুস্তকাবলির চাইতে উত্তম।"[১] রাজনৈতিক অপমানের চূড়ান্ত করিয়া ইংরেজ সরকার মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে জানাইয়া দেয় যে, তাঁহার বংশধরদিগকে লাল কিল্লাহর প্রাসাদসমূহ ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই পরিকল্পনা শুধু এইজন্যই করা হয় যে, জনসাধারণ তখনও ধারণা করিত তাহাদের সম্রাটই প্রকৃত শাসনকর্তা। ইংরেজদের অযোধ্যা অন্তর্ভুক্তি জনসাধারণের রাজনৈতিক নৈরাশ্যের অনুভূতিকে

অযোধ্যার অন্তর্ভুক্তি তামাদি নীতি

আরও উদ্রিক্ত করে। অযোধ্যার জনগণের মনের ভাব ছিল উপমহাদেশের অন্যান্য আরও অনেক স্থানের মনোভাবেরই ন্যায়, যেখানে লর্ড ডালহৌসীর 'তামাদি নীতি' একই ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তামাদি নীতির দ্বারা আইন রচিত হয় যে, দত্তক হিসাবে কোন উত্তরাধিকারী গ্রহণ করিলে উহাকে স্বীকৃতি দেওয়া হইবে না এবং যদি কোন শাসক সন্তানহীনভাবে মারা যান, তবে তাঁহার রাজ্য ইংরেজ রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। ঐ আইন অনুসারে ভূতপূর্ব পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র নানা সাহেব এবং ঝাঁসীর রাণীর দত্তক পুত্রকে

ব্রিটিশ সরকার বৃত্তি প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং তাঁহাদের রাজ্য ব্রিটিশ রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। এইসব ব্যবস্থায় জনসাধারণ অপমান বোধ করে। অতএব তাহাদের অপমানের জন্য দায়ী রাজশক্তিকে তাহারা ধ্বংস করিতে মনস্থ করে।

অর্থনৈতিক কারণ
লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত
ইনাম কমিশন

সেই সময় জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ইংরেজ সরকার কর্তৃক কিছু সংখ্যক জমিদারকে উৎখাত করা এবং ঐ সমস্ত জমিদারগণের অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গ ও অনুচরদের ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন চাকুরির উপরের স্তর জনসাধারণের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। ইংরেজরা সমস্ত উচ্চপদ অধিকার করিয়া রাখে এবং তাহাদের সমস্ত সঞ্চয় গ্রেট ব্রিটেনে প্রেরণ করে। মুঘল রাষ্ট্র মূলত একটি সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র, যাহা শিল্পী ও মেধাসম্পন্ন লোকদিগকে বেতন ও ভাতা দিয়া শিল্প ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন করে। কিন্তু ইংরেজরা এই সমস্ত লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করিয়া দেয়। কবি ও সাহিত্যিকদিগকে সরকার কর্তৃক আর উৎসাহ প্রদান করা হয়নি। বিভিন্ন ব্যাপারকে আরও ঘোরালো করিয়া দিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে শিল্প ও বাণিজ্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লর্ড বেন্টিংকের দ্বারা লাখেরাজ সম্পত্তি বাতিল করিয়া দেওয়ায় রাষ্ট্র অধিক রাজস্বের মালিক হয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তৎসঙ্গে ইহা অনেক জমিদারিহারা ভূস্বামীকে সর্বহারার পর্যায়ে ঠেলিয়া দেয়। এই স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভূস্বামীদের মালিকানা অনুসন্ধান করিবার জন্য লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক বোম্বাইতে নিযুক্ত 'ইনাম কমিশন' (Inam Commision) দাক্ষিণাত্যে প্রায় ২০,০০০ জমিদারি বাজেয়াপ্ত করিবার সময় ক্ষণিকের জন্যও বিবেচনা করে নাই যে, এইরূপ একটি কঠোর ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় ব্যাপক গোলযোগের সৃষ্টি করিতে বাধ্য।

সামাজিক কারণ
সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ
হিন্দু বিবাহ পুনর্বিবাহ আইন ১৮৫৬

মানবিক বিবেচনা হইতে উদ্বুদ্ধ অন্য একটি ব্যবস্থাকেও জনসাধারণ সন্দেহের চোখে দেখে; ইহা হইল 'সতীদাহ' প্রথা রহিত করিবার জন্য প্রণীত আইন। এই সতীদাহ প্রথার দ্বারা দাম্পত্য জীবনের একটি পুণ্যবান কাজ হিসাবে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় বিধবা স্ত্রীও নিজেকে জীবন্ত দগ্ধ করিত। ১৮৫৬ সালের হিন্দু বিধবা পুনঃবিবাহ আইন (Hindu Widow Remarriage Act) দ্বারা বিধবাদের পুনরায় বিবাহ করিবার অনুমতি দান সম্পর্কিত একটি সামাজিক ব্যবস্থাকেও অপছন্দ করা হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থার দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয়, হিন্দু ধর্মকে ধ্বংস করিবার জন্যই এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সরকার এই কথা বুঝিতে ব্যর্থ হয় যে, সামাজিক সংস্কার জনসাধারণের বিবেক-বিবেচনার বিষয়, আইনের ব্যাপার নহে। এই বিবেচনা আইন প্রণয়ন করিবার পূর্বে মানুষের মনে বসাইয়া দিতে হয়। খ্রিস্টান মিশনারীদের বিভিন্ন উক্তির দ্বারা জনগণের বিবেক অপমানিত হয়। মিশনারিগণ এই সমস্ত আইনগুলিকে হিন্দু চেতনা ও ইহার নৈতিক দণ্ডবিধির বিরুদ্ধে খ্রিস্টান মতাদর্শের বিজয় বলিয়া অভিহিত করে। অনুরূপ রেলপথ ও স্টিমারপথ নির্মাণকেও হিন্দু ধর্ম ধ্বংস করিবার একটি চিরাচরিত পন্থা হিসাবে অঙ্কিত করা হয়।

একটি অখ্রিস্টান জাতির শাসক হিসাবে তাহাদের কর্তব্য ভুলিয়া গিয়া ব্রিটিশ সরকার

জনসাধারণকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য লাগামহীন মিশনারী উৎসাহ প্রদর্শন করে। গ্রেট বৃটেনে ইহা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, "খ্রিস্টের শাসন কায়েম করিবার জন্য নিয়তি ব্রিটিশদের হাতে ভারতের শাসনভার তুলিয়া দিয়াছে। ১৮৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টরের চেয়ারম্যান মিঃ মস (Mr. Maughs) বিলাতের নিম্ন পরিষদে (House of Commons) বলেন—"খ্রিস্টের পতাকা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিজয়ের সঙ্গে উড়িবার জন্য ঈশ্বর এই সুবিশাল হিন্দুস্থান সাম্রাজ্য ইংল্যান্ডের হাতে অর্পণ করিয়াছে।" ১৮৩৬ সালের ২০শে অক্টোবর মেকলে লিখেন "ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকে, তবে আজ হইতে ত্রিশ বৎসর পর বাংলাদেশে একটি মূর্তিপূজারীও থাকিবে না।" এই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া অনেকগুলি ব্রিটিশ কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়। হিন্দু ও মুসলিম ধর্মীয় জমায়েতগুলিতে ইউরোপীয় সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের উপস্থিত থাকিয়া যে ধর্মের সম্মানে জমায়েত ডাকা হয়, সেই ধর্মের বিরোধী বক্তৃতা করা একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। ১৮৩৭ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় এতিম ছেলেমেয়েদিগকে খ্রিস্টান হিসাবে লালন-পালন করিবার জন্য খ্রিস্টান মিশনারীদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়। ধর্মত্যাগীগণ বিভিন্ন সম্পত্তি উত্তরাধিকার বলে প্রাপ্ত হওয়া বা অংশীদার হওয়াকে একটি আইন পাস করিয়া বলবৎ রাখা হয়। হিন্দু ও মুসলিম আইন অনুসারে যে ব্যক্তি ধর্মত্যাগ করে, সে তাহার পূর্ববর্তী ধর্মের আত্মীয়-স্বজনদের উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। এই নূতন আইন স্বভাবতই খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা নেওয়াকে উৎসাহিত করিবার জন্য রচিত হয়।

ধর্মীয় কারণ
সম্পত্তি উত্তরাধিকার আইনে পরিবর্তন

দেশীয় সৈনিকদের সমন্বয়ে গঠিত ব্রিটিশদের সিপাহী বাহিনী এই যুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; কারণ, তাহাদের অংশগ্রহণ ছাড়া এই ধরনের একটি ব্যাপক যুদ্ধ অসম্ভব। সিপাহীগণ এই যুদ্ধের মেরুদণ্ড হিসাবে কাজ করে। তাই এই স্থলে তাহাদের অসন্তুষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করা একান্ত প্রয়োজন। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইল, তাহারা কোন ভাড়াটিয়া সৈন্য নহে, যাহারা নিজ দেশের বাহিরে যুদ্ধ করিয়া বেড়ায়। যে দেশে তাহারা বাস করে, সেই দেশের জনগণের সুখ-দুঃখে তাহারা সমভাগী। ১৮৫৭ সালের দিকে সিপাহীরা একদিকে ব্রিটিশদের জন্য যুদ্ধ করিতে নিরুৎসাহ বোধ করে, অপরদিকে ব্রিটিশরাও তাহাদিগকে অবহেলা করিতে থাকে। সিপাহীরা ব্রিটিশদের হাতের একটি সফল অস্ত্র—এই ব্যাপারটিই ব্রিটিশদিগকে ভারতীয় সৈনিকদের ব্যাপারে সন্দিহান করিয়া তোলে। এই সন্দেহযুক্ত ব্যবহার দ্বারা সিপাহীগণ বিরক্ত হয়। ব্রিটিশরা মনে করে, সিপাহীরা যেসব বর্ধিত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, তাহা আর দিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং তাহাদের অনেকগুলি সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হয়। সিপাহীরা কতকগুলি শুল্ক হইতে মুক্ত ছিল। তাহাদের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের সঙ্গে পত্রালাপের সময় তাহারা সরকারি ডাক ব্যবহার করিতে পারিত। প্রত্যক্ষ সামরিক কার্যের সময় তাহারা একটি অতিরিক্ত ভাতা পাইত। এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা রহিত বা ব্যাপকভাবে কমাইয়া ফেলা হয়। পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাহাদের আশা ছিল স্বল্প পরিসরে। একজন সিপাহী সর্বোচ্চ পদ পাইত একজন সুবাদার বা

সামরিক কারণ
সিপাহীদের সুযোগ সুবিধা বাতিল

রিসালদার। অতএব, তাহারা একজন নবনিযুক্ত ব্রিটিশ প্রাইভেট সৈনিকের চাইতেও কম বেতন পাইত। এই সময় ব্রিটিশ কর্মকর্তাগণ সিপাহীদিগকে অত্যন্ত নোংরা ভাষায় অপমান করিত।

ভারতের বাহিরে যুদ্ধ করিবার জন্য এই দেশের সিপাহীদের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বাড়িয়া যায়। এই কাজ হিন্দু সিপাহীদের জন্য ছিল অতি দুরূহ ব্যাপার। কারণ, সমুদ্র অতিক্রম করিলে ধর্মত তাহারা জাতিচ্যুত হইয়া যাইত। এই সমস্ত বিষয়গুলি বিবেচনা না করিয়াই সরকার ১৮৫৬ সালের জেনারেল সার্ভিস এনলিস্টমেন্ট এ্যাক্ট চালু করে। এই আইনের বলে সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত লোকজন প্রয়োজনের খাতিরে সরকার যেখানেই বদলি করে, সেখানেই তাহারা যাইতে বাধ্য। পদোন্নতির দুরাশা এই আইনের অধীনে সিপাহীদিগকে বিদেশে চাকুরিতে প্রলুব্ধ করিতে ব্যর্থ হয়। সিপাহীদের আরেক আঘাত হানে অযোধ্যার অন্তর্ভুক্তির দ্বারা। বাংলা সেনাবাহিনীর শতকরা ষাট ভাগ লোক ভর্তি করা হইত অযোধ্যা হইতে। এই অন্তর্ভুক্তির দ্বারা অযোধ্যার সরকারে চাকুরিরত আত্মীয়-স্বজনদের চাকুরি ও জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে তাহারা খুবই চিন্তাযুক্ত হয়। চর্বিযুক্ত টোটার উৎপাত সিপাহীদের ধৈর্যে শেষ আঘাত হানে। এনফিল্ড রাইফেলে ভর্তি করিবার পূর্বে এই টোটার বাহিরের খোলস দাঁত দিয়া চিরিতে হইত। প্রচারিত হয় যে, এই টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি ব্যবহার করা হয়। ইহা সর্বজনবিদিত যে, একজন হিন্দু কখনও গরুর মাংস বা চর্বি ধর্মীয় কারণে মুখে দিতে পারে না এবং একজন মুসলমানের পক্ষে শূকর সব অবস্থাতেই হারাম।

জেনারেল সার্ভিস এনলিস্টমেন্ট এ্যাক্ট (১৮৫৬)
চর্বিযুক্ত টোটার প্রচলন

পূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা-বৈষম্যও খুবই বিসদৃশ হইয়া পড়ে। ডালহৌসীর বিদায়ের সময় ভারতে ইউরোপীয় সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪৩,৩২২ জন এবং সিপাহীদের সংখ্যা ছিল ২,৩৩,০০০। সৈন্য মোতায়েনও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। দিল্লী ও এলাহাবাদের ন্যায় সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ সম্পূর্ণভাবে সিপাহীদের নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হয় এবং কলিকাতা ও এলাহাবাদের মাঝখানে মাত্র একটি ব্রিটিশ রেজিমেন্ট রাখা হয় পাটনার নিকটবর্তী দিনাপুরে। অধিকন্তু, সেই সময় ইংল্যান্ড ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, পারস্য যুদ্ধ এবং চীন যুদ্ধের ন্যায় কতকগুলি অভারতীয় যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ায় তাহার যুদ্ধ সরঞ্জামের উপর বিরাট চাপ পড়ে। এমতাবস্থায় সিপাহীদের মনে এই ধারণা ঢুকাইয়া দেওয়া হয় যে, ইংল্যান্ড খুবই সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়িয়াছে এবং ভারতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সংখ্যা খুবই নগণ্য হইবার দরুন ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা সিপাহীদের উপর নির্ভরশীল।

যুদ্ধের সূচনা ঃ যুদ্ধ প্রথম আরম্ভ হয় ১৮৫৪ সালে বাংলাদেশের ব্যারাকপুরে। ১৮৫৭ সালে সেখানে পুনরায় সিপাহীগণ উত্তেজিত হইয়া তাহাদের ব্রিটিশ অফিসারদিগকে হত্যা করে। ইহার পর যুদ্ধ বাংলাদেশের বহরমপুর এবং পাঞ্জাবের আম্বালায় ছড়াইয়া পড়ে। মীরাটে এই যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। সিপাহীগণ ১০ই মে তাহাদের ইউরোপীয় অফিসারদিগকে হত্যা করিয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হয়। দিল্লীতে তখনও পর্যন্ত নামে মাত্র মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ বাস করেন। সিপাহীগণ তাঁহাকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করে এবং তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। দিল্লীতে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় প্রাণ

হারায়। সমগ্র দিল্লী সিপাহীদের পদানত হয়। ক্রমশ সমগ্র বান্দেলখণ্ড, যুক্ত প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশে যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়ে। বিদ্রোহীদের প্রধান প্রধান ঘাঁটি হইল দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেরিলী, অযোধ্যা ও ঝাঁসি।

যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকারও ইহা দমন করিতে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। আম্বালার বিদ্রোহ অতি সহজেই দমন করা হয়। সেখান হইতে একটি উদ্ধারকারী ব্রিটিশ বাহিনী মীরাটের অন্য একটি বাহিনীর সহিত মিলিত হইয়া বাদলীসরাইয়ে বিদ্রোহী সিপাহীদিগকে পরাজিত করে এবং দিল্লী নগরীর অপরদিকে অবস্থিত প্রসিদ্ধ পর্বতে অবস্থান নেয়। পাঞ্জাব হইতে নিকলসন নামে একজন সাহসী অফিসারকে অতিরিক্ত সৈন্য বাহিনী দিয়া পাঠান হয়। আগমনের পরমুহূর্তেই নিকলসন বিদ্রোহীদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। ১৪ই সেপ্টেম্বর কাশ্মীর গেট তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হয় এবং ছয় দিনের প্রাণপণ যুদ্ধের পর রাজপ্রাসাদসহ দিল্লীনগরী ইংরেজদের কবলে আসে। নিকলসন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের সমাধি ক্ষেত্রে লেফটেন্যান্ট হডসন কর্তৃক ধৃত হন। তাঁহার দুই পুত্র ও পৌত্র আত্মসমর্পণের পর লেঃ হডসন কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হইয়া তাঁহার চোখের সামনে প্রাণ ত্যাগ করেন। বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট বছরগুলি সেইখানে অতিবাহিত করিয়া তিনি ১৮৬২ সালে দেহত্যাগ করেন।

বিদ্রোহ দমন দিল্লীতে

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্ণৌয়ের চীফ কমিশনার স্যার হেনরী লরেন্স স্থানীয় সমস্ত ইউরোপীয় অধিবাসীকে লইয়া কানপুরের ব্রিটিশ রেসিডেন্সীতে আশ্রয় নেন। সিপাহীগণ রেসিডেন্সীর সবাইকে সেখানে অবরোধ করে এবং পরবর্তী যুদ্ধে স্যার লরেন্স নিহত হন। পরে ২৫শে সেপ্টেম্বর হ্যাভলক ও আউটরামের নেতৃত্বে একটি ব্রিটিশ সেনাবাহিনী সেখানে উপস্থিত হয়। উদ্যত সঙ্গিনের মোকাবিলায় যুদ্ধ করিয়া তাঁহারা রেসিডেন্সীতে প্রবেশ করেন। সেই সময় জেনারেল নেইল লক্ষ্ণৌতে মারা যান। কিন্তু ব্রিটিশ অফিসারগণ এই অবরুদ্ধ সেনানিবাস হইতে বাহির হইতে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাসে আরও কতকগুলি সৈন্যের সহায়তায় স্যার কলিন ক্যাম্বেল এই সমস্ত সৈনিকদের উদ্ধার করেন। বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে প্রশমিত হইবার পর ১৮৫৮ সালের মার্চ মাসে ইংরেজগণ লক্ষ্ণৌ পুনর্দখল করে।

লক্ষ্ণৌতে

কানপুরে বিপ্লবীদের নেতা ছিলেন মৃত পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র নানা সাহেব। একহাজার ইংরেজ নর-নারী কানপুরে একটি দেওয়ালের পিছনে আশ্রয় লয়। এলাহাবাদের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য তাহারা সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া নদীর তীরে পৌছিলে নানা সাহেবের আদেশে তাহাদের মধ্য হইতে দুইশত জন বন্দিকে হত্যা করিয়া উহাদের মৃতদেহ নিকটবর্তী একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয় (১৫ই জুলাই)। এই ঘটনার দুই বা তিনদিন পর হ্যাভেলক কানপুর অধিকার করেন। নানা সাহেব এবং তাঁহার সহকারী তাঁতীয়া টোপী, একজন মারাঠা ব্রাহ্মণ নিরাপদ স্থানে পলায়ন করেন। এই ব্রিটিশ অধিকারের পর কানপুর পুনরায় বিপ্লবীদের হস্তগত হয়। অতঃপর ১৮৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে স্যার কলিন ক্যাম্বেল ইহাকে পাকাপাকিভাবে জয় করেন।

কানপুরে

১৮৫৭ সালের মে মাসে বেরিলীতে বখত খানের নেতৃত্বে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সিপাহীগণ

রোহিলা নেতা হাফিজ রহমতের একজন পৌত্রকে তাহাদের নবাব বলিয়া ঘোষণা করে।

বেরিলী বখ্‌তখান বিপ্লবীগণ পূর্ণ এক বৎসর তথায় তাহাদের আধিপত্য বজায় রাখে। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৮ সালের মে মাসে স্যার কলিন ক্যাম্বেল ইহা অধিকার করেন।

ঝাঁসীর সিপাহীদের জন্য রাণী লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন জনসমাবেশের প্রতীক। লর্ড ডালহৌসীর তামাদি নীতির দ্বারা ঝাঁসির রাজত্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই সময় হইতে রাজত্বের বিধবা রাণী লক্ষ্মীবাঈ তাঁহার রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র বিশ বৎসর। কানপুরের পরাজয়ের পর মারাঠা নেতা তাঁতীয়া টোপী রাণীর সঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু এই সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজ সেনাপতি স্যার হুগেরুজের (Sir Hugerose) নিকট বেতাওয়ারের যুদ্ধে পরাজিত হয়। ইহার পর রাণী

ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজদের সঙ্গে আরেকটি যুদ্ধে মিলিত হন। কিন্তু সেখানেও তিনি পরাজিত হন (জুন ১৮৫৮)। পুরুষের বেশে সজ্জিত এক অশ্বারোহী সৈনিকের সাজে সজ্জিত রাণী ১৮৫৮ সালের ১৭ই জুন যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করেন। ইংরেজগণ কর্তৃক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পশ্চাদ্ধাবিত হইবার পর তাঁতীয় টোপীকে ১৮৫৯ সালের এপ্রিল মাসে সিন্ধিয়ার একজন জায়গীরভোগী ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করে। পরে তাঁহাকে ফাঁসীতে ঝুলান হয়। নানা সাহেব নেপালের জঙ্গলে পলাইয়া যান এবং কথিত আছে, তিনি সেইখানেই মারা যান। এইভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘটনা শেষ হয়। অতঃপর লর্ড ক্যানিং সমগ্র ভারতে শান্তি ঘোষণা করেন।

প্রধান প্রধান দেশীয় জায়গীরদারগণ এবং সদ্য বিজিত শিখগণ এই দেশজোড়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই বরং শিখদের সহায়তায়ই ইংরেজগণ সফলতা লাভে সক্ষম হয়। মৌলভী আহমদুল্লাহর নেতৃত্বে সংঘটিত অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ডের বিপ্লব দমন করিবার জন্য নেপালের জঙ্গ বাহাদুর সর্বতোভাবে তাঁহার গুর্খা বাহিনীকে ইংরেজদের হাতে অর্পণ করিয়া সাহায্য করেন। এই যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতিগণ কোন বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্ব প্রদর্শনে ব্যর্থ হন। ইংরেজ সেনাপতিগণ যে অযোগ্য, মেধাহীন, নির্জীব, শুধু বয়সের সম্মানেই পদোন্নতি প্রাপ্ত,

যাহারা অংশ গ্রহণ করে নাই তাহা ইতোমধ্যেই লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক ইংল্যান্ডে প্রেরিত এক পত্রে জানান হয় (১৮৫১)। অপরদিকে যুদ্ধকলায় সিপাহীদের উচ্চ যোগ্যতা ও কৌশল ইংরেজরা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। তাহা সত্ত্বেও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, উপযুক্ত নেতা ও সংগঠনের অভাবে ভারতের বীর সিপাহীগণ ও জনগণের স্বাধীনতার যুদ্ধ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

স্বাধীনতার যুদ্ধে ব্যর্থতার কারণ ঃ উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীগণ জনসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ করিতে চেষ্টা করে। এই স্বাধীনতার যুদ্ধ, যাহা ছিল একটি গণবিপ্লব এবং কয়েক মাস পর্যন্ত যাহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য একটি ভীষণ ভীতির কারণ হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া অযোধ্যা-রোহিলা খণ্ডে, কতকগুলি কারণে তাহা ব্যর্থ হয়। প্রথমত, ইংরেজদের তুলনায় তাহাদের সামরিক সাজসরঞ্জাম ছিল খুবই নিম্নমানের। উদাহরণ স্বরূপ, তাহাদের পুরাতন নলের উপরিভাগ দিয়া গুলি ভরিবার মত হাতিয়ারগুলি (Muzzle loaders) ইংরেজদের নব আবিষ্কৃত নলের পশ্চাদভাগ দিয়া গুলি ভরিবার মত হাতিয়ারগুলির (Breech loaders) ন্যায় অত দূরপাল্লার নহে। দ্বিতীয়ত,

বিপ্লবীগণ যেখানে সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক উন্নতির বৈশিষ্ট্য বুঝিতে ব্যর্থ হয়, সেখানে ইংরেজগণ এইগুলিকে নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহার করে। সুতরাং একটি ব্যাপক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা ও ডাক যোগাযোগের উপর কর্তৃত্ব থাকিবার ফলে ইংরেজগণ দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে খবরের আদান-প্রদানকরত অবস্থার প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করিতে সক্ষম হয়। তৃতীয়ত, বিপ্লবীগণ প্রধান প্রধান দেশীয় রাজা ও জমিদারদের নিকট হইতে উপযুক্ত কোন সাহায্য পায় নাই; বরং কোন কোন দেশীয় রাজন্যবর্গ এই বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদের প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করে। চতুর্থত, বিপ্লবীদের আদর্শ, ভাবধারা ও কার্য পদ্ধতিতে কোন সামঞ্জস্য ছিল না। অযোধ্যার বেগম, ঝাঁসীর রাণী, নানা সাহেব ও ওয়াহাবীদের প্রত্যেক দলের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য ছিল। তাহাদের কোন সঠিক কর্মপন্থা বা কর্মধারা ছিল না। পঞ্চমত, বিপ্লবীগণ এমন কোন নেতা পান নাই, যিনি সমস্ত বিপ্লবীর উৎসাহ উদ্দীপনাকে একত্রীভূত করিয়া ব্রিটিশদিগকে সাফল্যের সঙ্গে এই উপমহাদেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন।

বিপ্লবীদের নিম্নমানের অস্ত্রশস্ত্র
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে বিপ্লবীদের ভীতি
দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রত্যক্ষ সমর্থনের অভাব
বিপ্লবীদের কার্যপদ্ধতির বিভিন্নতা

স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল : স্বাধীনতা যুদ্ধের নির্মম পরিণতি সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের উপর আপতিত হয়। ব্রিটিশগণ মুসলিম ওয়াহাবীদিগকে এই বিপ্লবের জন্য দায়ী করে। এই যুদ্ধের এক যুগ পর যখন মুসলমানগণ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস ও অপমানিত, ইংরেজ কর্মচারী হান্টার লিখেন—"মুসলমানগণ বর্তমানে এবং অনেক বৎসর পর হইতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তির সামনে এক বিরাট চিরন্তন বিপদের উৎস হিসাবে দণ্ডায়মান। যে কোন কারণবশত তাহারা আমাদের ব্যবস্থা হইতে নিজেদেরকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে এবং যেসব পরিবর্তনে অধিক আপস ভাবাপন্ন হিন্দুগণ বিনা আপত্তিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছে, সেইগুলিকে তাহারা অত্যন্ত গভীর ব্যক্তিগত অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করে।"[২] স্বাধীনতা যুদ্ধের পর দশ হইতে পনের বৎসর পর্যন্ত ব্রিটিশগণ ভারতের মুসলমানদের জন্য ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করে। নিজেদের জীবন রক্ষার্থে হাজার হাজার মুসলমান নর-নারী দেশ ছাড়িতে বাধ্য হয়। সেই যুগে উপমহাদেশের পত্র-পত্রিকাগুলির মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল এইগুলি। কিছু সংখ্যক মুসলমানকে ফাঁসী দেওয়া হয়, অনেককে গুলি করিয়া মারা হয় এবং আরও অনেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়া আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়।

মুসলমানদের কাঁধে যুদ্ধের বোঝা চাপানো

ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার দিক হইতে এই যুদ্ধ ছিল এক বিরাট যুগান্তকারী ঘটনা। প্রথমত, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডের রাজা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৫৮ সালের ২রা আগস্ট ভারতে উত্তম শাসন পরিচালনার জন্য একটি আইন পাস করা হয়, যাহাতে বলা হয় যে, "ভারতবর্ষ রাজার দ্বারা এবং তাহার নামে একজন প্রধান সচিব বা সেক্রেটারীর মাধ্যমে পনের জন সদস্যের একটি কাউন্সিলের সহযোগিতায় পরিচালিত হইবে।" তৎসঙ্গে গভর্নর-জেনারেলকে 'ভাইসরয়ে'র নূতন উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর রাণীর নামে স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণার দ্বারা লর্ড ক্যানিং এলাহাবাদের এক দরবারে ভারতের শাসন ক্ষমতা গ্রেট ব্রিটেনের সম্রাট কর্তৃক গ্রহণ করিবার

কথা প্রকাশ করেন। এই ঘোষণায় ভারতের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক স্বাক্ষরিত সন্ধি ও আপসগুলিকে মানিয়া লওয়া হয়; দেশীয় রাজন্যবর্গের অধিকার ও মান-মর্যাদাকে সম্মান করা এবং ভারতের পুরাতন অধিকারসমূহ, চালচলন ও সংস্কারগুলির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপের প্রতিজ্ঞা করা হয়। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বৃদ্ধির সমস্ত আগ্রহকে বাতিল বলিয়া উল্লেখ করা হয়। "শুধুমাত্র যাহারা ব্রিটিশ প্রজাদিগকে হত্যার ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছে—এই মর্মে যাহাদিগকে ঘোষণা করা হইয়াছে বা হইবে, তাহারা ব্যতীত বাকি সমস্ত দোষী ব্যক্তির প্রতি" অনুকম্পা প্রদর্শন করা হয়। একটি সুবিচার, পরোপকার ও ধর্মীয় ধৈর্যশীল নীতি গ্রহণ করা হয়, যদ্দারা প্রজাসাধারণের ধর্মীয় আস্থা বা প্রার্থনায় হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকিবার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ঘোষণা করা হয়, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মেধানুসারে চাকুরি দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়ত, ভারতে ব্রিটিশ সামরিক নীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়। ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত প্রাদেশিক সেনাবাহিনীগুলিকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখা হয়। ঐগুলিতে ইউরোপীয় লোকজন বৃদ্ধি করিয়া কিছু একান্ত প্রয়োজনীয় বিভাগের অধীনে রাখা হয় এবং ইউরোপীয় সৈন্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। গোলন্দাজ বাহিনীতে কোন ভারতীয়কে ভর্তি করা বন্ধ করা হয় এবং ইহাকে সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয়দের হাতে রাখা হয়। তৃতীয়ত, ইহার পর হইতে ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গকে ব্রিটিশ সম্রাটের সার্বভৌম ক্ষমতা মানিয়া লইতে বাধ্য করা হয়।

ভারতের শাসনভার রাজার স্বহস্তে গ্রহণ
লর্ড ক্যানিং এর ঘোষণা

বৃটিশদের সাময়িক নীতি
দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি নীতি

স্বাধীনতার যুদ্ধ দুইটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া রাখিয়া যায়—একটি মুসলমানদের জন্য, অপরটি হিন্দুদের জন্য। স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলীগড় আন্দোলনের প্রভাবে মুসলমানগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মান্ধাতার আমলের অস্ত্রশস্ত্র ও সংগঠন লইয়া ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার দিন আর নাই। ব্রিটিশগণ বেশ ধনী, সুসংবদ্ধ এবং যথেষ্ট অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী। তাহারা বুঝিতে পারিল, ব্রিটিশরাজ প্রতিহত করিবার উর্ধ্বে এবং এমন উপকারী যে, তাহাদিগকে উপেক্ষাও করা যায় না। মুসলমানদের মধ্যে যাহারা উন্নতি লাভ করিতে চায়, তাহাদের উচিত ইহার সঙ্গে লাগিয়া থাকিয়া দেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য যে সব সুযোগ-সুবিধা ব্রিটিশরাজ প্রদান করিতেছে, তাহার সদ্ব্যবহার করা। হিন্দু দৃষ্টিকোণ হইতে এই যুদ্ধ ভারতের রাজনীতিতে চরমপন্থী মতবাদের সৃষ্টি করে। আন্দোলনের বাড়াবাড়ি কিছু ভারতীয় ও কিছু ইংরেজের মধ্যে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করে, যাহা দুই দলের জাতীয় বিভিন্নতার দর্শন ঘোরতর আকার ধারণ করিবার ফলে আধুনিককালের ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও শাসন নীতিকে প্রভাবিত করিয়া আসিয়াছে।

ব্রিটিশদের প্রতি মুসলমানদের ধারণার পরিবর্তন

(গ) স্যার সৈয়দ আহমদ খান ঃ

এই পুস্তকের অন্যত্র আলোচনা করা হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা চালু হইবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরা ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া দ্রুত উন্নতির দিকে প্রধাবিত হয়। কিন্তু মুসলমানগণ এই শিক্ষাগ্রহণ প্রত্যাখ্যান করে। তাহাদের যুক্তি হইল, যদি তাহারা ইংরেজি শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং

অন্যান্য সকল নীতি হইতে দূরে সরিয়া থাকে তবে ব্রিটিশ এই উপমহাদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের এই নীতি সফলতা লাভ করিত যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগণও ইংরেজদিগকে অনুরূপভাবে প্রত্যাখ্যান করিত। যাহা হউক, এই জাতীয় বিপ্লবের পর দেশে হিন্দুদের প্রভাব বাড়িয়া যায় এবং তাহারা রাজনীতি ক্ষেত্রেও অগ্রগামী হইয়া উঠে। এই সেইদিনও দেশের সর্বোচ্চ শ্রেণীর অধিকারী মুসলমানগণ সমাজের প্রায় নিম্নস্তরে পতিত হয়। এই অবস্থা স্বভাবতই মুসলমানদের মধ্যে হতাশা ও নিরুৎসাহের সৃষ্টি করে। জাতির এই সংকটাপন্ন অবস্থায় মুসলিম সমাজে কিছু প্রতিভাবান ও গুণী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। তাহাদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত মুসলিম সংস্কারক ও রাজনীতিবিদ সৈয়দ আহমদ খান ১৮১৭ সালের ১৭ই অক্টোবর দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মীর মুত্তাকী। সৈয়দ আহমদের পূর্বপুরুষগণ সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের রাজত্বকালে এই উপমহাদেশে আগমন করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ মুঘল সরকারের অতি গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেন। সৈয়দ আহমদের মাতা আজিজ-উন-নিসা পুত্রের শিক্ষা ও লালন-পালনের ব্যাপারে তাঁহার পিতার চাইতে অধিক আগ্রহ প্রদর্শন করেন। তাঁহার মাতা অতি সুপ্রসিদ্ধ ও সম্মানিত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সুতরাং একটি উত্তম শিক্ষার উপকারিতা সম্পর্কে তাঁহার অতি সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ধারণা ছিল। সৈয়দ আহমদের প্রাথমিক জীবন একটি মুঘল উমরাহ পরিবারের সংস্পর্শে অতিবাহিত হয়। তিনি পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থায় লেখাপড়া করেন এবং কোরআন, হাদিস, ফিকাহ্, আরবি ও ফার্সি ভাষা এবং চিকিৎসাশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। ১৮৩৮ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর এই পরিবার কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ফলে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে চাকুরি লইতে বাধ্য হন। ১৮৩৮ হইতে ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশদের অধীনে অতি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদ গ্রহণ করেন। সৈয়দ আহমদ খান ১৮৯৮ সালের ২৬শে মার্চ পরলোকগমন করেন।

তাঁহার জীবন

স্যার সৈয়দ আহমদ খান ইংরেজ শাসনকে এই দেশের জনসাধারণের জন্য উপকারী বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই কারণে স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি ইংরেজদের পক্ষ সমর্থন করেন এবং ফলে বিপ্লবীদের দ্বারা তিনি দুর্ভোগের সম্মুখীন হন। একটি ভয়াবহ যুদ্ধের পিছনে ফেলিয়া আসা ধ্বংসাবশেষ এবং ইহার পূর্ববর্তী ভাবধারা ও আদর্শের সংঘাত সংস্কার সাধনের ভার স্যার সৈয়দ আহমদের উপর অর্পিত হয়। মুসলমানগণ বিদেশী শক্তির পদানত থাকিবার অনিচ্ছাবশত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। মুসলমানদের এই মনোভাবের অতি ভয়াবহ ও সুদূর প্রসারী ফলাফল পূর্ব হইতে অবগত হইবার কৃতিত্ব স্যার সৈয়দ আহমদেরই প্রাপ্য। তাঁহার কাজ ছিল অতি দুরূহ; কিন্তু তিনিও ইহার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ ও মুসলমানদের মধ্যে আপস সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করেন এবং প্রমাণ করিতে চাহেন যে, মুসলমানগণও জনসাধারণের অন্যান্য অংশের ন্যায় সহযোগী হইতে পারে। মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার করিলে এবং অজ্ঞতা-কুসংস্কারের দ্বারা সৃষ্ট ধর্মীয় ও সামাজিক লৌকিকতাসমূহ দূরীভূত করিতে পারিলে এই উদ্দেশ্য সফল হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। পুস্তক, প্রবন্ধ ও

ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তাঁহার মনোভাব

রচনা আকারে তিনি হাজার হাজার পৃষ্ঠা প্রকাশ করেন এবং জনসাধারণকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবার জন্য, তাঁহার মতে গুরুত্বপূর্ণ এই ধরনের বিভিন্ন বক্তৃতা তিনি প্রদান করেন।

চাকুরি ব্যপদেশে সৈয়দ আহমদ খান অনেক স্থান পরিদর্শনের সুযোগ লাভ করেন। সেইসব স্থানে মুসলমানদের দুরবস্থা দেখিয়া তিনি এতই অভিভূত হইয়া পড়েন যে, এক সময় তিনি অন্য কোন দেশে হিজরত করিবার বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যাহা হউক, তিনি সেই সিদ্ধান্ত পরিত্যাগকরত মুসলিম জাতিকে চরম ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিষয়টির উপর তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া উপসংহারে আসেন। একমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষাতেই মুসলিম জাতির মুক্তি নিহিত, এই উদ্দেশ্যে তিনি দুইটি কর্মপন্থা গ্রহণ করেন—প্রথমত, মুসলমানদের ব্যাপারে ব্রিটিশদের মধ্যে লালিত সন্দেহ দূর করিবার প্রচেষ্টা করিতে হইবে এবং দ্বিতীয়ত, তাহাদের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার সুবিধাদি প্রদান করিতে হইবে। ব্রিটিশ অফিসারদের সন্দেহ ভাঙ্গনের জন্য এবং তাহাদিগকে মুসলমানদের নিকটবর্তী করিবার জন্য তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তিকা—ভারতে বিদ্রোহের কারণ' (Causes of the Indian Revolt) লিখেন। কেউ কেউ তাঁহার এই গবেষণার উপর এই মর্মে দ্বিমত পোষণ করিতে পারেন যে, এই স্বাধীনতা যুদ্ধ বিদেশী শাসনকে এই দেশ হইতে বহিষ্কার করিবার প্রচেষ্টা নহে বরং ইহা শুধুমাত্র সিপাহীদের বিদ্রোহ; এবং মুসলমানগণ কোন ধর্মীয় যুদ্ধ হিসাবে ইহাতে যোগদান করে নাই। একই উদ্দেশ্যে লিখিত তাহার অন্য একটি পুস্তিকার নাম 'রাজভক্ত ভারতীয় মুসলমানগণ' (Loyal Muhammedans of India)। ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের শিক্ষার সাদৃশ্য বিষয়গুলির উপর তিনি জোর দিতে উদগ্রীব হন এবং এই দুই ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য তিনি সচেষ্ট হন।

মুসলমানদের উপর হইতে ব্রিটিশ আন্দোলন দূরীকরণার্থে এবং মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা প্রদানে তাহার প্রচেষ্টা

সুবিধাদি প্রদানের জন্য এবং মুসলমানদিগকে শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ করিবার জন্য সৈয়দ আহমদ খানের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তিনি মুরাদাবাদে একটি ফার্সি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ইহাকে শহরের তহশীল স্কুলের সঙ্গে মিলাইয়া ফেলা হয়। ১৮৬৪ সালে অনুবাদ কার্যাবলির জন্য তিনি একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন, যাহা পরবর্তীকালে 'সায়েন্টিফিক সোসাইটি অব আলীগড়' (Scientific Society of Aligarh) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আলীগড়ে থাকাকালীন তিনি উর্দু ও ইংরেজি দুইটি ভাষায় প্রকাশিত 'দি আলীগড় ইন্সটিটিউট গেজেট' (The Aligarh Institute Gazette) আরম্ভ করেন। ইহা রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য উপকারী বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ সময় পর্যন্ত ইহা মুসলমানদের সাধারণ মতামত শিক্ষা দিয়া তাহাদের মধ্যে একটি রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি করে। ইংল্যান্ড সফরের সময় (১৮৬৯-৭০) স্যার সৈয়দ আহমদ খান ইউরোপীয় সভ্যতা পুরামাত্রায় দর্শন করেন। তিনি "ইহা দেখিয়া অভিভূত হইয়া যান, একটি ছোট

মোরাদাবাদে ফার্সি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা
সায়েন্টিফিক সোসাইটি অব আলীগড়
দি আলীগড় ইন্সটিটিউট গেজেট

তাঁহার ইংল্যান্ড সফর (১৮৬৯-৭০)

শিশুর ন্যায় হতভম্ব হইয়া পড়েন,"—স্মিথ। ইতোপূর্বে শুধু রাজনৈতিক দিক হইতে তিনি বৃটেনের প্রতি আনুগত্যের উপর জোর দেন। কিন্তু এখন হইতে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনের উপরও তাঁহার ব্যগ্রতা অতি উৎসাহের সঙ্গে প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার জাতিকে শুধু ব্রিটিশ শাসন গ্রহণ করানো নহে, বরং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রহণ করাইবার মধ্যে তাঁহার কর্তব্য দেখিতে পান।

আলীগড় আন্দোলন ঃ ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে মুসলমানদের শিক্ষার কর্মসূচি সম্পর্কে সৈয়দ আহমদ খান যথেষ্ট মনোযোগ দেন। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনি সফর করিয়া উহাদের সাংগঠনিক পন্থা অবলোকন করেন। অতঃপর মুসলমানদের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চিন্তা তাঁহার মনে গভীরভাবে দানা বাঁধিয়া উঠে। ইংল্যান্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৭২ সালে সৈয়দ আহমদ খান 'আলীগড় মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল, স্থাপন করেন। ১৮৭৭ সালে এই স্কুল 'মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজে' উন্নীত হয়। এই কলেজই প্রসিদ্ধ আলীগড় আন্দোলনের চাবিকাঠি। এই কলেজ শুধুমাত্র একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নহে, বরং শীঘ্রই ইহা ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক জীবনের কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়ায়। দেশ বিভক্ত হওয়া পর্যন্ত এক শতাব্দীর প্রায় তিনভাগ সময়ে আলীগড় এই মর্যাদা বজায় রাখে এবং এমনসব নেতা প্রস্তুত করে, যাঁহারা এই জাতির শক্তি ও উন্নতির মূলে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার এই সাহসিক কার্যের গুরুত্ব প্রথম হইতেই উপলব্ধি করেন। এই কলেজকে একটি পুরাদস্তুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করিতে তিনি মনস্থ করেন। যাহা হউক, ১৯২১ সালে এই কলেজ প্রসিদ্ধ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। প্রায় একই সঙ্গে তাহার কর্মসূচি ও চিন্তাধারার পক্ষে মুসলিম জনমত গঠনের জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ খান 'তাহজীব-উল-আখলাক' নামে একটি সাময়িকী প্রকাশ করেন। 'তাহ্জীব' আলীগড় আন্দোলনের এক শক্তিশালী স্তম্ভে পরিণত হয়। ১৮৫৭ সালের পরবর্তী মুসলিম গণজীবনের ইতিহাসে ইহার এক অদ্বিতীয় গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। স্যার সৈয়দের জীবনে ইহা এক বিশিষ্ট পদক্ষেপ। ইহা তাঁহার ভাবধারা প্রচার করে এবং তাঁহার কর্মসূচি ও উদ্দেশ্য তাঁহার জনগণের গোচরীভূত করে। প্রধানত এই সাময়িকীর মাধ্যমেই তিনি ভারতের মুসলমানদের নেতা হন।

স্কুল প্রতিষ্ঠা
কলেজের উন্নতি (১৮৭৭)
আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়
তাহ্জীব উল আখলাক

স্যার সৈয়দ আহমদ খান হৃদয়ঙ্গম করেন, শুধু একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বারাই মুসলিম শিক্ষার সমস্যা সমাধান হইবার নহে। শিক্ষাবিষয়ে আলোচনার জন্য একটি সমিতিরও আবশ্যকতা রহিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ১৮৮৬ সালে তিনি 'মোহামেডান এডুকেশনাল কংগ্রেস' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯০ সালে এলাহাবাদের এক বৈঠকে এই প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করিয়া 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' নাম রাখা হয়। এই কনফারেন্স যথেষ্ট উপকারী কার্য সাধন করে। ইহা মুসলমান নেতৃবৃন্দকে প্রতি বৎসর একবার একত্রিত হইয়া তাঁহাদের সমস্যাবলি আলোচনা করিবার সুযোগ প্রদান করে।

মোহামেডান এডুকেশনাল
কনফারেন্স প্রতিষ্ঠা (১৮৯০)

মুসলমানদের ব্যাপারে তাঁহাদের পুরাতন অবিশ্বাস ও অত্যাচার একটি ভ্রান্ত ধারণার

বশবর্তী ছিল—এই ব্যাপারটিকে সারা মুসলিম বিশ্বে প্রচার করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার স্যার সৈয়দ আহমদ খানের কর্মসূচিতে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসে। এই নীতিতে অর্থনৈতিক কারণসমূহ একটি সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করে। স্যার সৈয়দ আহমদ খান চেষ্টা করেন একটি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠনের জন্য, যাহা তখনও ছিল ইহার শৈশবে। একটি শ্রেণী, যাহা তৎকালীন উত্তর ভারতে বাণিজ্যিক ও আমলাতান্ত্রিক কাঠামো বিস্তারে মগ্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দ্বারা লালিত-পালিত ও অর্থনৈতিক দিক হইতে ইহার উপর নির্ভরশীল—ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ঐসব অঞ্চলে যতই কার্যকরভাবে অনুপ্রবেশ করিতে সক্ষম হয়, ততই ইহা একটি ব্রিটিশপন্থী দলে উন্নতি লাভ করিবার মত কর্মসংস্থানের অবস্থা সৃষ্টি করে—সেই দল এই ক্ষেত্রে মুসলমানগণের এবং কিছুটা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। এই উপমহাদেশের পরবর্তী রাজনৈতিক কোন্দল, যাহাকে "হিন্দু মুসলিম ঐক্য" বলিয়া অভিহিত করে, তাহা সৈয়দ আহমদের অন্তরের খুবই সন্নিকটে ছিল। তিনি সর্বদা এই দুই জাতির পারস্পরিক আস্থা ও সহনশীলতা রক্ষা করিবার উপর জোর দেন। ইহাতে তাহাদের মুক্তি বলিয়া তিনি উপলব্ধি করেন। দুইটি সম্প্রদায় অলঙ্ঘনীয়ভাবে একই পরিবেশে বর্ধিত; ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু তাহাদের মানবতাবোধ একই। স্যার সৈয়দ আহমদ খান বলেন, তাহারা একত্রে বসবাস করে, একত্রে নির্যাতিত হয় এবং একত্রে মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু হিন্দি-উর্দু বিতর্ক হিন্দু-মুসলিম বৈরীভাবের কারণ হইয়া দাঁড়ায় এবং যাহা পরবর্তী রাজনৈতিক কার্যকলাপে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই বিতর্কের সময়েই স্যার সৈয়দ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন, হিন্দু মুসলিম ঐক্য একটি দুরাশা মাত্র।

হিন্দি-উর্দু বিতর্ক

১৮৩৫ সালের পর হইতে উর্দু ভাষা পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহ এবং বিহারে কোর্ট কাছারির ভাষা ও ভাব আদান-প্রদানের বাহন হিসাবে কাজ করিয়া আসে। ইহাকে মুসলিম আধিপত্যের ধ্বংসাবশেষ গণ্য করিয়া হিন্দুরা ইহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে সচেষ্ট হয়। ১৮৬৭ সালে এই বিষয়ে বেনারস হইতে একটি সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানো হয়। হিন্দুরা সরকারি ভাষা হিসাবে উর্দু তুলিয়া দিয়া তদস্থলে হিন্দি ভাষা চালু করিবার জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ফলে বিহার ও যুক্ত প্রদেশের সরকারি অফিসসমূহ হইতে উর্দু ভাষা তুলিয়া দেওয়া হয়। সরকারি কাগজপত্রে ইংরেজির পর দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে উর্দু ভাষা উঠাইয়া দিয়া হিন্দি ভাষা প্রবর্তন করা হয়। এই হিন্দি-উর্দু বিতর্কে স্যার সৈয়দ আহমদ খান বিরক্ত হন। তিনি স্বীকার করেন—"আমাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, হিন্দু ও মুসলমানগণ কখনও একত্র হইতে পারিবে না।" হিন্দুদের মধ্যে প্রগতিশীল শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে এই দুই জাতির মধ্যে দ্রুত তিক্ততার সৃষ্টি হয়। প্রথমে তিনি মুসলমানদিগকে যে কোন সম্প্রদায় বা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করিতে চান। কিন্তু এখন তিনি মুসলমানদিগকে হিন্দুদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে এবং ভারতে মুসলমানদের প্রথম ও শীর্ষস্থানীয় আত্মনিয়ন্ত্রণশীল রাষ্ট্র গঠনের পরামর্শ দান করেন। স্যার সৈয়দের এই মনোভাব নিশ্চিত হয় ১৮৮৫ সালে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' (Indian National Congress) প্রতিষ্ঠার দ্বারা, যাহার সঙ্গে সে যুগের শিক্ষিত ভারতীয়দের বিশাল অংশ অবিকৃত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কল্পনা বিজড়িত।

উর্দুভাষা নির্মূল করিবার পরিকল্পনা

(ঘ) রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহ

১। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress) ঃ

ভারতের স্বাধীনতাকামী ও মুক্তিযোদ্ধাদিগকে একই পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে ও পরে তিনটি সংগঠনের উৎপত্তি হয়। এইগুলি হইল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন (১৮৫৩) এবং ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন (১৮৭৫)। এই সমস্ত দলের নেতৃবৃন্দ শাসনতন্ত্রের আলোচনায় ভারতের অধিকার দাবি করেন। একজন যুবক নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (১৮৪৮-১৯২৫) ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি আই.সি.এস. (Indian Civil Service) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চাকুরি গ্রহণ করেন। কিন্তু অনেক কারণবশত সেই চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া তাঁহাকে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিতে হয়। তাঁহার বাগ্মীতার দ্বারা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি জনমনে অদ্বিতীয় প্রভাব বিস্তার করেন। পরবর্তী চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তিনি ভারতের একজন অতি প্রভাবশালী নেতা হিসাবে মহীয়ান থাকেন। ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের রাজনৈতিক দাবি মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলে এই আন্দোলন আরও জোরদার হয়। পরবর্তীকালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ও এলবার্ট বিলের ব্যাপার লইয়া সমগ্র দেশে বিরাট গোলযোগের মাধ্যমে ভারতীয় জনসাধারণ ইংরেজ শাসকদের সত্যিকারের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া আরও অধিকতর প্রচণ্ড বিক্ষোভকারী হইয়া দাঁড়ায়।

কংগ্রেসের পূর্ববর্তী সংগঠন
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি
ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন

এই অবস্থায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, স্যার সৈয়দ আহমদ খান, দাদা ভাই নওরোজী (১৮২৫-১৯১৭) ও অন্যান্য দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ জনগণের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ান। তাঁহাদের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন আরও বিস্তৃতি লাভ করে। রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য জাতীয় আন্দোলনের বিস্তৃতি ও শক্তি দেখিয়া ইংরেজ সরকার ভীত হয়। তাহারা এই আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করিবার জন্য এবং ইহার গতিবেগ রুদ্ধ করিবার জন্য অত্যন্ত তৎপর হইয়া উঠে। এইভাবে ইঙ্গ-ভারতীয় প্রশ্নটিকে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আলোচনার পন্থা হিসাবে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রতিষ্ঠা করা হয়। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হইলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত আই.সি.এস. অফিসার এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম (Allan Octavian Hume)।

প্রতিষ্ঠাতা
আক্টভিয়ান হিউম

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি নামে একজন বাঙালি ব্যারিস্টার এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। পরে উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনগুলি অনুষ্ঠিত হইবার বন্দোবস্ত করা হয়। জাতীয় কংগ্রেসের মূল আদর্শ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদানের মাধ্যমে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক অধিকার আদায় করা। জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুতর প্রশ্নাবলিও অধিবেশনগুলিতে ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়। এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে, তৎকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ছিল হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান এবং বদরুদ্দীন তৈয়বজী (১৮৪৪-১৯০৬), রহিমতুল্লাহ সায়ানী, নবাব সৈয়দ মাহমুদ, মাওলানা মুহাম্মদ আলী, হাকিম আজমল খান, ডাঃ আনসারী, জনাব হাসান ইমাম,

কংগ্রেসের
উদ্দেশ্য

মাওলানা আজাদ ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন।

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে মাত্র দুইজন মুসলমান উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায় ৩৩ জন মুসলমান উপস্থিত হয়; এবং ১৮৯০ সালের কলিকাতা অধিবেশনে মোট ৭০২ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৫৬ ছিলেন মুসলমান (শতকরা বাইশ ভাগ)। এইগুলি এবং এই ধরনের অন্যান্য ঘটনাবলি পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে, তখনও প্রাথমিক যুগের ব্রিটিশপন্থী স্তর ঘেঁষা বিরাট মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও রাজভক্ত এবং তত রাজভক্ত নহে—এরূপ মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি মুসলমান ও অমুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভক্তির ন্যায় অভিন্ন ছিল না। এতদসত্ত্বেও এই বিভক্তিগুলি দুই সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করিবার জন্য একটি আপাত যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার দাঁড় করাইবার মত—এবং পরবর্তীকালে যাহা সত্যই করা হইয়াছিল—একে অন্যের যথেষ্ট গা- ঘেঁষা ছিল। মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাইতে অধিক পশ্চাদগামী ও ব্রিটিশপন্থী বলার চাইতে অর্থনৈতিক দিক দিয়া পশ্চাদগামী ব্রিটিশপন্থী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমধিক পুরাতন, শক্তিশালী, বর্তমানে ক্রটি অন্বেষী হিন্দুর চাইতে মুসলমানই ছিল বেশি বলাটাই সঠিক হইবে। যেভাবেই ইহাকে বলা হউক, এইখানেই হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা উৎপত্তির অর্থনৈতিক ভিত্তি নিহিত। এইভাবেই রাজনীতি সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তাধারা বেশ ভালভাবেই আরম্ভ হয়, যদিও আন্তঃসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নহে, তবু বেশ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে।

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি

অর্থনৈতিক পরিক্রমা ছিল আরও নাটকীয়। ১৮৯০ হইতে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন সম্পূর্ণ নূতন ধারায় প্রবাহিত হয়। এই সময়ে মুসলমানগণ সরকারকে উন্নতির কিছুটা ইঙ্গিত প্রদানের মধ্যে শুভবুদ্ধির উন্মেষ দেখিতে পায়। কিন্তু ইতোমধ্যে আরও পুরাতন, ধনী ও প্রতিষ্ঠিত দলগুলি কেরানিগিরি ও অন্যান্য পেশাগত কাজকর্ম হইতে বিভক্ত হইয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানে যোগদানকরত পূর্ব স্তর হইতে নূতন ও উদ্যোগী প্রচণ্ড জাতীয়তাবাদী দলে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। বেশ কিছু সময় পর্যন্ত ইহা মোটের উপর মুসলিম বিদ্বেষী ছিল না। তাহা সত্ত্বেও হিন্দুয়ানী মনোভাব প্রবলভাবে প্রবেশ করিয়া ইহাকে কার্যকরভাবে প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করে। তারপর ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের দ্বারা বর্ণ হিন্দুদের এই আন্দোলন ও মনোভাব চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। লর্ড কার্জনের এই বঙ্গভঙ্গ মোটামুটিভাবে কলিকাতা কেন্দ্রিক বর্ণ হিন্দুদের স্বার্থ পরিপন্থী। অপরদিকে ব্রিটিশপন্থী মুসলমানরা ইহাতে সন্তুষ্ট হয় এবং এই প্রশ্নটি পূর্ব অভিপ্রায় অনুযায়ী একটি হিন্দু-মুসলিম ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। ইতোপূর্বেকার হিন্দু জাতীয়তাবাদী আবেগ এখন মুসলিম বিরোধী উন্মত্ততায় পর্যবসিত হয়। এই সময় আধুনিক যুগে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রচণ্ড বিরোধ ছড়াইয়া পড়ে। কিছুকাল পর জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অবস্থান লইলে মুসলমানদের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। মুসলমানগণ কংগ্রেস ও ইহার নূতন নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী মতাদর্শকে সন্দেহের চোখে দেখিতে থাকে। এই সমস্ত ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে অনেক মুসলমান কংগ্রেস দল ত্যাগ করিয়া মুসলিম লীগ দল গঠন করে।

২। মুসলিম লীগ ঃ

স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রতিষ্ঠিত আলীগড় আন্দোলন মুসলমানদিগকে নিজেদের স্বার্থ লইয়া চিন্তা করিতে শিক্ষা দেয়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের দ্বারা সৃষ্ট রাজনৈতিক অবস্থা মুসলমানদিগকে একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ লইতে উৎসাহিত করে। বাংলা বিভাগ ইহাকে পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলা—এই দুই ভাগে বিভক্ত করে। পূর্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানী হয় ঢাকা এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী হয় কলিকাতা। পূর্ববাংলায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং এই বিভাগ পূর্ববাংলার মুসলমানদের উদ্দেশ্য সফল হয়, অপরদিকে হিন্দুগণ পূর্ববাংলায় সংখ্যালঘু হইয়া যায়। ফলে হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করে। কারণ, বঙ্গভঙ্গের অর্থ হইল, পূর্ববাংলায় বাঙালি মুসলমানদের জন্য একটি স্থায়ী আসন করিয়া দেওয়া—ইতোপূর্বে যাহারা বাংলার সিভিল সার্ভিস ও অন্যান্য লোভনীয় বিষয়গুলিতে হিন্দুদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন স্থান পাইত না। মুসলমানদিগকে পূর্ববাংলায় তথা সমগ্র বাংলাদেশে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য কলিকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী বা মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে মর্মে কোন কোন লেখক অভিযোগ করেন। মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক মুক্তি এবং হিন্দু মহাজনদের যাঁতাকল হইতে উদ্ধার লাভ দেখিতে পায়, এবং তাই তাহারা ইহাকে সমর্থন করে। তাহারা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করে, সম্প্রদায় হিসাবে শুধু নিজেদের অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার জন্য তাহারা স্ব-স্ব অভ্যন্তরীণ অনৈক্য দূরে নিক্ষেপ করিয়া একটি সাধারণ রাজনৈতিক অঙ্গনে সমবেত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

মুসলমানদিগকে রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক হইতে একত্রীভূত করিবার প্রয়াসে একটি মুসলিম সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়, এবং বঙ্গভঙ্গের দ্বারা সৃষ্ট রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য মহামান্য আগা খানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর নিকট সিমলায় উপস্থিত হয়। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে তাঁহারা মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনও দাবি করেন। মিন্টো এই দাবি পূরণের আশ্বাস প্রদান করেন এবং ১৯০৯ সালের মর্লি- মিন্টো সংস্কারে এইগুলি কার্যকর করা হয়। অতঃপর ক্রমবর্ধমান হিন্দু বিরোধীতা ও উন্মত্ততায় বাধা প্রদান করিবার জন্য এবং তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিবার বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। ইহার ফলে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুরের উদ্যোগে ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের বার্ষিক অধিবেশনে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' (All India Muslim League) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের ঐতিহাসিক প্রস্তাব গৃহীত হয়। মুসলমানগণ তাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। গঠিত হইবার সময় মুসলিম লীগ তিনটি লক্ষ্য স্থির করে—(১) ব্রিটিশ সরকার ও মুসলমানদের মধ্যে একাত্মবোধ সৃষ্টি করা, (২) মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা, (৩) মুসলমানদের মনে অন্য ধর্মাবলম্বী সম্পর্কে বৈরীভাব সৃষ্টিতে বাধা প্রদান করা।

সিমলা প্রতিনিধি
মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা (১৯০৬)
লীগের লক্ষ্য

ভারতের রাজনৈতিক দিগন্তে জাতীয়তাবাদের উদয় ব্রিটিশদের বিচলিত করিয়া তোলে। তাহারা তাই একটি রক্ষাকবচের সন্ধানে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং হিন্দু-মুসলিম শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্কের মধ্যে সেই কবচের সন্ধান পায়। কিন্তু ১৯১০ সালের পরবর্তী ভারত ও ইহার বহির্গত ঘটনাবলি ভারতের মুসলিম রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ, কানপুরে নিষ্ঠুরভাবে মুসলিম হত্যা এবং ইউরোপের বলকান যুদ্ধসমূহ মুসলমানদিগকে ব্যথিত করে। অতঃপর মুসলমানগণ বুঝিতে পারে, ব্রিটিশদের সমর্থন ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করা নিরর্থক। ১৯১২ সালে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের এক অধিবেশনে মুসলিম নেতৃবৃন্দ লীগের শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব করে, যাহাতে কংগ্রেসের সঙ্গে স্বাধীনতার একই দাবিতে লীগকে যুক্ত করা যায়। সেই অধিবেশনে এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যাবলি ও সহযোগিতা বর্তমান রাখিবার জন্য একটি প্রস্তাব পাস করিয়া মুসলিম লীগের রাজভক্ত নীতির পরিবর্তন সাধন করা হয়। এই নীতির পরিবর্তন কংগ্রেস কর্তৃক সাদরে প্রশংসিত হয়। তৎকালীন হিন্দু জাতীয়তাবাদের ক্রমবর্ধমান চেহারা দেখিয়া মুসলমানগণ চমৎকৃত হয় এবং হিন্দুগণ বুঝিতে পারে যে, এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের যুগপৎ সহযোগিতা ছাড়া শাসনতান্ত্রিক সংস্কার কিছুতেই পাওয়া যাইবে না। অতএব, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বিষয়টি অতি আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করা হয়। ১৯১৫ হইতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত লীগ ও কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনসমূহ একই স্থানে এবং প্রায় একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রিটিশদের প্রতি মুসলমানদের বৈরীভাব
বঙ্গভবন রদ (১৯১১)
কংগ্রেস-লীগ ঐক্য

১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের (Imperial Legislative Council) উনিশ জন সদস্য শাসনতন্ত্রের সংস্কার দাবি করিয়া ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। উহার পরপরই অনেকগুলি দাবি-দাওয়া লইয়া মুসলিম লীগও আগাইয়া আসে। এই দাবিগুলি হইল— (১) পাঞ্জাব ও মধ্য প্রদেশে পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন; (২) প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলমানদের আসন সংখ্যা নির্ধারণ করা; (৩) মুসলমান ও তাহাদের ধর্মীয় রীতি-নীতি বিরোধী কোন আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা। এই সমস্ত দাবি-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত আলোচনার ফলে ১৯১৬ সালে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং এই চুক্তি 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' নামে পরিচিত। কংগ্রেস মুসলিম লীগের দাবি-দাওয়াগুলি মানিয়া লয়। অতঃপর সিদ্ধান্ত লওয়া হয়, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে "নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান হইতে হইবে। তাঁহারা বিভিন্ন প্রদেশে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা তাঁহারা যে অনুপাতে নির্বাচিত হইবেন, এই ক্ষেত্রেও তাঁহাদের প্রতিনিধিত্বের অনুপাত যথাসম্ভব সমান হইবে।" প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব নিম্নরূপ হইতে হইবে—

লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬)
প্রাদেশিক আইন পরিষদে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব

(ক) পাঞ্জাব ৫০%; (খ) যুক্ত প্রদেশ ৩০% (গ) বাংলাদেশ ৪০%; (ঘ) বিহার ও উড়িষ্যা ২৫%; (ঙ) মধ্যপ্রদেশ ১৫%; (চ) মাদ্রাজ ১৫%;' (ছ) বোম্বাই ৩৩%; আসামের প্রতিনিধিত্ব অমীমাংসিত থাকিয়া যায়।

ব্রিটিশ যদিও এই চুক্তির সমালোচনা করে, কিন্তু ইহার উভয় ধারাকেই তাহারা ১৯১৯ সালের 'ভারত শাসন আইনে' মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। এই চুক্তি ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বিখ্যাত ঘটনা; কারণ, একদিকে সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি মুসলমানদিগকে ব্রিটিশ সরকারের মুখোমুখি লইয়া আসে, অপরদিকে ইহা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মুসলিম লীগের আলাদা রাজনৈতিক সত্তার স্বীকৃতি আদায় করে।

লক্ষ্ণৌ চুক্তির ফল

কিন্তু ১৯৩০ সালের পর খিলাফত আন্দোলনের যুগে মুসলিম লীগ দুর্বল হইয়া পড়ে। অধিকন্তু ১৯৩১ সালে মাওলানা মুহাম্মদ আলীর মৃত্যুর পর মুসলমানদিগকে একই পতাকাতলে সমবেত রাখিতে সমর্থ এইরূপ কোন উপযুক্ত নেতা ছিলেন না। এই সংকটাপন্ন অবস্থায় মুসলমানগণ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করে। সেই সময় জিন্নাহ লন্ডনের প্রিভি-কাউন্সিলে ওকালতি করিতেন। ১৯৩৫ সালে তিনি উপমহাদেশে আগমন করেন এবং মুসলিম লীগের পুনর্গঠনের কাজে হাত দেন। লীগ টিকেটে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার আয়োজনও করা হয়। নির্বাচন উপলক্ষে জিন্নাহ সমগ্র ভারত সফর করেন। যুক্ত প্রদেশ, বোম্বাই ও অন্যান্য সংখ্যালঘু প্রদেশে মুসলিম লীগ বেশ জয়যুক্ত হয়; কিন্তু পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের সুদৃঢ় প্রাদেশিক দলগুলির বিরুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। নির্বাচনের পূর্বে এমনকি নির্বাচনের সময়ও কংগ্রেস মুসলিম লীগের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু নির্বাচনের পর কংগ্রেস-লীগ সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

মওলানা মুহাম্মদ আলীর মৃত্যু (১৯৩১)
জিন্নাহ কর্তৃক লীগের পুনর্গঠন
নির্বাচনে লীগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

১৯৩৫ সালের এ্যাক্ট অনুসারে মুসলমানদিগকে মন্ত্রিপরিষদে অন্তর্ভুক্ত করিবার কথা। কিন্তু কংগ্রেস ইহাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। ৭টি প্রদেশে গঠিত কংগ্রেস সরকার মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী কতগুলি কার্য সম্পাদন করে এবং ফলে ১৯৩৯ সালে ভারতের গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক একতরফাভাবে ভারতকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সম্পৃক্ত করায় এবং কংগ্রেসের দলীয় কোন্দলের দরুন কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলে মুসলমানগণ 'মুক্তি দিবস, উদযাপন করে। কংগ্রেসের মুসলিম বিরোধী নীতি মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করে। পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় হিন্দুদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনার সূত্রপাত করে। এলাহাবাদ অধিবেশনে স্যার মুহাম্মদ ইকবালের সভাপতির ভাষণের পর মুসলিম লীগ একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করে। ১৯৩৮ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিম কনফারেন্সে দ্বিজাতি নীতির (Two Nations Theory) প্রস্তাব গৃহীত হয়। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটি এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করে।

কংগ্রেসের শত্রু ভাবাপন্ন মনোভাব
দ্বিজাতি নীতি

৩। খেলাফত আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৪) ঃ

প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ সরকারকে জনবল ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণ দিয়া সাহায্য করে এবং প্রতিদানে ইংরেজও ভারতীয় জনগণকে দায়িত্বশীল স্বায়ত্তশাসন দিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি দেয়, যুদ্ধের

পর তাহারা তুরস্কের খলিফার রাজত্ব ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবে। কিন্তু তুরস্কের ব্যাপারে ব্রিটিশ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। ফলে তুরস্কের খলিফার সম্মান ও রাজত্ব টিকাইয়া রাখিবার জন্য ১৯১৯ সালে ভারতে খেলাফত আন্দোলন আরম্ভ হয়। আলী ভ্রাতৃদ্বয় মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী, ডাঃ আনসারী ও অন্যান্য প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৯১৮ সালে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারের খসড়া প্রকাশিত হয় এবং ১৯১৯ সালে উহা কার্যকর হয়। দেশে দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু ইহা জনগণকে সন্তুষ্ট করিতে ব্যর্থ হয়। ইহার পর গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দেশে এক প্রচণ্ড অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করে। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা সরকারকে দাবি আদায়ে বাধ্য করিবার জন্য ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায় একত্রে মিলিত হয়। এই আন্দোলন প্রতিহত করিবার জন্য সরকার রাউলাট এ্যাক্ট (Rowlatt Act) বিধিবদ্ধ করিয়া জনসাধারণের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। প্রতিবাদে গান্ধী সাধারণ হরতাল আহ্বান করেন। সমগ্র দেশে ব্যাপক ধর-পাকড় আরম্ভ হয়। পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করা হয়। অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে অনুষ্ঠিত জনসভায় জেনারেল ডায়ার হাজার হাজার হিন্দু, মুসলিম ও শিখ জনতার উপর গুলি করিবার আদেশ দেন। ফলে শত শত নিরীহ জনতা হতাহত হয়। এই ঘটনায় সমগ্র দেশে জনগণ বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। ইহার প্রতিবাদে জিন্নাহ ও অন্যান্য অনেক সদস্য কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ হইতে পদত্যাগ করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন রাউলাট এ্যাক্ট

জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড

পাঞ্জাবের এই হত্যাযজ্ঞের ফলে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা আসে। খেলাফত আন্দোলন এবং রাউলাট এ্যাক্ট বিরোধী আন্দোলন একত্রিত হইয়া যায়। ১৯২১ সালে অনুষ্ঠিত নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেস গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব করে। খেলাফতের আন্দোলনের প্রতি সম্মান প্রদান করিয়াও প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে হাজার হাজার নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। মাওলানা মুহম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, চিত্তরঞ্জন দাস (সি. আর. দাস), মতিলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হন। এইভাবে অসহযোগ আন্দোলনকে সাময়িকভাবে প্রতিহত করা হয়।

হিন্দু-মুসলিম ঐক্য

খেলাফত আন্দোলন ও রাউলাট এ্যাক্ট বিরোধী আন্দোলনের দ্বারা ভারতে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়িয়া উঠে, তাহা পরবর্তী কয়েক বৎসরে কিছু লোমহর্ষক ঘটনাবলির দরুন নষ্ট হইয়া যায়। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মালাবারের মোপলা মুসলমানদের বর্ধিত অসন্তোষ ১৯২১ সালের শেষের দিকে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। সরকার এই বিদ্রোহকে অতি নিষ্ঠুরভাবে দমন করিতে আরম্ভ করে। এই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন বিফল করিবার জন্য সরকার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ করিয়া দেয়। এইভাবে এই দুই সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯২৪ সালে তুরস্কের মুস্তাফা কামাল পাশা খেলাফত পদের বিলুপ্তি ঘোষণা করিলে ভারতের খেলাফত আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মোপলা বিদ্রোহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা খেলাফত পদের বিলুপ্তি

(ঙ) মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঃ

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৮৭৬ সালে করাচীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্বদেশের বিদ্যার্জন সমাপ্ত করিয়া তিনি ইংল্যান্ড গমন করেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত তিনি ব্যারিস্টারী পাস করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি বোম্বাইয়ে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। শীঘ্রই সমগ্র ভারতে একজন সুদক্ষ উকিল হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। ১৯১০ সালে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য হন এবং এই পদে তিনি বেশ কিছু বৎসর অতিবাহিত করেন। জাতীয় কংগ্রেসের একজন সভ্য হিসাবে তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিয়া জাতির একজন বিখ্যাত নেতা হিসাবে স্থান লাভ করেন। ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের একজন উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন এবং পরে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

প্রাথমিক জীবন

জিন্নাহ ১৯১৬ সালে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের প্রসিদ্ধ লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর অগ্রনায়ক। ১৯১২ সালে স্বাধীনতার দাবিতে কংগ্রেসের সঙ্গে একই শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য মুসলিম লীগ ইহার গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে। এই নীতির পরিবর্তন মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের সমগোত্রীয় করিয়া তোলে এবং ইহা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করে। এই ভিত্তিতেই বস্তুত মাওলানা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে লীগে যোগদানে রাজি করিতে সক্ষম হন। তিনি নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, লীগের সদস্যপদের দরুন বৃহৎ জাতীয় বিষয়ের প্রতি কোন অবিশ্বাস দেখা দিবে না; কারণ, সেই জাতীয় স্বার্থেই তাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত। প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ওকালতিতেই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বিষয়টি আগ্রহের সহিত আলোচিত হয় এবং ১৯১৫ হইতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত লীগ ও কংগ্রেস তাহাদের বার্ষিক অধিবেশনগুলি একই স্থানে এবং প্রায় একই সময়ে সম্পন্ন করে।

হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ প্রদর্শক

১৯২৮ সালে দিল্লীতে একটি সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনকল্পে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করিয়া একটি খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই কমিটি আলোচ্য বিষয়ে যে রিপোর্ট প্রদান করে, তাহাই 'নেহরু রিপোর্ট' নামে পরিচিত। এই রিপোর্টে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন এবং বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন বিলুপ্ত করা হয়। ১৯২৯ সালে তেইশ জন গণ্যমান্য মুসলমান নেহরু রিপোর্ট ও ইহার সমর্থকদের বিরুদ্ধে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন। এখন হইতে মুসলমানেরা এবং মুসলিম লীগ জাতীয় কংগ্রেসকে একটি হিন্দু সংগঠন হিসাবে আখ্যায়িত করে, যদিও কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অনেকেই মুসলমান ছিলেন। যাহা হউক, মুসলিম সম্প্রদায়ও একটি রাজনৈতিক ঐক্য সাধনে হিমশিম খাইয়া যায়। অতঃপর জিন্নাহ তাঁহার প্রসিদ্ধ 'চৌদ্দ দফা' নামে একটি নীতি ঘোষণা করেন। ইহার প্রধান নীতিগুলি হইল—কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলিম সদস্যদের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশের কম হইবে না; পৃথক নির্বাচন চালু থাকিতে হইবে; পাঞ্জাব, বাংলাদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশসমূহ এমনভাবে পুনর্গঠন করা যাইবে না, যাহাতে মুসলিম

নেহরু রিপোর্ট জিন্নাহর চৌদ্দ দফা

সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্ষুণ্ন হয়; এমন কোন ধর্মীয় প্রস্তাব পরিষদে পাস করা যাইবে না, যাহাকে কোন সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য তাঁহাদের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন। মুসলমানদের শিক্ষা, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতি বিষয় সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং কেন্দ্র ও প্রদেশের মন্ত্রিসভায় মুসলিম মন্ত্রিবর্গের সংখ্যা মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হইতে হইবে। এই সমস্ত দফা নেহরু রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই বিধায় মুসলমানেরা ইহা প্রত্যাখ্যান করে। কংগ্রেস এই চৌদ্দ দফা মানিয়া না লওয়ায় হিন্দু-মুসলিম মৈত্রী ভাঙিয়া যায়।

তখনও মুসলমানগণ দ্বিধাবিভক্ত। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগ ততটা সুগঠিত বা সমর্থিত একটি দল নহে। ইহার আর্থিক অবস্থা ছিল অসচ্ছল এবং মাত্র একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা ভারতে লীগের পক্ষে কলম চালাইত। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত জিন্নাহ মুসলিম মহলে তেমন জনপ্রিয় ছিলেন না। তখনও পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের একজন বিশ্বস্ত নেতা এবং ইসলামের জন্য সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গীকৃত নহেন—এই হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এক বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে জিন্নাহ 'কায়েদ-ই-আজম' বা সম্মিলিত মুসলিম সম্প্রদায়ের মহান নেতা, এই উপাধিতে ভূষিত হন। একজন তেজস্বী বক্তা হিসাবে তিনি অসংখ্য অনুষ্ঠানে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। তাহার প্রধান গবেষণার বিষয় ব্যক্ত করেন নিম্নরূপভাবে—"নূতন প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র প্রকাশিত হইবার পর ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে, কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইল দেশের অন্যান্য প্রত্যেকটি সংগঠনকে ধ্বংস করা এবং ইহাকে একটি অতি নিকৃষ্ট ধরনের ফ্যাসীবাদ ও একনায়কত্ববাদের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।"[৩]

জিন্নাহ কর্তৃক লীগের পুনর্গঠন কায়েদ-ই-আজম

জিন্নাহর নেতৃত্ব সুফল প্রদান করে। সমগ্র ভারতে মুসলিম লীগের শক্তি বৃদ্ধির জোয়ার আসে। ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত আইন পরিষদের মুসলিম আসনসমূহের জন্য ৬১ বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে লীগ দখল করে সাতচল্লিশটি আসন, স্বতন্ত্র মুসলিম প্রার্থীগণ দশটি আসন এবং কংগ্রেস মনোনীত মুসলিম প্রার্থীগণ চারিটি আসন লাভ করেন। ১৯৩৭ সালের শেষের দিকে মুসলিম লীগের ১৭০টি নূতন শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং শুধু একটি প্রদেশেই এক লক্ষ নূতন সদস্য লীগে যোগদান করে। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে জিন্নাহ মন্তব্য করেন—কংগ্রেস সরকারের হাতে মুসলমানগণ সুশাসন আশা করিতে পারে না। সুতরাং জিন্নাহ তাঁহার দ্বিজাতি নীতি (Two Nation Theory) ঘোষণা করেন। কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত সাতটি প্রদেশে মুসলমানদের উপর কিরূপ অত্যাচার চালানো হইতেছে, তাহা তিনি প্রকাশ করেন। এইরূপ ক্রমবর্ধমান মুসলিম ভীতি ও ক্ষোভের পরিবেশেই লীগের নীতিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।

মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি দ্বিজাতি তত্ত্ব

মুসলিম লীগ প্রথমে ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইন' মানিয়া লয়; কিন্তু ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে জিন্নাহ ঘোষণা করেন, শুধুমাত্র মাথা গণনা অনুসারে কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভারতীয় উপমহাদেশে কার্যকর হইবে না; এবং তিনি ইহাও ঘোষণা করেন যে, এই নূতন আইন মুসলিম সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে।

মুসলমানগণ অতঃপর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তিতে ভারতের স্বাধীনতার বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) আরম্ভ হইবার পরবর্তী মাসগুলিতে জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ আরও প্রচণ্ডভাবে দাবি করে যে, মুসলিম জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি মুসলিম লীগই; এবং সেই সঙ্গে ইহাও দাবি করে যে, ভারতের সমস্ত জাতি ও বর্ণের লোকদের সপক্ষে কথা বলিবার অধিকার শুধুমাত্র কংগ্রেসেরই নহে। এই সময়েই বিশেষত মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম ঐক্যের একমাত্র প্রতিভূ হইয়া উঠেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু পূর্বে ও পরে আরও একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নীতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহা হইল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ভারতের এক প্রবাসী ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী কর্তৃক উদ্ভাবিত 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্র হাসিলের নীতি। ১৯৪০ সালে জিন্নাহ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, মুসলমানেরা সংখ্যালঘু নহে, বরং একটি আলাদা জাতি। তিনি জোর দিয়া বলেন, "আমরা ১০০ মিলিয়নের একটি জাতি এবং আরও বড় কথা হইল, আমরা একটি জাতি, যাহার পৃথক সংস্কৃতি ও সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্য, চারুকলা ও স্থাপত্য শিল্প ..... চলাফেরা ও দিনপঞ্জী, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, যোগ্যতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। সংক্ষেপে জীবনের উপর এবং সেই বিষয়ে আমাদের নিজস্ব ও পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি রহিয়াছে।"[৪]

মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের বিষয় মুসলিম ঐক্যের প্রতিভূ হিসাবে জিন্নাহ্

লাহোর প্রস্তাব ঃ

পাকিস্তান নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র অর্জন করিবার চিন্তা কিভাবে মুসলমানদের মনে স্থান পায়, তাহা এই অধ্যায়ের অন্যত্র আলোচনা করা হইয়াছে। লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পূর্বে পাকিস্তানের বিকল্প হিসাবে অনেকগুলি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। বিকল্প পন্থার মধ্যে মুসলমানদের পৃথক সংস্কৃতির স্বীকৃতি এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত একটি অঞ্চল প্রদান করিবার কথাও উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এই ব্যাপারে জাতীয় কংগ্রেস কোন সমবেদনামূলক নীতিই গ্রহণ করে নাই। পৃথক মুসলিম জাতির একটি পৃথক সত্তার অস্তিত্ব মানিয়া লইতে তাহারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। কংগ্রেসের এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিশেষ করিয়া ১৯৩৭ হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সময়ে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার আমলে মুসলিম লীগের নীতি কঠোর আকার ধারণ করে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুসলিম লীগ কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করে—মুসলিম ভারত "অনমনীয়ভাবে ফেডারেল ধরনের রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য অর্জনের বিরোধী। কেননা ইহার ফলে গণতন্ত্র ও সংসদীয় সরকারের নামে এই দেশে সংখ্যাগুরু শাসনই প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

পৃথক মাতৃভাষা পটভূমি

এই প্রত্যাশা ও উত্তেজনার পরিবেশেই ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে মুসলিম লীগ ঐতিহাসিক লাহোর সম্মেলনে মিলিত হয়। সভাপতির ভাষণে জিন্নাহ বলেন, মুসলমানগণ অবশ্যই তাহাদের মাতৃভূমি, তাহাদের রাজ্য এবং তাহাদের রাষ্ট্র লাভ করিবে।" ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চের সেই অধিবেশনে একটি স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবি করিয়া একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহাও গৃহীত হয় যে— এইসব

অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শাসন সংক্রান্ত বিষয়ক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থাদি তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য যথেষ্ট কার্যকর ও নির্দেশমূলক রক্ষাব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে বিশেষভাবে থাকিতে হইবে। ভারতের অন্যান্য স্থানে, যেখানে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু, সেখানে তাহাদের ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শাসন বিষয়ক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থাদি তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য যথেষ্ট কার্যকর ও নির্দেশমূলক রক্ষাব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে বিশেষভাবে থাকিতে হইবে। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এই ঐতিহাসিক প্রস্তাব পাঠ করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়। জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলমানগণ স্বাধীনতা ও আত্মীয়ন্ত্রণের কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই পদক্ষেপ তাহাদের মাতৃভূমির দিকে। সমগ্র দেশের মুসলমানগণ এই প্রস্তাব গ্রহণ করে যাহার ফলে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হইয়া একটি আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

পাদটীকা

১। A single English book is better than an entire collection of oriental books.

২। ডব্লিও হান্টারঃ Our Indian Musalmans.

৩। Since the inauguration of the new provincial constitution (1935 Act) it has been established beyond doubt that the sole aim and object of the Congress is to annihilate every other organization in the country, and to set itself up as a fascist and authoretarian organization of the worst type.

৪। We are a nation of a hundred million, and what is more we are a nation with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture .... customs and calender, history and tradition, aptitudes and ambitions. In short we have our own distinctive outlook on life and of life .... *The Pakistan Doctrine*. পৃঃ ৫৩৫.

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

Selections from the *History of the Freedom Movement*, Vol -III

W. Hunter	:	*Our Indian Musalmans*
W. Wallbank	:	*A Short History of India and Pakistan.*
Symond	:	*Making of Pakistan*
C. Smith	:	*Islam in Modern India*
K. K. Aziz	:	*Britain and Muslim India*
Setaramaya	:	*History of the Indian National longress, 5 vols.*

Moulana Azad : *India Wins Freedom*

A. Hamid : *Muslim Separatism*

Ravoof : *Meet Mr. Jinnah*

Titus : Indian Islam

Moulana Mohammad Ali : *My Life—A Fragment.*

S. B. Choudhury : *Theories on Indian Mutiny*

S. Moinul Huq : *The Great Revolution of 1857*

M. A. Khan : *History of the Faraidi Movement in Bengal*

অষ্টম অধ্যায়
পাকিস্তানের সৃষ্টি

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর গ্রেট ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং একই দিন ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো জার্মানির বিরুদ্ধে 'ভারত যুদ্ধে লিপ্ত' বলিয়া ঘোষণা করেন। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে ভারত প্রতিরক্ষা প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং তাহা নির্বিবাদে পাস হয়। কংগ্রেস আইনসভা বর্জন করে এবং অযথা ভারতকে যুদ্ধে টানিয়া লইবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের জন্য ন্যায়বিচার ও উত্তম আচরণের নিশ্চয়তা এবং ভারতে লীগের মতের বিরুদ্ধে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধন করা হইবে না এই শর্তে মুসলিম লীগ ব্রিটিশকে এই যুদ্ধে সমর্থন করিবার ওয়াদা করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের ওয়াদা

ভারতের জনসাধারণের নিকট ভাইসরয় একটি অঙ্গীকার করেন। তাঁহার বক্তব্যে তিনি ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন (Dominion Status) প্রদানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি স্বীকার করেন, যুদ্ধের পর ১৯৩৫ সালের এ্যাক্টে উল্লিখিত শাসনপ্রণালী পুনর্বিবেচনা করা হইবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, একটি নূতন সরকারের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য ব্রিটিশ সরকার অনেকগুলি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভায় মিলিত হইবে। ইহা পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেওয়া হয়—যে কোন নূতন শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের ন্যায় প্রত্যেকটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার যথাযথভাবে রক্ষা করা হইবে।

কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ শত্রুভাবাপন্ন। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ ইহার মন্ত্রিসভাগুলিকে পদত্যাগ করিতে বলিলে তাহারা পদত্যাগ করে। সেই সময় হইতে যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং যুদ্ধের প্রস্তুতির

কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পদত্যাগ

ব্যাপারে অংশগ্রহণ হইতে বিরত থাকে। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ ভারত সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে হিটলারি জার্মানির শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ক্ষমতা দুর্বল করিয়া দেয়। এই অনিশ্চয়তার একমাত্র সমাধান স্বাধীনতা বলিয়া কংগ্রেস মত প্রকাশ করে।

ইতোমধ্যে মুসলিম লীগ একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রস্তাব গ্রহণ করে। লীগ অতঃপর আরও জোরালো হইয়া উঠে। 'ব্রিটেনের যুদ্ধ' আরম্ভ হইবার ক্ষণপূর্বে ভারতের এই

১৯৪০ এর আগস্ট প্রস্তাব

অচলাবস্থার পরিসমাপ্তি করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার ইহার উল্লেখযোগ্য '১৯৪০-এর আগস্ট প্রস্তাব পেশ করে। নূতন দিল্লী হইতে এক বিবৃতির মাধ্যমে ভাইসরয় স্মরণ করাইয়া বলেন যে, বিগত অক্টোবর মাসে ব্রিটিশ সরকার স্পষ্ট

করিয়া ঘোষণা করে, ভারতে ইহার লক্ষ্য হইল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং ইহার অর্থ হইল "ব্রিটিশ কমনওয়েলথের স্বাধীন ও সমান অংশীদারিত্ব।" মুসলিম লীগের ভীতি দূর করিবার জন্য বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয় যে, "সংখ্যালঘুদের মতামতের উপর পুরাপুরি গুরুত্ব দেওয়া হইবে।"

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশের জয়লাভের ব্যাপক প্রত্যাশা ধূলিসাৎ হইয়া যায়। জাপানের দ্রুত জয়লাভ প্রশান্ত মহাসাগরে শক্তির ভারসাম্য সম্পূর্ণ উল্টাইয়া দেয়। জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশাল ব্রিটিশ, ফরাসি, ডাচ ও মার্কিন উপনিবেশসমূহ ছিনাইয়া লইবার হুমকি দেয়। এমনকি অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডেও তাহারা ভীতির সঞ্চার করে। ১৯৪২ সালের মে মাসের মধ্যে বার্মা জাপানিদের হাতে চলিয়া যায়। এমতাবস্থায় ব্রিটিশরা অনুধাবন করে যে, ভারতের ব্যাপারে একটা আপস করা এখন অপরিহার্য এবং কংগ্রেস ও লীগের সহযোগিতা ছাড়া তাহাদের বিপর্যয়ের সমূহ সম্ভাবনা। তদনুসারে ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে লর্ড প্রিভিসীল, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস এবং নিম্ন পরিষদের নেতাকে ভারতে পাঠান হয়। ২৯শে মার্চ তিনি শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ঘোষণা করেন, যাহার লক্ষ্য হইল একটি ডোমিনিয়ন বা উপরাজ্য যাহা যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য উপরাজ্যের ন্যায় একই চুক্তিতে ব্রিটিশ সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিবে, কিন্তু ইহাও অন্যান্যগুলির ন্যায় সমমর্যাদার হইবে এবং কোন প্রকারেই তাহার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতিতে কাহারও আনুগত্যের অধীন থাকিবে না। একটি ভারতীয় কমিটি নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে। সমস্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া দেশীয় করদ রাজ্যগুলি সেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করিবে। সেই খসড়া ঘোষণাপত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ব্রিটিশ ভারতের যে কোন প্রদেশের পক্ষে এই প্রস্তাবিত ঐক্যজোটে প্রবেশ না করিয়া স্বাধীনভাবে স্বীয় স্বাধীন সরকার গঠন করিবার অধিকার। এই নন-এক্সেসন বা ঐক্যজোটের অন্তর্ভুক্ত না হইবার অধিকারটি মুসলিম লীগের স্বাতন্ত্র্য নীতি উপশম করিবার জন্যই করা হয়। এই ঘোষণাপত্র এই কথাও উল্লেখ করে যে, ধর্মীয় ও বর্ণগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যাপারে ব্রিটেন ও ভারতীয় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হইতে হইবে। কিন্তু ক্রীপস প্রস্তাবাবলি যুদ্ধকালীন ভারতের শাসনতান্ত্রিক অবস্থার কোন বড় পরিবর্তন নাকচ করিয়া দেয়।

দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ পরাজয় ক্রিপস মিশন একটি নূতন ভারতীয় ঐক্যজোট গঠনের প্রস্তাব

কংগ্রেস এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে, কারণ এইগুলি দ্বারা অতি শীঘ্র ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইতেছে না। দ্বিতীয়ত ইহাতে প্রস্তাবিত নন-এক্সেসন বা কোন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত না হইবার এখতিয়ার ভারতের ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করিবার সামিল। অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিও এই প্রস্তাব নাকচ করিয়া দেয়। মুসলিম লীগ যুক্তি প্রদর্শন করে যে, 'নন-এক্সেসন' প্রস্তাবটি খুবই অস্পষ্ট। ভারতের স্বাধীন অঞ্চলের বিভক্ত করিবার কোন প্রস্তাব ইহাতে নাই এবং এই প্রস্তাবে একটি নূতন ভারতীয় ঐক্যজোট গঠনের উল্লেখ করা হইতেছে। সুতরাং লীগ ক্রীপস প্রস্তাব নাকচ করিয়া দেয়।

কংগ্রেস ও লীগ উভয় দল কর্তৃক ক্রীপস মিশন বাতিল

ক্রীপস মিশন ব্যর্থ হইবার কিছুদিন পর ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট কংগ্রেস 'ভারত ছাড় প্রস্তাব' (Quit India Resolution) গ্রহণ করে। কংগ্রেস ইহার গণ আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করিবার পূর্বেই ব্রিটিশ সমস্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে। তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। টেলিগ্রাফ তার কাটিয়া ফেলা হয়। রেল লাইন উপড়াইয়া ফেলা হয়। বিমান ঘাঁটির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ধ্বংস করা হয় এবং পোস্ট অফিস ও রেল স্টেশন জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এই ভারত ছাড় আন্দোলনে মুসলিম লীগের কোন করণীয় ছিল না। কারণ, তাহাদের মতে ইহার অর্থ হইল, ভারত হইতে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করত মুসলমানদিগকে হিন্দুদের দয়ার উপর রাখিয়া এই দেশে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। অতএব, কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মুসলমানদিগকে প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার মানিয়া লইতে লীগ অস্বীকার করে। জিন্নাহ অতঃপর তাঁহার প্রস্তাবিত পাকিস্তানের সঠিক সীমানা বর্ণনা করেন। তিনি পাঁচটি প্রদেশের উপর স্বীয় দাবি উত্থাপন করেন—বাংলাদেশ, আসাম, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের প্রশাসনিক জেলা।

কংগ্রেসের ভারত ছাড় প্রস্তাব

১৯৪৫ সালের জুন মাসে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ইংল্যান্ড হইতে একটি প্রস্তাব লইয়া প্রত্যাবর্তন করেন এবং ভারতের বিভিন্ন দলের বাইশ জন প্রতিনিধিকে সিমলায় এক অধিবেশনে আমন্ত্রণ করেন। এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য হইল, ক্রীপস প্রস্তাব অনুসারে একটি নূতন কার্যনির্বাহী সভা গঠন করা। ভাইসরয় ভারতের প্রধান প্রধান দলসমূহ হইতে এক-একজন মনোনীত ব্যক্তিদের তালিকা পেশ করিবার জন্য বলেন, যাহাতে কার্যনির্বাহী সভা পুনর্গঠিত করিবার জন্য তিনি ঐ তালিকা হইতে সদস্য গ্রহণ করিতে পারেন। মুসলিম লীগ ব্যতীত সব দলই তাহাদের তালিকা পেশ করে। জিন্নাহ এই নীতি প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, তিনি দাবি করেন যে, সভায় নিযুক্ত সমস্ত মুসলমানকে মুসলিম লীগের সদস্য হইতে হইবে। অথচ কংগ্রেস ইহার দুইজন মুসলিম সদস্যকে মনোনয়ন দিয়া তাঁহাদিগকে ইহার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রাখিবার উপর জোর দেয়। জিন্নাহ আরও উল্লেখ করেন, মুসলিম-হিন্দু সংখ্যাসাম্য যথেষ্ট নহে। তাঁহার যুক্তি হইল, অন্যান্য মনোনীত সংখ্যালঘু সদস্যগণ কোন কোন সময় বর্ণ হিন্দুদের পক্ষে ভোট দিয়া লীগ মনোনীত সদস্যদিগকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করিবে। সর্বশেষে তিনি দাবি করেন যে, পাকিস্তানের প্রস্তাব স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, লীগ ওয়াভেল পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে পাকিস্তান প্রস্তাব বাক্সে পড়িয়া থাকিবে এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য ঠাণ্ডা ঘরে রাখা হইবে। সিমলা অধিবেশন জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলিতে থাকে এবং অতঃপর ওয়াভেল অনিচ্ছার সঙ্গে ইহার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সিমলা অধিবেশন (১৯৪৫)

ইতোমধ্যে ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে গ্রেট ব্রিটেনের জাতীয় নির্বাচনে শ্রমিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ডিসেম্বর মাসে সরকার ঘোষণা করে, ভারতের অবস্থা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করিয়া ব্রিটিশ পার্লামেন্টে রিপোর্ট প্রদান করিবার জন্য একটি পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদল শীঘ্রই ভারত সফর করিবে। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে গ্রেট ব্রিটেনকে একমাত্র শত্রু বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা বড় বড় নগরের রাজপথে মাঝে মাঝে মিছিল করিয়া ব্রিটিশদের

অপমান করিতে থাকে। ১৯৪৬ সালের প্রথমদিকে হরতাল, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। অনেক জায়গায় অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং পাঁচদিন ধরিয়া দাঙ্গা চলিতে থাকে। ততোধিক সাংঘাতিক ছিল বোম্বাইয়ের (মুম্বাইয়ে) ভারতীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহ। নৌবাহিনীর ধর্মঘট অন্যান্য বন্দরনগরীগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে এবং ইহা ছাড়াও অনেক শহরে পুলিশ বাহিনীও ধর্মঘট করে। ভারতীয় উপমহাদেশকে একরূপ বিদ্রোহ কবলিত বলিয়া মনে হয়। লীগ-কংগ্রেস মতবিরোধও ভয়ংকর অবস্থার সম্মুখীন হয়। ভারতের নির্বাচনে প্রাদেশিক আইন পরিষদের ৪৪১টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৪২৫টি আসন লীগের হাতে আসে এবং কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে সবগুলি মুসলিম আসনে লীগ জয়ী হয়। অবশিষ্ট সাধারণ আসনগুলির সবগুলিতেই কংগ্রেস জয়ী হয়। এই নির্বাচন প্রমাণ করে, ভারতে মাত্র দুইটি প্রধান দল বর্তমান। এই আইন পরিষদের নূতন অধিবেশনেই জিন্নাহ গৃহযুদ্ধের হুমকি প্রদর্শন করিয়া একটি জোরালো বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি ইহাও ঘোষণা করেন যে, দেশ বিভক্তিই একমাত্র সমাধান। তিনি ইহাও ঘোষণা করেন, সর্বপ্রথম ব্রিটিশ ও কংগ্রেসকে পাকিস্তান দিয়া দিতে হইবে। তিনি সতর্ক করিয়া দেনঃ "একমাত্র মুসলমানদের মৃতদেহের উপর দিয়াই উত্তর প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস দলের পতাকা উড়িবে।"[১]

উপমহাদেশে হাঙ্গামা

ভারতের ভয়াবহ পরিস্থিতি সমাধানকল্পে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ মন্ত্রিমিশন (British Cabinet Mission) এই দেশে আসে। এই মিশনে ছিলেন লর্ড প্যাথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস এবং এ. ভি. আলেকজান্ডার প্রমুখ ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য-বৃন্দ। এই প্রচেষ্টা বিদ্রোহী মনোভাবকে প্রশমিত করে এবং ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে কাজ করিবার সময় ইহা প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি মানিয়া চলিতে উৎসাহ প্রদান করে। এই মিশন সিমলায় একটি ত্রিদলীয় সম্মেলন আহ্বান করে। উক্ত সম্মেলনে কংগ্রেস ও লীগ একে অপরের সঙ্গে প্রচণ্ড বিতর্কে লিপ্ত হয়। কংগ্রেস দল একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার, গ্রেট ব্রিটেন কর্তৃক অবিলম্বে সকল ক্ষমতা ত্যাগ এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন সার্বভৌম ভারতীয় সরকারের নিকট অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানায়। সেই সরকারে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সীমিত থাকিবে। ব্রিটেনের নিকট লীগের দাবি ছিল, "আপনারা বিভক্ত করিয়া দিন এবং তারপর এই দেশ ত্যাগ করুন।" অথচ কংগ্রেস বাস্তবপক্ষে ব্রিটেনকে বলিতেছে, "আপনারা এই দেশ ত্যাগ করুন এবং তারপর আমরা বিভক্ত করিব।" দুই দলের মধ্যে কোন আপোসই সম্ভব হইতেছে না বিধায় সম্মেলনও ব্যর্থ হয়।

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা (১৯৪৬)

ত্রিদলীয় সম্মেলন ব্যর্থ হইলে মন্ত্রিমিশন স্বয়ং একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, এবং ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে ইহা ঘোষণা করা হয়। সাতশত মাইলের ব্যবধানের দরুন পাকিস্তানের বাস্তবতা নাকচ করিয়া দিয়া মিশন এমন একটি পরিকল্পনা পেশ করে, যাহা ভারতের ঐক্য বজায় রাখে এবং তৎসঙ্গে লীগের ইচ্ছানুযায়ী মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা স্বীকার করা হয়। এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়া বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা। ইহা ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ এবং করদরাজ্যগুলি লইয়া গঠিত হইবে। একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ

দফতরসমূহের ক্ষমতা থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত ক্ষমতা প্রদেশ ও করদরাজ্যগুলির হাতে থাকিবে। এই পরিকল্পনা প্রদেশসমূহকে কতকগুলি স্বায়ত্তশাসিত গ্রুপে বিভক্ত করে; যথা— গ গ্রুপে থাকিবে বাংলাদেশ ও আসাম, খ গ্রুপে থাকিবে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও সিন্ধু এবং অবশিষ্ট প্রদেশসমূহ থাকিবে ক গ্রুপে। যদি কোন প্রদেশ সুবিধানুসারে অন্য কোন গ্রুপে যাইতে চায় বা এই জোট হইতে বাহির হইতে চায়, তবে সেই সুযোগ দিবার ব্যবস্থাও পরিকল্পনায় রাখা হয়। প্রাদেশিক ও করদরাজ্যগুলির আইন পরিষদ হইতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচিত ২৯৬ জন সদস্য ও করদরাজ্যগুলির সদস্য সম্বলিত একটি গণপরিষদ এই রাষ্ট্রজোটের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে। তিনটি প্রাদেশিক গ্রুপের প্রতিনিধিবৃন্দ পৃথকভাবে মিলিত হইয়া প্রত্যেক গ্রুপের প্রদেশসমূহের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে। বিভিন্ন গ্রুপের নেতৃবৃন্দ হইতে সদস্য লইয়া ভাইসরয়ের কার্য নির্বাহী কমিটিকে পরিবর্তন করিয়া একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠনের জন্য এই পরিকল্পনা সুপারিশ করে। তবে শর্ত থাকে, পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যাইতে চাহিলে মূল পরিকল্পনাও গ্রহণ করিতে হইবে।

ব্রিটিশ মন্ত্রিমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা

১৯৪৬ সালের ৬ই জুন বেশ গাম্ভীর্য সহকারে মুসলিম লীগ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কংগ্রেসও মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করে, কিন্তু কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রত্যাখ্যান করে। মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনার ব্যাখ্যা লইয়াও মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস দল প্রত্যাখ্যান করিলেও সরকার লীগ সদস্যদিগকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করিবার অনুমতি দেয় নাই। ১৯৪৬ সালের ৬ই জুলাই কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরু শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে ঘোষণা করেন—"সেখানে (গণপরিষদে) আমরা যাহা করি, তাহা নির্ধারণ করিবার ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমরা কোন ব্যাপারে কাহারও নিকট দায়বদ্ধ নই।" অন্য একজন কংগ্রেস নেতা, মাওলানা আজাদ এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন—"গণপরিষদ যখন অধিবেশনে বসিবে, তখন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে ইহার হাতে শৃঙ্খলহীন অধিকার থাকিবে। ইহা হইবে সার্বভৌম, এবং একটি ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের জন্য ইহা আইন প্রণয়ন করিবে; বিভক্ত ভারতবর্ষের জন্য নহে।" এই সমস্ত উক্তি মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করিয়া দেয়। মুসলিম লীগ ১৬ই আগস্টকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' (Direct Action Day) বলিয়া ঘোষণা করে এবং কংগ্রেস ও ব্রিটিশ উভয়ের বিরুদ্ধে মুসলমানরা হরতাল পালন করে। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে কলিকাতায় দাঙ্গা আরম্ভ হয়। এই দাঙ্গা চারিদিন ধরিয়া চলিতে থাকে এবং ইহাকে আধুনিক ভারতের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলিয়া অভিহিত করা হয়। তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলিকাতার দাঙ্গা শীঘ্রই দমন করেন। শেষ পর্যন্ত ইহা পূর্ব বাংলা, বিহার এবং পাঞ্জাবে ছড়াইয়া পড়ে। এই দাঙ্গায় ১২০০০ লোক প্রাণ হারায়।

ইতোমধ্যে ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নেহরু অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেন এবং লীগও শেষ পর্যন্ত ইহাতে যোগদান করে। কিন্তু পূর্বের ন্যায় লীগ-কংগ্রেস কোন্দল অব্যাহত থাকে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও শিখ প্রতিনিধি দলকে

লন্ডনে আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু সেই আলোচনাও ব্যর্থ হয়। অতঃপর ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৮ সালের জুন মাসে উপমহাদেশ ত্যাগ করিবার ঘোষণা প্রদান করে। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে এই দেশের ক্ষমতা ব্রিটিশদের হাত হইতে ভারতীয়দের হাতে হস্তান্তর করিবার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত করিয়া পাঠান হয়। মাউন্ট ব্যাটেন এই দেশের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া লন্ডনে যান এবং মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবার কারণ ব্যাখ্যা করেন। ১৯৪৭-এর জুন মাসে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং একটি বেতার ভাষণের মাধ্যমে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন যে, ভারতের রাজনৈতিক অখণ্ডতা রক্ষা করিবার কোন পরিকল্পনাই গ্রহণীয় নহে। এই স্থবির অবস্থার একমাত্র সমাধান হইল ব্রিটিশ শক্তি কর্তৃক দুইটি সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর। উভয় সরকারই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন (Dominion Status) লাভ করিবে। এই নূতন ব্যবস্থার প্রকৃত পন্থাগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

১। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে একটি পৃথক ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য গঠন করিতে দেওয়া হইবে। এই উদ্দেশ্যে একটি নূতন গণপরিষদ গঠন করা হইবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের আইন পরিষদসমূহের হিন্দু সংখ্যাগুরু জেলাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ ইচ্ছা করিলে ঐ প্রদেশগুলিকে বিভক্ত করা হইবে।

২। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের জনসাধারণ পাকিস্তানে যোগদান করিতে চায় কিনা, তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য তথায় গণভোট গ্রহণ করা হইবে।

৩। গণভোটের মাধ্যমে জনসাধারণের মতামত যাচাই করিয়া সিলেট জেলাকে বাংলাদেশের মুসলিম অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে।

৪। বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের হিন্দু ও মুসলিম প্রদেশসমূহের সীমানা নির্ধারণ করিবার জন্য একটি সীমানা নির্ধারক কমিশন গঠন করা হইবে।

৫। পার্লামেন্টের চলতি অধিবেশনে ভারতকে শীঘ্রই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দান করিবার জন্য (বা বিভক্তিকরণের সিদ্ধান্ত হইলে উভয় দেশকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দান করিবার জন্য) একটি আইন প্রণয়ন করা হইবে। এই আইন গণপরিষদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিবে না।

৬। প্রত্যেক করদরাজ্যের হাতে তিনটি বিকল্প প্রদান করা হয়—পাকিস্তানের সহিত যোগদান করা, অথবা ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে যোগদান করা বা কাহারও সঙ্গে যোগ না দিয়া একাকী স্বাধীন থাকিবার ব্যবস্থা করা।

১৯৪৭ সালের ৪ঠা জুলাই 'ভারত স্বাধীন' প্রস্তাবটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপিত হইলে উহা তৎক্ষণাৎ পাস হইয়া যায়। ১৫ই আগস্ট দুইটি ডোমিনিয়ন বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসিত দেশের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাবটি ১৮ই জুলাই আইনে পরিণত হয়। ১৪ই আগস্টের মধ্যরাত্রিতে পাকিস্তান ও ভারত ইউনিয়নের জন্য স্বাধীনতা বাস্তবে পরিণত হয়। ভারত ইউনিয়নের রাজধানী নয়াদিল্লীতে এবং পাকিস্তানের রাজধানী করাচীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয়। ১৫ই আগস্ট ভারত ইউনিয়নের নূতন ডোমিনিয়নের গভর্নর জেনারেল হিসাবে লর্ড মাউন্টব্যাটেন শপথ গ্রহণ করেন এবং পণ্ডিত নেহরু ইহার প্রধানমন্ত্রী

হন। ১৪ই আগস্ট করাচীতে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন এবং রানা লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

পাদটীকা

১। Only over the dead bodies of Muslims will the Congress Party flag fly in the Northern Provinces.—M. A. Jinnah.

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

W. Wallbank : *A Short History of India and Pakistan.*

Ian Stephen : *Pakistan*

A. Aziz : *Discovery of Pakistan*

Symond : *Making of Pakistan*

Moulana Azad : *India Wins Freedom.*

Aslam Siddiqi : *Pakistan Seeks Security*

P. Spear : *India, Pakistan and the West.*

ইনাম উল হক : ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন।

নবম অধ্যায়
বিশ্ব রাজনীতিতে পাকিস্তান

স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা বিশ্ব ইতিহাসের একটি সুকঠিন ও ভয়াবহ যুগের সঙ্গে মিলিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার জাতিসমূহের শৈশব যেরূপ মোটামুটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ আবৃত অবস্থায় কাটিয়াছে, এই সমস্ত এশিয়ান রাষ্ট্রের শৈশব অনুরূপভাবে কাটে নাই। ১৯৪৭ সালে জন্মলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত রাষ্ট্র বিশাল বিপ্লবীশক্তি ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কেন্দ্রস্থলে নিক্ষিপ্ত হয়। নূতন জাতীয়তার প্রথম যুগেই ভারত ও পাকিস্তান শীতল যুদ্ধের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হইয়া পড়ে। ক্রমবর্ধমান শক্তি কমিউনিস্ট চীনের অস্পষ্ট উদ্দেশ্য এবং কোরিয়ার যুদ্ধ, তৎসঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের গোলযোগ ও অনিশ্চয়তা এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ঘরোয়া সমস্যাবলি ও জাতীয় ঐক্য সংরক্ষণে ব্যস্ত ভারত ও পাকিস্তান গভীরভাবে শান্তি ও এশিয়ার সাধারণ স্থিতি কামনা করে।

আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা চুক্তিতে অংশগ্রহণ ঃ

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের চাইতে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য হয়। তাহার নিকট প্রতিবেশীর ন্যায় সমান সম্পদ, শিল্প কারখানা, জনসম্পদ ও ভূখণ্ড নাই। ভারতের ন্যায় বিশ্ব কূটনীতিতে সে এক স্বাধীন নীতি গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হয়, যে নীতিতে সবার বন্ধু ও সবার খাতক হওয়া যায়। পাকিস্তান গোড়াতেই খুবই নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করে। উত্তর দিকে সে রাশিয়ার ন্যায় এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার গুরুভার উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। অধিকন্তু ১৯৪৭ সাল হইতে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে কোন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে নাই। বিভিন্ন উপলক্ষে দুই দেশ যুদ্ধের মুখোমুখি হইয়া দাঁড়ায়। কাশ্মীর সীমান্তে দুই দেশের নিয়মিত সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রায় এক বৎসর পর্যন্ত অঘোষিত যুদ্ধ চলিতে থাকে। অতএব পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি তিনটি লক্ষ্য সামনে রাখিয়া রচিত হয়—(১) যে কোন আক্রমণ হইতে নিরাপত্তা, যাহা উত্তর দিক হইতেও আসিতে পারে, (২) যুদ্ধ বাধিলে তাহার চাইতে শক্তিশালী প্রতিবেশী ভারতের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিরক্ষা শক্তি অর্জন এবং (৩) নিঃসন্দেহে কাশ্মীরের ব্যাপারে দরকষাকষির ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে উত্তম অবস্থা লাভ করা।

বিশ্ব রাজনীতিতে পাকিস্তানের অসুবিধা
পাকিস্তানে বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য

স্বাধীনতার পর মনে হইল, পাকিস্তান ভারতের ন্যায় জোট নিরপেক্ষ (Non-Alignment) বৈদেশিক নীতিই গ্রহণ করিবে। পাকিস্তানের তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৯৫০ সালে রাশিয়া সফরের একটি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কিন্তু তৎপরিবর্তে তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সফর করেন। বাহ্যত কাশ্মীরের ব্যাপারে সম্ভাব্য রুশ বন্ধুত্বের কৌশল ব্যবহার করিয়া প্রধানমন্ত্রী পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের উপর চাপ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯৫২ সালের দিকে পরিষ্কারভাবে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, রাশিয়া কাশ্মীর বিরোধে স্পষ্টভাবে ভারতের পক্ষ অবলম্বন করিতেছে। এই সময় হইতে পাকিস্তান জোট নিরপেক্ষ নীতির পথ ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সহিত, বিশেষ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পথ ধরে।

পাকিস্তান কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত হয়

পাক-তুরস্ক মৈত্রী (Turko-Pak Alliance) ঃ ১৯৫৪ সালের ২রা এপ্রিল পাকিস্তান ও তুরস্ক উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার জন্য করাচীতে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। "তুরস্ক ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে উভয় দেশের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে পরামর্শ ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি হিসাবে" এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই ঘোষণায় "রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা এবং স্বীয় স্বার্থে ও শান্তিপ্রিয় দেশগুলির স্বার্থে শান্তি ও নিরাপত্তা জোরদার করিবার নিমিত্ত বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিবার আগ্রহ পরীক্ষা করিবার কথা" ব্যক্ত করা হয়। আগ্রাসী দেশের দুর্দমনীয় বিপদের মুখে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে তুরস্ক ও পাকিস্তান এই চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তি পাক-তুরস্ক পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি (Turko-Pakistan Mutual Assistance Pact) নামে পরিচিত।

নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রচেষ্টা

পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি (Pak-U.S. Arms Aid Pact) ঃ ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক নিরাপত্তা আইনের অধীনে পাকিস্তান সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করে। এই সাহায্যের উদ্দেশ্য ছিল—(১) প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধি করা, (২) উচ্চ ও শক্তিশালী স্থায়িত্ব অর্জন করা এবং (৩) জাতিসংঘ সনদের আওতায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ১৯৫৪ সালের ১৯শে মে পাক সেনাবাহিনীর সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণের সহায়তাকল্পে পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সহায়ক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। সিদ্ধান্ত লওয়া হয়, পাকিস্তান এই সহায়তা শুধুমাত্র তাহার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, তাহার ন্যায়সঙ্গত আত্মরক্ষা বা আঞ্চলিক প্রতিরক্ষাকল্পে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুমতি দান করিবে বা জাতিসংঘের সম্মিলিত নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবে, এবং পাকিস্তান এই অস্ত্রের সাহায্যে অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কাজে লিপ্ত হইবে না। এই চুক্তির অধীনে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে যথেষ্ট পরিমাণ সামরিক অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করে। কোন কোন হিসাব অনুযায়ী পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাজেটের শতকরা পঞ্চাশ ভাগই যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রদান করা হয়।

চুক্তির উদ্দেশ্য পাক সেনাবাহিনী পুনর্গঠন

বাগদাদ চুক্তি (পরবর্তী সেন্টো) (CENTO) ঃ ১৯৫৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি রাত্রিবেলা তুরস্ক ও ইরাক ইরানে বসিয়া তুরস্ক-ইরাক চুক্তি বা বাগদাদ চুক্তি নামে একটি

প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদন করে। বাগদাদ চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় একটি পরিষদ, সামরিক কমিটি, সামরিক উপ-পরিষদ, সামরিক পরিকল্পনা গ্রুপ, অর্থনৈতিক বিশেষ কমিটি, বিভিন্ন উপ-পরিষদ ও কার্যনির্বাহী দলসমূহ, বাগদাদ চুক্তি আণবিক কেন্দ্র, ধ্বংসাত্মক কার্য বিরোধী কমিটি, যোগাযোগ কমিটি ইত্যাদি। এই চুক্তিটিকে আরব লীগের যে কোন সদস্য রাষ্ট্র বা মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা ও শান্তির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট যে কোন রাষ্ট্রের সদস্যপদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। তবে সেই রাষ্ট্র চুক্তির উভয় মৌলিক স্বাক্ষরকারী দ্বারা স্বীকৃত হইতে হইবে। যুক্তরাজ্য, পাকিস্তান ও ইরান ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই চুক্তিতে যোগদান করে। এই চুক্তির প্রথম উপাদানে বলা হয়—"সদস্য রাষ্ট্রসমূহ পারস্পরিক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষায় সহযোগিতা করিবে। সহযোগিতার ভিত্তিতে যে পন্থা অবলম্বন করিবার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়, তাহা অন্যের সাথে বিশেষ চুক্তির বিষয়ে পরিণত হইতে পারে।"

চুক্তির গঠনতন্ত্র

১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের যোগদান

পাকিস্তানের এই চুক্তিতে যোগদান পাশ্চাত্য জগতে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়, কিন্তু অপরদিকে সে জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রবর্গের নিকট তাহার সম্মান হারায়। পাকিস্তানকে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। পাকিস্তানের জনগণও এই চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে নাই। এই চুক্তি রাশিয়ার ন্যায় মহাশক্তিসম্পন্ন প্রতিবেশীকে পাকিস্তানের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন করিয়া তোলে। ইহার ফলে পাকিস্তান জাতিসংঘে কাশ্মীরের মামলায় পরাজিত হয়। কারণ, পাকিস্তানের পশ্চিমা বন্ধুবর্গ তাহাকে ভারতের বন্ধু রাশিয়ার ন্যায় সমর্থন প্রদান করে নাই।

প্রতিক্রিয়া

১৯৫৮ সালের জুলাই বিপ্লবের পর ইরাক এই চুক্তির বিভিন্ন ফোরামে অংশগ্রহণ হইতে বিরত থাকে এবং ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে সে এই চুক্তি হইতে বাহির হইয়া আসে। ১৯৫৯ সালের ২১শে আগস্ট এই চুক্তিকে 'সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন' (Central Treaty Organization) নামে নূতন নামকরণ করা হয়। ইতোমধ্যে ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে ইহার সদর দফতর বাগদাদ হইতে আংকারায় স্থানান্তরিত হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা (S.E.A.T.O) ঃ ১৯৫৪ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, ফিলিপিন্স, থাইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে এই চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তিসংস্থায় একটি পরিষদ ও একটি সচিবালয়ের ব্যবস্থা করা হয়। স্বাক্ষরকারী দেশের কোন একটির উপর কোন বহিরাগত আক্রমণ হইলে বা কোন অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দিলে এই আটটি রাষ্ট্র সম্মিলিত কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে সম্মত হয়। অর্থনৈতিক বিষয়ে সহযোগিতা করিতেও তাহারা সম্মত হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চাইতে সামরিক ও কমিউনিস্ট বিরোধী কার্যকলাপের উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১৯৫৪

এই চুক্তিও পাকিস্তানের জনসাধারণ ও কমিউনিস্ট বিশ্ব কর্তৃক কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়। একজন পাকিস্তানির উক্তি অনুসারে, এই সমস্ত চুক্তি ও সন্ধির দ্বারা তাহাকে অযথা কমিউনিস্ট বিশ্বের শত্রুতায় টানিয়া আনা হইয়াছে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক ইতিহাসে ইহা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সমস্ত চুক্তির মাধ্যমে পাক সেনাবাহিনী সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইবার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে। এই কথা

প্রতিক্রিয়া

স্মরণ রাখিতে হইবে, বর্তমান বিশ্বে কোন জাতি শুধু তাহার অসহায় অবস্থা ও নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে না। সামরিক শক্তি এবং শান্তিকামী দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, কিন্তু সতর্ক সহযোগিতার দ্বারা শান্তি রক্ষা করিতে হইবে।

গুরুত্বপূর্ণ কাশ্মীর প্রশ্নে অনেক হতাশার পর পাকিস্তান বুঝিতে পারে, এই ব্যাপারে ভারতের জড়িত থাকার দরুন তাহার পশ্চিমা বন্ধুবর্গ তাহাকে সাহায্য করিবে না। এইভাবে ১৯৫৮ সালের পর হইতে পাকিস্তান তাহার পশ্চিমা ঘেঁষা বৈদেশিক নীতি হইতে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বের নীতিতে পরিবর্তন করে। নীতির এই পরিবর্তনের ফলে পাকিস্তান কমিউনিস্ট মহলের বড় বন্ধুতে পরিণত হয়। কমিউনিস্ট মহল পাকিস্তানকে প্রতিরক্ষার অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও কৌশলী-বিশেষজ্ঞ দিয়া সাহায্য করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা এবং সেন্টো চুক্তি হইতে বহির্গত না হইয়াও পাকিস্তান চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে ভাল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হয়।

পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির পরিবর্তন

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

Ian Stephen : *Pakistan*

Aslam Siddiqui : *Pakistan Seeks Security*

Percival Spear : *India, Pakistan and the West*

S.M. Ikram : *Modern Muslim India and the Birth of Pakistan.*

Rushbrook Williams : *The State of Pakistan*

W. Wallbank : *A Short History of India and Pakistan.*

দশম অধ্যায়
স্বাধীনতার পর পাকিস্তান

১৯৪৭ সালের পরবর্তী উপমহাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র খুলিলে দেখা যায়, বিশাল ভারত ইউনিয়ন মধ্যখানে থাকিয়া পাকিস্তানকে দুইটি বাহুতে বিভক্ত করিয়াছে— একটি বাহু উত্তর-পশ্চিমে আর একটি বাহু পূর্বে। বৃহদায়তন পশ্চিম পাকিস্তানের অংশে পড়িয়াছে তিন লক্ষ বর্গমাইল এলাকা, যাহার জনসংখ্যা তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ।

আয়তন

সিন্ধু নদীর উপত্যকা ও ইহার শাখা-প্রশাখা ভারত মহাসাগরের সমুদ্র উপকূল বিধৌত করিয়া উত্তর ভারতের বিশাল পার্বত্য প্রাচীরের ঢালু পর্যন্ত বিস্তৃত। এই এলাকা সাধারণত শুষ্ক। উদাহরণ স্বরূপ সিন্ধু প্রদেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের হার গড়ে ৮ ইঞ্চি মাত্র। তবে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক জলসেচের ব্যবস্থা বিদ্যমান। জলসেচ ব্যবস্থা এই শুষ্ক ও মরুভূমি এলাকার কোন কোন অংশকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষি উৎপাদন এলাকায় পরিণত করিয়াছে।

পশ্চিম পাকিস্তান

প্রধানত বাংলাদেশের পূর্ব অঞ্চল বা অতীতের পূর্ববঙ্গ লইয়া গঠিত পূর্ব পাকিস্তান ভৌগোলিক, স্থান-বিবরণ ও জলবায়ুর দিক হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। অসংখ্য খাল ও নদী বিশেষত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী দ্বারা বেষ্টিত ৫৩,০০০ বর্গমাইল পলিমাটির এই সমতল অঞ্চল গভীর উষ্ণ বন বিশিষ্ট ও আর্দ্র। এই দেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাত গড়ে ৭৫ ইঞ্চি হইতে ১৬০ ইঞ্চি পর্যন্ত। প্রচুর চাউল উৎপাদনকারী ও বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাট রপ্তানিকারী পূর্ব পাকিস্তান খুবই উর্বর এলাকা। ইহা ঘন বসতিপূর্ণ এবং লোকসংখ্যা ১৯৪৭ সালে চারি কোটি ষাট লক্ষ। লোক বসতি কোন কোন অঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলে ১,২০০ জন।

পূর্ব পাকিস্তান

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্
প্রথম গভর্নর-জেনারেল (১৯৪৭-১৯৪৮)

স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তানের অবস্থা ঃ

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় পাকিস্তানিগণ তাহাদের নূতন দেশের জন্য এক বিশাল অঞ্চল লাভ করে, কিন্তু তাহাদের নূতন রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী কাঠামো লাভ করে নাই। এই প্রয়োজনীয়তা তাহাদিগকে রাতারাতি পূরণ করিতে হয়। ব্রিটিশ ভারতের

পাকিস্তানিরা শূন্য হাতে অফিসে আসে
তাঁবুতে প্রতিষ্ঠিত সরকারি দফতর

পুরাতন রাজধানী নয়াদিল্লী ইহার বৃহৎ সরকারি ভবন এবং অসংখ্য অফিস ও উহাদের কর্মচারীবৃন্দ সমেত ভারত ইউনিয়েনের ভাগে পড়ে। সিন্ধু প্রদেশের প্রধান নগরী এবং সমুদ্র বন্দর করাচীকে পাকিস্তানের রাজধানী হিসাবে লওয়া হয়। এই নূতন রাজধানীতে তাঁবু ও ব্যারাকের মধ্যে বিভিন্ন অফিস ও দফতর বসানো হয়। ইতোমধ্যে নূতন দিল্লী হইতে ২৫,০০০ সরকারি কর্মচারীদের এক বহর পরিবার-পরিজন ও তৈজসপত্র লইয়া করাচীতে আশ্রয় লয়। এই স্থানান্তরের সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতে ব্যাপক দাঙ্গা ও রেল লাইনচ্যুতির ঘটনা ঘটে। পাকিস্তান সরকার সমূহ-অসুবিধার মধ্য দিয়া উহার সিভিল সার্ভিসের বিরাট অংশকে নূতন রাজধানীতে স্থানান্তর করিতে সক্ষম হয়। করাচী পৌঁছিয়া এই সমস্ত স্থানান্তরিত কর্মাধ্যক্ষবৃন্দ নিজদিগকে তাঁবু কিংবা অস্থায়ী ভবনে প্রতিষ্ঠা করেন। বাজার হইতে ক্রীত অমসৃণ টেবিল হইল ডেস্ক, বাক্স হইল তাহাদের চেয়ার এবং প্যাকিং ঠোঙ্গা হইল তাহাদের ফাইল। এইরূপ কোন প্রকারে প্রয়োজনীয় দলিলের ফাইল প্রস্তুত করা হয়। সরকারি বিভাগসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং শাসন কার্য চালু করা হয়।

শত শত ব্রিটিশ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অফিসারগণ করাচীতে আগমনের সময় পুরাতন অবিভক্ত ভারতের তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি ও সমস্ত দেনার অংশও সঙ্গে লইয়া আসেন। যুদ্ধ সামগ্রীর কিছু অংশও শর্ত অনুসারে পাকিস্তানের নিকট আসিবার কথা। মোট ৪,২০,০০০ ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যের মধ্যে ১,৫০,০০০ সৈন্য পাকিস্তানের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সাবেক ভারতের সহায় সম্পত্তির পাকাপাকি ভাগ বাটোয়ারার আয়োজন সমাপ্ত হয়। পাক-ভারতের নিকট যুক্তরাজ্যের ঋণের শতকরা ১৭.৫ ভাগ পাকিস্তানের অংশে আসে। অবিভক্ত ভারতের নগদ টাকার অনুরূপ এক ভাগ এবং একই হারের ঋণও পাকিস্তানের ভাগে আসে।

সম্পত্তি দেনা

স্বাধীনতা দিবসে দেখা যায়, পাকিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসার ও সামরিক বিভাগে বিশেষজ্ঞের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। তাই ব্রিটিশ অফিসারদিগকে এদেশে থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করা হয়। চারিটি প্রদেশের তিনটিতেই ব্রিটিশ অফিসারদিগকে গভর্নর হিসাবে বহাল রাখা হয় এবং করাচীতে ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্টদিগকে স্থায়ী সচিব রূপে চারিটি দফতরের অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। অনেক ব্রিটিশ অফিসারদের পাক সেনাবাহিনীতে বহাল রাখা হয় এবং ১৯৪৯ সালের প্রথম ভাগে পর্যন্তও সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর প্রধান সেনাপতিগণ ছিলেন ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী। তাহা ছাড়াও পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীতে প্রায় ৭৫০ জন ছিলেন ব্রিটিশ অফিসার ও কৌশলী বিশেষজ্ঞগণ।

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ প্রশাসকের অভাব ব্রিটিশ অফিসার বহাল

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস করা ভারত স্বাধীন আইন অনুযায়ী ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (India Act 1935) অনুসারে পাকিস্তানের শাসনকার্য চালাইবার কথা। একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচনাকাল পর্যন্ত এবং ব্রিটিশ আধিপত্য অবশ্যই নাকচ হইয়া যাওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান ১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে শাসিত হইবে। করাচীর আইন সভা ছিল প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহ হইতে বাছিয়া লওয়া ৭০ সদস্য বিশিষ্ট গণপরিষদ। মন্ত্রিসভার দায়িত্বের প্রথানুযায়ী গঠিত করাচীর মন্ত্রিসভা ফেডারেল আইন সভার ইচ্ছাধীন ছিল। যেহেতু ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অধীনে পাকিস্তান ছিল

গণপরিষদ
করদ রাজ্য

একটি ডোমিনিয়ন, সুতরাং পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি পাক মন্ত্রিসভা কর্তৃক মনোনীত হন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হন। ফেডারেল রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান চারিটি গভর্নর শাসিত প্রদেশে বিভক্ত (পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পূর্ব বাংলা)। নিম্নলিখিত করদ রাজ্যসমূহ এই নূতন রাষ্ট্রে যোগদান করিতে উদ্যোগ নেয় ঃ বাহওয়ালপুর, খয়েরপুর; চারিটি এস্টেট যেগুলির দ্বারা পরে বেলুচিস্তান স্টেট ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছিল; এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গোত্রীয় রাষ্ট্রসমূহ। এই সমস্ত রাষ্ট্রের মোট আয়তন ১,১৮,০০০ বর্গমাইল। জুনাগড় ও উহার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি ছোট ছোট রাষ্ট্র, যথা মানভাদর প্রথমে পাকিস্তানে যোগদান করে কিন্তু পরে ভারত ইউনিয়ন ঐগুলিকে জোর পূর্বক ছিনাইয়া লয়। পূর্বতন ব্রিটিশ বাংলাদেশকে বিভক্ত করা হয় এবং পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অংশে পড়ে। ঢাকাকে পূর্ব বাংলার রাজধানী ও ইহাকে পাকিস্তানের পূর্ব শাখা করিয়া একটি প্রদেশে রূপান্তরিত করা হয়। পূর্ব-পাকিস্তানেও অসংখ্য মোহাজের ভারত হইতে চলিয়া আসে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীর সদর দফতর ঢাকায় একটি বালিকা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিতে হয়। বাস্তুত্যাগী চাকুরি-জীবীদের জন্য কোন আসবাবপত্র, ফাইল এবং থাকিবার জন্য কোন বাসস্থান ছিল না। অভ্যাগত অধিকাংশ আই. সি. এস. অফিসারদিগকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়োগ করা হয়।

স্বাধীন জীবন আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান অনেক গুরুতর সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হইল, ইহার সম্পূর্ণ পৃথক দুই অংশের জনসাধারণ প্রধানত মুসলমান, কিন্তু তাহারা একাধিক ভাষায় কথা বলে এবং বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থায় লালিত-পালিত। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রধানত তিন জাতীয় লোকের বাস; সিন্ধী, পাঞ্জাবি ও পাঠান। পরবর্তী দুই জাতীয় লোকের মধ্যে মতের মিল খুবই কম। ত্রিশ লক্ষের চাইতে কিছু অধিক পসতু-ভাষী পাঠানদের এই লোকসংখ্যা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গোত্রীয় জেলাগুলোতে এক দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করে। এই সমস্ত অস্থির, যুদ্ধপ্রিয় ও ভয়ংকর আত্মকেন্দ্রিক গোত্রগুলিকে ব্রিটিশ আমলেও শায়েস্তা করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৪৭ সালে তাহাদের মর্যাদা এক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়, কারণ পাকিস্তান সীমান্তের অপর পারে আফগাস্তিানে আরও পঞ্চাশ লক্ষ পসতু ভাষীর বাস। আফগান দেশ-প্রেমিকদের অনেকে সমস্ত পসতুভাষী লোকদিগকে একত্রিত করিয়া এক বৃহত্তর আফগানিস্তান গঠন করিবার সুযোগে থাকে। অবশ্য সীমান্ত জেলার গোত্রীয় লোকজন গণভোটের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যায় পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে ভোট দিলে এই আন্দোলন রুদ্ধ হইয়া যায়। প্রথম গভর্নর-জেনারেল হিসাবে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে এই অঞ্চল পরিদর্শন করিতে আসিলে বিভিন্ন গোত্র— ওয়াজিরীয়, আফ্রিদি ও মাশহাদগণ তাঁহাকে বন্ধুত্বের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানায়। পরবর্তীকালে অবশ্য পশতু সমস্যা কাবুল ও করাচীর মধ্যে গভীর শত্রুভাবের সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ সবাই বাঙালি; সুতরাং ভাষাগত ও সামাজিক দিক হইতে কোন ব্যতিক্রম তথায় অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

পাকিস্তানের দুই অংশের যোগাযোগের সমস্যা জনগণ

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বাহ্যত নিরাপদের সহিত পাকিস্তানের শাসনাধীনে আসে। কিন্তু অন্যান্য সমস্যাবলি তখনও জীবন্ত থাকিয়া যায়। তন্মধ্যে সংখ্যালঘুদের মান নির্ণয় এবং

দেশের দ্রুত শিল্পায়ন অতি গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ হইয়াছে; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ পরিষ্কার সমাধান নহে। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭৬ ভাগ মুসলমান এবং পূর্ব-পাকিস্তানে এই হার ৭১ ভাগ। এই হারকে সংখ্যায় রূপান্তরিত করিলে দেখা যায়, পাকিস্তানে মোট দুই কোটি সংখ্যালঘু রহিয়াছে যাহারা প্রধানত হিন্দু। অপরদিকে ভারত ইউনিয়নে ৪ কোটির এক বিরাট মুসলিম সংখ্যালঘু জনসংখ্যা বিদ্যমান। ১৯৪৭ সালে এই বিরাট অংকের সংখ্যালঘু দল প্রত্যেকটি দেশকে উহাঁর সংখ্যালঘুদের সহিত সম্প্রীতি বজায় রাখিবার পক্ষে এক চ্যালেঞ্জ স্বরূপ বিদ্যমান থাকে। এই চ্যালেঞ্জই বস্তুত সবাইর সঙ্গে সুব্যবহারের চাবিকাঠি স্বরূপ কাজ করিতে থাকে। কিন্তু বাস্তবে ধর্মোন্মত্তা যুক্তিকে ছাড়াইয়া গিয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামার অতি সহজ শিকারে পরিণত হয়।

সংখ্যালঘু সমস্যা

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় উত্তম ফসলের বৎসর পাকিস্তান সৌভাগ্যবশতঃ খাদ্য-উদ্বৃত্ততা উপভোগ করে এবং তৎসঙ্গে বিপুল পরিমাণ পাট, তুলা, চামড়া ও পশম লাভ করে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহার নিকট কোন শিল্প কারখানাই ছিল না; পাট প্রক্রিয়ার জন্য কোন মিল-ফ্যাক্টরী ছিল না। তুলার জন্য কোন কারখানা ছিল না এবং চামড়ার জন্য কোন ট্যানারী বা চামড়ার কারখানা ছিল না। পাকিস্তানকে একটি আধুনিক দেশে পরিণত করিতে হইলে দেশের শিল্পায়ন প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অর্থনৈতিক অবস্থা

মুসলিম লীগ এই নূতন রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়। ইহার নেতৃবৃন্দ অতি সুপরিচিত ছিলেন না। স্বাধীনতার প্রথম বৎসর মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ রাষ্ট্র পরিচালনার প্রধান ভার বহন করেন এবং দেশের গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন। সত্তর বৎসর বয়সের এই ক্লান্ত বৃদ্ধ জিন্নাহ্ তবুও এই নূতন জাতির পক্ষে এক বিরাট শক্তির স্তম্ভ স্বরূপ বিরাজ করেন। কিন্তু কঠিন দায়িত্বভার তাঁহার পক্ষে অতি গুরুভার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আর বেশিদিন বাঁচিয়া থাকা তাঁহার ভাগ্যে ছিল না এবং ১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর হৃদক্রিয়া বন্ধ হইয়া তিনি মারা যান। অতি জাঁকজমকের সহিত তাঁহাকে করাচীতে দাফন করা হয়। ইতোপূর্বে তাঁহাকে কায়েদ-ই আজম (মহান নেতা) উপাধিতে সম্মানিত করা হয়; কারণ পাকিস্তানিগণ এই নূতন রাষ্ট্রকে তাঁহার কীর্তি বলিয়া মনে করে।

মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা গঠন

একদল যোগ্য প্রশাসকদল জিন্নাহ্‌র সঙ্গে সংযুক্ত থাকিয়া তাঁহার অসমাপ্ত কার্য চালাইয়া যাইতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান জিন্নাহ্‌র প্রধান সহকর্মী ছিলেন। ১৮৯৫ সালে তিনি পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন। আলীগড় ও অক্সফোর্ডে তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং স্বাধীনতার পূর্বে ভারতের আইন সভা এবং ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে তিনি যথেষ্ট রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে লিয়াকত আলী খান

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার জাফরুল্লাহ্ খান ব্রিটেনে আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ভারতীয় ফেডারেল কোর্টে তিনি জজ হিসাবে কাজ করেন এবং ভাইসরয়ের নির্বাহী পরিষদে বিভিন্ন পদে বহাল থাকেন। একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। বাগ্মীতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে জাতিসংঘে পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে স্যার জাফরুল্লা খান

উপমহাদেশে এই যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল কাশ্মীর সমস্যা। ইহা একজন হিন্দু রাজার অধীনে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য। কাশ্মীরের ঐ হিন্দু রাজা ডোগরার বিরুদ্ধে অনেক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ১৯৪৬ সালে কাশ্মীরের জনপ্রিয় নেতা শেখ আবদুল্লাহ "কাশ্মীর ছাড়" আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং ফলে তিনি ডোগরা সরকার কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। দেশ বিভক্তি পরিকল্পনা অনুসারে করঙ্গ রাজ্য পাকিস্তান বা ভারত ইউনিয়নের সহিত যোগদান করার কথা। তদনুসারে হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় ও মানভাদরের মুসলিম রাজন্যবর্গ পাকিস্তানের সহিত যোগদান করেন, কিন্তু ভারত ইউনিয়ন ইহার প্রতিবাদ করে। তাহার যুক্তি হইল ঐ সমস্ত রাজ্যের শতকরা ৮২ ভাগ অধিবাসী হিন্দু। অতএব, কেবলমাত্র আইন প্রয়োগের দ্বারা হায়দ্রাবাদ ও জুনাগড় পাকিস্তানে যোগদান করিতে পারে না। ভারত ইউনিয়ন ঐ সব রাজ্য জোরপূর্বক গ্রাস করে। অপরদিকে কাশ্মীরের অধিকাংশ অধিবাসী একজন হিন্দু রাজার অধীনে মুসলমান। সেই হিন্দু রাজা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারত ইউনিয়নের সহিত যোগ দিতে চান এবং ভারত ইউনিয়নও এই ব্যাপারে আইনের প্রশ্ন বার বার উত্থাপন করে।

কাশ্মীর সমস্যা
ভারতের দ্বিমুখী নীতি

কাশ্মীরী মুসলমানদের জনপ্রিয় দাবির কণ্ঠরোধ করিবার জন্য ডোগরা রাজা জনগণের উপর নির্মম অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞের আশ্রয় লন। হাজার হাজার কাশ্মীরী মুসলমানদের হত্যা করা হয় এবং শেখ আবদুল্লাহসহ তাহাদের অপরাপর নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। কাশ্মীরীদের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম তাহাদের সমধর্মীয় সীমান্তের লোকদের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়ে। তাহারা অধিক দিন এই অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ১৯৪৭ সালের ২১শে অক্টোবর কাশ্মীরে প্রবেশ করে। কাশ্মীরের এক বিরাট অংশ অধিকার করে, রাজধানী শ্রীনগর অবরোধ করে এবং রাজাকে প্রাণ লইয়া ভারতে পলাইয়া যাইতে বাধ্য করে। ২৪শে অক্টোবর আজাদ কাশ্মীর সরকার গঠন করা হয়। সীমান্তের গোত্রীয় লোকদিগকে তাড়াইবার জন্য ভারত উহার সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু ব্যর্থ হইয়া এই ব্যাপারটিকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে উত্থাপন করে। পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত হইয়া পড়িলে পাকিস্তান উহার সশস্ত্র বাহিনীর কয়েকটি ইউনিট কাশ্মীরে প্রেরণ করিয়া কিছু সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখল করিয়া লয় (মে, ১৯৪৮)। জাতিসংঘের প্রচেষ্টায় একটি স্বাধীন গণভোটের শর্তে কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতি প্রতিষ্ঠা করা হয় (জানুয়ারি ১৯৪৮)।

ডোগরা রাজার
বল প্রয়োগ

খাজা নাজিমুদ্দিন
(১৯৪৮-১৯৫১)

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র মৃত্যুর পর পূর্ব বাংলার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন। তিনি এমন একজন রাজনীতিবিদ যাঁহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ১৯১৯ সালের গৃহীত ভারত শাসন আইনের আওতায় প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ পর্যন্ত সুবিস্তৃত। নূতন গভর্নর-জেনারেল হিসাবে তিনি যথেষ্ট দক্ষতা, সম্মান ও উচ্চমানের দেশাত্মবোধের সহিত কাজ চালাইয়া যান।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতে বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বাসন এক বিরাট সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় মুসলমান বাস্তুত্যাগীদল ক্রমাগত পাকিস্তানে আশ্রয় লইতে থাকে। বাস্তুত্যাগী ও পুনর্বাসন নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ খোলা হয়। ১৯৪৮ সাল প্রধানতঃ বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বাসনে ব্যয় করা হয়। ১৯৫০ সালের দিকে এই সমস্যাটি আরও গুরুতর আকার ধারণ করে, এবং ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। যাহা হউক উভয় দেশই এই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। নীতিগতভাবে উভয়ে স্বীকার করে যে, সমস্যার সমাধান হিসাবে তাহারা যুদ্ধ বাছিয়া লইবে না। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল প্রসিদ্ধ "লিয়াকত-নেহরু চুক্তি" সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিকে কখনও কখনও ১৯৫০ সালের সংখ্যালঘু চুক্তি বা দিল্লী চুক্তি বলিয়াও উল্লেখ করা হয়। এই চুক্তির দ্বারা অবস্থার বেশ উন্নতি হয়। কারণ ইহা সমস্ত সংখ্যালঘুদের প্রতি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করিবার ব্যাপারে উভয় দেশের দৃঢ়তার নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং ধর্মের ভিত্তিতে ভেদাভেদ বন্ধ করিবার কথা উল্লেখ করে। এই চুক্তি পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তির পথ উন্মুক্ত করে। কিছুদিন পর উভয় দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক রেল চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়।

বাস্তুত্যাগী সমস্যা
১৯৫০ সালের লিয়াকত নেহরু চুক্তি
চুক্তির ফলাফল

চুক্তির ফলাফল

খাজা নাজিমুদ্দিন গভর্নর জেনারেল থাকাকালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ছিলেন সমস্ত নীতি নির্ধারণের মূলকেন্দ্র। তাঁহার সুযোগ্য নেতৃত্বে সমস্ত প্রচেষ্টা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে পরিচালিত হয়। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সেই সময় উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে পাকিস্তান বেশ সাফল্য অর্জন করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ছয় সালা জাতীয় উন্নয়নের পরিকল্পনাকে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তরের প্রথম পর্যায়ের ধারাবাহিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন হিসাবে গণ্য করা যায়। ১৯৫১ সালের ১৬ই অক্টোবর রাওয়ালপিণ্ডিতে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবার সময় লিয়াকত আলী খান এক গুপ্ত ঘাতকের গুলিতে নিহত হন। জাতি তাঁহাকে কায়েদ-ই-মিল্লাত উপাধিতে ভূষিত করে।

লিয়াকত আলীর শাহাদত ১৯৫১

গোলাম মুহাম্মদ
(১৯৫১-১৯৫৫)

লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর তাঁহার কোন সুস্পষ্ট উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্য যে ব্যবস্থা লওয়া হয় তাহাতে সবাই অবাকই হয়।

পূর্ব-পাকিস্তানের অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৪৮ সালে এম. এ. জিন্নাহ্‌র মৃত্যুর পর গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনিই এখন প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য নামিয়া আসেন। একজন সাবেক সিভিল সার্ভেন্ট ও অর্থমন্ত্রী গোলাম মুহাম্মদ গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে খাজা নাজিমুদ্দিন

নূতন প্রধানমন্ত্রী ঢাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারের একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁহার চরিত্র কলুষমুক্ত, তাই সবাই তাঁহাকে পছন্দ করেন। সম্ভবত ইতিহাস তাঁহার প্রতি বিরূপ, তাই দেশের এক বিপদসংকুল অবস্থায় তিনি প্রধানমন্ত্রী হন। আসন্ন ঝড়ের লক্ষণ, শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক, লিয়াকত আলী খানের জীবদ্দশাতেই দৃষ্টগোচর হয়। কিন্তু ইহাকে স্পষ্টভাবে

চেনা যায় নাই। পাকিস্তানের জন্য একটি ইসলামী শাসনতন্ত্রকামী জনগণের চাপে পড়িয়া ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে গণপরিষদের মৌলিক নীতি কমিটির রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করিয়া লইতে হয়। পাকিস্তানের অর্থনীতির পক্ষে সাহায্যকারী কোরিয়ার যুদ্ধে প্রাপ্ত বাণিজ্য সহায়তা অবনতির পথে ধাবিত হয়। ফসলের ক্ষেত্রে মন্দা দেখা যায় এবং খাদ্য ঘাটতির সমূহ সম্ভাবনা দৃষ্টিগোচর হয়।

দেশের সংকটাপন্ন অবস্থা

মোটের উপর তাঁহার প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের কয়েক মাসের মধ্যেই অনুমান করা হয় যে, দেশের অবস্থা নিদারুণ সংকটাপন্ন। কোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত লওয়া হয় না। ফাইলপত্র স্তূপাকারে পড়িয়া থাকে। নূতন প্রধানমন্ত্রী প্রশংসনীয় দেশপ্রেমের সহিত তাঁহার পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীর রীতি অনুযায়ী চলিতে চেষ্টা করিলেও মনে হয় আরও গুরুতর সমস্যা মোকাবিলার জন্য তাঁহার নিকট প্রয়োজনীয় প্রতিপত্তির অভাব বিদ্যমান। এই জন্যই ১৯৫২ সালের প্রথম দিকে তিনি তাঁহার নিজস্ব প্রদেশে বিরাট সংকটে নিপতিত হন। জিন্নাহ্ ও লিয়াকত আলী খান বাংলা ভাষার স্বপক্ষে শক্তিশালী দাবি থাকা সত্ত্বেও কোন বিচার বিবেচনা না করিয়া উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা হইবে বলিয়া ঘোষণা দিয়েছিলেন। খাজা নাজিমুদ্দিনও এই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন, তাহাও ঢাকায়। ফলে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ঐ বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র নিহত হন। পুলিশের গুলি চালানোকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান গণবিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। ফলে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটিকে আপাতত চাপা দিতে হয়। পরে ১৯৫৪ সালের মে মাসে উর্দু ও বাংলা উভয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার সমান মর্যাদা দিয়া এই বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে হয়; কিন্তু ইতোমধ্যে খাজা নাজিমুদ্দিনের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়িয়া যায়।

নাজিমুদ্দিনের অসুবিধা
ভাষার প্রসঙ্গ
ভাষা আন্দোলন ও ২১শে ফেব্রুয়ারি গুলি-বর্ষণ

পশ্চিম পাকিস্তানে কাদিয়ানী বিরোধী বিক্ষোভ বোধ হয় জন্মের পর পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, কারণ এই প্রশ্নে মুসলমানদের শ্রেণীগত বিবাদ জড়িত। কাদিয়ানী বা আহমদীয়গণ বলিতে চায় যে তাহারা মুসলমান, কিন্তু অনেক সুন্নী ইহা মানিয়া লইতে রাজি নহে, এবং দাবি করে যে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে তাহাদিগকে পৃথক অমুসলিম সম্প্রদায় বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। করাচীতে অবস্থিত খাজা নাজিমুদ্দিনের সরকার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই গতিশীল সমস্যাটির মোকাবেলার জন্য কিছুই করেন নাই। পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও একজন আহমদীয় স্যার জাফরুল্লাহ্ খান কর্তৃক প্রদত্ত এক বক্তৃতার দ্বারা ১৯৫২ সালের মে মাসে এই সমস্যাটি আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। ১৯৫২-৫৩ সালে ইহা এক ভয়াবহ দাঙ্গার রূপ ধারণ করে এবং সমগ্র লাহোর নগর ইহাতে জড়িত হইয়া পড়ে। ৩রা হইতে ৭ই মার্চের মধ্যে এই নগর আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। যাহা হউক জরুরি অবস্থার শেষ মুহূর্তে নাজিমুদ্দিন উদ্যমের সহিত কাজ করেন। অনেক ধর্মীয় নেতাকে গ্রেফতার করিয়া তিনি লাহোরে সামরিক আইনজারি করেন। এইসব ব্যবস্থাবলির কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অবস্থা আয়ত্তের

কাদিয়ানী বিরোধী বিক্ষোভ
লাহোরে অরাজকতা
লাহোরে সামরিক আইন
খাজা নাজিমুদ্দিন বরখাস্ত

খাজা নাজিমুদ্দিন বরখাস্ত

খাজা নাজিমুদ্দিন বরখাস্ত

ভিতর আসিয়া যায়। প্রধানমন্ত্রী লাহোর গমন করেন। গভর্নরের পদে মিয়া দৌলতানার পরিবর্তে মালিক ফিরোজ খান নুনকে নিযুক্ত করেন এবং প্রায় বিজয়ী বেশে করাচী প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু সিভিল সার্ভেন্টগণ ইহাতে হস্তক্ষেপ করে। ১৯৫৩ সালের ১৭ই এপ্রিল তাহাদের উত্তর আসে গভর্নর-জেনারেল এবং প্রায় বিশ বৎসরের সিভিল সার্ভেন্ট গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদের একটি অপ্রত্যাশিত ঘোষণায়। খাজা নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত করা হয় এবং একটি নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়।

এই নূতন মন্ত্রিসভার প্রধান হইলেন অজ্ঞাত, কিছুটা অল্প বয়স্ক প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ বগুড়ার মুহাম্মদ আলী। ১৯৪৮ সাল হইতে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি রেঙ্গুন, অটাওয়া ও ওয়াশিংটনে কাজ করিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তাঁহার পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় তিনিও একজন বাঙালি; কিন্তু তাঁহার ন্যায় তত জনপ্রিয়তার অধিকারী নহেন। তাঁহার বিভাগ-পূর্বকালীন রাজনীতি বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু জাতি তাঁহার নাম কদাচ শ্রবণ করিয়াছে। খাজা নাজিমুদ্দিন তখনও আইন সভায় মোটামুটি সংখ্যাধিক্য ছিলেন এবং মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। নূতন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ খাজা নাজিমুদ্দিনের নবগঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ অনুমোদন অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার মানস করেন। সুতরাং সুনিশ্চিতভাবে ধরিয়া লওয়া হয় যে, সর্বক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী গোলাম মুহাম্মদ ও আরেকজন প্রাক্তন সিভিল সার্ভেন্ট এবং ১৯৫১ সাল হইতে কার্যরত অর্থমন্ত্রী চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে আমলাতান্ত্রিক কর্মচারীবৃন্দ গোলমাল সৃষ্টি করিবেন। একটি অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়; কিন্তু ইহা কখনও কার্যকরী হয় নাই। ইতোমধ্যে ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগ পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়; কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানে লীগ মাত্র দশটি আসন লাভ করে এবং যুক্তফ্রন্ট[১] নামে সম্মিলিত বিরোধী দল ২২৩টি আসন লাভ করে।

বগুড়ার মুহাম্মদ আলী (১৯৫৩-'৫৩) অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রিসভা গঠন করেন, কিন্তু দুই মাসের মধ্যে করাচীর নির্দেশে সেই মন্ত্রিসভা ভাঙিয়া দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালের ইন্ডিয়া এ্যাক্টের ৯২ (ক) ধারা জারি করিয়া প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করিয়া পাঠান হয়। করাচীতে পরিষদের বাঙালি সদস্যবৃন্দ পাঠান ও সিন্ধী সদস্যদের সহযোগিতায় গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হন। অতএব, গভর্নর জেনারেল গণ পরিষদ ভঙিয়া দিয়া বগুড়ার মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সেই মন্ত্রিসভায় জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং হোসেন শহীদ সেহরাওয়ার্দীকে আইনমন্ত্রীর পদ দেওয়া হয়। ১৯৫৫ সালের ১৪ই অক্টোবর শহীদ সোহরাওয়ার্দী দেশের অখণ্ডতা রক্ষা ও উত্তম শাসনকার্যের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায় পশ্চিম পাকিস্তানকে এক প্রদেশে রূপান্তরিত করার জন্য "এক ইউনিট বিলের" খসড়া প্রণয়ন করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের এ কে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা পূর্ব পাকিস্তানে ৯২(ক) ধারা গণপরিষদ বরখাস্ত পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিল

পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিল

মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জা
১৯৫৫–১৯৫৬ ঃ গভর্নর জেনারেল হিসাবে
১৯৫৬–১৯৫৮ ঃ প্রেসিডেন্ট হিসাবে

গভর্নর-জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ অসুস্থতাবশত মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জার নিকট দায়িত্বভার অর্পণ করেন এবং সেই সাথে বগুড়ার মুহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভারও অবসান হয়। অতঃপর চৌধুরী মুহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতির উপদেশে পরোক্ষভাবে একটি গণপরিষদ নির্বাচিত হয়। অতএব, প্রাক্তন গণপরিষদের ন্যায় ইহাকে সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্বহীন বলিয়া অভিযুক্ত করিবার সুযোগ রহিল না। এই গণপরিষদ শেষ পর্যন্ত চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর পরিচালনায় ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র অনুমোদন করাইতে সক্ষম হয়। পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে রচিত এই শাসনতন্ত্র পাকিস্তানকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করে। কিন্তু কাহারও কাহারও ধারণা এই শাসনতন্ত্র যদি জিন্নাহ বা লিয়াকত আলী খানের ন্যায় পার্লামেন্টের বিতর্কে দক্ষ, যাহারা এই ধরনের প্রতিষ্ঠান কাজে লাগাইতে পারেন এবং যাহারা একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল দলের পরিচালনা করিয়াছেন এইরূপ গুণী ব্যক্তিবর্গের জীবিতকালে প্রণীত হইত তবে ইহার সাফল্যের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বলতর হইত। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় যে উদ্দেশ্যে এই শাসনতন্ত্র রচনা করা হয় সে লক্ষ্যে ইহা অগ্রসর হইতে ব্যর্থ হয়।

চৌধুরী মুহাম্মদ আলী মন্ত্রিসভা (১৯৫৫-'৫৬) ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র

সামরিক অভ্যুত্থান পর্যন্ত পরবর্তী ঘটনা পাকিস্তানের জাতীয় ইতিহাসের এক বিরাট কলংকময় অধ্যায়ের রচনা করে। ১৯৫৬ সাল হইতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তানে চারিজন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। শাসনতন্ত্র-প্রণয়নের এক পক্ষকালের মধ্যে মন্ত্রিসভার উপর চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হইয়া পড়ে। রাজনীতিবিদগণ স্ব স্ব ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত নীতিহীন কার্যকলাপের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ডাঃ খান সাহেব কর্তৃক রিপাবলিকান পার্টি নামে একটি নূতন দল গঠনের ফলে এই সমস্ত কার্যকলাপ আরম্ভ হয়। প্রায় সমস্ত লীগ সদস্যগণ তাহাদের দল ত্যাগ করিয়া নূতন দলে যোগদান করেন। যাহা হউক, ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চৌধুরী মুহাম্মদ আলী বিরক্ত হইয়া প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রত্যাখ্যান করেন, যদিও তিনি ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই আরেকটি মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারিতেন।

ডাঃ খান সাহেবের রিপাবলিকান পার্টি

চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর উত্তরাধিকারী হন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। প্রেসিডেন্ট মির্জা ও শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মধ্যে বস্তুত সামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়। বিচক্ষণ, সাহসী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ক্ষমতা লাভে প্রফুল্ল, সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্যপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ, তাঁহারা দেশকে একটি সুস্পষ্ট নেতৃত্বদানের অংশীদার হিসাবে যথেষ্ট উপযুক্ত ছিলেন। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে সংঘটিত সুয়েজ সংকটের সময় তাঁহারা না থাকিলে পাকিস্তান হয়ত কমনওয়েলথ ত্যাগ করিত। যুক্ত ও পৃথক নির্বাচনের ন্যায় একটি উদ্ভট অভ্যন্তরীণ সমস্যার মোকাবিলায়ও এই মির্জা-সোহ্‌রাওয়ার্দী

সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা (১৯৫৬-৫৭) আই, আই চুন্দ্রিগড় মন্ত্রিসভা (১৯৫৭)

জুটি বেশ কৌশলের সহিত কাজ করে। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আসন্ন জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তান পৃথক নির্বাচন দাবি করে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান দাবি করে যুক্ত নির্বাচন। কিন্তু শীঘ্রই এই জুটি একে অপরকে অবিশ্বাস করে এবং রিপাবলিকান পার্টিকে জনপ্রিয়হীন করিবার জন্য প্রচেষ্টা চালাইবার ফলে ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রিত্ব হারান। মুসলিম লীগের আই. আই. চুন্দ্রিগড় নূতন প্রধানমন্ত্রী হইয়া আসেন। কিন্তু পরিষদের উপদলগুলির মধ্যে তাঁহার সুনিশ্চিত কোন সমর্থক ছিল না। অথচ তৎকালে রিপাবলিকান পার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যে ব্যক্তিগত কোন্দল চরম আকার ধারণ করে। অতএব বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই তাঁহাকে ইস্তেফা দিতে হয়। মালিক ফিরুজ খান নূন তাহার স্থলাভিষিক্ত হন।

পাকিস্তানের ইতিহাসের প্রথম সাধারণ নির্বাচন—১৯৫৮ সালের সম্ভাব্য নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজনীতিবিদদের একমাত্র নেশা বা পেশা হইয়া দাঁড়ায়, যে কোন কৌশলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা বা ক্ষমতায় আরোহণ করা। প্রত্যেকেরই অনুমান সে সময় করাচী, ঢাকা বা লাহোরে যাহারাই মন্ত্রিসভায় থাকিবেন তাঁহারাই সুফল ভোগ করিবেন এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবেন। অতএব, অতি নির্লজ্জ কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়; ফলে দেশ এক অস্বস্তিকর অরাজকতার দিকে ধাবমান হয়। ১৯৫৮ সালের নির্বাচনে জয় লাভের জন্য রাজনীতিবিদদের নির্লজ্জ কারসাজি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভীতিপ্রদ বিশৃঙ্খলায় নিপতিত হয়; বৈদেশিক প্রতিপত্তি প্রায় বিলুপ্ত হয়; দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি সর্বস্তরে বিদ্যমান থাকে এবং নিঃসন্দেহে এই দুর্নীতি সিভিল সার্ভিসের ন্যায় উচ্চ শ্রেণীতে পর্যন্ত প্রসারিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আইন পরিষদে নিরর্থক এক পুরাতন বিরোধের জের ধরিয়া আওয়ামী লীগ দল স্পীকারকে পাগল বলিয়া ঘোষণা করাইয়া লইতে সমর্থ হয়। ইহার পরিণতি হিসাবে দুই দিন পর এই দলের বিরোধী এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক দল সুসংগঠিত বিক্ষোভের মাধ্যমে তাঁহার (স্পীকার) সহকারীর প্রতি আসবাবপত্রের টুকরা নিক্ষেপ করে—ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়।"[২]

মালিক ফিরুজ খান নুনের মন্ত্রিসভা (১৯৫৭-৫৮) ১৯৫৮ সালের নির্বাচনে জয়লাভের জন্য রাজনীতিবিদদের নির্লজ্জ কারসাজি

পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী স্বল্প সাজ-সরঞ্জাম লইয়া কাজ আরম্ভ করিলেও তৎকালে ইহা বেশ দক্ষতা অর্জন করে এবং তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সশস্ত্র বাহিনীগুলির অন্যতম হিসাবে গর্ব করিতে সক্ষম হয়। দেশের বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া এবং ১৯৫৮ সালের ৭-৮ই অক্টোবর রাত্রিবেলা একদল সেনাপতি তাহাদের প্রধান সেনাপতি জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খানের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করে। প্রেসিডেন্টের দ্বারা জারিকৃত এক ঘোষণার মাধ্যমে তাহারা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল করে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা মুলতুবি করিয়া দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে এবং দেশে সামরিক আইন জারি করে।

সামরিক আইন ১৯৫৮

পাদটীকা

১। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে মুসলিম লীগের কথিত দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হইয়া এবং লীগকে একাকী ভোট যুদ্ধে মোকাবিলা করিতে সাহস না করিয়া কয়েকটি বিরোধী দল ২১ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠন

করে। দলগুলি হইল কৃষক শ্রমিক পার্টি, আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি এবং গণতান্ত্রিক পার্টি।

২। Ian Stephen : *Pakistan*, লন্ডন, ১৯৬৩। স্পীকারের সহকারীর (ডেপুটি স্পীকার) নাম শাহেদ আলী।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

Rushbrook Williams : *The State of Pakistan.*

Ian Stephen : *Pakistan.*

T. W. Wallbank : *A Short History of India and Pakistan.*

Choudhury Khaliquzzaman : *Pathway to Pakistan.*

S. Sharifuddin Pirzada : *Foundation of Pakistan.*

Ayub Khan : *Friends not Masters.*

একাদশ অধ্যায়
সামরিক শাসন
ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইয়ুব খান
(১৯৫৮-১৯৬৯)

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি (কমাণ্ডার-ইন-চীফ) জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ৭-৮ই অক্টোবর এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন এবং ২৬শে অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জা পদত্যাগ করিলে তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে তিনি ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত হন। ১৯৬২ সালের মে মাসে তিনি প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির এক শাসনতন্ত্র জারি করেন। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের (Basic Democrats) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবেন। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র মোতাবেক অনুষ্ঠিত ১৯৬২ সালের নির্বাচনে সামরিক আইন প্রশাসক আইয়ুব খান নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নির্বাচনে তিনি তাঁহার অতি নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী মিস ফাতিমা জিন্নাহকে (মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র বোন) পরাজিত করিয়া পুনরায় আরও পাঁচ বৎসর মেয়াদের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি দেশের রাজধানী করাচী হইতে প্রথমে অন্তর্বর্তীকালীন রাজধানী রাওলপিণ্ডিতে এবং পরে নূতন রাজধানী ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত করেন। ইতোমধ্যে জনসাধারণ তাঁহার একনায়কত্বের শাসনে অতিষ্ঠ হইয়া গণআন্দোলনে নামিলে তিনি পুনরায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না বলিয়া ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা দেশে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। ফলে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান দেশে পুনরায় সামরিক আইন জারি করেন এবং আইয়ুব খান ক্ষমতাচ্যুত হন।

আইয়ুব খানের কৃতিত্ব ঃ

সামরিক শাসনের প্রথম উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হইল শহরবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, বিশেষ করিয়া করাচীতে। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায়, ১৯৫৮ সালে একমাত্র করাচীতেই ১,২০,০০০ উদ্বাস্তু পরিবার অবস্থান করে যাহারা দেশ বিভক্তির প্রথম বৎসরগুলিতে ভারত হইতে পাকিস্তানে আগমন করে। তাহারা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছিল। তাহাদের পুনর্বাসনের বিরাট দায়িত্ব লে: জেনারেল আজম খানের উপর ন্যস্ত করা হয়। তিনি অতি দ্রুত এক জরিপের আয়োজন করেন এবং

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন

স্থানীয় জনসাধারণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাহায্যও গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি এক খসড়া সাধারণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ফোর্ড ফাউন্ডেশন কর্তৃক সাহায্যকৃত স্থাপত্যশিল্প সম্বন্ধীয় এক বিদেশী কোম্পানিকে ডাকিয়া আনেন এবং ১৯৫৯ সালের জুন মাসের মধ্যে করাচীর কোরাঙ্গীতে ৭৫,০০০ উদ্বাস্তুদের বসতি সম্বলিত এক উপশহর নির্মার করেন। পরে এই ধরনের বসতি মালীরে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানেও নির্মাণ করা হয়।

ভারত হইতে আগত এই সমস্ত উদ্বাস্তুদিগকে পৃথকভাবে একত্রে বসতি স্থাপন করিবার ফলে তাহাদের মধ্যে পৃথক সত্তার সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, এইসব উদ্বাস্তুরা প্রায় সকলেই উর্দুভাষী। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যে স্থানে তাহাদিগকে আবাসন প্রদান করা হয় ঐ সব এলাকা উর্দুভাষী নহে। অধিকন্তু, তাহারা উত্তর ভারতের পৃথক সভ্যতা সংস্কৃতির বাহক। পৃথকভাবে বসবাস করিবার ফলে না তাহারা স্থানীয় ভাষা রপ্ত করে, না স্থানীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সহিত খাপ খায়। ফলে তাহাদের মধ্যে পৃথক সত্তা ও অনুভূতির সৃষ্টি হয়। দেখা গিয়াছে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বদা তাহারা শাসক গোষ্ঠীর ক্রীড়নক হিসাবে কাজ করে। এই কাজে তাহারা স্থানীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বা সংগ্রাম আন্দোলনে বিজাতীয় ভূমিকাই পালন করে। পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করে এবং এই দাঙ্গায় এইসব উদ্বাস্তু, যাহারা পূর্ব পাকিস্তানে বিহারী হিসাবে এক নামে পরিচিত, এক বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি করে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও এইসব বিহারীরা সামরিক শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে বাঙালি নিধনযজ্ঞে মাতিয়া উঠে। তাহারাই শেষ পর্যন্ত রাজাকার-আলবদরের মূল ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান এবং বর্তমান পাকিস্তানেও এই সমস্ত উদ্বাস্তুদল স্থানীয় লোকদের জন্য একটি চিরস্থায়ী শিরঃপীড়ার কারণ হইয়া বিরাজ করে। অথচ ইহাদিগকে পৃথকভাবে আবাসন না করিয়া স্থানীয় জনগণের সঙ্গে বসবাস করিতে দিলে তাহারা স্থানীয় আচার-অনুষ্ঠান রপ্ত করিত এবং শান্তিতে বসবাস করিতে সক্ষম হইত। অনেকের মতে বাঙ্গালিদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় এইসব বিহারীদের দুর্ব্যবহারও অনেকাংশে দায়ী।

সমালোচনা

আইয়ুবী আমলের একটি মৌলিক সংস্কার হইল ১৯৫৯ সালের জানুয়ারিতে প্রথম ঘোষণাকৃত পশ্চিম পাকিস্তানের বলিষ্ঠ ভূমি সংস্কার। পরে ইহা পূর্ব পাকিস্তানেও প্রয়োগ করা হয়। অর্থনৈতিক এই সংস্কারের উদ্দেশ্য ব্যাপক, যথাঃ কৃষিক্ষেত্রে উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রয়োগ, অধিক ফসল উৎপাদন, বৈদেশিক খাদ্য আমদানি হ্রাস, আরও অধিক উন্নতিশীল ও সুখী কৃষক শ্রেণী সৃষ্টি। কিন্তু এই সংস্কারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই মুখ্য, যথা পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের ক্ষমতা ধ্বংস করা। জমিদারদের প্রভাবে তথায় সাধারণ নির্বাচনে প্রজাগণ জমিদারদের ভোট দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এবং ফলে আইন সভায় এক শক্তিশালী ভূস্বামী-উপশালার (Lobby) সৃষ্টি হয়। ইহার প্রভাব জাতীয় উন্নতিতে এক বিরাট বাধার সৃষ্টি করে। ভোট সংগ্রহের হিসাব ও স্বীয় সদস্যপদ কাঠামোর দরুন পূর্ববর্তী কোন পাকিস্তানি মন্ত্রিসভা এই ভয়ানক সামাজিক জাল স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই। এই সংস্কারের ফলে বিরাট ভূস্বামীর ক্ষমতা বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ভূস্বামী উপশালাও আর সৃষ্টি হয় নাই। অতঃপর কোন ভূস্বামীকে ৫০০ একর জলসেচ ব্যবস্থা সম্বলিত জমি বা ১০০০

ভূমি সংস্কার বা জমিদারি প্রথার অবস্থা

একর জলসেচব্যবস্থাহীন জমি এবং তৎসহ ১৫০টি সব্জির বাগানের অধিক ভূমি রাখিতে দেওয়া হয় না। অবশিষ্ট জমি প্রজাদের মধ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। হস্তান্তরকৃত জমির জন্য জমিদারদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা (Basic Democracy System) প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের একটি নিজস্ব উদ্ভাবন। ১৯৫৯ সালের ২৬শে অক্টোবর যথারীতি ঘোষণাকৃত পরিকল্পনা অনুসারে এই ব্যবস্থায় পাঁচটি স্তর রাখা হয়। যথা ঃ (১) ইউনিয়ন কাউন্সিল, (২) থানা কাউন্সিল, (৩) জেলা কাউন্সিল, (৪) বিভাগীয় কাউন্সিল এবং (৫) প্রাদেশিক উপদেষ্টা কাউন্সিল। পরে প্রাদেশিক উপদেষ্টা কাউন্সিল রহিত করা হয়। এই ব্যবস্থায় ভোটদাতাগণ ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত করে। এই সদস্যদিগকে মৌলিক গণতন্ত্রী বলা হয়। মৌলিক গণতন্ত্রীদের সরাসরি ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। প্রত্যেক প্রদেশে ইহাদের সংখ্যা ৪০,০০০। পরবর্তীকলে ১৯৬৭ সালে প্রত্যেক প্রদেশের মৌলিক গণতন্ত্রীদের সংখ্যা ৬০,০০০ এ উন্নীত করা হয়।

মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা দেশে কোন গ্রহণযোগ্যতা পায় নাই। ফলে তৎকালীন জননন্দিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন নাই। ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী হিসাবে ফাতেমা জিন্নাহ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে সম্মিলিত বিরোধী দল ফাতেমা জিন্নাহকে দাঁড় করাইয়াছিল আইয়ুব খানকে পরাজিত করিবার জন্য—এই ব্যবস্থাকে পছন্দ করিয়া নহে। তাই ক্ষমতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে আইয়ুব খানের এই নির্বাচন ব্যবস্থাও রহিত হইয়া যায়। ১৯৭০ সালের নির্বাচন হইয়াছিল ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র মোতাবেক।

শিক্ষা সংস্কার সামরিক আমলের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৫৮ সালের ৩৯শে ডিসেম্বর জাতীয় শিক্ষার উন্নতির জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়। বিচারপতি হামুদুর রহমানকে এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়। এই কমিশন কর্তৃক পেশকৃত রিপোর্ট "হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট" নামে সমধিক পরিচিত। কমিশনের নিকট প্রদত্ত রূপ রেখায় বলা হয় যে, ইহা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও পুনর্গঠনের জন্য এমন ব্যবস্থার সুপারিশকারী যদ্বারা পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে গণদায়িত্বের অনভূতি, দেশাত্মবোধ ও জাতীয় ঐক্য গড়িয়া উঠে এবং তাহাদের মধ্যে পরিশ্রমের অভ্যাস, সাধুতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা জাগরিত হয়। এমন ব্যবস্থা হইতে হইবে যাহাতে মেধাবী লোকদের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করে এবং শিল্প কারখানা, কৃষিকার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারি চাকুরির জন্য দক্ষ, শিক্ষাপ্রাপ্ত, পেশাগত ও কৌশলী লোকজন প্রস্তুত করে। এই কমিশন সুপারিশ করে যে, শিক্ষাকে একটি উৎপাদনক্ষম কার্য (Productive activity), এবং উন্নতিশীল ও প্রগতিশীল জনহিতকর রাষ্ট্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় একটি মানব সম্পদের পুঁজি হিসাবে বিবেচনা করিতে হইবে। একটি শিক্ষিত জাতি গড়িয়া তুলিবার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাইমারি শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষিত জাতির প্রধান অঙ্গ। একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রকৌশলী, কৃষি, বণিক সম্প্রদায় ও সরকারি চাকুরির

শিক্ষা সংস্কার

পুরোধাগণ তাঁহাদের শিক্ষা লাভ করেন।

বহুল আলোচিত হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট লইয়া পাকিস্তানে ভীষণ বির্তকের সৃষ্টি হয়। এই রিপোর্টে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সীমিত করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ এই রিপোর্টকে কুখ্যাত বলিয়া সমালোচনা করে এবং ১৯৬২ সালে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। সমগ্র দেশে ক্রমশ এই বিক্ষোভ ছড়াইয়া পড়ে। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ শেষ পর্যন্ত সরকার বিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়।

১৯৬০ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর করাচীতে ভারত, পাকিস্তান ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে সিন্ধুনদির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার পানি ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিয়া 'সিন্ধু-পানি চুক্তি ১৯৬০' নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিভিন্ন নদীর পানি ব্যবহার লইয়া গোলযোগের কাহিনী বস্তুত পাকিস্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়। দেশ বিভক্তির ফলে যে সমস্ত নদী পাকিস্তানের জীবনীশক্তি সেইগুলির কর্তৃত্ব ভারতের হাতে চলিয়া যায়, কারণ সেইগুলির উৎসমূল ভারতে অবস্থিত। বিভক্তির পর ভারত ঐ সমস্ত নদীমুখ বন্ধ করিবার হুমকি দেয়। ১৯৪৮ সাল হইতে এই ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চলে, এবং বিশ্বব্যাংকের উদ্যোগে ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি মৈত্রী ও বন্ধুত্বের সঙ্গে সিন্ধু নদী পানি ব্যবহার লইয়া ভারত ও পাকিস্তান সরকারের দাবি ও কর্তৃত্ব নির্ধারণ ও সীমা নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। এই চুক্তি তিনটি পূর্বাঞ্চলীয় নদী—রবী, বিয়াস ও সুতলেজকে চুক্তিতে নির্ধারিত কতকগুলি শর্ত সাপেক্ষে ভারতের হাতে অর্পণ করে। প্রধান শর্ত এই যে, ১০ হইতে ১৩ বৎসরের অবস্থান্তর সময়ে ভারত পাকিস্তানকে ঐ সমস্ত নদীর পানি সরবরাহ করিতে থাকিবে। সেই অবস্থান্তর সময়ে পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলীয় নদীগুলির স্থলাভিষিক্ত করিবার কাজ চালাইতে থাকিবে। এই সময় কিভাবে ও কি পরিমাণ পানি সরবরাহ করিবে তাহাও চুক্তির একটি উপধারায় উল্লেখ করা হয়।

সিন্ধুনদ অববাহিকায় চুক্তি (১৯৬০)

আইয়ুব শাসনামলে শিল্পোন্নয়নে দীর্ঘ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। দেশের দ্রুত শিল্পায়নের জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন সংস্থাকে (P. I. D. C.) পূর্ব পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন সংস্থা (E. P. I. D. C) ও পশ্চিম পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন সংস্থায় বিভক্ত করা হয়। ফলে দেশ অতি দ্রুত ভারী শিল্প কারখানা স্থাপনের পথে অগ্রসর হয়। তৈল শোধনাগার, ইস্পাত কারখানা, ডি. ডি. টি. কারখানা এবং অন্যান্য অতি মূল্যবান ও ভারী শিল্প কারখানা শীঘ্রই গড়িয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি সাধন করা হয়। সমস্ত দেশকে অসংখ্য রাস্তা ও ফেরীর সাহায্যে সংযুক্ত করা হয়।

শিল্প উন্নয়ন

এই শাসনের আরেকটি শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব জনগণের ইচ্ছানুযায়ী বৈদেশিক নীতির মোড় পরিবর্তন। ইহার ফলে পাকিস্তান পশ্চিমা বৈদেশিক বলয় হইতে বাহির হইয়া একটি স্বাধীন বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করে। ১৯৫৮ সালের পূর্বে পাকিস্তান সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য শক্তির হাতের পুতুল ছিল। ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ ভারতকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিলে পাকিস্তান তাহার

বৈদেশিক নীতির পরিবর্তন

বৈদেশিক নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়। কমিউনিস্ট চীনকে শায়েস্তা করিবার জন্য পশ্চিমা শক্তিবর্গ ভারতকে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিয়াছে তাহা একদিন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে না তাহার কি নিশ্চয়তা রহিয়াছে। এই অস্ত্র সরবরাহের দ্বারা ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে অস্ত্র মজুতের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। তাই পাকিস্তান পাশ্চাত্য জোট হইতে বাহির হইয়া কমিউনিস্ট ব্লক অর্থাৎ চীন ও রাশিয়ার প্রতি দৃষ্টি দেয়। তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠে এবং সিটো (S.E.A.T.O.) ও সেন্টোর সঙ্গে দেশের সম্পর্ক নিস্তেজ হইয়া আসে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অপর পক্ষে চীনের নেতৃত্বে গঠিত আফ্রো-এশিয়ান জোটে পাকিস্তান এক বড় উদ্যোক্তা হিসাবে আবির্ভূত হয়। পাকিস্তান ও কমিউনিস্ট বিশ্বের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতাও আরম্ভ হয়।

এই পুস্তকের অন্যত্র আলোচনা করা হইয়াছে যে, কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে গঠিত জাতিসংঘ কমিশনের সুপারিশ ভারত সর্বদা প্রত্যাখ্যান করিয়া আসে। কাশ্মীরের মুসলমানদিগকে ভারত নির্মমভাবে দমন করে। কাশ্মীরী নেতা শেখ আবদুল্লাহ একনাগাড়ে বছরের পর বছর জেলে আটক থাকেন। অতঃপর ভারতীয় অত্যাচারের কবল হইতে মুক্তি লাভের জন্য কাশ্মীরী জনসাধারণ বলপ্রয়োগের নীতি অবলম্বন করে। কিন্তু শেখ আবদুল্লাহ্ ও মির্জা আফজাল বেগ মুক্তি লাভের পর ১৯৬৫ সালের মে মাসে মক্কা হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহাদিগকে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরে ভয়াবহ বিদ্রোহ, ধর্মঘট ও মিছিল আরম্ভ হয়। শ্রীনগরে পুলিশের গুলিতে আটজন লোক নিহত হয়। অপরদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী কারগীল অঞ্চলে তিনটি পাকিস্তানি ঘাঁটি আক্রমণ করে এবং পরে অধিকার করে। কিন্তু জাতিসংঘের চাপে পড়িয়া ভারত ঐগুলি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। আগস্ট মাসে "সাদা-ই-কাশ্মীর" নামে অভিহিত এক গোপন বেতার কেন্দ্র হইতে কাশ্মীরে একটি বিপ্লবী পরিষদ প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়। বিপ্লবী পরিষদের কার্যের প্রতিশোধ হিসাবে ভারতীয় সেনাবাহিনী শ্রীনগরের নিকটবর্তী বাটামুলা অঞ্চল ভস্মীভূত করে। ২৪শে আগস্ট ভারতীয় বাহিনী আওয়ান নামে একটি পাকিস্তানি গ্রামের উপর গোলন্দাজ বাহিনীর গোলা নিক্ষেপ করে। পরদিন তাহারা যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা অতিক্রম করে এবং টিথওয়াল সেক্টরে দুইটি পাকিস্তানি ঘাঁটি এবং ইউরি-পুঞ্চ সেক্টরে কয়েকটি ঘাটি দখল করে। ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ ভারত হাজীপীর গিরিপথও দখল করে।

কাশ্মীর ও পাক-ভারতের যুদ্ধ ১৯৬৫
কারগীল অঞ্চলে ভারত কর্তৃক তিনটি ঘাঁটি দখল
কাশ্মীরে বিপ্লবী পরিষদ
ভারত কর্তৃক যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা অতিক্রম

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৬৫, পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরী বাহিনী পাক সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় মেজর জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা অতিক্রম করে এবং অসাধারণ দক্ষতা ও ক্ষিপ্র গতিতে ভিম্বর সেক্টরে চম্ব ও দেবা অধিকার করে। ঐদিনই ভারত তাহার বিমান বাহিনী মোতায়েন করে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর পাকিস্তানি আকাশ সীমা অতিক্রম করিয়া ভারত এই যুদ্ধকে আরও বিস্তৃত করে। ৫ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তান ভিম্বর সেক্টরে জাউরিয়ান দখল করে এবং কাশ্মীরে অবস্থিত ভারতের এক লক্ষ সেনাবাহিনীর সরবরাহ লাইন বন্ধ করিবার হুমকি প্রদান করে। জাতিসংঘ উভয় রাষ্ট্রকে যুদ্ধ বিরতির আহবান জানায়, কিন্তু ভারত সেই আহবান প্রত্যাখ্যান

যুদ্ধ বিরতি ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

করে। হঠাৎ ৬ই সেপ্টেম্বর ভারত লাহোরের উপর ত্রিমুখী আক্রমণ চালায়, এবং ২২টি জঙ্গী বিমানসহ প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতির বিনিময়ে তাহারা পাকিস্তানের কয়েক মাইল ভিতরে প্রবেশ করে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং যুদ্ধাবস্থার কথাও ঘোষণা করেন। ৯ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থান্ট আইয়ুব খানের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। একটি আফ্রো-এশিয়ান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য পাকিস্তান তিনটি প্রস্তাব পেশ করে। ১৪ই সেপ্টেম্বর ভারত পেশোয়ার ও কোহাটের বেসামরিক জনতার উপর বোমা বর্ষণ করে। উথান্ট যুদ্ধ বিরতির আদেশ দান করিবার জন্য জাতিসংঘের নিকট আবেদন করেন। ২০শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সালের দুপুর বারোটার মধ্যে উভয় দেশের নিকট যুদ্ধ বিরতি দাবি করে। ফলে ২৩শে সেপ্টেম্বর রাত তিনটা হইতে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়। যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার পূর্বে জাতিসংঘের সমস্ত সদস্যবর্গ অদূর ভবিষ্যতে কাশ্মীর সমস্যার একটি সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টা করিবার প্রতিশ্রুতি দেন।

তাসখন্দ ঘোষণা (১০ই জানুয়ারি, ১৯৬৬) ঃ

সোভিয়েট রাশিয়ার উদ্যোগে ১৯৬৬ সালের ১০ই জানুয়ারি তাসখন্দে সোভিয়েট রাশিয়া, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে একটি যুক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান, ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং সোভিয়েট রাশিয়ার চেয়ারম্যান কোসিগীন উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলন শেষে তিনটি দেশ কর্তৃক একটি যুক্ত ঘোষণা প্রকাশ করা হয়, যাহার উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ :

- পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী উভয়ে জম্মু ও কাশ্মীর সমস্যা আলোচনা করেন এবং উভয় পক্ষ তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলিয়া ধরেন।
- উভয়ে একমত হন যে, দুই দেশের হাইকমিশনারদ্বয় তাহাদের স্ব স্ব কর্মস্থলে ফিরিয়া যাইবেন, এবং কূটনৈতিক মিশন পুনরায় চালু করা হইবে।
- উভয়ে একমত হন যে, দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনীর লোকজন ১৯৬৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারির পূর্বে তাহাদের আগস্ট ১৯৬৫ (যুদ্ধপূর্ব) স্থানে ফিরিয়া যাইবে।
- উভয় পক্ষ জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী সমস্ত বিবাদ সমাধানে শক্তি ব্যবহার না করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করিবার কর্তব্যের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।
- উভয়ে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করিতে একমত হন।
- উভয়ে যুদ্ধবন্দি বিনিময়ের ব্যাপারে উপদেশ দানের বিষয়ে একমত হন।
- উভয়ে প্রস্তাব করেন যে, দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান চুক্তিসমূহ কার্যে পরিণত করা হইবে।
- উভয়ে একমত হন যে, জনসাধারণের দেশ ত্যাগ বন্ধ করিবার নিমিত্তে উভয় দেশ বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করিবে।
- উভয় পক্ষ উদ্বাস্তুদের উঠাইয়া দেওয়া সম্পর্কিত সমস্যা এবং তাহাদের সম্পত্তি ফেরত দিবার বিষয়ে আলোচনা চালাইতে থাকিবেন।
- উভয় পক্ষ ঘোষণা করে যে, একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রচারিত অপপ্রচার বন্ধ করিয়া দিবে।

- প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী যে কোন জটিল বিষয়ে উভয় পক্ষ শীর্ষ অধিবেশন এবং অন্যান্য পর্যায়ের অধিবেশনে মিলিত হইবার বিষয়ে একমত হন।
- আরও কি কি পন্থা অবলম্বন করা যায় এই বিষয়ে আলোচনা করিবার নিমিত স্ব স্ব সরকারের নিকট সুপারিশ দাখিল করিবার জন্য পাক ভারত যুক্ত কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উভয় পক্ষ স্বীকার করে।
- উভয় পক্ষ একমত হয় যে, একে অপরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিবার আদর্শের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবে।

এই ঘোষণাপত্রের ভূমিকায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এবং প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী দুই দেশের মধ্যে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে একমত হন।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

Aziz Beg : *The Quiet Revolution*

R. V. Weeks : *Pakistan*

K. K. Aziz : *Making of Pakistan*

Syed : *Pakistan's Finest Hour*

সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর উদ্বৃতাংশ

দ্বাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ

২৫শে মার্চ ১৯৭১ দিবাগত রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঘুমন্ত মানুষের উপর নৃশংস আক্রমণ পরিচালনা এবং অতঃপর স্বাধীন দেশ হিসাবে বাংলাদেশের অস্তিত্বের ঘোষণার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তারপর দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে বাঙালি গেরিলা বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতের সহযোগিতায় ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ এ বাংলাদেশ হানাদার মুক্ত হইয়া একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে বিশ্বের বুকে আত্মপ্রকাশ করে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঐ দিন জেনারেল এ. এ. নিয়াজীর নেতৃত্বে ঢাকায় আত্মসমর্পন করে।
এই নয় মাসের যুদ্ধের পটভূমিকা ঠিক কখন আরম্ভ হয় এই লইয়া বিতর্ক রহিয়াছে। কাহারও কাহারও মতানুসারে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ব্রিটিশ রাজ এই দেশ ত্যাগ করে এবং পূর্ববাংলা তথা পূর্বপাকিস্তানের বাঙালি জনগণকে আরেক ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে জিম্মি রাখিয়া যায়। অতএব ইংরেজ নির্গমনের পর হইতে এই দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। আবার কোন কোন সূত্রানুযায়ী পূর্ববাংলার মানুষ গণহারে পাকিস্তানের স্বপক্ষে ১৯৪৬ এর নির্বাচনে ভোট প্রদান করিলেও ১৯৪৮ সালে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে অস্বীকার করিয়া উর্দূকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবার দিন হইতে বাঙালিরা বুঝিতে পারে নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব হুমকির মুখে। কিন্তু ১৯৫৬ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দূ ও বাংলা উভয় ভাষাকে সমান মর্যাদা প্রদান করা হইলে আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়; কিন্তু সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই।

আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা (১৯৪৮) ঃ

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই দেশের উল্লেখযোগ্য ঘটনা আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা। পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী এবং মুসলিম লীগের কর্মকান্ডে বিক্ষুব্ধ কতিপয় লীগ সদস্য ১৯৪৮ সালের ২৩শে জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, সম্পাদক শামছুল হক এবং যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ও খোন্দকার মোশতাক আহম্মদ।[১] সংগঠনের নাম রাখা হয় পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, তবে পরবর্তীকালে ইহা নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।

পটভূমি ও লক্ষ্য ঃ পাকিস্তান নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হাসিলের জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগ সংগ্রাম করে। পাকিস্তান হাসিলের পরও জনগণ এই সংগঠনকে সমর্থন দান

করে। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে তাহাদের মোহ ভঙ্গ হয়। ইহা দিবালোকের মত পরিষ্কার হইয়া যায় যে, পূর্বেকার নেতৃবৃন্দের সমস্ত গুনাবলীর উত্তরাধিকারী হইবার দাবি করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলিম লীগ এমন একটি দলে পরিণত হয় যাহার নেতাদের একমাত্র আকাঙ্খা হইল মন্ত্রিসভায় ক্ষমতা। স্বাধীনতা আন্দোলনে যাহারা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারা এই সংগঠনে প্রবেশের সুযোগ লাভ করেন নাই বরং যাহারা পাকিস্তানের বিরোধিতা করিয়াছে তাহারাই রাতারাতি মুসলিম লীগার হইয়া এই সংগঠনটিকে কোটারী মুসলিম লীগে পরিণত করে।

দেশের মূল সমস্যাবলীর সমাধান হয় নাই, বরং এই সুদীর্ঘ কালে মুসলিম লীগ দুঃখি মানুষের জন্য কিছুই করে নাই। পার্টি সম্পূর্ণভাবে সরকারি যন্ত্রে পরিণত হয় এবং সময়ের পরিক্রমায় ইহা সরকারী লীগে পরিণত হয়। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হয় এবং বিভিন্ন নিরাপত্তা আইন ও অধ্যাদেশের দ্বারা জনগণের প্রকৃত নেতা, যাহারা আইন সঙ্গত অধিকার দাবী করেন তাঁহাদিগকে দমন করা হয়। মুসলিম লীগের ভ্রান্তনীতির ফলে দেশ তেমন উন্নতি লাভ করে নাই। শিক্ষা ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে, উদ্বাস্তুদের পূনর্বাসন করা হয় নাই। শিল্পখাতে উন্নয়ন হয় নাই, দুই বৎসরেরও অধিক কাল শূন্য আসনের উপনির্বাচন হয় নাই, সরকারের প্রায় প্রত্যেকটি স্তরে প্রশাসন ব্যবস্থার অধোগতি পরিলক্ষিত হয় এবং দিন দিন নিরাপত্তা আইনের তালিকা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং দারিদ্র্যপীড়িত জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রয়াসে এবং জনমতের জোরে সমস্ত দাবি পূরণের জন্য জনগণের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। পকেট বা সরকারী লীগের বিপরীতে এই সংগঠন হইবে জনগণের বা আওয়ামের। এই উপলক্ষ্যে গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগ সম্পূর্ণতর একটি পৃথক সংগঠন।[২]

দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় নিম্নরূপঃ

১। পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব, অখন্ডতা, মর্যাদা ও স্থায়িত্ব রক্ষা করা।

২। পাকিস্তানের সংবিধান ও আইনকানুন সত্যিকারের গণতন্ত্রের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা।

৩। পাকিস্তানের মুসলমানদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থ উন্নয়ন বজায় রাখা এবং পাকিস্তানের অন্যান্য অমুসলিম নাগরিকদের অনুরূপ অধিকার নিশ্চিত করা।

৪। পাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিকের জীবনের মৌলিক চাহিদা যথা খাদ্য, আশ্রয়, পরিধেয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা স্বাস্থ্যের ব্যাবস্থা করা এবং সৎ ও সম্মানজনক যোগ্যতায় আয়ের ব্যবস্থা করা।

৫। সাধারণ মানুষের জীবিকার মান উন্নয়ন করা এবং তাহার শ্রমের পূর্ণ বিনিময়ের ব্যবস্থা করা।

৬। স্বউদ্যোগে সমবায়ের ভিত্তিতে সমাজ-সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করা, জ্ঞানের প্রচারনা করা, সমতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা, দমন-পীড়ন

দূর করা, দুর্নীতি উচ্ছেদ করা, নৈতিক ও বিষয়গত মান উন্নয়ন করা।

৭। বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগ হইতে পৃথক করা এবং বিচার বিভাগ ও সরকারি কর্ম কমিশনের স্বাধীনতা বজায় রাখা। যুদ্ধ বা বিদ্রোহের ন্যায় জরুরী বিষয় ব্যতীত যে কোন আটকাদেশের পূর্বে অপরাধীর বিচারের ব্যবস্থা করা।

৮। বেসামরিক ব্যক্তিদের স্বাধীনতা যথা : ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ধর্মীয় স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, সমিতি ও সংগঠনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

৯। সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করা; প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ এবং সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা।

১০। জনগণের মধ্যে ইসলামের সঠিক জ্ঞান এবং ইহার উচ্চ নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ প্রচার করা।

১১। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।[৩]

উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া আওয়ামী মুসলিম লীগ ইহার কার্যক্রম আরম্ভ করে। তাৎক্ষনিকভাবে দলটি নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করে।

১। বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করা এবং চাষীর মধ্যে জমিদারের জমি সমভাবে বন্টন করা।

২। জাতীয় জীবনে অত্যাবশ্যকীয় প্রধান শিল্পসমূহ জাতীয়করণ করা এবং সরকারি উদ্যোগে শিল্পপ্রতিষ্ঠা করা এবং সাথে সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প কারখানাকে উৎসাহিত করা ও প্রসার করা।

৩। বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা এবং আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পূনর্গঠিত করা।

৪। প্রশাসনিক ও সামাজিক জীবন হইতে দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি ও সকল প্রকারের অসামাজিক কার্যকলাপ উচ্ছেদ করা।

৫। মোহাজিরদিগকে দেশীয় জীবনে পূনর্বাসন করিবার জন্য সাহস ও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং তাহাদিগকে উপকারী নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলা।

৬। রাষ্ট্রীয় স্বার্থে সোনালী আঁশ—পাটের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা; উৎপাদনকারীদের জন্য সর্বোচ্চ মূল্য নিশ্চিত করা এবং পাটের উপযুক্ত বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে যথেষ্ট সংখ্যক পাটকল স্থাপন করা।

৭। কৃচ্ছতা পালনের ব্যবস্থা করা, প্রশাসনিক ব্যয় প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পর্যায়ে নামাইয়া আনা এবং নিম্ন বেতনভোগী কর্মকর্তাদের সৎ জীবন যাপনের ব্যবস্থা করা।

৮। সমগ্র দেশে বিনা মূল্যে চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের জন্য একসারি সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা।

৯। কেন্দ্র ও প্রদেশ সমূহে রাজস্ব বন্টনের একটি ন্যায়ভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন করা।

১০। ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করা এবং কর্মশালা প্রতিষ্ঠার আইন প্রণয়ন করা এবং নিঃস্ব এতিমদের উপকারী নাগরিকে পরিণত করিবার জন্য তাহাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

১১। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সড়ক, রেলপথ ও নদীপথের ব্যবস্থা করা।[৪]

প্রতিষ্ঠার পর হইতে আওয়ামী মুসলিম লীগ পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে তৎপর হয়। ইতিমধ্যে অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং একজন জাঁদরেল সাংসদ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। জনদরদী মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং সুযোগ্য সাংসদ ও ব্যারিস্টার শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ শীঘ্রই পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলে। বিশেষতঃ মাওলানা ভাসানীর জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধাচরণ এবং সাধারণ কৃষক প্রজার সুখ দুঃখের ভাগী হইবার ফলে সাধারণ মানুষ এই দলের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে।

আওয়ামী মুসলিম লীগ শুধু মুসলমানদের একটি সংগঠন হইবার ফলে অমুসলিম জনগণ বিশেষতঃ মাওলানা ভাসানীর অনুসারী বামপন্থী ও কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ একটি সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে আওয়ামী মুসলিম লীগকে হেয় জ্ঞান করে। তাছাড়া উনিশ শত পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হইলে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্টগণ মাথা গুঁজিবার একটি সংগঠনের অভাবে খুবই বিপাকে পড়ে। সারা দেশব্যাপী ধর পাকড় আরম্ভ হইলে তাহারা আরও বিপদগ্রস্ত হয়। উল্লেখ্য, বামপন্থী কমিউনিস্টদের তৎপরতা এই দেশে তেমন ব্যাপক ছিল না। কিন্তু ১৯৪৯ সালে মহাচীন কমরেড মাও সে তুং এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট শাসনাধীন হইয়া পড়িলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তাহাদের কর্মকান্ড ব্যাপক প্রসারতা লাভ করে। এই বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভাবাইয়া তোলে। তাই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে একটি বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্যে এতদঞ্চলে পঞ্চাশের দশকে তাহারা সিয়াটো সেন্টোর ন্যায় বিভিন্ন সংস্থা গড়িয়া তোলে। তাহারই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানে কমিউনিস্ট দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।[৫]

অতএব, ১৯৫৫ সালের ২৩শে অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত দলের কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী মুসলিম লীগ মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়া দলটিকে অসাম্প্রদায়িক করিয়া সমস্ত সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর জন্য ইহার দ্বার অবারিত করে। দলের তৎকালীন সভাপতি এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাবটি উত্থাপন করিলে ইহা সাদরে গৃহীত হয় এবং তদনুযায়ী দলের গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হয়। মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেই অধিবেশনে মওলানা ভাসানী ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী উভয়ের আন্তরিক আবেদনের ফলে প্রস্তাবটি সহজেই গৃহীত হয়।[৬] মওলানা ভাসানী প্রস্তাবের স্বপক্ষে এত জোরালো ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন যে, গুটি কয়েক যাহারা এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন তাহারা চুপ হইয়া যান। ফলে ছয়শত কাউন্সিলরের মধ্যে মাত্র ছয় জন বিপক্ষে ভোট দেন।

যুগান্তকারী এই সিদ্ধান্ত লইবার পর ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে সমবেত কাউন্সিলারগণ অতি উৎসাহে শ্লোগান দেন–শহীদ-ভাসানী জিন্দাবাদ হিন্দু-মুসলমান-ভাইভাই। এই প্রথমবারের মত মুসলমানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি দল তাহাদের দরজা পাকিস্তানে বসবাসরত সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিল।

ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী কর্মধারা ঃ

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক। ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি জিন্নাহ্ করাচীতে গণপরিষদের অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র বিধায় উর্দু হইবে এখানকার রাষ্ট্রভাষা।[৭] বাঙ্গালিরা তাৎক্ষনিকভাবে ইহার বিরোধীতা করিয়া বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের শ্লোগান তোলে। ইতিপূর্বে একজন বাঙ্গালি মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন জিন্নাহ্র প্রতি সমর্থন জানাইতে গিয়া উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা করিবার শুপারিশ করিলে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় উঠে এবং হরতালের মাধ্যমে জনগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে । সেই বৎসর জিন্নাহ্ তাঁহার প্রথম পূর্ব বাংলা সফরে পুনরায় উর্দূর পক্ষে বক্তব্য দিলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হইয়া যায়। ১৯৪৮ সালের ২৭শে নভেম্বর লিয়াকত আলী খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় পুনরায় উর্দূর স্বপক্ষে রাষ্ট্রভাষার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করিলে ছাত্রদের প্রবল প্রতিবাদের মুখে তিনি বক্তৃতা শেষ করিতেও পারেন নাই। পূর্ব পাকিস্তানে প্রচন্ড আন্দোলন আরম্ভ হইলে সরকার বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার করে।

এই ভাবে রাষ্ট্রভাষা'র প্রসঙ্গে সরকার যতই উর্দূর স্বপক্ষে বক্তৃতা বিবৃতি প্রদান করে ততই পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব গড়িয়া উঠে এবং একটি পৃথক বাঙালি জাতীয়তার উন্মেষ ঘটে। জনসাধারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকে মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির নামে তাহাদিগকে প্রবল ধোকা দেয়া হইয়াছে। ১৯৫২ সালে খাজা নাজিমুদ্দীন প্রধানমন্ত্রী হইবার পর উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা করিবার বিষয়টি পুনরায় ঘোষণা দিলে প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে জনগণ গণরোষের বিস্ফোরণ ঘটায়। ৩০শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা প্রতিবাদ সভা করে, এবং সমগ্র ঢাকা শহরে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। অতঃপর রাজনীতিবিদরাও আগাইয়া আসেন। সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করিয়া তাঁহারা আন্দোলনে যোগদানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রদেশ ব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী করিয়া সভা সমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ছাত্র জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া মিছিল বাহির করে। পুলিশের গুলিবর্ষনে কয়েকজন ছাত্র নিহত হয়, ইহাদের মধ্যে বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক উল্লেখযোগ্য। ছাত্র নিহত হইবার খবর সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িলে ভাষা আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। মাতৃভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনায় রূপলাভ করে।

ভাষা আন্দোলনের উপর ব্যাপক গণ সমর্থনে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে বাংলাকে অবশ্যই দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হইবে। সংবিধানের মূলনীতি কমিটির দ্বিতীয় খসড়ায় তাই বাংলা ও উর্দুকে সমভাবে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ও উর্দুকে সমভাবে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। রক্তদান এবং আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে লাভ করিবার মধ্য দিয়া বাঙ্গালি মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মলাভ করে যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীকার অর্জন ছাড়া তাহাদের চিন্তা চেতনার মুক্তি লাভ হইবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ

করিবার পাশাপাশি তাহাদের মন মানসিকতার স্বতন্ত্র বিকাশেও বাধা সৃষ্টি করে। তাই বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের সিঁড়ি ধরিয়া বাঙ্গালি মনে স্বাধীনতার চেতনা জন্ম লাভ করে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বিতীয় মাইল ফলক ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতসীন মুসলিম লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য সম্মিলিত বিরোধী দল কর্তৃক গঠিত যুক্তফ্রন্ট নামক এক শক্তিশালী জোট গঠন। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনে লক্ষ্য করা গিয়াছে, ক্ষমতাশীন মুসলিম লীগ সরকার পূর্বপাকিস্তান তথা বাঙ্গালি মন মানসিকতা এবং অর্থনৈতিক মুক্তির সম্ভাবনাকে অংকুরে বিনষ্ট করিবার এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। গুটি কয়েক রাজনীতিবিদ ছাড়া অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানী পূর্ব পাকিস্তানকে একটি উপনিবেশ হিসাবে দেখিতে অভ্যস্ত হয়; পাকিস্তানের দুইটি অংশ সমভাবে উন্নত হউক তা তাহারা চান না। সে কালে পাকিস্তানের পয়লা নম্বরের বৈদেশিক মুদ্রা আহরনের পণ্য ছিল পাট। সেই পাট একচেটিয়া ভাবে উৎপন্ন হয় পূর্ব পাকিস্তানে। অথচ পাট রপ্তানী করিয়া প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। এই অবস্থার ছেদ টানিবার জন্য ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া বিরোধী দল নির্বাচনী জোট গঠন করে। দলগুলি হইল শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, এ.কে.ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক শ্রমিক পার্টি, মাওলানা আতহার আলীর নেতৃত্বাধীন নেজামে ইসলাম পার্টি এবং গণতন্ত্রী দল। যুক্তফ্রন্ট নামে গঠিত এই নির্বাচনী জোট সুবিখ্যাত ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। উল্লেখ্য, একমাত্র মাওলানা ভাসানী ব্যতীত জোটের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃবৃন্দের কেউই ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মুসলিম লীগের সক্রিয় সদস্য ছিলেন না; বরং কেউ কেউ অবিভক্ত ভারতের পক্ষপাতী ছিলেন। নির্বাচনে জয়লাভের কয়েক মাসের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গিয়া গেলেও এই কর্মসূচি দেশের পরবর্তী রাজনীতিতে এক সুদূরপ্রসারী অবদান রাখিতে সক্ষম হয়।

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৮টি আসন লাভ করে এবং এ,কে, ফজলুল হক পূর্ব বাংলা প্রদেশে সর্বপ্রথম নির্বাচিত সরকার গঠন করেন। কিন্তু দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে গভর্ণর জেনারেল এক আদেশ বলে প্রাদেশিক সরকার ভাঙ্গিয়া দেন। তখনও প্রচলিত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আইনের ৯২ ক ধারা মোতাবেক গভর্ণর জেনারেল মনোনীত গভর্ণরের মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন জারী করেন। এইভাবে পূর্ব বাংলায় (তখনও পূর্ব বাংলা ছিল প্রদেশের সরকারি নাম) নির্বাচিত একটি সরকারকে বিলুপ্ত করা হয়। এ. কে. ফজলুল হককে বরখাস্ত করিবার সময় পাকিস্তানের বাঙ্গালি প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতার বিরুদ্ধে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনেন।[৮]

২১ দফা কর্মসূচি বাঙ্গালীদের সংগ্রামে সমানাধিকারের সনদ হিসাবে পরবর্তীকালের রাজনৈতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখে। ইহাতে পাটশিল্পের জাতীয়করণ এবং

পাট উৎপাদকের জন্য ন্যায্যমূল্য স্থিতিকরনের মত কতিপয় নূতন দাবী সংযোজন করা হয়। শ্রমিক ও কৃষকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ছাড়াও স্বায়ত্তশাসনের সমস্যা সমাধানের বিষয়টি ছিল কর্মসূচির অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক। ২১ দফার ১৯নং দফায় কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র দপ্তর ও মুদ্রা ব্যবস্থা এই তিনটি বিষয় কেন্দ্রের হাতে রাখিয়া লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন প্রদানের দাবিটি ছিল উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দাবির মধ্যে ছিল পাট শিল্পের জাতীয়করণ ও পাট চাষীদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ (৪নং দফা), বন্যা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধকল্পে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ (৭নং), শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার প্রচলন (১০নং), ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন বাতিল করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্বায়ত্বশায়ন প্রদান (১১নং), উচ্চ ও নিম্নপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য দূরীকরণ (২নং), রাজনৈতিক নেতাদের উপর নির্যাতনকারী বিশেষ নিরাপত্তা আইনের বিলোপ সাধন (১৪ নং), ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ (১৭ নং), ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের সম্মানে ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় দিবস হিসাবে ঘোষনা (১৮নং), ইত্যাদি। ইহা ছাড়াও কর্মসূচীতে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তিদান, মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিতকরণ, প্রশাসনযন্ত্রের গণতন্ত্রীকরণ, সকল নিবর্তনমূলক আইন বিলুপ্তি এবং কোরআন সুন্নাহর বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন না করিবার কথা জানানো হয়।

২১ দফা কর্মসূচিতে পূর্ববাংলার জনগণ ব্যাপক সাড়া দেয়; এইগুলি তাহাদের আশা-আকাঙ্খার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিধায় জনগণ এইগুলি মানিয়া লয়। মুসলিম লীগের প্রতি মানুষের বীতশ্রদ্ধ হইবার একটি বিশেষ কারণ হইল পূর্ব বাংলার মানুষ তাহাদের যে কোন দাবী দাওয়ার জবাবে “ইসলাম বিপন্ন” “পাকিস্তান শিশু রাষ্ট্র” “পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি” ইত্যাদি কতগুলি গৎ বাধা কথা শুনিতে শুনিতে মানুষ অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। অথচ এইসব কথার ফাঁকে ফাঁকে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে পূর্ব বাংলাকে দারুণভাবে বৈষম্যের শিকার করিয়া তোলে। ফলে ধীরে ধীরে পূর্ব বাংলার মানুষের মনে পশ্চিম পাকিস্তানীদের যাঁতাকল হইতে বাহির হইয়া আসিবার অদম্য স্পৃহা জাগিতে থাকে। জনগণ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসায়; কিন্তু ৯২-ক ধারার মাধ্যমে মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করিয়া কেন্দ্রের শাসন চাপিয়া দিবার ফলে পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হয় এবং ধীরে ধীরে দেশ স্বাধীনতার বাসনা লইয়া অগ্রসর হয়।

অতঃপর পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি লইয়া বাঙ্গালীরা আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের ক্ষমতায় অংশীদার হইবার অদম্য স্পৃহার কারণে স্বায়ত্বশাসনের বিষয়টি অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। ফলে স্বায়ত্বশাসন এবং বাঙ্গালীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রক্রিয়া মারাত্মক ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনের পর হইতে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সেই কারণেই এতদঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা ছিল প্রায় স্থবির। নেতৃত্বের দিকভ্রান্তি, লোভ-লালসা, স্বার্থচিন্তা, ক্ষমতার সান্নিধ্য, আদর্শিক ভাবনা ও রাজনৈতিক হতাশা ইত্যাদি বিবিধ কারনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বাধাগ্রস্ত হয়। আওয়ামী লীগ বিশেষ করিয়া ১৯৫৪ সাল হইতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় যাইবার

প্রচেষ্টায় থাকিয়া স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করে।[৯] অন্যদিকে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন বামপন্থীরা তাহাদের আদর্শগত ও আন্তর্জাতিক সংযোগের কারনে ষাটের দশকে একই পন্থা অবলম্বন করিয়া দেশবাসীকে হতাশ করে। পূর্ব পাকিস্তানে গভর্ণরের শাসন বলবৎ থাকা অবস্থায়ই শহীদ সোহরাওয়ার্দী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর অধীনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার আইনমন্ত্রী হিসাবে যোগদান করেন। অথচ দেশ বিভক্তির আগে এই ব্যক্তিই সোহরাওয়ার্দীর পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। সোহরাওয়ার্দীর মাধ্যমেই প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের বিষয়টি ঝুলাইয়া রাখা হয়। আওয়ামী লীগ স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে বিশ্বাসী হইয়াও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাসাম্য নীতি এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিটে বহাল রাখা সমর্থন করে।[১০] আওয়ামী লীগের দ্বারাই পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তানে পরিবর্তন করা হয়। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্বশাসনের সুকঠিন আন্দোলন স্তিমিত হয় এবং একক পাকিস্তান কাঠামোর অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সমঝোতামূলক ও কার্যকর সাংবিধানিক অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করিবার প্রক্রিয়া সুদূর পরাহত হইয়া যায়।

১৯৫৬ সালের সংবিধান ঃ

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর হইতে একটি সংবিধান প্রণয়নের প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছিল। উল্লেখ্য ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই ভারতে দুইটি পৃথক রাষ্ট্র, ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিধান সৃষ্টি করিয়া ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত হয় ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন। এই আইনের বলে ভারতকে দ্বিখন্ডিত করা হয় বলিয়া ইহাকে ভারত বিভক্তি আইনও বলা হয়। যথাক্রমে, হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার ভিত্তিতে বা দ্বিজাতিতত্ত্ব নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র দুইটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাতীয় কংগ্রেসের দাবী অনুযায়ী পাঞ্জাব ও বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়। আইনের ৩ (১) অনুচ্ছেদ বলে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনস্থ বাংলা প্রদেশের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা নামে দুইটি পৃথক প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়, যাহার পূর্ব বাংলা মুসলিম সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে পড়ে পাকিস্তানের অংশে আর হিন্দু সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে পশ্চিম বাংলা পড়ে ভারতের অংশে। অনুরূপভাবে পশ্চিম পাঞ্জাব পড়ে পাকিস্তানের অংশে আর পূর্ব পাঞ্জাব পড়ে ভারতের অংশে। তবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন মোতাবেক ভারত স্বাধীনতা আইনে উভয় রাষ্ট্রের জন্য ফেডারেল কাঠামো বহাল রাখা হয়। ৮নং অনুচ্ছেদে বলা হয় উভয় রাষ্ট্রের আইনসভা নিজ নিজ রাষ্ট্র পরিচালনা করিবার জন্য গণপরিষদ হিসাবে যথাক্রমে আইন প্রণয়ন করিবে। ৮(২)নং অনুচ্ছেদে বলা হয় নূতন আইন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে তাহা পরিপূর্ণ আইন হিসাবে রাষ্ট্রগুলির উপর বলবৎ করা যাইবে।[১১]

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানকে ডোমিনিয়ন মর্যাদার স্বাধীনতা দেয়া হয়। ইহার অর্থ হইল দেশের একজন গভর্ণর-জেনারেল থাকিবেন যিনি সরকারের পরামর্শমত ব্রিটিশ রানী কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। যতদিন পর্যন্ত দুই দেশের গণপরিষদ নূতন সংবিধান রচনা করিয়া স্ব স্ব দেশকে প্রজাতন্ত্র বা অন্য কোন ব্যবস্থা ঘোষনা না করিবে ততদিন গভর্ণর জেনারেল

ব্রিটিশ রানী কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। ১৯৫০ সালে ভারত ইউনিয়ন একটি নূতন সংবিধানের আওতায় প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষিত হয় এবং তখন হইতে সংসদীয় রীতি অনুযায়ী ভারতের প্রেসিডেন্ট সংসদের ভোটে নির্বাচিত হন। কিন্তু পাকিস্তানে শুরু হইতে প্রধানমন্ত্রীগণ সংবিধানের মূলনীতি ঘোষনা করেন। এইগুলির উপর বিতর্ক করেন কিন্তু পুর্নাঙ্গ সংবিধান রচনা করিতে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান নেজাম ইসলাম পার্টির চৌধুরী মুহাম্মদ আলী ১৯৫৬ সালে একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করেন। গণ পরিষদে ইহার উপর অনেক বিতর্কের পর ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ ইহা পাশ হয়। সংবিধানে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষনা করা হয় এবং সংসদীয় পদ্ধতির সরকার কাঠামো সৃষ্টি করা হয়।

১৯৫৬ সালের সংবিধান চালু করিবার মধ্য দিয়া দেশ গণতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হয়। ফেডারেল সরকারের অওতায় প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের কিঞ্চিৎ রূপরেখা প্রদান করা হয়। সংবিধানে উল্লেখিত প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের পরিমান ছিল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অনুরূপ। মূল বিষয়সমূহ ক্ষেত্র বিশেষে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ফেডারেল সরকারের হাতে সংরক্ষিত করিয়া রাখা হয়। ফেডারেল আইনসভার তালিকায় সংরক্ষিত বিষয়ের সংখ্যা ৫৯ হইতে ৩০ টিতে কমাইয়া আনা হইলেও মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে আরও কেন্দ্রীভূত করা হয়। উপরন্তু নৌ, সেনা ও বিমান বাহিনীর পূর্ত কাজকর্ম, প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত শিল্প, পারমানবিক শক্তি ও তাহার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ এবং অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক উৎপাদনের বিষয়গুলি ফেডারেল তালিকার অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কর এবং বৈদেশিক মুদ্রার আকারে পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃক জাতীয় বাজেটের অধিকাংশ ব্যয় পূরণ করা হয়। অন্যদিকে প্রতিরক্ষা ব্যয় মোট বাজেটের প্রায় ৬০ শতাংশ অধিকার করায় প্রতিরক্ষা বিনিয়োগ, পূর্তকাজ, শিল্প, সংস্থাপনা; চাকুরী ও ঠিকাদারীর আকারে প্রতিরক্ষা বাজেটের প্রায় পুরোটাই নিয়ন্ত্রিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের মাধ্যমে। এইভাবে সরকারী ৬০ শতাংশ বাজেট বরাদ্দের উপর পূর্ব পাকিস্তানের কোন হিসসা ছিল না।[১২]

অর্থ সংকুলান ও রাজস্ব উৎসের ক্ষেত্রে ১৯৩৫ সালের আইনের বন্টন প্রথা পুরাপুরি বহাল রাখা হয়। অর্থাৎ ফেডারেল সরকারের হাতে বেশিরভাগ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রাদেশিক সরকারকে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল রাখিয়া প্রদেশকে এক ধরনের ভিক্ষুকে পরিণত করা হয় এবং ইহা প্রকটভাবে অনুধাবন করা হয় পূর্ব পাকিস্তানে।

পাকিস্তানে একটি কার্যকর ফেডারেল পদ্ধতি পরিচালনার পূর্বশর্ত ছিল বাস্তবভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে ক্ষমতা কাঠামোর অঙ্গীভূত করা। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হইয়াছিল একটি অবৈধভাবে গঠিত গণপরিষদের মাধ্যমে এবং ইহাতে পুর্ব পাকিস্তানর প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হইয়া আসিলেও পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যগণ নির্বাচিত হইয়া আসেন নাই। যে প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়, তাহাতে স্বভাবতঃই মনে হয় যে সম্প্রতি পাকিস্তানের ক্ষমতাশীন গোষ্ঠী পাকিস্তান সৃষ্টির দিন হইতে অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন যে শীঘ্র হোক বা বিলম্বে হোক পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। সেইজন্য তাহারা প্রথম হইতেই সুযোগের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন, যতদিন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান তাহাদের নিকট অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাজনক বলিয়া প্রতিপন্ন না হইবে ততদিন তাঁহারা পূর্ব পাকিস্তানকে

প্রয়োজনবোধে শক্তি প্রয়োগের দ্বারা ধরিয়া রাখিবেন এবং যখন সেইখান হইতে লইবার মত কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না তখন তাহার দায়দায়িত্ব ছাড়িয়া দিবেন।[১৩]

১৯৫৬ সালের সংবিধানের সমালোচনা ঃ

১৯৫৬ সালের সংবিধান লইয়া পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৫ই জানুয়ারী ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মাওলানা ভাসানী ১৯৫৬ সালের খসড়া শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে পল্টন ময়দানের এক সভায় সভাপতির ভাষনে বলেন ঃ প্রস্তাবিত খসড়া শাসনতন্ত্র পাকিস্তানের সাত কোটি নির্যাতিত জনসাধারনকে চির-শৃংখলাবদ্ধ করার এক মহা ষড়যন্ত্র। কিন্তু সংগ্রামের ঐতিহ্যবাদী পূর্ববাংলার জনসাধারন গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠীর এই হীন চক্রান্তকে বরদাশত করিবে না। আমরা জীবনের বিনিময়েও কায়েমী স্বার্থবাদীদের রচিত এই গণবিরোধী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রাচীর গড়িয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর।"[১৪] মাওলানা ভাসানী অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের প্রতিবাদে ১৬ই জানুয়ারী হইতে ২২শে জানুয়ারী পর্যন্ত সাতদিন প্রদেশের ছাত্র, যুবক, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে কালো ব্যাজ ধারণ করিতে বলেন এবং ২৯শে জানুয়ারি প্রদেশব্যাপী অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রতিরোধ দিবস পালনের আহ্বান জানান। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে একুশ দফার ভিত্তিতে জনগণের স্বার্থের অনুকূল একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র দাবী করা হয়–যাহাতে স্পষ্টতঃ বলা হয় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি দান, যুক্ত নির্বাচন, আঞ্চলিক শায়ত্বশাসন এবং সংখ্যা সাম্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে।

মাওলানা ভাসানী তাঁহার ভাষণে শাসকচক্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, গত আট বৎসরে কেন্দ্র পূর্ব বাংলাকে শোষণ করিয়া এবং ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া অর্থনৈতিক দিক হইতে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ফলে পূর্ব বাংলায় বেকারত্ব বাড়িয়াছে, শিক্ষিত যুবক রোজগার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা লোপ পাইতে চলিয়াছে। কৃষক শ্রমিকের রোজগারের পথ রুদ্ধ হওয়ায় তাহারা বর্তমানে বাড়ি ঘর বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শাসনতন্ত্র সম্পর্কে তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের হাতে সমস্ত অর্থকরী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব বাংলায় বিক্রয় কর; সুপারি, তামাক, ও পাটের উপর ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স ও পার্চেজ ডিউটি, ব্যবসায় বাণিজ্য সমস্তই কেন্দ্রের হাতে দিয়া পূর্ব বাংলা প্রদেশকে অর্থনৈতিক দিক হইতে অচল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি দাবী করেন যতদিন পর্যন্ত পূর্ব বাংলার বঞ্চিত অর্থ দেওয়া না হইবে ততদিন পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্র হইতে কোন অর্থ মঞ্জুর করা হইবে না। তিনি আশঙ্কা করেন, পূর্ব বাংলার উপর যদি নির্যাতন ও শোষণ অব্যাহত থাকে তবে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে এই প্রদেশের জনসাধারনের ভবিষ্যৎ বংশধর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে চিন্তা করিবে।[১৫]

সংবিধান চালু হইবার পর শাসনতন্ত্রবলে প্রেসিডেন্টের পদমর্যাদা করায়ত্ত হইলে ইস্কান্দার মীর্জা এইবার তাহার প্রতিনায়কের ভূমিকায় আবির্ভূত হন। ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া তিনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে থাকেন। তিনি শাসনতন্ত্রকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও দর কষাকষির মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন। কে

কোন রাজনৈতিক দলে অবস্থান করিতেছে তাহা বুঝা দুষ্কর হইয়া পড়ে। আজ যে মুসলিম লীগে তাহাকে আগামী কাল রিপাবলিকান দলে দেখা যায়। কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী বা প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী কেউই সরাসরি প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক প্রভাবের বাহিরে ছিলেন না। ইস্কান্দার মির্জা কর্তৃক সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে অপসারন কিংবা পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হইবার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে ঢাকা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তবলে গভর্নর হামিদ আলী কর্তৃক মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারকে অপসারন ইহাই প্রমাণ করে যে, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের অধীনে প্রধানমন্ত্রী কিংবা প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীর পদ অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধানের চাইতে নিশ্চয়তাপূর্ণ রাখা হয় নাই।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) অভ্যুদয় ঃ

১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইস্কান্দার মীর্জা প্রভাবশালী বাঙালি ও আওয়ামী লীগ নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিলে তিনি ঘোষনা দেন যে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পূর্ব বাংলার জন্য ৯৮ শতাংশ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার এই ঘোষনা তাঁহার দল আওয়ামী লীগে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। আওয়ামী লীগ প্রথমে সুপ্তভাবে এবং পরে প্রকাশ্যভাবে দ্বিধাবিভক্তির দিকে অগ্রসর হয়। আন্তর্জাতিকভাবে সিয়াটো (S.E.A.T.O) ও সেন্টো (C.E.N.T.O) সামরিক চুক্তির প্রতি সোহরাওয়ার্দীর খোলাখুলি সমর্থনদান ছিল ২১ দফা কর্মসূচিতে প্রতিশ্রুত পাকিস্তানের জোট নিরপেক্ষ ও স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির পরিপন্থী। কেন্দ্রীয় সরকারে আওয়ামী লীগের এই নীতি বিচ্যুতিকে বামপন্থী সহযোগীগণ সমর্থন করেন নাই। ফলে দলে ভাঙ্গন অত্যাসন্ন হইয়া উঠে।

১৯৫৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ টাঙ্গাইলের কাগমারীতে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে এক সভায় মিলিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই সভায় যোগদান করেন। এই সভায় মাওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করিবার অভিযোগ উত্থাপন করেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী দৃঢ়ভাবে ইহার বিরোধীতা করেন এবং দাবী করেন যে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ৯৮ শতাংশ স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হইয়াছে। এই সম্মেলনেই মাওলানা তাঁহার প্রসিদ্ধ ভাষনে বলেন, "তোমরা যদি পূর্ব পাকিস্তানে তোমাদের শোষণ অব্যাহত রাখিতে চাও, যদি তোমরা পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবী মানিয়া না লও, তাহা হইলে পশ্চিম পাকিস্তানী ক্ষমতাশীন গোষ্ঠীর কাছে আমার একটা বক্তব্যই আছে–তাহা হইল আসসালামু আলাইকুম-তোমরা তোমাদের পথে যাও, আমাদের পথ আমরা বাছিয়া লইব।" তাৎক্ষনিকভাবে মাওলানাকে একজন কমিউনিস্ট, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ভারতের দালাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কেন্দ্রের সমর্থনে আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগ মাওলানার সমর্থক ছাত্র ইউনিয়নের উপর নির্যাতন চালায়। শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীর ডান হাত হিসাবে তাঁহার সকল কাজ ও ধারনার প্রতি সমর্থন দিয়া মাওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পক্ষাবলম্বন করেন। এইভাবে সোহরাওয়ার্দী ও আওয়ামী লীগের মূল অংশ পাকিস্তানের 'জাতীয় সংহতির' রক্ষক হিসাবে চিহ্নিত হন।[১৬]
অতঃপর আওয়ামী লীগ মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এক গ্রুপ এবং হোসেন শহীদ

সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আরেক গ্রুপে বিভক্ত হইয়া যায়। এই অবস্থায় মাওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালের ২৫শে জুলাই ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে সকল প্রগতিশীল শক্তির সমন্বয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন। রূপমহল সিনেমা হলে এবং পরে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ন্যাপ আওয়ামী লীগের রোসানলে পতিত হইয়া আক্রমণের শিকার হয়। আওয়ামী বাহিনীর আক্রমণে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত খান আব্দুল গফফার খান, জি. এম. সৈয়দ, মিয়া ইফতেখার উদ্দিন প্রমুখ বামপন্থী নেতৃবৃন্দ "রাষ্ট্রবিরোধী" পাকিস্তানের সংহতি ভঙ্গকারী" হিসাবে আক্রমণের মুখে পড়েন, এবং পল্টনের জনসভা শেষ পর্যন্ত পন্ড হইয়া যায়।
১৯৫৬ সালের সংবিধানের আওতায় ১৯৫৯ সালে সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষনা দেওয়া হয়। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে পাকিস্তান গনতন্ত্রের পথে এক বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু আমলা, সেনানায়কগণ ও নব্য পুঁজিবাদী গোষ্ঠী এই নির্বাচনে জনপ্রতিনিধিদের আগমন আশংকায় ভীত হয়। বার বৎসরে অবস্থান সংহতকারী ও সম্পদ আহরণকারী আমলা, সেনাবাহিনী, নব্য পুঁজিবাদী ও অভিজাত শ্রেণীর জন্য প্রস্তাবিত নির্বাচন ছিল একটি হুমকি। তাই তাহারা পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বানচাল করিবার ষড়যন্ত্রে একে অপরের সঙ্গে হাত মিলায়। অবশ্য রাজনৈতিক পরিস্থিতিও তাহাদের সহায়তায় আসে, ফলে ১৯৫৮ সালের ২৬শে মে দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়।

পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ১৯৫৮ ঃ

পাকিস্তান যখন ১৯৫৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিতেছিল সে সময় ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসেন এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল ঘোষনা করেন। জেনারেল আইয়ুব খান ব্রিটিশ রাজকীয় সেনাবাহিনীর একজন সাবেক অফিসার, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি বার্মা ফ্রন্টে যুদ্ধ করেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবার এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা লইয়া আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু বাহ্যিকভাবে দেশ হইতে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, চোরাচালান রোধ করিবার সংকল্প তিনি জোরালোভাবে ব্যক্ত করেন। দেশীয় বাজার তখন চোরাকারবারীদের দ্বারা আনয়ন করা বিদেশী পণ্যে সয়লাব। দেশের প্রথম সামরিক আইন হিসাবে সাধারণ মানুষ ইহাতে তেমন বিচলিত বা সম্পৃক্ত হয় নাই বরং সামরিক প্রশাসনের কিছু দুর্নীতি বিরোধী পদক্ষেপে সন্তুষ্টই হয়। ১৯৫৮ সালের ২৭শে অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে অপসারণ করিয়া আইয়ুব খান সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন।

আইয়ুব খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পূর্বে লক্ষ্য করা গিয়াছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারন করিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন পাট বিদেশে রফতানী করিয়া পাকিস্তান প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে; কিন্তু সেই টাকার সিংহভাগ খরচ হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। সিভিল সার্ভিস, সামরিক বাহিনী, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বৈদেশিক সার্ভিস সহ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান অগ্রগামী থাকে, আর পূর্ব পাকিস্তান উহার ন্যায্য হিস্যা হইতে বঞ্চিত হয়। নিম্নলিখিত ছকে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

১৯৫৫ সাল পর্যন্ত

পদমর্যাদা	পূর্ব পাকিস্তান	পঃ পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান মোট সংখ্যা
সচিব	০০	১৯	–
যুগ্ম সচিব	৩	৩৮	৭.৩%
উপসচিব	১০	১২৩	৭.৫%
সহসচিব	৩৮	৫১০	৭.০০%

সশস্ত্রবাহিনীর অফিসার

বাহিনী	পূর্ব পাকিস্তান	পঃ পাকিস্তান
সেনাবাহিনী	১৪	৮৯৪
নৌবাহিনী	৭	৫৯৩
বিমানবাহিনী	৬০	৬৪০

সামরিক শাসক স্বীকার করেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য উহার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তিনি এই বৈষম্য দূরীকরণের অঙ্গীকার করেন। কিন্তু বাস্তবে তাহা হয় নাই। সময়ান্তরে দেখা গিয়াছে যে, একনায়কতান্ত্রিক প্রক্রিয়াধীনে দুর্নীতি অপ্রতিহত গতিতে অব্যাহত রহিয়াছে এবং জাতীয় সম্পদ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় পুঁজিপতিদের হাতে। মৌলিক অধিকার স্থগিত থাকায় এবং রাজনৈতিকদলসমূহ নিষিদ্ধ থাকায় জাতীয় সম্পদ আরও কম সংখ্যক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে। এই সময় রাজনৈতিক ক্ষমতায় বাঙ্গালিদের কোন হিস্যা না থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের উপর শোষণের প্রক্রিয়া এক চরমতম পর্যায়ে উপনীত হয়। আইয়ুবের প্রবৃদ্ধিমুখী অর্থনীতি ধনীকে আরও ধনী এবং দরিদ্রকে দরিদ্রতর করিয়া তোলে এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বিদ্যমান বৈষম্য সবচাইতে প্রকট হইয়া উঠে। আইয়ুবের শাসনামলেই দেশে বিখ্যাত ২২ পরিবারের সৃষ্টি হয়। ইহাদের সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী এবং ইহাদের নিয়ন্ত্রনে ছিল দেশের ৮০ শতাংশ ব্যাংক ব্যবসায়, ৯০ শতাংশ বীমা ব্যবসায় এবং ৬০ শতাংশ শিল্প সম্পদ।

সামরিক আইন জারীর সঙ্গে সঙ্গে মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান এবং কয়েক হাজার রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। এই সুযোগে ১৯৫৯ সালে সামরিক সরকার নির্বাচিত পদের অযোগ্য আদেশ" (Elective Bodies Disqualifiction Order) বা সংক্ষেপে EBDO নামের এক আদেশ বলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় বড় বড় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করে। "সরকারী চাকুরী অযোগ্য আদেশ" (Public Office Disqualification Order) বা সংক্ষেপে PODO নামের এক আদেশ বলে ৩০৩ জন সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাকে চাকুরীর অযোগ্য ঘোষণা করে। নির্মম সামরিক প্রশাসনাধীনে চারি বৎসর দেশে কোন রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল না। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) পরস্পরের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক রাজনীতিতে ঘোর কলহে লিপ্ত থাকায় আইয়ুবের ব্যক্তি স্বাধীনতাবিহীন শাসনামল জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহকে তাহাদের অবস্থান সংহতকরণে সহায়তাও করে, যাহা অন্য

সময়ে অত্যন্ত কঠিন ছিল। ১৯৬০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি দেশে এক গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। কোন বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই গণভোটে আইয়ুব খানকে একটি শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষমতা দেয় এবং আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হন।

১৯৬০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি জেনারেল আইয়ুব খান একটি শাসনতান্ত্রিক কমিশন গঠন করেন। কমিশন দেশের রাজনীতিবিদগণ এবং বেসামরিক শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করে। কমিশন তথ্য প্রকাশ করে।

১। যথাযথ নির্বাচনের অভাব এবং বিগত সংবিধানে ত্রুটি

২। মন্ত্রণালয় এবং রাজনৈতিক দলসমুহের উপর রাষ্ট্রপ্রধানদের অবাঞ্চিত হস্তক্ষেপ এবং প্রাদেশিক সরকার প্রশাসনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

৩। সুসংগঠিত ও সুশৃংখল রাজনৈতিক দলসমূহে নেতৃত্বের অভাব, রাজনীতিবিদদের চরিত্রহীনতা এবং প্রশাসনে তাহাদের অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপ।[১৭]

কমিশন সুপারিশ করে যে, পাকিস্তানের নাগরিকগণ দেশের প্রেসিডেন্ট কিংবা আইনসভার সদস্যদের নির্বাচিত করিবার যোগ্যতা সম্পন্ন নন বিধায় উচ্চতর আসনসমূহে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রয়োগ থাকা সুবিবেচনাপ্রসূত হইবে না। সে অনুযায়ী এক ধরনের সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বুনিয়াদি গণতন্ত্রীদের (Basic Democrats) মাধ্যমে দেশের প্রথম নির্বাচনের পরামর্শ দেওয়া হয়। কমিশন নির্বাহী বিভাগের উপর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ রক্ষাকারী শক্তিশালী আইনসভা ভিত্তিক একটি আমেরিকান পদ্ধতির অনুরূপ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার গঠনের সুপারিশ করে। ইহাতে একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা এবং পাকিস্তানের দুইটি অংশ হইতে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করিবার সুপারিশ রাখা হয়।

শাসনতান্ত্রিক কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৬২ সালের সংবিধান রচিত হয়, যাহাতে একটি শক্তিশালী কেন্দ্র রাখা হয়, আমেরিকান পদ্ধতির রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার গঠনের (Presidential form of Government) ব্যাবস্থা রাখা হয়। প্রেসিডেন্ট সরাসরি নির্বাচিত না হইয়া মৌলিক গণতন্ত্রী বা বুনিয়াদি গণতন্ত্রীদের দ্বারা নির্বাচিত হইবার ব্যবস্থা রাখা হয়। মৌলিক গণতন্ত্রীদের সাধারণ নির্বাচনে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি প্রদেশে (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত ৮০,০০০ (প্রতি প্রদেশে ৪০,০০০) সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচকমন্ডলীর ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়। কিন্তু ক্ষমতা ধারনের বিবেচনায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আমেরিকা বা ফরাসী প্রেসিডেন্টের চাইতেও অধিক শক্তিশালী। ১৯৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রীদের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। একই বৎসর নির্বাচনের পূর্বে ১৯৫৯ সালের "নির্বাচিত পদের অযোগ্য আদেশ" বলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়।

এদিকে শক্তিশালী কেন্দ্রের ধুয়া তুলিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলার এক ভয়াবহ চিত্র ফুটিয়া উঠে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান অগ্রণী ভূমিকা পালন করিলেও উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান

ক্রমশঃ পিছাইয়া যাইতে থাকে। অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিতকরণ এবং শক্তিশালী কেন্দ্রের কথা বলিয়া পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের মূলে কুঠারাঘাত করিবার প্রতিবাদে ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র আন্দোলন আরম্ভ হয়।

১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে গণ অসন্তোষ দানা বাঁধিয়া উঠিলে আইয়ুব খান তড়িঘড়ি পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা স্বীকার করেন। তদনুযায়ী জাতীয় অর্থ কমিশনের সুপারিশে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন বাজেটে ১১ কোটি টাকা বরাদ্ধ দেয়া হয়। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায়ও এই ধরনের কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ১৯৬২ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (PIDC) এবং পরবর্তীকালে রেলওয়েকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া পাকিস্তান পূর্ব রেলওয়ে ও পাকিস্তান পশ্চিম রেলওয়ে নামে আখ্যায়িত করা হয়। মূলতঃ শাসনতান্ত্রিক কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত বাঙ্গালিদের শান্ত করিবার লক্ষ্যেই এই সমস্ত পদক্ষেপ লওয়া হয়। কিন্তু ক্ষমতায় বিকেন্দ্রীকরণ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারনে অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে থাকে। এই অসন্তোষ ক্রমশঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করে। তদুপরি ১৯৬২ সালের সংবিধান জারীর পর হইতে জাতীয় সম্প্রীতি অর্জনের পরিবর্তে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আরও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। অতঃপর রাজনৈতিকভাবে একটি একক রাষ্ট্রের স্থলে পাকিস্তানে শুরু হয় বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পরামর্শদাতাগণ পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের মনোভাব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা কখনও করেন নাই। ব্যাপক স্বায়ত্বশাসনের দাবির মুখে তাহারা ক্ষমতা কেন্দ্রায়নের উপরই অধিক গুরুত্ব দেন। তাঁহারা মনে করেন কেবলমাত্র একটি শক্তিশালী কেন্দ্রই পাকিস্তানকে অখন্ড রাখিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক সমঝোতা বা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরনের মাধ্যমেই কেবল একক রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান টিকিয়া থাকিতে পারিত। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নিজেদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড নিজেদের মত করিয়া পরিচালনা করিতে না পারায় দিনে দিনে ক্ষোভ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৬২ সালের সংবিধানের প্রতিবাদে দিনের পর দিন ছাত্র বিক্ষোভ চলিতে থাকে। এই ধরনের বিক্ষোভ চলাকালে তাহারা সংবিধানের কপিতে অগ্নিসংযোগ করে এবং পূর্ববর্তী সংবিধান পূনর্বহালের দাবি করে।

১৯৬০ সালের ১লা মার্চ আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্র জারি হইবার পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অংশের প্রতিনিধিত্বকারী শাসনতান্ত্রিক নেতা হিসাবে সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা ম্লান হইয়া পড়ে। ১৯৬৩ সালে চিকিৎসার্থে লন্ডন যাইবার সময় তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে আইয়ুবী শাসনযন্ত্রের পতন ঘটিবে ও পাকিস্তানে গণতন্ত্র পূনর্বহাল হইবে। এই অবস্থায় আওয়ামী লীগ সর্ব পাকিস্তান ভিত্তিতে কেন্দ্রে সরকার গঠনে সক্ষম হইবে। তাই পূর্ব পাকিস্তানের সর্বপ্রকার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের তিনি বিরোধী ছিলেন। একই বৎসর শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডনে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলে তিনিও সোহরাওয়ার্দীর একই সুরে কথা বলেন। তিনি বলেন, 'যতদিন পর্যন্ত আমার নেতা সোহরাওয়ার্দী জীবিত রহিয়াছেন ততদিন পর্যন্ত আমি এককভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য দাবি উত্থাপন করিতে পারিব না। আমাদের অবশ্যই চিন্তা করিতে হইবে অখন্ড পাকিস্তানের ভিত্তিতে।' তিনি আরও বলেন, 'আওয়ামী লীগ একটি শাসনতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল । কাজেই শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়ই

আমাদের দাবি আদায় করা হইবে। আমি ়য়ত্বশাসনের পক্ষে থাকিতে পারি, কিন্তু স্বাধীনতার পক্ষে নহে।'

১৯৬৩ সালে জুরিখে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর রাজনৈতিক অঙ্গনে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগ অতঃপর একটি আঞ্চলিক সংগঠনে পরিণত হয়। ন্যাপ তখন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধাবিভক্তির শিকার হয় (রুশ গ্রুপ ও চীন গ্রুপ)। চীনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের জন্য এক গ্রুপ আইয়ুব খানকে সমর্থন দিতেছিল। এই দল অনেকটা পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক একটি দলে পরিণত হয়। ইহার বাহিরে জাতীয় ভিত্তিক কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না। এই সুযোগে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা পুনর্বার নির্বাচিত হন। মৌলিক গণতন্ত্রীরা নিজেদের দুর্নীতি ও অস্তিত্বের স্বার্থে আইয়ুব খানকে সমর্থন দিয়া যায়। ফলে জনগণের মধ্যে তাহারা গ্রহণযোগ্যতা হারায়।

ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ শোষণের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় এবং দেশের দুই অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য সবচাইতে বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় বাঙালি অর্থনীতিবিদগণ দেশের দুই অংশের জন্য দুই অর্থনীতির প্রবক্তা হইয়া যান। এই বৈষম্যের দ্বারা বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তি মাথাচাড়া দিয়া উঠে এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক নিবর্তনের প্রেক্ষিতে জাতীয় সংহতির আকাঙ্খাও জোরদার হইয়া উঠে।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানবাসী তিনদিকে ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অত্যন্ত অসহায় বোধ করে। দেশের সশস্ত্র বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তান বিশিষ্ট অবদান রাখিলেও (লাহোর ফ্রন্টে ভারতীয় বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইলে ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যরাই লাহোর রক্ষা করে এবং যুদ্ধ ভারতীয় অংশে ঠেলিয়া দেয়) যুদ্ধের সময় এই অংশকে ভারতের অনুকম্পায় ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাঙালিরা এই ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন হইয়া উঠে যে ৯৫ শতাংশ জাতীয় বাজেট পশ্চিমাঞ্চলের অনুকূলে বরাদ্ধ করিয়া দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত চাকুরী, শিল্প কারখানা ইত্যাদির অর্থনৈতিক সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে এই সময় জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি ক্রমান্বয়ে আওয়ামীলীগের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হইতে শুরু করে। ১৯৬৪-৬৫ সালে মিস ফাতেমা জিন্নাহর অনুকূলে নির্বাচনী প্রচারনা চালাইবার সময় শেখ মুজিব জনগণের মধ্যে আইউবের শাসনতন্ত্র ও সরকার বিরোধী মনোভাব এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ উপলব্ধি করাইতে সক্ষম হন। প্রত্যেকটি বাঙালির ঘরে ঘরে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি 'অবিচার' আলোচনা ও ক্ষোভের বিষয়ে পরিণত হয়। প্রাদেশিক ক্যাডারভুক্ত (ইপিসিএস) বাঙালি অফিসার, কেরানী, শিক্ষক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী সকলেই এই আলোচনায় অংশ নেন। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও বাণিজ্য ভারসাম্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্যের সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে উন্নয়ন ব্যয় এবং বিদেশী সাহায্য ও ঋণের বন্টনে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হইতে অনেক পিছনে পড়িতে থাকে। বৈদেশিক সাহায্যের মোট প্রবাহ, রাজস্ব ব্যয়ের বিতরণ, প্রতিরক্ষা ব্যয়, স্বাস্থ্য সার্ভিস প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।

বিদেশী সাহায্য ও ঋণের বন্টন

	পূর্ব পাকিস্তান (কোটি রুপী)	মোট ব্যয়	পঃ পাকিস্তান (কোটি রুপী)	মোট ব্যয়
বিদেশী উন্নয়ন সাহায্য	৯৩.৮৯	১৭%	৩৩৩৫.২২	৬২%
মার্কিন পণ্য সাহায্য	১২৯.০০	৩০%	২৬২.০০	৬৪%

বৈদেশিক সাহায্যের মোট প্রবাহ

দ্বিতীয় পরিকল্পনা	মোট মিলিয়ন টাকা	পূ. পাক	প. পাক
৪ বছর (১৯৬১-৬৫)	২,৫৮২	৭.৬২	১০,২৫৫
তৃতীয় পরিকল্পনা			
(১৯৬৫-৭০)	৪,৪৮১	৬৯০৪	১১.৩৮৫

কেন্দ্রীয় সরকারে উন্নয়ন বরাদ্দ (১৯৪৭-৪৮) হইতে (১৯৬০-৬১)

পূঃ পাকিস্তান	কোটি টাকা	পঃ পাকিস্তান কোটি টাকা
বিনিয়োগ	১৭২	৪৩০
ঋণ	১৮৪	২২৪
অনুদান	৭৬	১০১

প্রতিরক্ষা ব্যয় (মিলিয়ন রুপী)

বৎসর	মোট ব্যয়	প্রতিরক্ষা ব্যয়	মোট বাজেটের শতাংশ
১৯৪৯-৫০	৮৫৬	৬২৫	৭৩%
১৯৫৯-৬০	১,৮৪৭	১,০৪৪	৫৫%
১৯৬৫-৬৬	৪,৪৯৮	২,৮৮৬	৬৪%
১৯৬৬-৬৭	৩,৭৭৬	২,২৯৪	৬০%

ছয় দফা আন্দোলন ঃ

পাকিস্তানে গণভিত্তিক রাজনৈতিক শূন্যতায় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবী আরও জোরদার করেন। মধ্যবিত্ত ও উদিয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর সমর্থনকে পুঁজি করিয়া মুজিব জনগণের সমর্থন আদায়ে আগাইয়া যান। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে ৬ দফা ভিত্তিক একটি প্রস্তাব গৃহিত হয়। একই অধিবেশনে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে লাহোরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় তিনি ৬ দফার প্রস্তাব পেশ করেন এবং দাবী করেন যে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের নীতিমালার অনুসরণে প্রণীত এই ছয় দফা পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্নতার হাত হইতে রক্ষা করিবে। আমাদের বাঁচার অধিকার শীর্ষক এক প্রচারপত্রে তিনি ছয়দফার ব্যাখ্যা দেন এবং ইহার সমালোচকদের জবাব দেন।

তিনি বলেন "আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবীরূপে ৬ দফা কর্মসূচী দেশবাসী ও

ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী সরকারের দালালেরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগনের দুশমনদের এই কুৎসা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত প্রয়োজন ও ন্যায্য দাবী যখনই উঠিয়াছে তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ চৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবী, পূর্ব পাক জনগণের মুক্তি-সনদ ২১ দফা দাবী, যুক্ত নির্বাচন-প্রথার দাবী, ছাত্র তরুণদের সহজ ও স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষা লাভের দাবী, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবী ইত্যাদি সকল প্রকার দাবীর মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, "কায়েমী স্বার্থবাদী মহল প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবীতেও পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন।"[১৯] তিনি আশা করেন যে সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী, বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মীগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব-পাকিস্তানি মাত্রই ছয় দফার মর্ম উপলব্দি করিবেন।

শেখ মুজিবুর রহমান প্রস্তাবিত ছয় দফা ঃ

১নং দফা ঃ

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করত: পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাহাতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে।

২নং দফা ঃ

ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবল মাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় প্রদেশের হাতে থাকিবে।

৩নং দফা ঃ

মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে। দুইটির একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেই চলিবে।

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু শাসনতন্ত্রের সুস্পষ্ট ব্যবস্থার দ্বারা পূর্ব-পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে মুদ্রা পাচার বন্ধ করিতে হইবে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে, দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

৪নং দফা ঃ

সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায় ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ হইতে ফেডারেল সরকারের জন্য নির্ধারিত অংশ

ফেডারেল তহবিলে সরাসরি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

৫নং দফা ঃ

এই দফায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকিবে ঃ

(১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব থাকিতে হইবে।

(২) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

(৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

(৪) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী রফতানী চলিবে।

(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

৬নং দফা ঃ

এই দফায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষিবাহিনী গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানে একটি অস্ত্র নির্মাণ কারখানা, সামরিক একাডেমী ও এখানে নৌবাহিনী সদর দফতর স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়।[২০]

৬দফা কর্মসূচীর পক্ষে-বিপক্ষে অনেক আলোচনা সমালোচনা হয়। কেউ কেউ ইহাকে পাকিস্তান ভাঙ্গার প্রস্তাব হিসাবে অভিহিত করেন। আবার কেউ কেউ ইহাকে পূর্ব-পশ্চিমের বৈষম্য দূরীকরণের প্রকৃষ্ঠ পন্থা হিসাবে উল্লেখ করেন। ইতিপূর্বে যদিও পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত রাজনৈতিক দলসমূহ স্বায়ত্তশাসনকে তাহাদের অন্যতম দাবী হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে, তথাপি ছয় দফা প্রকাশিত হইবার মধ্য দিয়া আওয়ামী লীগের নাম কার্যকর এবং অর্থবহভাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবীর সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যায়। ছয় দফা দেশের জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলিকে অনুপ্রাণিত এবং সংঘবদ্ধ হইতে সাহায্য করে এবং অচিরেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ঃ

শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রস্তাবিত ছয় দফা প্রস্তাব পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বিশেষতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের অখণ্ডতা ব্যাহত না করিয়াও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নিজেদের মত করিয়া আহরিত বৈদেশিক মুদ্রার দ্বারা আঞ্চলিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখে এবং এইভাবে অর্থনৈতিক

বৈষম্য দূরীকরণের উপায় খুঁজে পায়। কিন্তু ইহার বিপক্ষে অনেকে ইহাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী একটি প্রয়াস হিসাবে উল্লেখ করে। তবে পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী লোকেরা ইহাতে প্রমাদ গণে। ফলে ছয় দফার উদ্যোগী বিশেষতঃ শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করিবার ফন্দি আঁটিতে থাকে। ইহারই এক পর্যায়ে ১৯৬৭ সালের শেষের দিকে তথ্য প্রকাশ করা হয় যে কতিপয় ব্যক্তি পাকিস্তানকে ধ্বংস করিবার পরিকল্পনা চালাইতেছে। এই মর্মে কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করিবার জন্য আইয়ূব খানের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে এই মামলায় জড়ানো হইবে কিনা ইহা লইয়া প্রশাসনের অভ্যন্তরে বিতর্ক হয়। অতঃপর সিদ্ধান্ত হয় যে, ভারতের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিবার ষড়যন্ত্রে শেখ মুজিবকে জড়াইয়া মামলা হইলে তাহার ভাবমূর্তি বিনষ্ট হইবে এবং এইভাবে ছয় দফাও তলাইয়া যাইবে।

অতঃপর ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাওয়ালপিণ্ডিতে ঘোষণা করে যে, "দুইজন বিশিষ্ট সি এস পি অফিসার সহ ২৮ জনকে গত মাসে পূর্ব পাকিস্তানে উত্থাপিত একটি রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতার অভিযোগে গ্রেফতার করা হইয়াছে। তাঁহারা পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।" প্রেসনোটে আরও বলা হয় ঃ

আটাশজন লোক পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের কেউ কেউ ঢাকার একটি বিদেশী দূতাবাসের ফার্ষ্ট সেক্রেটারী মিঃ ওঝার সহিত যোগাযোগ রাখিয়াছিলেন এবং কেউ কেউ আগরতলা সফর করিয়া সেখানে লেঃ কর্ণেল মিত্র, মেজর মেনন, এবং অন্যান্যের সঙ্গে পরিকল্পনাটি লাইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন।[২১]

পাকিস্তান সরকার ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডাকিয়া পাঠান এবং মিঃ ওঝাকে ফিরাইয়া লইবার নির্দেশ প্রদান করেন। ১৯৬৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জারীকৃত অপর এক প্রেসনোটে বলা হয়, পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে আটককৃত ২৮জন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বর্তমানে সেনাবাহিনী, নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনীর আইনের অধীনে প্রত্যক্ষভাবে অপরাধ সংগঠনের দায়ে গ্রেফতার করা হইয়াছে এবং শেখ মুজিবুর রহমান এই ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা ও পরিচালনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই প্রেসনোটে সরকার জানায় যে এই বিষয়ে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" নামে একটি মামলা দায়ের করা হইয়াছে। শেখ মুজিব সম্পর্কে বলা হয়--"মামলার তদন্ত চলিতেছে। ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা ও পরিচালনায় শেখ মুজিবুর জড়িত থাকিবার প্রমাণ হাতে আসায় তাহাকেও গ্রেফতার করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই তিনি পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে আটকাধীন রহিয়াছেন।"[২২] কিছুদিন পর সরকার একজন বাঙালি সিএসপি অফিসারসহ আরও ছয়জনকে অভিযুক্ত করিয়া একটি ঘোষণা দেয় এবং এইভাবে ৩৫ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম তালিকায় লিপিবদ্ধ হয়। শেখ মুজিবের নাম তালিকায় যুক্ত হওয়ায় তাহা প্রস্তাবিত বিচারের চরিত্র বদলাইয়া দেয়। মামলায় তাহার নাম উল্লেখিত হওয়া মাত্রই তাহা জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষন করে এবং তাহারা আসল ঘটনা এবং সুনির্দিষ্ট অভিযোগ

সম্পর্কে জানার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠে। এই ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনার জন্য ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে একটি বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানের নাম মূলত রাজনৈতিক কারণে মামলায় সংযুক্ত করা হয়। যদিও ষড়যন্ত্রের নেতা হিসাবে তাঁহার নাম তালিকায় ১ নং অভিযুক্ত হিসাবে দেখানো হয়, মামলার অভিযোগ পত্রে দেখা যায় যে, ২নং অভিযুক্ত লেঃ কর্ণেল মোয়াজ্জেম হোসেন ইহাতে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং শেখ মুজিব ছিলেন গ্রুপের সাংগঠনিক কাঠামোতে দ্বিতীয় সারির একজন ব্যক্তিমাত্র। শেখ মুজিব পর্দায় আবির্ভূত হইবার অনেক আগে মোয়াজ্জম, ৩নং অভিযুক্ত স্টুয়ার্ড মুজিব, ৪নং অভিযুক্ত সুলতান উদ্দিন এবং ৫নং অভিযুক্ত নূর মোহাম্মদসহ কতিপয় ব্যক্তি অন্যান্যদের সঙ্গে লইয়া পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য একটি সংগঠন গড়িয়া তুলিবার প্রক্রিয়া শুরু করিয়াছিলেন।

পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা অভিযোগ করে যে, মামলার উল্লেখিত ৩৫ ব্যক্তি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অস্ত্রের সাহায্যে একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার ষড়যন্ত্র করে। এই অভিযানে ভারতের পক্ষে মিঃ ওঝা অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় বাসস্থানসহ সকল প্রকার সহায়তা প্রদানে সম্মত হন। তাহারা আরও অভিযোগ করে যে সময়মত পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা এই বিষয়টি উদ্‌ঘাটিত করিতে না পারিলে এতদিনে অভিযান আরম্ভই হইয়া যাইত।

গণঅভ্যুত্থান ঃ

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনায় যতই সময় গড়াইয়া যায় ততই বাঙালিদের মধ্যে এই মামলা সম্পর্কে কৌতূহল বাড়িতে থাকে। জনগণ প্রতিদিন মামলার কার্যক্রম পত্রিকায় পাঠ করে এবং মামলার আসামী কামালউদ্দিন ও অন্যান্যদের উপর অকথ্য নির্যাতনের বিবরণ শুনিয়া শিহরিত হইতে থাকে। কামাল উদ্দিন ও তাহার স্ত্রীর ফরিয়াদ প্রতিটি বাঙালি মনে প্রবলভাবে রেখাপাত করে এবং তাহারা এই অত্যাচার নিজেদের উপর সংঘটিত হইতেছে বলিয়া বিবেচনা করে। বাঙালি মনে এই মামলার সত্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, কারণ শেখ মুজিবসহ অন্যান্য সমস্ত আসামীরা ইহাকে নিছক একটি বানোয়াট ঘটনা হিসাবে ব্যক্ত করেন। অত্যাচার নিপীড়নে অসহায় কোন কোন আসামী স্বীকারোক্তি দিলেও জনতা ইহাকে একান্ত বাধ্য হইয়া মিথ্যা বলিয়াছে ধরিয়া লয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনমানসিকতায় পাঞ্জাবী শাসনের প্রতি চরম ঘৃণার উদ্রেক করে। তাছাড়া প্রধান আসামী শেখ মুজিবসহ আসামীগণ ঘটনার কথা অস্বীকার করিলে ছাত্র-জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এবং আইয়ূব বিরোধী চরম বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে।

অপরদিকে অনেকটা সে সময়েই পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডিতে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্র-পুলিশের এক সংঘর্ষ ইট ছোড়াছুড়ি হইতে গুলিবর্ষণের ঘটনার রূপ লাভ করে এবং পুলিশের গুলিতে এক ছাত্র নিহত হইলে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে অবতরণ করে। ইতিমধ্যে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে আইয়ুব খানের বিরোধ হয় এবং পরিণতিতে ভূট্টোকে মন্ত্রিসভা হইতে বাদ দেওয়া হয়। ভুট্টো অতঃপর সক্রিয় রাজনীতিতে মাঠে নামেন

এবং পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি (পি.পি.পি) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া আউয়ুব বিরোধী আন্দোলনে নামেন । এইদিকে আইয়ূব খানের একনায়কসুলভ রাজনীতিতে এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ন্যায় একটি রাজনৈতিক মামলায় বিরক্ত হইয়া পাকিস্তান বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শল আসগর খান আইয়ূব বিরোধী এক কড়া বিবৃতি দেন। (অক্টোবর১৯৬৮) আসগর খানের সরকার পরিবর্তন প্রত্যাশী এই বিবৃতি পশ্চিম পাকিস্তানে ইতিমধ্যে রাজনীতিতে প্রায় মুহ্যমান রাজনীতিবিদদের মনে আশার সঞ্চার করে এবং তাহারা সরকার পরিবর্তনের আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। ঠিক এইসময় রাওয়ালপিণ্ডিতে পুলিশের হাতে মার খাওয়া ছাত্ররা আন্দোলনে নামে এবং পাক সেনাবাহিনীর সদর দফতর রাওয়ালপিণ্ডিতে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে এক ধর্মঘট আহ্বান করে। সুযোগের জন্য অপেক্ষামান জুলফিকার আলী ভূট্টো তৎক্ষণাৎ ছাত্রদের এই ধর্মঘট সমর্থন করিয়া বিবৃতি প্রদান করেন। রাতারাতি তিনি সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রদের মধ্যমনীতে পরিণত হন এবং অচিরেই বিপুল সংখ্যক ছাত্র জনতা আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনে তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অধিকাংশ জেলে, আর অনেকেই পলাতক। জামাতে ইসলামী শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রবক্তা এবং গোঁড়া ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে তেমন জনপ্রিয় নহে; অন্যান্য তেমন কোন রাজনৈতিক দল ছিল না যাহারা আন্দোলনে মাঠে থাকিতে পারে। একমাত্র মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এককভাবে বিভিন্ন স্থানে স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবীতে সোচ্চার থাকেন। স্বভাবতই জনতার কাংখিত আন্দোলনের নেতৃত্ব আসিয়া পড়ে ছাত্রদের হাতে।

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি ঃ

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পাকিস্তানে এক নজিরবিহীন গণআন্দোলনের সূচনা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে এই আন্দোলন বিপ্লবের পর্যায়ে পৌছে। সরকারের প্রশাসনযন্ত্র পুরাপুরি অচল হইয়া পড়ে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। সংগ্রাম কমিটি ক্রমান্বয়ে ১১ দফা দাবীনামা ঘোষণা করে। এই দাবী পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত ছাত্র জনতার মধ্যে প্রেরণার সঞ্চার করে। পরবর্তীকালে এই ১১ দফা জনতার আশা আকাঙ্খার প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়। দেশের সর্বত্র ১১ দফা মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হইতে থাকে। ইহার সমর্থনে সর্বত্র হাজার হাজার জনসভা ও মিছিল সংঘঠিত হয়।

১১ দফার প্রথম দফা ছাত্র ও শিক্ষকদের মূল দাবীগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় তাহা তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্র সমাজের অনুমোদন লাভ করে। (ক) হইতে (ঢ) পর্যন্ত ১৪টি উপ-পর্যায়ে এই দাবী বিস্তৃত। দুই নম্বর দফা বা প্রস্তাব ছিল সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র। তিন নম্বর দাবীতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি এবং মুদ্রাব্যবস্থায় সীমিত রাখিবার প্রস্তাব করা হয়। চতুর্থ দাবীতে বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুর সমন্বয়ে একটি সাব ফেডারেশন গঠন করিয়া প্রত্যেকটি ইউনিটের স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হয়। পঞ্চম দাবী ব্যাংক, বীমা ও সকল

বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। ষষ্ঠ প্রস্তাবে কৃষকদের কর, খাজনা, ও রাজস্ব হ্রাস, সপ্তম প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কার্যকর বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা এবং নবম প্রস্তাবে জরুরী আইন, নিরাপত্তা আইনসহ সকল দমনমূলক আইন প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়। দশম প্রস্তাবে সিয়াটো, সেন্টো এবং পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি হইতে সদস্যপদ প্রত্যাহার এবং ১১ দফায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্তবৃন্দসহ সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দাবী করা হয়।

জনগণের স্বতস্ফূর্ত সমর্থনে ১১ দফা কর্মসূচী অচিরেই ঐতিহাসিক জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ন্যায্য বেতন ও বোনাসের দাবী অন্তর্ভুক্ত থাকায় পূর্ব পাকিস্তানে জোরদার সামাজিক শক্তি হিসাবে উদিয়মান শ্রমিক শ্রেণী এই কর্মসূচীতে সমর্থন জানায়। কর, খাজনা ও রাজস্বের দীর্ঘ প্রলম্বিত দাবী সংযোজন করিয়া গরিব কৃষকদের উপর শোষণের প্রক্রিয়া বন্ধ করিবার প্রস্তাব তুলিয়া ছাত্ররা এই কর্মসূচীকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া দিতে সক্ষম হয়। ব্যাংক বীমা ও বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ ১১ দফা কর্মসূচীতে মূল ভূমিকা পালনকারী বামপন্থী ছাত্রদের সমর্থন অর্জন করে। টিউশন ফী, বাস ও ট্রেনভাড়ায় ৫০ ভাগ ছাত্র কনসেসনের দাবীতে প্রদেশ ব্যাপী ছাত্র সমাজ সাড়া দেয়। একইভাবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবী নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মহলে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।[২৩] শীঘ্রই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে পিছনে ফেলিয়া ১১ দফার কর্মসূচী লইয়া ছাত্রনেতারা আগাইয়া যায় এবং সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে আইউব বিরোধী আন্দোলনের ঝড় তুলিতে সমর্থ হয়।

গণ বিস্ফোরণ ঃ

শীঘ্রই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও আগাইয়া আসেন এবং সমগ্র পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (ডাক) বা Democrative Action Committee নামে সর্বদলীয় কমিটির ব্যানারে মাঠে নামেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত দল ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন সেইগুলির তেমন জোরালো কোন অবস্থান ছিল না। জুলফিকার আলী ভূট্টো তাঁহার নিজস্ব পন্থায় আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে 'ডাক' এ অংশগ্রহণ হইতে বিরত থাকেন। মাওলানা ভাসানী দেশে বামপন্থীদের সমন্বয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনয়নের রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাহাছাড়াও তিনি চরম বুর্জোয়া নেতৃত্বের সমন্বয়ে গঠিত 'ডাক' এর দ্বারা দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নাই বলিয়া মনে করেন। তাই তিনি 'ডাক' এ যোগদান করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মনে করেন পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত 'ডাক' এর দ্বারা তাঁহারা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে নিষ্ক্রিয় করিতে পারিবেন। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের 'ডাক' এর অন্তর্ভুক্ত নেতৃবৃন্দ বিশেষত পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ মনে করেন তাঁহারা 'ডাক' এর সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানের ছয় দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবী নস্যাৎ করিতে সক্ষম হইবেন। ফলে 'ডাক' স্বায়ত্তশাসনের চাইতে গণতান্ত্রিক অধিকার ও সংসদীয় পদ্ধতি পুনঃ প্রবর্তনের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়া একটি ৮ দফা ভিত্তিক কর্মসূচী প্রণয়ন করে। পশ্চিম পাকিস্তানের 'ডাক' নেতৃবৃন্দ যুক্তি দেখান, গণতন্ত্র

একবার পূনর্বাসিত হইলে স্বায়ত্বশাসনের দাবীর বাস্তবায়ন সহজতর হইবে। কিন্তু ১১ দফার ভিত্তিতে আন্দোলনরত পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র নেতৃবৃন্দ ৮ দফা প্রত্যাখ্যান করেন।

'ডাক' কর্তক মৌলিক গণতন্ত্র এবং পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করিবার দ্বারা উহা কিছুটা জনসমর্থন লাভ করিলেও পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের ১১ দফার ভিত্তিতে তীব্র আইউব বিরোধী আন্দোলনে তাহা ম্লান হইয়া যায়। অপরদিকে মাওলানা ভাসানীর 'ঘেরাও' আন্দোলনের ডাকে সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তান প্রকম্পিত হয়। প্রতিদিন তিনি এক একটি মিল কারখানা ঘেরাও করিয়া শ্রমিকদের দাবী আদায়ে চাপ সৃষ্টি করেন। সরকার বেসামাল অবস্থায় পতিত হয়। সমগ্র পাকিস্তানে আইউব বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠে। ইহার মধ্যে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা অবস্থাকে আরও জটিল করিয়া তোলে। ১৯৬৯ সালের ২০শে জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া ছাত্র বিক্ষোভকালে পুলিশ মাত্র ১০ গজ দূরত্ব হইতে গুলি করিলে আসাদ নামের একজন মার্ক্সবাদী ছাত্রনেতা নিহত হয়। প্রতিবাদে ছাত্ররা ২১ তারিখ হইতে ৭২ ঘন্টার ধর্মঘটের ডাক দেয়। ২৪ তারিখ মতিউর রহমান নামে এক স্কুল ছাত্র এবং রুস্তম নামে এক যুবক পুলিশের গুলিবর্ষনে নিহত হয়। পরদিন নিহত হয় বাবুল ও আনোয়ার। অতঃপর ধর্মঘট এবং পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়া একটি নিত্যদিনের ঘটনা হইয়া দাঁড়ায়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী আগরতলা মামলায় ধৃত সার্জেন্ট জহুরুল হক সামরিক কারাগারে বন্দি অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হইয়া মারা যান। সরকার ব্যাখ্যা দেয় যে তিনি পলাইবার সময় প্রহরীদের গুলিতে মারা যান। কিন্তু তাহা জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নাই। জনগণ ইহাকে একটি ঠাণ্ডা মাথায় হত্যাকাণ্ড হিসাবে গ্রহণ করে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকটর এবং একজন জনপ্রিয় শিক্ষক ডঃ জোহা মিলিটারীদের বেয়নেটের আঘাতে নিহত হন। এইভাবে যতই গুলিবর্ষনে মৃতের সংখ্যা বাড়িতে থাকে, ততই আন্দোলন তীব্রতর হইতে থাকে। বিশেষ করিয়া আসাদ, ডঃ জোহা ও সার্জেন্ট জহুরুল হকের হত্যাকাণ্ডে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান দুর্বার আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়ে এবং পরিণতিতে ইহা এক গণঅভ্যুত্থানের রূপলাভ করে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ঃ

প্রেসিডেন্ট আইউবের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর হইতে থাকিলে তিনি উপলব্ধি করেন যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অতঃপর সমঝোতা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাঁহার সামরিক ও রাজনৈতিক উপদেষ্টারাও তাঁহাকে অনুরূপ উপদেশ প্রদান করেন। তিনি অতঃপর ভূট্টোসহ অধিকাংশ রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেন। তবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বন্দিদের মুক্তি দিতে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের লইয়া গোলটেবিল বৈঠক করিতে হইলে ষড়যন্ত্র মামলা এবং শেখ মুজিবের বান্দিদশা বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। কারণ মাওলানা ভাসানী ও ভুট্টো গোলটেবিল বৈঠকে বসিতে ইতিমধ্যে অসম্মতি প্রদান করিয়াছেন। এমতাবস্থায় শেখ মুজিবকে জেলে রাখিয়া গোলটেবিলে বসিবার পরিকল্পনা ভণ্ডুল হইবার অবস্থা সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে সেনা প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্ট আউয়ূবের প্রধানমন্ত্রী হইবার প্রস্তাবও প্রদান করেন কিন্তু রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের পরামর্শে শেখ মুজিব তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু দিন যতই গড়াইতে থাকে

ততই গোলটেবিলের প্রয়োজনীয়তা আরও প্রকট হইতে থাকে। সরকারের তরফ হইতে শেখ মুজিবকে অতঃপর প্যারোলে বা পুলিশি প্রহরায় গোলটেবিল বৈঠকে আনিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং তিনিও উহাতে সম্মতি প্রদান করেন। নেতৃবৃন্দ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে প্যারোলের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানান। ইতিমধ্যেই তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার ধারণা ছিল তাঁহার অবর্তমানে বৈঠক হইয়া গেলে তিনি হয়ত নেতৃত্ব হারাইবেন। জেলের মধ্যে অবস্থানের ফলে তিনি জানিতেন না যে তাঁহার পক্ষে বাহিরে কিরূপ ভয়াবহ আন্দোলন চলিতেছে। অপরদিকে আইউব খান ভাবিতেছিলেন 'সাপও মরিবে লাঠিও ভাঙ্গিবে না'। শেখ মুজিবকে বৈঠকে আনিয়া একটা সমঝোতাও করা যাইবে আবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাও চলিবে। এই সময় মাওলানা ভাসানী শেখ মুজিবকে প্যারোলে বৈঠকে বসিতে নিষেধ করেন এবং আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁহাকে মুক্ত করা হইবে বলিয়া ঘোষণা দেন। মাওলানা ভাসানী ইতিমধ্যে তাঁহার ঘেরাও আন্দোলনের জন্য শাসক গোষ্ঠির শির পীড়ার কারণ হইয়া উঠিয়াছেন। শেখ মুজিব মাওলানার পরামর্শে সায় দেন এবং প্যারোলে যাইবার তাঁহার সম্মতি প্রত্যাহার করিয়া লন।

পূর্ব পাকিস্তানে তখন ছাত্রদের ১১ দফা দাবীর তীব্র আন্দোলনের মুখে প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। জনতা সবরকমের ১৪৪ ধারা ও অন্যান্য বিধি নিষেধ উপেক্ষা করিয়া দুর্বার আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গড়িয়া তোলে। সরকারী কর্মকর্তা ও জনসাধারণ ছাত্রদের দেয়া বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করিতে থাকে। ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করিবার জন্য জনগণ চাপ দিতে থাকে। উত্তেজিত জনতা ষড়যন্ত্র মামলার ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান, পাকিস্তানের সাবেক প্রধান বিচারপতি এম, এ রহমানের বাসভবন আক্রমণ করিয়া সেখানে অগ্নিসংযোগ করে। অতঃপর তিনি এবং মামলার সরকারী পক্ষের মূল কৌশুলী মঞ্জুর কাদির প্রাণ লইয়া পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করেন। শেখ মুজিব প্যারোলে পশ্চিম পাকিস্তানে অনুষ্ঠিতব্য গোলটেবিলে যাইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় আন্দোলন আরও চরম আকার ধারণ করে। জনতা শেখ মুজিবের নিঃশর্ত মুক্তির জন্য দাবী করিতে থাকে। 'জেলের তালা ভাঙ্গব শেখ মুজিবকে আনবো' জাতীয় শ্লোগানে ঢাকার রাজপথ প্রকম্পিত হইতে থাকে। প্যারোলে মুক্তি লাভে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়া জনতার অনুভূতিতে সাড়া দেওয়ায় জনমনে শেখ মুজিব অতি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হন। তাই সরকারের সমস্ত বিধি নিষেধের বেড়াজাল ভাঙ্গিয়া জনতা রাস্তার আন্দোলনে শরিক হয়। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আইউবের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যায়। এমতাবস্থায় একজন মাত্র লোকই গোটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনিতে সক্ষম ছিলেন এবং তিনি হইলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

এই অবস্থায় ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ আইউব খান ঘোষণা দেন যে তিনি আর আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না। তাঁহার এই ঘোষণা পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু ব্যক্তিবর্গকে সন্তুষ্ট করিলেও পূর্ব পাকিস্তানে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া ইহা সৃষ্টি করে নাই। একই রাত্রিতে আইউব সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হইল এই শর্তে যে শেখ মুজিবকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে হইবে। ২২ শে ফেব্রুয়ারি সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গসহ শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হয়। প্রায় তিন বছর পর জেলের বাহিরে পদার্পণ

করিয়া তিনি নিজেকে সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসাবে দেখিতে পান। এতদিন তৎপরতাহীন তাঁহার রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ছয় দফা এবং ছাত্রদের এগারো দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানি জনগণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। শেখ মুজিব জেলের বাহিরে আসিলে এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-শ্রমিক, পেশাজীবী ও আমজনতা তাঁহার উপর এক বিরাট দায়িত্ব প্রদান করে এবং তিনিও ইহাকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহন করেন।

আইউবের সহিত নেতৃবৃন্দের গোলটেবিল বৈঠক ঃ

২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ রাওয়ালপিণ্ডিতে গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় ভাষণ দেন। ছাত্র ও শ্রমিক নিয়ন্ত্রিত এই সমবেশে তিনি ঘোষণা করেন, ছয়দফা এবং ১১ দফা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গোলটেবিল বৈঠকে উভয় দফাসমূহ বাস্তবায়িত করিতে না পারিলে তিনি বৈঠক বর্জন করিবেন। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে তিনি শাসনতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতি। তাঁহার দল আওয়ামী লীগ হইতে চাপ ছিল বৈঠকে যোগদানে বিরত থাকিবার জন্য। মাওলানা ভাসানীসহ বামপন্থী জোটসমূহ বৈঠকের বিরোধীতা করে। কিন্তু শেখ মুজিব ছিলেন ওয়াদাবদ্ধ, তাই তিনি বৈঠকে বাসিতে বাধ্য ছিলেন। তবে তিনি তাঁহাদিগকে আশ্বাস দেন, ৬ দফা ও ১১ দফা আদায় করিতে না পারিলে বৈঠক বর্জন করিবেন। সেই সাথে তিনি সংসদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব স্থিরকরনের দাবী সংযোজন ও আদায়ের আশ্বাস দেন। অবাধ প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে চালু ছিল সংখ্যাসাম্য পদ্ধতি। ৬ দফা ও ১১ দফা উভয় দাবীতেই সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতি সংসদীয় গণতন্ত্র পূনর্বহালের প্রস্তাব ছিল, কিন্তু কোনটাতেই জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব স্থিরকরনের ব্যাপারে সরাসরিভাবে দাবী জানানো হয় নাই।

২৫ শে মার্চ শেখ মুজিব তাঁহার ১৭ জন সহকর্মী ও উপদেষ্টা লইয়া আইউব খানের সহিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। আইউব খান নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানান এবং আশা প্রকাশ করেন যে অচিরেই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হইবে। অতঃপর কোরবানীর ঈদের জন্য বৈঠক মুলতবি হইয়া পুনর্বার ১০ই মার্চ বৈঠক বসে। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ কেবল সংসদীয় পদ্ধতির পূনর্বহাল এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনে উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে তাঁহারা মুখ খুলিতে নারাজ। তাঁহারা পাকিস্তানে ফেডারেল পদ্ধতির বাস্তবতার কথা স্বীকার করেন কিন্তু তাঁহারা সেই ফেডারেশনের চরিত্র কিরূপ হইবে তাহা বর্ণনায় অনিহা প্রকাশ করেন। শেষের দিকে নেতৃবৃন্দ একটি আপাতঃ সমঝোতায় আসেন। তাহা হইল ঃ (ক) পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট[২৪] ভাঙ্গিয়া দিয়া সেখানে একটি সাব ফেডারেশন গঠন করা হইবে এবং (খ) অঞ্চলভিত্তিক স্বায়ত্বশাসন মঞ্জুর করা হইবে। 'ডাক' নেতৃবৃন্দকে তাঁহাদের স্ব স্ব দাবী স্বতন্ত্রভাবে উত্থাপনের অধিকার দেওয়া হইলও নেতৃবৃন্দ স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণ সম্পর্কে

কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহনে ব্যর্থ হন।

শেখ মুজিব তাঁহার লিখিত বক্তব্যে রাজনৈতিক অধিকার, নাগরিক স্বাধীনতার বিপন্নাবস্থা, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের উপর অর্থনৈতিক অবিচার এবং বিদ্যমান সাংবিধানিক ব্যবস্থায় মৌলিক অধিকার অব্যাহতভাবে বিঘ্নিত হইবার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের অনুভূতি তুলিয়া ধরেন। মোটামুটিভাবে তিনি ছাত্র সম্প্রদায়ের ১১ দফা এবং আওয়ামী লীগের ৬ দফার সংমিশ্রণমূলক একটি অতি জোরালো বক্তব্য তুলিয়া ধরেন। তিনি স্মরণ করাইয়া দেন যে সংখ্যাগুরু হওয়া সত্বেও পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাসাম্য নীতি মানিয়া লইয়াছিল, কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হইল আইন সভায় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সংখ্যাসাম্য নীতি রাতারাতি বাস্তবায়িত হইলেও বেসামরিক, বৈদেশিক ও প্রতিরক্ষা সার্ভিসসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা সংখ্যাসাম্যের নীতিতে বন্টন না হইয়া এক অঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। তিনি নেতৃবৃন্দকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, ""আওয়ামী লীগ হলো পাকিস্তান আন্দোলনে মুক্তি যোদ্ধাদের একটি সংগঠন। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম। আমি এই ভেবে গর্ব-অনুভব করি যে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বাধীনে আমি ও আমার সহকর্মীরাও পাকিস্তান আন্দোলনের পুরোভাগে অবস্থান করেছেন।"[২৫] মুজিবের প্রস্তাবাবলী ছিল পাকিস্তানের শক্তি সংহতকরণ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর ভিত্তিতে প্রণীত।

প্রেসিডেন্ট আইউব খান ১৩ই মার্চ ১৯৬৯ তাঁহার সমাপনী ভাষণ দেন এবং প্রস্তাব দেন যে,

(ক) জনগণের প্রতিনিধিগণ প্রত্যক্ষভাবে ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হইবেন।

(খ) দেশ পরিচালিত হইবে ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির অধীনে।

আইউব খানের ভাষনে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ হতাশ হন। তাঁহার দুই নম্বরের প্রস্তাবের অর্থ হইল দেশ সংখ্যাসাম্য নীতি এবং কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনে বিদ্যমান অবস্থা অব্যাহত থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ তাঁহার এই প্রস্তাবে মোটামুটি সায় দেন। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানে যে ইতিমধ্যে ছয় দফার সমর্থনে এবং বিদ্যমান প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ভাগ বাটোয়ারার বিরুদ্ধে এক গণ অভুত্থান হইয়া গিয়াছে তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হন। সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ যে আর সংখ্যাসাম্য নীতি গ্রহণে প্রস্তুত নহে তাহা তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন নাই। বাঙালিদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ আইউব খানের বিবৃত্তি ছিল হতাশাব্যঞ্জক। অতঃপর এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব ঐ প্রস্তাব নাকচ করেন এই বলিয়া যে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ এই প্রস্তাব মানিবে না। ঐ সম্মেলনে তিনি 'ডাক' হইতে আওয়ামী লীগের সরিয়া দাঁড়াইবার কথাও ঘোষণা করেন। এইভাবে আওয়ামী লীগ সরিয়া দাড়াইবার পর 'ডাক' স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে এবং গোলটেবিল বৈঠক কোন ইতিবাচক ফল প্রদানে ব্যর্থ হয়।

'ডাক' ও গোলটেবিল বৈঠক হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার ফলে শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা প্রবলভাবে বাড়িয়া যায়। তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের একচ্ছত্র নেতায় পরিণত হন। বৈঠকে যোগদানের সময় অনেকে অভিযোগ করিয়াছিলেন. তিনি ক্ষমতার ভাগ লইবার জন্য বৈঠকে

যোগ দিতেছেন এবং অচিরেই ৬ দফা ও ১১ দফা শিকায় ঝুলিবেই। কিন্তু শেখ মুজিব তাঁহাদের আশাংকাকে উড়াইয়া দিয়া এবং ক্ষমতার পাদমূলে ভাগ বসাইবার দিকে না যাইয়া জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিক হিসাবে জনগণের মাঝে ফিরিয়া আসায় তাঁহার ভাবমুর্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। সমস্ত নেতৃবৃন্দকে ছাড়াইয়া গিয়া পূর্ব-পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া লইয়া কেন্দ্রের সঙ্গে দরকষাকষির জন্য তিনিই একমাত্র প্রতিনিধি হইয়া দাঁড়ান। তিনিই জনগণের শেষ বিচারে বঙ্গশার্দূল এবং বঙ্গবন্ধুতে পরিণত হন।

সামরিক আইন জারী এবং জেনারেল ইয়াহিয়ার ক্ষমতা দখল ঃ

'ডাক' ও সরকারের সহিত অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হইবার পরও সাংবিধানিক সংশোধনী লইয়া আলোচনা পর্দার আড়ালে অব্যাহত থাকে। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ছয়দফার ভিত্তিতে একটি সংবিধানের খসড়া প্রনয়ণ করেন। ১৯৬২ সালের সংবিধানের সংশোধনী হিসাবে প্রণীত প্রস্তাবে মৌলিক বিষয়াবলী যথা ঃ দেশের নাম ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান, প্রেসিডেন্ট অবশ্যই হইবেন একজন মুসলমান প্রভৃতি বিষয় ঠিক রাখিয়া ৬ দফা ভিত্তিক আমুল পরিবর্তন সাধনমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ১৩ই মার্চ আইয়ুব ও মুজিবের মধ্যে একটি গোপন ভোজসভার ব্যবস্থা করা হয়। ভোজসভার পূর্বেই ৬ দফা ভিত্তিক সংবিধানিক সংশোধনী পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের মধ্যে বিলি করা হয় এবং একটি কপি আইউব খানকেও দেওয়া হয়। ইহা আইউব খানের হাতে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার মত পরিবর্তন করেন এবং ভোজের পরিকল্পনা বাতিল করেন। ২৪শে মার্চ তিনি ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। সংশোধনীটিকে তিনি পাকিস্তান 'ভাঙ্গিবার পরিকল্পনা' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে লিখিত পত্রে সংশোধনীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তিনি জানান যে এই সংশোধনী প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। দেশের অর্থনীতি দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দিবে এবং পাকিস্তানকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিবে। দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা সংরক্ষনের জন্য সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেন্টের স্পীকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করিয়া আইউব খান সেনাবাহিনীকে আহ্বান জানান এবং জোর দিয়া বলেন যে, সশস্ত্র বাহিনীকে অবশ্যই দেশের অখণ্ডতা নিশ্চিত করিয়া পাকিস্তানকে রক্ষা করিতে হইবে।

আইউব খান উপলদ্ধি করেন যে, দেশের আইন শৃংখলা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো এমন চরম অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে যে তাঁহার এই বয়সে এইগুলিকে পুনরায় বাগে আনিবার মত শক্তি তাঁহার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সেনাবাহিনীকে একমাত্র বিকল্প হিসাবে মনে করিয়া শেষ বয়সে সসম্মানে সরিয়া দাঁড়ানোটাকে তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করেন।

১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারী করেন। ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া তিনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বিরক্ত না করিয়া ২৬শে মার্চ "জাতির উদ্দেশ্যে তাঁহার ভাষণে তিনি বলেন, 'দেশে একটি শাসনতান্ত্রিক সরকার গঠনের উপযোগী অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন উচ্চাভিলাষ তাঁহার নাই, তিনি আরও নিশ্চয়তা দেন যে, 'প্রতিনিধিগণ সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত অবাধ নিরপেক্ষ

নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন এবং সেই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণেরই দায়িত্ব হইবে দেশকে একটি কার্যোপযোগী সংবিধান উপহার দেওয়া।' ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আমি সমাজের ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের আশু দাবী এবং বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন আছি। আমার প্রশাসন এই মর্মে নিশ্চয়তা দিতেছে যে, এই সমস্ত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে সবরকমের প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা হইবে।'

আইন কাঠামো আদেশ বা *Legal Framework Order (LFO)* ঃ

সামরিক জান্তা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি নির্বাচন প্রস্তুতির দিকেও মনোনিবেশ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভকারী দল যাহাতে, সামরিক জান্তার মতে, বিরূপ কোন সংবিধান প্রণয়ন করিতে না পারে সেই জন্য সরকার ১৯৭০ সালের ৩১শে মার্চ আইন কাঠামো আদেশ বা *Legal Framework Order (LFO)* জারী করে। ইহাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় একটি প্রস্তাবনা, ২৭টি অনুচ্ছেদ, ৩টি তফসিল, পরিষদের কার্যবিবরণীসহ ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য সরকারের নিয়মবিধি, শর্ত ও বিধি নিষেধ। এই আদেশের মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহ গঠনের বিধিবিধান, নির্বাচন পরিচালনা ও মূলনীতি, নির্বাচনে অংশগ্রহণেচ্ছু প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান, স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন, জাতীয় পরিষদ ও উহার সদস্যবর্গের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি। আদেশের ১২৪ নং অনুচ্ছেদে ১২০ দিনের মধ্যে একটি সংবিধান প্রণয়নের সময়সীমাও বাধিয়া দেওয়া হয়। ইহার প্রস্তাবনা এবং ইসলাম, কোরআন ও সুন্নাহ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কতগুলি মৌলিক বিষয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করিবার উপর নির্দেশনা দেওয়া হয়। দেশের নাম পাকিস্তান ইসলামী রিপাবলিক, রাষ্ট্রপ্রধান হইবেন একজন মুসলমান, দেশ হইবে একটি ফেডারেল রিপাবলিক, গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিমালা অব্যাহত রাখা এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দিবার কথা বলা হইলেও প্রকৃতপক্ষে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টিকে গুরুত্বহীন ভাবেই রাখা হয়। সুনির্দিষ্ট কোন বক্তব্য এই ব্যাপারে না থাকায় পূর্ব-পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ইহাতে হতাশা ব্যক্ত করেন এবং আইন কাঠামোতে নূতন কোন প্রস্তাবনা নাই বলিয়া ধরিয়া লন।

সবচাইতে মারাত্মক ও অগণতান্ত্রিক বিধান সংযোজন করা হয় ২৭ নং অনুচ্ছেদে। ইহাতে বলা হয় ঃ

এই আদেশের কোন ব্যাখ্যা লইয়া সন্দেহ বা প্রশ্ন দেখা দিলে সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিবেন প্রেসিডেন্ট এবং সেই সিদ্ধান্তই হইবে চূড়ান্ত এবং কোন আদালতে তাহা লইয়া প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। এই আদেশে কোন সংশোধনীর প্রয়োজন হইলে প্রেসিডেন্টই সেই সংশোধনের ক্ষমতা রাখিবেন—জাতীয় পরিষদ নহে।"

এই ধরনের আইনী ধরা বাধার মধ্যে নির্বাচনে যাইতে বিরোধী বিশেষত বামপন্থী নেতৃবৃন্দ অনিহা প্রকাশ করেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে সেনাবাহিনীর অনুমোদন ছাড়া কোন সংবিধানই পাশ করা যাইবে না। মাওলানা ভাসানী দ্ব্যর্থহীনভাবে এই আইন কাঠামোর মধ্য দিয়া নির্বাচনে যাইবার বিরোধীতা করেন। এই পর্যায়ে তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাদেশ

স্বাধীন করার কথা বলেন। তিনি শ্লোগান দেন ঃ "ভোটের বাক্সে লাথি মারো ঃ পূর্ব-বাংলা স্বাধীন করো।" কিন্তু শেখ মুজিব শত বাধার মুখেও নির্বাচনে যাইবার নিদ্ধান্ত লন। তিনি মনে করেন নির্বাচনে যাইয়া সংখ্যাগরিষ্টতা অর্জন করিতে পারিলে সামরিক জান্তা না চাহিলেও বিশ্বজনমতের চাপে পড়িয়া তাহারা নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। তাহা ছাড়াও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিলে তিনিই আইনগতভাবে কেন্দ্রের সঙ্গে দরকষাকষির জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের একমাত্র প্রতিনিধি হইয়া যাইবেন।

নির্বাচনী প্রচারণা আরম্ভ হইলে আওয়ামী লীগ সর্বাগ্রে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। ৬ দফা ও ১১ দফার সংমিশ্রনে প্রণীত ইশতেহারে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাংখা তথা প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের উপর জোর দেওয়া হয়। নির্বাচন প্রচারাভিযান চলাকালে পূর্ব-পাকিস্তানে এক প্রলংকরী প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়। ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর ১৫০ মাইল বেগে প্রবাহিত ঘূর্ণিঝড় ৪০ ফুট উচু জালোচ্ছ্বাসসহ উপকূলে আঘাত হানে। সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার ফলে বিদেশী প্রচার মাধ্যমগুলির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় কয়েক লক্ষ লোক এই দুর্যোগে প্রাণ হারাইয়াছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ত্রাণ কার্যের ব্যাপারে চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করে। আওয়ামী লীগ অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া পূর্ব-পাকিস্তানি জনগণের একমাত্র ত্রানকর্তায় পরিণত হয়। এই ঘটনার পর পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম-পাকিস্তানের উপর সমস্ত আস্থা হারাইয়া ফেলে এবং আওয়ামী লীগই তাহাদের একমাত্র আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩০০ পুরুষ আসন ও ১৩টি মহিলা আসনের মধ্যে প্রতিজনে ১ ভোটের ভিত্তিতে পূর্ব-পাকিস্তানে আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৯ (১৬২+৭) এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের ভাগে পড়ে ১৪৪টি (১৩৮+৬) আসন। পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বোচ্চ আসন পায় পাঞ্জাব প্রদেশ—৮৫টি (৮২+৩) আসন। তারপর সিন্ধু ২৭+১, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১৮+১; বেলুচিস্তান ৪+১, কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক উপজাতীয় এলাকাসমূহ, ৭+০০। অপরদিকে প্রাদেশিক পরিষদসমূহের পূর্ব-পাকিস্তানে পুরুষ ৩০০ এবং মহিলা ১০টি আসন, পাঞ্জাবে ১৮০+৪, সিন্ধুতে ৬০+২, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৪০+২, বেলুচিস্তানে ২০+১টি আসন দেওয়া হয়।

ঘূর্ণিঝড় কবলিত ৯টি আসন বাদে অবশিষ্ট জাতীয় পরিষদ আসনগুলিতে আওয়ামী লীগ অবিশ্বাস্য সফলতা লাভ করে। ১৫৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৫১টি আসন লাভ করে। সাইক্লোন কবলিত এলাকায় পরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ একই সফলতা লাভ করে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব জনগণের এই রায়কে ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতি সমর্থন হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি অবিলম্বে সকল পর্যায়ে ৬ দফা কর্মসূচীতে উল্লেখিত প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়িত করিয়া পরিপূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের ভিত্তিতে একটি সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকর করিবার দাবী জানান। ১১ই ডিসেম্বর সন্দ্বীপে

তিনি বলেন, ৬ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে দেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হইবে। " আওয়ামী লীগ এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং আমরা এমন একটি সংবিধান করিব যাহা বাঙালিদের উপর শোষণের অবসান ঘটাইবে।" নির্বাচনের ফলাফল দাঁড়ায় নিম্নরূপ ঃ

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ	১৬৭
পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	১
পূর্ব-পাকিস্তান স্বতন্ত্র প্রার্থী	১
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	৮৫
কাউন্সিল মুসলিম লীগ	৭
কনভেনশন মুসলীম লীগ	২
কায়েদে আজম মুসলিম লীগ	৯
ন্যাপ (ওয়ালী খান)	৮
জামায়াতে ইসলাম	৪
জামিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান	৭
জমিয়তে ওলামায়ে পাকিস্তান ও নেজাম ইসলাম পার্টি	৭
পশ্চিম পাকিস্তানে স্বতন্ত্র প্রার্থী	১৫

এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে ৩৮.৩ শতাংশ ভোট পাইয়া সমগ্র পাকিস্তান ভিত্তিক একটি দল হিসাবে জয়লাভ করে। অপরদিকে দ্বিতীয় বৃহত্তর দল হিসাবে জুলফিকার আলী ভূট্টোর পাকিস্তান পিপল্স পার্টি (পিপিপি) পূর্ব পাকিস্তানে কোন আসনই লাভ করে নাই। শুধুমাত্র আঞ্চলিক একটি দল হিসাবে ১৯.৫ শতাংশ ভোট অর্জন করিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ১৪ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকগুলিতে বিপুল সংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্য যোগদান করেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, শেখ মুজিবের ছয় দফা ভিত্তিক সংবিধানে সমগ্র পাকিস্তানের সদস্যদের সমর্থন রহিয়াছে।

সেনা বাহিনীর ক্র্যাকডাউন (২৫শে মার্চ) ঃ

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবের বিপুল জনপ্রিয়তা এবং ৬ দফা কর্মসূচীর প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন লইয়া তাঁহার ক্ষমতার চৌকাঠে আগমন পাক-সেনাবাহিনী এবং পাঞ্জাবী সদস্যগণ ভাল চোখে দেখেন নাই। তাঁহারা এই ভাবিয়া শংকিত হন যে বাঙালিদের দ্বারা শাসিত হইতে যাইয়া কতইনা যাতনার মধ্যে নিপতিত হন। তাই তাহারা বিকল্প নেতৃত্বের সন্ধান লাভ করেন পিপিপি নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টোর মধ্যে। সেনা অফিসাররা তাঁহার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া যান। ভূট্টোর সহিত পরামর্শ করিয়া ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ নির্ধারণ করেন। তারিখ নির্ধারিত হইলেও ভুট্টো হুমকি দেন, পূর্বাহ্নে ক্ষমতার ভাগাভাগিতে শেখ মুজিবের সহিত কোন বুঝাপড়া না হইলে তিনি অধিবেশন বর্জন করিবেন। কিন্তু সেনা কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করিবার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৫ই ফেব্রুয়ারি তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে অধিবেশন বর্জনের ঘোষণা দেন। এই সংবাদে এমন কি পশ্চিম পাকিস্তানী

সদস্যগণও বিস্ময় প্রকাশ করেন। কিন্তু ভূট্টো তাঁহার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদিগকে হুমকি দেন। 'খাকী কিংবা সাদাকালো পোষাকের যে কেউই পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ঢাকা যাক না কেন, তাহাকে নিজের উপর ঝুঁকি লইয়াই যাইতে হইবে।' ইয়াহিয়া তাঁহাকে নিস্ফলভাবে রাজি করাইতে চেষ্টা করেন। পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী ইয়াহিয়ার সহিত আলোচনা শেষে ভূট্টো সাংবাদিকদের বলেন, 'পাকিস্তান পিপলস্ পার্টিকে বাদ দিয়া যে কোন সংবিধান প্রণয়নের প্রচেষ্টা নিস্ফল, নেতিবাচক এবং উল্টা ফলাফল প্রদর্শন করিবে। কিন্তু তাঁহার এইসব নেতিবাচক বক্তব্য সর্বমহলে নিন্দিত হয় এবং কাইয়ূম গ্রুপের মুসলিম লীগ ছাড়া সমস্ত দলই অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকায় আগমণ করেন। প্রতিক্রিয়ায় শেখ মুজিব শুধু মন্তব্য করেন কেবলমাত্র ৬ দফা ভিত্তিক একটি শাসনতন্ত্র একটি শক্তিশালী, স্থিতিশীল, সুখী ও সমৃদ্ধ পাকিস্তান নিশ্চিত করিতে পারে।

অতঃপর ভূট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের সেনা অফিসার, সিভিল সার্ভিসের আমলা, বড় বড় শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ও ভূস্বামীদের বুঝাইতে সক্ষম হন যে ৬ দফার ভিত্তিতে সংবিধান রচিত হইলে পূর্ব-পাকিস্তানকে বিগত দিনে হারানো উহার ন্যায্য হিস্যা দিতে হইবে এবং প্রতিরক্ষা বিভাগে পাঞ্জাবীদের একাধিপত্য বিলুপ্ত হইয়া সেখানে বাঙালিরা স্থান করিয়া লইবে। শুধু তাহাই নহে শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানকে বাজার হিসাবে ব্যবহার করিয়া যে মুনাফা তাঁহারা হাসিল করিয়াছিলেন উহার অবসান হইবে, এবং কাশ্মীর সমস্যা চিরদিনের মত হিমাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে বাঙালিরা ৬ দফার মধ্যে তাহাদের অর্থনৈতিক বৈসম্যের অবসানসহ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি দেখিতে পায়।

ভূট্টো ও সিনিয়র সেনা কর্মকর্তাদের অনমনীয় মনোভাবের দরুন ইয়াহিয়া চরম হতাশায় নিমজ্জিত হন। ন্যায়নীতির কথা বিবেচনা করিয়াও তিনি তো আর সেনাবাহিনী এবং পশ্চিম পাকিস্তানের একটি মহল ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। অগত্যা ১লা মার্চ তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামিয়া আসে এবং বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। সেনাবাহিনীর উপর তাহারা সম্পূর্ণ আস্থাহীন হইয়া পড়ে। ছাত্র, শ্রমিক, জনতা স্বাধীনতার কর্মসূচী গ্রহণ করে। পরদিন ৩রা মার্চ পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম কমিটির সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ আওয়ামী লীগের জঙ্গী কর্মি ও ছাত্রদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসমাবেশে স্বাধীনতার কর্মসূচী সম্বলিত একটি প্রস্তাব পাঠ করেন।

পর্দার অন্তরালে পাঞ্জাবী সামরিক নীতি নির্ধারকেরা শেখ মুজিব তথা পূর্ব-পাকিস্তানের অসহিষ্ণু গণঅভ্যুত্থানকে অস্ত্রের সাহায্যে মোকাবিলা করিবার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১লা মার্চের পর হইতে সাদা পোষাকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে সেনাবাহিনীর লোকজন আনিতে আরম্ভ করেন। প্রকৃতপক্ষে সে সময় পূর্ব-পাকিস্তানে যে পরিমাণ অবাঙ্গালী সেনা সদস্য ছিল উহার দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানকে শায়েস্তা করা সম্ভব ছিল না। তাই অতিরিক্ত সৈন্য আনয়নের জন্য যথেষ্ট সময়েরও প্রয়োজন ছিল। ইতিপূর্বে ৩০শে ১৯৭১ জানুয়ারি কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের সদস্য পরিচয় দানকারী কতিপয় যুবক ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের একটি বিমান ছিনতাই করিয়া লাহোর বিমান বন্দরে তাহা ধ্বংশ করে। প্রতিবাদে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পূর্ব ও পশ্চিম

পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ভারতের আকাশসীমা বন্ধ করিয়া দেয়। তাই শ্রীলংকা হইয়া পি আই এর বিমানকে ঢাকা আসিতে অতিরিক্ত ৪ ঘন্টা বেশী সময় লাগিত। তাই পশ্চিম পাকিস্তান হইতে অতিরিক্ত সৈন্য আনিবার জন্য সময়ের প্রয়োজন ছিল। অতএব সামরিক জান্তা সমস্যা নিরসনের নামে সময়ক্ষেপণ করে এবং ২৫শে মার্চ পর্যন্ত পর্যাপ্ত সৈন্যসহ বিপুল অস্ত্রশস্ত্র পূর্ব-পাকিস্তানে আনয়ন করে।

শেখ মুজিব শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল ৬ দফার জন্য হোক বা যে উপায়েই হোক একবার ক্ষমতায় বসিতে পারিলে ক্রমান্বয়ে বাঙালিদের ন্যায্য হিসসা আদায় করা সম্ভব হইবে। কিন্তু পাঞ্জাবীরা শুধু সৈন্য আনিয়াই ক্ষান্ত ছিল না, তাহারা ঢাকার মিরপুর, মোহাম্মদপুর, সৈয়দপুর এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন বিহারী (অবাঙ্গালী মোহাজেরকে এক কথায় বিহারী বলা হইত) এলাকায় গোপনে অস্ত্র সরবরাহ করে এবং কৃত্রিম উপায়ে বাঙালি-বিহারী দাঙ্গার সূত্রপাত করে। শেখ মুজিব হিংসাত্মক আন্দোলন ত্যাগ করিয়া অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এই সময় সরকার মূলত শেখ মুজিবের নির্দেশে ও তাঁহার অনুসারীদের দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে। প্রথম যেসব মুখ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সেগুলি হইল ঃ

১। কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য কর আদায় স্থগিত করা এবং (২) ব্যাংকিং চ্যানেলে মূলধন পাচার বন্ধ করা।

প্রতিরক্ষা ছাড়া সরকারের প্রতিটি বিভাগকে আন্দোলনের এই নির্দেশনামার অধীনে আনা হয়। কেবলমাত্র সরকারী প্রশাসনই নহে মিল, কলকারখানা, ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির দায়িত্ব এবং আচরণ বিধিও এইসব নির্দেশাবলী অনুসারে পরিচালিত হইতে থাকে।

রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে ১৫ই মার্চ কয়েকজন জেনারেলকে সঙ্গে লইয়া ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। ১৬ হইতে ২৪ শে মার্চ শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে দেনদরবার অনুষ্ঠিত হয়। শেষের দিকে ভূট্টোও ইহাতে যোগ দেন। পূর্বের ন্যায় ইয়াহিয়া তাঁহার আচরণে সমঝোতামূলক মনোভাব প্রদর্শন করিয়া সংঘঠিত ঘটনাবলীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং রাজনৈতিক সমঝোতায় তাঁহার আন্তরিক আকাঙ্খা ব্যক্ত করেন। কিন্তু ভূট্টো, মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে সংঘঠিত আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ একটি স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ইতিপূর্বে ১ লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হইলে ২ রা মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। সবুজ জমিনের মধ্যখানে লাল বৃত্তের মাঝে বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র খচিত পতাকা পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বত্র উত্তোলন করা হয়। ২৩ শে মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে একমাত্র গভর্ণর হওয়া ছাড়া সর্বত্রই স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উড়ানো হয়। এই দিনটি সর্বত্র 'বাংলাদেশের মুক্তিদিবস' হিসাবে উদযাপন করা হয়। ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান রমনার রেসর্কোস ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ঐতিহাসিক ভাষণে শর্তসাপেক্ষে ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রস্তাব রাখেন। সর্বশেষ এইবারের সংগ্রামকে তিনি স্বাধীনতার সংগ্রাম বলিয়া উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান আন্তরিকভাবেই চাহিয়াছিলেন ভূট্টোর সহিত সমঝোতার মধ্যমে

সামরিক শাসকদের নিকট হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিরার জন্য। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতাকামী সর্বস্তরের জনগনকে তখন নিয়ন্ত্রণ নিরস্ত্র করা ছিল এক দুরূহ ব্যাপরে। ভূট্টোর একান্ত ইচ্ছা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ভূট্টোর ক্ষমতায় আরোহন করা এবং এইভাবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীভুত করা; যাহা ছিল পাকিস্তানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবারই নামান্তর, কিন্তু তারপরেও তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী শেখ মুজিবের হাতে সমগ্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব দিতে রাজী ছিলেন না, এবং সেই জন্যই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ প্রতারণার শিকার হইয়া পূর্ন স্বাধীনতার জন্য মরিয়া হইয়া উঠে। অপরদিকে ভূট্টোপন্থী সেনা কর্মকর্তাগণ বাঙালিদের চরম শিক্ষা দিবার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে সেনা সমাবেশ ঘটাইতে থাকে।

২৫ শে মার্চ ১৯৭১ রাত্রে পাক হানাদার বাহিনী ঢাকা সহ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সমস্ত সেনানিবাসে বাঙালি সৈন্যদের উপর অতর্কিতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ইউনিফর্ম -ধারী সমস্ত বাঙালিদের আক্রমনের টার্গেট বানায় রাত ১২ টায় শেখ মুজিবকে তাঁহার বাসভরন হইতে গ্রেফতার করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে লইয়া যায়। শুরু হইয়া যায় এক জঘন্য ধ্বংসযজ্ঞ। বাঙালিরাও গর্জিয়া উঠে। তাহারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় এবং বিশ্ববাসীর নিকট সাহায্যের আবেদন করে।

অতঃপর ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এবং ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশ হানাদার দখলমুক্ত হয় এবং অচিরেই জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

পরিশিষ্ট

বিপুল অর্থ-সম্পদে পরিপূর্ণ, রুক্ষ ও শ্যামলীমার সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠা প্রকৃতির লীলাভূমি ভারত বা হিন্দুস্থানের প্রতি প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত বহিরাগত দ্বিগ্বিজয়ী ও পর্যটকদের লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে অহর্নিশি। তাহারই এক পর্যায়ে মধ্যযুগের প্রারম্ভে আরব-মুসলিম অভিযাত্রীদের আগ্রাসনের শিকার হয় হিন্দুস্থান। অষ্টম শতাব্দীতে সাবধানী পদচারণায় আস্থাশীল হইয়া অতঃপর মধ্য এশিয়ার মুসলিম দিগ্বিজয়ীদের পদভারে প্রকম্পিত হয় হিন্দুস্থান। তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আর অভিযান নহে, প্রাথমিক তুর্কি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের মধ্য দিয়া দক্ষিণ এশিয়া তথা উত্তর ভারতে শুরু হয় মুসলিম শাসনের পদযাত্রা। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক দ্বারা শুরু হয় মুসলমানদের ভারত শাসনের সুলতানী আমল। বেশ কয়েকটি বংশে বিভক্ত সুলতানী আমলে সমুজ্জল থাকেন কুতুবুদ্দিন আইবেক, ইলত্যুৎমিশ, গিয়াসুদ্দিন বলবন, জালালুদ্দিন ফিরুজ খিলজী, আলাউদ্দিন খিলজী, গিয়াসুদ্দিন তুঘলক, মুহাম্মদ বিন তুঘলক, ফিরোজ শাহ্ তুঘলক এবং সিকান্দর লোদীর ন্যায় প্রতিভাবান সুলতানগণ।

দিল্লী কেন্দ্রিক সুলতানী আমলে ভারতে ভয়াবহ আক্রমণ পরিচালনা করেন 'খোদাই অভিশাপ' (Scourge of God) মধ্য এশিয়ান আক্রমণকারী মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান। কথিত আছে, যে উর্বর শ্যামলিমায় আচ্ছাদিত সবুজ অঞ্চলে চেঙ্গিস খানের অশ্বারোহী বাহিনীর অশ্বখুর লাগিয়াছে সেই অঞ্চল মুহূর্তে বিবর্ণ ও রুক্ষ রূপ ধারণ করিয়াছে। বহুদিন

ঐ অঞ্চলে সবুজের সমারোহ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। চেঙ্গিস খানের সেই ভয়াবহ আক্রমণ হইতে দিল্লীর সুলতানগণ হিন্দুস্থানকে রক্ষা করিয়াছিলেন—এই কৃতিত্ব একান্তই দিল্লীর সুলতানদের। সালতানাতের পতনের যুগে ইহা বেশ কয়েকটি বিদেশী আক্রমনের শিকার হয়; তন্মধ্যে মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী তৈমূর লং ছিলেন অন্যতম। দিল্লীতে যুগ যুগ ধরিয়া সঞ্চিত অনেক ধনসম্পদ তৈমূর তাঁহার রাজধানী সমরখন্দে লইয়া যান এবং ইহার প্রাচ্যের অনন্য সুন্দর নগরীতে পরিণত করেন। তৈমূরের আক্রমণের পর দিল্লী সালতানাত আর বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। লোদী আমলে মধ্য এশিয়ার আরেক ভাগ্যান্বেষী, দিগ্বিজয়ী চেঙ্গিস-তৈমূরের বংশধর জহিরুদ্দিন বাবরের আক্রমণের মুখে লোদী বংশ খান খান হইয়া যায় এবং তদস্থলে ক্ষমতার হাতবদলে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে জাঁকজমকের সাথে।

মুঘল সাম্রাজ্য হিন্দুস্থানকে উপহার দেয় যুগোপযোগী একটি সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা। কাবুল হইতে টেকনাফ এবং হিমালয় হইতে করমণ্ডল উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য শাসিত হয় এককেন্দ্র হইতে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাটগন যথাক্রমে বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহ্জাহান এবং আওরঙ্গজেব ভারতকে সুশীল প্রশাসন, সামরিক নিয়ন্ত্রণ, শিল্পকলা, স্থাপত্য, শিল্প কারখানা, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি দ্বারা সুষমামণ্ডিত করেন। ভারতে দেশীয় ও ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ট তৃতীয় এক ধারা সৃষ্টি হয় যাহা ইন্দো-ইসলামী শিল্পকলা ও স্থাপত্যে সমৃদ্ধি লাভ করে। সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই নূতন ধারা সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে বিধায় ভারতের প্রজাসাধারন সমস্বরে গাহিয়াছেন- "দিল্লিশ্বরোবা, জগদ্বিশ্বরোবা- যিনি দিল্লীর ঈশ্বর (অর্থাৎ সম্রাট) তিনি জগতের ঈশ্বর।

তবে ইহার মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন এক পাঠান শের শাহ, যিনি ভূমি প্রশাসনে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করেন। কৃষকদিগকে কবুলিয়াতের মাধ্যমে জমির উপর রায়তি মালিকানা প্রদান করেন, সমগ্র হিন্দুস্থানকে অনেকগুলি মহাসড়ক দ্বারা বেষ্টন করেন এবং সম্রাট আকবরের প্রসিদ্ধ ভূমি প্রশাসনের পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করেন।

১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সাথে সাথে আরম্ভ হয় পতনের যুগ। পতনের যুগ স্থায়ী হয় আরও দেড়শত বৎসর। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ভারতের শাসন ক্ষমতা মুঘলদের হাত হইতে বৃটিশ রাজের কাছে স্থানান্তরিত হইলেও ইহার পূর্বেই কার্যত ইংরেজ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালনা করে। মুঘল সম্রাটগন নামে মাত্র সম্রাট ছিলেন, কিন্তু মূলতঃ তাহারা ছিলেন ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পেনশনভোগী মাত্র। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে মুসলিম মনীষী ও সংস্কারকগণ আপ্রাণ চেষ্টা করেন মৃতপ্রায় মুসলিম সমাজে প্রাণ সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে উজ্জিবিত করিতে। এই পর্যায়ে ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালি উল্লাহর নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই পর্যায়ে তাহারা সশস্ত্র সংগ্রামে জড়াইয়া পড়েন—প্রথমে শিখদের বিরুদ্ধে এবং পরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে। এই সশস্ত্র প্রতিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৮৫৭ সালের প্রত্যক্ষ সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়া। ওহাবী আন্দোলন নামে এই আন্দোলন পূরা ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ধিকি ধিকি জ্বলন্ত থাকিলেও ১৮৫৭ সালেই প্রকৃতপক্ষে সংগ্রামীগণ বুঝিতে পারেন যে ইংরেজদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের মুখে সেকেলে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া

টিকিয়া থাকা প্রায় অসম্ভব। এই পর্যায়ে মুসলমান সমাজ আধুনিক শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং আলীগড় শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা ইংরেজদের সহিত সম্পর্ক পূনরুদ্ধারের প্রয়াস পায়। কিন্তু আরেকটি অংশ দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে এবং অসির পরিবর্তে মসির দ্বারা ইংরেজ বিরোধী স্পৃহা জাগরুক রাখে। পরবর্তীকালে ইহারা জাতীয় কংগ্রেস এর সহিত একযোগে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করে এবং ১৯৪৭ সালের পাক-ভারত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখে।

ইংরেজ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসা ও খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য এই দেশে আগমণ করিলেও অতি সূক্ষ্ম কূটকৌশলের মাধ্যমে তাহারা এই দেশের শাসন ক্ষমতা ক্ষয়িষ্ণু মুঘল বংশ হইতে কাড়িয়া লয়। অন্যুন দুইশত বৎসরের শাসনামলে ইংরেজরা এই দেশের সম্পদ ব্রিটিশ দ্বীপপূঞ্জে অতি সন্তর্পণে পাচার করিলেও তাহারা ভারতের আধুনিকায়নে বিরাট ভূমিকা পালন করে। ভারতকে তাহারা একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করে এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়িয়া তোলে। সমগ্র হিন্দুস্থানের জনজীবনে তাহারা কতটুকু আধুনিকতা প্রবিষ্ট করাইতে সক্ষম হইয়াছিল তাহা এক বিতর্কের বিষয় হইলেও তাহারা নিদেন পক্ষে একটি পাশ্চাত্য শহুরে পরিবেশ এবং একটি শক্তিশালী আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহাতে বোধ হয় সবাই মোটামুটি একমত হইবেন।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র রাখিয়া গেলেও পাকিস্তান ইহার পূর্বাঞ্চল লইয়া স্থিতিশীল থাকিতে পারে নাই। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ইহার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তানকে আরেক উপনিবেশে পরিণত করে। বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আহরণকারী পূর্ব-পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার হয়। জনগণ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের দাবী করে। আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। পূর্ব পাকিস্তানীগণ জনগণের ভোটের মাধ্যমে সমগ্র পাকিস্তানের সরকার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব ভার গ্রহণের মত অবস্থায় উপনিত হইলে পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক এবং পাঞ্জাবী সেনা কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত কেন্দ্রীয় সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানীদের সরকার প্রধানের পদ প্রদানে অনিহা প্রদান করিলে বাঙালি জনগণ গর্জিয়া উঠে। পাঞ্জাবী সেনাকর্তারা চান অস্ত্রের জোরে বাঙালিদের দাবাইয়া রাখিতে। পাঞ্জাবী প্রয়াস ব্যর্থ হয় এবং বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের দাবী স্বাধীনতার দাবীতে রূপলাভ করে। বাঙালিরা অতঃপর স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ২৬শে মার্চ ১৯৭১ হইতে শুরু হইয়া যায় এক রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতার যুদ্ধ। ইহারই পরিণতিতে পাকিস্তান ভাঙ্গিয়া যায় এবং পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

পাদটীকা

১। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৯০৫-১৯৪৮) দলিলপত্র পৃঃ ১১৭।

২। ঐ পৃঃ ১২১, ১২২

৩। ঐ পৃঃ ১২২

৪। ঐ পৃঃ ১২২-১২৩

৫। একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৬। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত; পৃষ্টা ৪৫১। মূল ইংরেজী হইতে অনুদিত।

৭। মওদুদ আহম্মদ ঃ বাংলাদেশ: স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা পৃ ২৪

৮। ঐ পৃঃ ২৭

৯। ঐ পৃঃ ৩৪

১০। ঐ

১১। ঐ পৃঃ ৬

১২। ঐ ৩৯।

১৩। ঐ।

১৪। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পা ঃ প্রাগুক্ত; পৃ ঃ ৪৫৫

১৫। ঐ পৃঃ ৪৫৬।

১৬। মওদুদ আহম্মদ ঃ প্রাগুক্ত; পৃ ঃ ৪৮।

১৭। ঐ পৃ ৫৪।

১৮। ঐ পৃ ঃ ৬৩

১৯। হাসান হাফিজুর রহমানঃ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড পৃঃ ২৫৯

২০। ঐ পৃঃ ২৫৯-২৬৬।

২১। মওদুদ আহমদঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২

২২। ঐ।

২৩। ঐ, পৃঃ ১১২।

২৪। ১৯৫৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ও বেলুচিস্তান প্রদেশসমূহকে একত্রিত করিয়া এক প্রদেশে রূপান্তরিত করা হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ নামে অভিহিত করা হয়। উহাই এক ইউনিট।

২৫। মওদুদ আহমদ ঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৫।

নির্ঘণ্ট

ই

খ

ট

ড

ঢ

ত

থ

দ

ধ

ন

য

র

ল

শ